তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দশম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ (২২০০) ১৩৬০
দ্বিতীয় মুদ্রণ (২২০০) ১৩৮৮

উপদেষ্টা পরিষদ :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর সুকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯ গুল্‌ ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

আরোগ্য-নিকেতন

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

কর কমলেষু—

আরোগ্য-নিকেতন অর্থাৎ চিকিৎসালয়। হাসপাতাল নয় দাতব্য চিকিৎসালয়ও নয়—দেবীপুর গ্রামের তিন পুরুষ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী মশায়দের চিকিৎসালয়।

স্থাপিত হয়েছিল প্রায় আশি বৎসর পূর্বে। এখন ভাঙা-ভগ্ন অবস্থা; মাটির দেওয়াল ফেটেছে, চালার কাঠামোটার কয়েকটা জায়গাতেই জোড় ছেড়েছে—মাঝখানটা খাঁজ কেটে বসে গেছে কুঁজো মানুষের পিঠের খাঁজের মতো। কোনো রকমে এখনও খাড়া রয়েছে,—প্রতীক্ষা করছে তার সমাপ্তির; কখন সে ভেঙে পড়বে সেই ক্ষণটির পথ চেয়ে রয়েছে।

অথচ যেদিন স্থাপিত হয়েছিল সেদিন স্থাপন-কর্তা জগদ্বন্ধু কবিরাজ মহাশয় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ঠাকুরদাস মিশ্রকে বলেছিলেন, বুঝলে ঠাকুরদাস, "যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী" বলব না—তবে··· আমাদের বংশের বসতি এখানে যতকাল থাকবে ততকাল এ আটন, এ পাট পাকা হয়ে রইল। হেসে বলেছিলেন—দম্ভ মনে করিস না ভাই, দম্ভ নয়। হাত দুখানি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেছিলেন, অক্ষয় লাভের কারবার। যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে। পুরানো ঘিয়ের মতো—যত দিন যাবে তত দাম বাড়বে। বলতে গেলে সংসারে শ্রেষ্ঠ লাভের কারবার। দেনা-পাওনা—দেওয়া-নেওয়া দুই দিকেই শ্রেষ্ঠ লাভ মিলবে এখানে, অথচ দুই পক্ষের কেউ ঠকবে না।

জগদ্বন্ধু মহাশয়ের বন্ধু ঠাকুরদাস মিশ্র ছিলেন একেবারে হিসেবনবিশ বিষয়ী লোক, পেশায় জমিদারের গোমস্তা। তিনি বড় বড় অঙ্ক বুঝতেন, মামলা মকদ্দমা বুঝতেন, দলিল আরজি জবাব বুঝতেন, কিন্তু এই সব তত্ত্ব বুঝতেন না। তিনি বক্রভাবেই বলেছিলেন—নাড়ী টিপে আর গাছগাছড়া তুলে এনে ছেঁচে পিষে শুকিয়ে পাঁচন-বড়ি দিলেই পয়সা। টাকায় অন্তত চোদ্দ আনা লাভ তোমার বাঁধা—সে বুঝলাম। কিন্তু—রোগীর লাভ? ওটা কী করে বললি জগ? তোর লাভ, রোজকার রোগীর খরচ, সে দেনা করেও করতে হবে। তার তো ধনে-প্রাণে মরণ।

বাধা দিয়ে জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন—তুই বাঁকা পথে হাঁটিস ঠাকুরদাস। পয়সার কথাটা পরের কথা। যে লাভ বললাম সে লাভ পয়সার নয়, অথচ ওইটাই সংসারে শ্রেষ্ঠ লাভ। একপক্ষের লাভ আরোগ্যলাভ, অন্যপক্ষের লাভ সেবার পুণ্য। জানিস? বিশ্বসংসারে আরোগ্যলাভই হল শ্রেষ্ঠ লাভ। যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে যে-সব প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল—লাভানামুত্তমং কিম্—? সংসারের লাভের মধ্যে সর্বোত্তম লাভ কী? যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—'লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যম্' অর্থাৎ আরোগ্যলাভই সংসারের শ্রেষ্ঠ লাভ।

সেদিন ঠাকুরদাস মিশ্র হেসেছিলেন। বলেছিলেন—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না জগ। তা সে গঙ্গার চরের নালতের শাক হলেও না। ও তোর ধম্মপুত্ত যুধিষ্ঠিরের সংস্কৃত শোলোকেও কবরেজদের টাকার লাভের হিসেব ধরা পড়বে না। কথা শেষ করে জগদ্বন্ধুকে বেশ এক হাত নেওয়ার আনন্দে হো-হো করে হেসেছিলেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন পরই হঠাৎ বাতব্যাধিতে

আক্রান্ত হয়ে মাস তিনেক পঙ্গু হয়ে থেকে ওই জগদ্বন্ধু মশায়ের চিকিৎসাতেই আরোগ্যলাভ করে বলেছিলেন—তুই ভাই আমাকে জীবনদান করলি, তুই জেনে রাখিস ভাই যে, যদি কোনোদিন দরকার হয় আমি তোর জন্যে জীবন দেব।

হেসে জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন—তা হলে—লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যম্—কথাটা স্বীকার করলি আজ ?

মিশ্র হেসেই বলেছিলেন—হ্যাঁ, তা করলাম।

পরদিন মিশ্র নিজে জগদ্বন্ধু মশায়ের আরোগ্য-নিকেতনে এসে একটা কাঠির ডগায় ন্যাকড়া জড়িয়ে তেল-সিঁদুরের লালরঙে নিজের হাতে দেওয়ালে মোটা হরফে লিখে দিয়েছিলেন—লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যম্।

আরোগ্য-নিকেতন নামকরণ তখন হয় নাই। তখন এ অঞ্চলের লোকেদের কতক বলত—'মশায়ের হোথা', কতক বলত—'মশায়ের কোবরেজখানা'।

আরোগ্য-নিকেতন নামকরণ হয়েছিল পুরুষান্তরে জগদ্বন্ধু মশায়ের ছেলে জীবন-মশায়ের আমলে। তখন কালান্তর ঘটেছে। একটি নতুন কাল শুরু হয়েছে। দেশের কেন্দ্রস্থল নগরে নগরে তার অনেক আগে শুরু হলেও এ অঞ্চলে তখন তার প্রারম্ভ। জীবনমশায় তাঁদের চিকিৎসালয়ের নামকরণ করে বড় একটি কাঠের ফালির উপর কালো হরফে আরোগ্য-নিকেতন নাম লিখে বারান্দার সামনে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়—জগদ্বন্ধু মশায় যে ঘরখানি করেছিলেন সে ঘরেরও অনেক অদলবদল করেছিলেন। তক্তাপোশের উপর ফরাসের ব্যবস্থা যথাযথ রেখে তার সঙ্গে চেয়ার টেবিল বেঞ্চি জুড়ে দিয়েছিলেন।

আজও দেখতে পাবেন। নড়বড়ে টেবিল, হাতলভাঙা চেয়ার এখনও আছে। বেঞ্চিখানা শক্ত। সেটা আজও নড়ে না।

আরোগ্য-নিকেতনের জীর্ণ পতনোন্মুখ ঘরখানি—ওই নামলেখা কাঠের ফলক—এমন কি জীবনবন্ধু মশায়কেও দেখতে পাবেন, সেখানে গেলে।

যাবেন, মহানগরী থেকে শতাধিক মাইল। চলে যাবেন বড় লাইনের ট্রেনে…জংশনে নেমে পাবেন একটি অপরিসর শাখা-রেলপথ। মাইল দশেক গিয়ে পাবেন একটি সমৃদ্ধ গ্রামের স্টেশন। চারিদিকে দেখতে পাবেন কালান্তরের সুস্পষ্ট পরিচয়। দেখতে পাবেন, একখানা ট্যাক্সি, একখানা মোটর বাস, সাইকেল রিকশা, গোরুর গাড়ি। স্টেশন থেকে এই আরোগ্য-নিকেতন দূর পথ নয়, সামান্য পথ, এক মাইলের কিছু উপর ; প্রয়োজন হলে গোরুর গাড়ি একখানা নেবেন কিংবা সাইকেল রিকশা। কিন্তু তার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো। দেখতে পাবেন ভাঙাগড়ায় বিচিত্র গ্রামখানিতে পুরাতন-নূতনের সমাবেশ।

পাকা লাল কাঁকরে তৈরি সড়ক ধরে যাবেন। দেখবেন প্রাচীন কালের জমিদারদের বড় বড় নোনাধরা পাকা বাড়ি। ভাঙা বাগান। ধসে-পড়া পাঁচিল। শ্যাওলা-পড়া মন্দির। পুকুরের ভাঙা ঘাট। পুরানো মন্দির। চারিদিকেই দেখবেন ধূলি-ধূসরতা ; আবর্জনার স্তূপ। পতিত জায়গায় আগাছার জঙ্গল। এরই মধ্যে এক জায়গায় পাবেন এক পুরানো বৃদ্ধ বট ; শাখা-

প্রশাখা জীর্ণ ; গোড়াটা বাঁধানো ; তাতেও দেখবেন অনেক ফাটল। এটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা। এর পরই এই রাস্তাটি শেষ হয়েছে, মিশেছে প্রশস্ত একটি পাকা সড়কের সঙ্গে। লালমাটি ও নুড়ি-জমানো রাস্তা, রাস্তার দুপাশে দোকান। এইটিই হল বাজারপাড়া। প্রাণস্পন্দনে মুখরিত। মাল-বোঝাই গোরুর গাড়ির সারি চলেছে, মানুষ চলেছে, কোলাহল উঠছে, গন্ধও এখানকার বিচিত্র। বাজারটা দিন দিন বেড়ে চলেছে। চা-মিষ্টান্নের দোকান পাবেন ; ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করলে এখানে ঢুকে পড়বেন। নবগ্রাম মেডিকেল স্টোর্সের পাশেই আছে সবচেয়ে ভালো চা-মিষ্টির দোকান। খুব খুঁজতে হবে না, নবগ্রাম মেডিকেল স্টোর্সের ঝকঝকে বাড়ি, আসবাব, বহু বর্ণে বিচিত্র বিভিন্ন ওষুধের বিজ্ঞাপন আপনার দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করবে। বুশশার্ট-প্যাণ্ট-পরা হরেন ডাক্তারকে গলায় স্টেথোসকোপ ঝুলিয়ে বসে থাকতেও দেখতে পাবেন। ভালো চায়ের দোকানটা ঠিক এর পাশেই।

এখান থেকেই আবার উত্তরমুখী একটি শাখাপথ পাবেন। রাস্তাটি খুব পরিসর নয় ;— একখানি গাড়ি যায়, দুপাশে দুসারি লোক বেশ স্বচ্ছন্দে চলতে পারে।

একটু, বোধ হয় সিকি মাইল, চলবেন ছায়াচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে ; দুপাশে চার-পাঁচটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পাড়ের উপর আম, জাম, শিরীষ, তেঁতুলের গাছগুলি দুপাশ থেকে পল্লব বিস্তার করে পথটিতে ছায়া ফেলেছে। একটি পুকুরে একটি ছোট বাঁধা ঘাটও পাবেন। এখান থেকে বের হলেই পাবেন উন্মুক্ত প্রান্তর। এখানে দেখবেন বিচিত্র দৃশ্য। নতুন বাড়িঘর, একেবারে নতুন কালের ফ্যাশন, নতুন কালের ইঞ্জিনীয়ারিং এর নিদর্শন। ক্যানেল আপিস তৈরি হয়ে গেছে। আশেপাশে ছোট ছোট কোয়ার্টার। এ দিকে নতুন ক্যানেল তৈরি হচ্ছে। এর পরই পাবেন আর একদফা বাড়ির সারি ; গুটিকয়েক ছোট ইমারতকে ঘিরে বড় বড় ইমারত তৈরি চলেছে। চারিদিকে ভারা বাঁধা, রাজমজুর খাটছে, মজুরনীরা গান গাইছে আর ছাদ পিটছে। হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-পরা ইঞ্জিনীয়ার ঘুরছে সাইকেল হাতে নিয়ে। ওই ছোট বাড়িগুলি এখানকার হাসপাতাল। ছোট হাসপাতালটি, ডাক্তার-কম্পাউণ্ডারের ছোটখাটো দুটি কোয়ার্টার ; আও ছোট কয়েকটি কাঁচাবাড়ির বাসা, এখানে থাকে নার্সেরা। একটু দূরে একটি ছোট ঘর দেখবেন—সেটি মোতিয়া ডোমের বাড়ি। আর ওই অর্ধসমাপ্ত বড় ইমারতটি— ওটিও হাসপাতালের ইমারত, এ অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

এ সব দেখে থমকে দাঁড়াবেন না। নতুন গঠনের মধ্যে আশা আছে, ভবিষ্যৎ গড়ছে— সুতরাং মনে মোহের সঞ্চার হবে, স্বপ্ন জেগে উঠবে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ; সেই স্বপ্নে ভোর হয়ে পড়বেন, আরোগ্য-নিকেতন পর্যন্ত যেতে আর মন উঠবে না।

চলে যাবেন এগিয়ে, এই সব নতুন কালের ঝকঝকে ইমারতগুলিকে বাঁয়ে রেখে চলে যাবেন। আরও মাইলখানেক পথ যেতে হবে। দুধারে শস্যক্ষেত্র ; মাঝখানে লাল কাঁকর-দেওয়া ওই একখানি গোরুর-গাড়ি যাওয়ার মতো আঁকাবাঁকা পথটি। মাইলখানেক পর গ্রাম দেবীপুর ; এই গ্রামেই আছে পুরাতন আরোগ্য-নিকেতন।

শ্রীহীন গ্রাম দেবীপুর, দারিদ্র্যের ভারেই শুধু নিপীড়িত নয়, কালের জীর্ণতাও তাকে জীর্ণ

করে তুলেছে। লক্ষ্য করে দেখবেন—গ্রামের বসতির উপরে যে গাছগুলি মাথা তুলে পল্লব বিস্তার করে রয়েছে তার অধিকাংশই প্রবীণ প্রাচীন, নতুন গাছের লাবণ্যময় শোভা কদাচিৎ চোখে পড়বে। জীবনের নবীনতার ধ্বজা হল নতুন সতেজ গাছের শ্যামশোভা। প্রথমেই চোখে পড়বে—ঝড়ে-শুয়ে-পড়া শূন্যগর্ভ বকুলগাছতলায় ধর্মঠাকুরের আটন। তার পরেই পাবেন একটি কামারশালা; অবশ্য কামারশালাটির অস্তিত্ব অনেক আগে থেকেই অনুভব করবেন আপনি। কামারশালার ঠং-ঠং শব্দ দেবীপুরের দক্ষিণে—ওই নতুনকালের বসতি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠছে যে প্রান্তরে—সেই প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। ইমারতের দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছে।

কামারশালে দেখবেন চাষীদের ভিড়, গলিত লোহার ফুলকি। তারপরই গ্রাম শুরু। শান্ত ছোট গ্রাম। বাঁশের বনে শিরীষগাছের মাথায় পাখি ডাকে। নানা ধরনের পাখি।

কুহু—কুহু—কুহু!

চোখ—গে-ল! চোখ গে-ল!

কৃষ্ণ কো-থা হে!

বউ কথা কও!

কা—কা—কা! ক-ক্ ক-ক্ ক-ক্!

মধ্যে মধ্যে বড় অর্জুনগাছের মাথার উপরে চিল ডেকে ওঠে—চি—লো! চি—লো! পথের উপর শালিকের ঝাঁকের কলহ-কলরব—ক্যা-ক্যা করকর কিচিরমিচির কট-কট কট-কট; তারপরই লেগে যায় ঝাপটাঝাপটি।

মানুষের দেখা পাবেন কদাচিৎ। যা দু-একজন পাবেন তারা দেহে জীর্ণ, মনে ক্লান্ত, দৃষ্টিতে সন্দিগ্ধ। আপনাকে দেখেও কথা বলবে না। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে যাবে, কিছু দূর গিয়ে পিছন ফিরে আবার তাকাবে। কে? বামপন্থী না দক্ষিণপন্থী? ভোট চায়? না, চাঁদা?

সেকালে অর্থাৎ যখন আরোগ্য-নিকেতন প্রথম স্থাপিত হয়েছিল তখন ধারা ছিল অন্যরকম। দেশের অবস্থাও ছিল আর-এক রকম। গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে গাই ছিল, ভাঁড়ারে গুড় ছিল, পুকুরে মাছ ছিল। লোক এক হাতে পেট পুরে খেত—দুহাতে প্রাণপণে খাটত। দেহে ছিল শক্তি, মনে ছিল আনন্দ। সে মানুষেরাই ছিল আলাদা। একালের মতো জামা জুতো পরত না; হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরে অনাবৃত প্রশস্ত বক্ষ দুলিয়ে চলে যেত। ধবধবে কাপড় জামা চকচকে জুতোপরা আপনাকে দেখলে হেঁট হয়ে নমস্কার করে বলত—কোথা থেকে আসা হচ্ছে বাবুমহাশয়ের? কোথায় যাওয়া হবে প্রভু?

আপনি বলতেন—আরোগ্য-নিকেতন।

—ওঃ! তা নইলে—আপনাদের মতো মনুষ্য আর কোথা যাবেন ই গেরামে! তা চলে যান। ওই সামনেই দেখছেন—মা কালীর থান, বাঁয়ে চন্দ মশায়ের লটকোনের দোকান—ডাইনে ভাঙবেন—দেখবেন বাঁধানো কুয়ো; সরকারী কুয়ো, তার পাশেই জীবনমশায়ের

কবরেজখানা, অর্থাৎ আরোগ্য-নিকেতন। লোকে লোকারণ্য। গাড়ির সারি লেগে আছে। চলে যান।

আজ কিন্তু সেখানে মানুষজন পাবেন না। লোকারণ্য কথাটা আজ অবিশ্বাস্য, এমন কি হাস্যকর বলেই মনে হবে। সকালের দিকে দুজন বড় জোর ছ-সাত জন রোগী আসে, হাত দেখিয়ে চলে যায়; আরোগ্য-নিকেতনে আজ আর কোনো ওষুধ পাওয়া যায় না; ওষুধের আলমারিগুলি খালি পড়ে আছে। বার্নিশ চটে গেছে, ধুলোয় সমাচ্ছন্ন। দুটো-তিনটের কব্জা ছেড়ে গেছে। যারা হাত দেখাতে আসে তারা হাত দেখিয়ে ওষুধ লিখে নিয়ে চলে যায়, তারপর বাকি সময়টা স্থানটা প্রায় খাঁ-খাঁ করে।

অপরাহ্নের দিকে গেলে দেখতে পাবেন জীবনবন্ধু মশায় একা বসে আছেন। দেখতে পাবেন উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পঁচিশ হাত লম্বা একখানা খোড়ো কোঠা-ঘর। প্রস্থে আট-দশ হাত। সামনে একটি সিমেণ্ট-করা বারান্দা, সেটা এখন ফেটে প্রায় ফুটিফাটা হয়ে গিয়েছে, মধ্যে মধ্যে খোয়াও উঠে গিয়েছে, তিন পাশের স্বল্পগভীর ইটের ভিত ঠাঁই ঠাঁই বসে গিয়েছে। ধুলো জমে আছে চারিদিকে। শুধু বারান্দার দুই কোণে দুটি রক্তকরবীর গাছ সতেজ সমারোহে অজস্র লাল ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে বাতাসে দুলছে। ওই গাছ দুটির দিকে চেয়ে বসে আছেন বৃদ্ধ 'মশায়'। প্রায় সত্তর বছর বয়স;—স্থবির, ধূলিধূসর,—দিক-হস্তীর মতো প্রাচীন। এককালের বিশাল দেহের কাঠামো কুঞ্চিত দেহচর্মে ঢাকা; বক্ষপঞ্জর প্রকট হয়ে পড়েছে, মোটা মোটা হাত—তেমনি দুখানি পা, সামনে দেখবেন প্রকাণ্ড আকারের অতিজীর্ণ একজোড়া জুতো, পরনে থান-ধুতি—তাও সেলাই-করা; শোভা শুধু শুভ্র গজদন্তের মতো পাকা দাড়ি-গোঁফ; মাথার চুলও সাদা—কিন্তু খাটো করে ছাঁটা।

পুরানো আমলের একখানা খাটো-পায়া শক্ত তক্তাপোশের উপর ছেঁড়া শতরঞ্জি বিছিয়ে বসে থাকেন। ফুলে-ভরা গাছ দুটির দিকে চেয়ে শুধু ভাবেন। নানা ভাবনা। বিচিত্র এবং বহুবিধ।

ভাবেন—মানুষের চেয়ে গাছের আয়ু কত বেশী! ওই করবীর কলম দুটি তাঁর বাবা লাগিয়েছিলেন—সে প্রায় ষাট বৎসর হল! আজও গাছ দুটির জীবনে এতটুকু জীর্ণতা আসে নাই।

ভাবনায় ছেদ পড়ে যায় তাঁর। কে যেন কোথায় অস্বাভাবিক বিকৃতস্বরে কী যেন বলছে। চারিদিকে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পান না। পরক্ষণেই হাসেন তিনি। হাটকুড়ো জেলের পোষা শালিক পাখিটা আশেপাশে কোনো গাছে বসে আছে, গাছতলায় পথে কাউকে যেতে দেখে কথা বলছে। বলছে—মাছ নাই! মাছ নাই! মাছ নাই!

পাখিটা সাধারণ পাখি থেকে খানিকটা ব্যতিক্রম। পোষমানা পাখি—ছাড়া পেয়ে উড়ে গেলে আর ফেরে না। প্রথম প্রথম বাড়ির কাছে আসে—উড়ে বেড়ায়—চালে বসে—উঠানেও নামে—কিন্তু খাঁচাতে আর ঢোকে না। এ পাখিটা কিন্তু ব্যতিক্রম। ওকে সকালে খাঁচা খুলে ছেড়ে দেয়, পাখিটা উড়ে যায়, আবার সন্ধ্যার সময় ঠিক ফিরে আসে। খাঁচায়

দরজা খোলা থাকলে একেবারে খাঁচায় ঢুকে পড়ে। না থাকলে—খাঁচার উপর বসে ডাকে—মা—মা—মা! বুড়ো, বুড়ো, অ-বুড়ো!

বুড়ো হল হাটকুড়ো জেলে। হাটকুড়োর স্ত্রী ওকে বুড়ো বলে ডাকে। সেইটা পাখিটা শিখেছে। ওই পাখিটা বোধ হয় কাছেই কোথাও এসে বসেছে, জীবন দত্তকেই দেখে ডেকে কথা বলছে। মানুষের দর্শনে পাখিটা জীবনে সার্থকতা লাভ করেছে। অন্তত লোকে তাই বলে। বলে—পূর্বজন্মের সাধনা কিছু আছে। কেউ বলে—মানুষই ছিল পূর্বজন্মে, কোনো কারণে শাপগ্রস্ত হয়ে পক্ষী হয়ে জন্মেছে।

জীবনমশায় দাড়িতে হাত বোলান। সঙ্গে সঙ্গে হাসেন। জীবন জন্মান্তর সম্পর্কে বিশ্বাস এ যুগে উলটে-পালটে গেল। তাই তিনি কোনো ভাবনাই ভাবেন না। ঘন ঘন হাত বোলান তিনি দাড়িতে। এক-একবার খুব ছোট করে ছাঁটা মাথার চুলের উপর হাত বোলান, বেশ লাগে। হাতের তালুতে সুড়সুড়ি লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবেন, মুখুজ্জে তো এখনও এল না!

সে এলে যে দাবা নিয়ে বসা যায়। কালসমুদ্রের খানিকটা—অন্তত রশিখানেক—কাগজের নৌকায় পরমানন্দে অতিক্রম করা যায়। সেদিন শ্রাবণের অপরাহ্ণ। মশায় পথের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। আকাশে মেঘ জমে রয়েছে। ঘুনি-ঘুনি বৃষ্টি পড়ছে, উতলা হাওয়া বইছে; অপরাহ্ণেই ছায়া এমন গাঢ় হয়েছে যে সন্ধ্যা আসন্ন মনে হচ্ছে। কিন্তু সেতাবের সাদা-ছাউনি-দেওয়া ছাতা এর মধ্যে বেশ দেখা যাবে; বয়স হলেও জীবনমশায়ের চোখ বেশ তাজা আছে। ইদানীং সুচে সুতো পরাতে চশমা সত্ত্বেও একটু কষ্ট হলেও দূরের জিনিস—বিশেষ করে কালোর গায়ে সাদা কি সাদার মধ্যে কালো ছাতার মতো বড় জিনিস—চিনতে কোনো কষ্ট হয় না তাঁর। দেহ সম্পর্কে ভালো যত্ন নিলে এটুকু দৃষ্টিহানিও বোধ হয় হত না। সেতাবের দেহও ভালো আছে। মধ্যে মধ্যে সেতাবের নাড়ী তিনি পরীক্ষা করে দেখেন। বুড়োর যেতে এখনও দেরি আছে। নাড়ীর গতি কী!

জীবনমশায়, নাড়ীর মধ্যে, কালের পদধ্বনি অনুভব করতে পারেন। এটি তাঁর পিতৃ-পিতামহের বংশগত সম্পদ। তাঁরা ছিলেন কবিরাজ। তিনি প্রথম ডাক্তার হয়েছেন। কবিরাজি অবশ্যই জানেন। প্রয়োজনে দুই মতেই চিকিৎসা করে থাকেন। তবে এই নাড়ী দেখাই তাঁর বিশেষত্ব। নাড়ীর স্পন্দনের মধ্যে রোগাক্রান্ত জীবনের পদক্ষেপ থেকে রোগীর রোগের স্বরূপ এবং কালের দ্বারা আক্রান্ত জীবনের পদক্ষেপ থেকে কাল কতদূরে তাও তিনি বুঝতে পারেন।

নিদান হাঁকায় জীবনমশায়ের নাম ছিল—আজও আছে।

নাড়ী দেখে বহুজনের মৃত্যু তিনি পূর্বাহ্ণেই ঘোষণা করেছেন তাঁর চিকিৎসক-জীবনে। একের পর এক রোগীর কথা পলকে পলকে মনে উঠে মিলিয়ে যায়। এই মনে পড়াটার গতি অতি অস্বাভাবিক রকমের দ্রুত। থেমে গেল এক জায়গায়। সুরেন মিশ্রের ছোট ছেলে শশাঙ্কের মৃত্যুঘোষণার কথায়। মনে পড়ল শশাঙ্কের ষোড়শী বধূর সেই বিচিত্র দৃষ্টি; তার সেই

মর্মান্তিক কথাগুলি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

কত মৃত্যু, কত কান্না, কত নীরব মর্মান্তিক শোক তিনি দেখেছেন। রোগীর জীবনান্ত ঘটেছে—তিনি ভারী পায়ে স্থির পদক্ষেপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা তিনি করেছেন, কিন্তু জেনেই যে, চেষ্টা ব্যর্থ হবে। মনকে প্রস্তুত রেখে করেছেন; এমন রোগীর বাড়ি থেকে চলে আসতেন—ভাবতে ভাবতেই পথ চলতেন। তখন পথে অতি অন্তরঙ্গ-জনও চোখে পড়ত না। রোগের কথা, চিকিৎসার কথা ভাবতেন; কখনও কখনও মৃত্যুর কথাও ভাবতেন। মশায়ের ভাবনামগ্ন চিত্ত তখন বিশ্বলোক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাতার পর পাতা উলটে যেত। তাই বাইরের দৃষ্টিপথে মানুষ পড়েও পড়ত না। বহু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দূরের গ্রামে, রোগীর মৃত্যুর পর বাধ্য হয়েই সেখানে প্রতীক্ষা করতে হত; শোকবিহ্বল পরিবারটির মধ্যে বসে থাকতেন অচঞ্চল হয়ে, গুমোটে ভরা বায়ুপ্রবাহহীন গ্রীষ্ম-অপরাহ্ণের স্থির বনস্পতির মতো। লোকে এই সব দেখে ডাক্তারদের বলে থাকে—ওরা পাথর। খুব মিথ্যে বলে না তারা। পাথর খানিকটা বটে ডাক্তারেরা। মৃত্যু এবং শোক দেখে চঞ্চল হবার মতো মনের বেদনাবোধও নষ্ট হয়ে যায়। মনে ঘাঁটা পড়ে; সাড় হারিয়ে যায়। শশাঙ্কের মৃত্যু-রোগে মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা করতে গিয়ে আঘাত তিনি পেয়েছেন—কিন্তু চিকিৎসকের কর্মে কর্তব্যে ত্রুটি তিনি করেন নি। তাঁর নিজের পুত্র—।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। নিজের পুত্রের হাত দেখেও তিনি তার মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন। তিন মাস আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। একথা তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন। ছেলে ছিল ডাক্তার, তাকেও ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিলেন। আজ ভাবেন—কেন বলেছিলেন একথা?

চিকিৎসা-বিদ্যায় পারঙ্গমতার দম্ভে?

তাই যদি না হবে, সত্যকে ঘোষণা করে মনের কোণে আজও এমন বেদনা অনুশোচনা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে কেন? ওই স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠলেই একটি 'ছি-ছি-কার' সশব্দে মর্মস্থল থেকে বেরিয়ে আসে কেন? 'পরমানন্দ মাধব'কে মনে পড়ে না কেন? উদাস দৃষ্টি তুলে মশায় তাকিয়ে থাকেন আকাশের নীলের দিকে। অথচ জানাতে হয়, বলতে হয়। তার বিধি আছে। চিকিৎসকের কর্তব্য সেটা। তার ক্ষেত্র আছে।

এক

উনিশ শো পঞ্চাশ সাল—বাংলা তের শো ছাপ্পান্ন সালের এক শ্রাবণ-অপরাহ্ণে জীবনমশায় এমনি করেই তাকিয়ে ছিলেন আকাশের দিকে। পথের উপর থেকে কেউ যেন তাঁকে ডাকলে।

—প্রণাম গো, ডাক্তার জ্যেঠা।

—কে? মতি! কোথায় যাবি রে?

মতি কর্মকার কয়লার ধুলোমাখা আটহাতি কাপড়খানা পরেই কোথায় হনহন করে চলেছে। গোষ্ঠ কর্মকারের ছেলে মতি। গোষ্ঠ ডাক্তারকে বড় ভক্তি করত। ডাক্তারও তাকে ভালোবাসতেন। গোষ্ঠ অনেকগুলি ওষুধ জানত। সন্ন্যাসীদত্ত ওষুধ। রঘুবর ভারতী ছিলেন বড়দরের যোগী। এসব ওষুধ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল সে। ডাক্তারকে গোষ্ঠ ওষুধগুলি দিতেও চেয়েছিল। ডাক্তার নেন নি। তবে অনেক রোগীকে তিনি পাঠিয়ে দিতেন গোষ্ঠের কাছে। বিশেষ করে দুদিন অন্তর জ্বরের জন্য। বড় পাজী জ্বর ওটা। পালাজ্বর অর্থাৎ একদিন অন্তর জ্বর– তবু ওষুধ মানে। কিন্তু ঐ দুদিন অন্তর জ্বর—ও ওষুধ মানে না। মানাতে অন্তত দীর্ঘদিন লাগে। কুইনিন ইনজেকশনও মানতে চায় না। অথচ ওই রঘুবর ভারতীর ওষুধে একদিনেই বন্ধ হয়ে যাবে। আগে গোষ্ঠ দিত, এখন মতিই দেয়, জ্বরের নির্দিষ্ট দিনে একটা হলুদমাখা ন্যাকড়ায় একটা জলজ গাছের পাতা কচলে রস বার করে বেঁধে শুঁকতে দেয়। তাতেই জর বন্ধ হয়। হবেই বন্ধ। বিচিত্র দ্রব্যগুণ-রহস্য! অতি বিচিত্র! এই রোগী পাঠানো নিয়েই গোষ্ঠের সঙ্গে ডাক্তারের অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। এদেশের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত ছিল—বিস্ময়কর ফলপ্রদ চিকিৎসা! একবার তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল এই চিকিৎসা-প্রণালী জানবার, কিন্তু—। কিন্তু তাঁর গুরুর নিষেধ ছিল। তিনি বলেছিলেন—ডাক্তারি যখন শিখেছ, তখন ওদিকে যেয়ো না। যার গুণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে জান না, তাকে প্রয়োগ কোরো না।

মতি কর্মকার বললে—একবার আপনার কাছেই এলাম জ্যেঠা।

বাঁচলেন মশায়। একজন কথা বলবার লোকের জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন। এবার তক্তাপোশে ভালো করে বসলেন তিনি, পুরনো তাকিয়াটাকে টেনে নিয়ে বললেন—আয় আয়। বোস। কী খবর বল?

—একবার আমার বাড়িতে যেতে হবে।

—কেন?

—মাকে একবার দেখতে হবে।

—কী হল মায়ের?

—আজ্ঞে, মাসখানেক হবে, পুকুরঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, তা পরেতে খুবই বেদনা হয়, নিয়ে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। তখন দেখে বেঁধেছেঁদে ছেড়ে দিয়েছিল, বলেছিল, —দিন কতক ওঠাহাঁটা কোরো না, সেরে যাবে। তাই গিয়েও ছিল। কিন্তু আবার আজ দিন আষ্টেক হল বেদনাটা চাগিয়ে উঠেছে; দিনরাত কনকন করছে। আবার নিয়ে গেলাম হাসপাতাল—তা বললে, এক্স-রে করতে হবে, সে না হলে কিছু বলতে পারবে না। তা—সে তো অনেক খরচ—অনেক ঝঞ্ঝাট! তাই বলি, যাই জ্যেঠার কাছে।

হাসলেন জীবনমশায়। বেচারী মতি! বুড়ো মা গলায় কাঁটার মতো লেগেছে। মায়ের

উপর মতির গভীর ভালোবাসা। মায়ের প্রতি তার এই ভক্তির জন্য লোকে বুড়ো খোকা বলে। মায়ের কষ্টও সে দেখতে পারছে না—আবার এক্স-রে করানোও তার পক্ষে অনেক ঝঞ্ঝাট। অগত্যা এসেছে তাঁর কাছে।—তা বেশ, কাল সকালে যাব।

—আজ্ঞে না, একবার চলুন এখুনি। বুড়ী চীৎকার করছে আর গালাগাল করছে আমাকে। বলছে, নিজের মেয়ে হলে এমনি অচিকিৎসেতে ফেলে রাখতে পারতিস?

বলতে বলতে খানিকটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মতি। বললে—সারা জীবন মায়ের অযত্ন করি নাই, আজ মা আমাকে—কেঁদে ফেললে মতি।

ডাক্তার বললেন, চল তবে। দেখে আসি।

খালি গায়েই বেরিয়ে পড়লেন মশায়। মতি ব্যস্ত হয়ে বললে—আপনার ছাতা?

—ছাতা লাগবে না, চল। এই ফিনফিনে জলে—এতে ছাতা লাগে না। ভারী পায়ে ডাক্তার হাঁটেন; গতি একটু মন্থর। মতি ছুটে চলে গেল।—আমি যাই জ্যেঠা, বাড়িতে খবরটা দিই গে।

—যা।

এগিয়ে গিয়ে মতি বাড়িটা একটু পরিষ্কার করে ফেলবে। ছেলেপুলেগুলোকে সামলাবে। বোধ হয়, মতির মা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে আছে, সেখানা পালটে তাড়াতাড়ি একখানা ফরসা কাপড় পরাবে। ডাক্তারের অজানা তো কিছু নাই।

বাড়ির দোরে গিয়ে গলা ঝাড়লেন ডাক্তার। তারপর ডাকলেন—মতি!

মতি সাড়া দিলে—আজ্ঞে, এই যাই।

তার মানে—আরো খানিকটা অপেক্ষা করুন ডাক্তার জ্যেঠা। এখনও প্রস্তুত হতে পারি নাই। দাঁড়ালেন ডাক্তার, ভালোই হল, বরাবর সামনে দেখা যাচ্ছে সোজা কাঁচা সড়কটা। এই পথেই সাদা কাপড়ের ছাউনি দেওয়া ছাতা মাথায় দিয়ে আসবে সেতাব মুখুজ্জে। এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে নেভানো লণ্ঠন আর দাবার পুঁটুলি। কিন্তু কই সেতাব?

মতি ডাকলে—আসুন জ্যেঠা।

বৃদ্ধা কাতর হয়ে পড়েছে। মতি ঠিক বলেছে—জেরবার হয়ে পড়েছে বুড়ী। হাঁটুটা ফুলেছে। স্ফীত স্থানটার উপর হাত দিলেন ডাক্তার। রোগী কাতরে উঠল, ডাক্তার চমকে উঠলেন। জ্বরও হয়েছে যেন! হাঁটু থেকে হাত তুলে বললেন—হাতটা দেখি!

নাড়ী ধরে বসলেন ডাক্তার।

—জ্বর কবে থেকে হল?

মতি বললে—জ্বর তো হয় নাই জ্যেঠা।

—হয়েছে। নাড়ী দেখতে দেখতেই বললেন ডাক্তার।

মতির মা ঘোমটার ভিতর থেকেই ফিসফিস করে বললে—ও বেথার তাড়সে গা খানিক জ্বর-জ্বর করছে। বেথা সারলেই ও সেরে যাবে।

—হ্যাঁ, ব্যথা সারলেই জ্বর সারবে, জ্বর সারলেই ব্যথা সারবে।

—না-না জ্বরের ওষুধ আমি খাব না। জ্বর আমার আপনি সারবে। আপুনি আমাকে পায়ের বেদনার ওষুধ দেন। জ্বরের চিকিৎসের দরকার নাই। ও কিছু নয়। কুনিয়ান খেতে নারব—ফোড় নিতেও নারব। ও'পোস দিতে—বুড়ী থেমে গেল। না খেয়ে থাকতে পারব না বলতে বোধ করি লজ্জা পেল।

ডাক্তার হেসে বললেন—উপোস তোমাকে করতে হবে না। সে আমি বলব না তোমাকে। তুমি তো আমার আজকের রোগী নও গো। নতুন বউ থেকে তোমাকে দেখছি আমি। সেবার পুরানো জ্বর—সে তো আমিই সারিয়েছিলাম। গোষ্ঠ আমার কাছে কবুল খেয়েছিল। রাতদুপুরে হেঁসেল থেকে মাছ ভাত বের করে তোমাকে খাওয়াত সে। সে আমি জানি। তাতেই আমি তোমার জন্যে পোরের ভাতের ব্যবস্থা দিয়েছিলাম।

হাসতে লাগলেন ডাক্তার।

ঘোমটার মধ্যে জিভ কেটে লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে গেল মতির মা। গোষ্ঠ তাকে চুরি করে খাওয়াত না, সে নিজেই চুরি করে খেত। একদিন স্বামীর কাছেই ধরা পড়েছিল। তার পরদিনই গোষ্ঠ ডাক্তারের কাছ থেকে পোরের ভাতের ব্যবস্থা এনেছিল।

ডাক্তার বললেন—তা বলো না কী খেতে ইচ্ছে?

চুপ করে রইল মতির মা। এরপর আর কী উত্তর দিতে পারে সে? লজ্জায় তার মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ছি! ছি! ছি!

—বলো, লজ্জা কোরো না। যা ইচ্ছে হয় খেয়ো। যা খুশি। মতির দিকে তাকিয়ে বললেন—মায়ের যা খেতে ইচ্ছে খেতে দিবি, বুঝলি?

—আর ওষুধ? শঙ্কিতভাবেই প্রশ্ন করলে মতি। চাপান কি কিছু?

—কিছু না। খেতে দে বুড়ীকে ভালো করে। কালীমায়ের স্থানের মৃত্তিকা লাগিয়ে দে। বাস্।

মতির মা-ও মাথার ঘোমটা খানিকটা কমিয়ে দিলে। বললে—যাতনায় পরান যে বেরিয়ে যাচ্ছে আমার।

—তবে আগুনের সেঁক। শত বৈদ্য সম অগ্নি; ওর চেয়ে বেদনার আর ওষুধ হয় না। নুনের পুঁটলি করে সেঁক দে। ওতেই যা হয় হবে।

—ওতেই যা হয় হবে? ওষুধ দেবেন না? যা খুশি তাই খাব? আমি তাহলে আর বাঁচব না? পরিপূর্ণভাবে ঘোমটা খুলে মতির মা এবার ডাক্তারকে প্রশ্ন করে নিষ্পলক দৃষ্টিতেই তাঁর দিকে চেয়ে রইল। বিচিত্র সে দৃষ্টি! কঠিনতম প্রশ্ন সে দৃষ্টিতে সমুদ্যত হয়ে রয়েছে। জীবনের শেষ প্রশ্ন।

এমন দৃষ্টির সম্মুখে কেউ বোধ হয় দাঁড়াতে পারে না। পারে তিন প্রকারের মানুষ। এক পারে বিচারক—যাকে প্রাণদণ্ড দিতে হয়। আসামী যদি তাকে প্রশ্ন করে—আমাকে মরতে হবে?—তবে বিচারক বলতে পারে—হ্যাঁ, হবে।

আর পারে জল্লাদ—যে ওই দণ্ড হাতে তুলে দেয়।

আর পারে চিকিৎসক।

জীবনমশায় সেকালে বলতে পারতেন। অবশ্য প্রবীণ রোগীকেই সাধারণত বলতেন—আর কী করবে বেঁচে? দেখলেও অনেক, শুনলেও অনেক, ভোগ করলেও অনেক, ভুগলেও অনেক। এইবার যারা রইল তাদের রেখে—। প্রসন্ন হাসি হাসতেন।

তাঁর বাবা জগৎমশায় শেষটায় বলতেন, গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরিনাম করো, ইষ্টনাম করো। নামের তরী বাঁধা ঘাটে।

তাঁর ডাক্তারী বিদ্যার গুরু রঙলাল ডাক্তার ছিলেন বিচিত্র মানুষ। রোগীর সামনে সচরাচর মৃত্যুর কথা বলতেন না। তবে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—Medicine can cure disease but cannot prevent death; বলেই লম্বা পা ফেলে রোগীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেন।

আজ জীবন ডাক্তার মতির মায়ের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—তাতেই বা তোমার দুঃখ কিসের গো? নাতিপুতি ছেলে বউ রেখে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে। পার তো চলে যাও তীর্থস্থানে।

কথার মাঝখানেই মতি বলে উঠল—এই দেখুন ডাক্তার জ্যেঠা, কী বলছেন দেখুন। হাঁ গো, সে টাকা আমাদের আছে?

—কেন? এই তো দশ ক্রোশ পথ, ট্রেনে যাবি, বাড়ি ভাড়া করে রেখে আসবি। কীই বা খরচ? কাটোয়াতে ভিড় বেশী, অনেক পূর্ববঙ্গের লোকজন এসেছে—তার চেয়ে উদ্ধারণপুর ভালো। পাড়াগাঁ—গঙ্গাতীর, সারবার হলে এক মাস গঙ্গার বাতাস গায়ে লাগালেই সব ভালো হয়ে যাবে। নিত্য গঙ্গাস্নান করবে, দেখবি মায়ের নবকলেবর হয়ে যাবে। না হয়—

কথা অসমাপ্ত রেখেই ডাক্তার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—মতি, জল দে হাতে।

দুই

মন খারাপ হল না ডাক্তারের। মতির মায়ের বয়স হয়েছে, বয়সের অনুপাতে দেহ অনেক বেশী ভেঙেছে। বাত-জ্বর, পেটের গোলমাল—নানানখানা রোগ তো আছেই। তার উপর এই আঘাতে পায়ের হাড়ে আঘাত লেগেছে। ভেঙেছে। হয়তো বা শেষ পর্যন্ত আঘাতের স্থানটা পাকবে। একমাত্র ছেলে, বউ, কয়েকটিই নাতি-পুতি, তা যাক না বুড়ী; এ তো সুখের যাওয়া। বুড়ীর যেতে ইচ্ছে নাই। ডাক্তার এক নজরেই বুঝতে পারেন। মৃত্যুর কথা শুনলে চমকে ওঠে না—এমন লোক বোধ হয় সংসারে খুব কম। তবু বলেন এই কারণে যে, মানুষের এগিয়ে যাওয়ারও তো সীমা নেই।

বেচারী মতির মা পিছনে পড়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে। তাকে দোষ দিতে পারবেন না। ছেলে, বউ, নাতি, নাতনী, ঘর-সংসার—বড় জড়িয়ে পড়েছে বুড়ী।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।

বুড়ী সেই সনাতন 'আশ্চর্য' হয়ে উঠেছে আজ। কিন্তু যেতে হবে বুড়ীকে। আর যাওয়াটাই ওর পক্ষে মঙ্গল। হ্যাঁ মঙ্গল। নইলে দুর্ভোগের আর অন্ত থাকবে না।

জীবন ডাক্তারের দেহখানা খুব ভারী। পা দুটো মাটির উপরে দেহের ওজনে জোরে জোরেই পড়ে। ডাক্তার পথ দিয়ে চলেন—পাশের বাড়ির লোকেরা জানতে পারে ডাক্তার চলেছেন। এই শ্রাবণ মাসের ফিনফিনে বৃষ্টিতে পিছল এবং নরম মেটে রাস্তার উপর সন্তর্পণে পা ফেলে চলতে হবে। চোখ রাখতে হবে মাটির উপর। দুটোই ডাক্তারের পক্ষে বিরক্তিজনক। কিন্তু উপায় নাই—পিছল পথে পা ফসকালে অঙ্গ আর থাকবে না। পৃথিবীকে মানুষ বলে—মা, সবুজ ঘাসে আর ফসলে ঢাকা দেখে বলে—কোমলাঙ্গী ; একবার পড়লেই ভুল ভেঙে যায়। আপন মনেই ডাক্তার হাসেন।

আরে—আরে—আরে! ডাক্তার থেমে গিয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। পথের ধারে একটা ডোবার মুখে এই অনাবৃষ্টির বর্ষায় সামান্য পরিমাণে খানিকটা জল জমেছে—দুটো ছেলেতে পরমোৎসাহে তাই ছেঁচতে শুরু করেছে। কাদাগোলা জল ছিটিয়ে রাস্তার ওইখানটা কর্দমাক্ত করে তুলেছে।

ছেলে দুটো থেমে গেল। জীবনমশায় এখানে সর্বজনমান্য।

—কী করছিস? হচ্ছে কী?

—মাছ গো। এই এতু বড়ি একটা ল্যাঠা মাছ।

—তুই তো মদন ঘোষের ব্যাটা?

—হি গো, মদনার ব্যাটা বদনা আমি।

ডাক্তার হেসে ফেললেন, বললেন—শুধু মদনার ব্যাটা বদনা? তুই মদনার ব্যাট—বদনা ঠ্যাঁটা! পাজীর পা-ঝাড়া! উল্লুক!

—ক্যানে? কী করলাম আমি?

—কী করলি? এবার কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ করে ডাক্তার বললেন, এমনি করে বাবারনাম, নিজের নাম বলতে হয়? ছি! ছি! ছি! বলতে হয়—আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রীমদনলাল ঘোষের ছেলে আমি, আমার নাম শ্রীবদনলাল ঘোষ। বুঝলি?

বদন ঘাড় কাত করে মাথাটা কাঁধের উপর ফেলে দিলে। খুব খুশী হয়েছে বদন। ডাক্তার বললেন—আর এটি? এটি কে?

ছেলেটি বেশ সুশ্রী। সুন্দর চেহারা। এ গ্রামের বলে মনে হচ্ছে না। ডাক্তারের কথায় উত্তরও দিলে না। বদন বললে—ও আমাদের গাঁয়ে এসেছে। সরকারদের বাড়ি। মামার বাড়ি এসেছে।

—আচ্ছা! অহীন্দ্র সরকারের মেয়ে অতসীর ছেলে?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে দিলে দুবার—হ্যাঁ।

ডাক্তার বললেন—জলে ভিজো না, বাড়ি যাও। সর্দি হবে। জ্বর হবে। মাথা ধরবে।

বদন বললে—আপুনি ভিজছে ক্যানে?

ডাক্তার কৌতুকে সশব্দেই হেসে উঠলেন। বললেন—আমি ডাক্তার রে দুষ্টু। অসুখ আমাকে ভয় করে। যা—বাড়ি যা। চল, আমার সঙ্গে চল।

ছেলে দুটোকে সঙ্গে নিয়েই তিনি ফিরলেন। সেতাব না এসে থাকলে এদের নিয়েই একটু আমোদ করবেন। চলতে চলতে বললেন—জানিস, আমড়া খেলে অম্বল হয়, অম্বল হলে জ্বর হয়। কিন্তু ডাক্তারেরা খায়। লোককে বলি আমড়া খাই আমরা, লোককে বলি খেয়ো না আমড়া।

আরোগ্য-নিকেতনের বারান্দায় ইতিমধ্যেই সেতাব মুখুজ্জে কখন এসে বসে আছেন। ডাক্তারকে দেখে তিনি বললেন, গিয়েছিলি কোথা? আমি এসে ভাবি গেল কোথায়! নন্দ কি ইন্দির দুজনের একজন পর্যন্ত নাই।

ছেলে দুটোকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন. যা—বাড়ি যা তোরা। সেতাবকে বললেন, গিয়েছিলাম মতি কর্মকারের বাড়ি। মতির মায়ের হুকুম এসেছে। বোস, চায়ের জন্য বাড়িতে বলে আসি। কল্কের টিকেটা ধরিয়ে দে তুই, ইন্দির বাইরে গিয়েছে।

একেবারে সাত-আটটা কল্কেতে তামাক সাজা আছে। এ ছাড়াও তামাক-টিকে আছে। খাওয়া-দাওয়ার পরই নন্দ সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তারপর প্রয়োজনের সময় ইন্দির থাকলে ইন্দির, না থাকলে ডাক্তার বা সেতাব নিজেরাই কেউ দরকারমতো কল্কেতে আগুন দিয়ে নেন। এখন দুজনে বসবেন দাবাতে। কতক্ষণ চলবে কে জানে! বাড়িতে ভাত ঢাকা থাকবে। তবু তো আগেকার কালের শক্তিও নাই—উৎসাহও নাই।

চায়ের বরাত করে তামাকের টিকে ধরিয়ে নিয়ে দাবায় বসলেন দুজনে। খেলাটা হঠাৎ যেন জমে উঠল। সেতাবের মন্ত্রীটা খাঁ করে মেরে বসলেন মশায়। ওদিকে আকাশে মেঘও বেশ জমেছে, বৃষ্টিও বেশ সুর ধরেছে; ঝিপ-ঝিপ করে বৃষ্টি নেমেছে, বৃষ্টি খানিকটা হবে বলে মনে হচ্ছে। নীরবেই খেলা চলছিল, সেতাব মুখুজ্জে বললেন—ভিতরে চল জীবন—গা সিরসির করছে।

—সিরসির করছে? কেন রে? আমার তো বেশ আরাম বোধ হচ্ছে!

—তোমার কথা আলাদা। এত চর্বিতে শীত লাগে কখনো? আমার শরীরটাও ভালো নাই।

—জ্বর হয় নি তো? দেখি হাত?

—না, হাত দেখতে হবে না। ওই তোর বাতিক। আমি নিজেও জানি হাত দেখতে। দেখেছি নাড়ী গরম একটু হয়েছে। ও কিছু নয়; চল ভেতরে চল। সেতাব সরিয়ে নিলেন হাতখানা।

ডাক্তার কিন্তু ছাড়লেন না, হাত বাড়িয়ে একরকম জোর করে সেতাবের হাতখানা টেনে নিলেন। হ্যাঁ, বেশ উত্তাপ হাতে! কিন্তু নাড়ী অনুভব করার সুযোগ পেলেন না। সেতাব মুখুজ্জে হাতখানাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছেন।

—ছাড়, হাত ছাড়, জীবন। হাত ছাড়।

—পাগলামি করিস নে সেতাব। নাড়ী দেখতে দে।

—না। চীৎকার করে উঠলেন সেতাব।

—আরে, হল কী তোর? আরে! বিস্মিত হয়ে গেলেন জীবন ডাক্তার।

—না-না-না। ছেড়ে দে আমার হাত। ছেড়ে দে। ঝটকা মেরে ডাক্তারের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেতাব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর নিজের লণ্ঠনটা একপাশে নামানো ছিল। সেটা জ্বালাবার অবকাশও ছিল না; নেভানো লণ্ঠনটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন দাওয়া থেকে।

—সেতাব, ছাতা, তোর ছাতা।

এবার সেতাব ফিরলেন। ছাতাটি নিয়ে লণ্ঠনটি জ্বালাতে জ্বালাতে বললেন—নিজের নাড়ী দেখ তুই। তুই এইবার যাবি আমি বললাম। লোকের নাড়ী দেখে নিদান হেঁকে বেড়াচ্ছিস, নিজের নিদান হাঁক।

সেতাব চলে গেলেন সেই বৃষ্টির মধ্যে।

ডাক্তার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেতাব মধ্যে মধ্যে এমনি অকারণে রেগে ওঠেন। অকারণ ঠিক নয়, নিজের চাল ভুল হলে মনে মনে রাগেন নিজের উপরেই, তারপর একটা যে-কোনো ছুতোতে ঝগড়া করে বসেন। উঠেও চলে যান। ফেরানো তাঁকে যায় না, পরের দিন ডাক্তার যান তাঁর বাড়ি। গেলেই সেতাব বলেন—আয়—আয় বোস। এই যাব বলে উঠেছিলাম আর তুইও এলি।

ডাক্তার একটু হেসে বাড়ির ভিতরে যাবার জন্যে ঘুরলেন; ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ করতে গিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন। আজ সেতাবের রাগটা প্রচ্ছন্ন বিকার নয় তো? উত্তাপে অল্প জ্বর মনে হল—। কিন্তু নাড়ী দেখতে তো দিলেন না সেতাব। ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত করে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ভাবছিলেন—যাবেন এখুনি সেতাবের বাড়ি।

ফল নেই। তাই যদি হয় তবে সেতাব কিছুতেই তাঁকে হাত দেখতে দেবেন না, বরং আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠবেন।

আর এই বৃষ্টিতে ভিজে অনিষ্ট? সে যা-হবার হয়েছে।

মৃত্যু-রোগের একটা যোগাযোগও আছে, যা বিচিত্র এবং বিস্ময়জনক।

পরের দিন।

সাধারণত ডাক্তার বেশ একটু দেরিতে ওঠেন। আজ কিন্তু উঠলেন সকালেই। সমস্ত রাত্রি ভালো ঘুম হয় নি। সেতাব সম্পর্কেই দুশ্চিন্তা একটা বাতিকের মতো তাঁকে চঞ্চল

করে রেখেছিল। কত উদ্ভট চিন্তা। তাঁর অভিজ্ঞতায় যত বিচিত্র রোগলক্ষণ উপসর্গ তাঁর চোখে পড়েছে, তিনি যেন উপলব্ধি করেছেন—সেই সব উপসর্গের লক্ষণ তিনি সেতাবের আচরণের সঙ্গে মিলিয়ে পেয়েছেন সেদিন। যত দেখেছেন ততই যেন মিলেছে। মনে মনে অনুতাপ হয়েছে, সেতাবকে তিনি জাপটে ধরে জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন না কেন? ওই বর্ষণের মধ্যে যেতে দিলেন কেন? প্রচ্ছন্ন বিকার নিয়ে জ্বরই খুব খারাপ, তার উপর এই বর্ষায় ভিজে যদি সর্দিটা প্রবল হয় তবে যে অসাধ্য হয়ে উঠবে।

বয়স সেতাবের হয়েছে, জীবনে বন্ধনও নাই। বন্ধন বলতে স্ত্রী—কিন্তু সে স্ত্রী এমনই সক্ষম ও আত্মপরায়ণা যে, সেতাবের অভাবে তার বিশেষ অসুবিধা ঘটবে না। সেতাবের অভাব অনুভব করলেন তিনি নিজে। সেতাব না হলে তাঁর দিন কাটে না। তিনি থাকবেন কাকে নিয়ে?

সকালে উঠেই তিনি সেতাবের বাড়ি যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ডাক্তার-গিন্নীও সকালেই ওঠেন। এবং ঁার বিচিত্র স্বভাবের বিচিত্রতম অংশটুকু এই প্রথম প্রভাতেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। নাম তাঁর দুর্গা। দুর্গা প্রভাতে ওঠেন যুদ্ধোদ্যতা দশপ্রহরণ-ধারিণীর মতো। মেজাজ সপ্তমে উঠেই থাকে; সেই মেজাজে বকেঝকে বাড়িটাকে সন্ত্রস্ত করে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে আশ্চর্যভাবে ধীরস্থির হয়ে আসেন। ডাক্তার দেরিতে ওঠেন যেসব কারণে ওটা তার মধ্যে একটা প্রধান কারণ। গিন্নী স্থির হলে নিশ্চিন্ত হয়ে গাত্রোত্থান করেন তিনি।

ডাক্তার-গিন্নী অনেক আগেই উঠে বাসনমাজা-ঝিকে তিরস্কার করছিলেন, বালি এবং কর-করে ছাই দিয়ে বাসনমাজার জন্য। ওতে বাসনের পরমায়ু কতদিন? সংসারে যাঁরা সিদ্ধপুরুষ, মৃত্যু যাঁদের ইচ্ছাধীন, তাঁদের মাথায় ডাণ্ডা মারলে তাঁরাও মরতে বাধ্য হন। ও তো নির্জীব কাঁসার গেলাস। বালি দিয়ে দুবেলা ঘষলে ও আর কতদিন। কাঁসার দাম যে কত দুর্মূল্য হয়েছে সেও তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। ডাক্তার উঠে আসবার সময় কেশে গলা পরিষ্কার করে সাড়া দিয়ে নামলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন—আমি বেরুচ্ছি একবার মাঠে। সকালবেলা উঠেই প্রথম কথাটি তাঁকে মিথ্যে বলতে হল। নইলে গিন্নীর দৃষ্টি এবং হুঙ্কার ভস্মলোচন ভস্মকারিণীর মতো প্রখর এবং ভীষণ হয়ে উঠবে।

ছাতাটি নিয়ে বেরিয়ে সোজা এসে উঠলেন ওই বড়বাজারের গ্রামখানিতে। সদর রাস্তা থেকে ছোট পথ ধরে সেতাবের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং ডাকলেন।

—সেতাব!

সেতাবও তখন উঠেছেন। ঘরের ভিতর তক্তাপোশের উপর বসে তামাক খাচ্ছেন। বাইরে ডাক্তারকে দেখে হেসে বললেন—এসেছিস?

ডাক্তার ঘরে ঢুকে তক্তাপোশের উপর বসে বললেন—যাক। জ্বর-টর নাই তো? মুখ দেখে মনে হচ্ছে ছেড়ে গিয়েছে।

সেতাব হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন—দেখ।

—দেখব ? হাসলেন ডাক্তার।

—দেখ। নিদান একটা হাঁক দেখি। আর তো পারছি না। জীবনে ঘেন্না ধরে গেল।

ডাক্তার হেসে বললেন—তা কাল রাত্রে বুঝেছি। যে রাগ তোর আমার উপর !

সেতাব ওদিক দিয়েই গেলেন না, বললেন, কাল রাত্রে বুড়ী আমাকে যা বকলে, সে তোকে কী বলব ? এক মুঠো মুড়ি পর্যন্ত খেতে দিলে না রে। বললাম সর্দিতে গা গরম হয়েছে, জীবন আমাকে দুধ-মুড়ি খেতে বলেছে। ঘি-ময়দা থাকলে চারখানা গরম লুচি সব থেকে উত্তম। ঘরে ঘি-ময়দা আছে, বুঝলি—জেনেই আমি বলেছিলাম। বাজারে ময়দা মেলে না—আমার জমিতে মণ দুই গম হয়েছিল, সে পিষিয়ে ময়দা করিয়ে রেখেছি। বাড়ির দুধ হয়-না হয়-না করেও সের দেড়েক হয়। তার সব সরটুকু জমিয়ে বুড়ী ঘি করে। একদিন সরের মুখ দেখতে পাই না। কালই বিকেলে সর গালিয়েছে রে ! না তোকে কী বলব, আমাকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি, তোর পর্যন্ত বাপান্ত করে ছাড়লে। এই সকালে খিদেতে পেট জ্বলছে খাণ্ডব দাহনের মতো।—কী করব—বসে বসে তামাক টানছি। এর চেয়ে যাওয়াই ভালো। কী হবে বেঁচে !

ডাক্তার হাতখানা এবার টেনে নিলেন—স্পর্শমাত্রেই বুঝলেন জ্বর ছেড়ে আসছে। বললেন—জ্বর ছেড়ে আসছে। কাল রাত্রে গিন্নী খেতে না দিয়ে ভালোই করেছে। কয়েক মুহূর্ত নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—আজ সকাল সকাল ঝোল-ভাত খা। এখন বরং চায়ের সঙ্গে কিছু খা। আর জ্বর হবে বলে মনে হচ্ছে না।

—কিছু খা! সেতাব রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন—কিছু খা ! ঠাকুরসেবা নাই ? সে কে করবে ?

—কাউকে বল না, করে দেবে।

—দেবে ? একালের কোন ব্যাটা এসব জানে, না এতে মতি আছে ! আছে এক মুখ্য ডাণ্ড ওই ঠ্যাঙবেঁকা চাটুজ্জেদের ছেলে। তা এখন তার কাছে যায় কে ? যদি ব্যাটা বুঝতে পারে যে আমি খেয়েছি তবে এক বেলাতেই আট আনা চেয়ে বসবে।

—তাই দিবি। শরীর আগে না পয়সা আগে ! খিদেয় তোর পেট জ্বলছে—আমি বুঝতে পারছি, তুই খা। আমি বরং ব্যবস্থা করছি। আমাদের গ্রামের মিশ্রদের কাউকে পাঠিয়ে দোব, বুঝলি ? খা তুই, পেট ভরে খা। চায়ের সঙ্গে মুড়ি ফেলে নাস্তা কর।

সেতাব এবার চুপিচুপি বললেন—তুই বল না, একটু হালুয়া করে দিক। ময়দা চাললেই সুজি বেরুবে। চিনি অবিশ্যি নাই, তা ভালো গুড় আছে। খেজুরগুড়ের পাটালিও আছে ওর ভাঁড়ারে। বুঝলি, রোজ রাত্রে দুধের সঙ্গে ভাত খায় আর ওই পাটালি বার করে। ভাবে আমি ঘুমিয়ে গিয়েছি। আমি সাড়া দিই না, কিন্তু গন্ধ পাই। বল না ওকে।

ডাক্তার হেসে ফেললেন।

খাওয়ার বিলাসে সেতাব চিরকাল বিলাসী, একটু ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসেন বলে ওঁর স্ত্রী নাম দিয়েছে বালকদাসী। বলে, উনি আমার বালকদাসী—ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসি !

রাম রাম রাম—জিভখানা কেটে ফেলো গিয়ে। না-খেলে মানুষ বাঁচে না, খিদে পেলে পৃথিবী অন্ধকার, তাই খাওয়া। তা বলে এটি খাব, ওটি খাব, সেটি খাব—এ কী আবদার! রামচন্দ্র!

ভালোমন্দ খাওয়ার রুচি ওঁদের স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই। বার্ধক্যের সঙ্গে সে রুচি আরও বেড়েছে। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধে। ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হয়। সেতাবের কথা শুনে ডাক্তার তাই হাসলেন।

সেতাব ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—হাসলি যে!

ডাক্তার বললেন—নিদান হাঁকতে বলছিলি না?

মুহূর্তে সেতাবের মুখ শুকিয়ে গেল। ডাক্তার সেটুকু লক্ষ্য করলেন—এবং সমাদরের সঙ্গে অভয় দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—না-না তা বলি নি, ভয় পাস নে, এখনও অনেক দেখবি রে তুই। দেরি আছে। রুচি এখনও সমানে আছে। কিন্তু আজ আর হালুয়াটা খাস্ নে। জ্বরটা একেবারে ছেড়ে যাক। বরং একবেলা আজ ঝোল-ভাত খাস। ওবেলা যদি আর জ্বর না আসে—কই দেখি দে, নাড়ীটা দেখি। গায়ে হাত দিয়ে জ্বর ছাড়ছে বুঝে আর নাড়ী দেখি নি। জ্বর আসবে কিনা দেখি।

নাড়ী ধরে ডাক্তার হাসলেন, বললেন—না। জ্বর আর আসবে না মনে হচ্ছে। হালুয়া কাল তোকে আমি খাওয়াব। আজ না। কিন্তু হঠাৎ হালুয়াতে এমন রুচি হল কেন বল তো?

—চা-মুড়ির নাম শুনে বমি আসছে। বুঝেছিস না? কি রকম অরুচি হয়ে গিয়েছে। তা তুই এক কাজ কর, দোকান থেকে চারখানা বিস্কুট আনিয়ে দিতে বল। তাই বলে যা। চায়ের সঙ্গে ভিজিয়ে সে ভালো লাগবে।

বিস্কুট নিজে পাঠিয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার উঠলেন। সেতাব-গৃহিণী এখনি তর্ক তুলবেন, রোগীর এই অবস্থায় মুড়ি বেশী উপযোগী অথবা বিস্কুট বেশী উপযোগী? একেবারে সমকক্ষ চিকিৎসকের মতোই তর্ক তুলবেন। এবং প্রশ্ন করবেন—দেশে যে আগেকার কালে বিস্কুট ছিল না তখন রোগীরা খেত কী? এবং বিস্কুট খেত না বলে তারা কি মনুষ্যপদবাচ্য ছিল না, না তাদের রোগ সারত না? সেতাবগৃহিণী নারী না হয়ে যদি পুরুষ হতেন তবে বড় উকিল হতে পারতেন। রাগ করে চেঁচামেচি করবেন না, নিজের খুঁটে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কূটতর্ক করবেন; কার সাধ্য তাঁকে এক পা হটায়। এ-যুগে জন্মালেও জন্ম সার্থক হতে পারত। এখন তো মেয়েরাও উকিল জজ ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ডাক্তারের মনের মধ্যেই কথাগুলি খেলে গেল। প্রকাশ্যে সেতাবকে বললেন—গিন্নীকে বলে কাজ নাই। আমি বরং ফিরবার পথে বাজার থেকে দেখে-শুনে কারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই যেন বাইরে থাকিস। বুঝলি!

নিজের পথ্য সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে সেতাব এবার হাত ধরে বললেন—বোস বোস, একটু চা খেয়ে যা।

ডাক্তার হেসেই বললেন—চা খাব তো তোর বিস্কুট কিনে পাঠাবে কে? তা ছাড়া কর্ম-

ফল ভোগ, সেই বা কে করবে? দু-চারজন হাত দেখাতে আসবে তো! বসে থাকবে তারা। আমি উঠি।

বলেই তিনি উঠলেন।

সেতাব সম্পর্কে দুশ্চিন্তা কেটে গেছে তাঁর। পরমানন্দ মাধব, পরমানন্দ মাধব! মৃদুস্বরে নাম জপ করতে করতে ভারী পা ফেলে তিনি অগ্রসর হলেন।

মাথার ছাতাটা একটু নামিয়ে মাথার উপর ধরলেন। সাধারণ লোকে—যাদের ঘরে রোগী আছে—তারা দেখতে পেলে তাঁকে ছাড়বে না।—ডাক্তারবাবু একটু দাঁড়ান। ছেলে-টার হাত দেখে যান। কি—একবার আমার বাড়ি চলুন। আজ দশদিন পড়ে আছে আমার বাবা—একবার ধাতটা দেখুন।

তারপর অনর্গল প্রশংসা। যার নাম নিছক তোষামোদ। বিনা পয়সায় একবার ডাক্তার দেখানো। ওতে অবশ্য জীবন মশায়ের খুব একটা আপত্তি বা দুঃখ নেই, কারণ বাপের আমল থেকে তাঁর আমল পর্যন্ত বিনা ফি-তেই গরিবগুনা মধ্যবিত্তদের ঘরে চিকিৎসা করে এসেছেন। কিন্তু এখন এই বয়সে আর না। তা ছাড়া—। এই বাদলা দিনের ঠাণ্ডা সকালবেলাতেও তাঁর কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। লোকে তাঁকে আর চায় না। হ্যাঁ, চায় না। বলে—সে আমলের ডাক্তার, তাও পাস-করা নয়। আসলে হাতুড়ে। এখনকার চিকিৎসায় কত উন্নতি হয়েছে। সে সবের কিছু জানে না।

কেউ কেউ বলে গোবদ্যি।

হনহন করে হাঁটলেন ডাক্তার।

পথের পাশেই হাসপাতাল; পাশেই তৈরি হচ্ছে নতুন হেলথ সেণ্টার। ওদিকে একবার না তাকিয়ে পারলেন না। যাবার সময়ও তাকিয়েছিলেন, তখন সব নিঝুম স্তব্ধ ছিল। এখন জেগেছে সব। হাসপাতালটার বারান্দায় কজন রোগী বাইরে এসে বসেছে। ঝাড়ুদারেরা ঘুরছে স্বামী-স্ত্রীতে। ওই নার্সদের ঘর থেকে দুজন নার্স বেরিয়ে চলেছে হাসপাতালের দিকে। এদিকে চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারির বারান্দায় এর মধ্যেই কজন রোগী এসে গেছে। আরও আসছে। ওই ওদিকে হেলথ সেণ্টারের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। প্রকাণ্ড বড় বাড়ি। অনেক আয়োজন, অনেক বেড, অনেক বিভাগ, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, সংক্রামক ব্যাধির বিভাগ, সাধারণ বিভাগ। সার্জারি বিভাগটা বড় হবে, তাতে রক্ত থেকে যাবতীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। তা ভালোই হচ্ছে। রোগে যে রকম দেশ ছেয়ে ফেলছে তাতে এমনি বিরাট ব্যবস্থা না হলে প্রতিবিধান হবে না। ডাক্তারের মনে পড়ল—প্রথমে হয়েছিল ওই চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারিটি। সে হল উনিশ শো দুই বা তিন সালে।

তার আগে—।

—প্রণাম ডাক্তারবাবু! কোথায় গিয়েছিলেন? ডাকে?

ডাক্তার চকিত হয়ে মুখ ফেরালেন। দেখলেন এখানকার চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারির কম্পাউণ্ডার হরিহর পাল তাঁর পিছনেই সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি থেকে ডিস্‌পেন-

সারিতে আসছে, তাঁকে চিনেই বোধ হয় বেল না দিয়ে রথ থেকে নেমে পদাতিক হয়ে তাঁকে সম্মান দেখিয়েছে। সস্নেহে ডাক্তার বললেন—ভালো আছ হরিহর ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তারপর খবর ভালো তো ? কী রকম চলছে তোমার ?

—ওই কোনো রকমে চলে যায় আর কি।

ডাক্তার বুঝলেন হরিহরের প্র্যাকটিস ভালোই চলছে আজকাল। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন—

– পেনিসিলিন চালাচ্ছ খুব ! এ তো পেনিসিলিনের যুগ !

—আজ্ঞে তা বটে। সবেই পেনিসিলিন। ওষুধটা খাটেও ভালো। বলতে বলতেই সামনের দিকে অর্থাৎ মশায়ের পিছনের দিকে তাকিয়ে হরিহর একটু চঞ্চল হয়ে বললে—ডাক্তারবাবু আসছেন আমাদের। আপনাদের গ্রাম থেকেই আসছেন দেখছি। ওঃ, বোধ হয় মতি কর্মকারের মাকে দেখতে গিয়েছিলেন। কাল রাত্রে মতি এসেছিল, কল দিয়ে গিয়েছিল।

মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল মশায়ের। তাঁকে অবিশ্বাস করেই তা হলে মতি কল দিয়ে গিয়েছে তার মাকে দেখতে ? মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালেন মশায়। ওদিকে হাসপাতালের নূতন ডাক্তারটির বাইসিক্ল দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। জীবনমশায় নমস্কার করলেন—নমস্কার !

হাসপাতালের ডাক্তার নামলেন বাইসিক্ল থেকে। তরুণ বয়স, পরনে প্যাণ্ট, বুশশার্টের উপরে ওয়াটারপ্রুফ, মাথায় অয়েলস্কিনের ঢাকনি-মোড়া শোলার হ্যাট। চোখে শেলের চশমা ; কলকাতার অধিবাসী—নাম প্রদ্যোত বোস। প্রতিনমস্কার করে প্রদ্যোত ডাক্তার বললেন—ভালো আছেন ?

—ভালো ? তা রোগ তো নেই। সংসারে তো একেই ভালো থাকা বলে। তারপর—মতির মাকে দেখে এলেন ?

—হ্যাঁ। কাল রাত্রে মতি এসে বলে—রাত্রেই যেতে হবে। তার মা নাকি যন্ত্রণায় অধীর অস্থির হয়ে পড়েছে। সে কিছুতেই ছাড়বে না। কেসটা তো জানা। প্রথম যখন পড়ে যায় তখন কিছুদিন হাসপাতালে ছিল। কমেও গিয়েছিল বেদনা। তারপর বেদনা বেড়েছে আবার, বোধ হয় ওই অবস্থাতেই ঘোরাফেরা কাজকর্ম করেছে। আমার ধারণা আবারও ধাক্কাটাক্কা লাগিয়েছিল। আপনি তো দেখেছেন কাল বিকেলে। সবই তো জানেন।

—হ্যাঁ দেখেছি। তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, কেমন দেখলেন ?

—একটু পাকিয়ে গেছে, এক্স-রে না করলে ঠিক ব্যবস্থা তো হবে না। ভিতরে কোথাও হাড়ের আঘাত গুরুতর হয়েছে; ফেটে থাকতে পারে, যদি ফ্র্যাকচার হয়ে হাড়ের কুচিটুচি থাকে তো অপারেশন করতে হবে। ব্যবস্থা হলেই সেরে যাবে। মারাত্মক কিছু নয়। ঠোঁট দুটিতে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী ফুটিয়ে তুললেন তিনি।

মশায় একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, কুচিটুচি নেই। ফ্র্যাকচার নয়। ব্যথাটা সরে নড়ে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলোটাও। আমার অবিশ্যি সার্জারিতে বিদ্যেবুদ্ধি নাই। ভালো বুঝি না। বুঝি নাড়ী। আমার যা মনে হল—তাতে ওটা উপলক্ষ্য। যাকে বলে হেতু। আসলে—। কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখে একটু হেসে ইঙ্গিতের মধ্যে বক্তব্য শেষ করলেন।

প্রদ্যোত ডাক্তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে একটু কড়া সুরেই বললেন—হ্যাঁ—আপনি তো জ্ঞানগঙ্গার ব্যবস্থা দিয়ে এসেছেন। হাসলেন প্রদ্যোত ডাক্তার। এবার রসিকতা করেই বললেন—আমি গিয়ে দেখি ভয়ে বুড়ীর এমন প্যালপিটেশন হচ্ছে যে, জ্ঞানগঙ্গাও আর পৌঁছুতে হবে না। স্টেশনে যাবার জন্য গাড়িতে তুলতে তুলতেই হার্টফেল করবে।

আরও একটু হেসে নিলেন প্রদ্যোত ডাক্তার। তারপর বললেন—নাঃ, বেঁচে যাবে বুড়ী! মতি কিছু খরচ করতে প্রস্তুত আছে, বাকিটা হাসপাতাল থেকে ব্যবস্থা করে ওকে আমি খাড়া করে দেব। ওকে মরতে আমি দেব না।

শেষের কথাটিতে প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ রনরন করে বেজে উঠল। মনে হল ডাক্তার তীর ছুঁড়লে—তীরটা তাঁর মাথার খাটো-করে ছাঁটা চুলগুলি স্পর্শ করে বেরিয়ে চলে গেল; তীরটার দাহ—তীরটা তাঁর কপালে কি ব্রহ্মতালুতে বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা থেকেও শতগুণে মর্মান্তিক।

ঘাড় নেড়ে মশায় বললেন—আমাকে মারতে হবে না ডাক্তারবাবু, বুড়ী নিজেই মরবে। তিন মাস কি ছ মাস—এর মধ্যেই ও যাবে। ওর অনেক ব্যাধি পোষা আছে। এই আঘাতের তাড়সে সেগুলি—

প্রদ্যোতবাবু চকিতে ঘাড় তুললেন—তারপর বাধা দিয়ে বললেন—পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টো-মাইসিন—এক্স-রে—এসবের যুগে ওভাবে নিদান হাঁকবেন না। এগুলো ঠিক নয়। জড়ি বুটি সর্দি পিত্তি এসবের কাল থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি আমরা। তা ছাড়া এসব হল ইনহিউম্যান—অমানুষিক।

এরপর জীবনমশায়কে আর কথা বলার অবকাশ না দিয়েই প্রদ্যোত ডাক্তার বললেন—আচ্ছা নমস্কার, চলি। দেরি হয়ে যাচ্ছে হাসপাতালের। সঙ্গে সঙ্গে বাইসিক্লে উঠে ভিতরের দিকে চালিয়ে দিলেন দ্বিচক্রযানখানিকে। কটু কথা বলে মানুষের কাছে চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্য মানুষ এমনি নাটকীয় ভাবেই হঠাৎ পিছন ফিরে চলে যায়।

খানিকটা গিয়ে আবার নেমে বললে—আসবেন একদিন, আমাদের ব্যবস্থা দেখলেই বুঝতে পারবেন সব। নতুন নতুন কেসের সব অদ্ভুত ট্রিটমেন্টের হিস্ট্রি পড়ে শোনাব—মেডিক্যাল জার্নাল থেকে। হাতুড়ে চিকিৎসা ছাড়া এককালে যখন চিকিৎসা ছিল না—তখন যা করেছেন—করেছেন। কিন্তু একালে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা যখন হয়েছে, লোকে পাচ্ছে—তখন ওই হাতুড়ে চিকিৎসা ফলানো মারাত্মক অপরাধ। অন্য দেশ হলে শাস্তি হত আপনার।

কঠিন হয়ে উঠেছে তরুণ ডাক্তারটির মুখ।

জীবনমশায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি অপরাধী? অন্য দেশ হলে তাঁর শাস্তি হত?

এত বড় কথা বলে গেল ওই ছোকরা ডাক্তার? জীবন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন; কয়েকটি রোগী হাসপাতালে ঢুকবার সময় তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়াল, সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। জীবনমশায় লক্ষ্য করলেন না। তিনি আত্মসংবরণ করছিলেন। এ তো তাঁর পক্ষে নতুন নয়। দীর্ঘ জীবনে পাশ-করা ডাক্তার এখানে অনেক এল—অনেক গেল। জেলা থেকে বড় ডাক্তারও এসেছেন। কলকাতা থেকেও এসেছিলেন। মতভেদ হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনি অবজ্ঞাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে জীবনমশায়ই অভ্রান্ত। না, জীবনমশায় নয়—তিনি নয়, নাড়ীজ্ঞান-যোগ অভ্রান্ত।

মনে পড়ছে। সব ঘটনাগুলি মনে পড়ছে।

পিতামহ দীনবন্ধু দত্ত এই জ্ঞানযোগ পেয়েছিলেন এখানকার বৈদ্যকুলতিলক কৃষ্ণদাস সেন কবিরাজ মহাশয়ের কাছে।

আবার তিনি চলতে শুরু করলেন।

তিন

জীর্ণ আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ায় তখন জনদশেক রোগী এসে বসে আছে। এদের অধিকাংশই মুসলমান। আজ তিন পুরুষ ধরে—দীনবন্ধু মশায়ের আমল থেকে—মশায় বংশ পুরুষানুক্রমে চিকিৎসাই করে আসছেন। জীবনমশায় আজ বৃদ্ধ, আসক্তিহীন, উৎসাহহীন—কিন্তু তবু এরা তাঁকে ছাড়ে না। একমাত্র পুত্র মারা গেছে, নতুন কালের চিকিৎসা-বিজ্ঞান এসেছে তার বিপুল সমারোহ নিয়ে, নিজে স্থবির হয়েছেন, সংসারে শান্তি নাই, জীবনমশায় মধ্যে মধ্যে ভাবেন একেবারেই ছেড়ে দেবেন। কিন্তু দেব-দেব করেও দিতে পারেন না, দেওয়া হয় না। আজ তিনি ভাবলেন—না। আর না, আজই শেষ করবেন।

আরোগ্য-নিকেতনে আজ আর ওষুধই নাই; ও ব্যবস্থা ডাক্তার উঠিয়ে দিয়েছেন। আজকাল প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। নবগ্রাম বি কে মেডিক্যাল স্টোর্স ওষুধ দেয়। দু-তিন মাস অন্তর কিছু অর্থও দেয় কমিশন বাবদ।

এখনও ওই ভাঙা আলমারি তিনটের মাথায় ওষুধের হিসেবের খাতা স্তূপীকৃত হয়ে জমা হয়ে রয়েছে। খেরো-মলাটগুলো আরসোলায় কেটেছে। ভিতরের পাতাগুলি পোকায় কেটে চালুনির মতো শতছিদ্র করে তুলেছে। তবু আছে। ডাক্তারের দুর্ভাগ্য—উই নেই; অথবা কোনোদিন অগ্নিকাণ্ড হয় নি। জঞ্জাল হয়ে জমে আছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে জীবন দত্ত হাসেন। ওর মধ্যে অন্তত বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা পাওনার হিসেব আছে। বেশী, আরও বেশী। তিন পুরুষের হিসেব ধরলে লক্ষ টাকা। তাঁর আমলের—তাঁর নিজের—পাওনা অন্তত ওই বিশ হাজার টাকা।

পিতামহ দীনবন্ধু দত্ত নবগ্রামে রায়চৌধুরী বংশের আশ্রয়ে এসে পাঠশালা খুলেছিলেন, পাঠশালা করতেন, রায়চৌধুরীদের দেবোত্তরের খাতা লিখতেন, কিছু আদায়ও করতেন। ওই

রায়চৌধুরীদের বাড়িতে চিকিৎসা করতে আসতেন কবিরাজ-শিরোমণি কৃষ্ণদাস সেন। দীনবন্ধু দত্তকে তিনিই শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছিলেন। রায়চৌধুরী বংশের বড়তরফের কর্তার একমাত্র পুত্রের সান্নিপাতিক জ্বরবিকার হয়েছিল; জীবনের আশা কেউই করে নি; মা শয্যা পেতেছিলেন, বাপ স্থাণুর মতো বসে থাকতেন, তরুণী পত্নীর চোখের জলে নদীগঙ্গা বয়ে যাচ্ছিল। আশা ছাড়েন নি শুধু ওই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়। তিনি বলেছিলেন—একজন ধীর অক্লান্তকর্মা লোক চাই, সেবা করবে। তা হলে আমি বলতে পারি, রোগের ভোগ দীর্ঘ হলেও রোগী উঠে বসবে। সেবা করতে এগিয়ে এসেছিলেন দীনবন্ধু দত্ত। দীর্ঘ আটচল্লিশ দিনের দিন জ্বর ত্যাগ হয়েছিল। কবিরাজ দীনবন্ধুকে বলেছিলেন—আজও তোমার ছুটি হল না। অন্তত আরও চব্বিশ দিন তোমাকে সেবা করতে হবে। এই সময়টাতেই সেবা কঠিন। এখন স্নেহান্ধ আত্মীয়-স্বজনেরা স্নেহাতিশয্যে সেবার নামে রোগীর অনিষ্ট করবে। রোগীকে কথা বলাবে বেশী, কুপথ্যও দেবে। এই সময়ে তোমাকে বেশী সাবধান হতে হবে। তাও দীনবন্ধু নিখুঁত ভাবে করেছিলেন।

সন্তান আরোগ্য লাভ করতে বড়কর্তা দীনবন্ধু দত্তকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীনবন্ধু তা গ্রহণ করেন নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছিলেন—আমি তোমাকে পুরস্কার দেব। প্রত্যাখ্যান কোরো না। ধীরতা তোমার আশ্চর্য, বুদ্ধিও তোমার স্থির; লোভেও তুমি নির্লোভ। তুমি চিকিৎসাবিদ্যা শেখো আমার কাছে। তুমি পারবে।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে নবগ্রামের পাশে এই ছোট শান্ত গ্রামখানিতে তিনি বাস করেছিলেন। নবগ্রামে বাস করেন নি। গ্রামখানি ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ-অধ্যুষিত, সুতরাং সেখানে কলহ অনেক এবং সেখানে বাজার আছে কাছেই, তাই কোলাহলও বড় বেশী। এসব থেকে দূরেই তিনি থাকতে চেয়েছিলেন। বলতেন—দেবতারা প্রসন্ন সহজে হন না, কিন্তু রুষ্ট হন এক মুহূর্তে; সামান্য অপরাধে আজীবন সেবার কথা ভুলে যান। আর বাজারে থাকে বণিক। সেখানে চিন্তার অবকাশ কোথা?

মশায় উপাধি পেয়েছিলেন এই দীনবন্ধু মশায়ই। পরনে থান-ধুতি, পায়ে চটি, খালি গা, দীনবন্ধু মশায় গ্রামান্তরে রোগী দেখে বেড়াতেন। এ অঞ্চলে প্রতিটি বালক তাঁকে চিনত। তিনি ডেকে তাদের চিকিৎসা করতেন; মধু খাওয়াতেন। টিনবন্দী মধু থাকত। আর আশ্চর্য ছিল তাঁর সাধুপ্রীতি। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করে, তাদের পরিচর্যা করে বহু বিচিত্র মুষ্টিযোগ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ভণ্ড সন্ন্যাসীর কাছে ঠকেছেনও অনেক। তাতে তাঁর আক্ষেপ বা অনুশোচনা ছিল না; কিন্তু এ নিয়ে কেউ তাঁকে নির্বোধ বলে রহস্য বা তিরস্কার করলে বলতেন—সে-ই আমাকে ঠকিয়েছে, আমি তো তাকে ঠকাই নি। আমার আক্ষেপ কি অনুতাপের তো হেতু নাই। শুধু কি সন্ন্যাসী—কত বেদে, ওস্তাদ, গুণীন—এদের কাছেও তাদের বিদ্যা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

পুত্র জগদ্বন্ধু দত্ত ছিলেন উপযুক্ত সন্তান। তিনি পিতার কাছে সমস্ত বিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন। মৃত্যুকালে দীনবন্ধু মশায় ছেলেকে বলেছিলেন—বিষয় কিছু পারি নি করতে—

কিন্তু আশয় দিয়ে গেলাম মহৎ। মহদাশয়ত্বকে রক্ষা কোরো। ওতেই ইহলোক পরলোক—দুইই সার্থক হবে।

জগদ্বন্ধু দত্ত পিতৃবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছিলেন। তাঁকেও লোকে বলত—জগৎ মশাই। পিতার অর্জন-করা মহাশয়ত্ব তিনি রক্ষাই করেন নি, তাকে উজ্জ্বলতর করেছিলেন। তিনি রীতিমতো সংস্কৃত শিখে আয়ুর্বেদ পড়েছিলেন। পাকুলিয়ার বৈদ্যপাটের ছাত্র তিনি। চিকিৎসক হিসাবে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যেমন ছিল ব্যুৎপত্তি তেমনি ছিলেন নির্লোভ এবং রোগীর প্রতি স্নেহপরায়ণ। আবার মানুষ হিসাবে যেমন ছিল তাঁর মর্যাদাবোধ তেমনি ছিল প্রকৃতির মধুরতা। সে মধুরতা প্রকাশ পেত তাঁর মিষ্ট ভাষায়, সূক্ষ্ম রসবোধে ও রসিকতায়। তাঁর রসিকতার কয়েকটি স্মৃতি এখানকার মানুষে রসশাস্ত্রের অলিখিত ইতিকথায় কয়েকটি অধ্যায় হয়ে আছে। তাঁর রসিকতার সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তাতে কটু বা অম্লরসের একটুকু প্রক্ষেপ থাকত না। মানুষকে মধুর রসে আপ্লুত করে দিত। প্রসন্ন হয়ে উঠত রসিকতায় অভিষিক্ত জনটি।

এই যে লাল কাঁকরের পাকা রাস্তাটি নবগ্রাম থেকে এই গ্রামে এসে পৌঁছেছে এবং এই গ্রাম পার হয়ে উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ মাঠখানির বুক চিরে চলে গিয়েছে—ওই রাস্তাটির কথা উঠলেই লোকের মনে পড়ে যায় জগৎমশায়ের কথা, তাঁর রসজ্ঞানের কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে মন সরস ও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। আপন মনে একা একাই লোকেরা হেসে সারা হয়।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে। তখন এখনকার এই পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য সড়কটির শুধু আকারই ছিল, আয়তনও একটা ছিল, অবয়বও ছিল,—কিন্তু কোনো গঠনই ছিল না। একটা অসমান, খানাখন্দে বন্ধুর এবং দুর্গম গো-পথ ছিল। বর্ষার সময় এক-বুক কাদা হত। সে কাদা একালে কেউ কল্পনাই করতে পারবেন না। মশায়ের রসিকতার কাহিনীটি থেকেই তা বুঝতে পারবেন।

এখনও দেবীপুরে সেকালের খানাখন্দের নাম শুনতে পাওয়া যায়। একটু প্রবীণ দেখে যাকে খুশি জিজ্ঞাসা করবেন—সে নাম বলবে—চোরধরির গাদ অর্থাৎ কাদা; মানে যে কাদায় পড়ে চোর ধরা পড়ে যায়। গোরুমারির খাল—ও খালটায় চোরাবালির মতো একটা চোরা গর্তে ব্রজ পরামানিকের একটা বুড়ী গাই পড়ে মরেছিল। এই কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ হেসে উঠবে। না হেসে থাকে কী করে? ভাবুন তো ব্যাপারটা! ব্রজর গোরু মরল, কিন্তু সে বিপদের চেয়েও বড় বিপদ হল—ব্রজ যে প্রায়শ্চিত্ত করবে তার মাথা কামাবে কে? সে নিজে নাপিত, ক্ষুর তার আছে, কিন্তু চালাবে কে? এখনকার মতো তখন তো সবাই ক্ষুর চালাতে জানত না। জানলেও নিজের হাতে মাথা কামানো নিশ্চয় যায় না শেষে ওই জগদ্বন্ধু মশায়ই দিয়েছিলেন ব্রজর মাথা কামিয়ে। কবিরাজ ছিলেন, বিকারগ্রস্ত রোগীর মাথা অনেক সময় তাঁকে কামিয়ে দিতে হত কি না। এসব রোগীর মাথায় ক্ষুরের মতো অস্ত্র চালাতে তিনি পরামানিকের হাতে ক্ষুর ছেড়ে দিতেন না। সেদিন ব্রজর মাথা

কামাতে বসে তার মাথাটি বাঁ হাতে ধরে নিজেই হেসে ফেলেছিলেন, কামাবার সময় জগদ্বন্ধু মশায় হেসেই বলেছিলেন, ব্রজ, আজ শোধ নিই?

—আজ্ঞে? ব্রজ অবাক হয়ে গিয়েছিল—শোধ? কিসের শোধ?

—কামাবার সময় অনেক রক্ত দেখেছ বাবা, আজ আমি দেখি? শোধ নিই?

এই রাস্তাকে ভালো করেছেন তিনি অর্থাৎ জীবনমশায় নিজে। তিনিই ওই কাঠের নামফলকখানা টাঙিয়েছিলেন। জগদ্বন্ধু মশায় ছিলেন কবিরাজ। জীবনমশায়—ডাক্তার কবিরাজ দুই। তখনকার দিনে একটা কথার চলন ছিল ঘরে ঘরে। জগৎ খাবি, না জীবন খাবি? সেকালে অসুখ হলে বাড়ির লোক রোগীকে প্রশ্ন করত—জগৎ খাবি, না জীবন খাবি? অর্থাৎ ডাক্তারি ওষুধ খাবি—জীবন দত্তকে ডাকব? না—কবিরাজী ওষুধ খাবি—জগদ্বন্ধু কবিরাজ মশায়কে ডাকব?

যাক। আজ ওই কথাটা চিরদিনের মতো ভুলে যাক লোকে।

—মশায়! বাবা!

জীবনমশায় আহত অন্তর নিয়ে ফিরে এসে ডাক্তারখানায় স্তব্ধ হয়ে বসলেন, স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। আজ থেকে শেষ। শেষ হয়ে যাক মশায় বংশের মশায় উপাধি চিকিৎসকের কাজ। যাক।

এরই মধ্যে শেখপাড়ার বৃদ্ধ মকবুল এসে দরজার মুখে বসে তাঁকে ডাকলে—মশায়! বাবা!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনা-আপনি বেরিয়ে এল জীবনমশায়ের বুক থেকে।—কে? তিনি সচেতন হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন মকবুলের দিকে।

মকবুল বললে—হাতটা একবার দেখেন বাবা। বড়া কষ্ট পাচ্ছি এই বুড়া বয়সে। অষ্টাঙ্গে দরদ। ঘুষঘুষা জ্বর। মাটি নিতে হবে তা আমার মালুমে এসেছে। কিন্তু এই কষ্ট—এ যে সইতে নারছি বাবা। ইয়ার একটা বিধান দ্যান।

মশায় ঘাড় নেড়ে বললেন—আমার কাছে তোমরা আর এস না মকবুল। চিকিৎসা আর আমি করব না। একালে অনেক ভালো চিকিৎসা উঠেছে, হাসপাতাল হয়েছে, নতুন ডাক্তার এসেছে। তোমরা সেইখানেই যাও।

মকবুল অবাক হয়ে গেল। জীবনমশায় এই কথা বলছেন? দীনুমশায়ের নাতি, গৎ-মশায়ের ছেলে—জীবনমশায় এই কথা বলছেন? যে নাকি নাড়ীতে হাত দিলে মকবুলের মনে হয়, অর্ধেক রোগ ভালো হয়ে গেল, তাঁর মুখে এই কথা!

ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হেসে, তাকে বুঝিয়েই বললেন—আমার আর ভালো লাগছে না মকবুল। তা ছাড়া বয়স হয়েছে, ভুল-ভ্রান্তি হয়—

—অ ডাক্তার! বলি, তুমি চিকিৎসা ছাড়লে আমাদের কী হবে হে? আমরা যাব কোথায়? নাও—নাও। লোকের হাত দেখে বিদেয় করো। তোমার ভুল-ভ্রান্তি! কী বলে,

তোমার ভুল-ভ্রান্তি হলে সে বুঝতে হবে আমাদের অদৃষ্ট-ফের! নতুন চিকিৎসা, নতুন ডাক্তার—অনেক সরঞ্জাম, বৃহৎ ব্যাপার, ওসব করাতে আমাদের সাধ্যিও নাই, ওতে আমাদের বিশ্বাসও নাই।—বললে কামদেবপুরের দাঁতু ঘোষাল। অনেক কষ্টেই বললে।

একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে অনর্গল কাশতে শুরু করে দিলে সে। বুকের পাঁজরাগুলি সেই কাশির আক্ষেপে কামারের ফুটো হাপরের মতো শব্দ করে দুঁপছে। মনে হচ্ছে, কখন কোন মুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে দাঁতু মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। ডাক্তার চারিদিকে তাকিয়ে খুঁজলেন একখানা পাখা অথবা যা হোক একটা কিছু—যা দিয়ে একটু বাতাস দেওয়া যায়। দাঁতুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। কিন্তু কিছুই নাই কোথাও। ওই নন্দ হতভাগার জন্যে কিছু থাকবার জো নাই। শিশি-বোতল থেকে মিনিমগ্লাস, মলম তৈরীর সরঞ্জাম, থারমোমিটারের খোল, এমন কি পুরানো বাতিল স্টেথোসকোপের রবারের নলের টুকরো দুটো পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে হতভাগা। কিছু না পেয়ে ডাক্তার উঠে ভাঙা আলমারির ভিতর থেকে টেনে বের করলেন একখানা পুরানো হিসেবের খাতা; লাখ টাকা পাওনার তামাদি দলিল; তারই একদিকের খেরোর মলাটখানা ছিঁড়ে নিয়ে বাতাস দিতে শুরু করলেন। বাইরে সমাগত রোগীদের দিকে তাকিয়ে একজনকে বললেন—বাড়ি থেকে এক গ্লাস জল আন তো! চট করে।

কামদেবপুরের এই বৃদ্ধ দাঁতু ঘোষালের চিরকাল একভাবে গেল। দাঁতু যত লক্ষ্মীছাড়া তত লোভী; দুনিয়া জুড়ে খেয়ে খেয়ে লোভের তৃপ্তি খুঁজে বেড়ালে সারাজীবন; কিন্তু তাতে লোভের তুষ্টি হয় নি, হয়েছে রোগ; পুষ্টির বদলে হয়েছে দেহের ক্ষয়। তার উপর গাঁজা খায় দাঁতু! এককালে গাঁজা খেত ক্ষুধার জন্য। গাঁজায় দম দিয়ে খেতে বসলে পাকস্থলীটি নাকি বেলুনের মতো ফেঁপে ওঠে। তাতে আহার্য ধরে বেশী পরিমাণে। তাঁর বাড়িতেই দাঁতু ঘোষাল নিমন্ত্রণ খেতে বসে অন্ন-ব্যঞ্জনে বালতিখানেকেরও উপর কিছু উদরস্থ করে—মিষ্টির সময় সাতচল্লিশটি রসগোল্লা খেয়ে উঠেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে গোটা কাঁঠাল খেয়ে দাঁতু ঘোষাল যে কতবার বিছনায় শুয়ে ছটফট করেছে তার হিসেব নাই। বার চারেক তো কলেরার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তবু ঘোষাল লোভ সংবরণ করতে পারলে না। এখন বদহজম থেকে হাঁপানি হয়েছে। তার উপর নেশা। গাঁজায় দম দিয়ে হুঁকো হাতে বসবে, টানবে আর কাশবে। কাশতে কাশতে হাঁপাতে শুরু করবে। এবং সপ্তাহে দুদিন ডাক্তারের এখানে আসবে—ওষুধ দাও ডাক্তার। ভালো ওষুধ দাও। আর ভুগতে পারছি না।

ভালো ওষুধ চায় ঘোষাল, কিন্তু মূল্য দিয়ে নয়। বিনা মূল্যে চাই। বাল্যকালে ঘোষাল জীবন ডাক্তারের সঙ্গে পাঠশালায় পড়েছিল, অনেক মন্দবুদ্ধি এবং মন্দকর্মে মতি সে যুগিয়েছে, সেই দাবিতে ডাক্তারের চিকিৎসায় ঔষধে তার অবাধ অধিকার। তার উপরে ঘোষাল যজমানসেবী পুরোহিত ব্রাহ্মণ। অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতা পূজা করে বেড়ায়। সে হিসেবেও তার এ দাবি আছে। বিদেশী ডাক্তারেরা এ দাবি মানে না। তারা না মানতে পারে কিন্তু জীবন মানবে না কেন? এ দাবি তারা দীনবন্ধু মশায়ের আমল থেকে চালিয়ে

আসছে, ছাড়বে কেন? তবে গুণও আছে ঘোষালের। কোনো যজ্ঞিবাড়ি থেকে কাকের মুখে বার্তা পাঠিয়ে দাও, ঘোষাল এসে হাজির হবে। কোমর বেঁধে দিবারাত্রি খেটে কাজ সেরে খেয়ে-দেয়ে বাড়ি যাবে। দক্ষিণা দাও ভালোই, না দাও তাতেও কিছু বলবে না সে; পুরিয়া দুয়েক অর্থাৎ দু আনা কি চার আনার গাঁজা দিলেই ঘোষাল কৃতার্থ। আরও আছে, শ্মশানে যেতে ঘোষালের জুড়ি নাই। সে হিসেবে ঘোষাল এ অঞ্চলের সকলজনের একজন বান্ধব তাতে সন্দেহ নাই। উৎসবে আছে, শ্মশানে আছে—রাজদ্বারেও আছে ঘোষাল; মামলায় সে পেশাদার সাক্ষী।

সুস্থ হতে ঘোষালের বেশ কিছুক্ষণ লাগল। হেউ-হেউ শব্দে ঢেকুরের পর ঢেকুর তুলবার চেষ্টা করে অবশেষে দু-তিনটে বেশ লম্বা এবং সশব্দ ঢেকুর তুলে একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে ঘোষাল বললে—আঃ বাঁচলাম! তারপর আবার বললে—তুমি বরং ওদের হাত দেখে শেষ করো ডাক্তার। আমি আর একটু জিরিয়ে নিই।

এই সুযোগে মকবুল এগিয়ে এল, হাত এগিয়ে দিল। ডাক্তার তার হাতখানি ধরলেন। বিচিত্র হাস্যে তার মুখখানি প্রসন্ন হয়ে উঠল। উপায় নাই। তিনি ছাড়তে চাইলেও এরা তাঁকে ছাড়বে না; এই মকবুলেরা। নূতনকে এরা ভয় করে—তাকে গ্রহণ করার মতো সামর্থ্য তাদের নাই; মনেও নাই; আর্থিক সঙ্গতিতেও নাই। মকবুলের দেহ পর্যন্ত বিচিত্র। এক গ্রেন কুইনিন খেলে মকবুলের ঘাম হতে শুরু হয়, শেষ পর্যন্ত নাড়ী ছাড়ে। মকবুল বিলিতী ওষুধকে বিষের মতো ভয় করে। একে একে রোগীদের দেখে তাদের ব্যবস্থা দিয়ে সব শেষে দেখলেন দাঁতু ঘোষালকে।

ঘোষাল বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। এবার সে হাতখানি বাড়িয়ে দিলে। জীবন ডাক্তার বললেন—তোর হাত দেখে কী করব ঘোষাল? রোগ তো তোর ভালো হবার নয়। তোর আসল রোগ হল লোভ। লোভ তো ওষুধে সারে না। তার উপর নেশা। সকালে উঠেই এই অবস্থায় তুই গাঁজা টেনে এসেছিস।

দাঁতু লজ্জিত হয় না, সে বেশ সপ্রতিভভাবেই বললে, গাঁজাতে হয় নাই দস্ত। বিড়ি। বিড়ি। বিড়িতে হল। তোমার দাওয়াতে বসে ছিলাম, দেখলাম ওই কি বলে তাহের শেখ বিড়ি টানছে। ভারি পিপাসা হল, ওরই কাছে একটা বিড়ি নিয়ে যেই একটান টেনেছি, অমনি বুঝেছ কি না, হাঁপ ধরে গেল। তারপরেতে তোমাকে কতকগুলো কথা একসঙ্গে বলেছি আর ব্যস, হঠাৎ বুঝেছ কি না—।

হাত দুটি নেড়ে দিলে দাঁতু ঘোষাল—এতেই বুঝিয়ে দিলে যে আচমকা রোগটা উঠে পড়ল। এতে আর তার অপরাধটা কোথায়? ঘোষাল নিরাপরাধ ব্যক্তির মতোই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—এ সব গ্রহের ফের বুঝলে না! তা দাও ভাই, যা হোক একটা এমন ওষুধ দাও যাতে হাঁপানি-কাশিটা কমে। সকালে বিকেলে চায়ের সঙ্গে দুটো করে চারটে আরসুলা সিদ্ধ করে করে খাচ্ছি, তাতেও কিছু হচ্ছে না।

ডাক্তার বললেন—গাঁজা-তামাক বন্ধ করতে হবে। লোকের বাড়ি খাওয়া বন্ধ করতে

হবে। একেবারে ঝোল আর ভাত। না হলে ওষুধে কিছু হবে না, ওষুধও আমি দেব না ঘোষাল।

—তবে আর একবার ভালো করে হাতটা দেখো। ঘোষাল হাতটা বাড়িয়ে দিলে। —দেখো, দেখে বলে দাও কবে মরব। নিদান একটি হেঁকে দাও। ওতে তো তুমি বাকসিদ্ধ। দাও। শুনলাম কামারবুড়ীকে নিদান হেঁকে দিয়েছ। গঙ্গাতীরে যেতে বলেছ। আমাকে দাও।

ডাক্তার চমকে উঠলেন। নতুন করে মনে পড়ে গেল সকালবেলার কথা। তিনি চঞ্চল হয়ে নড়েচড়ে বসে বললেন—তুই থাম ঘোষাল, তুই থাম।

তিনি তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ টেনে প্রেসক্রিপশন লিখে ঘোষালের হাতে দিয়ে বললেন—এই নে। গাছ-গাছড়া শুধু, দু-তিনটে জিনিস মুদীখানায় কিনে নিবি। তৈরি করে নিয়ে খাস।

ডাক্তার উঠে পড়লেন। চেয়ারখানা ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল অমরকুঁড়ির পরান খাঁ। সে সেলাম করে দাঁড়াল। সামনে ছইওয়ালা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খাঁয়ের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর দীর্ঘস্থায়ী অসুখ। আজ ছ মাস বিছানায় পড়ে আছে। মৃত সন্তান প্রসব করে বিছানায় শুয়েছে। সপ্তাহে দুদিন করে পরান ডাক্তার নিয়ে যায়। আজ যাবার দিন। যেতে হবে। পরান খাঁ অবস্থাপন্ন চাষী। নিয়মিত ফি দিয়ে থাকে। ডাক্তার হাসলেন। একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে। এই সব বিনা ফি-এর রোগীদের তিনি যখন বলেছিলেন আর তাদের চিকিৎসা করবেন না তখন তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, চিকিৎসা ছাড়লে চলবে কী করে ? বাঁচতে হবে তো! আজ যে তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত। একা তিনি নন—ঘরে স্ত্রী আছে। ক্ষমাহীনা স্ত্রী।

পরান বললে—দেরি হবে না কি আর।

—নাঃ দেরি কিসের। ডাক্তার পা বাড়ালেন।—চলো।

পরান এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে—আপনি তা হলে গাড়িতে চড়েন। আমি পায়দলে তুরন্ত গিয়া ধরব গাড়ি। একটু অপ্রস্তুতভাবেই বললে—কিছুটা তরি নিয়া এসেছিলাম। নন্দ নিয়া গেছে ভিতরে। ডালাটা নিয়াই যাব আমি।

পুরানো কালের লোক পরান; এখনও ভালোবাসার মূল্য দেয়। খেতের ফসল, পুকুরের মাছ ডাক্তারের বাড়ি মধ্যে মধ্যে পাঠায়। কখনও নিজেই নিয়ে আসে। বিবির অসুখে এই ভেট পাঠানোর বহরটা একটু বেড়েছে। ডাক্তারের উপর অগাধ বিশ্বাস পরানের। নতুন কালের চিকিৎসায় বিশ্বাস থাক বা না থাক নতুন কালের অল্পবয়সী ডাক্তারদের উপর বিশ্বাস তার নাই। তৃতীয়পক্ষের বিবি যুবতী, মেয়েটি শ্রীমতীও বটে; এর উপর পরানের আছে সন্দেহ-বাতিক। বিবিকে বাঁচাবার জন্য তার আকুলতার সীমা নাই, অর্থব্যয় করতেও কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু জেনানার আবরু জলাঞ্জলি দিয়ে বাঁচার চেয়ে মরাই ভালো। জীবনমশায়ের কথা আলাহিদা। পরান 'আলাদা' শব্দটাকে বলে 'আলাহিদা'। মাথার চুল সাদা হয়েছে, চোখের

চাউনির মধ্যে বাপ-চাচার চাউনি ফুটে ওঠে, গোটা মানুষটাই শীতকালের গঙ্গানদীর জলের মতো পরিষ্কার।

গাড়ি মন্থর গমনে চলল।

পরান খাঁয়ের মতো ঘরকয়েক বাঁধা রোগীর জন্যই মশায় সংসারের ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত। বর্ষায় ধানের অভাব হলে ধান ঋণ দেয় তারা। অভাব-অভিযোগের কথা জানতে পারলেই পূরণ করে। অথচ—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।

কী না ছিল?

মাঠের উপর এসে পড়েছিল গাড়িটা। চারিপাশের উৎকৃষ্ট ক্ষেতগুলির দিকে আপনি চোখ পড়ল। এগুলির অধিকাংশই ছিল মশায়দের। ওই বিরাট পাঁজার পুকুর, ওই শ্রীলাইকার, ওই ঘোষের বাগান! শুধু জমি পুকুরই নয়—এই গ্রামের সামান্য জমিদারি অংশও কিনেছিলেন তাঁর বাবা জগদ্বন্ধু মশায়। এক আনা অংশ তিনি চড়া দামে কিনেছিলেন।

গাড়ির মধ্যে বসে যেতে যেতে মনে পড়ে গেল পুরানো কথা।

তখন তাঁর কিশোর বয়স।

পড়তেন নবগ্রাম মাইনর ইস্কুলে। সেইবারই তাঁর মাইনর ইস্কুলে শেষ বৎসর। সে আমলে জমিদারত্বের একটা উত্তাপ ছিল। যে জমিদারি কিনেছে সেকালে তারই মেজাজ পালটেছে। জমিদারি কিনলেই লোকে মনে করত—লক্ষ্মী বাঁধা পড়লেন। সে আমলের প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের অধিকারী কণ্ঠমহাশয়ের গানে আছে —"আগে করবে জমিদারি তবে করবে পাকাবাড়ি।" তাঁরই স্বজাতি জ্ঞাতি ঘোষগ্রামের রাধাকৃষ্ণ মিত্র ওই নবগ্রাম মাইনর ইস্কুলে পড়ত। ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নবগ্রামের প্রতিপত্তিশালী জমিদারের ভাইয়ের সঙ্গে চলত তার অবিশ্রাম প্রতিযোগিতা। লেখাপড়ায় নয়, জমিদার-বংশধরত্বের। প্রায়ই খিটিমিটি বাধত। বাধবার মূল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকত রাধাকৃষ্ণ। বলত, He is a zamiuder's son, I am also a zaminder's son; এখন ঝগড়া হচ্ছে, বড় হলে দাঙ্গা হবে!

তাঁর বাবা জগদ্বন্ধু জমিদারি কেনার পর তাঁরও মনে এ উত্তাপ কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল। লোকে—সহপাঠীরা—বলেছিল, গুলবাঘা এবার ডোরাবাঘা হল! সাবধান!

সহপাঠীরা তাঁকে বলত—গুলবাঘা।

সেই কিশোর বয়সে তাঁর নিজের রূপের কথা মনে পড়ছিল। রূপ—যে রূপ সুকুমার-কোমল-উজ্জ্বল—সে রূপ তাঁর কোনো কালে ছিল না। কিন্তু রূপ তাঁর ছিল। সবল পরিপুষ্ট দেহ—গোল মুখ, ঝকঝকে চোখ, নির্ভীক দৃষ্টি, শ্যামবর্ণ দুর্দান্ত কিশোর। হাডু-ডু-ডু খেলবার সময় মালকোঁচা মেরে জীবন ডাক দিতে ছুটলে প্রতিপক্ষ দল খানিক পিছিয়ে 'খোল' অর্থাৎ স্থল নিত। বলত—হাঁ গুলবাঘা ছুটেছে।

এধার থেকে ওধার মুহূর্তে ছুটে ঘুরবার ভান করে একেবারে মাঝের দাগের কাছে পর্যন্ত এসে বোঁ করে আবার ঘুরে আক্রমণ করতেন। কাউকে-না-কাউকে মেরে আবার ঘুরতেন।

বাড়ির পিছনে কুস্তির আখড়া ছিল। ল্যাঙট পরে নরম মাটির উপর দেহ ঠুকে আছাড়

তেন শরীর শক্ত করবার জন্য। এর উপর মুগুর ছিল, সে দুটো আজও আছে।

গুলবাঘ হিংস্রতর নরঘাতী ডোরাবাঘই হয়ে উঠত যদি না জগদ্বন্ধু মশায় মাথার উপরে থাকতেন। জগদ্বন্ধু মশায়ের চিত্ত এতে বিন্দুমাত্র উত্তপ্ত হয় নি। মশায় বংশের মহদাশয়ত্বই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। দম্ভের মোহে তিনি জমিদারি কেনেন নি। জমিদারির উপর কোনো মোহ তাঁর ছিল না। জমিদারি তিনি কিনেছিলেন জমিদারের দম্ভের উত্তাপ থেকে বাঁচবার জন্য। যেদিন জমিদারি কেনা হয় সেদিনের একটা কথা মনে পড়ছে।

জগদ্বন্ধু মশায়ের বন্ধু, পেশায় গোমস্তা ঠাকুরদাস মিশ্র যে চিকিৎসালয়ের দেওয়ালে লিখে-ছিল 'লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যম্', সে-ই তাঁকে শ্লেষ করে বলেছিল—তা হলে এবার জমিদার হলে। আশয়ের চেয়ে বিষয় বড় হল। আগে লোকে সম্ভ্রম করত—মশায় বলে, এবার লোক প্রণাম করবে জমিদার মশায় বলে! বাবুমশায় বলে! ঠাকুরদাস বাতের যন্ত্রণা এবং আরোগ্যের আনন্দ তখন একেবারেই ভুলে গেছে। অনেক দিন হয়ে গেছে তখন।

জগদ্বন্ধু বলেছিলেন—ভাই, ঢাল আর তরোয়াল দুটোই হল অস্ত্র। ওর একটা থাকলেই সে যোদ্ধা। কিন্তু তরোয়াল না নিয়ে তরোয়ালের চোট থেকে মাথা বাঁচাতে শুধু ঢালটা যে রাখে তাতে আর তরোয়ালধারীতে তফাত আছে। আছে কি না আছে—তুমিই বলো। ঠাকুরদাস, ওটা আমার ঢাল, শুধু ঢাল। নবগ্রামের তরোয়ালধারী জমিদারদের উঁচানো তরোয়ালের কোপ থেকে আশয়ের মাথা বাঁচানো দায় হয়ে উঠেছিল। তাই ঢাল অস্ত্র হলেও ধরতে হল। কথাটা তোকে খুলেই বলি ঠাকুরদাস। নবগ্রামের জমিদারদের কাছে মান বজায় রাখা দায় হয়ে উঠেছে ভাই। সদাই ওঁরা শস্ত্রপাণি। নবগ্রামের রায়চৌধুরী বংশের তরোয়াল ভেঙেছে, ওঁরা এখন বাঁট ঘুরিয়ে তারই ঘায়ে লোকের মাথা ভাঙতে চান। আবার নতুন ধনী ব্রজলালবাবু এখন আমাদের গ্রামের আট আনা অংশের জমিদার। তাঁদের হল চকচকে ধারালো তলোয়ার। আজ মাস ছয়েক থেকে দেখছি, ব্রজবাবুদের বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হলে ডাক আসছে চাপরাসী মারফত। সেলাম অবিশ্যি করে। বলে—'সালাম গো ডাক্তারবাবু—বাবুদের বাড়ি একবার যেতে হবে যে।' ওদের দেখাদেখি রায়চৌধুরীরা পথে-ঘাটে দেখা হলে হেঁকে বলতে শুরু করেছে—'মশায় হে, একবার আমাদের বাড়ি হয়ে যাবে যেন।' তবু তো বড়বাবুরা দর্শনী দেন, এরা আবার তাও দেয় না। বুঝেছ না, অনেক ভেবে ঢাল কিনলাম। এ আমার তরোয়াল নয়। এক হাতে ঢাল থাকল—অন্য হাতে খলনুড়ি। ওটা ছাতার বদল।

কথাটা তিনি তাঁর জীবনে সত্য বলেই প্রমাণিত করেছিলেন। তাঁর ওই ঢালের আড়ালে এ গ্রামের অনেক জনকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। এবং ওই ঢাল দেখিয়ে এ গ্রামের কাউকে কখনও অস্ত্রধারীর ঔদ্ধত্যে অপমানিত করেন নি।

কথাগুলি জীবন দত্ত নিজের কানে শুনেছিলেন। পাশের ঘরেই তিনি বসে পড়ছিলেন সেদিন।

তবুও জীবনমশায়ের মনে বিষয়-বৈভবের দম্ভের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল। কী করবেন

তিনি? উত্তাপ লাগলে উত্তপ্ত হওয়া যে প্রকৃতি-ধর্ম। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া তো সহজ নয়। নইলে তিনি ডাক্তার হতেন না। বাপের কাছে কবিরাজিই শিখতেন। উত্তপ্ত বস্তু সহজ ধর্মে আয়তনে বাড়তে চায়। জমিদারের এবং বড়লোকের ছেলে তাঁর বৈভব ও অহঙ্কারের উত্তপ্তচিত্ত তখন বাপপিতামহের জীবনপরিধিকে ছাড়িয়ে বাড়তে, বড় হতে চাচ্ছে! তাই জগদ্বন্ধু ছেলের মাইনর পড়া শেষ হওয়ার পর তাকে টোলে ভরতি করতে চাইলেন। ব্যাকরণ শেষ করার পর আয়ুর্বেদ পড়বে। কিন্তু জীবনমশায় বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে ডাক্তারি পড়ি।

—ডাক্তারি!

—হ্যাঁ। দেশে তো ডাক্তারিরই চলন হতে চলল। কবিরাজিতে লোকের বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। বর্ধমানে ইস্কুল হয়েছে। আমি ওখানেই পড়ব।

দেশে সত্যই তখন ডাক্তারি অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা রাজকীয় সমারোহে রথে চড়ে আবির্ভূত হয়েছে। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিকেল স্কুল, জেলার সদরে সদরে হাসপাতাল, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি, ইংরেজ সাহেব ডাক্তার, দেশী নামজাদা ডাক্তারদের পোশাক গলাবন্ধ কোট, প্যান্টালুন, গোল টুপি, গার্ডচেন, বার্নিশ-করা কাঠের কলবাক্স; ঝকঝকে লেবেল-আঁটা সুন্দর শিশিতে ঝাঁঝালো রঙীন ওষুধ, ওষুধ তৈরীর সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, সব মিলিয়ে সে যেন একটা অভিযান। এ অঞ্চলে তখনও কবিরাজির রাজ্য চলছে। এ যুগের সাঁড়াশি আক্রমণের মতো দুদিকে বসেছেন দুজন ডাক্তার। উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। উত্তরে বসেছেন ভুবন ডাক্তার। বড় লাল ঘোড়ায় চেপে ব্রিচেস আর গলাবন্ধ কোট পরে ভুবন ডাক্তার মধ্যে মধ্যে এ পথে যাওয়া-আসা করেন। আর উত্তর থেকে আসেন রঙলাল ডাক্তার—তসরের প্যান্টলুন, গলাবন্ধ কোট, গলায় ঝোলানো পকেট-ঘড়ি। রঙলাল ডাক্তার যাওয়া-আসা করেন পালকিতে। রঙলাল ডাক্তার থাকেন এখান থেকে মাইল চারেক দূরে। এ অঞ্চলে তিনিই প্রথম অ্যালোপ্যাথি নিয়ে এসেছেন। অদ্ভুত চিকিৎসক। প্রতিভাধর ব্যক্তি। মেডিক্যাল কলেজ বা ইস্কুলে তিনি পড়েন নি; নিজে বাড়িতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। নদী থেকে, শ্মশান থেকে শব নিয়ে এসে গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে কেটে অ্যানাটমি শিখেছেন। বিস্ময়কর সাধনা। তেমনি সিদ্ধি। কোথায় বাড়ি হুগলী জেলায়, সেখান থেকে এসেছিলেন এ জেলায় রাজ হাই ইংলিশ ইস্কুলে শিক্ষকতার কর্ম নিয়ে। ইংরিজীতে অধিকার ছিল নাকি অসামান্য। আর তেমনি ছিল অগাধ আত্মবিশ্বাস। বিখ্যাত হেড মাস্টার শিববাবুর ইংরিজী খসড়া দেখে দু-এক জায়গায় দাগ দিয়ে বলতেন—এখানটা পালটে এই করে দিন। ইমপ্রুভ করবে! বলতে সঙ্কোচ অনুভব করতেন না। তিনি হঠাৎ কোনো আকর্ষণে ময়ূরাক্ষী-তীরে নির্জন একটি গ্রামে এসে এই সাধনা করেছিলেন তপস্বীর মতো। তারপর একদিন বললেন—এইবার চিকিৎসা করব। এবং কিছুদিনের মধ্যেই এ অঞ্চলে অসামান্য প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। রঙলাল ডাক্তারের চিকিৎসার খ্যাতি রঙলালকেই প্রতিষ্ঠা দেয় নি—তাঁর সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিরও প্রতিষ্ঠা করেছিল। চারিদিকে নতুন চিকিৎসার প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে শুরু করলে।

জীবন ডাক্তার সেদিন কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে কবিরাজির পরিবর্তে ডাক্তারির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। প্রতিষ্ঠা চাই, খ্যাতি চাই, অর্থ চাই, মানুষের কাছ থেকে অগাধ শ্রদ্ধা চাই। তার প্রেরণা দিয়েছিল ওই জমিদারিটুকু। জমিদারি যখন কিনেছেন বাবা তখন অবশ্যই পারবেন ডাক্তারি পড়াতে। তাই মাইনর পাস করে তিনি গেলেন কাঁদী রাজ হাই ইস্কুলে এণ্ট্রান্স পড়তে। এণ্ট্রান্স পাস করে এফ. এ. পড়বেন, তারপর ডাক্তারি।

* * * * *

গোরুর গাড়িটা থামতেই ডাক্তারের তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনেই পরান খাঁয়ের দলিজা। এসে পড়েছেন। পুরানো কাল থেকে বাস্তব বর্তমানও বটে।

চার

পরানের বিবি একটু ভালোই আছে। আরো ভালো থাকা তার উচিত ছিল। কিন্তু তা থাকছে না। নাড়ীর গতি দেখে ডাক্তারের যা মনে হয় উপসর্গের সঙ্গে ঠিক তার মিল হয় না। রোগের চেয়ে রোগের বাতিকটা বেশী। এখানে ব্যথা ওখানে ব্যথা, বিছানায় শুয়ে কাতরানো, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা—এর আর উপশম নেই। আরও মজার কথা!—'রোগী তো ভালো আছে' বললেই রোগ বেড়ে যায়। কী করবেন ডাক্তার! এর চিকিৎসা তাঁর হাতে নাই। তিনি বুঝতে পেরেছেন, মেয়েটি ভালো হতে চায় না। পরান খাঁয়ের স্ত্রী হিসেবে সুস্থ দেহে উঠে হেঁটে বেড়াতে সে অনিচ্ছুক। তাই ডাক্তার কৌশল অবলম্বন করেছেন, রোগ আদৌ কমে নি বলে যাচ্ছেন। আজো তাই বলবেন—তবে হ্যাঁ, ভয় কিছু নাই খাঁ। ভয় কোরো না। এ ছাড়া খাঁকেই বা বলবেন কী? ও কথা খাঁকে বললে খাঁ যে কী মূর্তি ধরবে—সে ডাক্তারের অজানা নয়। বৃদ্ধের জীবনও অশান্তিময় হয়ে উঠবে। স্বামী-স্ত্রীর অমিলনের মতো অশান্তি আর নাই। তিনি নিজেও চিরজীবন জ্বলছেন। আগুন তাঁর জীবনে কখনও নিভল না। আজও রোগী দেখে বাড়ি ফিরে দেখলেন যে সে আগুন যেন লেলিহান হয়ে উঠেছে। কোন্ আহুতি পেয়েছে বুঝলেন না।

আতর-বউ নিজে নিষ্ঠুর আক্রোশে বকছে। এই মুহূর্তেও বকে চলেছে আপনার মনে। বকছে তাঁকে এবং নবগ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার শশী মুখুজ্জেকে। শশীই দিয়ে গিয়েছে আহুতি; সে তাঁর অনুপস্থিতিতে এসে হাজির হয়েছিল। জীবন ডাক্তারকে না পেয়ে বাড়ির ভিতর আতর-বউয়ের কাছে বসে তাঁকেই জ্বালাতন করে গিয়েছে। তামাক খেয়ে ছাই এবং গুল ঝেড়ে ময়লা করে দিয়ে গিয়েছে গোটা দাওয়াটা। রাজ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে ওই হাসপাতালের ডাক্তার তাঁকে যে কটু কথাগুলি বলেছে, সেগুলিও আতর-বউয়ের কানে তুলে দিয়ে গিয়েছে। হতভাগা শশীর উপর আতর-বউয়ের মমতাও যত ক্রোধও তত।

জীবনমশায়ের শিষ্য শশী। তাঁর আরোগ্য-নিকেতনেই ডিসপেনসিং শিখেছিল সে—

এখানেই তার হাতেখড়ি। তারপর বর্ধমান গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাকা কম্পাউণ্ডার হয়ে ফিরে নবগ্রামের চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারির প্রথম কম্পাউণ্ডার হয়েছিল সে। কম্পাউণ্ডিং সে ভালোই জানে। তার সঙ্গে চিকিৎসা-বিদ্যাটাও মোটামুটি শিখেছে শশী। তিনিই তাকে নাড়ী দেখতে রোগ চিনতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু শশী আশ্চর্য অপরিচ্ছন্ন লোক। কামানোর ঝঞ্ঝাটের জন্য দাড়ি-গোঁফ রেখেছে। স্নান কদাচিৎ করে, দাঁতও বোধ করি মাজে না। এক জামা পনেরো দিন গায়ে দেয়; উৎকট দুর্গন্ধ না হলে সেটাকেও ছাড়ে না। আর প্রায় অনবরতই তামাক টানে। জামার পকেটেই থাকে তামাক টিকে দেশলাই এবং হাতে থাকে হুঁকো। তার উপর করে মদ্যপান। মধ্যে মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। ওই হুঁকোর জন্যেই তার নবগ্রাম ডিস্‌পেনসারির চাকরি গিয়েছিল। পকেটে হুঁকো, কল্কে, তামাক, টিকের টিন—এ না নিয়ে শশী কোনো কালেই এক পা হাঁটে না। বলে—"ওরে বাবা, লোকে লুকিয়ে বাবার হুঁকো টেনে তামাক খেতে শেখে। আমি আমার কর্তাবাবার —মানে বাবার বাবার কাছে তামাক খেতে শিখেছি। লুকিয়ে নয়, তিনি আমাকে নিজে সেজে তামাক খাওয়াতেন। এ ছাড়া চলতে বারণ। ছেলেদিগে বলেছি, আমি মরলে আমার চিতায় যেন হুঁকো কল্কে তামাক টিকে দেয়। দেশলাই চাই না। ও চিতের আগুনেই হবে।" ডাক্তারখানার ওষুধের আলমারিতে তামাক-টিকে রাখত। কোণে গুল ঝেড়ে গাদা করত, ডাক্তার সাহেব এলে কোনো কিছু একখানা কাগজ কি কাপড় কি প্যাকিং বাক্স দিয়ে চাপা দিয়ে রাখত। তবুও ধরা পড়ত। তিনবার ধরা পড়ে চাকরি বেঁচেছিল, চারবারের বার বাঁচল না। তা না বাঁচলেও শশী ওই বিদ্যেতেই বেশ করে খেয়েছে, আজও খাচ্ছে। মদ্যপানটা কিছু কমেছে এখন। ছেলের চাকরি করে। নিজে এখনও একটা টাকা কোনরকমে উপার্জন করে শশী। পরামর্শের দরকার হলে মধ্যে মাঝে জীবনমশায়ের কাছে আসে। জীবন ডাক্তারকে বলে গুরুজী! বলে অনেক শিখেছি জীবনমশায়ের কাছে। যা-কিছু জানি তার বারো আনা। বলে আর প্রচুর হাসে। ইঙ্গিত আছে কথাটার মধ্যে। শশী তাঁর কাছে শুধু ডিসপেনসিং এবং ডাক্তারিই শেখে নি, দাবা খেলাও শিখেছিল সে। আরও শিখেছিল হরিনাম সংকীর্তনে দোয়ারকি। এ দুটোতে শশীর বিদ্যা—শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী বলে তাই।

শশীকে দাবা খেলতে বসিয়ে দিয়ে বন্ধুরা তার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসে খেতে দিত। শশীর বাড়িতে গিয়ে বলত, শশীদাকে আজ রাত্রে রোগীর কাছে থাকতে হবে। কল পেয়েছে। শশীদা আমাদের বললে, ভাই, বাড়িতে গিয়ে আমার খাবার যদি এনে দিস, তবেই তো খাওয়া হয়। শশীদার খাবার দিন।

শশী রাত্রে খেত রুটি এবং শশীর স্ত্রীর রুটি ছিল বিখ্যাত। রাত্রি দুটোর পর শশী যখন দাবা খেলে উঠত, তখন সঙ্গীরা খাবারের শূন্য পাত্রটা তার হাতে দিত, বলত—নিয়ে যাও শশীদা। তোমাদের বাড়ির থালা। শশীর আর বাড়ি যাওয়া হত না। গালাগালি দিয়ে খালি পেটেই শুয়ে পড়ত সেই আড্ডাঘরে। না হলে শশীর কলের মর্যাদা যায়। পরের দিন কারুর

কাছে দুটো টাকা ধার করে নিয়ে তবে বাড়ি ফিরত। বলত, কলের টাকাটা রাখো তো!

তাঁর কাছে শেখা তৃতীয় বিদ্যা সঙ্গীত। তাতে সে অসুর। অসুর বললেও ঠিক ব্যাখ্যা হয় না, বলতে হয় বিকটাসুর। কণ্ঠস্বর তার যেমন কর্কশ তেমনি সে বেমক্কা বেতালা। তার উপর মদ্যপান না করে আসরে সে নামে না। দৃষ্টান্ত দেয় বড় বড় ওস্তাদের।

সংকীর্তনের দলে শশী তারস্বরে চীৎকার করে।

জীবনমশায় কপালে হাত দিয়ে হেসে বলেন, আমার কপাল! মধ্যে মধ্যে শশীকে বলেন—শশী, একসঙ্গে বেচারা হরিকে আর তানকে মেরে খুন করিস না বাবা! শিষ্যের পাপ গুরুকে অর্সায়! আমার যে নরক হবে। শশী বলে—ভাববেন না! আপনার রথ আটকায় কোন্ শা—।

বলেই সে হা-হা করে হাসে।

এই শশী ডাক্তার!

মধ্যে মধ্যে শশী আসে পরামর্শের জন্য, কেসটা যে পেকে গেল ডাক্তারবাবু!

জীবনমশায় বলেন, রোগীটা কাঁচা না পাকা আগে বল। পাকা হলে খসতে দে। তোর চিকিৎসা-দোষের চেয়ে ওর বয়সের দোষ বেশী।

রোগী তরুণ হলে শোনেন, গভীরভাবে চিন্তা করে পরামর্শ দেন।

কখনও কখনও কল দিয়ে নিয়ে যায় শশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সব কলে ফী নাই, বিনা ফীয়ের কল। শশী কম্পাউণ্ডার যেখানে ডাক্তার হিসেবে চিকিৎসা করে, সেখানে চারিদিকে দৈন্য; চার আনা আট আনা ফীতে শশী সন্তুষ্ট। সেখানে জীবনমশায়কে এক টাকা ফী দেবে কোথা থেকে! তা ছাড়া জীবনমশায় এখানকার মাটি, মানুষ, গাছপালাকে নিবিড়ভাবে চেনেন। তাদের দুঃখ তিনি জানেন। তাদের জন্য তাঁর বাপ-পিতামহের চিকিৎসালয়ে দুয়ার ছিল অবারিত। তাঁর দুয়ারও তিনি বন্ধ করেন নি। এরা কঠিন রোগে শয্যাশায়ী না হলে ও চার আনা বাঁচাতে বুকে হেঁটেও দাতব্যালয়ের দুয়ারে এসে হাজির হয়। তাদের কাছে তিনি কি ফী নিতে পারেন?

ইদানীং কিন্তু শশীর মাথায় যেন একটু গোল দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রে যে কয়টা বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়েছে, সেই আবিষ্কারের সঙ্গে শশী কোনোমতেই তাল রাখতে পারছে না। এতদিন পর্যন্ত খুব গোল বাধে নি। তারপর সাল্‌ফাগ্রুপের বিভিন্ন নামে ট্যাবলেট বের হতেই বেচারার মুশকিল হয়েছে। এর পর পেনিসিলিন স্ট্রেপ্টোমাইসিন। নূতন কালের ডাক্তাররা ওই ওষুধগুলি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করে চলেছে। পেনিসিলিন ছাড়া তো কথাই নাই। শশী ওগুলো ব্যবহার করতে খানিকটা ভয় পায়। পাবারই কথা। পাওয়াও উচিত। এর ফলে কিন্তু শশী ক্ষেপে ওঠে মধ্যে মধ্যে এবং যা করে বসে চিকিৎসা-শাস্ত্রে তা অভূতপূর্ব। কিছুদিন আগে বাউড়ীদের কুড়োরামের কন্যার হয়েছিল নিউমোনিয়া। শশীকে কুড়োরাম বলেছিল—ডাক্তারবাবু—ওই হাসপাতালের ডাক্তার বললে, ফুঁড়ে ওষুধ দিলে শিগগির সেরে যাবে। তা—

শশী বুঝেছিল—পেনিসিলিনের কথা বলছে কুড়োরাম। চটে গিয়ে বলেছিল—নিয়ে আয় টাকা। দিচ্ছি ফুঁড়ে। প্যাক করে ফুঁড়ে—একটু আঙুলের ঠেল, আমার তো ওই কষ্ট। তারপর তোরা সামলাবি দেহের দাহ। টাকার দাহ আছে। তাও সামলাবি। ও ইনজেক্‌শন দিতে আমাকে টাকা-টাকা করে ফী দিতে হবে—তাও বলে দিচ্ছি।

—তা হলে?

—তা হলে যা খুশি কর। হাসপাতালের ডাক্তার তো বললে—তা হাসপাতাল থেকে দিলে না কেন? ভরতি করে নিলে না কেন?

—সে আজ্ঞে জায়গা নাই। আর হাসপাতালেও উসব ওষুধ দেয় না।

—তা হলে, আমি যা বলি, তাই কর। চিরকাল খাওয়ার ওষুধ আর মালিশে বড় বড় 'নীলমণি' কেস ভালো হয়ে এল—আর আজ কুড়োরামবাবুর কন্যের বুকে খানিকটা সর্দি হয়েছে—পেনিসিলিন ছাড়া আর ভালো হবে না?

—তবে তাই দেন।

শশীর মাথায় বিকৃতি কিছু হয়েছে বার্ধক্য ও নেশার জন্য, সেটা নিস্ফলতার আক্রোশে আরও বেড়ে যায়। সে গভীর চিন্তা করে স্থির করেছিল মালিশের সঙ্গে সরষের তেল মেশানোর পরিবর্তে কেরোসিন মিশিয়ে মালিশ করলে মালিশের কাজ দ্রুততর হবে। কেরোসিনে আগুন জ্বলে। সুতরাং তার তেজে বুকের ভিতরের সর্দি নিশ্চয় দ্রুত গলবে। যেমন চিন্তা তেমনি কর্ম। ফলে ব্লিস্টার দেওয়ার মতো বুক-পাঁজর জুড়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল টলটলে এক ফোস্কা। তখন ছুটে এসেছিল মশায়ের কাছে।

জীবন ডাক্তারই ব্যাপারটা সামলেও দিয়েছিলেন। বেগ অবশ্য খুব পেতে হয় নি। প্রচুর যত্ন নেওয়ার ফলে ঘা হতে পায় নি। ফোস্কার চামড়া উঠেই নিষ্কৃতি পেয়েছে। এবং বেঁচেও উঠেছে। সেটার জন্য কৃতিত্ব কার—সে কথা জীবন ডাক্তার জানেন না। শশীর উদ্ভাবিত ওষুধের গুণই হোক, আর মেয়েটার ভাগ্যই হোক, ফোস্কা উঠলেও নিউমোনিয়াটা বাগ মেনে গিয়েছিল। বিনা পেনিসিলিনে, বিনা মালিশে, বিনা অ্যান্টিফ্লজিস্টিনে কয়েকদিনের মধ্যে সেদিক দিয়ে বিপন্মুক্ত হয়েছিল।

এই শশিভূষণ আজ এসেছিল। কেন এসেছিল শশী কে জানে! হতভাগা কিন্তু আতর-বউকে জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আতর-বউয়ের কানে কামার-বুড়ীর কথাটা তুলেছে, তা বোঝা যাচ্ছে। ছি! ছি! ছি!

আতর-বউ এখন তাঁকে এই ছুতো ধরেই বকছে। "চিরটা জীবন মানুষের এক স্বভাব? বার বার ঠেকেও মানুষ শেখে না! নিদান হাঁকার অহঙ্কার কেন? তুই অমুক দিন মরবি বলে লাভ কী? তবু যদি পাশকরা ডাক্তার হতে! ঘরে ডাক্তারি শিখে কেউ সর্ববিদ্যে-বিশারদ হয়?—ছি—ছি—ছি! নবগ্রামের ডাক্তারেরা কী বলছে তা শুনে আসুক গিয়ে। আর ওই মুখপোড়া নেমকহারাম শশী বলে কিনা বোগাস!"

পাঁচ

এই 'বোগাস' শব্দটা শশী প্রয়োগ করেই বেশী গোল বাধিয়েছে। শব্দটার অর্থ মশায়গিন্নী জানেন না, তবে ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা বা সমস্ত কথাবার্তার পর ওই শব্দটার অর্থ মশায়গিন্নীর কাছে অত্যন্ত অপমানজনক মনে হয়েছে।

শশীরও অবশ্য দোষ নাই। সেও এসেছিল গায়ের জ্বালায়। নবগ্রামে প্রদ্যোত ডাক্তার ব্যাপারটা নিয়ে বেশ একটা শোরগোল তুলেছে। পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা মানুষের স্বভাব-ধর্ম। তাই একজন প্রতিবাদ করার সঙ্গে আরও পাঁচজন আপনি এসে তার সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে সবল এবং প্রবল করে তোলে।

প্রদ্যোত ডাক্তার নবগ্রামের পাসকরা ডাক্তারদের সকলকেই নাকি কথাটা জানিয়েছেন। এবং ডাক্তারদের আসর থেকে বাজার-হাটে ছড়িয়ে পড়েছে। কথায় আছে 'মরার বাড়া গাল নেই'। মৃত্যুর চেয়ে কঠিন এবং ভীষণ আর কিছু হয় না। আজও এর ঠিকানা মেলে নি, দিগ্‌নির্ণয় হয় নি। মানুষ মরে; নিত্যই অহরহ মরছে—তবু আজও কেউ তাকে দেখে নি, তার স্বর কেউ শোনে নি, বর্ণে-গন্ধে-স্পর্শে-স্বাদে আজও তার এক বিন্দু আভাসও কেউ কখনও পায় নি। এর ব্যাখ্যা করা যায় না, আজও কেউ করে নি। সাধারণ মানুষে 'মরবি' বললে কেউ ভয় পায় না। কিন্তু চিকিৎসক বললে আতঙ্কিত হয়; বিশেষ করে রোগীকে বললে তার আতঙ্কে আর ফাঁসির আসামীর আতঙ্কে কোনো প্রভেদ থাকে না। প্রদ্যোত ডাক্তার সেই কথাই বলেছে, বলেছে—এত বড় হৃদয়হীন ব্যাপার আর হয় না। এর সঙ্গে ডাকাত বা গুণ্ডার বা খুনের ছুরি তুলে তেড়ে আসায় প্রভেদ কী? প্রদ্যোত নাকি চায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করা হোক। সকল ডাক্তারের সই-করা দরখাস্ত।

নবগ্রামে এখন তিনজন পাসকরা ডাক্তার। প্রদ্যোত নিজে আছে হাসপাতালে, আর দুজনের একজন হরেন ডাক্তার নবগ্রামেরই ছেলে, বয়সে প্রদ্যোত থেকে কয়েক বছরের বড়। মেডিকেল ইস্কুল থেকে পাস করে এসে গ্রামেই প্র্যাকটিস করছে। নিজের ছোটখাটো একটি ডিসপেনসারি আছে। আর আছেন প্রৌঢ় ডাক্তার চারুবাবু।

ডাক্তারের মধ্যে চারুবাবু সর্বাপেক্ষা প্রবীণ; পঞ্চাশের উর্ধ্বে বয়স। চারুবাবুই এখানকার প্রথম এম. বি.। প্রায় পঁচিশ বছর আগে সদ্য ডাক্তারি পাস করেই এখানকার হাসপাতালে চাকরি নিয়ে এসেছেন। দশ বছর আগে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস ধরেছিলেন। আজ বছর চারেক থেকে সে প্র্যাকটিস তিনি একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। এখন এখানে ইউনিয়ন বোর্ড, ইস্কুল বোর্ড প্রভৃতি নিয়ে মেতেছেন বেশী। লোকে অবশ্য বলে চারু ডাক্তারের প্র্যাকটিস পড়ে এসেছিল স্বাভাবিক নিয়মে, ডাক্তার তাই ওই দিকে ঝুঁকেছেন। ডাক্তারের ছেলেরাও বড় হয়েছে। বড়টি বেশ উঁচুদরের সরকারী চাকুরে। ছোটটি ডাক্তারি পড়ছে। চারু ডাক্তার লোকটি কিন্তু সাঁচ্চা। দিলখোলা মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত হিসেবী লোক। মেজার গেলাসে মেপে দুটি আউন্স ব্র্যাণ্ডি সন্ধ্যেবেলা নিয়মিত তিনি পান করে থাকেন।

এ অঞ্চলে অনেক ডাক্তারেরই কিছু-না-কিছু ব্যাড-ডেট অর্থাৎ অনাদায়ী বাকি থেকে গেছে, কিন্তু চারু ডাক্তারের খাতায় হিসেবে যেমন একচুল গলদ থাকে না তেমনি পাওনাও এক পয়সা অনাদায় থাকে না। তাঁর কম্পাউণ্ডার প্রতি মাসেই দু-চার নম্বর বাকির জন্য তামাদির মুখে ইউনিয়ন কোর্টে গিয়ে নালিশ দায়ের করে আসে। এ বিষয়ে কেউ কেউ অনুযোগ করে—কঠোর বলতেও দ্বিধা করে না, কিন্তু চারুবাবু বলেন—লুক অ্যাট জীবনমশায়। ওই বৃদ্ধকে দেখে কথা বল বাবা। পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি খাতায় লেখা রইল—উইয়ে খেলে। দেখেই শিক্ষা হয়েছে। ঠেকে শিখতে বোলো না বাবা। এখনও চারু ডাক্তার যে অল্পসল্প প্র্যাকটিস করেন তা তাঁর নিজের ব্যক্তিগত খরচটা তুলবার জন্য। তাঁর প্র্যাকটিস কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ডিসপেনসারিটিও ছোট হয়ে এসেছে। চারটে আলমারির মধ্যে এখন ওষুধ আছে মাত্র একটাতে, আর এক একটার পাঁচটা থাকের মধ্যে তিনটে খালি।

আরও একজন পাসকরা ডাক্তার আছেন—চক্রধারীবাবু। চারুবাবুর চেয়েও বয়সে বড়। এল. এম. এফ.। চারুবাবুর আগে তিনিই ছিলেন এখানকার চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির ডাক্তার। তাঁর চাকরিতেই চারুবাবু বহাল হয়েছিলেন। চক্রধারী এখন প্রায় সন্ন্যাসী। বাড়িতেই আছেন—তবে গেরুয়া-টেরুয়া পরে দিনরাত পুজো-আচ্চা করেন। প্র্যাকটিস তো করেনই না, এখন কেউ হাত দেখাতে এলে—বলেন—বাজে বাজে। হাত দেখে কী হবে? কেউ কিছু জানে নাকি? কিছু জানে না বাবা। সব আন্দাজে ঢিল। লাগল তো লাগল, না লাগল তাতেই বা কী, ফী তো পকেটেই এল। বাবা, রোগ হলে সারে আপনি। রোগীর দেহেই আছে সারাবার শক্তি। ডাক্তার তেতো কষা ঝাঁজালো ওষুধ দেয় আন্দাজে। রোগী মনে করে ওষুধে সারল। তবে হ্যাঁ, দু-চারজন পারে।

চক্রধারী তামাক খেতে খেতে শুরু করেন তাঁর প্রথম যৌবনে দেখা বড় ডাক্তারদের কথা। স্যার নীলরতন, বিধান রায়, নলিনী সেনগুপ্ত প্রভৃতি ডাক্তারদের কথা। সে সব বিচিত্র বিস্ময়কর গল্প। বলেন—হ্যাঁ, সে দেখেছি বটে। এখানে রঙলাল ডাক্তারকে দেখেছি। একটা গোটা ডাক্তার ছিল। আর এখানে আছে একটা মানুষ ওই জীবনমশায়। হ্যাঁ ও পারে। ধরতে পারে। মশায়ের নিজের ছেলে বনবিহারী, সেও ডাক্তার ছিল। আমাদের বন্ধু লোক। একসঙ্গে মদ খেয়েছি। ফুর্তি করেছি। সেই ছেলের—বুঝেছ—রোগ হল। মৃত্যু-রোগ···আমরা বুঝতেও পারি নাই। কিন্তু মশায়—

রোগীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যায়। সে উঠে চলে যায়। চক্রধারী হেসে বলে—গোবিন্দ গোবিন্দ! তার পরই বলে—বিনা পয়সায় অনেক হাত দেখেছি। আর না।

প্রদ্যোত ডাক্তার চক্রধারীকে চিকিৎসক বলেই ধরে না। তাই তার গণনায় নবগ্রামে পাসকরা ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র তিনজন। প্রদ্যোতের কথায় প্রতিবাদ কেউ করেন নি, হরেন ডাক্তার বা চারুবাবু কেউ না। এক রকম মৌন থেকে তার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বলতে হবে। মানুষের মুখের উপর 'তুমি আর বাঁচবে না'—এ কথা বলার চেয়ে নিষ্ঠুর আর কী হতে পারে? এবং এতে যে রোগীর মনোবল ভেঙে যায়, রোগের সঙ্গে যুদ্ধে

দুর্বল হয়ে পড়ে, এও সত্য। বাঁচবার ইচ্ছা, বাঁচব বিশ্বাসটাই যে বাঁচবার পক্ষে পরম ঔষধ—কে অস্বীকার করবে এ কথা? হরেন ডাক্তার চুপ করে প্রদ্যোতের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েও হাত জোড় করেছে। অর্থাৎ মার্জনা করুন আমাকে। প্রদ্যোত ডাক্তার তীব্র তিরস্কার করেছে —ডাক্তারিকে কি আপনি শুধু আপনার জীবিকার পেশা মনে করেন হরেনবাবু? আপনার কোনো সেক্রেড ডিউটি নাই? এই ধরনের নিদান হাঁকা আর গরুয়াধারী করকোষ্ঠী গণক-দের মধ্যে তফাত কী? আর জড়ি-বুটি-তুক-তাক-জলপড়া—এই সব চিকিৎসার সঙ্গে বেদেদের চিকিৎসার অনাচারের মধ্যে ডিফারেন্স কী?

হরেন জোড়হাত করেই দাঁড়িয়েছিল সর্বক্ষণ। প্রদ্যোতের কথার শেষে হেসে বলেছে—আমি গ্রামের লোক। এক সময় আমার বাল্যকালে উনিই আমাকে বাঁচিয়েছিলেন।

একটু থেমে আবার বলেছে—এক সময় উনি খুব ভালো চিকিৎসা করতেন প্রদ্যোতবাবু। আমি অবশ্য ছোট ডাক্তার, আমার বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য। তবে ওঁর নাড়ী দেখে রোগ ডায়গ-নিসিস্-চিকিৎসা অদ্ভুত ছিল। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, হয়তো—মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। তার উপর বয়স হয়েছে। এ ক্ষেত্রে—। এ ছাড়া কিশোরদা নেই, তিনি আসুন, তাঁর অ্যাবসেন্সে এটা করা ঠিক হবে না।

কিশোরবাবু! কিশোরবাবু! প্রদ্যোত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কিশোরবাবু কে? কোনো কথা না বলে তিনি উঠে এলেন।

চারুবাবু বলেছেন—আপনি ইয়ং ম্যান, রক্তের তেজ আছে। তা ছাড়া আজ আছেন কাল নাই। চলে যাবেন অন্যত্র। কে যেন বলছিল—এ চাকরিও আপনার ট্রপিকাল ডিজিজের এক্সপিরিয়েন্সের জন্যে। এর পর আপনি ফরেনে যাবেন। স্পেশালাইজ করবেন। আপনার কি ওই বৃদ্ধের ওপর রাগ করা উচিত? যেতে দিন। দরখাস্ত করলে ওর সঙ্গে হয়তো অনেকের অন্ন উঠবে। শতমারি ভবেদ্‌বৈদ্য সহস্রমারি চিকিৎসক। মানুষ মেরে মেরে হাতুড়েরা নিজেরাও করে খায়, লোকেরও কিছু উপকার করে। আপনার মতো লোকের এ রাগ সাজে না। আমি বরং বৃদ্ধকে বারণ করে দেব। বুঝেছেন। নিদান-টিদান হাঁকবেন না। জানেন—আমাদের সময় একটা গান ছিল—আমরা খুব গাইতাম—"ঘা কর বাবা আস্তে ধীরে, ঘা কর কেন খুঁচিয়ে।" বলেই হো-হো করে হেসে উঠলেন চারুবাবু।

প্রদ্যোতের বেশ লাগল চারুবাবুকে আজ। এখানে এসেই চারুবাবুর সঙ্গে আলাপ সে করেছে, কিন্তু সে আলাপ একেবারে যাকে লে ভদ্রতার মুখোশ এঁটে বাঁও-কষাকষি ব্যাপার। আজ চারুবাবু মুখোশ খুলে কথা বলেছেন। রসিক লোক। বেশ রসিয়ে আবৃত্তি করলেন—'ঘা কর বাবা আস্তে ধীরে'। প্রদ্যোতের মন অনেকখানি নরম হয়ে গেল। একটু লজ্জাও পেলে। চারুবাবু ওই যে বললেন—বৃদ্ধের উপর রাগ করা তার উচিত নয়।

প্রদ্যোত বললে—বেশ, আপনার কথাই মানলাম। কিন্তু বৃদ্ধকে একটু সাবধান করে দেবেন। এ সব ভালো নয়। একে তো অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তার উপর আনসায়েন্টিফিক। হাত দেখে নাড়ী, পিত্ত, কফ, নিদান—এসব কী?

চারুবাবু বললেন—এক সময় কিন্তু মশায় লোকটার নিদান আশ্চর্যরকম ফলেছে। তা ফলত। এবং এখনও। কণ্ঠস্বর মৃদু করে বললেন—আপনি কিন্তু দেখবেন—মতির মাকে বর্ধমান কি কলকাতা পাঠাব ভেবেছেন—তাই পাঠিয়ে দেবেন। নইলে বুড়োর কথা যদি ফলে যায়।

—যাবে না। দৃঢ়স্বরে কথার মধ্যেই প্রতিবাদ এবং দৃঢ় প্রত্যয় জানিয়ে প্রদ্যোত সাইকেল চেপে চলে এসেছে। হি মাস্ট প্রুভ হিমসেলফ্—প্রমাণ সে করবেই। উইচক্র্যাফটের মতো এই হাতুড়ে বিদ্যের ভেলকি ভেঙে সে দেবেই। জীবনে তার মিশন আছে। শুধু অর্থোপার্জনের জন্য সে ডাক্তার হয় নি।

কথাটা গোপন থাকে নি। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে পল্লবিত হয়ে সারা নবগ্রামেই ছড়িয়ে পড়ল।—প্রদ্যোত ডাক্তার নাকি জীবনমশায়কে জেল দেবে! মতির মায়ের নিদান হেঁকেছে জীবনমশায়, ডাক্তার মতির মাকে বাঁচাবে। এবং তারপর দরকার হলে মামলা করবে। ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার, মিনিস্টারের কাছে দরখাস্ত করবে। দরখাস্ত করবে—হাতুড়ের চিকিৎসা করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হোক। কথাটা নিয়ে সবচেয়ে গরম এবং তীব্র আলোচনা হল বি কে মেডিক্যাল স্টোর্সে।

বিনয়ের ওষুধের দোকান—বি কে মেডিক্যাল স্টোর্স এ অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকান। ডাক্তারেরা, যারা প্র্যাকটিসের সঙ্গে ওষুধেরও ব্যবসা করে তারা সকলেই বিনয়ের দোকান থেকে পাইকিরি হারে ওষুধ কেনে। এ অঞ্চলে বিনয়ের দোকানের নাম-ডাক খুব। ওষুধ নেন না শুধু চারুবাবু। চারুবাবুর দোকানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই বিনয় দোকান খুলেছিল। চারুবাবু যেবার হাসপাতালের চাকরি ছাড়েন—হাসপাতালে আসে নতুন এম. বি. অহীনবাবু, সেইবার বিনয় দোকান খোলে। অহীনবাবুই খুলিয়েছিলেন। তাঁর যত প্রেসক্রিপশন আসত বিনয়ের দোকানে, বিনয়ের দোকানে তিনি সন্ধ্যের সময় নিয়মিত ঘণ্টা দুয়েক করে বসতেন। বিনা ফী-য়ে রোগী দেখতেন। অহীনবাবুর পর তিনজন ডাক্তার এসেছেন হাসপাতালে—তাঁরাও অহীনবাবুর মতোই বিনয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রদ্যোত কিন্তু তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নি। তার সঙ্গে কী-কী নিয়ে বিনয়ের একটু-আধটু দর-কষাকষি চলছে।

বি কে ফার্মাসির বিনয় চিকিৎসা জানে না, কিন্তু চিকিৎসকদের ডাক্তার-কবিরাজদের ইতিহাসে ইতিকথায় সে প্রায় শুকদেব বললেও অত্যুক্তি হয় না। দিন-রাত্রিই বিনয় এখানকার ডাক্তারদের নিয়ে আলোচনা করে। শশী পথ দিয়ে যাচ্ছিল হরিজন পল্লীতে রোগীর সন্ধানে। বিনয় তাকে ডেকে বললে—ডাক্তার তামাক খেয়ে যাও। তারপর রসিকতা করে বলেছে—মলে, শশী ডাক্তার, তোমরা এবার মলে। প্রদ্যোত ডাক্তার বলেছে —সব হাতুড়ের রুটি মারব। জেলে দেব ব্যাটাদের। তারপর বিস্তৃত উত্তপ্ত আলোচনা।

শশী সেই কথা এসে বলেছে ডাক্তার-গিন্নীকে।

—কী দরকার? বিনা পয়সায় মতির মায়ের হাত দেখে নিদান হাঁকার কী দরকার?

এ কাল হল বিজ্ঞানের কাল। পাসকরা ডাক্তারদের কাল। বদি পিত্তি কফ নিদান—সেকালে চলত। একালে ওসব কেন? যত সব—! হুঁ!

এই কথাটা ডাক্তারের অন্তরে বড় লাগে। জীবনের সকল দুঃখ-ব্যর্থতার উদ্ভব ওইখান থেকেই। মানুষের দেহে যেমন একটি স্থানে অকস্মাৎ একটি আঘাত লাগে বিষমুখ তীক্ষ্ণধার কোনো বস্তুতে, তারপর সেই ক্ষতবিন্দুকে কেন্দ্র করে বিষ ছড়ায় সর্বদেহে, এও ঠিক তেমনি। তাঁর অদৃষ্ট। অদৃষ্ট ছাড় কী আর বলা যায়! সঙ্গতি থাকতেও তাঁর ডাক্তারী পড়া হয় নাই। তিনি কলেজে পড়ে পাস করে ডাক্তার হলে, আতর-বউ—তুমিও আসতে না এ বাড়িতে।

বিচিত্র ঘটনা সে। স্মরণ হতেই ডাক্তার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এক সর্বনাশী ছলনাময়ী তাঁর জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়ে গিয়েছে। কাঁদী ইস্কুলে পাঠ্য-জীবনে এই সর্বনাশীকে নিয়ে ওখানকার এক অভিজাত বংশের ছেলের সঙ্গে বিবাদ হল। ছেলেটিও তাঁর স্বজাতি, কায়স্থ। পড়ন্ত জমিদারবাড়ির ছেলে।

হায় রে অবুঝ কৈশোর! শক্তি যোগ্যতা বিচার করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে না। কিশোর ছেলে তালপত্রের খাঁড়া হাতে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। রাখাল ছেলে রাজার ছেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সঙ্কোচ অনুভব করে না, ভয় পায় না।

ছয়

জীবনমশায়ের মনে পড়ল। এক কিশোর শাল আর এক কিশোর তমাল চারায় প্রতিযোগিতা হয়েছিল—তাতে কিশোর তমাল লজ্জা পায় নি।

নবগ্রামে মাইনর পাস করে জীবন ডাক্তার কাঁদী গেলেন এণ্ট্রান্স পড়তে। কাঁদী রাজ হাই ইস্কুলে ভর্তি হলেন। এণ্ট্রান্স পাস করে বর্ধমান মেডিক্যাল ইস্কুলে ভর্তি হবেন। জীবনে সে কত কল্পনা, কত আশা! নিজের ডাক্তারী জীবনের ছবি আঁকতেন মনে মনে। রঙলাল ডাক্তারের মতো গরদের পাতলুন আর গলাবন্ধ কোট পরে, সাদা একটা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াবেন এ অঞ্চল। বুকে সোনার চেনে বাঁধা সোনার পকেট-ঘড়ি। থারমোমিটার, স্টেথোসকোপ, কলবাক্স। ঘরে লক্ষ্মী ছিলেন, বাপও ছিলেন স্নেহময়, অর্থের অভাব ছিল না, জীবনের দেহেও ছিল শক্তি, মনেও ছিল সাহস; সুতরাং কাঁদীর পাঠ্যজীবনে উৎসাহের স্ফূর্তির অভাব হয় নি। একদিকে করতেন হৈ-হৈ, রৈ-রৈ, অন্যদিকে বোর্ডিংয়ের তক্তাপোশে শুয়ে স্বপ্ন দেখতেন ভাবীকালে জীবন দত্ত এল. এম. এস. সাদা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন জীবনের মোড় ফিরে গেল। সদ্য যুবক জীবন দত্ত প্রেমে পড়ে গেলেন। প্রেমে পড়েছিলেন এক দরিদ্র কায়স্থ শিক্ষক-কন্যার। তাঁর বয়স তখন আঠারো, নায়িকার বয়স বারো। সেকালে চোদ্দ বছরেই মেয়েরা যৌবনে প্রবেশ করত।

দেহে মনে দুইয়েই তারা একালের বেণীদোলানো সতেরো বছরের মেয়েদের থেকে স্বাস্থ্য এবং মনে অনেক বেশী পরিপুষ্ট হয়ে উঠত। এ মেয়েটি আবার একটু বেশী পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। আজকালকার মতে অকালপক্ব বললে একটু আপত্তি করেন জীবন ডাক্তার। বলেন—অকালে পাকা আর সকালে পাকার তফাত আছে। অকালে যা পাকে তাতে গঠনে খুঁত থাকে; উপাদানে খামতি থাকে। কিন্তু সকালে যা পরিপুষ্টিতে পূর্ণতা লাভ করে পাকে তাতে খুঁত থাকে না; যে-যে উপাদানের রস-পরিপূর্ণতায় স্বাভাবিকভাবে ফলই বল বা দেহমনই বল, রাঙিয়ে-ওঠা রঙ ধরে মিষ্ট গন্ধে মনকে আকর্ষণ করে, তার সবই থাকে তার মধ্যে। বরং একটু বেশী পরিমাণেই থাকে, নইলে সকালে পাকে কী করে? মঞ্জরী একটু সকালে ফুটেছিল।

মেয়েটির নাম মঞ্জরী।

মঞ্জরীর স্বাস্থ্য ছিল সুন্দর। বারো বছরের মঞ্জরী একালের কলেজে পড়া ষোড়শী বা পূর্ণিমার চেয়ে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পূর্ণাঙ্গী ছিল। শুধু চুল দেখে সন্দেহ হত যে মেয়েটি ষোড়শী নয়—কারণ চুলগুলি পিঠ ছাড়িয়ে নিচে নামে নি। কালো চুলের রাশিটি পিঠ ছাড়িয়ে নিচে নামলে তবে ষোড়শী রূপটি পরিপূর্ণ হবার কথা। ঠিক কেমন জান? যেন, কোজাগরী লক্ষ্মী-প্রতিমার পিছনে চালপট লাগানো হয়েছে অথচ তাতে ডাকসাজের বেড়টি এখনো লাগানো হয় নি। সেইগুলি আঁটা হলেই নিখুঁত হয়ে লক্ষ্মীপ্রতিমা হয়ে উঠবে। এইটুকু খুঁত ছিল। তার বেশী নয়।

একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে। জীবন ডাক্তার মনে মনেই সংশোধন করে নেন সেটুকু। লক্ষ্মীপ্রতিমা বটে—তবে শ্যামা। এবং তাতেই যেন অধিকতর মনোরম মনে হত মেয়েটিকে। মঞ্জরীর রূপটি তখন ছিল ভুঁইচাঁপার সবুজ নিটোল ডাঁটাটির মতো, মাথায় এক থোকা ফুলের কুঁড়ি তখনও ফোটে নি; ফোটবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ।

অন্তরের দিক থেকেও বারো বছরের মঞ্জরী ষোড়শীর চেয়ে কম ছিল না। দেহের পরিপুষ্টিতায়, স্বাস্থ্যসমৃদ্ধির কল্যাণে সে তখন কিশোরীর মন পেয়েছিল। একেবারে ষোলো আনার অধিকারীর চেয়েও বেশী, আঠারো আনা বলা চলে; বলা চলে কেন জীবন দত্তের হিসাবে তাই হয়। ষোলো বছরে কৈশোর পূর্ণ হলে বয়স মেপে হিসেবের আইনে বারো আনা তো পাওয়ারই কথা, ষোলো আনার বাকি চার আনার দু আনা পূরণ করেছিল তার সমৃদ্ধ স্বাস্থ্য, বাকি দু আনা সেকালের ঘরের শিক্ষায় এবং মায়ের প্রদত্ত শ্বশুর-বাড়ি যাওয়ার মন্ত্রপাঠের ফলে সে পেয়েছিল। এর উপরও বাড়তি দু আনা মূলধন তার ছিল। সে পড়ে-পাওয়া নয়, সেটা সে পড়াশুনা করে পেয়েছিল। গরিব হলেও বাপ ছিলেন শিক্ষক, বাঙলা লেখাপড়া কিছু শিখিয়েছিলেন। বাপ শিশুবোধক থেকে বোধোদয় পর্যন্ত পড়িয়ে আর পড়ান নি, বলেছিলেন কৃত্তিবাসী কাশীদাসী রামায়ণ মহাভারত পড়ো। কিন্তু

রামায়ণ মহাভারত পড়েও সে ক্ষান্ত হল না। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত নিজেই পড়লে। ওগুলি বাড়িতেই তাদের ছিল। খাতায় লেখা পূর্বপুরুষের সম্পদ। এর পর বঙ্কিমচন্দ্র পেলে হাতে। প্রতাপ-শৈবলিনী, জগৎসিংহ-আয়েষার সঙ্গে পরিচয় হতেই ষোলো আনা আঠারো আনায় ফেঁপে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র তার হাতে এনে দিয়েছিল তারই বড় ভাই।

জীবন ওখানে সহপাঠী পেলে মঞ্জরীর বড় ভাই বঙ্কিমকে। বোর্ডিংয়ে জীবন নাম-ডাক ছুটিয়েছিল; খরচ করত দরাজ হাতে। ওই যে বাপ জমিদারি কিনেছিলেন—তারই হাঁকটা জীবন ওখানে নানাপ্রকারে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে ভালো তামাকের গন্ধটা ছিল একটি বিশেষ প্রকার। ঐ গন্ধে গন্ধে এলেন চতুরানন। বঙ্কিমের নাম-ডাক ছিল চতুরানন। ছেলেরা বলত বঙ্কিম চার মুখে হুঁকো খায় চার মুখে কথা কয়। ভালো তামাকের গন্ধে এসে বঙ্কিমই আলাপ জমিয়ে তুললে। এবং আলাপের সূত্রে আবিষ্কার করলে যে, জীবন তাদের আত্মীয়। বঙ্কিমের মামা জীবনের নিজের মামীর দেওরের আপন ভায়রার নাতজামাই। এবং একদা টেনে নিয়ে গেল নিজেদের বাসায়। বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—জীবন আমাদের আপনার লোক বাবা। বঙ্কিমের বাবা নবকৃষ্ণ সিং সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেন নি, তবুও তিনি পরিচয় পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই সমাদর করলেন।

—দীনবন্ধু দত্ত মহাশয়ের পৌত্র তুমি? জগদ্বন্ধু দত্ত মহাশয়ের ছেলে? তোমরা তো মহাশয়ের বংশ গো। আয়ুর্বেদ তোমাদের কুলবিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনেছি তোমার বাবা জমিদারি কিনেছেন।

পুলকিত হয়েছিল জীবন। সলজ্জ মুখে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভালোই লেগেছিল এ প্রশংসাবাদ।

নবকৃষ্ণবাবু বলেছিলেন—আমার বাড়িও তো তোমাদের ওই দিকে গো। চাকরি করি—যাওয়া আসা পুজোর সময়—গরমের ছুটিতে বড় যাই না। দেশে তো সম্পত্তি তেমন কিছু নাই; বিঘে পাঁচ-সাত জমি, শরিকে শরিকে বিবাদ। কী করব গিয়ে? নইলে পাঁচ কোশ দূরে বাড়ি, আত্মীয়তাও যা-হোক একটা আছে, আলাপ থাকত। তা ভালো হল আলাপ হল। কিন্তু—।

একটু ভুরু কুঁচকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—কিন্তু তুমি যে ইংরেজী পড়তে এলে?

প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝতে পারে নি জীবন; উত্তরে প্রশ্নের সুরেই বলেছিল—আজ্ঞে?

—তোমাদের তো আয়ুর্বেদই এক রকম কুলগত বিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুলধর্মও বলতে পারি। এর জন্যে তোমার সংস্কৃত পড়া উচিত ছিল গো। ইংরেজী পড়তে এলে কেন? বিদ্যাই শুধু নয়, বাঁধা টাট, বাঁধা ঘর,—সে এক রকম যজমানের মতো। ওই থেকেই তো তোমাদের প্রতিষ্ঠা, মহাশয় উপাধি; জমি পুকুর জমিদারি সব তো ওই থেকে।

জীবন বলেছিল—আমার ইচ্ছে ডাক্তারি পড়ব।

—ডাক্তারি! বাঃ বাঃ। খুব ভালো হবে। সে খুব ভালো হবে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ সিংহ। তারপর তিনি বলেছিলেন—যাও, বাড়ির ভিতরে যাও। বঙ্কিম,

নিয়ে যা তোর মায়ের কাছে। তিনি তো হলেন আসল আত্মীয়। আমরা তো তাঁর টানে-টানে আত্মীয়! যাও।

মঞ্জরী তখন উঠানে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আনি-মানি ঘুরছিল। গাছ-কোমর বেঁধে হাত দুটোকে দুদিকে প্রসারিত করে দিয়ে বনবন করে খাচ্ছিল ঘুরপাক। মুখে সে ছড়া আওড়াচ্ছিল—

"আনি মানি জানি না
পরের ছেলে মানি না
লাগলে পরে নাইক দোষ
মানব না-কো রাগ কি রোষ
সরে যাও—সরে যাও
নইলে এবার ধাক্কা খাও।"

বলেই পাশে ঘুরন্ত ভাইদের কোনো একজনের সঙ্গে খাচ্ছিল ধাক্কা। একজন—সে ভাই-ই হোক বা বোনই হোক পড়ছিল। পড়ে গিয়ে কেউ অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে রাগ-রোষ সত্যই করে না, পড়ে শুয়েই থাকে চোখ বুজে, মনে হয় মাটি দুলছে—আকাশ দুলছে—ঘরগুলোও দুলছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে—অতলের কি পাতালের দিকে সে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। সর্বাঙ্গ কেমন সিরসির করতে থাকে।

বঙ্কিম জীবনকে নিয়ে ঘরে যখন ঢুকল তখন মঞ্জরী পাক খেতে খেতে কাউকে ধাক্কা মারবার উদ্যোগ করছে এবং ঘুরপাকের বেগের মধ্যে ঠিক ঠাওর করতে না পেরে দাদা ভ্রমে জীবনের হৃৎপিণ্ডের উপর মারলে ধাক্কা; এবং নিজেই পড়ে গিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল। জীবন দত্ত থ মেরে দাঁড়িয়ে গেলেন। এদিকে মঞ্জরীর হাসিও স্তব্ধ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। তার ভুল ভেঙেছে। দাদা ভ্রমে অপরিচিত একজনকে ধাক্কা মেরেছে বুঝে বিস্ময়ে ও লজ্জায় চোখ দুটো বড়ো করে ভূমিশয্যা থেকে উঠেই 'ও-মাগো' বলে ছুটে পালিয়ে গেল গৃহাভ্যন্তরে। এবং আবার শুরু করলে খিলখিল হাসি। জীবন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সে আমলে ওই যথেষ্ট।

ঘটনার ওইখানেই শেষ নয়, আরও আছে।

বঙ্কিম পলায়নপরা মঞ্জরীকে উদ্দেশ করে হেসে বলেছিল—মর হতচ্ছাড়ী! তারপর মায়ের সঙ্গে জীবনের পরিচয় করিয়ে দিলে। জীবন তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—না না। তুমি তো সম্পর্কে আমার বড় গো। আমার দাদা তোমার মাসীমার দেওরের ভায়রার নাতজামাই। সে হিসেবে তুমি আমার দাদার কোনো শ্বশুর-টশুর হবে। আমারও তাই তা হলে। বোসো, বোসো। প্রণাম আমিও তোমাকে করব না, তুমিও আমাকে কোরো না।

বঙ্কিম এ সম্পর্ক নির্ণয়ে খুব খুশী হয়েছিল—তা হলে তো তার সঙ্গে সম্পর্ক আর এক পর্ব তফাত অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষ। নাতি দাদামশায় সম্পর্ক—রসিকতার অবাধ অধিকার।

মা খাবার আনতে উঠে যেতেই বঙ্কিম ভিতরে গিয়ে মঞ্জরীকে ডেকে বলেছিল—আয় না হতচ্ছাড়ী, দাদামশায় দেখবি।

—কে? মঞ্জরীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ চাপা হলেও শুনতে পাচ্ছিল জীবন।

—দাদামশায় রে!

—দূর! ওই আবার দাদামশায় হয়! ও একটা বুনো শুয়োর, মা গো—কী হোঁতকা চেহারা, কালো রঙ!

—ছি! তুই ভারি ধিঙ্গী হচ্ছিস দিন দিন। আমাদের বড় মামা হল ওর মাসীমার দেওরের নিজের নাতজামাই।

—মরণ! সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো-বউয়ের বোনঝি-জামাই!

—না। না। উঠে আয়, আমার বন্ধু। খুব ভালো ঘরের ছেলে।

—ভালো ঘরের ছেলে তো এমন হোঁতকা বুনো শুয়োরের মতো চেহারা কেন?

—কী যা-তা বলছিস? বীরের মতো চেহারা। মুগুর ভাঁজে কি না!

—তাহলে পড়তে না এসে যাত্রার দলে ভীম সাজতে গেল না কেন? আমরা সত্যিকারের ভালো গদাযুদ্ধ দেখতে পেতাম। তুই যা—আমি যাব না।

বঙ্কিম একটু ক্রুদ্ধ হয়েই ফিরে এল।

জীবনও বন্য বরাহের মতো মাথা হেঁট করেই বসে ছিল; খুব প্রীতিপ্রদ নয়, তরুণ বয়সে ও কথায় কারুরই পুলক-সঞ্চার হয় না। সে চলে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে—আজ যাব ভাই, কাজ আছে।

মা ঠিক এই সময়েই জলখাবারের থালা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। থালাখানি নামিয়ে দিয়ে ডাকলেন—মঞ্জী কই? মঞ্জী—জল নিয়ে আয় এক গেলাস। মঞ্জী!

মা-টি বড় রাশভারী লোক। অমান্য সহজে করা যায় না। জীবন ওই কণ্ঠস্বর শুনেই 'না' বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। মঞ্জরীও মিনিট-খানেকের মধ্যেই জলের গেলাস হাতে বেরিয়ে এল।

মা বললেন—প্রণাম কর। দাদার বন্ধুই শুধু নয়, আমাদের আপনার লোক। তোদের দাদামশায় হয়।

মঞ্জরী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

—হাসছিস যে? প্রণাম কর!

—ওইটুকু আবার দাদামশাই হয়?

—হয়। মামা-কাকা বয়সে ছোট হয় না? তুলসীপতার ছোট বড় আছে?

মঞ্জরী এবার প্রণাম করলে। সে আমলে গড় করে প্রণাম করত। এ আমলের মতো হেঁট হয়ে পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকানো প্রণাম নয়। উঠেই আবার হাসতে লাগল।

মা বিরক্ত হয়েই বললেন--হাসছিস কেন ?

—দাদামশাই মিলছে না বলে হাসছি।

—কী ? কী মিলছে না ?

—দাদামশায়ের গালে কাদা কই ? ছড়ায় আছে, ঠাকুরদাদা গালে কাদা—। বলেই মঞ্জরী হাসতে হাসতেই চলে গেল।

এর পর কিশোর জীবন দত্তের অবস্থার কথা বোধ করি না বললেও চলে।

সে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠল। মঞ্জরী! মঞ্জরী! মঞ্জরীকে সে জয় করবেই। কিন্তু অকস্মাৎ পথ রোধ করে দাঁড়াল একজন।

এই হল সেই ছেলে যার সঙ্গে বিবাদ করে জীবনের সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। অভিজাত বংশের উগ্র দাম্ভিক ছেলে ভূপতিকুমার বসু। লোকে ডাকত ভূপী বসু বলে। ভূপী বসু—ওখানকার নামজাদা দুর্দান্ত। মাঝখানে শহরে-বাজারে বেশ গা দুলিয়ে হেলে-দুলে যে মাতঙ্গ-গমন ধরনের চলনটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটা ওখানে অর্থাৎ কাঁদী অঞ্চলে আমদানি করেছিল ভূপী বোস। সে যখন যে পা-খানা ফেলত---তখন তার সর্বাঙ্গটা সেই দিকে লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যেন হেলে যেত। সামনে বা পিছনে যারা থাকত তারা বাধ্য হয়ে দেখত; পাশে যারা চলত—যাদের পাশে তাকাবার অবকাশ থাকত না, তারা এই দোলার ধাক্কা খেয়ে তাকিয়ে সভয়ে সরে যেত; ওরে বাবা ভূপী বসু যাচ্ছে!

ভূপী বসু ছিল গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি। মাথায় রেখেছিল বাবরি চুল; জমিদারের বাড়ির ছেলে। এই ভূপীও ছিল বঙ্কিমের বন্ধু। অনেক আগে থেকেই সে মঞ্জরীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল।

সুতরাং ভূপী বোসের সঙ্গে আরম্ভ হল প্রতিযোগিতা। ব্যাঘ্র-বরাহ-সংবাদরচনা শুরু করলেন কৌতুকপ্রিয় বিধাতা। ভূপী বোস ব্যাঘ্র, জীবন দত্ত বরাহ। এ নাম মঞ্জরী দিয়েছিল।

সাত

তাঁর সহপাঠী, বোর্ডিংয়ে পাশের সিটের ছাত্র, এরা তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছে তখন। দোষ তাদেরও ছিল না, কিশোর জীবনেরও ছিল না।

সহপাঠীরা জানত না যে জীবন বুকে মঞ্জরীর ধাক্কা খেয়েছে এবং ধাক্কা খেয়েও সেইদিকেই ছুটেছে। এবং জীবনও জানত না যে, ভূপী বোস-রূপী ব্যাঘ্রটি মঞ্জরীর প্রত্যাশায় ওত পেতে বসে আছে। সে সময়ে সামান্য একটা কারণে অভিজাত-কুলপ্রদীপ ভূপী বোস মঞ্জরী ও মঞ্জরীর মায়ের উপর রাগ করে ওদিক দিয়ে যাওয়া-আসা বন্ধের ভান করে বসে ছিল। এরই মধ্যে বরাহ প্রবেশ করল।

ভূপী জীবন থেকে বয়সে বেশ ক-বছরের বড়। কিন্তু ফেল করেও জীবনের এক ক্লাস উপরে পড়ে। কাঁদী ইস্কুলের সর্বজনপরিচিত ভূপী। কাঁদী ইস্কুলে সেকালে যারাই পড়েছে তারা ইস্কুলে ভরতি হওয়ার পাঁচদিন বা সাতদিনের মধ্যেই তাকে চিনেছে। প্রথমেই চোখে পড়ত তার হেলে-দুলে চলন। তারপর শুনত তার বিচিত্র বাগ্‌বিন্যাস।

—কোথায় বাড়ি রে ব্যাট্যচ্ছেলে? দরিদ্র অবস্থার পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের প্রতি এইটিই ছিল তার প্রথম প্রশ্ন।

তার চেহারা বেশভূষা এবং বাগ্‌ভঙ্গিতে আগন্তুক দরিদ্র সন্তানেরা শঙ্কিত হত, একালের মতো বিদ্রোহ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কাল ছিল বিরূপ। তারা সসম্ভ্রমেই বলত গ্রামের নাম। তারপরই ভূপী প্রশ্ন করত—অ! কোন্ থানা র‍্যা? কোন্ পরগণা? কত নম্বর লাট?

তারপর বলত—ওইখানেই আমাদের একটা লাট আছে। ৫০৭ কি ৭০৫ একটা নম্বর তাতে সে লাগিয়ে দিত।

জীবন দত্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কিন্তু এই ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে নাই ভূপী; একটু খাতির করে বলেছিল—কোথায় বাড়ি হে ছোকরা? জীবনের বলিষ্ঠ দেহ এবং বেশ ফিটফাট পোশাক দেখেই তাকে র‍্যা এবং ব্যাটা না বলে বলেছিল হে এবং ছোকরা।

প্রথম দিন জীবন ভড়কে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তও হয়েছিল। কিন্তু সে বিরক্তি গোপন করেই বলেছিল—নবগ্রাম।

বলেই সে চলে গিয়েছিল। দন্তী নখী, শৃঙ্গীদের সান্নিধ্য পরিত্যাগই শ্রেয়,—এই বাক্যটি স্মরণ করেছিল এবং ভূপীকে ওই দলেই ফেলেছিল। কিন্তু ভূপী ছাড়ে নাই। সে নিজেই এসেছিল এগিয়ে, দু-চার দিন পরেই একদিন বোর্ডিংয়ে জীবনের ঘরে এসে বলেছিল—শুনলাম নাকি ছোকরা, তুমি তামাক খাও ভালো। কই খাওয়াও দেখি! দেখি কী তামাক তুমি খাও! ভূপীর কণ্ঠস্বর রীতিমতো পৃষ্ঠপোষকের কণ্ঠস্বর।

জীবন দুর্দান্ত ছিল, কিন্তু অভদ্র ছিল না। এবং জমিদারী যত কালের পুরনো হলে জমিদার-বংশে পচ ধরে—তাদের একখানা জমিদারি ততকালেরও পুরনো হয় নি। এবং সত্য বলতে কি, সেদিন একটু গোপন খাতিরও মনে মনে অনুভব করেছিল সে ভূপী বোসের প্রতি। বড় বংশের ছেলে, ভালো চেহারা, এমন বোলচাল, তার উপর জীবন বিদেশী, ভূপী এখানকারই লোক, সুতরাং ওটা স্বাভাবিক ছিল। জীবন সেদিন তামাকও খাইয়েছিল। সেদিন যাবার সময় ভূপীর হঠাৎ নজর পড়েছিল জীবনের মুগুর দুটোর উপর। একটু নেড়েচেড়ে দেখেও গিয়েছিল। হেসে নামও দিয়ে গিয়েছিল—মুদ্গর সিংহ।

ঝগড়াটা লাগল হঠাৎ।

ভূপী বোস নবকৃষ্ণ সিংহের বাড়ি থেকে বের হচ্ছে, জীবন ঢুকছে। ভূপী পান চিবুচ্ছিল, সঙ্গে বঙ্কিম, পিছনে বঙ্কিমের মা। জীবনের অনুপস্থিতিতে গরমের ছুটির মধ্যে ভূপীর সঙ্গে ওদের ঝগড়া মিটে গেছে।

জীবনের সঙ্গে একজন মুটে। তার দেশের লোক ; গরমের ছুটির পর দেশ থেকে ফিরেছে ইস্কুলে, আসবার সময় মস্ত ঝাঁকায় বাগানের আম, খেতের ফুটি, কিছু তরকারি এবং খড় দিয়ে মুড়ে একটা মাছও এনেছে।

ভূপী থমকে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হেসে বললে, কী রকম? মুদ্গর সিংহ এখানে? এ বাড়িতে?

পিছন থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কথা ভেসে এল—উনি আমাদের সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোন-পো বউয়ের বোনঝি-জামাই, আপনার লোক, সম্পর্কে আমার দাদামশাই! কী এনেছ গা দাদামশাই?

সকলের পিছন থেকে মঞ্জরী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে সামনে এসে দাঁড়াল।

ভূপীও সঙ্গে সঙ্গে ফিরল। বললে—চল—চল—দেখে যাই দাদামশাই মুদ্গর সিংহ কী এনেছেন? নামা ঝুড়িটা।

জিনিসপত্রগুলি দেখে মুখ বেঁকিয়ে একটা আম তুলে নিয়ে দাঁতে কেটে একটু রসাস্বাদ করেই থু-থু করে ফেলে দিয়ে বললে—আমড়া! আমি ভেবেছিলাম আম! কাল আমি আম পাঠিয়ে দেব! গোলাপখাস, আর কি বলে, কিষণ-ভোগ। আমের গায়ে কাগজের টিকিটে লেখা থাকবে—কবে কখন খেতে হবে। ঠিক সেই সময়ে খাবেন কিন্তু। না হলে ঠিক স্বাদ বুঝবেন না।

ভূপী চলে গেল। মঞ্জরীর মা বললেন—এসো বাবা। ভালো তো সব?

হ্যাঁ ভালো। আমি কিন্তু চলি এখন। এই তো আসছি। বোর্ডিংয়ের বারান্দায় জিনিসপত্র পড়ে আছে। গাড়োয়ানকে রেখে এগুলি দিতে এসেছিলাম আমি। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, ভূপীর কথাগুলিতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

—একটু জল খেয়ে যাবে না?

—না। গাড়োয়ানটা অজ গাড়াগেঁয়ে। ভয় পাবে, আমি যাই।

কিশোর জীবন দত্ত সেদিনই ভূপীর আঁচটা অনুভব করেছিল। এবং সেই হেতুই সেদিন তার সহপাঠী বোর্ডিংয়ের পাশের সিটের বন্ধুটিকে সব কথা বলেছিল বাধ্য হয়ে। না বলে উপায়ও ছিল না। এত বড় মাছটা এবং এতগুলি আম ও ফুটির উপর ছেলেদের লোভ হয়েছিল দুর্দান্ত। কোথায় কোন্ বাড়িতে এগুলি গেল জানতে তাদেরও কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কাজেই প্রশ্নেরও বিরাম ছিল না। অবশেষে বলতে হল নাম।

বন্ধুরা শুনে শিউরে উঠল।—ওরে বাবা, গেছিস কোথায় তুই? বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বাঁধতে গেছিস! ও যে ভূপী বোসের মঞ্জরী।

—ভূপী বোসের মঞ্জরী?

—হ্যাঁ বাবা। ওদিকে হাত বাড়িয়ো না মানিক। হাত কেটে নেবে।

জীবন দত্ত কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে প্রশ্ন করেছিল—কথা পাকা হয়েছে কিনা জান?

—না। তবে—

—ব্যস। তবে দেখা যাক মঞ্জরী কার। মঞ্জরী তো এখনও বাপরূপী গাছে ফুটে আছে রে। যার মুরদ থাকবে সেই পেড়ে মালা গেঁথে গলায় পরবে। আমিও জীবন দত্ত।

গাড়োয়ানের হাতেই সে মাকে একখানি গোপন পত্র পাঠালে—'অবিলম্বে পঞ্চাশটি টাকা চাই।' সেদিনের পঞ্চাশ টাকা আজ উনিশ শো পঞ্চাশ সালে অন্তত দু-হাজার টাকা।

লাগল সংঘর্ষ।

প্রথমটা ভূপী বোস গ্রাহ্যই করে নাই। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওই বরাহটা! বঙ্কিম অথবা মঞ্জরী দুজনের মধ্যে একজনের কাছে নিশ্চয় সেই প্রথম দিনের বরাহ-সম্বোধন-বৃত্তান্তটা শুনেছিল এবং মনে মনে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড কৌতুক ও পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করেছিল। মঞ্জরী জীবন দত্তকে দেখে বুনো শুয়োর বলেছিল বলে ভূপীও তার নামকরণ করেছিল বরাহ। আরো বলত মুদ্গর সিংহ। ওই সব নামে সে তাকে অভিহিত করত। অবশ্য আড়ালে। আর আমড়ার-স্বাদবিশিষ্ট আমের টুকরি বা কতকগুলো ফুটি কি একটা মাছকে সে মূল্যই দিত না। ওর বদলে কলমের গাছের অল্প গোটাকয়েক ল্যাংড়া কি বোম্বাই কি কিষণভোগ নামবিশিষ্ট আম এবং গণ্ডাকয়েক লিচু কি গোলাপজাম বা জামরুলের মূল্য যে বেশী এটা সে জানত। তার ওপর তার রূপ-গৌরব সম্পর্কে সে ছিল পূর্ণমাত্রায় সচেতন। কাজেই সে গ্রাহ্য করে নাই।

এদিকে জীবন নিজের পেলবরূপের অভাব পূরণ করতে হয়ে উঠল বিলাসী। বাড়িতে তার টাকার চাহিদার অঙ্ক বাড়তে লাগল। জগদ্বন্ধু মশায় বেশ একটু চিন্তিত হলেন। তবুও একমাত্র ছেলের দাবি সহজে অগ্রাহ্য করলেন না। বাপের কাছ ছাড়াও মায়ের কাছ থেকে টাকা আনাত জীবন। পুরো দাবিটা বাবাকে জানাতে সাহস করত না।

তার জন্য জীবন কখনও আক্ষেপ করেন নি। আজও করেন না।

কী আক্ষেপ? যৌবনের স্বপ্ন, নারীপ্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এর চেয়ে মাদকতাময়, এর চেয়ে জীবনের কাম্য কৈশোরে আর কী আছে? শুধু কি কৈশোরে যৌবনে? সমস্ত জীবনে কোনো নারীকে যে সম্পূর্ণভাবে জয় করে জীবন ভরে পেয়েছে তার চেয়ে ভাগ্যবান কে আছে? মঞ্জরীর প্রেমের প্রতিযোগিতায় যদি জমিদারির এক আনা ছ-গণ্ডা দু-কড়া দু-ক্রান্তি বিক্রি হয়েই যেত—তাতেই বা কী হত! তাতেও আক্ষেপ হত না তাঁর।

তাই হয়তো যেত। বাবার কাছে টাকা না পেলে সে ধার করত। তখন তার হালচালে সেখানে রটে গিয়েছিল—জীবন দত্ত ধনী বলে নয়—নামজাদা ধনীর ছেলে! সুতরাং টাকা ধার পেতে সেই আমলে তাকে কষ্ট পেতে হত না। বঙ্কিমদের বাড়িতে নিত্যনূতন মনোহারী উপঢৌকন পাঠাতে লাগল সে।

কাঁদীর বাজারে তখন তার নাম ছুটে গেল 'বাবুজী' বলে। জীবন বাজারের রাস্তায় বের হলে দোকানীরা বলত—কি বাবুজী? কোনদিকে যাবেন?

খাস লালবাগের ছোঁয়াচ-লাগা কাঁদীতে আমীরি আমলের 'জী' শব্দটা তখনও বেঁচে ছিল। কোম্পানির আমলের বাবু শব্দের সঙ্গে ওটিকে লাগিয়ে বাবুজীই ছিল ওখানকার সম্মানের আহ্বান।

জীবন বাবুজী হাসত।

ওসমান শেখ ওখানকার সব থেকে বড় মনোহারী দোকানের মালিক, তার সঙ্গে ব্যাপারটা আরও অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। জীবন ওসমানকে বলত—চাচাজান। ওসমান বলত—বাপজান। ওসমান শেখের মস্ত দোকান, দু-তিনটে শাখা। মনোহারী, জুতো, তামাক। বাকি খাতার পাতায় সসম্রমে জীবন বাপজানের নামপত্তন করে নিয়েছিল ওসমান চাচা। চাচা মানুষ চিনত। জীবনের প্রয়োজন না থাকলেও চাচা তাকে ডেকে বলত—বাপজান! আরে, শুনো শুনো!

—কী চাচাজান?

—আরে বাপজান—আজ চার-পাঁচ রোজ তুমাকে ঢুঁড়ছি। নতুন 'খোশবয়' এনেছি। শহরে (অর্থাৎ মুরশিদাবাদ) গেলাম, মহাজন দেখালে—দেখো ওসমান, 'খোশবয়' দেখো। আতর ছোট হয়ে গেল। নিয়ে যাও—রাজবাড়িতে দিবা। রাজবাড়ির জন্যে নিলাম, আর তিন জমিদারবাড়ির জন্যে নিলাম, হাকিমদের জন্যে নিলাম। পরেতে বললাম—আর দু-শিশি! তুমার তো দু-শিশি চাই আমি জানি। নিজের জন্য এক শিশি; আর—।

হেসে চাচা বলত—আর ই বাড়ির জন্য এক শিশি! নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে কাগজে মুড়ে তার হাতে তুলে দিত।

—দাম?

—সে হবে। নিয়া যাও তুমি। আর আমি রাখতে পারব নাই। ইয়ার মধ্যে ভূপী চাচা এসেছে দু-দিন। ওই উকিল সাহেবের বাড়িতে দেখেছেন ই খোশবয়। বলে আমার চাই দু-শিশি। দাও। আমি বলি—নাই। সে বলে—জরুর আছে। আমি দোকান তল্লাস করব। তুমি লুকায়ে রেখেছ, জীবনটারে দিবে। অনেক কষ্টে রেখেছি। নিয়া যাও তুমি। দাম সে খাতায় লিখে রাখব। তার তরে তোমার ভাবনা কী?

ওই গন্ধ রুমালে মেখে জীবন ভূপী বোসের সান্নিধ্যে এসে রুমালখানা পকেট থেকে বের করে মুখ মুছতে শুরু করত। ভূপী চকিত হয়ে উঠত। তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাত। জীবন বুঝত এবং হাসত। প্রশ্নটা ভূপীর এই—মঞ্জরীর কাপড়ে এবং এই বরাহটার রুমালে একই মিষ্টি গন্ধ কী করে এল?

ভূপী অবশ্য হটবার ছেলে নয়, ঠিক পরদিনই সেই গন্ধ সে রুমালে মেখে আসত। জীবন ভাবত—ভূপী বোস তো যে-সে নয়, ওসমান চাচার দোকানে না পেয়ে নিশ্চয় মুরশিদাবাদ থেকে আনিয়েছে।

হায়—তখন কি জানতেন যে, মঞ্জরীকে পাঠানো উপঢৌকনটি ভূপীর কাছে এসেছে বিচিত্রভাবে!

থাক সে কথা। ও নিয়ে আক্ষেপ কেন? কোনো কিছু নিয়েই আক্ষেপ জীবন দত্ত আর আজ করেন না। পরিহাস করেন। প্রেম এক প্রকারের সাময়িক উন্মাদ রোগ! সেই রোগে সদ্যযুবক জীবন দত্ত সেদিন আক্রান্ত হয়েছিল।

ভূপী বোসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হার মানবার চরম মুহূর্তটির আগেকার মুহূর্ত পর্যন্ত ভেবেছিল সে জিতেছে। জয় তার অনিবার্য। মনে করেছিল, পরাজয় আশঙ্কায় ভূপীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

ভূপী বোস তখন জীবন দত্তের অর্থব্যয়ের প্রাচুর্য দেখে বেশ খানিকটা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে ছুতো-নাতায় কথা-কাটাকাটি করত। জীবন আমোদ অনুভব করত। সঙ্গে সঙ্গে দু-চার বার ডাম্বল ভাঁজার ভঙ্গিতে হাত ভাঁজত ভূপীর সামনেই। নিত্য মুগুর ভাঁজাটা সে বজায় রেখেছিল। এবং বোর্ডিংয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে রুটি খেত পঁচিশ থেকে তিরিশখানা। ভূপী তার দেহ দেখেও ভয় পেত। জীবন হাসত। জয় তার অনিবার্য। সম্পদের প্রতিযোগিতায় তার জয় হয়েছে, বীর্যের প্রতিযোগিতায় সে শ্রেষ্ঠ; স্বয়ংবরে আর চাই কী?

হায় রে হায়! হায় রে মানুষের দম্ভ! আর বিচিত্র মানুষের মন! বিশেষ করে নারীর মন! ও যে কিসে পাওয়া যায়, এ কেউ বলতে পারে না।

হঠাৎ একদিন জীবন দত্তের ভুল ভেঙে গেল। ভূপী বোসের সঙ্গে হয়ে গেল চরম সংঘর্ষ। এবং সম্পদ ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠতা সত্ত্বেও সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সেদিন দোলের দিন।

বেশ একটি মূল্যবান উপঢৌকনের ডালা সাজিয়ে জীবন দত্ত মঞ্জরীদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখনও মঞ্জরীর সারা অঙ্গের কোথাও এক ফোঁটা আবীরের চিহ্ন ছিল না। জীবনের অভিপ্রায় ছিল সে-ই তার শ্যামল সুন্দর মুখখানিকে প্রথম আবীর দিয়ে রাঙিয়ে দেবে। প্রথমেই দেখা হল মঞ্জরীর মায়ের সঙ্গে। সে উপঢৌকনের ডালাটি তাঁর সামনেই নামিয়ে দিয়ে বললে—মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে আপনাদের কথা শুনেছেন কি না।

মঞ্জরীর মা গম্ভীর মানুষ, জীবন তাঁকে ঠিক বুঝতে পারত না। একটু কেমন ভয় করত। যেন ভালোও লাগত না লোকটিকে।

তিনি মুখে বললেন—না না, এসব ঠিক নয় জীবন। বলে ডালাটি হাতে করে উঠে গেলেন উপরতলায়। নীচে রইল মঞ্জরী। মঞ্জরীর মুখে চোখে নিষ্ঠুর কৌতুক। এ নিষ্ঠুর কৌতুক জীবনের যেন ভালোই লাগত। এবং এই নিষ্ঠুরতার জন্যই তার কৌতুক যেন বেশী মধুর মনে হত, বেশী করে টানত তাকে।

একলা পেয়ে জীবন পকেট থেকে আবীর বের করে বললে—নাতনীকে আজ মাথাব কিন্তু।

মঞ্জরী হেসে বললে—আমিও মাথাব। রঙ গুলে রেখেছি। দাঁড়াও দাঁড়াও। সে ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। বেরিয়ে এল হাত দুটি পিছনে রেখে। জীবনের তখন হুঁশ ছিল না। সে সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জরীর মুখে মাথায় মাখিয়ে দিলে আবীর। এদিকে মঞ্জরীর দুখানি হাত মুখের সামনে উদ্যত হল, দুই হাতে মাখানো আলকাতরা।

জীবন সভয়ে পিছু হটল। সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বাহির দরজার দিকে ছুটল, বন্য বরাহের মতো।

বাহির দরজার মুখেই তখন ব্যাঘ্র। ব্যাঘ্রের পশ্চাতে প্রজাপতি চতুরানন বঙ্কিম।

বন্য বরাহে এবং ব্যাঘ্রে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়ে গেল। দ্রুত ধাবমান সবল দেহে জীবন দত্তের সঙ্গে ধাক্কা লাগল ভূপী বোসের; বঙ্কিম তখন রাস্তার উপর থেকে লাফ দিয়ে উঠেছে মঞ্জরীর দাওয়ায়। জীবন দত্তের ধাক্কা সহ্য করতে পারলে না ভূপী। একেবারে চিত হয়ে উল্টে যাকে বলে সশব্দে-ধরাশায়ী-হওয়া তাই হল ভূপী বোস। জীবন ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আঘাত তাকেও কম লাগে নি, কিন্তু সে সহ্য করবার শক্তি তার ছিল। এবং একটু সামলে নিয়েই সে সত্যসত্য সহানুভূতির সঙ্গে হাত ধরে তুলতে গেল ভূপী বোসকে। ইচ্ছাকৃত না-হোক অনিচ্ছাকৃত হলেও ত্রুটিটা তারই বলে মনে হল তার। শুধু সে তাকে হাত ধরে তুলেই নিরস্ত হল না, ভূপীর শরীরে কোথাও আঘাত লেগেছে কিনা দেখতে চেষ্টা করলে, ধুলো ঝেড়ে দিলে অপরাধীর মতো।

এই অবসরে ভূপী ছিটকে-যাওয়া পায়ের জুতোপাটিটা কুড়িয়ে নিয়ে তার মাথায় মুখে পিঠে আথালি-পাথালি মারতে শুরু করলে। গাল দিলে—শুয়ার কি বাচ্চা! হারামজাদা! উল্লুক!

ব্যস। উন্মত্তের মতো জীবন হুঙ্কার দিয়ে পড়ল ভূপী বোসের উপর। সেদিন নেশাও করেছিল জীবন। সিদ্ধি খেয়েছিল। ভূপীর সঙ্গে যে যুদ্ধ কেমন করে হয়েছিল, সে তার মনে নাই; কিন্তু বুকে বসে ভূপীর নাকে তার প্রকাণ্ড হাতের প্রচণ্ড মুঠির একটা কিল সে মেরেছিল। মারতেই মনে হল নাকটা যেন বসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে দিলে ভূপী বোসের মুখ, রক্তাক্ত হয়ে গেল জীবনের হাত—জামায় কাপড়েও রক্ত লাগল। বঙ্কিম চিৎকার করে উঠল—করলি কী?—আরও একটা আর্ত কণ্ঠ তার কানে এল—মঞ্জরীর কণ্ঠস্বর—ও মা গো! খুনে ডাকাত, খুন করলে মা গো!

চকিতে উন্মত্ত জীবন আত্মস্থ হয়ে গেল।

তাই তো! এ কী করলে সে? ভূপী বোসের জ্ঞান নাই, বুকে চেপে বসে তার স্পর্শ থেকে সে তা বুঝতে পেরেছে। বিপদের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হল। ভূপীর দেশ। দেউলিয়া জমিদার ঘরের ছেলে। ওরা ভয়ঙ্কর। দাঁত-নখ-ভাঙা বাঘই হয় নরখাদক। আর মঞ্জরীর কান্না শুনেও আজ তার স্বপ্ন ভেঙেছে। মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে উঠে ছুটল। ছুটল একেবারে নিজের গ্রামের অভিমুখে। পথ দশ ক্রোশ। কিন্তু সে পথ ধরে ফিরল না, ফিরল অপথে অপথে, ময়ূরাক্ষী নদীর তীর ধরে। বোধ হয় তেরো-চোদ্দ ক্রোশ পথ হেঁটে বাড়ি এসে পৌঁছেছিল। জামা-কাপড় নদীতে কেচে, কাদা মাখিয়ে, রক্তচিহ্নের আভাস গোপন করে বাড়ি এল।

মেডিক্যাল কলেজে পড়ার স্বপ্ন তার শেষ হল।

মঞ্জরীর মোহে পড়ে ঘুচে গেল। মঞ্জরীই দিলে ঘুচিয়ে।

সেদিন জগদ্বন্ধু মশায় ও তাঁর স্ত্রী ছেলের অবস্থা দেখে শিউরে উঠে প্রশ্ন করলেন—কী হয়েছে? এমন করে কেন তুমি ফিরলে? কী হয়েছে?

জীবন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। কোনো উত্তর দিলে না।

জগদ্বন্ধু মশায়ের মতো দৃঢ়চিত্ত প্রকৃতির মানুষের সামনেও সে অটল রইল। মঞ্জরীর নাম

সে কিছুতেই প্রকাশ করবে না। শেষ পর্যন্ত বললে একজন বড়লোকের ছেলে তাকে জুতো মেরেছিল, সে তার শোধ নিয়েছে। আঘাত অবশ্য বেশী হয়েছে, রক্তপাত হয়েছে খানিকটা, সেই জন্যই ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে। ওখানে থাকলে সে হয়তো খুন করবার চেষ্টা করবে। ওখানে সে আর ফিরবে না। সে অন্য জায়গায় পড়বে। সিউড়ি বা বর্ধমান সরকারী হাই ইস্কুলে পড়বে সে।

—না! আর না!

জগদ্বন্ধু মশায় বললেন—আর না। বাইরে পড়তে আর আমি তোমাকে পাঠাব না। আমাদের কৌলিক বিদ্যা শেখো তুমি।

জগদ্বন্ধু মশায়ের কণ্ঠস্বর কঠিন, কিন্তু মৃদু। এ কণ্ঠস্বর শুনে জীবনের সর্বদেহ যেন হিম হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়েছিল, এ সে-ই কণ্ঠস্বর, এ কণ্ঠস্বরে যে কথা বলেন জগদ্বন্ধু মশায় তার আর লঙ্ঘন হয় না। জীবনের মনে পড়ল, একদিন নবগ্রামের বাবুদের বাড়ির এক অনাচারী, ব্যভিচারী প্রৌঢ়ের অসুখে চিকিৎসা হাতে নিয়ে হঠাৎ একদিন ঠিক এই কণ্ঠস্বরে চিকিৎসায় জবাব দিয়েছিলেন। বাবুটি ছিলেন মদ্যপায়ী; জগদ্বন্ধু মশায় তাঁকে মদ্য পান করতে নিষেধ করেছিলেন; কিন্তু তিনি নিষেধ লঙ্ঘন করেছিলেন। জগদ্বন্ধু মশায় ঘরে ঢুকে সেই কথা জানতে পেরেই ফিরে এসেছিলেন। রোগীর আত্মীয়েরা অনুনয় করে তাঁকে ফেরাতে এসেছিল—মশায় এমনি কঠিন মৃদুস্বরে বলেছিলেন—না। ঐ ছোট একটি 'না' শব্দ শুনে জমিদার পক্ষ থমকে গিয়েছিল। এবং সে 'না'-এর আর পরিবর্তন কোনো দিন হয় নাই। আজকের 'না'ও সেই 'না'। এবং এর সঙ্গে জগদ্বন্ধু যে কথাগুলি বললেন তার মধ্যেও কণ্ঠস্বরের সেই মৃদুতা এবং সেই কাঠিন্যই রনরন করছিল।

জীবন দত্ত সচকিত হয়ে মুহূর্তের জন্য বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই মাথা নামিয়েছিল। বুঝতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে নি—এ 'না'-এর আর পরিবর্তন নাই।

জগদ্বন্ধু মশায় পঞ্জিকা খুলে বসলেন, বিদ্যা আরম্ভের দিন করবেন।

আট

শুভকর্মে বিলম্ব করতে নাই এবং কর্মহীন মানুষের মনের মধ্যে মন্দের হাতছানি অহরহ ইশারা জানিয়ে ডাকে। জগদ্বন্ধু মশায় অবিলম্বে ফাল্গুনের শেষেই জীবনের হাতে ব্যাকরণ তুলে দিয়ে পাঠ দিয়েছিলেন। আয়ুর্বেদ—পঞ্চম বেদ। চতুর্বেদের মতোই স্বয়ং প্রজাপতির সৃষ্টি। দেবভাষায় কথিত, দেবভাষায় লিখিত। সুতরাং দেবভাষায় অধিকার লাভ করতে হবে প্রথম। ব্যাকরণ কিন্তু জীবনের খুব ভালো লাগে নাই, নরঃ নরৌ নরাঃ থেকে আগাগোড়া ব্যাকরণ মুখস্থ কি সোজা কথা! তবে ভালো লাগল অন্য দিকটা। সকালবেলা জগদ্বন্ধু মশায় যখন রোগী দেখতে বসতেন তখন ছেলেকে কাছে বসাতেন। তাঁর আয়ুর্বেদ-ভবনের ওষুধ তৈরীর কাজে জীবনকে কিছু কিছু কাজ দিতেন। গাছ-গাছড়া মূল ফুল চেনাতেন। সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছিল

তাঁর নাড়ী-পরীক্ষা বিদ্যা। অদ্ভুত বিস্ময়কর এ বিদ্যা! কবিরাজের ঘরের ছেলে, কিশোর বয়সেই অল্পস্বল্প নাড়ী পরীক্ষা করতে জানতেন। জ্বর হয়েছে কিনা, জ্বর ছেড়েছে কিনা, এগুলি তিনি নাড়ী দেখে বলতে পারতেন। জগদ্বন্ধু মশায় যখন তাঁকে নাড়ী-পরীক্ষার প্রথম পাঠ দিলেন সেদিন ওই পাঠ শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। আজও মনে পড়ছে।

দেবতাকে প্রণাম করে জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন—রোগ নির্ণয়ে সর্বাগ্রে সংগ্রহ করবে বিবরণ, তারপর রোগীর ঘরে ঢুকে গন্ধ অনুভব করবে, তারপর রোগীকে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করবে। তারপর প্রশ্ন করবে রোগীকে—তার কষ্টের কথা। তাই থেকে পাবে উপসর্গ। এরপর প্রত্যক্ষ পরীক্ষার প্রথম এবং প্রধান পরীক্ষা নাড়ী-পরীক্ষা। তারপর জিহ্বাগ্র, মূত্র ইত্যাদি। পাকস্থলী মলস্থলী অনুভব করবে। সর্বাগ্রে নাড়ী।

আদৌ সর্বেষু রোগেষু নাড়ী জিহ্বাগ্রে সম্ভবাম।
পরীক্ষাং কারয়েদ্বৈদ্যং পশ্চাদ্রোগং চিকিৎসয়েৎ॥

অতি সুকঠিন এ পরীক্ষা। বিশেষ করে নাড়ী-পরীক্ষা। রোগ হয়েছে—রোগদুষ্ট নাড়ী—সুস্থ নাড়ী এ অবশ্য বোঝা বিশেষ কঠিন নয়। তুমিও দেখ দেখেছি।

হাসলেন জগদ্বন্ধু মশায়। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু যে বোধে রোগনির্ণয়, তার ভোগকাল নির্ণয়, মৃত্যুরোগাক্রান্ত হলে মৃত্যুকাল-নির্ণয় পর্যন্ত করা যায়, সে অতি-সূক্ষ্ম জ্ঞান-সাপেক্ষ; জ্ঞান নয়, বোধ। তার জন্য সর্বাগ্রে চাই ধ্যানযোগ। আমরা যে চোখ বন্ধ করে নাড়ী দেখি—তার কারণ নাড়ীর গতি অনুভবে ধ্যানযোগে মগ্ন হয়ে গতি নির্ণয় করি। পারি-পার্শ্বিকের কোনো কিছুতে আকৃষ্ট হয়ে আমার মন যেন যোগ থেকে ভ্রষ্ট না হয়। ইন্দ্রিয়ের অগোচর শক্তি এবং রহস্য,—যা নাকি জগতের নিগূঢ় অন্তরে প্রবহমাণ প্রকাশমান—সেই শক্তি, সেই রহস্য যেমন ধ্যানযোগে যোগীর অনুভূতির গোচরীভূত হয়, ঠিক তেমনিভাবেই আয়ুর্বেদজ্ঞ যখন রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করেন, তখন দেহের অভ্যন্তরে চক্ষু-অগোচরে রোগশক্তির ক্রিয়া, তার রূপ আয়ুর্বেদজ্ঞের ধ্যানযোগে যথাযথভাবে গোচরীভূত হয়। বায়ু, পিত্ত, কফ—এই তিনের যেটি বা যেগুলি কুপিত হয়ে দুষ্ট হয়ে রোগীর রক্তধারায় ক্রিয়া করছে, নাড়ীতে তার গতি, তার বেগ কতখানি—সব একেবারে নির্ভুল অঙ্কফলের মতো নির্ণীত হয়। আর—।

জগদ্বন্ধু মশায়ের কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। তিনি বললেন—জ্ঞানযোগে নাড়ীবোধে আর মনঃসংযোগে ধ্যানযোগে যদি অনুভূতিতে সিদ্ধ হতে পার, তবে বুঝতে পারবে রোগের অন্তরালে কেউ আছে বা নেই।

জগদ্বন্ধু মশায় ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে বলেছিলেন—আমার বাবা বলতেন—এক সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছিলেন, তিনি তাঁকে সাপের বিষের ওষুধ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—সর্প-দংশনে বিষক্রিয়ার ওষুধ আছে; কিন্তু যে সাপ কালের আজ্ঞা বহন করে আসে, তার দংশনে মৃত্যুই ধ্রুব; তার ওষুধ হয় না। ঠিক তেমনি, রোগের ওষুধও আছে, চিকিৎসাও আছে, কিন্তু কালকে আশ্রয় করে যে রোগ আসে, তার ওষুধও নাই, চিকিৎসাও নাই। আমরা বৈদ্য, আমরা চিকিৎসাজীবী—আমাদের চিকিৎসা করতেই হয়, কিন্তু ফল হয় না। এই নাড়ীবোধের

যায়। বুঝতে পারা যায়—রোগ তার দেহে নির্দিষ্টকাল ভোগ করেই ক্ষান্ত হবে—অথবা রোগের অন্তে কাল তাকে গ্রহণ করবে।

জীবন মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। শুনতে শুনতে সব যেন তাঁর ওলোটপালোট হয়ে গিয়েছিল। সত্যই ওলোটপালোট।

সেকালে জীবন দত্তের চোখের সামনে ছিল রঙলাল ডাক্তারের প্রতিষ্ঠা—তাঁর গরদের কোট পেণ্টালুন, সোনার চেন,—সাদা ঘোড়া—আরও অনেক কিছু,—অর্থ, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা। যার জন্য ডাক্তারি পড়াই ছিল স্বপ্ন। কিন্তু এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, সেদিন শাস্ত্রতত্ত্ব শুনতে শুনতে এ সব তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। এক অপরূপ জ্ঞানলোকের সিংহদ্বারে তাঁকে তাঁর পিতা—তাঁর গুরু এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ওই দরজা খুলে প্রবেশ করতে পারলে অমৃতের সন্ধান পাবে। তিনি যেন তার আভাসও পেয়েছিলেন।

তাঁর বাবা বলতেন, তিনিও মানেন—কোনো শাস্ত্র জানা আর সে শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ, দুটো আলাদা জিনিস। বলতেন—বাবা, আমাদের শাস্ত্রে বলে, গুরুর কৃপা না হলে জ্ঞান হয় না। শিক্ষা হয়তো হয়। মুখস্থ অবশ্য করতে পার। কিন্তু সে শিক্ষা যখন জ্ঞানে পরিণত হয়, তখন পৃথিবীর রূপ পালটে যায়; চক্ষুর অগোচর প্রত্যক্ষ হয়, স্পর্শের অগোচর অনুভূতিতে ধরা দেয়। নাড়ী-পরীক্ষা-বিদ্যা জ্ঞানে পরিণত হলে তুমি জীবনের মধ্যে মৃত্যুকে অনুভব করতে পারবে।

সে কথা সত্য। জীবন দত্ত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বলতে পারেন—সত্য, এ সত্য, এ সত্য।

এই সুদীর্ঘকালে কত দেখলেন—পৃথিবীর আয়তন জম্বুদ্বীপ থেকে প্রসারিত হয়ে পশ্চিম গোলার্ধ, পূর্ব গোলার্ধ, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত হল, প্রাচীনকালে যাকে সত্য বলে মেনেছে মানুষ, তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল, নতুন সত্যকে গ্রহণ করতে হল, কিন্তু এই সত্য মিথ্যা হয় নি। এ চিরসত্য।

একালে পড়েছেন ডুবুরীর কথা। সমুদ্রে নামে—আধুনিক যন্ত্রপাতি-সংযুক্ত পোশাক পরে মুক্তা আহরণ করে, তারা সেখানে গিয়ে সমুদ্রের তল-দেশের বিচিত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলেও যায় মুক্তা আহরণের কথা। ঠিক তেমনিভাবেই সেদিন জীবন দত্ত সব ভুলে গিয়েছিলেন; প্রতিষ্ঠার কথা, সম্পদের কথা, সম্মানের কথা—সব ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। সেদিন এই প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধু মশায় তাঁকে এক বিচিত্র পুরাণ-কাহিনী শুনিয়েছিলেন। মৃত্যু কে? ব্যাধি কী? মৃত্যুর সঙ্গে ব্যাধির কী সম্পর্ক? সেই সব নিয়ে—সে কাহিনী বিচিত্র।

জগদ্বন্ধু মশায় ভাগবত-কথকের মতো দক্ষ কথক ছিলেন। তাঁর নিপুণ গভীর বাগ্‌বিন্যাসে জীবন দত্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

বলেছিলেন—অবশ্য রোগমাত্রেই মৃত্যু-স্পর্শ বহন করে। মহাভারতে আছে, ভগবান প্রজাপতি মনের আনন্দে সৃষ্টি করে চলেছেন, সৃষ্টির পর সৃষ্টি। বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর। তখন পৃথিবীতে শুধু সৃষ্টিই আছে, লয় বা মৃত্যু নাই। এমন সময় তাঁর কানে এল যেন কার

ক্ষীণ কাতর কণ্ঠস্বর। তিনি উৎকর্ণ হলেন। এবার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল যেন অস্বাচ্ছন্দ্যকর কোনো গন্ধ। এবার সৃষ্টির দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করলেন। দেখে চকিত হয়ে উঠলেন। এ কী? তাঁর সৃষ্টির একটি বৃহৎ অংশ জীর্ণ, মলিন, স্থবির, কর্কশ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর বুক বহু জীবে পরিব্যাপ্ত। স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খল অথচ উচ্ছ্বাসবিহীন—স্তিমিত। বিপুলভারে ক্লিষ্ট পৃথিবী করছেন কাতর আর্তনাদ। আর ওই যে অস্বাচ্ছন্দ্যকর গন্ধ? ও গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে ওই জীর্ণ সৃষ্টির জরাগ্রস্ত দেহ থেকে।

উপায় চিন্তায় নিমগ্ন হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। ললাটে চিন্তার কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। অকস্মাৎ এই চিন্তামগ্নতার মধ্যে তাঁর মুখমণ্ডল অকারণে কুটিল হয়ে উঠল। ভ্রূকুটি জেগে উঠল প্রসন্ন ললাটে। হাস্যস্মিত মুখে অপ্রসন্নতা ফুটে উঠল। প্রসন্ন নীল আকাশে যেন মেঘ উঠে এল দিগন্ত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অঙ্গ থেকে ছায়ার মতো কী যেন বেরিয়ে এল; ক্রমে সে ছায়া কায়া গ্রহণ করল—একটি নারীমূর্তি তাঁর সামনে দাঁড়াল কৃতাঞ্জলি হয়ে। পিঙ্গলকেশা, পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণা; গলদেশে ও মণিবন্ধে পদ্মবীজের ভূষণ, অঙ্গে গৈরিক কাষায়; সেই নারীমূর্তি প্রণাম করে ভগবানকে প্রশ্ন করলেন—পিতা, আমি কে? কী আমার কর্ম? কী হেতু আমাকে আপনি সৃষ্টি করলেন?

ভগবান প্রজাপতি বললেন—তুমি আমার কন্যা। তুমি মৃত্যু। সৃষ্টিতে সংহারকর্মের জন্য তোমার সৃষ্টি হয়েছে। সেই তোমার কর্ম।

চমকে উঠলেন মৃত্যু—অর্থাৎ সেই নারীমূর্তি; আর্তস্বরে বললেন—পিতা হয়ে তুমি এ কী কুটিল কঠিন কর্মে আমাকে নিযুক্ত করছ? এ কি নারীর কর্ম? আমার নারী-হৃদয়—নারী-ধর্ম এ সহ্য করবে কী করে?

ভগবান হেসে বললেন—কী করব? উপায় নাই। সৃষ্টি যখন করেছি, তখন ওই কর্মই করতে হবে।

মৃত্যু বললেন—পারব না।

—পারতে হবে।

মৃত্যু তপস্যা শুরু করলেন। কঠোর তপস্যা করলেন। ভগবান এলেন—বললেন—বর চাও।

মৃত্যু বর চাইলেন—এই কঠিন নিষ্ঠুর কর্ম থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন।

ফিরে গেলেন ভগবান—না।

আবার তপস্যা করলেন মৃত্যু, এবারের তপস্যা পূর্বের তপস্যার চেয়েও কঠোর।

আবার এলেন প্রজাপতি। আবার ওই বর চাইলেন মৃত্যু—এই নিষ্ঠুরতম কর্ম থেকে কন্যাকে অব্যাহতি দিন পিতা।

প্রজাপতি নীরবে ধীরভাবে ঘাড় নাড়লেন, জানালেন—না। সে হয় না।

এবং মুহূর্তে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কন্যারূপিণী মৃত্যু দীর্ঘক্ষণ আকাশমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আবার আসন

গ্রহণ করলেন।

তৃতীয়বার তপস্যামগ্ন হলেন মৃত্যু। এবার যে তপস্যা করলেন, তার চেয়ে কঠোরতর তপস্যা কেউ কখনও করে নি। আবার ভগবান ব্রহ্মাকে আসতে হল। আবার মৃত্যু ওই বর চাইলেন। বর প্রার্থনা করতে গিয়ে এবার তাঁর ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল। চোখ দিয়ে অনর্গল ধারায় জল গড়িয়ে এল। ব্রহ্মা ব্যস্ত হয়ে নিজে অঞ্জলি বদ্ধ করে সেই প্রসারিত অঞ্জলিতে অশ্রুবিন্দুগুলি ধরলেন। বললেন—মা, তোমার চোখের জল এ সৃষ্টিতে পড়বামাত্র এর উত্তাপে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে সেই অশ্রুবিন্দুগুলি হতে এক-একটি কুটিল মূর্তির আবির্ভাব হল। ভগবান বললেন—এরা হল রোগ; এরা তোমারই সৃষ্টি; এরাই তোমার সহচর।

মৃত্যু বললেন—কিন্তু আমি নারী হয়ে পত্নীর পার্শ্ব থেকে পতিকে গ্রহণ করব কী করে? মায়ের বুক থেকে তার বত্রিশনাড়ী-ছেঁড়া সন্তানকে গ্রহণ করব, এই নিষ্ঠুর কর্মের পাপ—

বাধা দিয়ে ভগবান বললেন—সব পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে তুমি। পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। তা ছাড়া তাদের কর্মফল তোমাকে আহ্বান করবে এই রোগেদের মাধ্যমে। অনাচার, অমিতাচার, ব্যভিচারের ফলে রোগাক্রান্ত হবে মানুষ। তুমি তাদের দেবে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, জ্বালা থেকে শান্তি, পুরাতন জন্ম থেকে নব জন্মান্তর।

—কিন্তু—। মৃত্যু আকুল হয়ে বললেন—শোকাতুরা স্ত্রী পুত্র মাতা পিতা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, বুক চাপড়াবে, মাথা কুটবে, সে দৃশ্য আমি দেখব কী করে?

ভগবান বললেন—তুমি অন্ধ হলে, দৃষ্টি তোমার বিলুপ্ত হল। দেখতে তোমাকে হবে না।

মৃত্যু বললেন—তার ক্রন্দন? নারী-কণ্ঠের আর্তবিলাপ কি—

বাধা দিয়ে ভগবান বললেন—তুমি বধির হলে। কোনো ধ্বনি তোমার কানে যাবে না।

জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন—মৃত্যু অন্ধ, মৃত্যু বধির। রোগই তার সন্তানের মতো নিয়ত তার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে নিয়ম—কাল। যার কাল পূর্ণ হয়, তাকে যেতে হয়। অকালমৃত্যুও আছে। নিজের পাপে মানুষ নিজের আয়ুক্ষয় করে কালকে অকালে আহ্বান করে। আমাদের যে পঞ্চম বেদ আয়ুর্বেদ—তার শক্তি হল, কাল যেখানে সহায়ক নয় রোগের, সেখানে রোগকে প্রতিহত করা। রোগ এমন ক্ষেত্রে ফিরে যায়, তার সঙ্গে অন্ধ-বধির মৃত্যুও ফিরে যায়। কিন্তু কাল যেখানে পূর্ণ হয়েছে, সেখানে আক্রমণের বেগে নাড়ীতে যে স্পন্দন-বৈলক্ষণ্য দেখা দেয় তা থেকে বুঝতে পারা যায়, মৃত্যু এখানে কালের পোষকতায় অগ্রসর হচ্ছে। এমন কি কতক্ষণ, কয় প্রহর, কয় দিন, কয় সপ্তাহ, পক্ষ বা মাসে সে গ্রহণ-কর্ম শেষ করবে, তাও বলা যায়—এই নাড়ী পরীক্ষা করে।

এই মুহূর্তটিতে সেদিন ঘরের কোণে একটা টিকটিকি টক টক শব্দে ডেকে উঠেছিল। মাটিতে আঙুলের টোকা দিয়ে জগদ্বন্ধু মশায় টিকটিকিটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন—ওই দেখো।

জীবন প্রথমটা ভেবেছিল—বাবা বলছেন—টিকটিকি তাঁর কথাকে সত্য বলে সমর্থন করছে। কিন্তু না। সেদিকে তাকিয়ে জীবন দেখেছিলেন, ডাক দিয়েই টিকটিকিটা লাফিয়ে ধরেছে একটা ফড়িংকে। ফড়িংটা ঝটপট করছে।

মশায় বলেছিলেন—অনুরূপ অবস্থায়—মানে ধরো যদি কোনো মানুষকে কুমীর ধরেছে কি কোনো দুটো কঠিন জিনিসের মধ্যে চাপা পড়েছে—পিষ্ট হচ্ছে, এমন অবস্থায় তার নাড়ী যদি পরীক্ষা করা যায় তবে নাড়ীর মধ্যে জীবনের আর্তনাদ অনুভব করতে পারবে। একেবারে প্রত্যক্ষ করতে পারবে, মনে হবে চোখে দেখছ।

নাড়ীবিজ্ঞানে নিদান হাঁকার প্রথম অভিজ্ঞতার গল্প বলেছিলেন জগদ্বন্ধু মশায়। বলেছিলেন—গিরিশবাবুর মা,—এই নবগ্রামের গিরিশবাবু, তাঁর মা—বর্ষার সময় বাঁধানো ঘাটের চাতালে পা পিছলে পড়ে গেলেন। পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাবা তখন দেহ রেখেছেন—আমার বয়স তখন কম। গেলাম। নাড়ী দেখে শঙ্কিত হলাম। কিন্তু সঠিক কিছু বুঝতে পারলাম না। দেখলাম, আঘাতের ফলে যেমন নাড়ী স্পন্দনহীন হয়, তাই হয়েছে। সে ক্ষেত্রে নাড়ী অসাধ্য নয়। তবু কেমন যেন সন্দেহ হল। বললাম প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে মৃত্যু হতেও পারে—না হতেও পারে। আপনারা আরও বিচক্ষণ কবিরাজ এনে দেখান। পারুলিয়ার বৃদ্ধ কবিরাজ মশায় এলেন সন্ধ্যায়। তিনি দেখলেন। বললেন —এ অবস্থায় তিনদিন উত্তীর্ণ হলে এ যাত্রা রক্ষা পেলেন। তবে—

আবার নাড়ী দেখলেন, বাহুমূলে কণ্ঠে, নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—রক্ষা পেলেও এক বৎসর মধ্যেই ওঁর দেহান্ত ঘটবে এবং দেহান্তের পূর্বে যেখানে আঘাত পেয়েছেন আজ, সেইখানে তীব্র বেদনা অনুভব করবেন। যেন নূতন করে সেদিন আঘাতটা পেলেন—এমনি মনে হবে।

গিরিশবাবু দ্বিতীয় দিনেই মাকে পালকি করে গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলেন। সকলেই সন্দেহ করলেন—তিনদিনের মধ্যেই দেহান্ত ঘটবে। গঙ্গাতীরে দেহরক্ষায় মায়ের একান্ত বাসনা ছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে চতুর্থদিনের প্রভাতে বৃদ্ধার জ্ঞান হল। ধীরে ধীরে সেরেও উঠলেন। দেহরক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে ফেরার নিয়ম নয়। গঙ্গাতীরেই থাকলেন তিনি। ঠিক বৎসরের শেষে—এক সপ্তাহ আগে, হঠাৎ একদিন তিনি যন্ত্রণা অনুভব করলেন আঘাতের স্থানে। যন্ত্রণা ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। চব্বিশ ঘণ্টা সেই যন্ত্রণা ভোগ করে তিনি অচেতন হয়ে গেলেন। তারপর আর বারো ঘণ্টা পরে ঘটল তাঁর দেহান্ত।

এ আমার প্রত্যক্ষ প্রথম অভিজ্ঞতা। তারপর নিজেই অনেক দেখলাম। তুমিও দেখবে। এ ঠিক বুঝিয়ে দেবার নয়, ব্যাখ্যা করে ফল নাই। উপলব্ধি করবার শক্তি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বাবা। তোমার যদি সে ভাগ্য থাকে, সে শক্তি যদি অর্জন করতে পার, তবে তুমিও বুঝতে পারবে।

নয়

হঠাৎ আজ নিজের নাড়ী ধরলেন জীবন মশায়, কত দেরি ? কত দূরে সে ? দীর্ঘক্ষণ নাড়ী ধরে বসে রইলেন। কই, কিছুই তো অনুভব করতে পারছেন না। কোথায় গেল তাঁর অনুভবশক্তি ? ওই তরুণ ডাক্তারটির আঘাতে তিনি কি অন্তরে অন্তরে অসাড় হয়ে গেলেন ?

—কী, হচ্ছে কী ? নিজের নাড়ী দেখছ ? প্রশ্ন করলেন আতর-বউ।

জীবন ডাক্তার ছেড়ে দিলেন নিজের নাড়ী। আতর-বউ এসেছে। আসবারই কথা। সারাটা জীবন ভাত খাওয়া শেষ করে, লোকজনকে খাইয়ে আতর-বউ পাখা হাতে এসে তাঁর বিছানার পাশে বসে। পান-দোক্তা খায়, বাতাস করে। কর্পূর-দেওয়া জলের গ্লাসটি শিয়রে রেখে দেয়। হাতে সেবা করে, মুখে অনর্গল মর্মচ্ছেদী অথচ মিষ্ট কথা বলে যায়। তাঁকে উদ্দেশ করে বড় বলে না, নিজের কপালকে উদ্দেশ করে। আইনের প্যাঁচে তাকে ধরা যায় না। প্রতিবাদ করলেই আতর-বউ বলে—তোমাকে তো কোনো কথা আমি বলি নি। আমি বলছি আমার কপালকে। তুমি ফোঁস করে উঠছ কেন ?

অনেককাল আগে জীবন ডাক্তার একবার ধৈর্য হারিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমার কপালে যে ভগবান আমাকে বেঁধে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। আঘাত করলে আমাকেই লাগে যে !

আতর-বউ ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যক দৃষ্টিপাত করে নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন—তোমাকে লাগে ?

—হ্যাঁ। বুঝতে পার না ?

আতর-বউ একটা পাথরের খল নিয়ে কপালে ঘা মেরে কপালটা রক্তাক্ত করে তুলে বলেছিলেন—কই ? কই ? কই ?

এরপর থেকে জীবন ডাক্তার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলেই চোখ বুজে পড়ে থাকেন ঘুমের ভান করে। আজ অতীত কথা স্মরণ করতে গিয়ে এমনই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে পায়ের শব্দ শুনতে পান নাই।

আতর-বউ আবার প্রশ্ন করলেন—শরীর খারাপ ?

জীবন দত্ত চেষ্টা করলেন মিথ্যা বলতে। বলতে চাইলেন—'শরীরটা যেন ভালো বোধ হচ্ছে না।' কিন্তু বললেই এই আতর-বউ আর এক আতর-বউ হয়ে যাবে। শিশুর মতো অসহায় করে তুলে সেবা-যত্নে জীবন ডাক্তারকে অভিষিক্ত করে দেবে।

কতবার জীবন দত্তের মনে হয়েছে এই আতর-বউই তার জীবনের ছদ্মবেশিনী মৃত্যু। তাঁর বাবা বলতেন, তিনিও তাঁর সুদীর্ঘ চিকিৎসক জীবনে বুঝেছেন, উপলব্ধি করেছেন, মৃত্যু অবগুণ্ঠনময়ী। দূর থেকে তাকে চেনা যায় না। তাকে দেখে ভয় হয়, কারণ সে আসে জ্বালাযন্ত্রণাময়ী ব্যাধির পশ্চাদনুসরণ করে—কালবৈশাখীর ঝড়ের অনুসারিণী বর্ষণ-ধারার মতো। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ব্যাধির জ্বালায়, যন্ত্রণায় জীবনের উপর তোলে বিক্ষোভ,

মৃত্যু আসে বর্ষাধারার মতো, সকল জ্বালা-যন্ত্রণার বিক্ষোভ জুড়িয়ে দিয়ে, প্রশান্ত স্নিগ্ধ করে দেয়। আতর-বউ ঠিক তাই। দূরে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভয়ঙ্করী, তার অশ্রুরুদ্ধ তপ্ত কথাগুলি ব্যাধির জ্বালার মতোই যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু—।

না। আতর-বউ তাঁর জীবনে ব্যাধি, শুধুই ব্যাধি। মৃত্যু হল সেই মঞ্জরী। জীবনে তো আয়ু থাকতে কেউ মৃত্যুকে পায় না। তাই জীবন দত্ত মঞ্জরীকে পান নি। মধ্যে মধ্যে মৃত্যু ছলনা করে যায় মানুষকে, আসতে আসতে ফিরে যায়, ধরা দিতে দিতে দেয় না। রেখে যায় আঘাতের চিহ্ন; অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ব্যাধি রেখে যায়। মঞ্জরীও তাই করেছে। ছলনা করে চলে গেছে, রেখে গেছে ব্যাধিরূপিণী আতর-বউকে।

নীরবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জীবন ডাক্তার। আতর-বউয়ের প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। আতর-বউ কিন্তু এ নীরবতায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সরস মনে থাকলে জীবন ডাক্তার বলেন—আতর-বউ রাগলে টেম্পারেচার ওঠে ম্যালেরিয়ার জ্বরের মতো। দেখতে দেখতে একশো পাঁচ।

আতর-বউ তাঁর জীবনে ম্যালেরিয়াই বটে; পোষাই আছে; এতটুকু অনিয়ম ব্যতিক্রম হলেই প্রকট হয়ে উঠবে। অনিয়ম না হলেও অমাবস্যা পূর্ণিমাতে দেখা দেওয়ার মতো মধ্যে মধ্যে জর্জর জ্বরোত্তাপ ফুটবেই।

আজ কিন্তু শশী হতচ্ছাড়া এসে আতর-বউকে স্বরূপে প্রকট করে দিয়ে গিয়েছে। আতর-বউ শশীকে স্নেহও করেন। অনেকদিন শশী যে এ বাড়িতে কাটিয়েছে; আতর-বউয়ের ফাইফরমাস শুনত, তাঁদের ছেলে মেয়েদের কোলে-পিঠে করত; এ বাড়ি ছেড়েও শশী সম্পর্ক ছাড়ে নাই, মধ্যে মধ্যে আসে। শশীকে ডাক্তার বলেন—ওটা হল ম্যালেরিয়ার পিলে। ওটা কামড়ে উঠলেই ম্যালেরিয়া জাগবেন।

আতর-বউ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, বললেন—বলি হাঁগা, কথা বললেও কি তোমার নিদান বুঝবার পক্ষে ব্যাঘাত হবে?

জীবন ডাক্তার এবার সোজাসুজি বললেন—শশী তোমাকে কী বলে গিয়েছে বলো তো?

—শশী? শশী কী বলে যাবে? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো! সব তাতেই শশী। কার না শুনতে বাকি আছে যে, তুমি কামারবুড়ীর নিদান হেঁকেছ? কে না এ চাকলায় শুনেছে যে, সরকারী ডাক্তার তোমাকে হাতুড়ে বলে প্রকাশ্যে অপমান করেছে! নিদান হাঁকাতে বারণ করেছে! বলেছে দরখাস্ত করবে। মকদ্দমা করবে। শশী বলবার মধ্যে বলেছে—পায়ের হাড় ভেঙেছে—এতে উনি নিদানটা না হাঁকলেই পারতেন। নিদানের রুগী আছে বই কি। সেখানে পাস-করা ডাক্তাররা থৈ পাবে না। এই তো তারই হাতে রুগী রয়েছে—ডাক্তাররা কেউ কিছু করতে পারলে না। তোমাকে ডাকতে এসেছিল শশী। শশীর ওপর দোষ কেন?

বৃদ্ধ জীবন ডাক্তার চুপ করে রইলেন। কী বলবেন? আমল পালটেছে, চিকিৎসা-শাস্ত্র এগিয়ে গিয়েছে। তিনি পিছিয়ে পড়েছেন। নইলে—আগের কালের চিকিৎসা অনুযায়ী

তাঁর নিদান ভুল নয়, বুড়ীর যাওয়ার কথা, নিশ্চয় যাওয়ার কথা এই আঘাতের ফলে। তবে এ কালের সার্জারির উন্নতি, এক্সরে আবিষ্কার এ সব তাঁর অজানা নয়; কিন্তু সে চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য।

তাই সে হিসেব তিনি করেন না। আরও একটা কথা,—বুড়ীর এই সময় যাওয়াটা ছিল সুখের যাওয়া, সমারোহের যাওয়া। স্বেচ্ছায় যাওয়াই উচিত। তাঁর বাবা বলতেন—।

তাঁর বাবার কথাগুলি স্মরণ করবার অবকাশ পেলেন না তিনি। বাইরে থেকে কেউ তাঁকে ডাকলে—ডাক্তারবাবু!

চমকে উঠলেন ডাক্তার। আতর-বউও চকিত হয়ে উঠলেন। এ যে নবগ্রামের কিশোরের গলা। দুজনের মুখই মুহূর্তে প্রসন্ন হয়ে উঠল। কিশোর! কিশোর আসে যেন বর্ষার দুর্যোগরাত্রির অবসান করে প্রসন্ন শরৎপ্রভাতের মতো। বয়সে প্রৌঢ় হয়েও কিশোর চিরদিন কিশোরই থেকে গেল! আজন্ম কুমার কিশোর উনিশশো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত ছিল রাজনৈতিক এবং সমাজসেবক কর্মী। এখন সে সব ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে বেড়ায়, তবে অভ্যাসবশে দু-চারটে পরের উপকার না করে পারে না, না করলে লোকেও ছাড়ে না। কিশোর ছেলেটি ডাক্তারের জীবনের একটা অধ্যায়। তাঁর জীবনে প্রকাণ্ড বড় একটি স্থান অধিকার করে আছে।

—ডাক্তারবাবু! আবার ডাকলে কিশোর।

—সাড়া দাও, আসতে বলো! প্রসন্ন স্বরেই তিরস্কার করলেন আতর-বউ। এবং স্বামীর অপেক্ষা না করেই তিনি নিচে নেমে গেলেন,—ডাকলেন—এসো বাবা এসো।

মোটা খদ্দরের কাপড় এবং হাত-কাটা খাটো পাঞ্জাবির উপর একখানা চাদর—এই হল কিশোরের চিরকালের পোশাক। প্রসন্ন প্রশান্ত সুশ্রী মানুষ। যে পোশাকেই হোক কিশোরকে মানায় বড় সুন্দর। কর্মঠ সবল দেহ, সবল প্রদীপ্ত মন; মানুষটি ঘরে ঢুকলেই ঘরখানি যেন প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

কিশোর এসে মাটির উপরেই বসে পড়ল এবং বিনা ভূমিকাতেই বললে—একবার বেরুতে হবে ডাক্তারবাবু।

আতর-বউ একখানা আসন পেতে দিলেন, বললেন—উঠে বোসো কিশোর। মাটিতে কি বসে!

ডাক্তার হেসে বললেন—মহারাজ অশোক মাটিতে বসে রাজা হয়েছিলেন। কিশোর মাটিতে বসে একদিন রাজা না হোক মিনিস্টার হবে। কেমন কিশোর?

কিশোর হাত জোড় করে বললে—তার চেয়ে এই বয়সে বিয়ে করতে রাজী আছি ডাক্তারবাবু। এমন কি শনির দশায় পড়তেও রাজী আছি। কিন্তু আপনাকে একবার তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।—শেষের কটি কথায় কিশোরের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল—জানিয়ে দিলে সরস পরিহাসের মানসিকতা তার এখন নাই।

—কি ব্যাপার? কোথায় যেতে হবে?

—যেতে হবে আমাদের গ্রামেই। রতনবাবু হেডমাস্টার মশায়ের ছেলে বিপিনের অসুখ—একবার যেতে হবে।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন। বৃদ্ধ রতনবাবু এককালের নামকরা হেডমাস্টার, দুর্লভ দৃঢ় চরিত্রের মানুষ; তাঁর ছেলে বিপিনও বাপের উপযুক্ত সন্তান, সৎপ্রকৃতির মানুষ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। বিপিন কয়েক বৎসর রক্তের চাপের আধিক্যে অসুস্থ রয়েছে। সম্প্রতি অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতায় গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। সেখান থেকে ওষুধপত্র নিয়ে দেশে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিশ্রামই এ রোগের চিকিৎসা। নবগ্রামের ডাক্তার হরেন চাটুজ্জে কলকাতায় গিয়েছিলেন এই উপলক্ষ্যে। সেখানকার বড় ডাক্তারের কাছে চিকিৎসাবিধি বুঝে এসেছে এবং সেইমত চিকিৎসা সে-ই করছে। এখন হঠাৎ কী হল যে, কিশোর তাঁকে ডাকতে এসেছে?

কিশোর বললে—চলুন, পথে চলতে চলতে বলব।

কিশোর বলে যাচ্ছিল রোগের কথা। পথ চলতে চলতে কথা হচ্ছিল।

কলকাতায় বড় ডাক্তার রক্তের চাপ কমাবার জন্য রক্ত মোক্ষণ করেছিল। মূত্রাশয়ে দোষ পাওয়া গেছে। এখন গ্লুকোস ইন্‌জেকশনই হল প্রধান চিকিৎসা। এর সঙ্গে অবশ্যই আরও অনেক ওষুধ আছে। এ ব্যবস্থায় কলকাতায় ভালোই ছিলেন বিপিনবাবু। ভালো থাকতেই দেশে এসেছেন, হরেন ডাক্তার ভরসা দিয়েছিল; বড় ডাক্তারও সম্মতি দিয়েছিলেন। এখন দেশে ফিরে হঠাৎ রোগটি যেন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বিচিত্র এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে—হিক্কা। আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল হিক্কা চলছে সমানভাবে। হাসপাতালের ডাক্তার প্রদ্যোত বোসকেও ডাকা হয়েছিল, কিন্তু তাদের ওষুধে কোনো ফল হয় নাই। তবে একমাত্র ভরসার কথা এই যে, নাড়ীর গতি বা হৃদ্‌যন্ত্রের গতির উপর এখনও কোনো প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয় নাই। কিন্তু দিতে কতক্ষণ? কাল কিশোর হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছিল। তাতেও কোনো ফল হয় নাই। তাই আজ কিশোর জীবনমশায়কে ডাকতে এসেছে।

প্রদ্যোত ডাক্তারের নাম শুনে জীবন ডাক্তার সচেতন হয়ে উঠলেন, বললেন, হাসপাতালের ডাক্তারটি কি এখনও দেখছে? সেও কি থাকবে নাকি? তা ছাড়া হরেন? হরেনের মতামত নেওয়া হয়েছে তো?

কিশোর তাঁর দিকে ফিরে তাকাল, বললে—প্রদ্যোত ডাক্তারের কথা আমি শুনেছি ডাক্তারবাবু। প্রদ্যোত ডাক্তার এমনিতে তো লোক খারাপ নয়, বরং ভালো লোক বলেই আমার ধারণা; হঠাৎ একন অভদ্র—

—ভদ্রতা-অভদ্রতার কথা নয় কিশোর! এ হল সত্য-মিথ্যার কথা। প্রদ্যোত ডাক্তারের যদি এই বিশ্বাসই হয় যে নাড়ী পরীক্ষা করে আমি যে ধরনের চিকিৎসা করি সে ভুল, সে মিথ্যা, তা হলে অবশ্যই তিনি আমাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতে পারেন। সে কথা এখন থাক। এখন আমি যে কথাটা জানতে চাচ্ছি তার উত্তর দাও। জীবন ডাক্তার পথের মধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

কিশোর একটু বিস্মিত হয়েই ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকালে। জীবন ডাক্তার বললেন—তুমি আমাকে খুলে বলো কিশোর। তুমি কি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্মতি নিয়ে আমার কাছে এসেছ? না, নিজেই এসেছ? তোমার তো এ ব্যাধি আছে। টাকাওয়ালা লোকের টাকব্যাধি যেমন শোভন, তোমার পক্ষে এ কর্মটি তেমনি শোভনই বটে। পরের উপকার যারা করে পরের ঘরের বিধি-ব্যবস্থা উলটে দিতে তাদের অধিকারও থাকে।

কিশোর এবার একটু হেসেই বললে—এই শেষ বয়সে আপনি অভিমান করলেন ডাক্তার-বাবু! এবং এতখানি অভিমান?

—তা হয়েছে কিশোর। এবং সে অভিমান ছাড়তে পারব না। তুমি যখন যেখানে ডেকেছ—আমি গিয়েছি। আজ কিন্তু যেতে পারব না তোমার ডাকে।

—একা আমি ডাকি নি ডাক্তারবাবু। রোগীর বাপ আপনাকে আহ্বান জানিয়েছেন, রতনবাবু আপনাকে ডেকেছেন। বলেছেন, জীবন ডাক্তার নাড়ীটা দেখলে আমি নিশ্চিন্ত হই। অন্তত অনিশ্চিত মনের সংঘাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। সে ঠিক বলে দেবে।

অর্থাৎ মৃত্যুর কথা!

জীবন ডাক্তার একটু বিচলিত হলেন। বৃদ্ধ রতন তাঁরই সমবয়সী। মাত্র দু-বছরের ছোট। তাঁর থেকে এক ক্লাস নিচে পড়ত। যে বছর জীবন ডাক্তার কাঁদীর ইস্কুল থেকে ভূপী বোসের নাক ভেঙে দিয়ে পালিয়ে এলেন সেই বছরই রতন এম. ই. পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে ওখানে গিয়ে ভরতি হল। রতন এনট্রান্সেও বৃত্তি পেয়েছিল। চিরকালই ধীর প্রকৃতির মানুষ রতন। রতন এই কথা বলেছে? বলেছে—জীবন নাড়ী দেখলে আমি চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই! যা হবে সে ঠিক বলে দেবে!

বলবে বই কি। জীবন ডাক্তার যে নিজের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর কথা তিন মাস পূর্বে থেকে নাড়ী দেখে জেনেছিলেন—শুধু জেনেই ক্ষান্ত হন নি, ঘোষণা করে জানিয়েছিলেন সে কথা। সুতরাং বলবে বই কি রতন।

* * *

রতনবাবু মৃদুস্বরেই প্রশ্ন করলেন বটে কিন্তু মৃদু হলেও কণ্ঠস্বর কাঁপল না, প্রশ্ন করলেন—কেমন দেখলে বলো? কী দেখলে?

হাত ধুয়ে জীবন ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—হিক্কার জন্যে ভেবো না, ও দু-তিন দিনেই বন্ধ হয়ে যাবে।

অশীতিপর বৃদ্ধ হলেও রতনবাবু খাড়া সোজা মানুষ। এতটুকু ন্যুব্জ হন নি। অবশ্য মাথায় তিনি খাটো এবং দেহেও তিনি ভারী নন? তবুও খানিকটা ঝুঁকে পড়ার কথা, কিন্তু তা তিনি পড়েন নি। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ হলেও স্থির এবং শুষ্ক, সহজে জল তাঁর চোখে আসে না। সেই যৌবনে ত্রিরিশ বৎসর বয়সে পত্নীবিয়োগের পর থেকে স্বপাকে নিরামিষ খেয়ে ছেলেকে মানুষ করেছেন। আদর্শবাদী নীতিপরায়ণ মানুষ রতনবাবু। রতনবাবু ঈষৎ হেসে বললেন—আমার প্রশ্ন তো তা নয়। আমি যা জিজ্ঞাসা করেছি সে তো তুমি বুঝেছ জীবন!

—বুঝেছি। কিন্তু—

—তোমার কাছে তো 'কিন্তু' প্রত্যাশা করি না। তুমি স্পষ্ট বল বলেই তোমার জন্য আমার এত আগ্রহ।

ডাক্তার মাটির দিকে চেয়ে রইলেন।

—জীবন? মৃদুস্বরে ডাকলেন রতনবাবু।

—ভাবছি।

—আমার জন্যে? রতনবাবু বললেন—আমার জন্য ভেবো না। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু—তিনিই তো পরমানন্দ।

চমকে উঠলেন ডাক্তার। তাঁর সমস্ত অতীত কালের স্মৃতি যেন মুহূর্তে আলোড়িত হয়ে উঠল। তাঁর নাড়ী-পরীক্ষা বিদ্যা শিক্ষার গুরু এই কথাটি বলতেন। জীবন আর মৃত্যু? যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু—তিনিই আনন্দস্বরূপ!

বাবা জগৎ মশায় নস্য নিয়েছিলেন এই সময়,—সে-কথা জীবন ডাক্তারের আজও মনে আছে। তার ফলেই হোক আর হৃদয়াবেগের জন্যই হোক তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠেছিল। ভারী গলায় কথাগুলির প্রতিধ্বনিতে জীবন ডাক্তারের বুকের ভিতরটা যেন বর্ষার মেঘের ডাকে পৃথিবীর মতো এক পুলকিত অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন—বাবা, এতে আমাদের দুই তত্ত্বই হয়, ইহলোক পরলোক দুই। পরমানন্দ স্বরূপ যিনি তিনিই আমার মাধব। আমাদের ইষ্টদেবতা।

ধ্যানযোগে সিদ্ধ চিকিৎসক যখন গভীর একাগ্রতায় তন্ময় হয়ে নাড়ী পরীক্ষা করেন—তখন জীবন এবং মৃত্যুর যুদ্ধ আর বিয়োগান্ত বলে মনে হয় না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন লীলা বলে মনে হয়, তখন অনায়াসেই বলা যায় যে সূর্যাস্তের কাল সমাগত। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আনন্দ এক, পৃথক নয়।

রতনবাবু অপেক্ষা করে তাঁরই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন—এবার তিনি তাঁকে ডাকলেন—জীবন!

জীবন ডাক্তার সচেতন হয়ে উঠলেন, রতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একবার যেন কেঁপে উঠলেন, বললেন—তেমন কোনো লক্ষণ আমি আজ পাই নি রতন। তবে—

—কী তবে? বলো! দ্বিধা কোরো না। হাসলেন রতনবাবু; বিষণ্ণ এবং করুণ সে হাসি। এ হাসির সামনে দাঁড়ানো বড় কঠিন। অন্তত মুখ তুলে চোখে চোখ রেখে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। মাথা হেঁট করে বলতে হয়।

জীবন ডাক্তার তাঁকে মিথ্যা বলতে চান নি। তিনি যা সত্য তাই বলতে যাচ্ছিলেন, তাই বোধ করি মাথা হেঁট করলেন না তিনি। বললেন—এ রোগটি হঠাৎ মারাত্মক হয়ে ওঠে; রোগের বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হয় না, এবং বৃদ্ধির হেতুও হিসাবের বাইরে। যে-কোনো একটা আঘাতের ছুতো, দৈহিক হোক মানসিক হোক—হলেই চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

—সে আমি জানি।

—তা হলে আমার বলবার তো কিছু নাই রতন। রোগ এখন ষোলোআনা দাঁড়িয়েছে। তবুও এমন কোনো লক্ষণ আমি পাই নি যাতে বলতে পারি সাধ্যাতীত। দুঃসাধ্য—কিন্তু অসাধ্য আমি বলব না। তবে এ রোগের যা প্রকৃতি তাতে যে-কোনো মুহূর্তে অসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। ভগবানের দয়া, সে দয়া তোমরা পিতাপুত্রে পাবার হকদার।

—হকদার! এ দয়ার উপর কি কারও হক আছে জীবন?

জীবন ডাক্তার এবার চুপ করে রইলেন। এ কথার সত্যই উত্তর নাই।

রতনবাবু বললেন—তুমি তা হলে হিক্কাটা থামিয়ে দাও।

—আমার ওষুধে ডাক্তারদের আপত্তি হবে না তো? অ্যালোপ্যাথি মতে যা ওষুধ—সে বিষয়ে ওঁদের চেয়ে আমি তো অনভিজ্ঞ নই। আমি দেব—আমাদের কৌলিক চিকিৎসাপদ্ধতি অনুযায়ী ওষুধ।

হরেন ডাক্তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—আমাদের ওষুধে আপনার আপত্তি হবে না তো? প্রয়োজন হলে আমরা একটা-দুটো ইনজেকশন দেব, গ্লুকোজ দেব, বিশেষ করে ঘুমের জন্য ইনজেকশন না দিলে ওঁর ঘুম হয় না। তা ছাড়া—প্রেসার বাড়লে—তার জন্যে ওষুধ দিতে হবে। আর একটা কথা—।

থমকে গেল হরেন ডাক্তার। হাজার হলেও হরেন এই গ্রামের ছেলে, জীবন ডাক্তারকে সে শ্রদ্ধা করে, ছেলেবেলায় জীবন ডাক্তারের অনেক ওষুধ সে খেয়েছে। এখনও দু-চারটে রোগীকে বলে—এর জন্যে জীবন মশায়ের কাছে যাও বাপু। আমাদের ওষুধের চেয়ে ওঁর ওষুধে কাজ বেশী হবে।

সেদিন প্রদ্যোত ডাক্তারকে নিদান সম্পর্কে যাই বলে থাক হরেন, জীবন ডাক্তার নাড়ী দেখে রোগ নির্ণয় করলে রক্ত মল মূত্র পরীক্ষা না করেও তাঁর নির্ণয়মত রোগেরই চিকিৎসা করে যেতে পারে। এই কারণেই কথাটা বলতে হরেন ডাক্তার সঙ্কুচিত হল।

—বলো, কী বলছ?

—আপনাকে বলার দরকার নেই, তবুও—। হরেন ক্ষমা প্রার্থনা করে হাসলে। বাকিটা আর বললে না।

জীবন ডাক্তার কিন্তু একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। প্রদ্যোত ডাক্তারের মুখ মনে পড়ে গেল। দুজনেই একালের ছেলে—প্রায় এক সময়ের পাসকরা ডাক্তার। দীর্ঘকালের পরিচয়ের জন্য প্রদ্যোতের মতো কঠিন তিরস্কার করতে না পারলেও উপদেশের ছলে তিরস্কার করতে পারে। অসহিষ্ণুভাবেই জীবন ডাক্তার বললেন—বলার দরকার আছে হরেন, তুমি যা বলছ প্রকাশ করে বলো।

হরেন একটু ভেবে নিয়ে বেশ হিসেব করেই বললে—আমরা লক্ষ্য রেখেছি হার্ট আর কিডনির ওপর। তার জন্যে ওষুধ দিচ্ছি; আফিং-ঘটিত ওষুধে হিক্কা থামতে পারে। কিন্তু হার্টের কথা ভেবে সে সব অষুধ ব্যবহার করি নি। প্রেসক্রিপশন তো আপনি দেখেছেন।

আমার ওষুধে হার্টের কোনো অনিষ্ট হবে না, আফিং-ঘটিত ওষুধ আমি দেব না হরেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

দশ

ডাক্তার হাঁটছিলেন বেশ একটু জোরে জোরে। মনের মধ্যে উত্তাপ যেন ঘুরপাক খাচ্ছে। ওষুধ ঠিক হয়ে গিয়েছে, সে ওষুধ তিনি নিজে তৈরি করে দেবেন। এ দেশেরই সুলভ কয়েকটা জিনিস দিয়ে তৈরী মুষ্টিযোগ। সে কিন্তু ওদের বলবেন না। সংসারে যা সুলভ তার উপর মানুষের আস্থা হয় না। তা ছাড়া এ বলেও দেবেন না। কখনই বলবেন না। এবং এক-দিনে এই হিক্কা থামিয়ে দিয়ে ওদের দেখিয়ে দেবেন, কি বিচিত্র চিকিৎসা এবং ওষুধ তাঁর আছে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। সেতাবকে একবার দেখে গেলে হত। তা হলে কিন্তু ফিরতে হয়, অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটতে হাঁটতে সেতাবের বাড়ির গলিটা ফেলে এসেছেন। থাক—বুড়োর জ্বর আজ নিশ্চয় ছেড়ে গিয়েছে। একলাই বোধ হয় ছকের উপর দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে বসে আছে। কাল সকালে বরং দেখে যাবেন। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে এই ওষুধটা তৈরী করে দিতে হবে।

—জীবনমশায়, না কে গো? ওগো জীবনমশায়! পাশের গলি থেকে মেয়েলী গলায় কে ডাকলে।—শোনো গো! দাঁড়াও!

দাঁড়ালেন জীবনমশায়। গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়া বিধবা। নব-গ্রামের নিশি ঠাকরুণ। বিখ্যাত নিশি ঠাকরুন। গ্রামের এ কালের ছেলেরা আড়ালে আব-ডালে নিশি ঠাকরুনকে বলে—মিসেস শেরিফ অব নবগ্রাম। গ্রামের মধ্যে অসীম প্রতাপ নিশি ঠাকরুনের।

নিশি ঠাকরুন এসেই প্রশ্ন করল—বলি হ্যাঁগো, একে, মানে রতনবাবুর ছেলেকে দেখে এলে? কেমন দেখলে বলো তো?

জীবনমশায় প্রমাদ গনলেন। কণ্ঠস্বর শুনে তিনি নিশি ঠাকরুনকে অনুমান করতে পারেন কি। কিন্তু অনুমান করা উচিত ছিল, কারণ এই গলিতে এমনভাবে আধিপত্য-খাটানো কণ্ঠ-স্বরে আর কে ডাকবে? নিশি ঠাকরুন এই গলিতে নিজের দাওয়ার উপর বসে থাকে এবং যাকে দরকার তাকেই ডেকে তার প্রয়োজনীয় সংবাদটি সংগ্রহ করে।

জীবন ডাক্তার সংক্ষেপে বললেন—অসুখ কঠিন বটে, তবে হাল ছাড়ার মতো নয়। আমি যাই নিশি, ওষুধ দিতে হবে।

—আঃ, তবু যদি মশায়, তোমার ঘোড়া থাকত! দাঁড়াও না।

—ওষুধ দিতে হবে নিশি।

—তা তো বুঝছি। সঙ্গে লোকও দেখেছি। ওরে লোকটা—তুই এগিয়ে চল, ডাক্তার যাচ্ছে! আমার মামাতো ভাইয়ের মেয়েটা বড় ভুগছে। পেটের ব্যামো কিছুতেই সারছে

না। একবার দেখে যাও মশায়। এই সব হালের ডাক্তারদের পাল্লায় পড়ে এককাঁড়ি টাকা খরচ করলাম—কিছুতে কিছু হল না। তা তুমি তো আর এ গাঁ মাড়াও না। একেবারে আমাদিকে ছেড়েছ। বলি—অ—নীহার, শুনছিস ?

—ডাকতে হবে না, চলো দেখেই আসি। ওরে দাঁড়া তুই পাঁচ মিনিট।

বাড়ির মধ্যে ঢুকেই নিশি প্রায় পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললে—ঠিক করে বল দেখি মশায়, রতন মাস্টারের ছেলে বাঁচবে না মরবে ?

অবাক হলেন না জীবনমশায়। নিশি ঠাকরুনের স্বভাবই এই। পৃথিবীর গোপন কথাগুলি ওর জানা চাই। জেনে ক্ষান্ত হবে না, প্রচার করে তবে তৃপ্ত হবে।

গম্ভীর কণ্ঠে জীবনমশায় বললেন, আমি তোমাকে লুকিয়ে কথা বলি নি নিশি। নাড়ীতে কিছু বুঝতে পারি নি।

—না পার নি! তুমি জীবনমশায়, তুমি বুঝতে পার নি, তাই হয় ? লোকে বলে জীবনমশায় রোগীর নাড়ী ধরলে মৃত্যু-রোগে মরণ পায়ের চুটকি বাজিয়ে সাড়া দেয়। লুকোচ্ছ তুমি।

এবার ডাক্তার ভ্রূকুটি করে উঠলেন। নিশি এতে নিরস্ত হল কিন্তু ভয় পেলে না, বললে—আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। ওই হয়েছে। এখন—ওলো ও নীহার! বলি—যাস কোথায় লা ?

—কী পিসী ? নীহার এতক্ষণে উত্তর দিলে ঘরের ভিতর থেকে। একটুখানি দরজা খুলে উঁকি মারলে মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে আচারের গন্ধ পেলেন জীবনমশায়। মেয়েটি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আচার খাচ্ছিল। আমাশয় পেটের অসুখের ওটা একটা উপসর্গ। রোগটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। নইলে অনিষ্টকারক বস্তুতে রুচি কেন ?

মেয়েটি বেরিয়ে এল।

শীর্ণ কঙ্কালসার বাসি অতসী ফুলের মতো দেহবর্ণ একটি কিশোরী। মাথায় সিন্দুর। বয়সে কিশোরী হলেও সন্তানের জননী হয়েছে।

জীবনমশায় চমকে উঠলেন। সর্বাঙ্গে যেন কার ছায়া পড়েছে।

নিশি ঠাকরুন বললে, গর্ভস্থতিকা হয়েছে। দুটি সন্তান। সব ভেসে যাবে মশায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেঁদে ফেললে নিশি।

দুটি সন্তান। কত বয়স ? চোদ্দ ? দুটি সন্তান ? ডাক্তার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

চোখ মুছে মুহূর্তে সহজ হয়ে নিশি বললে—পূর্ণ বারোতে প্রথম সন্তান হয়েছে। নেকটানেকটি বিয়েন—চোদ্দ বছরে কোলেরটি। চাঁদের মতো ছেলে মশায়, কী বলব তোমাকে, চোখ জুড়িয়ে যায়।

চাঁদ নয় যম। মাকে খেতে এসেছে। বাপের মূর্তিমান অসংযম। সমস্ত অন্তরটা তিক্ত হয়ে উঠেছিল জীবন ডাক্তারের। এই সব অনাচারীর সাজা হয় না ? পরক্ষণেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। বাবা বলতেন—রোগী যখন দেখবে বাবা, তখন কোনো কারণে তার

উপর ক্রোধ বা ঘৃণা কোরো না, করতে নাই। তিনি বলতেন, মানুষের হাত কি বাবা? মানুষ তো ক্রীড়নক।

তাঁর অ্যালোপ্যাথিক শাস্ত্রের গুরু রঙলাল ডাক্তার বলতেন—মানুষ বড় অসহায়। তার অন্তরে পশুর কাম, ক্রোধ, লোভ; অথচ পশুর দেহের সহনশক্তি তার নাই! ওদের ওপর রাগ কোরো না! করতে পার, অধিকার অবশ্যই তোমার আছে। কিন্তু তা হলে চিকিৎসক-বৃত্তি নিতে পার না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললেন—এতদিন কী করছিলে নিশি?

—এই এটা-সেটা। তা ছাড়া সূতিকা তো হয় মশায়, এমন হবে কী করে জানব বলো? তারপরে এই দিন কতক হালের ডাক্তারদের দেখালাম, ওরা আবার নানান কথা বলে। এই লম্বা খরচের ফর্দ। সে আমি কোথায় পাব?

—হুঁ। বলেই থেমে গেলেন ডাক্তার।

নিশির কথা তখনও ফুরোয় নি—বাঈয়ের কবচ, দেবতার ওষুধ, অনেক করেছি।

তা বুঝতে পেরেছেন ডাক্তার। গলায় এক বোঝা মাদুলি। হাতে ন্যাকড়ায় বাঁধা জড়ি-পুষ্প। কিন্তু কী করবেন? ডাক্তারই বা কী করবেন? আছে একমাত্র ওষুধ। কবিরাজী—সূচিকাভরণ।

—পারবে? জল বারণ। খাওয়াতে পারবে নিশি?

—জল বারণ? নিশিও চমকে উঠল। কী বলছ মশায়?

—হ্যাঁ! জল বারণ। দেখি আর-একবার হাতখানি খুকী!

মরণ-রোগক্লিষ্টা খুকী—মুখে কাপড় দিয়ে হাসে। দুই সন্তানের জননী সে—সে নাকি খুকী? ডাক্তারও হাসেন। সঙ্গে সঙ্গে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। একমাত্র উপায় বিষ। বিষম রোগের বিষজ ঔষধ! নাড়ীতে পদধ্বনি শুনছেন তিনি।

নিশি মিথ্যা বলে নি। মরণের পায়ে এদেশের মেয়েদের চুটকি থাকলে তার ঝুমঝুম বাজনাও শুনতে পেতেন ডাক্তার। লোকে বলত, কেমন বাপ, কেমন শিক্ষা দেখতে হবে! বাপ ছিলেন গুরু, তিনি ছিলেন এই নাড়ী-পরীক্ষা বিদ্যায় প্রায় সিদ্ধপুরুষ। দীক্ষার দিন ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভের পর যেদিন হাতে-কলমে নাড়ী-পরীক্ষা বিদ্যায় শিক্ষা দিয়েছিলেন—সে দিনটিও ছিল অতি শুভ দিন। বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়া।

এই বৃদ্ধ বয়সেও সেদিনের কথাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন কালকের কথা। স্পষ্ট মনে পড়ছে সব। পথ চলতে চলতে মশায় ভাবছিলেন কথাগুলি।

* * *

হিক্কার ওষুধ তৈরী করে ওষুধ খাওয়ার প্রণালী পালনের নিয়ম কাগজে লিখে রতনবাবুর লোকের হাতে দিয়ে জীবনমশায় আয়ুর্বেদ-ভবনের দাওয়ার উপর বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। নিশি ঠাকরুনের কথা কয়টিই আবার মনে পড়ল।

চাকর ইন্দির এসে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল।

ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকালেন। ভাবছিলেন রতনবাবুর ছেলে বিপিনের হিক্কার কথা। বোধ করি কাল ভোর নাগাদ হিক্কার উপশম হবে। কমে আসবেই। কী বলবে প্রদ্যোত ডাক্তার ?

—তামাক খান। আর মা বললেন চায়ের জল ফুটছে।

অর্থাৎ বাড়ির ভিতর যাবার জন্যে আতর-বউ বলে পাঠিয়েছেন। হুঁকোটি হাতে নিয়ে ডাক্তার বললেন—চা বরং তুই নিয়ে আয়। এখন আর উঠতে পারছি না।

—এই খোলাতে বসে থাকবেন ? আকাশে মেঘ ঘুরছে। বৃষ্টি নামবে কখন।

আকাশের দিকে চাইলেন ডাক্তার। শ্রাবণের আকাশে এক স্তর ফিকে মেঘের নিচে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ঘুরছে, এক যাচ্ছে এক আসছে। গতি দেখে ডাক্তারের মনে হল—বৃষ্টি আসবে না। বললেন, বেশ আছি। বৃষ্টি আসবে না।

তবু দাঁড়িয়ে রইল ইন্দির। ডাক্তারের মনে পড়ল, বাজারের খরচ চাইছে ইন্দির।

নিয়ম হল ডাক্তার কল থেকে ফিরে টাকাগুলি আতর-বউয়ের হাতে দিয়ে থাকেন। আজকাল ডাক্তার ব্যবসা প্রায় ছেড়েছেন। এককালে কুড়ি পঁচিশ ত্রিশ টাকা দৈনিক পকেটে নিয়ে ফিরতেন। এখন কোনোদিন চার টাকা কোনোদিন ছয় কোনোদিন বা দু টাকা। এক-একদিন কল আসে না। আবার বেশী দূরের কল যাতে টাকা বেশী তাতে ডাক্তার নিজেই যান না। আজ ডাক্তার আতর-বউকে টাকা দেন নি। পরান শেখের বাড়ি থেকে ফিরে খাওয়াদাওয়ার পরই আতর-বউয়ের সঙ্গে কলহ বেধেছিল। তারপর কিশোর এসে ডেকে নিয়ে গেল রতনবাবুর বাড়ি। ডাক্তার ইতিমধ্যেই জামা খুলে খালি গা করে বসেছিলেন। জামাটা ইন্দিরের হাতে তুলে দিলেন। বললেন—পকেটে টাকা আছে দেখ—

—চার টাকা।

—দিগে আতর-বউকে। আমাকে আর বিরক্ত করিস নে।

—আর দুটো কল্কে সেজে রেখে যাই ?

—যা, তাই যা। তুই বড় বেশী বকিস।

আকাশের দিকে চেয়ে কথা বলছিলেন ডাক্তার। দেখছিলেন আকাশের মেঘ—ইন্দিরের কথার দিকে ছিল কান, মুখে তার জবাবও দিচ্ছিলেন কিন্তু মনের মধ্যে ঘুরছিল বিপিনের হিক্কার কথা, প্রদ্যোতের কথা, নিশির কথা। লোকে বলে জীবনমশাই নাড়ী ধরলে মরণ পায়ের চুটকি বাজিয়ে সাড়া দেয়। কেমন বাপ, কেমন শিক্ষা!

* * *

সেদিন ছিল বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়া। পুত্রের দীক্ষার জন্য এই প্রথম শুভ-দিনটিই নির্বাচন করেছিলেন জগৎমশায়। একান্তে নির্জন ঘরে পুত্রকে কাছে বসিয়ে তিনি যেন তার চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সেদিন। বাড়িতে বলে রেখেছিলেন যেন কেউ তাঁদের না ডাকে, কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

জীবন অল্পস্বল্প নাড়ী দেখতে জানতেন। চিকিৎসকের বাড়ির ছেলে। বাল্যকালে

খেলাচ্ছলে খেলাঘরে বৈদ্য সেজে বসে সঙ্গী সাথীদের হাত দেখতেন, কাদামাটি, ধুলো কাগজে মুড়ে ওষুধ দিতেন। জীবনের মা পর্যন্ত নাড়ী দেখতে জানতেন। সেদিন বাপ তাকে প্রথম পাঠ দিয়ে নাড়ীতত্ত্ব বুঝিয়ে মৃত্যুর কাহিনী বলে আয়ুর্বেদ-ভবনে যে সব রোগীরা এসেছিল তাদের কয়েকজনের নাড়ী নিজে পরীক্ষা করে ছেলেকে বলেছিলেন, দেখো—এর নাড়ী দেখো।

রোগীকে ওষুধের ব্যবস্থা পত্র দিয়ে অন্যদিকে যেদিকে ওষুধ পাওয়ার ব্যবস্থা সেই দিকে পাঠিয়ে দিয়ে জীবনকে রোগীর নাড়ীর বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই ছিল জগৎমশায়ের শিক্ষার ধারা।

আয়ুর্বেদ-ভবনের কাজ শেষ করে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি রোগীকে রোগীর বাড়িতে গিয়ে দেখে বাড়ি ফেরার পথে বলেছিলেন—বাবা, যে চিকিৎসক নাড়ীবিজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করতে পারে তার সঙ্গে মৃত্যুকে সন্ধি করতে হয়। মৃত্যুর যেখানে অধিকার সেখানে মৃত্যু বলে—আমার পথ ছেড়ে দাও। এ আমার অধিকার। আর যেখানে তার অধিকার নাই সেখানে ভুলক্রমে উঁকি মারলে চিকিৎসক বলেন—দেবি, এখনও সময় হয় নাই, এক্ষেত্রে তোমাকে স্ব-স্থানে ফিরতে হবে।

কারণ এমন চিকিৎসকের রোগনির্ণয়েও ভ্রান্তি ঘটে না, ঔষধ নির্বাচনেও ভুল হয় না। মৃত্যু যেমন অমোঘ, পঞ্চম বেদ আয়ুর্বেদের স্রষ্টা ব্রহ্মার সৃষ্টি ভেষজ এবং ওষধির শক্তিও তেমনি অব্যর্থ। যে ব্রহ্মার ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি হল মৃত্যুর, সেই ব্রহ্মারই প্রসন্ন দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি হয়েছে ভেষজের। ব্রহ্মা এই শাস্ত্র দিয়েছিলেন দক্ষপ্রজাপতিকে, দক্ষের কাছ থেকে এই শাস্ত্র পেয়েছিলেন অশ্বিনীকুমারেরা, তাঁদের কাছ থেকে পেলেন ইন্দ্র, ইন্দ্র দিলেন ভরদ্বাজ আর দিবদাস ধন্বন্তরিকে। এইখানে আয়ুর্বেদ দু'ভাগে ভাগ হয়েছে। ধন্বন্তরি শল্য-চিকিৎসার ভাগ পেয়েছিলেন। তারপর পুনর্বসু এবং আত্রেয়। তারপর অগ্নিবেশ। আচার্য অগ্নিবেশ রচনা করেছিলেন অগ্নিবেশ সংহিতা। এই সংহিতা থেকেই চরক সংহিতার সৃষ্টি। পঞ্চনদ প্রদেশের মনীষী চরক এই সংহিতাকে নতুন করে সংস্কার করেছিলেন। চরক হলেন চিরজীবী। কথা বলতে বলতেই পথ চলছিলেন পিতাপুত্রে। চলেছিলেন গ্রামান্তরে। জগৎমশায় সচরাচর গাড়ি-পালকি ব্যবহার করতেন না। বেশী দূর হলে তবে গোরুর গাড়ির এবং তাড়াতাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন হলে তবে ডুলিতে চাপতেন। সেদিন ছেলেকে দেখিয়েছিলেন ঠিক আজকের ওই নিশির ভাইঝির মতো একটি রোগিণী। ঠিক এমনি। কিশোরী মেয়ে, বড় জোর ষোল বছর বয়স— সে আবার দুই সন্তানের পর তৃতীয়বার সন্তানসম্ভবা ছিল।

সেদিন ফিরবার পথে জগৎ মশায় বলেছিলেন—নির্দিষ্ট আয়ুর কথা শাস্ত্রে আছে। কিন্তু কর্মফলে সে আয়ুরও হ্রাসবৃদ্ধি আছে। ব্যভিচার করে মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করে আনে মানুষ। এ সব ক্ষেত্রে তাই—অথচ—।

চুপ করে গিয়েছিলেন জগৎ মশায়, বোধ হয় সংশয় উপস্থিত হয়েছিল নিজের মনে। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, এক-এক সময় শাস্ত্রবাক্য সংশয় জাগে, জীবন! আমাদের শাস্ত্রে বলে—স্বামীর পাপের ভাগ স্ত্রী গ্রহণ করে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কী বলব? এ ক্ষেত্রে স্বামীর

অমিতাচারের ফল ভোগ করছে মেয়েটা, সেই হেতুতেই ওকে যেতে হবে অকালে।

আবার খানিকটা চুপ করে থেকে বলেছিলেন—হয়তো বা প্রাক্তন জন্মান্তরের কর্মফল ওই মেয়েটার—তার ফলেই স্বল্পায়ু হয়েই জন্মেছিল। তাই বা কে বলবে?

সেদিন জীবনমশায়ও ওই কথাতেই বিশ্বাস করেছিলেন। মনে মনে নিজের ভাগ্যবিধাতাকে প্রণাম জানিয়েছিলেন। তাকে পরিত্রাণ করেছেন তিনি। মঞ্জরী স্বাস্থ্যবতী বটে, কিন্তু বয়স তো বারো বৎসর। কে বললে—মঞ্জরীর ঠিক এই পরিণতি হত না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আজ বৃদ্ধ জীবনমশায় আকাশের দিকে চাইলেন আবার। এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। দাড়িতে হাত বুলোলেন। আকাশে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়েছে। গাঢ় লাল হয়ে উঠেছে দিগন্তবিস্তৃত মেঘস্তর। তার নিচে বকের সারি উড়ে চলেছে। হঠাৎ এতক্ষণে চোখে পড়ল সামনে ঢাকা রয়েছে চায়ের বাটি। ইন্দির কখন রেখে গিয়েছে। অতীত কথা স্মরণ করতে গিয়ে চায়ের কথা মনে হয় নি। ইন্দির নিশ্চয় কথা বলেছিল, খেয়াল করে দেবার চেষ্টাও সে নিশ্চয় করেছিল কিন্তু সে তিনি স্মরণ করতেই পারছেন না।

থাক। আজ চা থাক।

অতীত কালের কথার একটা নেশা আছে। বড় মনোরম বর্ণবিন্যাস। চোখে পড়লে আর ফেরানো যায় না। বিশেষ করে যেখানটার কথা মনে পড়ছে এখন সেখানটা যেন ঐ আকাশের রক্তসন্ধ্যার বর্ণচ্ছটার মতোই গাঢ়।

পথে তিনি ভাগ্যবিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এলেন—মঞ্জরীর বন্ধন থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য। আর বাড়ি ফিরেই দেখলেন—।

আবার হাসলেন এবং বার কয়েক দাড়িতে হাত বুলোলেন। হ্যাঁ কর্ম-পাক নিয়ে যিনি চক্র রচনা করেন তিনি যেমন চক্রী তেমনি রসিক।

* * *

সেদিন তৃতীয় প্রহরের শেষে তাঁরা বাড়ি ফিরেছিলেন। মা বসে ছিলেন, তাঁরা ফিরে এলে ভাত চাপিয়ে দেবেন। অবশ্য সে দিক দিয়ে বিশেষ অনিয়ম হয় নি। চিকিৎসকের খাওয়া তৃতীয় প্রহরেই ঘটে।

মুখ-হাত ধুয়ে ভিজে গামছা পিঠে বুলিয়ে জগৎ মশায় বললেন—জীবনকে কুলকর্মে দীক্ষা দিয়ে আজ আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু জীবনের মা তোমার মুখ এমন কেন?

—কেমন?

—যেন খুব চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে! কিছু ভাবছ?

—কী ভাবব? জীবনের মা কথাটা উড়িয়ে দিলেন যেন।

—তা বটে। কী ভাববে! মেয়েদের ভাবনা অলঙ্কারের, মেয়ের বিয়ের, ছেলের বিয়ের। সুতরাং দুটোর একটা ভাবতে পার।

হাসলেন জীবনের মা। উঠে গিয়ে উনানে চড়ানো বকনোর ঢাকা খুলে হাতায় ভাত তুলে টিপে দেখতে বসলেন।

জগৎ মশায়ের মনটা সেদিন প্রসন্ন ছিল—নির্মেঘ শরৎকালের আকাশের মতো। তিনি প্রসন্ন হেসে বললেন—কী, উত্তর দিলে না যে?

পিছন ফিরেই মা উত্তর দিলেন—কী বলব? তুমি অন্তর্যামী। ভাবছি না বললেও বলছ—ভাবছ। তা হলে তুমিই বলে দাও কী ভাবছি!

জীবনের অভিভূত ভাবটা তখনও কাটে নি। তার মাথার মধ্যে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বাপের গম্ভীর মৃদুস্বরের কথাগুলি।

অভিভূত ভাবটা আকস্মিক একটা আঘাতে কেটে গেল। জীবন চমকে উঠল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ছোট রেকাবিতে হরিতকীর টুকরো নামিয়ে দিয়ে জীবনের মা বললেন—তুমি অন্তর্যামীই বটে। তামাসা তোমাকে আমি করি নি। কাঁদী থেকে চিঠি নিয়ে দুপুরে লোক এসেছে। জানি না কী লেখা আছে, তবে কে চিঠি পাঠিয়েছে, তার নাম জেনে আমার ভাবনা হয়েছে। না ভেবে থাকতে পারি নি আমি। নবকৃষ্ণ সিংহ চিঠি লিখেছে—এই দেখো।

চিঠিখানি পড়লেন জগদ্বন্ধু মশায়। চমকিত হয়ে জীবন উদ্বিগ্নচিত্তে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু মুখ দেখে কিছু অনুমান করতে পারলে না। জগদ্বন্ধু মশায় চিঠি শেষ করে স্থির দৃষ্টিতে বৈশাখের উত্তপ্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন।

মনে পড়ছে জীবন ডাক্তারের।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছিল। তৃতীয় প্রহরের শেষ পাদ। পূর্বদুয়ারী ঘরের বারান্দায় বসে ছিলেন : সামনে পশ্চিম-দুয়ারী একতলা রান্নাঘরের চালার উপর দিয়ে, আচার্য ব্রাহ্মণদের বাড়ির উঠানের বকুল গাছের মাথার উপর দিয়ে রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখী আকাশ যেন তপোমগ্ন রুদ্রের অর্ধনিমীলিত তৃতীয় নেত্রের বহ্নির ছটায় ক্লিষ্ট নিথর। দিকে-দিগন্তরে কোথাও ধ্বনি শোনা যায় না। বাতাসও ছিল না সেদিন। মনে হয়েছিল, বোধ হয় সন্ধ্যার দিকে কালবৈশাখীর ঝড় উঠবে। পশ্চিম দিগন্তে আয়োজন হতে আরম্ভ হয়েছে। জীবন ওই আকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিল। তারও বুকে বোধ হয় ঝড় উঠবে মনে হয়েছিল। কী লিখেছে নবকৃষ্ণ সিংহ? মঞ্জরী, হয়তো মঞ্জরীর মা—এরা যে ওই দেউলিয়া অভিজাত ঘরের বর্বর ছেলেটার মোহে মুগ্ধ তাতে তার সন্দেহ নাই। বঙ্কিম মঞ্জরী সম্পর্কে তো নাই-ই, কোনো সন্দেহই নাই। তাকে নিয়ে তারা খেলা করেছে। তাই বা কেন? সে নিজেই মূর্খ বানর তাই তাদের বাড়ি গিয়ে বানর-নৃত্য করেছে—তারা উপভোগ করেছে। বানর-নৃত্য নয়—ভল্লুক-নৃত্য। মঞ্জরী মধ্যে মধ্যে তাকে ভালুকও বলত। ভালুক নাচই সে নেচেছে। ভালুক আর বানরে প্রভেদই বা কী? দুটোই জানোয়ার—দুটোই নির্বোধ! কিন্তু কী লিখেছে নবকৃষ্ণ সিংহ? মিথ্যা কদর্য অভিযোগ! কী করবে জীবন? ভগবান সাক্ষী, কিন্তু ভগবান তো সাক্ষী দিতে আসেন না। তিনি তো বলবেন না—প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা যদি অপরাধ হয় তবে জীবন অপরাধী। নইলে সে কোনো অপরাধ করে নাই। সে মৃত্যুদণ্ড প্রতীক্ষারত আসামীর মতোই অপেক্ষা করে রইল।

মশায় দৃষ্টি নামিয়ে বললেন—জীবনের মা! তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

চিন্তিত মুখেই জীবনের মা প্রতীক্ষা করছিলেন। সাগ্রহে তিনি বললেন—বলো! শোনবার জন্য তো দাঁড়িয়েই আছি।

—জীবনের বিবাহের আয়োজন করো।

—কার সঙ্গে? ওই মেয়ের সঙ্গে? নবকৃষ্ণ সিংহের মেয়ের সঙ্গে?

—হ্যাঁ, দিতেই হবে বিবাহ। নবকৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন—এই ঘটনায় এখানে তাঁর কন্যার দুর্নাম রটেছে চারিদিকে। ওই যে কুৎসিত প্রকৃতির ছেলেটি—সে তাঁর কন্যা মঞ্জরীকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নানারকম মন্তব্য করেছে। বলেছে—ঘটনার দিন সে নাকি জীবনকে আবীর দেবার ছলে মঞ্জরীর অঙ্গে হাত দিতে দেখেছে।

মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—জীবন!

মাকে এমন মূর্তিতে কখনও জীবন দেখে নাই।

মা আবার বললেন—বলো, আমার পায়ে হাত দিয়ে বলো—

জীবন সেদিন যেন নবজন্ম লাভ করেছে—বাপের সাহচর্যের ফলে, তাঁর অন্তরের স্পর্শে। সে উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে বললে—আমি তার কপালে আবীর দিয়েছি। আর কোনো দোষে দোষী নই আমি।

মশায় বললেন—কর কী জীবনের মা? ছি! বিবাহের আয়োজন যখন করতে বলছি, তখন ও-সব কেন? জীবন মনে মনে মেয়েটিকে কামনা করে। এক্ষেত্রে কি শপথ করায়? ছি! বিবাহের আয়োজন করো।

—সে কি? কোষ্ঠী দেখাও। নিজে মেয়ে দেখো। তারপর কথাবার্তা দেনা-পাওনা—

—কিচ্ছু না, এক্ষেত্রে ওসব কিচ্ছু না। ছক এই চিঠির সঙ্গে আছে। ওটা আমি ছিঁড়েই দিচ্ছি, কী জানি যদি বাধার সৃষ্টি করে; আর দেনা-পাওনাই বা কী? কী লিখেছেন তিনি জান? লিখেছেন, "আপনাদের বংশের উপাধিই হইয়াছে মহাশয়। মহাশয়ের বংশ আপনার। আপনি নিজে ও অঞ্চলে বিখ্যাত চিকিৎসক। আপনার পুত্র ডাক্তারি পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এ অবশ্যই আমার বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার বাসনা। কিন্তু যেরূপ ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আপনি প্রত্যাখ্যান করিলে আমার কন্যাকে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে।"

—আর কোনো কথা নয়। আয়োজন করো। বৈশাখে আর এক-দিনে বিবাহ হয় না। না। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেশাচারে নিষিদ্ধ। প্রথম আষাঢ়েই বিবাহ হবে।

এগারো

অতীত কালের কথা মনে করে যতই মনের মধ্যে বিচিত্র রসের সঞ্চার হয়—বৃদ্ধ জীবনমশায় ততই ঘন ঘন দাড়িতে হাত বোলান। সাদা দাড়ি, তামাকের ধোঁয়ায় খানিকটা

অংশে তামাটে রঙ ধরেছে। যত্ন অভাবে করকরে হয়ে উঠেছে। তবুও হাত না বুলিয়ে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে হাসেন, সেকালের তরুণবয়সী নিজেকে পরিহাস করেন এই হাসির মধ্যে। একা নিজেকেই বা কেন— সমস্ত মানুষকেই করেন।

যৌবনে কী একটা আছে; জলের যেমন ঢালের মুখে গতির বেগ তেমনি একটা বেগ; যৌবনের মন যখন কোনো একজনের দিকে ছোটে তখন ওই বেগে ছোটে, তখন শাস্ত্রের কথা, ভালোমন্দ বিবেচনার কথা, সমাজের বাধার কথা, হাজার কথাতেও কিছু হয় না, মন বাগ মানে না। এই সব শাস্ত্রকথাগুলিকে যদি বালির বাঁধের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে মন সেখানে ঢালের টানে ছুটন্ত জলস্রোত। হয় বাঁধ ভাঙে নয় জল শুকায়।

তাই তো আজ হাসছেন জীবনমশায়। সেই দিনই ওই রোগিণী দেখে ফিরবার পথে মঞ্জরীর সঙ্গে বিবাহ-সম্ভাবনা বন্ধ হওয়ায় তরুণ জীবন ভাগ্যবিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। মঞ্জরীর আসল চেহারা দেখতে পেয়ে তার উপর বিতৃষ্ণার সীমাও ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে জগৎ মশায় স্ত্রীকে বললেন—প্রথম আষাঢ়ে বিবাহ হবে, সেই মুহূর্তেই তরুণ জীবন সব ভুলে গিয়েছিল। শুধু ভুলে যাওয়াই নয়, মনে হয়েছিল হাত বাড়িয়ে সে আকাশের চাঁদের প্রায় নাগাল পেয়েছে। যেটুকু ব্যবধান রয়েছে আষাঢ় মাস পর্যন্ত নিশ্চয় সে ততখানি বেড়ে উঠবে।

জীবন দত্তের প্রত্যাশার আনন্দে টলমল মনের পাত্র হতে আনন্দ যেন উথলে উঠে তাঁর চারপাশে পড়েছিল। পৃথিবীর যতটুকু অংশ তাঁর চোখে পড়েছিল সমস্তটুকু আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। সব মধু। মধু বাতা ঋতায়তে!

ওদিকে পত্রবিনিময় চলছিল। জগৎ মশায় পত্র দিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ সিংহকে। কয়েকদিন পরই সে পত্রের উত্তর এল।

নবকৃষ্ণ সিংহ দ্বিতীয় পত্র লিখেছিলেন—"মঞ্জরী আমার লজ্জায় দুঃখে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল। আপনার পত্র আসিবার পর তাহার মুখে হাসি ফুটিয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মাকে বলিয়াছে—আমার শিবপূজা মিথ্যা হয় নাই।

জীবন দত্ত আনন্দে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। মঞ্জরী লজ্জায় দুঃখে শয্যাগ্রহণ করেছিল, জীবনের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধের কথা শুনে সে উঠে এসেছে? মুখে হাসি ফুটেছে? দুঃখের শয্যা ছেড়ে মঞ্জরীর হাসিমুখে উঠে বসার কথা মনে হতে তাঁর চোখের সামনে ফুলে-ফুলে সর্বাঙ্গ-ভরা গুলঞ্চফুলের গাছটার ছবি ভেসে উঠেছিল।

ছুটে গিয়ে সেতাবকে, সুরেন্দ্রকে এবং নেপালকে দেখিয়েছিলেন চিঠিখানা। চিঠিখানা তিনি চুরি করেছিলেন।

নিজের গ্রামের সুরেন্দ্র এবং নবগ্রামের সেতাব ও নেপাল ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুরেন আর নেপাল তখন মদ ধরেছে। সেকালে এ অঞ্চল সম্পর্কে লোকে বলত—মাটিতে মদ খায়। তা খেত। তেরো-চোদ্দ বছর হতেই মদ খেতে শিখত। তান্ত্রিকের দেশ, সবাই তান্ত্রিক—বিশেষ তো ব্রাহ্মণেরা। তারপর দীক্ষা হলে ওটা দাঁড়াত ধর্মসাধনের অঙ্গ। অর্থাৎ প্রকাশ্যেই খাওয়ার অধিকার পেত। খেত না শুধু সেতাব। সেতাবও ব্রাহ্মণ, শাক্ত ঘরের সন্তানও বটে,

কিন্তু ভড়কে যেত। সেতাব সমস্ত জীবনটা পিতলের পাত্রে নারিকেলের জল ঢেলে তাই দিয়ে তান্ত্রিক তর্পণ চালিয়ে এল।

সুরেন গ্রামের ছেলে। ঠাকুরদাস মিশ্রের ছেলে। জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ারী কাজ শিখেছে। চতুর ছেলে। সে বললে—আজ তোকে খাওয়াতে হবে। মদ-মাংস খাব। দে, টাকা ফেল।

নেপাল বাপের আদুরে ছেলে। সব-রেজেস্ট্রী আপিসের কেরানী তার বাবার অনেক রোজগার। নবগ্রামের ছড়ায় ছিল—বিনোদ বুড়ো লম্বা জামায়, পকেট ভরে রেজকি কামায়। বিনোদ মুখুজ্জে সত্যিই রেজকিবোঝাই পকেট দুটো দুই হাতে ধরে বাড়ি আসত। নেপাল লোক ভালো। হাউ হাউ করে বকত, হা-হা করে হাসত, দুম-দুম করে চলত, সাদা দিল-খোলা মানুষ। একবার রাঘবপুরে ব্রাহ্মণভোজনে নেমন্তন্ন খেতে যাবার পথে হঠাৎ নেপালের খেয়াল হল পৈতে নেই গলায়, কোথায় পড়েছে। নেপাল পথে কালী বাউড়ীকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল—কী করি বল তো কেলে? আমাকে একটা পৈতে দিতে পারিস? জীবনের বাড়ি এসে মশায়ের কবিরাজখানায় ঢুকে কামেশ্বর মোদকের বদলে খানিকটা হরিতকী খণ্ডই খেয়ে ফেলত অম্লান বদনে। স্বাদেও বুঝতে পারত না। এবং তাতেই তার নেশাও হত।

নেপাল সেদিন বলেছিল—হাম, হাম খাওয়ায়েঙ্গা। আমি খাওয়াব।

নেপালই সেদিন খাইয়েছিল। তিনি টাকা খরচ হয়েছিল। লুচি মাংস মিষ্টি মদ। গান-বাজনা হয়েছিল রাত্রি দুটো পর্যন্ত। সুরেন তবলা সঙ্গত করেছিল—জীবন আর নেপাল গান গেয়েছিল। সেতাব ছিল শ্রোতা।

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী। পূর্বরাগের পালাটাই শেষ করে ফেলেছিল তিনজনে। সেতাব ঘাড় নেড়েছিল, বাহবা দিয়েছিল।

ভুল হচ্ছে। বৃদ্ধ জীবন দত্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন এতক্ষণে। এতকাল পরে ভুল হয়ে যাচ্ছে। জীবন নিজেই সেদিন গুলঞ্চ চাঁপার ফুলের মালা গেঁথেছিল। একগাছি নয় চার গাছি। চার বন্ধু গলায় পরেছিল।

নেপাল এবং সুরেন সেদি তাকে পায়ে ধ'রে সেধেছিল—একটু খা ভাই। আজ এমন সুখের সংবাদ পেয়েছিস, আজ একটু খেয়ে দেখ! একটু!

জীবন কিন্তু ধর্মভ্রষ্ট হন নি।

বৈষ্ণব-মন্ত্র-উপাসকের বংশ। মহাশয়ের বংশ। তিনি খান নি। তিনি বলেছিলেন—না ভাই। বাবার কথা তো জানিস। মঞ্জরীদের বাড়িও ঠিক আমাদের মতো। তারাও বৈষ্ণব।

ওদিকে বাড়িতে চলছিল মহাসমারোহের আয়োজন। জগদ্বন্ধু মশায়ের একমাত্র সন্তানের বিবাহ। ব্রাহ্মণভোজন, জ্ঞাতিভোজন, নবশাখভোজন, গ্রামের অন্য লোকদের খাওয়াদাওয়া—এমন কি আশেপাশের মুসলমান পল্লীর মিঞা সাহেবদের লুচি মিষ্টি খাওয়ানো, ব্যবস্থার ত্রুটি রাখেন নি জগদ্বন্ধুমশায়। বাজনা, বাজি পোড়ানো, রায়বেঁশে—তার উপর দু'রাত্রি যাত্রা-গান হবে কিনা এ নিয়েও কথা চলেছিল। সুরেন-সেতাব-নেপাল থেকে গ্রামের ঠাকুরদাস

মিশ্রের মতো মাতব্বর পর্যন্ত ধরেছিলেন—সে কি হয়! যাত্রাগান করাতে হবে বৈ কি। না হলে অঙ্গহীন হবে।

মশায় বলছিলেন—আষাঢ় মাসের কথা। বৃষ্টি নামলে সব পণ্ড হবে। শামিয়ানাতে জল আটকাবে না। তাঁর ইচ্ছা ওই খরচে বরং গ্রামের সরকারী কালী-ঘরের মেঝে দাওয়া বাঁধানো হোক, ঘরখানারও সংস্কার হোক।

এই প্রতীক্ষার কাল যত সুখের তত উদ্বেগের। উদ্বেগে দিনকে মনে হয় মাস, মাসকে মনে হয় বৎসর। তবুও কাটল দিন। আষাঢ়ের এগারোই বিবাহ, আষাঢ়স্য প্রথম দিবস এল। আকাশে মেঘ এল। সে মেঘ ভুবন-বিদিত বংশের পুষ্কর মেঘ নয়। অশনিগর্ভ কুটিলমনা কোনো অজ্ঞাতনামা মেঘ। বর্ষণের ফলে বজ্রপাত হয়ে গেল সে মেঘ থেকে।

মঞ্জরী নাই।

বেলা দু'পহরের সময় লোক এল পত্র নিয়ে। পত্রে লেখা ছিল—'গত পরশ্ব রাত্রে আমার কন্যা বিসূচিকা রোগে মারা গিয়াছে।'

এক মুহূর্তে সুখস্বপ্ন একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেকালের তরুণ জীবন দত্ত। সেকালের মানুষের বিবাহিত পত্নীর মৃত্যুতে বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও আর্তনাদ বের হত না মুখ থেকে। এ তো ভাবী পত্নী। জীবন কাঁদে নি। নির্জনে কবিরাজখানার উপরের ঘরে চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ ঠাকুরদাস মিশ্রের উচ্চ চীৎকারে চমকে উঠেছিল।

চীৎকার করছিল ঠাকুরদাস মিশ্র।—আমি ঠাকুরদাস মিশ্রি—আমার চোখে ধুলো দেবে? লোকে ডালে ডালে যায়—আমার আনাগোনা পাতায় পাতায়। মুখ দেখে আমি মতলব বুঝতে পারি, পাটোয়ারিগিরি করে খাই আমি। এদিকের চার দিকে গোলমাল চলছে, ওদিকে বেটা সুট করে উঠে রাস্তায় নামল! আমার সন্দেহ হল। কী ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে হে? বললে—একবার মাঠে যাব। প্রথমটা বুকটা ধড়াস করে উঠল। সেখানে ওলাউঠো হয়েছে—লোকটা সেখান থেকে আসছে, ওর আবার কিছু হয় নি তো? লোকটা হনহন করে চলে গেল। গেল তো, একেবারে যে পথে এসেছে, সেই পথে। কাছের পুকুর জঙ্গল ফেলে চলল। হঠাৎ নজরে পড়ল ছাতাটিও বগলে পুরেছে। তখনই আমার সন্দেহ হল বেটা পালাচ্ছে, আমিও গলি-পথে মাঠের ধারে এসে দাঁড়ালাম। দেখি, মাঠে এসেই ছুটতে শুরু করছে। তখনই আমি বুঝে নিয়েছি। কিন্তু পালাবে কোথা? মাঠে চাষীরা হাল ছেড়ে ঘুরছে, হাঁকলাম—ধর বেটাকে—ধর-ধর। ধর।

সোলেমান, করিম, সাতন—তিনজন বেটাকে ধরলে, বললাম—নিয়ে আয় বেটাকে পাঁজা-কোলা করে। আনতেই সোলেমানের হাতের পাঁচনটা নিয়ে বেটার পিঠে কষে এক বাড়ি। বল বেটা, বল—সত্যি কথা বল। ঠিক বলবি, নইলে কাস্তে দিয়ে জিভ কেটে ফেলব। গলগল করে বলে ফেললে সব।

জগদ্বন্ধু মশায়ের গম্ভীর শান্ত কণ্ঠ বেজে উঠেছিল—ওকে ছেড়ে দাও ঠাকুরদাস, ও

গরিবের কী দোষ? ও কী করবে! ওকে পাঠিয়েছে—ও এসেছে। দূত অবধ্য। ও দূত। নবকৃষ্ণ সিংহের অপকর্মের জবাবদিহি বা প্রায়শ্চিত্ত ও কী করে করবে বলো?

ঠাকুরদাস বললেন—দোষ তোমার। একখানা চিঠিতে তুমি বিয়ে পাকা করলে। নিজে গেলে না, তাকে আসতে লিখলে না।

মশায় তাঁর বাপের কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করলেন,—প্রবঞ্চনা আমি করি নি ঠাকুরদাস, প্রবঞ্চনা করেছে নবকৃষ্ণ। এতে আমার দোষ কোথায় বলো?

জীবন নেমে এসেছিল উপর থেকে।

মঞ্জরীর বিসূচিকায় মৃত্যু মিথ্যা কথা। গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ তার সঙ্গে ভূপী বোসের বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

জীবনের মনে হয়েছিল—দোলের দিন মঞ্জরী হাতে আলকাতরা নিয়ে তার মুখে লেপে দিতে এসেছিল; সেদিন পারে নি, কিন্তু আজ মঞ্জরী সেই আলকাতরা মুখে মাখিয়ে দিয়েছে। যেন মঞ্জরী সেই খিল-খিল হাসি নতুন করে হাসছে দূরান্তরে দাঁড়িয়ে।

ভূপী হেসে বলছে—বুনো শুয়োরটা!

মশায় ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে তাকে বলেছিলেন—ভগবান তোমার উপর সদয়, বাবা জীবন। তোমাকে তিনি আজীবন প্রবঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ওই মেয়ে ঘরে এনে তুমি সুখী হতে না। শুধু প্রবঞ্চনা নয়—আজীবন সে তোমাকে অশান্তির আগুনে দগ্ধ করত। তা ছাড়া যার যে পতি-পত্নী। এ তো তোমার আমার ইচ্ছায় হবে না! লজ্জা পেয়ো না, দুঃখ কোরো না। মনকে শক্ত করো।

শেষের কথা কটা ভালো লাগে নি জীবনের। সে মাথা হেঁট করে সেখান থেকে চলে এসেছিল।

মশায় বলেছিলেন—তোমার সঙ্গে কথা আছে। যেয়ো না কোথাও। সুরেন তুমি যাও, তোমাকেও চাই। পাশের ঘরে অপেক্ষা করো।

পাশের ঘরে বসেই জীবন সমস্ত বৃত্তান্ত পেয়েছিলেন। ঠাকুরদাস মিশ্র আস্তে কথা বলতে জানতেন না, অন্যের কাছে আস্তে উত্তর শুনতেও পছন্দ করতেন না। জগৎ মহাশয়ের অনুরোধে দূতকে তিনি নির্যাতন করেন নাই বটে তবে ধমক দিয়েছিলেন অনেক। প্রশ্নোত্তরের মধ্যে যে কথাগুলি প্রকাশ পেয়েছিল, তা হল এই।

প্রতারণা নবকৃষ্ণ সিংহ ঠিক করেন নি।

করেছে মঞ্জরী, বঙ্কিম, আর ওদের মা।

জীবনের হাতে মুষ্ট্যাঘাত খেয়ে ভূপী বোস অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল; খুন করবে, সে খুন করবে বর্বর উল্লুককে, রোমশ কালো শুয়োরকে। তারপরই তার চোখ পড়েছিল মঞ্জরীদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ গিয়ে পড়ল তাদের উপর। বঙ্কিমকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্জরীর সামনে হাত নেড়ে কুৎসিত মুখভঙ্গি করে বলেছিল—এ তোদের ষড়যন্ত্র। তোদের!

তোদের! ভাই বোন মা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছিলি আমাকে তাড়াতে। টাকার জন্যে ওই শুয়োরটার সঙ্গে, ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে বাধে না! ছি! ছি! ছি! তারপর সাড়ম্বরে পথে চীৎকার করে অপবাদ রটনা করে ফিরেছিল। কিছুদিন থেকেই তার সন্দেহ হয়েছিল মঞ্জরীরা জীবনকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। জীবনের খরচের বাহুল্য দেখে অনুমান করেছিল যে, প্রশ্রয় পেয়েই জীবন এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। সে এর প্রমাণ দিতে পারে। নইলে নাতনী-দাদামশায় সম্পর্ক ধরে যে হাসিখুশি বক্র রসিকতার বাগ্‌যুদ্ধ চলছিল সে এমন সীমা ছাড়াত না। সম্পর্কটা প্রকাশ্য হলে মঞ্জরী তার কাছ থেকে দামী আতর গোপনে উপহার নিত না। আর আলকাতরা মাথাতে যেত না। তাই সেদিন নাক ভেঙে রক্তমাখা মুখেই ওই কথা রটাতে রটাতে বাড়ি ফিরেছিল। এবং তার দলবল জড়ো করে বোর্ডিং থেকে আরম্ভ করে চারপাশ জীবনের খোঁজে প্রায় সমুদ্র মন্থন করে ফেলেছিল। খুন করবে। তাকে না পেয়ে তার মুগুরটা কুড়ুল দিয়ে কেটে চেলা বানিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছিল।

নবকৃষ্ণ সিংহ অথৈ সমুদ্রে পড়েছিলেন। কূল-কিনারা ছিল না। গোটা বাজারে ঐ ছাড়া কথা ছিল না। মা মঞ্জরীকে বলেছিলেন—মর, মর—তুই মর!

মঞ্জরী মরতে পারে নি, কিন্তু শয্যা সত্যই পেতেছিল।

বঙ্কিম আস্ফালন করেছিল—আমিও বঙ্কিম সিংহ, আমি দেখে নোব।

বাপ তার গালে ঠাস করে চড় মেরেছিলেন—হারামজাদা, তুই সব অনর্থের মূল। দুজনকেই তুই ঘরে এনেছিলি।

বঙ্কিম তাতেও দমে নি, সে আরও প্রবল আস্ফালন করে বলেছিল—খুন করবো ওকে আমি।

নবকৃষ্ণ বাঁকা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কাকে? কাকে খুন করবি?

বঙ্কিম এর উত্তর দিতে পারে নি।

ওদিকে নিত্যনতুন রটনা রটাচ্ছিল ভূপী বোস। কঠিন আক্রোশ তার তখন। শেষ পর্যন্ত নবকৃষ্ণ এই পত্র লিখলেন জগদ্বন্ধু মশায়কে এবং পত্রোত্তর পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মঞ্জরীও উঠে বসেছিল। ভূপী বোসের নির্মম নিষ্ঠুর অপবাদ রটনায় লজ্জা তার হয়েছিল বই কি! দুঃখও হয়েছিল, বিছানায় উপুড় পড়ে কেঁদেও ছিল। আঘাত যে নির্মম। কাঁদী শহরের চারিদিকে যে রটে গিয়েছিল এই কাহিনী। জগৎ মশায়ের পত্রে সে সব মুছে গেল। নবকৃষ্ণ মাথা তুললেন, সেই পত্র দেখিয়ে বেড়ালেন সকলকে। জগৎ মশায় লিখেছেন—'মা লক্ষ্মীকে সসম্মানে ঘরে আনিব ইহাতে আর কথা কী আছে।' মঞ্জরীও উঠে বসেছিল। ওদিকে ভূপী বোস গর্জাতে লাগল খাঁচার বাঘের মতো। আর সে কী করতে পারে? তবুও নবকৃষ্ণ সিং সাবধানতা অবলম্বন করে কাঁদী থেকে দেশে চলে এলেন। কাঁদীতে বিবাহ দিতে সাহস করলেন না। গ্রীষ্মের ছুটির কয়েকদিন পরই বিবাহের দিন। স্কুলে ছুটির জন্য দরখাস্ত পাঠালেন। দরখাস্ত নিয়ে গেল বঙ্কিম। সেখানে যে কী করে কী হল কেউ বলতে পারে না, তবে ভূপীর সঙ্গে বঙ্কিমের ছিন্ন প্রীতির সম্পর্ক গাঢ়তর হয়ে উঠল। বঙ্কিমই ফিরে এসে সব

পণ্ড করে দিয়েছে।

লোকটি বললে—ওনারা জানতেন—পাত্র ডাক্তার হবে। কিন্তু জগৎ মশায় চিঠিতে লিখেছিলেন, ছেলে তাঁর ডাক্তারি পড়বে না; কবিরাজি করবে, আমার কাছেই কবিরাজি শিখছে। এই শুনেই মায়ের মুখ বেঁকে গেল, কন্যের মুখে বোঝা নামল।

কিন্তু নবকৃষ্ণ সিংহ সেটা চাপা দিলেন, বললেন—তাতে কী হয়েছে?

মঞ্জরীর মা বলেছিলেন—কোবরেজ? ছি! ছি! একালে কোবরেজের কি মান-সম্মান আছে? পয়সাই বা কোথায়? তুমি বরং লিখে দাও ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে হবে।

ধমক দিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ সিং। বলেছিলেন- তাঁর ছেলেকে তিনি যদি ডাক্তারি না পড়ান? দায়টা আমাদের না তাঁদের?

মঞ্জরী নাকি কেঁদেছিল গোপনে কিন্তু সে কথা মায়ের অগোচর ছিল না। তিনি আবারও বলেছিলেন—না বাপু, একে তো ছেলের ওই দত্যির মতো চেহারা, তার উপর কোবরেজ হলে খালি গায়ে—বড় জোর পিরান চাদর গায়ে—না বাপু—।

নবকৃষ্ণ বলেছিলেন—খবরদার! সাবধান করে দিচ্ছি আমি—এ বিয়ে ভেঙে গেলে তোমার মেয়েকে আইবুড়ো হয়ে থাকতে হবে। ভূপী বোস কালসাপের বাচ্চা—তার বিষে তোমার মেয়ের জীবন নীল হয়ে গিয়েছে। ও দেখে তোমার মেয়েকে নিতে পারে শুধু জগৎ মশায়। কবিরাজ বলে তাকে উপেক্ষা করতে চেয়ো না।

চুপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মঞ্জরীর মা। কিন্তু গজগজ তিনি করেছিলেন।

এই অবস্থায় ভূপীর সঙ্গে আপোস করে বঙ্কিম এল। ফলে আরও দুদিন প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল। তৃতীয় দিন রাত্রে নবকৃষ্ণ ঘুমিয়ে থাকলেন বাড়িতে, বঙ্কিমকে সঙ্গে নিয়ে মা এবং মঞ্জরী গোরুর গাড়ি ভাড়া করে এসে উঠল কাঁদীতে। পরের দিন ২৯শে বিবাহের দিন ছিল পাঁজিতে।

নবকৃষ্ণ সিংহ ছুটে গিয়েছিলেন বিবাহ বন্ধ করতে, কিন্তু কিছু করতে পারেন নি।

তখন মঞ্জরী ভূপতির চাদরে নিজের অঞ্চল আবদ্ধ করে নবকৃষ্ণের বাসাবাড়ি পিছনে রেখে ভূপীদের জীর্ণ পুরানো চকমিলানো দালানে গিয়ে উঠেছে।

মঞ্জরীর মা ভূপতির বামপার্শ্বে মঞ্জরীকে দেখে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করে বলেছেন—দেখো তো, কী মানিয়েছে—এ যেন মদন-মঞ্জরী!

ভূপতিদের বাড়িতে ওখানকার অভিজাতবংশীয়াদের সঙ্গে কুটুম্বিনীর দাবিতে রহস্যালাপ করে এসেছেন। একসঙ্গে দোতলার ঘরে বসে খেয়ে এসেছেন।

ঠাকুরদাস বলেছিলেন—চিটিং কেস করো তুমি, করতেই হবে।

জগদ্বন্ধু বলেছিলেন—তার আগে ভালো পাত্রীর সন্ধান করো। ওই এগারোই তারিখে বিয়ে। সদ্বংশের সুন্দরী পাত্রী খুঁজে বের করো। বিয়ে হয়ে যাক—কেস-টেস তার পরে। আমোদ-আহ্লাদ খাওয়াদাওয়া সেরে হৃষ্ট চিত্তে, সবল সুস্থ দেহে আদালতে হাজির হয়ে বলা

যাবে—আমাদের ঠকাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা ঠকি নি। ধারা-টারাগুলো বরং দেখেশুনে রেখো অবসরমতো।

হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন মশায়।

সকলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল জগৎ মশায়ের মুখের দিকে। এই অপমানেও জগৎ মশায় হা-হা করে হাসছেন!

জগৎ মশায়ের সেই এক কথা—বিয়ে এগারোই। একদিন পিছুবে না। সুরেন্দ্র, তুমি আর সেতাব আমার সঙ্গে পাত্রী দেখতে যাবে। তোমরা পছন্দ করে ঘাড় নাড়লে আমি তবে হাঁ বলব। খোঁজ করো কোথায় আছে গরিবের ঘরের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। তবে বংশ সদ্বংশ হওয়া চাই।

সেতাব, সুরেন্দ্র, নেপাল এদের উৎসাহের আর সীমা ছিল না। উঠে পড়ে লেগেছিল—পাত্রী খুঁজে বের করবেই। ভালো মানুষ সেতাব হেসে বলেছিল—এ সেই রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র সদাগরপুত্র কোটালপুত্রের গল্প হল, হারা উদ্দেশে রাজকন্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ভাহ্ জীবন, তুই এই একটু হাস দেখি!

সেতাব চিঠি লিখেছিল তার মামার বাড়িতে। "সুন্দরী গুণবতী সদ্বংশের বয়স্থা পাত্রী থাকিলে অবিলম্বে জানাইবে। কোনো পণ লাগিবে না। পাত্রের পিতা এখনকার নামকরা কবিরাজ জগৎ মশায়। খুব রোজগার। জমি পুকুর বাগান জমিদারি আছে। ছেলেও কবিরাজি শিখিতেছে।"

সুরেন্দ্র সত্যসত্যই চালচিঁড়ে বেঁধে বেরিয়ে পড়ার মতো বেরিয়ে পড়েছিল। জগৎ মশায়ের কাছে কয়েকটা টাকা চেয়ে নিয়ে বলেছিল—আমি একবার সদর শহরটা ঘুরে আসি। পসার নাই এমন গরিব উকিল-মোক্তারের তো অভাব নাই। এদের মধ্যে কায়স্থও অনেক। বয়সওয়ালা আইবুড়ো মেয়ে এই সব জায়গাতে মিলবে।

জগৎ মশায় তাই পাঠিয়েছিলেন সুরেন্দ্রকে।

নেপালটা ছিল ছেলেবেলা থেকেই আধপাগলা। সন্ধানের ধারা ছিল বিচিত্র। তার বাবা ছিলেন সবরেজেষ্ট্রি আপিসের মোহরার। নেপাল তখন বাপের সঙ্গে সবরেজেষ্ট্রি আপিসে গিয়ে টাউটের কাজ করত। দলিল যাতে আগে রেজেষ্ট্রি হয় তার ব্যবস্থা করে দাখিল দিত, কাটাকুটি থাকলে কৈফিয়ত লিখে দিত, সনাক্তদার না থাকলে সনাক্ত দিয়ে দিত। অর্থাৎ বলে দিত—"এই ব্যক্তির নাম ধাম পিতার নাম যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য—আমি শ্রীনেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পিতা শ্রীবিনোদলাল মুখোপাধ্যায় নিবাস নবগ্রাম—আমি ইহাকে জানি এবং চিনি।" তার তলায় সই মেরে দিত। ফি নিত দু আনা। নেপাল সবরেজেষ্ট্রি আপিসের সামনে বটতলায় বসে জনে জনে জিজ্ঞাসা করত—বলি চাটুজ্জেমশায়, আপনার খোঁজে ভালো কায়স্থ পাত্রী আছে?

—ওহে—কী নাম তোমার? গোবিন্দ পাল? কায়স্থ পাত্রীর খোঁজ দিতে পার?

—কোথায় বাড়ি শেখজী? আপনাদের গাঁয়ের কাছাকাছি কায়স্থ আছে? বেশ

সুন্দরী ভালো বংশের কন্যে আছে ? বলতে পারেন ?

শুধু এই নয়, পথেঘাটে পথিক পেলেই সে প্রশ্ন করত। ভালো কন্যে আছে হে কায়স্থ বংশের ?

শেষ পর্যন্ত লাগল একদিন। ওদের জমির ভাগজোতদার নবীন বাগ্দীকে বলেছিল—খোঁজ করিস তো নবীন! ভালো কায়স্থদের বড়সড় মেয়ে। নবীন যাচ্ছিল কাটোয়া—ভার বয়ে গঙ্গাজল আনবে। নেপাল বলেছিল—যাবি তো এতটা পথ। আসিস তো নবীন খোঁজ করে!

* * *

আজকের জীবন মশায় তখন শুধু জীবন ; বড় জোর জীবন দত্ত। সেদিন জীবনের পক্ষে এ আঘাত হয়েছিল মর্মান্তিক। কিন্তু ভেঙে পড়েন নাই। বরং ক্রোধে আক্রোশে বিবাহের জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। সে উৎসাহ অনেকের চোখে বেশী-বেশী মনে হয়েছিল। জীবন কিন্তু গ্রাহ্য করেন নাই। তরুণ জীবন সেদিন মনের ক্ষোভে উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিল।

আজ বৃদ্ধ জীবন মশায় হাসলেন। আজ তিনি দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের তরুণ জীবনের দিকে চেয়ে আছেন রসজ্ঞ দ্রষ্টার মতো।

সাপের বিষে জর্জর মানুষের জিভে নিমের মতো তেতোকেও নাকি মিষ্টি লাগে। মিষ্টি রসকে মনে হয় তেতো।

নাঃ।

ভুল হল। বৃদ্ধ জীবন মশায় বার-দুই ঘাড় নাড়লেন। না-না।

মঞ্জরী যে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তার সঙ্গে মঞ্জরীর প্রতি তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক কী ? ভালোবাসার সঙ্গে কি কখনও সাপের বিষের তুলনা হয় ? তিনি ক্ষোভে নিজে হাতে বিষের নল মুখে তুলে শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করেছিলেন।

ক্ষোভে আক্রোশে তরুণ জীবন দত্ত সেদিন দুটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

খুব সুন্দরী পত্নী ঘরে এনে সর্বোত্তম সুখে সুখী হবেন। ভালোবাসবেন তাকে রামায়ণের কাহিনীর ইন্দুমতীকে অজরাজার ভালোবাসার মতো।

আর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—ডাক্তার তিনি হবেনই।

নাই বা পড়তে গেলেন মেডিক্যাল স্কুল বা কলেজে। ঘরে বসে তিনি পড়ে ডাক্তার হবেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল তাঁর চোখের সম্মুখে।

এ অঞ্চলের প্রথম বিখ্যাত ডাক্তার—রঙলাল মুখুজ্জে। নতুন দিনের সূর্যের মতো তিনি তখন উঠছেন।

বিস্ময়কর মানুষ, বিস্ময়কর প্রতিভা, রোমাঞ্চকর সাধনা রঙলাল ডাক্তারের ; তেমনি চিকিৎসা!

গৌরবর্ণ মানুষ ; সবল স্বাস্থ্য, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, রঙলাল ডাক্তারকে একশো জনের মধ্যে দেখবামাত্র চেনা যেত। চেহারাতেই যাঁরা প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে আসেন তিনি ছিলেন

তাঁদেরই একজন। এ সব মানুষ দুঃসাহসী হবেই। স্বল্পভাষী কিন্তু সেই অল্প কথাগুলিও ছিল, রূঢ় ঠিক নয়, অতি দৃঢ়তায় কঠিন, সাধারণের কাছে রূঢ় বলে মনে হত। হুগলী জেলার এক গ্রামে সেকালের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। হুগলী ইস্কুলে এবং কলেজে এফ. এ. পর্যন্ত পড়ে বাপের সঙ্গে মনান্তরের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কলেজে পড়বার সময় তিনি হুগলীর মিশনারিদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন; তাদের ওখানে যেতেন, তাদের সঙ্গে খেতেন। বাপের সঙ্গে মনান্তরের হেতু তাই।

বাপের মুখের উপরেই বলেছিলেন—জাত আমি মানি না। ধর্মকেও না। তাই ওদের ওখানে ওদের সঙ্গে খাওয়া আমি অপরাধ বলে মনে করি না। আর ধর্মই যখন মানি না তখন ধর্মান্তর গ্রহণের কথাই ওঠে না।

সেই দিনই গৃহত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন পদব্রজে, কপর্দকশূন্য অবস্থায়। এই জেলায় প্রথম এসে এক গ্রামে হয়েছিলেন পাঠশালার পণ্ডিত। পাঠশালার পণ্ডিত থেকে হয়েছিলেন ইস্কুল মাস্টার। এ জেলার এক রাজ-ইস্কুলে শিক্ষকের পদ খালি আছে শুনে দরখাস্ত করে চাকরি পেয়েছিলেন। এই চাকরি করতে করতেই হঠাৎ আকৃষ্ট হলেন চিকিৎসা-বিদ্যার দিকে। রাজাদের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে হয়েছিল বন্ধুত্ব। প্রায় যেতেন তাঁর কাছে। হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে রোগী দেখতেন। ডাক্তারের কাছে ডাক্তারী বই নিয়ে পড়তেন। ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করতেন—রাত্রির পর রাত্রি। এক-একদিন সমস্ত রাত্রিব্যাপী আলোচনা চলত। আলোচনা থেকে তর্ক, তর্ক থেকে কলহ।

একদিন কলহ কী হয়েছিল কে জানে—সে কথা রঙলাল ডাক্তার কারও কাছে জীবনে প্রকাশ করেন নাই, ডাক্তারও করে নাই—তবে তার ফল হয়েছিল বন্ধুবিচ্ছেদ। কয়েকদিন পরেই হঠাৎ রঙলাল ডাক্তার মাস্টারি ছেড়ে তাঁর বইয়ের গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন এই অঞ্চলে। এখান থেকে ছ'মাইল দূরে ময়ূরাক্ষীর তীরে একটা বাঁকের উপর মুসলমান-প্রধান লাল-মাটি গাঁয়ে প্রথম রইলেন ঘর ভাড়া করে। তারপর গ্রামপ্রান্তে নদীর প্রায় কিনারার উপর একখানি বাংলো বাড়ি তৈরি করে বাস করলেন। সামনে বিস্তীর্ণ ময়ূরাক্ষীকে রেখে বারান্দার উপর বসে দিনরাত্রি সাধনা শুরু করলেন। মধ্যে-মধ্যে রাত্রে বের হতেন পিশাচসাধকের মতো। কাঁধে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে যেতেন আর নিয়ে যেতেন একটা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি। কবরস্থানের টাটকা কোন কবর খুঁড়ে শবদেহ বের করে নিয়ে—আবার কবরটি পরিপাটি করে বন্ধ করে—শবদেহটা ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে টেনে আনতেন। তারপর দু-একদিন রঙলাল ডাক্তারকে আর বাইরে দেখা যেত না। বাংলোটার পিছনে পাঁচিল-ঘেরা বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে তিনি একটা কাচের-ছাদ-ওয়ালা ঘর করেছিলেন। সে ঘরে কারুর ঢুকবার অধিকার ছিল না। সেইখানে তিনি মড়া কেটে বই মিলিয়ে দেহতত্ত্ব শিখেছিলেন। কিছুদিন পরই জুটেছিল এক যোগ্য উত্তরসাধক। ময়ূরাক্ষীর ওপারের মনা হাড়ী। মনা হাড়ী ছিল ময়ূরাক্ষী ঘাটের খেয়া-মাঝি। আর একটা কাজ-করত—সে ছিল শ্মশানের শ্মশানবন্ধু—দুর্দান্ত মাতাল, সব পরিচয়ের চেয়েও তার আর-একটা বড় পরিচয়

ছিল—লোকে বলত মনা রাক্ষস। মনার ক্ষুধার কখনও নিবৃত্তি হত না। একবার এক হাঁড়ি ভাত নিঃশেষ করে মনা শ্মশানের অনতিদূরে একটা পাঁঠাকে দেখে আবার ক্ষুধার্ত হয়ে পাঁঠাটাকে ধরে ঘাড় মুচড়ে মেরে ওই চিতার আগুনেই সেটাকে পুড়িয়ে শেষ করেছিল। এই মনাই হল রঙলাল ডাক্তারের প্রথম ভক্ত। বছর দুয়েক পর থেকে মনাই হয়েছিল তাঁর পাচক। তার হাতেই তিনি খেতেন। এই মনাই তাঁকে শব সংগ্রহে সাহায্য করত। ময়ূরাক্ষীর জলে ভেসে-যাওয়া শব তুলে এনে দিত। অনেক সময় শ্মশানের পরিত্যক্ত শব এনে দিত। এইভাবে বৎসর পাঁচেক সাধনার পর রঙলাল ডাক্তার একদিন ঘোষণা করলেন—আমি ডাক্তার। যে রোগ এখানে কেউ সারাতে পারবে না, সেই রোগী আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি সারিয়ে দেব।

কিছুদিনের মধ্যেই এই ঘোষণাকে তিনি সত্য বলে প্রমাণিত করলেন। লোকে বিস্মিত হয়ে গেল তাঁর প্রতিভায়। বললে, ধন্বন্তরি। ডাক্তার পালকি কিনলেন কলে যাওয়ার জন্য।

মনা বললে—উঁহু! একটা ঘোড়া কিনে ফেলো বাবা। মানুষের পায়ে আর ঘোড়ার পায়ে!

রঙলাল বললেন—দূর বেটা! মানুষের কাঁধে আর ঘোড়ার পিঠে? মানুষের কাঁধে আরাম কত?

—আজ্ঞে?

—সে তুই বুঝবি না বেটা! ঘোড়ায় চড়ে শেষে পড়ে হাড়গোড় ভাঙব?

জীবন দত্ত সেদিন আকাশকুসুম কল্পনা করে নাই। তার আদর্শ ছিল বাস্তব এবং সজীব। ডাক্তার হয়ে প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করে সোনার গহনায় সুন্দরী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন তার কাঁদী যাবার ইচ্ছা ছিল। সে যাবে বড় সাদা ঘোড়ায় চেপে, স্ত্রী যাবে কিংখাবে মোড়া পালকিতে।

মুরশিদাবাদ যাবার অছিলায় পথে কাঁদীতে ভূপী বোসের ফাটল-ধরা বাড়ির দরজায় ঘোড়াটার রাশ টেনে দাঁড় করিয়ে বলবে—আজকে রাত্রির মতো একটু বিশ্রামের স্থান হবে কি? ইচ্ছে করেই প্রহরখানেক রাত্রে গিয়ে উপস্থিত হবে ওদের বাড়িতে।

স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবে অন্দরে। মঞ্জরীর কাছে।

সে গিয়ে বলবে—আজ রাত্রির মতো থাকতে আমাদের একটু জায়গা দেবেন? আপনি তো আমাদের আপনার লোক। সম্বন্ধটা সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো-বউয়ের বোনঝি-জামাইয়ের মতো হলেও সম্বন্ধ তো বটে!

তারপর যা হবার আপনি হবে।

বিবাহের পর কিন্তু সব যেন বিপরীত হয়ে গেল। জীবন দত্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সেদিন, কেন এমন হল?

বারো

সেদিন আশ্চর্য মনে হয়েছিল—আজ কিন্তু আশ্চর্য মনে হয় না।

বিবাহের পূর্বে জীবনের যে উচ্ছ্বাস শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর সমুদ্রের মতো ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, বিবাহের দিনেই সেই উচ্ছ্বাস স্তিমিত নিরুৎসব বিষণ্ণ হয়ে গেল প্রতিপদ-দ্বিতীয়ার ভাটার সমুদ্রের মতো। জীবনে পূর্ণিমা তিথিটা যেন এলই না কোনোদিন। অমাবস্যাই কি এসেছে? না, তাও আসে নাই আজও। একমাত্র সন্তান বনবিহারীর মৃত্যুতেও না।

এগারোই আষাঢ়েই বিবাহ হয়েছিল। কন্যার এদেশে অভাব হয় না।

কন্যা এ দেশে দায়ের সামিল। যা দায় তাই দুর্বহ বোঝা। সবল মানুষ বোঝা বইতে পারে, দুর্বল মানুষ বোঝা নামাতে গিয়ে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সংসারে দুর্বলের সংখ্যাই তো বেশী!

দশটি কন্যার খোঁজ এসেছিল। ছটি কন্যাকে পরিচয় শুনেই নাকচ করেছিলেন জগৎ মশায়। চারটি কন্যা চাক্ষুষ করে সদর শহরের এক বৃদ্ধ মোক্তারের পিতৃমাতৃহীনা ভাগ্নীকে পছন্দ করলেন। পণ হরিতকী। মেয়েটির নাম কৃষ্ণভামিনী। মেয়েটি তখনকার দিনে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছিল। চোদ্দ বছর উত্তীর্ণ হয়ে মাস দুয়েক পরেই পনেরোয় পড়বে। এ মেয়ের সন্ধান এনেছিল সুরেন্দ্র।

বাইরে-ঘরে উৎসব সমারোহের কোনো ত্রুটি ছিল না। জগৎ মশায়ের তখন কবিরাজ হিসেবে খ্যাতিতে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠায়—যাকে বলে একই আকাশে চন্দ্রসূর্যের একসঙ্গে উদয়। জীবন তাঁর একমাত্র সন্তান, তার উপর এই বিচিত্র অবস্থায় বিবাহ। কাঁদীতে মঞ্জরী এবং ভূপী বোসের বিবাহ হয়েছিল যত চুপিচুপি, এখানে জীবনের সঙ্গে কৃষ্ণ-ভামিনীর বিবাহ তত উচ্চ সমারোহে নহবত থেকে ঢোল বাঁশি এমন কি ব্যাণ্ড বাজনা বাজিয়ে হয়ে গেল। ওই ব্যাণ্ড বাজনা আনা হয়েছিল কাঁদী থেকে। রাঢ় অঞ্চলে প্রথম ব্যাণ্ড বাজনার দল হয়েছিল মুরশিদাবাদে, তারপর কাঁদীতে। নবগ্রাম থেকে কাঁদী দশ ক্রোশ পথ; এখানকার বাজনার শব্দ দশ ক্রোশ অর্থাৎ বিশ মাইল অতিক্রম করে সেখানে নবদম্পতির নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটালেও বাজনদারদের মারফৎ খবরটা পৌঁছুবার কথা। এই এত সমারোহের মধ্যেও পাত্র জীবন যখন কন্যার বাড়িতে পৌঁছুল তখন সে ম্লান স্তিমিত হয়ে গেছে। বাসরে গিয়ে জীবন অবসন্ন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল, হাত জোড় করে বলল—আমাকে মাফ করবেন, আমার শরীরটা বড় খারাপ করছে।

তবুও অবশ্য ছাড়ে নি মেয়েরা। গানও গাইতে হয়েছিল, সেকালের নিয়ম অনুযায়ী কৃষ্ণভামিনীকে কোলে বসাতেও হয়েছিল।

কৃষ্ণভামিনীর রঙ ছিল পাকা সোনার মতো। মুখশ্রী কোমল এবং স্নিগ্ধ হলে তাকে ডাকসাইটে সুন্দরী বলা যেত।

চোদ্দ বছরের কৃষ্ণভামিনী যেদিন বধূবেশে মশায়দের ঘরে পদার্পণ করে, সেই দিনই তার

নামকরণ হয়েছিল আতর-বউ। কৃষ্ণভামিনীর রঙ দেখে মানুষের চোখ ঝলসে গিয়েছিল। নামকরণ করে জীবনের পিসীমা বলেছিলেন—তোমার স্বভাবের সৌরভে ঘর ভরে উঠুক।

ফুলশয্যার রাত্রিও কেটেছিল একটি প্রচ্ছন্ন উদাসীনতার মধ্যে। জীবন হেসেছিল, ঠাকুমা বউদিদির পরিহাস-রসিকতাতেও যোগ দিয়েছিল, কিন্তু সে যেন প্রাণহীন পুতুলনাচের পুতুলের মতো। আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে পড়ছে শোধ নেওয়ার আনন্দ কেমন যেন নিভানো প্রদীপের মতো কালো হয়ে গিয়েছিল। নিগূঢ় একটা বেদনা তাকে যেন অভিভূত করতে চেয়েছিল।

বিবাহ করেছিলেন তিনি অপমানের প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু বিবাহ করে বুঝলেন, অপমানের শোধ নেওয়া হয় নি ; শুধু বিয়ে করাই হয়েছে।

এ সংসারে অপমান মাত্রেরই গ্লানি মর্মদাহী, সে মর্মদাহ একমাত্র প্রতিশোধের উল্লাসেই মুছে যায় ; তার অন্তরে জ্বলে ওঠে যে আগুন, সেই আগুনে প্রতিপক্ষকে পুড়িয়ে ছাই করে শান্ত হয়। না পারলে সেই আগুনে নিজেই তিলে তিলে পুড়ে ছাই হয়। বড় মানুষ যাঁরা, মহৎ যাঁরা—তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা অপমানের আগুনকে ক্ষমার শান্তিবারি বর্ষণে নিভিয়ে ফেলেন।

জীবন মশায় মহৎ নন—নিজে তাই বলেন। তাঁর মনের আগুন তাই বোধ করি আজও জ্বলছে। বাইরে দেখে কেউ বুঝতে পারে না। বুঝতে তিনি দেন না। বুঝতে পারে একজন। সে আতর-বউ। সে প্রথম দিন থেকেই বোঝে।

জীবনের প্রচ্ছন্ন বেদনা সংসারে সকলের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকলেও নতুন বধূটির অগোচর ছিল না। শুধু তাই নয়, বধূটিকেও আক্রমণ করলে সংক্রামক ব্যাধির মতো। ফুলশয্যার রাত্রেই জীবন দত্তের বেদনা নতুন বউয়ের মনে আঘাত করে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল।

ফুলশয্যার শেষ রাত্রে জীবন বধূকে আকর্ষণ করেছিল—নিজের বুকের কাছে। বধূটি তিক্ত কঠিন স্বরে বলে উঠেছিল—আঃ, ছাড়ো!

—কেন? কী হল?

—কী হবে? ভালো লাগে না।

—ভালো লাগে না?

—না। ছেড়ে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। ছেড়ে দাও।

—কী হল?

—কী হবে? আমাকে দয়া করে বিয়ে করেছ, উদ্ধার করেছ। দাসী হয়ে এসেছি—দাসীর মতো খাটব। দু মুঠো খাব। আদর তো আমার পাওনা নয়। ছেড়ে দাও আমাকে।

আজও চলছে ওই ধারায়।

আতর-বউ আজ আগ্নেয়গিরি ; অগ্ন্যুদগার আরম্ভ হলে থামে না।

আতর-বউয়ের দোষ কী? আতর-বউয়ের বুকে আগুন লেগেছে তাঁরই বুকের আগুনের সংস্পর্শে।

* * *

তবু এর মধ্যে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ একটি সংসার।

ওই যে আতর-বউ বলে—কত নামডাক ছিল—দুহাতে রোজগার করেছ, চার হাতে খরচ করেছ—এর অর্থই তো হল যশ-প্রতিষ্ঠা অর্থ-সম্পদ। সাধারণ মানুষের এ ছাড়া আর কী চাই?

সাজানো সংসার—তিন কন্যা এক পুত্র। সুরমা-সুষমা-সরমা। ছেলে বনবিহারী। তারা পেয়েছিল মায়ের বর্ণচ্ছটা, বাপের স্বাস্থ্য।

খ্যাতি প্রতিষ্ঠাও অনেক হয়েছিল; সে খ্যাতি কিশোর-জীবনের আকাঙ্ক্ষার পরিমাপে সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদতুল্য না হলেও দিগন্তজোড়া বিলের তুলনায় মাঝারি আকারের পরিচ্ছন্ন একটি শখের পুষ্করিণী একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যার বাঁধানো ঘাট আছে, জলে মাছ আছে, নামেও যে পুষ্করিণীটি কর্তার অভিপ্রায় অনুযায়ী শ্যামসায়র বা শ্যামসরোবর। জলও তার নির্মল ছিল, তপ্ত গ্রামবাসীরা তাতে অবগাহন করে তৃপ্তও হয়েছে। তৃষ্ণার্তেরা তার জল পান করে শ্যামসায়রের অধিকারীকে মুক্তপ্রাণে আশীর্বাদও করেছে। কিন্তু দিগন্তবিস্তৃত বিলের তুলনায় সে কতটুকু, কত অকিঞ্চিৎকর—তা সেই অধিকারীই জানে যে এই বিলের মতোই একটি বিল কাটাতে চেয়েছিল। যার কল্পনা ছিল ওই বিলের ঘাটে ভিড়বে কত দেশদেশান্তরের বড় বড় বজরা নৌকা ছিপ।

আজ এই পরিণত বয়সে জীবনের সকল মোহই কেটে গেছে। লাল নীল সবুজ বেগুনে—সাত রঙের ইন্দ্রধনু তিনি আর দেখতে পান না। আজ চোখের সামনে মাত্র দুটি রঙ আছে। একটি সাদা আর অন্যটি কালো। আলো আর অন্ধকার। তাই আশ্চর্য হয়ে ভাবেন—সেদিন কী করে জেগেছিল ইন্দ্রধনুর মতো এমন বর্ণ-বৈচিত্র্যময় আকাঙ্ক্ষা।

এ প্রশ্ন মনে উঠতেই জীবন দত্ত হাসেন। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন—কেন? বার বার এ প্রশ্ন মনে ওঠে কেন তোমার? এ প্রশ্ন ওঠবার তো কথা নয়।

দুটি রঙ—দিন ও রাত্রির সাদা ও কালো রঙ দুটি ছাড়া বাকি রঙগুলি তুমি নিজেই তো ধুয়ে মুছে নিয়েছ নিজের হাতে। অক্ষম লোকের রঙগুলি ধুয়ে যায় ব্যর্থতায়, বেদনার চোখের জলে। তুমি ধুয়ে মুছে দিয়েছ মিথ্যা বলে; তোমার মহাগুরু জগৎ মশায়ের শিক্ষার কথা ভুলে যাও কেন? তাঁর শিক্ষার মধ্যে তো নিজেকে সেদিন ডুবিয়ে দিয়েছিলে তুমি।

নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করে নিয়ে ঘাড় নাড়লেন জীবন মশায়। বার বার দাড়িতে হাত বুলালেন। ঠিক! ঠিক!

হঠাৎ একটা আলোর ছটা এসে চোখে বাজল। আলো? উঃ—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাত্রি নেমেছে। খেয়াল ছিল না। পুরনো কথা মনে করতে গিয়ে বর্তমানের কথা ভুলেই গিয়েছেন তিনি।

আলোটা আসছে ভিতর-বাড়ি থেকে, হয় ইন্দির, নয় নন্দ আলো নিয়ে আসছে। না তো। পায়ের দিকে কাপড়ের ঘের দেখে মনে হচ্ছে—মেয়েছেলে। আতর-বউ আসছেন। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন জীবন মশাই। অসময়ে আতর-বউয়ের আসাটা তাঁর

কাছে শঙ্কার কারণ।

আতর-বউই বটে। আলোটা সামনে নামিয়ে দিয়ে আতর-বউ কাছে দাঁড়ালেন। দীর্ঘাঙ্গী গৌরবর্ণা আতর-বউ, কপালে সিন্দুরের টিপটি আজও পরেন, সিঁথিতে সিন্দুর ডগ-ডগ করে। কঠোরভাষিণী আতর-বউ সুযোগ পেলে বোধ করি একটা রাজ্যশাসন করতে পারতেন। জীবন মশায় এ-কথা অনেকবার বলেছেন রসিকতা করে। আতর-বউ উত্তর দিয়েছেন—একটা মানুষকেই আনতে পারলাম না হাতের মুঠোয়, তো একটা রাজ্য! আতর-বউ উত্তর দিয়ে চিরকাল এক বিচিত্র হাসি হাসেন।

আতর-বউ আলোটি নামালেন দাওয়ার উপর।

—কী খবর? মুখ তুলে বললেন জীবন মশায়। আতর-বউয়ের মুখখানি বড় মধুর লাগছে আজ। মমতায় যেন বর্ষার অভিষিক্ত ধরিত্রীর মতো কোমল।

আতর-বউ ঈষৎ উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—তুমি আজ চা খাও নি?

—ভুলে গিয়েছি।

—ভুলে গিয়েছ? হাসলেন আতর-বউ।—চা খেতে ভুলে যায় মানুষ! নন্দ ছোঁড়া গিয়ে বললে—তামাক পর্যন্ত খাও নি। এসে ডেকেছে, সাড়া দাও নি। শরীর ভালো আছে তো? না—মন ভালো নাই? কী হল তোমার?

অপ্রতিভের মতো হেসে জীবন মশায় বললেন—হয় নি কিছু। এমনি ভাবছিলাম। নবগ্রামে রতন মাস্টারের ছেলেকে দেখে এলাম; পথে নিশি-ঠাকরুণ ডেকে দেখালে তার ভাইঝিকে। রতন মাস্টারের ছেলের রোগ খুবই কঠিন, তবে জোর করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু এই মেয়েটি—এর আর—।

ঘাড় নাড়লেন ডাক্তার। আবার বললেন—এই কচি মেয়ে—বড় জোর পনেরো বছর বয়স—এরই মধ্যে দুটি সন্তান হয়েছে। নিশি দেখিয়ে বললে—চাঁদের মতো ছেলে। আমি দেখলাম চাঁদ নয়, যম। মাকে খেতে এসেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

—নিশিকে বলে এলে নাকি? শিউরে উঠলেন আতর-বউ।

—না। তবে নিশি বুঝতে পারবে। বলেছি জলবারণ খেতে হবে। এছাড়া ওষুধ নাই। কে?

আতর-বউয়ের পিছনে কেউ এসে দাঁড়াল। ও—ইন্দির!

—হ্যাঁ। ওকে চা করতে বলে আমি চলে এসেছিলাম। নাও চা খাও! ভালো মানুষ তুমি। যে চা নেশার জিনিস—তা না খেলেও তোমার কষ্ট হয় না? তামাক খেতে ভুলে যাও?

ইন্দির চায়ের পাথরের গেলাসটি এগিয়ে দিল। আতর-বউ বললেন—তুমি খাও, আমি দাঁড়িয়ে আছি। গেলাস আমি হাতে করে নিয়ে যাব। ইন্দিরের হাতে শনি আছে, ছ মাসে তিনটে পাথরের গেলাস ভাঙলো। ইন্দির, তাকের ওপর বড় এলাচ গুঁড়ো করা আছে, নিয়ে আয়।

ইন্দির চলে যেতেই আতর-বউ বললেন—তুমি আমাকে লুকোলে। ওই হাসপাতালের ডাক্তারের কথায় তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ। নতুন কালের ছেলেমানুষ ডাক্তার, অহঙ্কার অনেক। কাকে কী বলেছে জানে না। আমি তো জানি তোমার নিদান মিথ্যে হয় না। মতির মা যখন মরবে তখন বুঝতে পারবে ছোকরা ডাক্তার। আমিও তোমাকে ওবেলা কতকগুলো খারাপ কথা বললাম। মুখপোড়া শশী, যে এইখানে হাত-দেখা শিখলে, কম্পাউণ্ডারি শিখলে সে এসে বলে কিনা, হাত-পা ভাঙাতে নিদান হাঁকা তো শুনি নি, বুঝিও না। ও যে কেন মশায় বলতে গেলেন কে জানে! শশীর মুখে এই কথা শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি তাকে বলেছি, এ কথা তুই কোন্ মুখে বললি শশী? বলতে লজ্জা লাগল না? কলিকাল, নইলে তোর জিভ খসে যেত।

জীবনমশায় হাসলেন। কিন্তু কথার কোন উত্তর দিলেন না। শশীর উপর আজ অত্যন্ত চটেছে আতর-বউ।

আতর-বউ প্রতীক্ষা করলেন স্বামীর উত্তরের। উত্তর না পেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু ভালো দেখতে পেলেন না স্বামীর মুখ। শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি—তাঁর পাশে অনেকখানি খোলা জায়গার মধ্যে বারান্দাটির উপর একটি পুরানো লণ্ঠন যেটুকু আলোকচ্ছটা বিস্তার করেছিল সে নিতান্তই অপর্যাপ্ত। তার উপর আতর-বউয়ের দৃষ্টি বার্ধক্য-ম্লান। হাত বাড়িয়ে আলোটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। তারপর ঝুঁকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরেই বলে উঠলেন—হাসছ তুমি? তোমার কি গণ্ডারের চামড়া? হাসি দেখে অকস্মাৎ চটে উঠলেন আতর-বউ।

ডাক্তার কিন্তু আরও একটু হেসে বললেন—তা ছাড়া করব কী বলো? কাঁদব?

কাঁদবে? হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। আতর-বউ বললেন—কাঁদবে? তুমি? চোখে জল তো বিধাতা তোমাকে দেয় নাই। কি করে কাঁদবে তুমি? যে মানুষ নিজের ছেলের নিদান হাঁকে; মরণের সময় বাইরে বসে থাকে, বলে, কী দেখব? ও আমি ছ মাস আগে দেখে রেখেছি—

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন—থামো, আতর-বউ থামো। তোমাকে মিনতি করছি। থামো তুমি। আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও। রতনবাবুর ছেলেকে দেখে এসেছি, আমাকে একটু ভাবতে দাও। বুঝতে দাও।

আতর-বউ যেন ছিটকে উঠে পড়লেন ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো, বললেন—অন্যায় হয়েছে। আমার অন্যায় হয়েছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসাই আমার অন্যায় হয়েছে। আমার অধিকার কী? আমাকে এনেছিলে তোমরা দয়া করে, মামার বাড়ীর মা-বাপ মরা ভাগ্নী, বিনা পণে দয়া করে ঘরে এনেছিলে দাসী-বাঁদীর মতো খাটাতে—আমার সেই অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকার তো নাই। একশোবার অন্যায় করেছি, হাজারবার। মাফ করো আমাকে।

উঠে চলে গেলেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে।

এই তো আতর-বউ! চিরকালের সেই আতর-বউ! হাসলেন ডাক্তার। কিন্তু সে হাসি অর্ধপথেই একটা বিচিত্র শব্দে বাধা পেয়ে থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল স্থানটা। ডাক্তার এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। আতর-বউ লণ্ঠনটার শিখা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—বোধ হয় মাত্রা অনেক পরিমাণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কথাবার্তার উত্তেজনার মধ্যে কেউই লক্ষ্য করেন নি। সশব্দে লণ্ঠনের কাচটা ফাটিয়ে দপ করে নিভে গেল আলোটা।

* * *

সশব্দে হাসিও হঠাৎ থেমে গেল তাঁর। মনের ছিন্ন চিন্তা আবার জোড়া লাগল। আতর-বউ বলে গেলেন—বিধাতা তাঁকে চোখের জল দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান নি। কথাটা মনে হতেই, হাসি থেমে গেল তাঁর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার মনে মনেই বললেন—দিয়েছিলেন, অনেক অজস্র—তুমি অনুমান করতে পার না আতর-বউ, সমুদ্রের মতো অথৈ লবণাক্ত চোখের জল ভগবান তাঁর দুটি চোখের অন্তরালে অন্তরের মধ্যে দিয়েছিলেন। তার সংবাদ তুমি জান না। কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞানযোগ অগস্ত্য ঋষির মতো গণ্ডূষে সে সমুদ্র পান করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অন্তর এখন শুষ্ক সমুদ্রগর্ভের মতো বালুময় প্রান্তর। অনেক প্রবাল অনেক মণিমাণিক্য হয়তো আছে; কিন্তু তার সর্বাঙ্গে আছে চোখের জলের লবণাক্ত স্বাদ। তুমি তো কোনোদিন সে বুঝলে না, বুঝতে চাইলে না! তুমি, মঞ্জরী—তোমরা দুজনেই যে মৃত্যু; অমৃত তো তোমরা চাও নি কোনো দিন। চাইলে—তাঁর কাছে আসতে, বুঝতে পারতে। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জীবন ডাক্তার।

মঞ্জরী আতর-বউকে বা শুধু দোষ দিচ্ছেন কেন তিনি? তাঁর নিজের কথা? তিনি নিজে? নিজেই কি তিনি জীবনে অমৃত পেয়েছেন বলে অনুভব করেছেন কোনোদিন? এ কথা অন্য কেউ জানে না, জানতেন দুজন, তাঁরা আজ নেই। একজন তাঁর বাবা, প্রথম শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু।

জগৎ মশায় জানতেন তাঁর এ অতৃপ্তির কথা। অমৃত-অপ্রাপ্তিই হল অশান্তি অতৃপ্তি। মৃত্যুকালে জগৎ মশায় একথা তাঁকে ডেকে বলেছিলেন। জীবনকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আরও দশ বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুকালে জ্ঞানগঙ্গা গিয়ে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেছিলেন। মা তখন গত হয়েছেন। তিনিও খানিকটা জানতেন। কিন্তু তিনি এ অতৃপ্তির হেতু জানতেন না; তিনি হেতু সন্ধান করেছিলেন একেবারে বাস্তব সংসারে। বাবার মতো গভীরভাবে বুঝে তাঁর অন্তর খুঁজে সন্ধান করেন নাই।

বিবাহের পর জীবন আয়ুর্বেদ শিক্ষায় মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। যে পড়াশুনা তার ইস্কুল-জীবনে ভালো লাগে নাই সেই পড়াশুনায় যেন ডুবে গিয়েছিল। জগৎ মশায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। জগৎ মশায় বলেছিলেন—ইস্কুলে পড়াশুনার রকমসকম দেখে ভাবতাম জীবনের বুদ্ধি বোধ হয় মোটা; কিন্তু আয়ুর্বেদে দেখছি ওর বুদ্ধি ক্ষুরধার। তবে—। থেমে

গিয়েছিলেন তিনি—ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলেছিলেন—তবে এর সঙ্গে গানবাজনা শেখো। আনন্দ করো। গান করো। ভগবানের নাম না করলে চিকিৎসকের বৃত্তি নিয়ে বাঁচবে কী করে ?

ঠাকুরদাস মিশ্র সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, ওহে ওটা যে ওর রক্তে রয়েছে। বংশগত বিদ্যেতে তাই হয়। আমার ওই হারামজাদা বেটাটার বিবরণ জান ?

অর্থাৎ সুরেন্দ্রের। উচ্ছ্বাসভরে বলেই গেলেন ঠাকুরদাস মিশ্র।

—হারামজাদা বেটা মদ ধরেছে তা তো জান। লেখাপড়াও ছেড়েছে অনেক দিন। ভেবেছিলাম ও বেটাকে আর জমিদারী সেরেস্তার কাজে লাগাব না। পুজো-আর্চার মন্তরগুলো মুখস্থ করিয়ে বেটাকে লাট দেবগ্রামের বিশ্বেশ্বরী মায়ের পূজারী করে দেব। ওখানকার পূজারী বেটার বংশ নাই। পূজারীই সেবায়েত, পনেরো বিঘে জমি আছে চাকরান, তা ছাড়া বিশ্বেশ্বরী হল রেশমের পলু পোকা চাষের 'রাখে হরি মারে কে'র মতো দেবতা! বিশ্বেশ্বরীর পুজো না দিয়ে পুষ্প না নিয়ে ও চাষই হয় না। পাওনা অঢেল। তা কিছুতেই না। ও বলে—ও মন্তর আমার মুখস্থ হবে না। তারপর ব্যাপার শোনো—বেটা সেদিন দশ বছর আগের এক জমাওয়াশীল বাকি নিয়ে এসে আমাকে দেখিয়ে বলে—এটাতে যে ভুল রয়েছে। শোনো কথা! ভুল অবিশ্যি আমি জানি—ও ভুল আমারই কলমের ডগায় পুকুর লোপাট। কিন্তু দশ বছরের মধ্যে কেউ ধরতে পারে নি। জমিদারের ঘরে আর ধরাও পড়বে না। কিন্তু বেটার বিদ্যে দেখো। গোপনে গোপনে পুরানো কাগজ দেখে হিসেব বুঝেছে, বাপের ভুল ধরেছে। আমি তো বেটার মাথায় চড় মেরে বললাম, চুপ রে বেটা চুপ!

ঠাকুরদাস মিশ্র পুত্রগৌরবে যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন জগৎ মশায় তা হন নি। ঠাকুরদাস আঘাত পেতে পারে বলে শুধু একটু হেসেছিলেন, বাধাও দেন নি। শুধু একটু হেসেছিলেন। জগদ্বন্ধু ছিলেন জ্ঞানযোগী। সেই বাপের ছেলে এবং তাঁরই শিষ্য হয়েও আসল বস্তুটি তিনি আয়ত্ত করতে পারলেন না। বাবা বলেছিলেন—আয়ুর্বেদে ওর বুদ্ধি ক্ষুরধার।

বুদ্ধি তাঁর ক্ষুরধার ছিল, রোগ উপসর্গ—এমন কি রোগ ও উপসর্গের পশ্চাতে অন্ধ বধির পিঙ্গলকেশী মৃত্যু তার হিমশীতল হাত দুখানি জীবনকে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছে, কি হয় নি, তাও তিনি অনুমান করতে পারতেন। আজ তুমি তরুণ ডাক্তার জীবন ডাক্তারকে উপহাস করেছ, তিরস্কার করেছ, নতুন কালের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অহঙ্কারে তাকে অবহেলা করেছ। করো, কিন্তু সেকালে কেউ সাহস করত না।

স্মৃতি স্মরণ করতে করতে জীবনমশায় যেন প্রাচীন, স্থবির অজগরের মতো ফুলে উঠলেন ; একটা তরুণ বিষধর তার তারুণ্যের ক্ষিপ্রগামিতা আর বিষদন্তের তীক্ষ্ণতার অহঙ্কারে ছোবলের পর ছোবল মেরে গেল ; বার্ধক্যের জীর্ণতায় তাঁর বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছে, স্থবিরতায় তাঁর বিপুল দেহে গতিবেগ মন্থর হয়েছে ; অগত্যা তাঁকে সহ্য করতে হল।

নারায়ণ! নারায়ণ! পরমানন্দ মাধব হে!

বেশ স্ফুট স্বরেই উচ্চারণ করলেন জীবন ডাক্তার।

মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে জগদ্বন্ধু মশায় তাঁকে বলেছিলেন—জীবন, বলো আমাকে যদি কিছু জিজ্ঞাসার থাকে?

জীবন মশায় নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারেন নি, রুদ্ধ আবেগ চোখের জলের ধারায় পথ করে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। মুখে বলতে কিছু পারেন নি।

জগৎ মশায় বলেছিলেন—তুমি কাঁদছ? তোমার দীক্ষা আয়ুর্বেদে। জীবন এবং মৃত্যুর তথ্য তো তুমি জান; তবু কাঁদছ? ছি! আমাকে দুঃখ দিয়ো না; তুমি কাঁদলে এই শেষ সময়ে আমাকে বুঝে যেতে হবে যে আমার শিক্ষা সার্থক হয় নি। তা ছাড়া, মৃত্যুতে আমার তো কোনো দুঃখ নাই, আক্ষেপ নাই। পরম শান্তি অনুভব করছি আমি, সুতরাং তুমি কাঁদবে কেন?

জীবন ডাক্তারের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল।

জগৎ মশায় বলেছিলেন—আমি জানি তোমার মনে কোথায় আছে গভীর অতৃপ্তি। থাকা উচিত নয়। তোমার জীবনের কোনো দিক তো অপূর্ণ নয়!

কয়েক মুহূর্ত পরে বলেছিলেন—তবু আছে, রয়েছে! অবশ্য এর উপর মানুষের হাত নাই আমি জানি। কিন্তু এ অতৃপ্তি থাকতে তো অমৃত পাবে না বাবা। পরমানন্দ মাধবকে অনুভব করতে পারবে না। অতৃপ্তি অবশ্য কামনার বস্তু না পেলে মেটে না। কিন্তু কামনা যে কী তাই কি কেউ জানে? শোনো, আশীর্বাদ করে যাই কামনার বস্তু পেয়েই যেন তোমার সকল অতৃপ্তি মিটে যায়, অমৃত আস্বাদন করতে পার। দুঃখে স্থির থাকতে পার, পৃথিবীতে মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে অনুভব করতে পার; আর আনন্দে সুখে কাঁদতে পার। নাই পাও তৃপ্তি। তবে বাবা জ্ঞানযোগে ডুব দিয়ো। ওই আয়ুর্বেদে। বড় কঠিন এবং শুষ্ক পথ। হোক। জ্ঞান হল অগস্ত্য ঋষি; গণ্ডূষে দুঃখের সমুদ্র পান করে নেন। স্বেচ্ছায় সৃষ্টির কল্যাণে চলে যান দক্ষিণে।

জ্ঞানযোগ-রূপী অগস্ত্যের গণ্ডূষপানে শুকিয়ে-যাওয়া সমুদ্রের বালির মতো তাঁর জীবন বালুময়। কিন্তু তার প্রতি বালুকণায় সমুদ্রের জলের লবণাক্ত স্বাদ। আতর-বউ কোনো দিন একবার আস্বাদন করেও দেখলেন না, কেবল মরুভূমি বলেই তাঁকে উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে উত্তপ্ত করে তুললেন।

* * *

বাপের মৃত্যুর পর জ্ঞানযোগেই নিজেকে ডুবিয়ে দেবার জন্য জীবন দত্ত ডাক্তারি পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তখন বিলাতী চিকিৎসার অভিনবত্বে দেশ চকিত হয়ে উঠেছে। রঙলাল ডাক্তারের পালকির বেহারাদের হাঁকে হাঁকে দেশের পথঘাট মুখরিত; নবীন মুখুজ্জে ডাক্তারের ঘোড়ার খুরের ধুলোয় পথের দুই ধার ধূসর। শুধু পথঘাটেই নয়, কবিরাজদের মনের মধ্যেও এর সাড়া উঠেছে। এই বিদ্যা আগে থেকেই তাঁকে আকৃষ্ট

করেছিল, বাপের মৃত্যুর পর তিনি সুযোগ পেলেন।

বৃদ্ধ জীবন মশায় অন্ধকারের মধ্যে আবার একবার হাসলেন, দাড়িতে হাত বোলালেন।

হায়রে হায়! মানুষ সংসারে নিজেকে নিজে যত ছলনা করে, প্রতারণা করে, মিথ্যা বলে তার শতাংশের একাংশও বোধ হয় পরকে করে না।

বৃদ্ধ বার বার মাথা নাড়লেন। ছোট ছেলের অপটু মিথ্যা বলার চাতুরীকে ধরে ফেলে কতকটা হতাশায়, কতকটা স্নেহবশে, কতকটা ধরে-ফেলার আনন্দে যেমন প্রবীণেরা মাথা নাড়ে তেমনিভাবেই মাথা নাড়লেন বার বার। সেদিনের আত্মপ্রতারণার কথাই আজ ধরে ফেলেছেন তিনি।

শুধু জ্ঞানলাভের জন্য, জ্ঞানযোগের মধ্যে নিজেকে সমাহিত করবার জন্য ডাক্তারি শিখতে চেয়েছিলেন? নিজে ঘোড়ায় চড়ে, আতর-বউকে পালকিতে চাপিয়ে কাঁদীতে ভূপী বোসের বাড়ি যাওয়ার কামনার তাড়নার কথাটা মিথ্যা?

শুধু কি এই? জগৎ মশায়ের মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই কতকগুলি বাঁধা ঘর কি হাতছাড়া হয় নাই তাঁর? লোকে বলে নাই—এইবার মশাইদের বাড়ির পশার গেল?

নবগ্রামে কি প্রথম অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার এসে বসে নি? তার প্রায় মাস দুয়েক পর ওই কিশোরের বাপ কৃষ্ণদাসবাবুর আশ্রয়ে কি হরিশ ডাক্তার আসে নি? তিনি কি নিজেই শঙ্কিত হন নি?

গুরু রঙলাল ডাক্তার এর অন্য অর্থ করেছিলেন। বলতেন—জীবন, তোমাকে আমি ভালোবাসি কেন জান? তোমাকে ভালোবাসি তুমি জীবনে হার মান নি এইজন্যে। এ দেশের কবিরাজরা হার মেনে এই অ্যালোপ্যাথিকে শুধু ঘরে বসে শাপ-শাপান্তই করলে। না পারলে নিজেদের শাস্ত্রের উন্নতি করে এর সঙ্গে পাল্লা দিতে, না চাইলে এর মধ্যে কী আছে সেই তত্ত্বকে জানতে। আধমরারা এমনি করেই মরে হে। তুমি জ্যান্ত মানুষ। তাই তোমাকে ভালোবাসি। হার মানার চেয়ে আমার কাছে অপমানের বিষয় আর কিছু নাই। হার মানা মানেই মরা। ডেড ম্যান, ডেড ম্যান! বুঝেছ?

লম্বা একটা চুরুট ধরিয়ে খালি গায়ে একখানা খাটো কাপড় পরে রঙলাল ডাক্তার ময়ূরাক্ষীর দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন আর পা দোলাতেন।

রোগী আসত। একথা যেদিন বলেছিলেন সে দিনের কথা মনে পড়ছে। একজন জোয়ান মুসলমানকে ডুলি করে নিয়ে এসেছিল। পেটের যন্ত্রণায় ধড়ফড় করছিল জোয়ানটা। রঙলাল ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে দেখে নির্বিকার ভাবেই বলেছিলেন, শুয়ে পড়্ চিত হয়ে—এই আমার পায়ের তলায় শুয়ে পড়্।

জীবন ডাক্তারকে বলেছিলেন—দেখবে নাকি নাড়ী? দেখো, তোমার নাড়ীজ্ঞান কী বলে দেখো। অম্বল না অম্বলশূল না পিলের কামড় দেখো।

রোগী চীৎকার করে উঠেছিল, ওগো ডাক্তারবাবু, তুমি দেখো গো, তুমি দেখো! মরে

গেলাম, আমি মরে গেলাম। নইলে একটুকুন বিষ দেন মশায়—খেয়ে আমি মরে বাঁচি। আ: কোথাও কিছু হল না গো, কবরেজ হাকিম পীর কালীস্থান কিছু বাকি নাই মশায়।

বাধা দিয়ে রঙলাল বলেছিলেন, ঠাকুর-দেবতা কী করবে রে ব্যাটা? গোগ্রাসে গোস্ত খাবি তো তারা কী করবে? কতখানি গোস্ত খাস একেবারে—দেড় সের না দু সের? ক্রিমি হয়েছে তোর পেটে, তিন-চার হাত লম্বা ক্রিমি।

—হেই বাবা, ওষুধ দেন বাবা। যাতনায় আর বাঁচি না বাবা।

—তা দেব কিন্তু টাকা কই? অ্যাঁ? দুটো টাকা দে ফীজ আর ওষুধের দাম। দে আগে। টাকা না হলে হবে না।

—এক টাকা এনেছি বাবা—

জীবন বলেছিলেন, কাল তা হলে দিয়ে যেয়ো।

রঙলাল বলেছিলেন, ইউ আর এ ফুল। বিনা ফীজে চিকিৎসা করো না। ধারে ওষুধ দিয়ো না, মরবে তুমি। তা ছাড়া ওরা ভাববে এ লোকটার পশার নেই ভালো। মানুষের বেঁচে থাকতে টাকা চাই। মানুষ খাটে ওই বাঁচার মূল্য উপার্জন করতে, তাতেও যে দাক্ষিণ্য দেখাতে যায় সে শুধু ফুলই নয় সে অপরাধী, অপরাধী। তাকে জীবনের যুদ্ধে হারতেই হবে। জাস্ট লাইক দি হিন্দুজ, ইতিহাসে পাবে হিন্দুরা প্রবল যুদ্ধ করে জিতে এল প্রায়, মুসলমানেরা যুদ্ধ-বিরতি প্রার্থনা করলে; ব্যস, হিন্দুরা বিরত হল। আচ্ছা, বিশ্রাম করে নাও, কাল আবার যুদ্ধ হবে। কিন্তু রাত্রে মুসলমান আক্রমণ করলে বিনা নোটিশে, অপ্রস্তুত হিন্দুরা হারল, মরল কিন্তু স্বর্গে গেল। আমি স্বর্গকামী নই। বুঝেছ? বলেই রোগীর সঙ্গের লোকদের বলেছিলেন, যাও, আর একটা টাকা নিয়ে এসো। যাও। রোগী থাকুক এখানে। ভয় নেই। মরবে না। যাও।

তারা চলে গেলে বলেছিলেন, জীবনে টাকা চাই জীবন। টাকা চাওয়াটা অপরাধ নয়। কারও কাছে ভিক্ষা কোরো না, কাউকে ঠকিও না, কারও চুরি কোরো না, কাউকে সর্বস্বান্ত করে নিও না, কিন্তু তুমি যার জন্যে খাটবে তার মজুরি—ফীজ, এ নিতে সঙ্কোচ কোরো না। করলে তুমি মরবে—স্বর্গে যাবে কিনা জানি না।

তেরো

অদ্ভুত মানুষ ছিলেন রঙলাল ডাক্তার।

সাধারণ মানুষের সমাজ তাঁকে মহাদাম্ভিক অর্থপিপাসু হৃদয়হীন বলেই মনে করত। ঠিক তাঁর বাবার প্রকৃতির বিপরীত।

ভাষা ছিল রূঢ়, আপ্যায়নহীন অসামাজিক মানুষ।

জীবন ডাক্তারের সঙ্গেও প্রথম পরিচয়ে এমনই ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন তিনি।

জগৎ মশায়ের মৃত্যুর পর। মনে তখন গভীর অশান্তি। সুপ্ত অতৃপ্তি যেন প্রচণ্ড তৃষ্ণায়

জেগে উঠেছে জগৎ মশায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে, তাঁর গুরুগম্ভীর অস্তিত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে। তাঁর স্নেহ যেমন প্রসন্ন এবং গাঢ় ছিল, তাঁর নির্দেশ এবং পরোক্ষ শাসনও ছিল তেমনি গুরুগম্ভীর, অলঙ্ঘনীয়। জীবনের যে অসন্তোষ ছিল চাপা সে যেন চূড়া-ভেঙে পড়া পাহাড়ের বুকের আগুনের মতো বেরিয়ে পড়ল।

ওঃ—প্রথম দিনের অগ্ন্যুদ্গারের কথা মনে পড়ছে।

আতর-বউ সেদিন প্রথম মাথা কুটেছিলেন। আতর-বউও চিরকালের অসন্তোষের আগুন বুকে বয়ে নিয়ে চলেছেন। বিবাহের পর সেই ফুলশয্যার রাত্রি থেকেই জীবন ডাক্তার সে আগুনের উত্তাপ সহ্য করে আসছেন।

বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটি মামার বাড়িতে মানুষ। চিরদিনের মুখরা। চিরদিনের—। কী বলবেন? প্রচণ্ডা ছাড়া বোধ করি বিশেষণ নাই। চিরদিনের প্রচণ্ডা। অদ্ভুত জীবনী-শক্তি! সেই বাল্যকাল থেকেই মাথা কুটে বিদ্রোহ করতেন। শাসন যত কঠিন হয়েছে তত মাথা কুটেছেন। তত চীৎকার করে কেঁদেছেন। তারপর কৈশোরে দিনের পর দিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন মামা-মামীর ঘরে, দিনেকের জন্য বিশ্রাম নেন নি। তার সঙ্গে উপবাস। মাসের মধ্যে সাতটা-আটটা দিন উপবাস করতেন; অন্যপক্ষ শাসনের নামে নির্যাতন করে ক্লান্ত হয়ে হার মানলে তবে অন্ন গ্রহণ করতেন।

বিবাহের ফুলশয্যাতেই এমন মেয়ের বুক থেকে অগ্নিজ্বালা না হোক অগ্নিতাপ বিকীর্ণ হবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে। কিন্তু নতুন বউ হিসেবে সংসারে সে সুনাম কিনেছিল। দিনের বেলা দূর থেকে জীবনমশায় আতর-বউকে দেখতেন প্রসন্ন, প্রশান্ত, হাস্যময়ী; অবশ্য শাশুড়ীর সমাদর তার একটা বড় কারণ। মা বউকে বড় সমাদর করতেন। মায়ের ধারণা ছিল আতর-বউয়ের মতো পয়মন্ত মেয়ে আর হয় না। বিয়ের পর বাপের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষায় জীবনের মন-প্রাণ সমর্পণ করা দেখে এই ধারণা হয়েছিল তাঁর। তিনি বলতেন—আমার বউয়ের পয়েই এমনটা হল। নইলে সেই জীবনে, যে মাথাটা নিচু করে ঢুঁ মেরে বড় বড় জোয়ানকে ঘায়েল করেছে, বোশেখ মাসের দিনে সকালে বেরিয়ে বেলা দুপুর পার করে তাল খেয়ে ফিরেছে, মোলকিনী পুকুর বিশবার এপার-ওপার করে পাঁক তুলে কাদা করে তবে উঠেছে, তার এই মতিগতি হয়! ইস্কুলে গিয়ে মারামারি করেছে। বই ছুঁতো না। এ যেন সে মানুষই নয়। বউমার পয় ছাড়া আর কী বলব? বউমা বাড়িতে পা দেওয়ার পর এই হল!

এ কথা শুনে সেকালে আতর-বউয়ের মুখ স্মিতহাস্যে ভরে উঠত।

এই সময়টাই জগৎ মশায়ের জীবনের প্রবীণতম কাল, প্রবীণতার সঙ্গে সঙ্গে বিচক্ষণতা এবং বহুদর্শিতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; তখন জগৎ মশায় নিজে আর সাধারণ রোগী দেখতে বের হতেন না, জীবন ছিলেন সেজন্য। রোগ কঠিন হলে তবে নিজে যেতেন। নইলে বলতেন, আমার যাবার দরকার নাই বাবা, আমার জীবন যাচ্ছে। ও আমারই যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসতেন।

কথাটার ভিতরের অর্থ যে না বুঝত, তাকে তিনি ওর অর্থ বোঝাতে চেষ্টা করতেন না,

রসিকতা যে বোঝে না তার সঙ্গে রসিকতা তিনি করতেন না, সাদা কথায় বলতেন, জীবন দেখে এসে আমাকে বলবে, তাতেই হবে। জীবনকেই আমি বলে দেব যা করতে হবে, যে ওষুধ দিতে হবে, তার জন্য ভেবো না।

যেতেন, জীবন যখন বলত তখন। আর যেতেন অন্য চিকিৎসকের হাতের রোগী দেখবার জন্য ডাক এলে তখন। আর যেতেন যে ক্ষেত্রে নিদান হাঁকতে হবে সেই ক্ষেত্রে।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। এই ঘটনায় জগৎ মশায়ের খ্যাতি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নবগ্রামের বরদাপ্রসাদবাবুর কঠিন অসুখ। বরদাবাবুরা নবগ্রামের প্রাচীনতম জমিদার বংশ; এক পুরুষকাল আগে এই বংশেরই বড়তরফের কর্তার বাড়িতে জগৎ মশায়ের বাবা দীনবন্ধু মশায় খাতা লিখতেন এবং ছেলেদের পড়াতেন। এই বাড়ির ছেলের রোগের সেবা করে, দীনবন্ধু মশায় প্রথম চিকিৎসাবিদ্যার আস্বাদ পেয়েছিলেন এবং কর্তার ছেলের আরোগ্যের পর বিখ্যাত কবিরাজ কৃষ্ণদাস সেনগুপ্ত নিজে ডেকে তাঁকে আয়ুর্বেদে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এই কৃতজ্ঞতায় দীর্ঘকাল, জগৎ মশায়ের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, এই বংশের যে-কোনো বাড়িতে ডাকলে সসম্ভ্রমে বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করেছেন। কিন্তু এরা তাঁর সম্ভ্রমকে বজায় রাখত না, উপরন্তু পদে পদে অসম্ভ্রম করত, এমন কি ওষুধের দামও দিত না; বলত খাজনায় কাটছিট করে দেব; এই কারণেই জগৎ মশায় স্বগ্রামের কয়েক পয়সা জমিদারি কিনে অসম্ভ্রমের হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিলেন। এবং রক্ষাও পেয়েছিলেন। নবগ্রামের রায়চৌধুরী বংশ তাঁকে আর ডাকতেন না। তাঁরা হরিহরপুরের কবিরাজ হীরালাল পাঠককে গৃহ-চিকিৎসক করেছিলেন। রোগ কঠিন হলে ডাকতেন রাঘবপুরের গুপ্ত কবিরাজদের। বরদাবাবুর অসুখে বাধ্য হয়ে তাঁর ছেলে জগৎ মশায়কে ডেকেছিলেন। বরদাবাবুর ছেলে কলকাতায় ব্যবসায় করতেন। বাপের অসুখের সংবাদ শুনে গ্রামে এসেই ডাকলেন রাঘবপুরের গুপ্তকে। গুপ্ত এসে বললেন—তিনদিন, এক সপ্তাহ বা নবম দিনে মৃত্যু অনিবার্য।

ছেলে বললেন—আমি কলকাতায় নিয়ে যাব।

গুপ্ত বললেন—তাতে পথে মৃত্যু হবে। তিনদিন পরমায়ুও তাতে ক্ষয়িত হবে।

ছেলে এরপর রঙলাল ডাক্তারকে ডাকলেন, কবিরাজ হাত দেখে বললেন—। রূঢ়ভাষী রঙলাল ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন—ও বিদ্যেটা আমি বুঝি না, বিশ্বাসও করি না।

ছেলে বললেন—মানে উনি বলেছেন তিনদিন, এক সপ্তাহ বা নবম দিনে মৃত্যু অনিবার্য।

রঙলাল বললেন—সেও আমি বলতে পারব না। তবে ওর কাছে লিখে নিতে পারেন। মৃত্যু না হলে নালিশ করতে পারবেন। আমাকে লিখে দিলে আমি নালিশ করব।

ছেলে বললেন—এখন আমি চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই।

—তবে আমাকে কেন ডেকেছেন? নিয়েই যান।

—কবিরাজ বলেছেন—তাতে তিন দিনও বাঁচবেন না, পথেই ত্রিশূন্যে অর্থাৎ গাড়িতেই মারা যাবেন।

—তা পারেন। আবার নাও পারেন। আমি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। রোগ কঠিন। মরবেন

কি বাঁচবেন সে আমি জানি না।

রঙলাল ডাক্তার চলে গেলে অগত্যা তাঁরা জগৎ মশায়কে ডাকলেন।

জগৎ মশায় নাড়ী দেখে বলেছিলেন—সুচিকিৎসার জন্যে কলকাতা নিয়ে যাবেন, বাধা দেব না ; নিয়ে যান। চিন্তার কোনো কারণ নাই। আমি দায়ী রইলাম।

ছেলে বলেছিলেন—দেখুন, ভালো করে বুঝুন।

—না বুঝে কি এতবড় কথা বলতে পারি রায়চৌধুরীমশায় ? নিয়ে যান। আমার কথার অন্যথা হলে আমি দশের সম্মুখে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, চিকিৎসা আমি ছেড়ে দেব। আর—।

হেসে বলেছিলেন—আর এ যাত্রায় কর্তার রোগভোগ আছে, দেহরক্ষা নাই। অচিকিৎসা কুচিকিৎসা হলে তার কথা আলাদা। চিকিৎসা হলে বাঁচবেন। আপনি কলকাতায়ই নিয়ে যান।

তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। বরদাবাবুকে কলকাতা নিয়ে পৌঁছুতে কোনো বিঘ্ন ঘটে নাই এবং তিনি সেবার রোগমুক্ত হয়ে দেওঘরে শরীর সেরে বাড়ি ফিরেছিলেন।

বরদাবাবুর বাড়িতে তিনি কোনো দক্ষিণা গ্রহণ করেন নাই। বরদাবাবু বাড়ি ফিরে তাঁকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। দেওঘরের পেঁড়া, একটি ভালো গড়গড়া ও নল, কিছু ভালো তামাক আর একখানি বালাপোশ।

এই ঘটনার পরই জীবন তাঁকে বলেছিল—এবার ফীজ বাড়াতে হবে আপনাকে। চার টাকা ফীজ করুন।

জগৎমশায় তাতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু জীবন ছাড়ে নাই। বলেছিল—গরিব যারা তাদের বাড়ি আপনি বিনা ফীজে যাবেন। কিন্তু যে যা দেবে—এ করলে আপনার মর্যাদা থাকবে না।

এই সময়টিই দত্তমশায়দের বাড়ির সর্বোত্তম সুসময়।

জীবনের মা বলতেন, এসব আমার বউয়ের পয়।

আতর-বউ নিজেও তাই ভাবতেন।

সেকালে জীবন ডাক্তার রোগী দেখতে বের হবার সময় নিয়মিতভাবে আতর-বউ সামনে এসে দাঁড়াতেন। তাঁর মুখ দেখে যাত্রায় শুভ ফল অবশ্যম্ভাবী।

* * *

জগৎ মশায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দত্তমশায়দের খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠায় ভাঁটা পড়ল স্বাভাবিকভাবে।

অনেক বাঁধা ঘর—চার-পাঁচখানা গ্রাম তাঁকে ছেড়ে কামদেবপুরের মুখুজ্জে কবিরাজের এবং হরিহরপুরের পাঠক কবিরাজের কাছে গিয়ে পড়ল। ওদিকে নবগ্রামের বাবুরা নিয়ে এলেন একজন ডাক্তার। দুর্গাদাস কুণ্ডু। জীবন মশায় তখন শুধু জীবন দত্ত। মহাশয় তো সহজে লোকে বলে না। ওদিকে ডাক্তারির একটা সুবিধে আছে। বয়স যেমনই হোক, অভিজ্ঞতা থাক আর না-থাক—ডিগ্রি আছে ; ডিগ্রির জোরেই ডাক্তার খেতাব তাদের প্রতিষ্ঠিত।

জীবন দত্তের সুপ্ত কামনা এই দুঃসময়ের ঝড়ে ছাই-উড়ে-যাওয়া আগুনের মতো গনগনে হয়ে উঠল। তিনি ডাক্তার হবেন। সম্মুখে রঙলাল ডাক্তারের দৃষ্টান্ত। ওদিকে নবগ্রামে আরও একজন নতুন ডাক্তার এল। তাঁরই বন্ধু কৃষ্ণদাসবাবু, ওই কিশোর ছেলেটার বাপ, নতুন ডাক্তারকে আশ্রয় দিলেন। আরও শোনা গেল, নবগ্রামের নবীন ধনী ব্রজলালবাবু এখানে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি—অ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়—প্রতিষ্ঠা করছেন। তিনি গোপনে গোপনে আরম্ভ করে দিলেন। অনেক সন্ধান করে দুখানি বই আনালেন—ডাক্তারি শিক্ষা ও বাঙলা মেটিরিয়া মেডিকা। ইচ্ছা সত্ত্বেও রূঢ়ভাষী রঙলাল ডাক্তারের কাছে যেতে সাহস হল না।

মাস তিনেক পর হঠাৎ রঙলাল ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর দেখা হল, তাঁর সঙ্গে জীবনের যোগ-সূত্র রচিত হবার প্রথম গ্রন্থি পড়ল।

ওই কিশোর ছেলেটিকে তিনি এইজন্যই এত ভালোবাসেন। এই গ্রন্থিটি পড়েছিল তাকে উপলক্ষ্য করেই।

হঠাৎ একদিন শুনলেন, নবগ্রামের কৃষ্ণদাসবাবুর ছেলে কিশোরের বড় অসুখ। আজ দশ দিন একজ্বরী। দেখছিল ওই নবাগত হরিশ ডাক্তার, আজ মাসখানেক সে নবগ্রামে এসেছে। কৃষ্ণদাসবাবুই তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। পাশ-করা ডাক্তার—পাটনা ইস্কুল থেকে পাশ করে এসেছে। পসার না হওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণদাসবাবুই তার সকল ভার বহন করবেন বলেছেন। সে-ই দেখছিল—আজ রঙলাল ডাক্তার দেখতে আসবেন।

জীবন দত্ত বিস্মিত হলেন, শঙ্কিতও হলেন। নিজেকে একটা ধিক্কারও দিলেন। খবর রাখা উচিত ছিল। কৃষ্ণদাসবাবু তাঁর চেয়ে বয়সে বড় হলেও বন্ধু। এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেপালের পরমাত্মীয়—সম্বন্ধী। তা ছাড়া এই কিশোর ছেলেটিকে তিনি বড় ভালোবাসেন। এই নতুন ডাক্তারটি কৃষ্ণদাসবাবুর বাড়িতে আসবার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ চার মাস আগে পর্যন্তও তাঁরাই পুরুষানুক্রমে ওঁদের বাড়িতে চিকিৎসা করতে আসছিলেন। তাঁর তো একবার যাওয়া উচিত ছিল। চিকিৎসক হিসেবে না-ডাকতে যাওয়ায় মর্যাদায় বাধে, কিন্তু তার উপরেও যে একটা অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক আছে। কৃষ্ণদাসবাবুর সঙ্গে আছে, ওই কিশোর ছেলেটির সঙ্গেও আছে। ও পাড়ায় গেলেই তিনি কিশোরের খোঁজ করে দু-চারটি কথা বলে আসেন। ছ-সাত বছরের এই শ্যামবর্ণ ছেলেটি আশ্চর্য রকমের দীপ্তিমান। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং রসবোধে সরস বুদ্ধি।

এই তো সেদিন।

নেপালের বাড়ি থেকে তিনি নেপালকে সঙ্গে নিয়েই বের হচ্ছিলেন। পথে যাচ্ছিল কিশোর। দুপুরবেলা শ্যালক-পুত্রকে একা দেখে পাগলা নেপালের কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। কিশোরের গতিপথ দেখে যে-কেউ বুঝতে পারত যে, সে নিজেদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছে; পাগলা নেপাল সেই হিসেবে অকারণেই প্রশ্ন করলে—কোথায় যাবি? আমাদের বাড়ি?

—না।

—তবে? দুপুরবেলা যাবি কোথায়?

কিশোর উত্তর দিয়েছিল—যাব তোমার শ্বশুরবাড়ি।

নেপাল বুঝতে পারে নাই রসিকতাটুকু। জীবন হা-হা করে হেসেছিলেন।

জীবন ডাক্তার নিজেও অপ্রতিভ হয়েছেন তার কাছে। এই তো মাস কয়েক আগে। তখনও চিকিৎসা করতেন ওদের বাড়িতে। কিশোরেরই জ্বর হয়েছিল। নাড়ীতে দেখলেন অন্নদোষ। কৃষ্ণদাসবাবুর ভগ্নী বললেন—এই জ্বর অবস্থাতেও কাল খোয়া-ক্ষীর চুরি করে খেয়েছে। অন্নদোষের আর দোষ কী?

জীবন ডাক্তার বলেছিলেন—অ্যাঁ? তুমি চুরি করে খেয়েছ?

কিশোর অপ্রস্তুত হয় নি। বলেছিল—হ্যাঁ।

—জান, চুরি করে খেলে পাপ হয়?

কিশোর ঘাড় নেড়ে বলেছিল—হয়। কিন্তু খোয়া-ক্ষীর খেলে হয় না।

জীবন ডাক্তার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন—কে বলেছে তোমাকে?

কিশোর বলেছিল—ভাগবতে শুনেছি। কৃষ্ণ নিজে খোয়া-ক্ষীর, ননী, মাখন চুরি করে খেতেন। তবে কেন পাপ হবে?

জীবন ডাক্তারকে হার মানতে হয়েছিল। অতঃপর চিকিৎসা-শাস্ত্রতত্ত্ব বোঝাতে হয়েছিল। ছেলেটি মন দিয়ে শুনেছিল এবং শেষে বলেছিল—আচ্ছা আর বেশী খাব না। কম করে খাব।

এর পর জীবন ডাক্তার কিশোরকে দেখলেই পুরাণ-সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। কিশোর প্রায়ই উত্তর দিয়েছে এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছে। রাবণের কটা মাথা কটা হাত জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল—দশটা মাথা কুড়িটা হাত। জানেন, রাবণ কখনও ঘুমোত না।

—কেন?

—শুয়ে পাশ ফিরবে কী করে?

এইভাবে ছেলেটির সঙ্গে একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতা জমে উঠেছিল। তার অসুখ—বেশী অসুখ, রঙলালবাবুর মতো ডাক্তার আসছেন—জীবন ডাক্তার আর থাকতে পারলেন না। তিনি নিজেই এলেন কৃষ্ণদাসবাবুর বাড়ি। কৃষ্ণদাস অপ্রস্তুত হলেন কিন্তু জীবন স্মিতহাস্যে বললেন—কিছু না কৃষ্ণদাস দাদা, আপনারা ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ হলেও তো আমি আপনার ভাই। খুড়ো হিসেবে দেখতে এসেছি। চলুন, কিশোরকে একবার দেখব।

কিশোর প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল। গলায় মৃদু সর্দির শব্দ উঠছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। দু-চারটি ভুলও বকছে। ভাদ্র মাসে গরম কাপড় দিয়ে তাকে প্রায় মুড়ে রাখা হয়েছে। নতুন ডাক্তার বললেন—বুকে সর্দির দোষ রয়েছে; জ্বর উঠেছে এক শো তিন। নিউমোনিয়া এতদিন পূর্ণমাত্রায় দেখা দিত, কিন্তু আমি গোড়া থেকেই বেঁধেছি। তবু যে কেন জ্বর কমছে না—বুঝছি না।

জীবন ডাক্তার দুটি হাতের নাড়ী দীর্ঘক্ষণ ধরে মনঃসংযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলেন। জিভ চোখ দেখলেন, পেট টিপে পরীক্ষা করলেন। তারপর উঠে হাত ধুয়ে কৃষ্ণদাসবাবুর কাছে

বসে বললেন—একুশ দিন বা চব্বিশ দিনে জ্বরত্যাগ হবে কৃষ্ণদাস দাদা। ভয়ের কোন কারণ নাই, তবে জ্বরটা একটু বাঁকা। আগন্তুক জ্বর, সান্নিপাতিক-দোষযুক্ত; তবে প্রবল নয়; মারাত্মকও নয়। শ্লেষ্মা দোষ—ডাক্তারবাবু যেটা বলছেন—

হরিশ ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললেন—ওটা আনুষঙ্গিক, আসল ব্যাধি ওটা নয়।

হরিশ ডাক্তার প্রায় তাঁর সমবয়সী; জীবন দত্তের থেকে বছর চার-পাঁচের ছোট। কর্মজীবনে এটা খুব পার্থক্যের বয়স নয়। প্রীতির সঙ্গেই বলেছিলেন। কিন্তু পাশ-করা হরিশ ডাক্তার বলেছিল—নাঃ। আমি স্টেথোসকোপ দিয়ে দেখেছি। সর্দির দোষটাই মূল দোষ। আর সান্নিপাতিক মানে টাইফয়েডের কথা যা বলছেন—ওটা আমার মতে ঠিক নয়।

জীবন দত্ত ধ্যানস্থের মতো নাড়ী ধরে অনুভব করেছেন, যা বুঝেছেন তা ভুল হতে পারে না। তিনি মৃদু হাসির সঙ্গে ঘাড় নেড়েছিলেন। ঠিক এই সময়েই বাইরে পালকির বেহারাদের হাঁক শোনা গিয়েছিল।

হরিশ ডাক্তার ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল—ওই, উনি এসে গিয়েছেন।

জীবন দত্তও বাইরে যাবার জন্য উদ্যত হলেন, হঠাৎ নজরে পড়ল কিশোরের শিয়রে বসে অবগুণ্ঠনবতী তার মা। জীবন দত্ত গভীর বিশ্বাসে আশ্বাস দিয়ে আবার বলেছিলেন—কোনো ভয় নাই। যে যা বলবে বলুক মা, একুশ দিন বা চব্বিশ দিনে জ্বর ছেড়ে যাবে, ছেলে সেরে উঠবে।

রঙলাল ডাক্তারের সঙ্গেও সংঘর্ষ বাধল—এই একুশ দিন, চব্বিশ দিন নিয়ে।

রঙলাল ডাক্তার রোগী দেখলেন।

প্রথমেই বললেন—বাজে লোক—বেশী লোক ঘরে থাকা আমি পছন্দ করি না। যে ডাক্তার দেখছে আর রোগীর যে সেবা করছে, আর এক-আধজন।

জীবন দত্তও বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণদাসবাবু বললেন—তুমি থাকো জীবন।

উনি তাঁর হাত ধরলেন। জীবনমশায়ের মনে আছে—ভীত কৃষ্ণদাসবাবুর হাত ঘামছিল; জীবন দত্ত মৃদু স্বরে সাহস দিয়ে বলেছিলেন—ভয় কী?

রোগী দেখে রঙলাল ডাক্তার কিছু বললেন না। প্রেসক্রিপশন চাইলেন। পড়ে দেখলেন। সেগুলি ফিরিয়ে দিয়ে নিজে প্রেসক্রিপশন লিখে হরিশ ডাক্তারের হাতে দিলেন, বললেন—ও সব পালটে এই দিলাম। পথ্য—বার্লি, ছানার জল, বেদানার রস চলতে পরে। কোনো শক্ত জিনিস নয়। ছেলের টাইফয়েড হয়েছে।

হরিশ ডাক্তারের মুখ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জীবন দত্তের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়েছিল—এ জীবনমশায়ের মনে আছে। জীবন দত্ত কিন্তু হরিশ ডাক্তারের মুখের দিকে তাকান নি। ছিঃ। অপ্রস্তুত হবেন উনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রঙলাল ডাক্তার হরিশকে ভালো করে সব বুঝিয়ে দিলেন।

জীবন দত্তের কবিরাজী পদ্ধতির সঙ্গে তাতে কয়েকটিতে গরমিল ছিল। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর অধিকার কী? তারপর রঙলাল ডাক্তার ওষুধ তৈরি করতে বললেন।

ওইটি ছিল তাঁর একটি বিশেষত্ব। নিজের কলবাক্স থেকে ওষুধ তৈরি করে দিতেন। অন্য কোনো ডাক্তারের কি ডাক্তারখানায় তৈরি ওষুধ তিনি রোগীকে খেতে দিতেন না। এমন কি হঠাৎ যে বিপদ বা পরিবর্তন আসতে পারে, তাও ওষুধ তৈরি করে দিয়ে বলতেন—এই রকম হলে এই দেবে। এই রকম হলে এটা। এক-একদিন পর অবস্থা লিখে লোক পাঠাবে আমার কাছে। তবে যে ডাক্তার দেখছে, তার কাছে গোপন রাখতেন না কিছু। বিশ্বাসের পাত্র হলে তারপর তাকে দিতেন প্রেসক্রিপশন—সে ওষুধ তৈরি করে দিত। বলতেন—বিষ মিশিয়ে রোগীর অনিষ্ট করবে না, সে আমি জানি; বিষের দাম আছে। আমার সই-করা প্রেসক্রিপশন আছে—আমাকে দায়ী করতে পারবে না। কিন্তু জোলো দেশে জলের দাম লাগে না, ওষুধের বদলে জল দিলে কী করব? ছটা ওষুধের তিনটে না দিলে কী করব? পচা পুরনো দিলে কী করব? আমার বদনাম হবে।

ঠিক এই সময়। ওষুধের শিশি দুটি ঝাঁকি দিয়ে একবার নিজে ভালো করে তার রঙ এবং চেহারাটা দেখে হরিশ ডাক্তারের হাতে দিলেন—দু রকম ওষুধ থাকল। এইটাই এখন চলবে। যদি ভুল বকে বা জ্বর বাড়ে—জ্বর বাড়লেই ভুল বকবে, ভুল বকলেই জানবে জ্বর বেড়েছে, তখন এইটে দেবে। বুঝেছ? আর ওই লেপকাঁথাগুলো খুলে দাও। অত চাপা দিয়েই তো বাচ্চাটাকে খতম করবে। এমন করে জানালা-দরজা বন্ধ কোরো না। আলো-বাতাস আসতে দাও। বুঝেছ?

উঠলেন তিনি।

কৃষ্ণদাসবাবু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—রোগ কি টাইফয়েড?

—হ্যাঁ, কঠিন রোগ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে-ই জিজ্ঞাসা করছি।

—বাঁচা-মরা ঈশ্বরের হাত, সে আমি বলতে পারি না।

কৃষ্ণদাসও সাহসী লোক দিলেন—তিনি মুখে মুখে জবাব দিতে পটু ছিলেন। বলেছিলেন, সে কথা আপনি কেন, আমরাও বলতে পারতাম। আপনার দেখে কেমন মনে হল? টাইফয়েড সান্নিপাতিক হলেই তো অসাধ্য হয় না। রোগেরও প্রকার-ভেদ আছে। মৃদু, মধ্যম—কঠিন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে রঙলাল বলেছিলেন—আপনিই তো কৃষ্ণদাসবাবু? ছেলের বাবা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রোগ মধ্যম রকমের বলশালী। তবে কঠিন হতে কতক্ষণ! উপযুক্ত সেবা, নিয়মিত ওষুধ—এ না হলে রোগ বাড়তে পারে। এ রোগে সেবাটাই বড়।

—তার জন্যে দায়ী আমরা। এ রোগ সারতে কতদিন লাগবে?

—সে কী করে বলব আমি? সে আমি জানি না।

জীবন কবিরাজের এতটা অসহ্য মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, কৃষ্ণদাস দাদা, বাইশ

থেকে চব্বিশ দিনের মধ্যে আপনার ছেলের জ্বর ত্যাগ হবে, আপনি উতলা হবেন না।

হেঁট হয়ে কল-বাক্সে ওষুধ গুছিয়ে রাখছিলেন রঙলাল ডাক্তার—তিনি খোঁচা-খাওয়া প্রবীণ গোক্ষুর সাপের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে ডাকলেন।

—আপনি কে? গণক?

—না। উনি আমাদের এখানকার কবিরাজ। জগদ্বন্ধু মশায়ের নাম বোধ হয় জানেন।

—নিশ্চয় জানি। বিচক্ষণ কবিরাজ ছিলেন তিনি। রোগনির্ণয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। এখানকার বরদাবাবুর কথা মনে আছে আমার।

—উনি তাঁরই ছেলে। জীবন দত্ত।

রঙলাল আবার একবার তাকালেন জীবন দত্তের দিকে, বললেন, বাইশ থেকে চব্বিশ দিন কী থেকে বুঝলে? নাড়ী দেখে?

—হ্যাঁ, নাড়ী দেখে তাই আমার অনুমান হয়। জ্বর চব্বিশ দিনে ছাড়বার কথা। তিন অষ্টাহ। তবে প্রায়ই আমাদের দেশে এ রোগে প্রথম একটা-দুটো দিন গা ছ্যাঁক-ছ্যাঁকের শামিল হয়ে ছুট হয়ে যায়। সেই কারণেই বলেছি—বাইশ থেকে চব্বিশ দিন।

—তোমার সাহস আছে। অল্প বয়স—তাজা রক্ত। হেসেছিলেন রঙলাল ডাক্তার। তোমাদের বংশের নাড়ীজ্ঞানের প্রশংসা শুনেছি, বরদাবাবুর বেলা দেখেছিও। কিন্তু ওটা তো আমাদের শাস্ত্রের বাইরে।

ঠিক চব্বিশ দিনেই কিশোরের জ্বর ছেড়েছিল।

কৃষ্ণদাসবাবু জীবন দত্তকে ডেকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। রঙলাল ডাক্তারের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন—'আজ চব্বিশ দিনেই জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। ইহার পর ঔষধ এবং নির্দেশ দিলে সুখী হইব। আসিবার প্রয়োজন বোধ করিলে কখন আসিবেন জানাইবেন।'

রঙলাল ডাক্তার আর আসেন নি। শুধু নির্দেশ এবং ওষুধ পাঠিয়েছিলেন। তার সঙ্গে লিখেছিলেন, জগদ্বন্ধু মশায়ের ছেলেটিকে আমার আশীর্বাদ দিবেন।

জীবন দত্ত উৎসাহিত হয়ে চার মাইল পথ হেঁটে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন।

বহ্নিগর্ভ দুটি শমীবৃক্ষ পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবামাত্র দুজনের ভিতরের বহ্নিই উৎসুক হয়ে উঠল।

* *

সেই রঙলাল ডাক্তার তাঁর পিঠে সেদিন হাত বুলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। সে হাতের স্পর্শের মধ্যে জীবন দত্ত স্নেহ অনুভব করেছিলেন। সে এক বিস্ময়। তান্ত্রিক শবসাধকের মতো মানুষ রঙলাল ডাক্তার। বামাচারীর মতো কোনো আচার-নিয়ম মানেন না, কঠিন রূঢ় প্রকৃতি, নিষ্ঠুর ভাষা, ময়ূরাক্ষীর জলে ভেসে-যাওয়া মড়া টেনে নিয়ে ফালি ফালি করে চিরে দেখেন; কবর থেকে মড়া টেনে তোলেন, মায়ের কোলে সন্তানকে মরতে দেখেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, পৃথিবীর কারও কাছে মাথা হেঁট করেন না। এই মানুষটিকে

এই তন্ত্রপ্রধান অঞ্চলের লোকে বলত, আসলে রঙলাল ডাক্তার হলেন প্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক। বামাচারী।

কেউ কেউ বলত নাস্তিক্যবাদী পাথর।

রঙলাল ডাক্তার তাঁকে প্রথম কথাই বলেছিলেন—তুমি যদি ডাক্তারি পড়তে হে! বড় ভালো করতে। তোমার মধ্যে একজন জাত চিকিৎসক রয়েছে। কবিরাজি শাস্ত্রে কিছু নেই এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু আমাদের জাতের মতো শাস্ত্রটিও কালের সঙ্গে আর এগোয় নি। যে কালে এ শাস্ত্রের সৃষ্টি— চরম উন্নতি—সে কালে কেমিস্ট্রির এত উন্নতি ছিল না। তা ছাড়া আরও অনেক কিছু আবিষ্কার হয় নি। তারপর ধরো, কত দেশ থেকে কত মানুষ আমাদের দেশে এসেছে। তাদের সঙ্গে তাদের দেশের রোগ এ দেশে এসেছে—জল বাতাস মাটির পার্থক্যে বিচিত্র চেহারা নিয়েছে। তা ছাড়া আয়ুর্বেদ আগন্তুজ ব্যাধি বলে যেখানে থেমেছে, ইউরোপের চিকিৎসা-বিদ্যা মাইক্রোসকোপের কল্যাণে জীবাণু আবিষ্কার করে অনুমান ও উপসর্গের সীমানা ছাড়িয়ে চলে এসেছে বহুদূরে এগিয়ে।

আধুনিক কালের রোগ-চিকিৎসা নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। জীবন দত্ত তন্ময় হয়ে শুনেছিলেন। বার বার মনে পড়েছিল নিজের বাপ এবং মহাগুরু জগৎ মশায়কে। পার্থক্যের মধ্যে জগৎ মশায় শিক্ষার মধ্যে বার বার উল্লেখ করতেন অদৃষ্টের, নিয়তির, ভগবানের; এবং সমস্ত বক্তব্যই যেন রোগবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্য একটি ভাব-ব্যাখ্যা-জড়িত বলে মনে হত, যেন, কথার অর্থ ছাড়াও একটি ভাব থাকত; রঙলাল ডাক্তারের বক্তব্যের মধ্যে ঈশ্বর ছিল না, অদৃষ্ট ছিল না এবং সমস্ত বক্তব্য ছিল শুষ্ক, কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য, কথার মানে ছাড়া কোনো ভাববাষ্পের অস্তিত্ব ছিল না। রঙলাল ডাক্তার বলতেন—মানুষ মরে গেলে আমরা আর কোনো দিকে তাকাই না। বুঝেছ, ওই দেহপিঞ্জর করি ভঙ্গ প্রাণ-বিহঙ্গ কেমন করে ফুড়ুত করে উড়লেন—সে দেখতে আমরা চেষ্টা করি না। মধ্যে মধ্যে হেসে বলতেন—আরে, প্রাণ যদি বিহঙ্গ হয় তবে নিশ্চয় বন্দুকধারী শিকারীও আছে, তারা নিশ্চয় পক্ষিমাংস ভক্ষণ তা হলেই তো পুনর্জন্ম খতম।

সেই দিনই জীবন সুযোগ বুঝে বলেছিলেন, আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমাকে যদি দয়া করে ডাক্তারি শেখান!

—তুমি ডাক্তারি শিখবে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন রঙলালবাবু। অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা। বিস্ময়, প্রশ্ন অনেক কিছু তার মধ্যে ছিল। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, কবিরাজি ভালো চলছে না?

হেসে জীবন দত্ত বলেছিলেন, লেখাপড়াজানা বাবুদের সমাজে কবিরাজির চলন কম হয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ভালো চলে।

—তবে?

—আমার ছেলেবেলা থেকেই ডাক্তারি পড়বার ইচ্ছা ছিল কিন্তু—। জীবন দত্ত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন।

—তবে পড় নি কেন? তোমার বাবার তো অবস্থা ভালো ছিল।

জীবন দত্ত ম্লান হেসে বলেছিলেন—আমরা ভাগ্য মানি, তাই বলছি আমার ভাগ্য। আর কী বলব? নইলে বাল্যকাল থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল আমি ডাক্তারি পড়ব। কিন্তু—

—তোমার বাবা দেন নি পড়তে?

—আজ্ঞে না। অপরাধ আমার।

মঞ্জরীর কথাটা বাদ রেখে ভূপী বোসের সঙ্গে মারামারির কথা বলে বললেন—গ্রামে ফিরলাম—বাবা বললেন, আর না। আর তোমাকে বিদেশে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না। কৌলিক বিদ্যায় তুমি দীক্ষা গ্রহণ করো।

কথাটা শুনে ন্যাড়া পাহাড়ের মতো মানুষ রঙলাল ডাক্তার অকস্মাৎ হা-হা-হা শব্দে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন কৌতুকে; যেন তৃণপাদপহীন কালো পাথরে গড়া পাহাড়টা এই কাহিনী শুনে কৌতুকে ফেটে গেল এবং ভিতর থেকে ঝরঝর শব্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বের হল ঝরনার ফোয়ারা। এমনভাবে রঙলাল ডাক্তারকে হাসতে বড় কেউ একটা দেখে নি।

বেশ খানিকক্ষণ হেসে বললেন—সেই ভূপী বোস ছেলেটার সুডৌল নাকটা এমন করে তুমিই ভেঙে দিয়েছ? আরে, তাকে যে আমি দেখেছি। চিকিৎসা করেছি। তার শ্বশুর নিজের বাড়িতে এনেছিল চিকিৎসা করাতে, সংশোধন করতে। অপরিমিত মদ্যপান করে লিভারের অসুখ। আমাকে ডেকেছিল। ছোকরার মাকাল ফলের মতো টুকটুকে চেহারায় পোকাধরার কালো দাগের মতো নাকে ওই খুঁত।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন রঙলালবাবু, বললেন—আমি কিন্তু সন্দেহ করেছিলাম, ওটা হয়েছে সিফিলিস থেকে। বড়লোকের ছেলে—দুর্দান্ত মাতাল! সন্দেহ হওয়ারই কথা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম। কিছুতেই স্বীকার করে না। তারপর স্বীকার করলে। যা এদেশের লোকের স্বভাব! উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রঙলাল ডাক্তার—হাতের চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন—অদ্ভুত, এ দেশটাই অদ্ভুত! লজ্জায় রোগ লুকিয়ে রাখবে, বংশাবলীকে রোগগ্রস্ত করে যাবে! নিজে ভুগবে। কিছুতেই বুঝবে না তুই দেবতা নোস। তুই রক্তমাংসের মানুষ। ক্ষুধার দাস, লোভের দাস, কামের দাস!

উঠে দাঁড়ালেন রঙলাল ডাক্তার, বললেন—সেই শুয়ারটা কী বলেছিল জান? বলেছিল, কী করে হল তা জানি না। আমার স্ত্রী ছাড়া আর কারও সংস্রবে তো আমি কখনও আসি নি। আমি আর থাকতে পারি নি। প্রচণ্ড এক চড় তুলে বলেছিলাম—মারব এক চড় উল্লুক!

কিছুক্ষণ পায়চারি করে শান্ত হয়ে রঙলাল ডাক্তার এসে বসেছিলেন তাঁর আসনে। চুরুট ধরিয়ে দুটো টান দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, ওটা তাহলে তোমার ওই মুদ্গরসদৃশ হস্তের মুষ্ট্যাঘাতের চিহ্ন? তুমি তো ভয়ানক লোক। তবে ভূপী বোসের বন্ধুর কাজ করেছ। ওই চিহ্ন থেকে ওর ওই পাপ রোগটাকে ধরার সুযোগ করে দিয়েছ।

তারপর রঙলাল ডাক্তার বলেছিলেন—হ্যাঁ, তোমাকে আমি শেখাব, যতটা পার নিয়ে

নাও তুমি আমার কাছ থেকে। কী? কী ভাবছ তুমি?

সেদিন তখন জীবন দত্ত ভাবছিলেন—ভূপী বোসের কথা, মঞ্জরীর কথা। যতক্ষণ রঙলাল ভূপী বোসের কথা বলছিলেন জীবন দত্ত অবশ্য চিন্তাশক্তিহীন মানুষের মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রঙলালবাবু তাঁকে ডাক্তারি-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কথা শেষ করলেন, জীবন দত্ত তার উত্তরে কিন্তু প্রশ্ন করলেন—ভূপীর লিভারের দোষ হয়েছে? সেরেছে?

রঙলাল ডাক্তার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভূপীর জন্যে যেন তোমার মমতা রয়েছে জীবন?

জীবন এবার সচেতন হয়ে উঠলেন; লজ্জিত হলেন।

রঙলাল বললেন—তোমরা তো বৈষ্ণব?

—হ্যাঁ।

—তাই। তারপর বললেন—ভূপীর অসুখ আপাতত সেরেছে। আবার হবে। ওটা বাঁচবে না বেশীদিন। ওতেই মরবে। যোগাযোগ যে ভারি বিচিত্র। ছোকরার স্ত্রী, এক ধরনের মা আছে দেখেছ, রোগা ছেলেকে খেতে দেয় লুকিয়ে, ঠিক সেই রকম। ডাক্তার বারণ করেছে, ভূপী মদের জন্য ছটফট করছে, স্ত্রী গোপনে লোককে বকশিশ দিয়ে মদ আনিয়ে স্বামীকে দিচ্ছে, বলে—বেশী খেয়ো না, একটু খাও। আশ্চর্যের কথা হে, নিজের গহনা বিক্রি করে করছে। অদ্ভুত! পুরাণে আছে সতী স্ত্রী মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বামীকে বাঁচায়। আর এ মেয়েটা ভালোবাসায় তো তাদের চেয়ে খাটো নয়, কিন্তু এ মৃত্যুকে ডেকে এনে স্বামীকে তার হাতে তুলে দেয়। অদ্ভুত!

এর পর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন জীবন ডাক্তার। স্থান, কাল, পাত্র সব তিনি ভুলে গেলেন, মুছে গেল চোখের সম্মুখ থেকে। অর্থহীন একাকার হয়ে গেল। রঙলাল ডাক্তার সচেতন করে তুললেন জীবন দত্তকে। বললেন—ছেড়ে দাও ওই পচা ধনীর ছেলেটার কথা। ওসব হল মানুষের নিজের পাপের সৃষ্টির অপব্যয়। এখন শোনো যা বলছি। শিখবে তুমি ডাক্তারি? আমার মতো কঠিন নয় তোমার পক্ষে। তুমি চিকিৎসা জান—রোগ চেন। তোমার পক্ষে অনেক সহজ হবে। আমি এদেশের জন্যে অনুবাদ করেছি ওদের চিকিৎসাশাস্ত্র। পড়ে ফেললেই তুমি পারবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব। শেখাব। পড়াব।

এবার জীবন দত্তের কান এড়াল না। মুহূর্তে তাঁর সব উদাস অবসন্নতা দূর হয়ে গেল। আগুন জ্বলে উঠল জীবনে।

মঞ্জরী আর ভূপী বোস একদিন মেঘ আর বাতাসের মতো মিলে তার জীবনের সদ্য-প্রজ্বলিত বহ্নির উপর দুর্যোগের বর্ষণ ঢেলে নিভিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বনস্পতির কাণ্ড থেকে শাখাগ্র পর্যন্ত প্রসুপ্ত বহ্নির ধারা নেভে নি। সে জ্বলল। ভুলে গেলেন মঞ্জরীকে—ভূপীকে। আতর-বউকেও মনে রইল না সে মুহূর্তে। সেদিন সামনে ছিলেন রঙলাল ডাক্তার। হাতে ছিল—মোটা বাঁধানো খাতা—চোখের সামনে ছিল ভবিষ্যৎ। উজ্জ্বল, দীপ্ত।

চৌদ্দ

এর পর চার বৎসর—জীবন দত্তের জীবনের বোধ করি উদয়লগ্ন।

নতুন জন্মান্তর। অথবা নতুন জন্মলাভের তপস্যা।

রঙলাল ডাক্তার মধ্যে মধ্যে রহস্য করতেন। একবার বলেছিলেন—তাই তো হে জীবন; মনে বড় আক্ষেপ হচ্ছে। মনে হচ্ছে বিবাহ একটা করলাম না কেন?

এ ধরনের কথা হত রাত্রে। বারান্দায় বসে নিয়মিত পরিমাণ ব্রাণ্ডি খেতেন আর চুরুট টানতেন। জীবন দত্ত থাকলে তাঁর সঙ্গে গল্প করতেন, নইলে বই পড়তেন, কোনো কোনো দিন মনা হাড়িকে ডেকে তার সঙ্গেই গল্প করতেন। তিনি গল্প বলতেন না, গল্প বলত মনা, তিনি শুনতেন। ভূতের গল্প, তিনি শুনতেন আর মধ্যে মধ্যে অট্টহাস্যে ফেটে পড়তেন।

জীবন দত্তকে তাঁর খাতাপত্র দিয়েছিলেন—দত্ত সে-সবগুলি পড়তেন নিজের বাড়িতে, যথারীতি কবিরাজী পদ্ধতিতে চিকিৎসাও করে বেড়াতেন; দু-চারদিন অন্তর সকালের কাজ সেরে খাওয়া-দাওয়া করে চলে যেতেন রঙলাল ডাক্তারের ওখানে। যা বুঝতে পারতেন না বুঝিয়ে নিতেন। যে অংশটুকু পড়ছেন তাই বলে যেতেন, ডাক্তার শুনতেন। এই অবস্থাতেই কোনো কোনো দিন আসন্নমৃত্যু রোগীর বাড়ির অবিলম্ব আহ্বান জানিয়ে ডাক আসত; ডাক্তার বিবরণ শুনে কোনোটাতে যেতেন না; যেটাতে যেতেন—জীবন দত্ত সঙ্গে যেতেন। গুরু যেতেন পালকিতে, জীবন দত্ত যেতেন হেঁটে। সবল সুস্থ দেহ—আটত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, ওজন দু' মণের উপর, বিরাট মুগুরভাঁজা শক্ত শরীর—জীবন দত্ত জোয়ান হাতির মতোই ভারী পা ফেলে সমানে বেহারাদের সঙ্গে চলে যেতেন।

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই জীবন দেখলেন এ বিদ্যা আয়ত্ত করা তাঁর বুঝি সাধ্যাতীত। তিনি পিছিয়ে গেলেন। গুরুশিষ্যের মধ্যে গুরুর মনে বিরক্তির সুর বেজে উঠল। কদিন থেকেই রঙলাল ডাক্তার জীবন দত্তকে তাঁর সেই কাচের ঘরে মড়া কাটার জন্য বলছিলেন। জীবন দত্ত প্রথম দিন মড়া কেটেছিলেন কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় রাত্রে খাওয়ার পর বমি করে ফেলেছিলেন। তারপর দিন পাঁচেক আর গুরুগৃহের দিকে পা বাড়ান নাই। ছ'দিনের দিন ভেবেছিলেন—সেই পচা মড়াটা নিশ্চয় ডাক্তার ফেলে দিয়েছেন। সেদিন যাওয়া মাত্র তিরস্কার করেছিলেন গুরু। এবং মনাকে হুকুম করেছিলেন—আর একটা নিয়ে আয় মনা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মনা একটা বছর পাঁচেকের মেয়ের শব এনে হাজির করেছিল। এ অঞ্চলে হিন্দুরাও পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শব দাহ করে না, মাটিতে পুঁতে দেয়। সেদিন জীবন দত্ত হাতজোড় করে বলেছিলেন—ও আমি পারব না। ওই শিশুর দেহের উপর—ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন—বিশ্বাস করুন, আমার মেয়েটা ঠিক এমনি দেখতে। ঠিক এমনি। এমনি চুল, এমনি গড়ন!

রঙলাল ডাক্তার তাঁর দিকে যে চোখ তুলেছিলেন সে চোখ উগ্রতায় বিস্ফারিত। কিন্তু দেখতে দেখতে কোমল হয়ে এসেছিল। বলেছিলেন—আচ্ছা থাক। তুমি বাংলোয় গিয়ে

বোসো—এটাকে আমি ডিসেকশন করে যাই। মনে হচ্ছে—অত্যন্ত হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। রোগের কোনো চিহ্ন নেই।

সত্যই মেয়েটি দেখতে অনেকটা জীবন ডাক্তারের প্রথম সন্তান সুষমার মতো। আতর-বউয়ের তখন দুটি সন্তান হয়েছে, বড়টি মেয়ে সুষমা, তারপর ছেলে বনবিহারী।

জীবন দত্ত কাচের ঘর থেকে বেরিয়ে আর অপেক্ষা করেন নাই, বাড়ি চলে এসেছিলেন। গুরুর মনে বিরক্তির সুর বেজে উঠেছিল এই কারণে।

কয়েক দিন পর জীবন দত্ত যেতেই গুরু সেই কথাই বলেছিলেন, বোসো। কয়েকটা কথা বলব তোমাকে। জীবন শঙ্কিত হয়ে বসে ছিলেন। ডাক্তার চুরুট টেনে চলেছিলেন। কিছুক্ষণ পর চুরুটটা নামিয়ে রেখে বলেছিলেন—জীবন, তোমাকে যেমনটি গড়ে তুলব ভেবেছিলাম—তা হল না। তোমার মধ্যে সে শক্তি নাই। তা ছাড়া ইংরেজী ভালো না জানলে এ শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভও অসম্ভব। ভেবেছিলাম—আমি তোমার সে অভাব পূরণ করে দেব। কিন্তু সেও দেখছি সহজ নয়। আমার বিরক্তি লাগে এবং তোমার পক্ষেও এ বিদ্যার শিক্ষা-পদ্ধতির একটা বড় অংশ অত্যন্ত অরুচিকর। সে অরুচি কাটানো তোমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

ডাক্তার চুপ করে গেলেন।

আবার বলেছিলেন—তোমার বাবা তোমার ধাতুকে পুড়িয়ে পিটিয়ে শক্ত করে গড়ে গিয়েছেন—তাকে নতুন করে না গালিয়ে আর নতুন কিছু করা যাবে না। তলোয়ার আর খড়্গ দুটোই অস্ত্র, কিন্তু প্রভেদ আছে। তলোয়ার দিয়ে মহিষ বলি হয় না, আর খাঁড়া দিয়ে এ যুগের যুদ্ধ হয় না। বুঝেছ?

ঠিক এই মুহূর্তেই এল একটি ডাক। এ অঞ্চলের একটি নামকরা বাড়ি থেকে ডাক। বাড়িটির সঙ্গে রঙলাল ডাক্তারের প্রথম চিকিৎসার কাল থেকেই কারবার চলে আসছে। তারও চেয়ে যেন কিছু বেশী। একটি প্রীতির সম্পর্কও বোধ করি আছে। এ দেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে রঙলাল ডাক্তারের একটা অবজ্ঞা আছে। কিন্তু এ বাড়ি সম্পর্কে ঠিক অবজ্ঞা নাই। বাড়ির গৃহিণীর কঠিন অসুখ। মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রোগ মারাত্মক হয়ে উঠেছে। মহিলাটি আগে থেকেই অম্বলের ব্যাধির রোগিণী। তিনি আজই ঘণ্টা দুয়েক আগে পায়ে হোঁচট লেগে বাড়ির উঠানে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এই অবস্থা। ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছেন। নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। কথাও প্রায় বলতে পারছেন না। চোয়াল পড়ে গিয়েছে।

রঙলাল ডাক্তার বিস্মিত হলেন, কতক্ষণ আগে পড়ে গেছেন বলছ?

—এই ঘণ্টা দুয়েক।

—মাত্র দু ঘণ্টা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাই তো। এত শিগ্‌গির? মনা, বেহারাদের ডাক।

জীবন ডাক্তারও নীরবে গুরুর অনুসরণ করছিলেন।

রঙলাল ডাক্তার প্রথমটা লক্ষ্য করেন নাই ; মধ্যপথে জীবনকে দেখেছিলেন, বলেছিলেন, তুমিও আসছ ? এটা বোধ হয় ইচ্ছা ছিল না তাঁর। সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার জন্যই কথা শুরু করেছিলেন। কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই এই ডাকটি এসে পড়েছিল।

আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে সে ছবি।

বর্ধিষ্ণু ঘর, রাঢ় অঞ্চলের মনোরম মাটির কোঠা অর্থাৎ দোতলা, প্রশস্ত, পাকা মেঝে, চুনকাম করা দেয়াল। উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল—সে আমলের শৌখীন শেড-দেওয়া চব্বিশ-বাতি টেবিল ল্যাম্প!

অনেকগুলি লোক আত্মীয়-স্বজন—দূরে বসে রয়েছে।

একটি বিছানায় রোগিণী ছিলায়-টান-দেওয়া ধনুকের মত বাঁকা অবস্থায় পড়ে আছেন। এর উপরেও কেউ যেন টান দিচ্ছে ; অদৃশ্য কেউ যেন মেরুদণ্ডে হাঁটু লাগিয়ে সবল বাহুর আকর্ষণে টঙ্কার দিয়ে টানছে। রোগিণীর ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ। চোয়াল পড়ে গিয়েছিল এ কথা সত্য, কিন্তু তবু জীবন দত্ত বুঝতে পারলেন—অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে ওই ক্ষীণকায়া মেয়েটি এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছেন। শুধু ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যন্ত্রণার পরিচয় বেরিয়ে আসছে। তার সঙ্গে একটু শব্দ। সেটুকুকে আর চাপতে পারছেন না ভদ্রমহিলা।

রঙলাল ডাক্তারও স্থির দৃষ্টিতে রোগিণীকে দেখছিলেন। বোধ হয় পাঁচ মিনিট পর বললেন—আজই হোঁচোট লেগে দু ঘণ্টার মধ্যে এমন হয়েছে ?

হ্যাঁ, দু ঘণ্টাও ঠিক হবে না।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রঙলাল ডাক্তারের—কই কোথায় হোঁচোট লেগেছে ? রক্ত পড়েছে ?

—ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে। রক্তপাত হয় নি।

রঙলাল ডাক্তার পায়ের বুড়ো আঙুলে হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানাই যেন শিউরে উঠল ; নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় রোগিণী ভাষাহীন একটা অবরুদ্ধ আর্তনাদ করে উঠলেন। জীবন তখনও অবাক বিস্ময়ে রোগিণীকে দেখছিলেন—কী অপরিসীম ধৈর্য! চোখের দৃষ্টিতে সে যন্ত্রণার পরিচয় ফুটে উঠেছে। চোয়াল পড়ে গেছে, কণ্ঠ দিয়ে আর্তস্বর বের হচ্ছে, তাকে প্রাণপণে সংযত করবার চেষ্টা করছেন তিনি। এত যন্ত্রণাতেও জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে।

ক্ষত কোথাও হয় নি, রক্তপাতের চিহ্ন নাই ; বেঁকে যাচ্ছেন অসহ্য যন্ত্রণায় ; শুধু তাই নয়—শরীরের কোনো স্থানে পাখির পালকের স্পর্শেও অসহ্য যন্ত্রণায় রোগিণী থরথর করে কেঁপে উঠছেন। কণ্ঠ দিয়ে অবাধ্য আর্তস্বর বের হচ্ছে।

নাড়ী দেখলেন রঙলাল। রোগিণী আবার যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন। স্নায়ু-শিরাগুলি এমনই কঠিন টানে টান হয়ে উঠেছে যে, সামান্য স্পর্শেই ছিঁড়ে যাবার মতো যন্ত্রণায় অধীর করে তুলছে।

রঙলাল ডাক্তার ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। গম্ভীর মুখে বললেন—দেখো তো জীবন ; তোমার নাড়ীজ্ঞানে তুমি কি পাচ্ছ ?

সরে দাঁড়ালেন তিনি।

সন্তর্পণে এসে বসলেন জীবন দত্ত। আশঙ্কায় একবার বুকটা কেঁপে উঠল। শুক্রাচার্যের তুল্য রঙলাল ডাক্তার, তাঁর কাছে আজ পরীক্ষা দিতে হবে। নাড়ী অনুভবের অবকাশ তিনি পান নাই। যেটুকু পেয়েছেন তার মধ্যে নাড়ীর স্পন্দন আছে কি নাই তাও বুঝতে পারেন নাই। রঙলাল ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধ মোটা আঙুলে টিপে ধরে নাড়ী পরীক্ষা করেন। স্পন্দনের সংখ্যা গুনে দেখেন। মধ্যে মধ্যে তাতে ছেদ পড়ছে কি না দেখেন। এর বেশী কিছু না। বেশী কিছু বুঝতেও চেষ্টা করেন না।

রোগিণীর হাতখানি বিছনার উপরে যেমন ভাবে ছিল—তেমনি ভাবেই রইল; জীবন দত্ত শুধু মণিবন্ধের উপর আঙুলের স্পর্শ স্থাপন করলেন। চোখ বন্ধ করে পারিপার্শ্বিকের উপর যবনিকা টেনে দিলেন। প্রায়-রিক্ত-পত্র অশ্বত্থ গাছের একটি সরু ডালে একটিমাত্র পাতা, অতি ক্ষীণ বাতাসের প্রবাহে দৃষ্টির অগোচর কম্পনে কাঁপছে; সেই কম্পন অনুভব করতে হবে; অথচ অসতর্ক রূঢ় স্পর্শ হলেই পাতাটি ভেঙে ঝরে যাবে। অতিসূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতিকে প্রবুদ্ধ করে তিনি বসলেন। ধ্যানস্থ হওয়ার মতো।

তাঁর বাবা বলতেন—শক্তির ধর্মই হল ব্যবহারে সে সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ হয়। অনুভূতি হল পরম সূক্ষ্ম শক্তি। আবার স্থূল করলে সে গদা হয়ে ওঠে।

ক্ষীণ ও অতি ক্ষীণ স্পন্দন তিনি অনুভব করলেন। কখনও কখনও যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

কানে এল রঙলাল ডাক্তারের কণ্ঠস্বর—পাচ্ছ?

অতি সন্তর্পণে ঘাড় নেড়ে জীবন দত্ত জানালেন— পাচ্ছি। যেন ঘাড় নাড়ার সঙ্গে হাত না নড়ে ওঠে। দেহ-চাঞ্চল্যে মনের সূক্ষ্ম কোনো কম্পন-তরঙ্গের আঘাত না লাগে।

—কিছু বুঝতে পারছ? দেখো, ভালো করে দেখো!

জীবন এবার কোনো ইঙ্গিত জানালেন না। তিনি ধ্যানযোগকে গভীর এবং গাঢ় করে তুলতে চেষ্টা করলেন। জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রদীপের শিখাকে উজ্জ্বলতর করে তুলে ধরে রোগের অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

কতক্ষণ অনুভব করেছিলেন নাড়ী তাঁর নিজের ঠিক হিসাব ছিল না।

অনুভব করলেন নাড়ী, যত ক্ষীণই হয়ে থাক এ নাড়ী অসাধ্য নয়। উচ্চ স্থান থেকে পড়ে গেলে বা ভগ্ন অস্থি সংযোজন-কালে, অতিসারে, অজীর্ণ রোগে, বাতরোগে এমন হয়। কিন্তু অসাধ্য নয়। এখানে দুটি কারণ একসঙ্গে জুটেছে। অকস্মাৎ একটা নদীর বন্যার সঙ্গে আর-একটা নদীর জল মিশে দেহখানাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। অজীর্ণ রোগে জীর্ণ-দেহে পড়ে যাওয়ার আঘাতের ফলে এমন হয়েছে। আঘাতটা শুধু হেতু হয়েছে, এখন প্রয়োজন কুপিত বায়ুর প্রভাবে শরীরের স্নায়ু-শিরাগুলির সংকোচন দূর করা।

—কী দেখলে? রঙলাল ডাক্তার প্রশ্ন করলেন এবং ব্যগ্রতার সঙ্গেই করলেন।

—আজ্ঞে? সবিনয়েই জীবন বলেছিলেন—নাড়ী দেখে তো একেবারে অসাধ্য মনে

হচ্ছে না। তিনি নিজের নির্ণয়ের কথা বলে বলেছিলেন ধনুষ্টঙ্কার নয়।

রঙলাল ডাক্তার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন—হাঁ, টিটেনাস তো নয়ই এবং তুমি যা বলছ তাই খুব সম্ভব ঠিক। তুমি বলছ অসাধ্য নয়। জীবনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—কিন্তু সাধ্য হবে কী করে? চোয়াল পড়ে গেছে—ওষুধ যাবে না। শরীরের কোথাও হাত দেবার উপায় নেই, মালিশ করা যাবে না। সাধ্য হবে কিসে?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এলেন রঙলাল ডাক্তার।

বাইরে একান্তে জীবন বলেছিল—আপনি ওষুধ দিন, চামচ বা ঝিনুকে করে ফোঁটা ফোঁটা করে মুখে দেওয়া হোক। আর—আপনি অনুমতি করলে আমি একটা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করি। তাতে ওই বায়ুপ্রকোপের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসবে। স্নায়ুশিরার টানভাবটা কমে আসবে। চোয়ালও খুলবে বোধ হয়।

—মুষ্টিযোগ?

—আমাদের বংশের সংগ্রহ করা মুষ্টিযোগ। আমার পিতামহ পেয়েছিলেন এক সন্ন্যাসী চিকিৎসকের কাছে। তালগাছের কচি মাজমাতা, যা এখনও বাইরের আলোবাতাস পায়নি, তাই গরম জলে সিদ্ধ করে সেই জলের ভাপ—

—দিতে পার, দেখতে পার। আমার কাছে ও মরার সামিল। রোগীর আত্মীয়দের বলেছিলেন—ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। জীবন রইল। আশা আমি করছি না। জীবন আশা ছাড়ে নি; ও দেখুক। এ অবস্থা যদি কাটে, চোয়ালটা ছাড়ে—আমাকে খবর দিয়ো। জীবন একটা মুষ্টিযোগ দেবে। ঠিকমতো সব হয় যেন। বুঝলে?

সমস্ত রাত্রি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন জীবন ডাক্তার।

গরম জলের ভাপ দেওয়ার তত্ত্বাবধান করলেন। রাত্রি বারোটার পর অসহনীয় যন্ত্রণা কমল। জীবন নাড়ী দেখলেন। মুখ প্রফুল্ল হল। প্রশ্ন করলেন—এবার একটু দেখুন তো গায়ে সেঁক নিতে পারেন কিনা?

নিজেই জল-নিঙড়ানো গরম কাপড়ের টুকরোটা সন্তর্পণে রোগিণীর হাতের উপর রাখলেন। লক্ষ্য করলেন—দেহে কম্পন ওঠে কি না। উঠল না। প্রশ্ন করলেন—পারবেন সহ্য করতে? কষ্ট হবে জানি, কিন্তু সহ্য করতে হবে।

অসাধারণ রোগিণী। মূর্তিমতী ধরিত্রীর মতো সহনশক্তি। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন তিনি। উৎসাহিত হলেন জীবন। নিজেই বসলেন সেঁক দিতে। ওষুধ চলছিল ফোঁটা ফোঁটা। ঘণ্টাখানেক পরে রোগিণীর অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন—একটু বেশি বেশি দিয়ে দেখুন তো! মুখে ফোঁটা ফোঁটা ওষুধ দিচ্ছিলেন আর-একটি মহিলা। নীরবে চলছিল জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ।

ক্রমে রাত্রি তৃতীয় প্রহর শেষ হল। জীবন ডাক্তার এবার লক্ষ্য করলেন—প্রচণ্ড শক্তিতে গুণ দিয়ে বাঁকানো ধনুকের দণ্ডের মতো দেহখানি, ধীরে ধীরে সোজা হচ্ছে, সন্তর্পণে সভয়ে রোগিণী সোজা হতে চাচ্ছেন, যেন ধীরে ধীরে গুণ শিথিল করে দিচ্ছে কেউ।

জীবন মৃদুস্বরে বলল—দেখুন তো মা, হাঁ করতে পারেন কি না?

পারলেন, স্বল্প হলেও তার মধ্যে জিহ্বা সঞ্চালিত করবার স্থান পেলেন, চাপা উচ্চারণে বললেন—পারছি।

এবার পূর্ণ এক দাগ ওষুধ খাইয়ে সেঁকের ভার রোগিণীর ছেলের উপর দিয়ে বললেন—বাইরের বারান্দায় আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিন। একটু বিশ্রাম করব। আমার বিশ্বাস সূর্য উদয় হলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন উনি—আর ভয় নাই।

প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েই বললেন জীবন দত্ত। বায়ুর কাল চলে গিয়েছে; এবার কাল হয়েছে অনুকূল। ঝড় থেমেছে; অনুকূল মৃদু বাতাসে নৌকার মতোই জীবনতরী এবার পৃথিবীর কূলে এসে ভিড়বে।

তাই হয়েছিল। সেদিনের আনন্দ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ।

গুরু রঙলাল ডাক্তারকে বিস্মিত করতে পেরেছিলেন তিনি।

বেলা তখন আটটা। রঙলাল ডাক্তার রোগী দেখছিলেন। এ সময় তিনি ফীজ নিতেন না। রোগী দেখতে দেখতেই তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকালেন।

কান থেকে স্টেথোসকোপটা খুলে প্রশ্ন করলেন, বাঁচাতে পেরেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিপদটা আপাতত কেটে গিয়েছে।

—বাঃ! আজ এইখানে থাকো। বিশ্রাম করো।

দুপুরবেলা নিজে রোগিণীকে দেখে এসে খুশী হয়ে বলেছিলেন, এর ক্রেডিট বারো আনা তোমার জীবন। আমার ওষুধে কিছু ছিল না। যা ছিল তার পাওনা সিকির বেশি নয়। মেয়েটির এখন কলিকের চিকিৎসার প্রয়োজন। আমি বলেছি কবরেজি মতে চিকিৎসা করাতে। তুমি ব্যবস্থা করো।

সেইদিন রঙলাল ডাক্তার রাত্রে ব্রাণ্ডির রঙীন আমেজের মধ্যে মৃদু হেসে ওই কথাটা বলেছিলেন। বলেছিলেন, আক্ষেপ হচ্ছে হে জীবন—একটা বিয়ে করি নি কেন? তারপর হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন।

হাসি থামিয়ে আবার বলেছিলেন—কেন বললাম জান?

স্নেহে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন জীবন। অভিভূত ভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আজ্ঞে?

—তুমি আমাকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের সঙ্গে তুলনা কর সেটা আমি শুনেছি। আমি তাতে রাগ করি না। শুক্রাচার্য বিরাট পুরুষ। হোক এক চোখ কানা। হাসতে লাগলেন আবার। তারপর বললেন—আজ আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে কচের সঙ্গে তুলনা করতে।

হা-হা করে হাসতে লাগলেন—বিয়ে করলে একটা দেবযানী পেতাম হে।

পনেরো

আরও এক বৎসর পর রঙলাল ডাক্তার তাঁকে বিদায় দিলেন।

হঠাৎ চিকিৎসা ছেড়ে দিলেন। বললেন—আর না। এইবার শুধু পড়ব আর ভাবব। জীবন এবং মৃত্যু। লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ, তার পিছনের সেই প্রচণ্ড শক্তি—তাকে ধারণা করবার চেষ্টা করব। আর দেশী গাছ-গাছড়া নিয়ে একখানা বই লিখব।

জীবনকে বলেছিলেন—তোমার ডাক্তারি শেখাটা বোধ হয় ঠিক হল না জীবন। ওই সব বিচিত্র অবিশ্বাস্য মুষ্টিযোগ নিয়ে যদি গবেষণা করতে পারতে! কিন্তু তাও ঠিক পারতে না তুমি। তোমার সে বৈজ্ঞানিক মন নয়। কার্য হলেই তোমার মন খুশী। কেন হল—সে অনুসন্ধিৎসা তোমার মনে নাই। যাক। তুমি বরং ডাক্তারি, কবিরাজি, মুষ্টিযোগ তিনটে নিয়েই তোমার ট্রাইসাইকেল তৈরি করো। ওতে চড়েই যাত্রা শুরু করো। নিজেরই একটা স্টেথোসকোপ তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন; থারমোমিটার দেন নি, কিনতেও বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন—ওর দরকার নেই তোমার।

এর পরও জীবন দত্ত মধ্যে মধ্যে যেতেন। রঙলাল ডাক্তার দেখা করতেন, কিন্তু চিকিৎসা সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতেন না। প্রশ্ন করলে বলতেন—ভুলে গিয়েছি। এখন বাগান করছি, গাছ-গাছড়ার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে করো।

আসল উদ্দেশ্য ফুলের বাগান নয়, রঙলাল ডাক্তার নিজের সমাধিক্ষেত্র তৈরি করছিলেন। ওইখানেই তাঁকে মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছানুসারেই হয়েছে। তিনি উইল করে গিয়েছিলেন। সেই উইলে তিনি লিখেছিলেন—তাঁকে যেন সমাধি দেওয়া হয় এই বাগানের মধ্যে।

একা ঘরের মধ্যে মরেছিলেন। মৃত্যুকালে ঘরের মধ্যে কাছে কেউ ছিল না। সেও তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে। মনা হাড়ি ছিল দরজায় পাহারা। মনা অঝোরঝরে কেঁদেছিল কিন্তু ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয় নি। বলেছিল—সে পারব না। বাবার হুকুম নাই।

ওই রঙলাল ডাক্তারের দেওয়া স্টেথোসকোপ নিয়ে তিনি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করলেন। কবিরাজি ত্যাগ করলেন না। মুষ্টিযোগও রইল। সেইবারই দত্ত মশায়দের চিকিৎসালয়ের নামকরণ করলেন—'আরোগ্য-নিকেতন'।

নবগ্রামে তখন হরিশ ডাক্তার খুলেছে—হরিশ ফার্মেসি।

ধনী ব্রজলালবাবু দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে নাম দিয়েছে—পিয়ারসন চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি।

হোমিওপ্যাথ এসেছে একজন। পাগল ছিল লোকটা, নাম বলত—কে. এম. ব্রারোরী অর্থাৎ ক্ষেত্রমোহন বাড়ুরী। তার ডিসপেন্সারির নাম ছিল—'ব্রারোরী হোমিও হল'।

জীবন দত্ত কলকাতায় অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ কিনতে গিয়ে ওই সাইনবোর্ডটা লিখিয়ে

এনেছিলেন।—'আরোগ্য-নিকেতন'।

ওঃ—উদ্যোগপর্বে আতর-বউয়ের সে কী রাগ!

অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ, আলমারি এবং সরঞ্জামপাতি কিনবার জন্য পাঁচশো টাকায় পাঁচবিঘে জমি বিক্রি করেছিলেন তিনি। রাগ ক্ষোভ তাঁর সেই উপলক্ষ্য করে, নইলে ওটা ভিতরে ভিতরে জমাই ছিল।

ক্ষোভের দোষ ছিল না। জগৎ মশায়ের আমল থেকে তাঁর আমল পর্যন্ত তখন লোকের কাছে ওষুধের দাম পাওনা তিন-চার হাজার টাকারও বেশি। সচ্ছল অবস্থার লোকের কাছেই পাওনা বেশি। কিন্তু তার মধ্যে এই প্রয়োজনে শতখানেক টাকার বেশি আদায় হল না।

এর জন্য ক্ষোভ তাঁর নিজেরও হয়েছিল। কিন্তু আতর-বউয়ের ক্ষোভ স্বতন্ত্র বস্তু। সে ক্ষোভ তাঁর উপর এবং সে ক্ষোভ ক্ষমাহীন; আতর-বউয়ের বাহ্যিক ক্ষোভের আপাত উপলক্ষ যাই হোক, ক্ষোভ প্রকাশ হলেই মুহূর্তে মূল কারণ বেরিয়ে পড়ে; সেটা হল তাঁর বিরুদ্ধে একটা অনির্বাণ চিতার মতো অসন্তোষের বহ্নিদাহ!

তখন ওই জমি বিক্রির উপলক্ষ নিয়ে তাঁর মনের আগুন জ্বলেছিল। মনে পড়ছে, পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে—টাকা পাওনা দূরে থাক কটু কথা শুনে তখন তাঁর নিজের মনেও ক্ষোভ জমেছিল। ওষুধের বাকির প্রসঙ্গে লোকে বলেছিল—পঞ্চাশ টাকা? ওষুধের দাম? কী ওষুধ হে? সোনাভস্ম না মুক্তাভস্ম না মানিকভস্ম—কী দিয়েছিলে? পঞ্চাশ টাকা? গাছ-গাছড়া আর গিয়ে এটা-ওটা টুকি-টাকি—আর তো তোমার "রসসিন্দুর"—এর দাম পঞ্চাশ টাকা? যা ইচ্ছে তাই খাতায় লিখে রেখেছ? হরি-হরি-হরি!

এ নিয়ে আর বাদপ্রতিবাদ করেন নি জীবন ডাক্তার। ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। এবং ফেরবার পথেই সাহাদের শিবু সাহাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। ডাক্তারখানা তিনি করবেনই। বুকের ভিতর তখন অনেক আশা। অনেক আকাঙ্ক্ষা। রঙলাল ডাক্তারের স্থান তিনি পূর্ণ করবেন। তিনি যাবেন—রোগীর বাড়িতে আশার প্রসন্নতা ফুটে উঠবে। তিনি নাড়ী ধরবেন—রোগীর দেহে রোগ সচকিত হয়ে উঠবে। নবগ্রামের অহঙ্কারী জমিদার-সমাজ সম্ভ্রমে বিনত হবে। শুধু নবগ্রাম কেন? সারা অঞ্চলের ধনী-সমাজ জমিদার-সমাজ বিনত হবে। বড় ঘোড়া কিনবেন। সাদা ঘোড়া। পালকিও রাখবেন একখানা। বেশি দূরের পথে যাবেন পালকিতে। এ অঞ্চল বলতে সীমানা তো কম নয়—পূর্বে গঙ্গার ধার পর্যন্ত—কান্দী-পাঁচথুপি। এ দিকে অজয়ের ধার পর্যন্ত। কান্দী গেলে ভূপীর সঙ্গে দেখা করে আসবেন। চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তুলবার নতুন আকাঙ্ক্ষা হয়েছে তাঁর। জীবনের তখন অনেক আশা। ছেলে বনবিহারীর বয়স মাত্র বছর তিনেক। তাকে ডাক্তারি পড়াবেন। বড় ডাক্তার করে তুলবেন। মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এস পাশ করে আসবে সে।

আজ যারা অবজ্ঞা করে তাঁর পাওনা টাকা দিলে না, উপরন্তু ইঙ্গিতে অসাধুতার অপবাদ

দিলে, তারাই তাঁর কাছে আসবে বিপদের দিনে। সে দিন তিনি তাদের—। না—ফিরিয়ে দেবেন না, কটু বলবেন না। যাবেন। তাঁর বংশের নাম হয়েছে 'মশায়ের বংশ'—বংশের মহদাশয়ত্ব ক্ষুণ্ণ করবেন না।

তিনিই পথেই দাম-দর করে জমি বিক্রির কথাবার্তা পাকা করে বাড়িতে এসে বললেন, তুমি বোসো শিবু। আমি দুটো মুখে দিয়ে নি। তারপর বের হব। কাগজ কিনে লেখাপড়া শেষ করে বাড়ি ফিরব। রেজিস্ট্রির সময় তো তিন মাস—।

শিবু বলছিল—দেখুন দেখি, লেখাপড়ারই বা তাড়া কিসের গো? আপনি মশায়ের বংশের সন্তান, আজ আপনিই মশাই। আমি টাকা এনে গুনে দিয়ে যাচ্ছি—লেখাপড়া রেজেস্ট্রি হবে পরে।

শিবু পাঁচশো টাকা এনে দিয়ে গিয়েছিল সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা।

ওদিকে বাড়িতে তখন আতর-বউ আগুন ছড়াতে শুরু করেছেন। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! সবই অদৃষ্ট! মা খেয়েছি, বাপ খেয়েছি, সারা বালিকা বয়সে মামা-মামীর বাঁদীগিরি করেছি বিনা মাইনেতে। শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ী খেলাম, শ্বশুর খেলাম। এইবার লক্ষ্মী বিদেয় হবেন তার আর আশ্চর্য কি? আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—মেয়ে হয়েছে ছেলে হয়েছে—ওদের হাত ধরে ভিক্ষে করতে হবে আমাকে। পথে বসতে হবে।

জীবন দত্তের মাথার মধ্যেও আগুন জ্বলে উঠেছিল। তবু সে আগুনকে কঠিন সংযমে চাপা দিয়ে তিনি বলেছিলেন—ছি আতর-বউ! ছি!

—কেন? ছি কেন? আমার অদৃষ্ট তো এই বটে। কোনখানটা মিথ্যে বলো? শ্বশুর দেহ রাখবার আগের মাসেও এ বাড়িতে জমি এসে ঢুকেছে। আজ সবে চার বছর তিনি গিয়েছেন—এরই মধ্যে জমি বেরিয়ে গেল।

—এই বছর যেতে-না-যেতে আমি পাঁচ বিঘের জায়গায় দশ বিঘে কিনব।

—তা আর কিনবে না? কত বড় ডাক্তার হয়ে এলে, একেবারে বিলাতী পাশ সায়েব ডাক্তার!

এবার আর সহ্য করতে পারেন নি জীবন ডাক্তার। কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন—আতর-বউ!

চমকে উঠেছিলেন আতর-বউ সে ডাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর—শুরু করেছিলেন কান্না। জীবন ডাক্তার সে কান্না গ্রাহ্য করেন নি। কাঁদতেই ওঁর জন্ম। ওই ওঁর বোধ করি প্রাক্তন। কাঁদুন উনি। তিনি কী করবেন?

সেই রাত্রেই তিনি কলকাতা রওনা হয়েছিলেন।

কলকাতা থেকে ওষুধ-আলমারি কিনে এনে ওই সাইনবোর্ডটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন—'আরোগ্য-নিকেতন'।

সেতাব মুখুজ্জে এনে দিয়েছিল একটি গণেশ মূর্তি।

সুরেন সিন্দুর দিয়ে তার নিচে লিখেছিল—শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

পাগলা নেপাল তাঁকে একখানা সে-আমলের বাঁধানো নোটবুক এনে দিয়েছিল। নেপাল তখন কাজ করত নবগ্রামের ধনী ব্রজলালবাবুর বাড়িতে। ব্রজলালবাবুর জামাই ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার; তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল নেপালের। খাতাখানা সে তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনে দিয়ে বলেছিল—নে, রঙলাল ডাক্তারের মতো নোট করে রাখবি। আরও এসেছিল সেদিন স্থানীয় ডাক্তারেরা। কৃষ্ণলালবাবুর বাড়ির ডাক্তার হরিশ ডাক্তার এসেছিল; এখানকার ইস্কুলের হেডমাস্টার এসেছিল। এসেছিল থানার দারোগা।

আর এসেছিল—শশীকে নিয়ে শশীর পিসীমা।

—বাবা জীবন!

—আপনি? কী হয়েছে? জীবন দত্ত ভেবেছিলেন—শশীরই কোনো অসুখ হয়েছে।

—বাবা, শশীর বড় ইচ্ছে, খানিক আধেক চিকিৎসা শেখে। লেখাপড়া তো হল না। একটু-আধটু শিখিয়ে দিলে করে-কম্মে খাবে।

শশী তখন নিতান্ত কচি। কত বয়স হবে? সতেরো-আঠারো বছর। একটু পাগলাটে ভাব। ওই নেপালের মতো। ফিকফিক করে হাসত।

ওঃ—সে এক মনোহর রাত্রি। খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা, গান-বাজনা। এরই মধ্যে পাগল নেপাল এক কাণ্ড করেছিল। ওষুধের সঙ্গে কয়েক বোতল গোলাপজল ছিল। নেপাল লুকিয়ে গোলাপ-জল মাখতে গিয়ে—তাড়াতাড়িতে মাথায় দিয়েছিল ফ্রেঞ্চ বার্নিশ! আসবাবে দেবার জন্য জীবন দত্ত ওটা এনেছিলেন। তারপর সে এক কাণ্ড। মাথার চুলগুলিতে গালা জমে নেপালের আর দুর্গতির সীমা ছিল না। সে কী হাসি সকলের! শশী হেসেছিল সবচেয়ে বেশি। নিতান্ত তরুণ বয়স, তার উপর সেদিন সে জীবন-মশায়ের মনস্তুষ্টির জন্যে ছিল অতিমাত্রায় ব্যস্ত।

* * *

সেই শশী বিরক্তি প্রকাশ করে গেছে, তাঁর নিদান হাঁকার জন্য কটু কথা বলে গেছে! —একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ।

—মশায়! কে যেন ডাকলে।

বৃদ্ধ জীবন দত্ত চকিত হয়ে ফিরে তাকালেন। অন্ধকারের মধ্যেই তো বসে ছিলেন তিনি —হঠাৎ একটা আলোর ছটা এসে পড়েছে। কে তাঁকে ডাকছে। ওঃ, তিনি একেবারে যেন ডুবে গিয়েছিলেন অতীতকালের স্মৃতিতে। এতক্ষণে বর্তমানে ফিরে এলেন। হ্যাঁ—লোক এসেছে; তাঁকে ডাকছে। লোকটার হাতের আলোটা নিচের দিকে আলো ফেলেছে। উপরের দিকটায় হ্যারিকেনের মাথার ঢাকনির ছায়া পড়েছে।

—কে? প্রশ্ন করলেন জীবন দত্ত। পরক্ষণেই মনে হল সম্ভবত রতনবাবুর বাড়ির লোক বিপিনের অসুখ হয়তো বেড়ে উঠে থাকবে।

না। রতনবাবুর বাড়ির লোক তো নয়। যে গন্ধ লোকটির শরীর এবং কাপড়-চোপড় থেকে ভেসে আসছে তাতে মনে হচ্ছে সাধু সন্ন্যাসী গোষ্ঠীর কেউ। গাঁজা, ভস্ম, ধূলি-ধোঁয়া,

রুক্ষ দেহচর্ম এবং চুলের গন্ধ মিশিয়ে একটা বিশেষ রকমের গন্ধ ওঠে এদের গায়ে, এ সেই গন্ধ। সম্ভবত চণ্ডীমায়ের মহান্তের দূত। কিছুদিন থেকেই বুড়ো সন্ন্যাসীর অসুখের কথা শুনেছেন জীবন দত্ত।

জীবন দত্তের অনুমান মিথ্যা নয়। লোকটি চণ্ডীমায়ের মহান্তের চেলাই বটে। বললে—সাধুবাবাকে একবার দেখতে যেতে হবে।

—এই রাত্রে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্ধ্যা থেকে রক্তভেদ হচ্ছে। বড় কষ্ট। দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বললেন—জীবনকে একবার খবর দে! মালুম হোয় কি আজই রাতমে ছুটি মিলবে। সে একবার দেখুক।

বৃদ্ধের প্রাণ বড শক্ত প্রাণ। কতবার যে এমন হল! অন্তত বিশ-পঁচিশ বার। রক্তভেদ—নিদারুণ হিক্কা— নাড়ী ছেড়ে যাওয়া, এ সব হয়েও বৃদ্ধ বেঁচে উঠেছে।

একমাত্র কারণ গাঁজা। কিন্তু গাঁজা বুড়ো কিছুতেই ছাড়বে না। মদ খায় না এমন নয়। খায় কিন্তু পর্বে পার্বণে অতি সামান্য। তন্ত্রের নিয়ম রক্ষা করে। মদ্য-পানকে বলে—ঢুকু ঢুকু। জীবন দত্তই তাকে বরাবর ভালো করেছেন। ডাক্তারি ওষুধ বুড়ো খায় না। ইনজেকশনকে বড় ভয়। মশায়বাড়ির টোটকার উপরেই তার একমাত্র বিশ্বাস। তাও খুব কঠিন হয়ে উঠলে তবে বুড়ো জীবনকে ডাকে, বলে, 'দেখ তো ভাই জীবন। তলব কি আইল?' বুড়ো আবার পড়েছে। আজকাল বড় ঘন ঘন পড়ছে।

জীবন দত্ত উঠলেন।

বৃদ্ধ বয়স, রাত্রি প্রহর পার হয়ে গিয়েছে; বোধহয় সাড়ে দশটা। শ্রাবণ মাস, দিন বড় রাত্রি ছোট, হবে বৈ কি সাড়ে দশটা। তবু যেতে হবে। উপায় কী? চলো।

বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি ডাকলেন—আতর-বউ!

—কী? ভিতর থেকে রুক্ষ স্বরেই জবাব দিলেন আতর-বউ।

—বেরুতে হচ্ছে। ঘুরে আসি একবার।

—এই রাত্রে কোথায় যাবে? কার বাড়ি? না, যেতে হবে না তোমাকে। অনেক ডাক্তার আছে। অল্প বয়েস, বিদ্বান, বড় বড় পাশকরা। তারা যাক। এই বয়েস তোমার—তোমাকে ডাকতে এসেছে শুধু টাকা দেবে না বলে। যেয়ো না তুমি।

জীবন ডাক্তার কোমল স্বরেই বললেন—চণ্ডীতলায় সাধুবাবার অসুখ আতর-বউ।

ওই কথাতেই অনেক কিছু বলা হয়ে গেল। আতর-বউও মুহূর্তে নরম হয়ে গেলেন। তাই বা কেন? একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। বললেন—সাধুবাবার অসুখ? কী হয়েছে?

—কী হবে? সেই যা হয়। রক্তভেদ—পেটে যন্ত্রণা।

—এবার তা হলে বাবা দেহ রাখবেন। বয়স তো কম হল না।

—দেখি! বলে তো পাঠিয়েছেন—জীবনকে ডাকো—তলব আইল কি না দেখুক। দেখি!

ভারী জুতোর শব্দে স্তব্ধ পল্লীপথের দুপাশের বাড়ির দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে বৃদ্ধ হস্তীর মতো জীবন ডাক্তার চললেন—গ্রাম পার হয়ে, স্বল্প বিস্তৃতির একখানি মাঠ পার হয়ে—নবগ্রামের পূর্বপ্রান্তে ঘন জঙ্গলে ঘেরা দেবাশ্রমের দিকে। বর্ষার রাত্রি—অবশ্য অনাবৃষ্টির বর্ষা—তবুও রাস্তা পিছল, একটু সাবধানেই পথ চলতে হচ্ছিল। আলো নিয়ে সাধুর অল্পবয়সী চেলাটি দ্রুতপদে চলেছে—ডাক্তার প্রায় অন্ধকারেই চলেছেন। তাতে ডাক্তারের অসুবিধে নাই। অন্ধকারে ঠাওর করে পথ চলা তাঁর অভ্যাস আছে। কিন্তু সাধুর চেলার হাতের আলোটা দুলছে, অসুবিধে হচ্ছে তাতেই। মধ্যে মধ্যে চোখে এসে লাগছে। ডাক্তার বললেন—আলোটা এমন করে দুলিয়ো না হে ভোলানাথ। চোখে লাগছে। চলো, চলো, দাঁড়াতে হবে না। চলো তুমি। আলোটা দুলিয়ো না।

—কে? মশায় না কি?

সম্মুখের দেবস্থলের প্রবেশপথের ঠিক মুখ থেকে কে প্রশ্ন করলে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ঠস্বরটা চেনা। তবু জীবন দত্ত ধরতে পারলেন না। অন্যমনস্ক হয়ে সাধুর কথাই ভাবছিলেন তিনি। বহুকাল এখানে আছেন সাধু। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

—রোগীকে আমি ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। হাসতে লাগল সে।

—শশী! চমকে উঠলেন ডাক্তার।—কী দিয়ে ঘুম পাড়ালি?

পাগলা শশী হাসতে লাগল—অসুরের চিকিৎসা আসুরিক।

—কিন্তু তোকে খবর দিলে কে?

—এসে পড়লাম হঠাৎ। গিয়েছিলাম গলাইচণ্ডী, রামহরি লেটকে দেখতে। বেটার খুব অসুখ। দুপুরবেলা আপনাকে কল দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওই মতির মায়ের নিদানের কথা বলতে গিয়ে ভুলেই গেলাম। বউ-ঠাকরুন বলেন নি আপনাকে? কাল একবার রামহরিকে দেখতে যেতে হবে মশায়।

—সে তো পরের কথা। কাল হবে। এখানকার খবর বল। কী চিকিৎসা করলি মহান্তের? উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন তিনি। শশীকে যে তিনি জানেন।

শশী বললে—আর কী! গলাইচণ্ডী থেকে ফিরবার পথে ঢুকলাম—ভিজে শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, আর কেমন ছমছম করছিল বুঝেছেন—তাই বলি মাকে একবার প্রণাম করি আর শরীরটাকে তাজা করে নি।' বুড়োর কাছে একটান গাঁজা খেয়ে যাই।

—হুঁ, তারপর?

—দেখলাম বুড়ো ধুঁকছে। রক্ত দাস্ত হয়েছে। নাড়ী নাই। যাতনায় ছটফট করছে। শুনলাম তিন দিন গাঁজা খায় নাই। বললাম—যেতে তোমাকে হবে। তা গাঁজা না খেয়ে যাবে কেন—একটান গাঁজা খেয়ে নাও। তা বললে—না। তু বেটা বদমাশ শয়তান। আরে ওহি গাঁজা তো আমার মরণ আসবার পথ তৈয়ার করেছে। এক পাও পথ বাকি; সে আসুক নিজেই ওটুকু পথ তৈয়ার করে। আর গাঁজা কেনো? আমি মশায়, এক ডোজ

ক্যানাবিসিণ্ডিকা দিয়েছি। সঙ্গেই ছিল। আমি খাই তো। বাস—খেয়ে দু'তিন মিনিটের মধ্যে বুড়ো ঘুমিয়ে পড়ল। দেখুন, বোধ হয় নাড়ীও টিপটিপ করে উঠেছে। গাঁজা-খাওয়া ধাত তো। লেগে গিয়েছে।

হি-হি করে হাসতে লাগল পাগলা।

ষোলো

মিথ্যে বলে নি পাগলা। এক ডোজ ক্যানাবিসিণ্ডিকাতে বৃদ্ধ সাধুর ঘুম এসেছে; ঘুম যখন এসেছে তখন যন্ত্রণারও উপশম হয়েছে এবং নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে কিছু পারা গেল না।

সাধুসন্ন্যাসীর ধাতু প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষের সঙ্গে অনেক প্রভেদ। জীবনে আচার এবং বিধিনিয়ম পালনের প্রভাব দেহের উপর অমোঘ। দেহের সহনশক্তি আশ্চর্যভাবে বেড়ে যায়। তেমনি আশ্চর্য ক্রিয়া করে ওষুধ। অকর্ষিত মৃত্তিকায় প্রথম চাষের বীজের মতো। সুতরাং বলা তো যায় না। মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হয়েও এদের প্রাণশক্তির কাছে হার মেনে ফিরে যায়। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখছেন জীবন দত্ত। তাঁর বাবাও এ কথা তাঁকে বলে গেছেন। বলেছিলেন—এদের নাড়ী দেখে সহজে নিদান হেঁকো না, বাবা। আগে জেনে নিয়ো—তাঁদের নিজের দেহরক্ষার অভিপ্রায় হয়েছে কি না। মানুষের অভিপ্রায় প্রচণ্ড কাজ করে, যে রোগী হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ে তাকে বাঁচানো কঠিন হয়। সাধুদের হতাশা নাই, মনটি ওদের শক্ত। ইচ্ছাশক্তি প্রবল। এবং মৃত্যু বরণের অভিপ্রায় ওঁরাই করতে পারেন।

সাধু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ডাক্তার বললেন—রাত্রিটা সজাগ থেকো ভোলানাথ। রাত্রে যদি ঘুম ভাঙে—তবে জল খেতে দিয়ো। আর কিছু না। আমি ভোরবেলা আসব।

শশী খুব হাসতে লাগল। আত্মপ্রসাদের আর অবধি নাই তার। ডাক্তার তাকে ডেকে সঙ্গে নিলেন।—আয় একসঙ্গে যাই।

শশীও সঙ্গ ধরলে। বললে—চলুন—রামহরির কেসটা বলে রাখি। কাল আপনাকে যেতেই হবে।

ডাক্তার বললেন—শশী, আজ যা করেছিস করেছিস, এমন কাজ আর করিস না।

—কী? বুড়োকে ক্যানাবিসিণ্ডিকা দেওয়া?

—হাঁ। অন্যায় করেছিস।

—অন্যায় করেছি তো বুড়ো সুস্থ হল কী করে?

—কী করে তা বলা শক্ত। গাঁজা খাওয়া অভ্যেস আছে, সেই গাঁজা না খাওয়ার জন্যেও একটা যন্ত্রণা ছিল রোগের যন্ত্রণার সঙ্গে—সেটা উপশম হয়েছে—তার উপর মাদকের ক্রিয়া

আছে। এখন ঘুম ভেঙে এর ফল হয়তো মারাত্মক হবে।

—উহু! বুড়ো সেরে উঠবে এ আমি বলে দিলাম। কুড়ো বাউড়ীর মেয়েটার নিউমোনিয়ায় কেরোসিনের মালিশ দিলে সবাই আপনারা গাল দিয়েছিলেন—কিন্তু সেরে তো গিয়েছিল।

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন—শশী, এ সব পাগলামী ছাড়। শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়বি।

—আমি পাগল?

—হ্যাঁ। তুই পাগল। আমার আর কোনো সন্দেহ নাই।

একটু চুপ করে থেকে শশী বললে—তা বেশ। পাগলই হলাম আমি। তা বেশ। আবার খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—কাল কিন্তু রামহরিকে দেখতে যেতে হবে। আমি কল দিয়ে রাখলাম।

—রামহরির কী হল?

—সে সাত-ত্রুগুণে চোদ্দখানা ব্যাপার। এবার যাবে।

—যাবে তো আমাকে টানাটানি কেন? যাক না। এ বয়সে গেলেই তো খালাস। না, যেতে চায় না কামারবুড়ীর মতো তা রামহরির এ ইচ্ছে স্বাভাবিক। আবার যেন মালাচন্দন করেছে এই বয়সে।

—হ্যাঁ। বছর পঁচিশেক বয়স মেয়েটার। কিন্তু রামহরি বাঁচবার আশায় আপনাকে ডাকছে না। ডাকছে নিদান দিতে হবে, বলে দিতে হবে—জ্ঞানগঙ্গা যেতে পারে কি না। বড় ইচ্ছে জ্ঞানগঙ্গা যায় উদ্ধারণপুর কি কাটোয়া। জ্ঞানগঙ্গা গিয়ে বেশীদিন বাঁচলে তো মুশকিল। কণ্ট্রোলের বাজার। এ জেলার চাল ও জেলায় যাবার হুকুম নাই। কিনে খেতে গেলে অনেক টাকা লাগবে।

বকবক করে বলেই চলল শশী।

—চোরের রাজ্য বুঝেছেন, সব চোর। আপাদমস্তক চোর। রাজা চোর, রানী চোর, কোটাল চোর,—সব চোর। আমি চোর, তুমি চোর—সব চোর। চালের দর ষোলো টাকা? তাও এ জেলায় ষোলো তো ও জেলায় ছাব্বিশ, আর দু পা ছাড়াও ছত্রিশ—আর এক পা ওদিকে চল্লিশ।

মশায় ঠিক কথাগুলি শুনছিলেন না। তিনি ভাবছিলেন। ভাবছিলেন রামহরির কথা। শশী আপন মনেই বকে চলেছিল। হঠাৎ একবার থেমে—আবার আরম্ভ করলে। এবার কথার সুর আলাদা। দেশের সমালোচনা বন্ধ করে অকস্মাৎ সরস রসিকতায় সুরসিক হয়ে উঠল শশী। বললে—রামহরি জ্ঞানগঙ্গা যাবে—কিন্তু বেহিসেবি কাণ্ড করে তো যাবে না, কদিন বাঁচবে—আপনাকে বলে দিতে হবে, সেই হিসেব করে চাল ডাল বেঁধে নিয়ে যাবে। বলে, ঠাকুর, তোমার কী বল? দশদিন বেশী বাঁচলে—চাল কম পড়বে। তখন নগদ দামে কিনতে হবে। পাঁচদিন কম বাঁচলে চাল বাড়বে। সে চাল ঘরে ফিরে নিতে নাই, বেচে দিতে হবে। সে সব তো আমার হাত দিয়ে হবে না। হবে পরের হাত দিয়ে। পাঁচভূতে সব তচনচ করে দেবে আমার। বুঝুন ব্যাপারটা—রামহরি যে হিসেব নেবে তার উপায়

থাকবে না। ব্যাটা বলে—তাতে আমার স্বর্গে গিয়েও শান্তি হবে না। আমি বলি—স্বর্গে যাওয়াই হবে না তোর। রথে চড়ে বলবি—রোখো রোখো! আমি নামব। রথ ফিরিয়ে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখবি। মহা মুশকিল। গঙ্গাতীরে মৃত্যু—ভূত হবারও উপায় থাকবে না, সে হলে সান্ত্বনা পাকত রামহরির—ঘাড় ভাঙতে পারত। পিছু পিছু গিয়ে খোনা স্বরে বলতে পারত—দেঁ—আমার টাকা ফিঁরে দেঁ।

হি-হি করে হাসতে লাগল শশী।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রির মধ্যে দুজনে পথ হাঁটছিলেন।

বৃদ্ধ জীবনমশায় আপনার মনে রামহরির কথা ভাবছিলেন। এমনটা কী করে হল? কেমন করে হয়? জ্ঞানগঙ্গা যেতে চায় রামহরি? বিনা ভাবনায়, বিনা কামনায়, বৈরাগ্যযোগ মুক্তি-পিপাসা কি জাগে? আমি মরব এই কথা ভেবে প্রসন্ন মনে সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে অভিসারে চলার মতো চলতে পারে? দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর যুবতী বধূর স্বামী-সন্দর্শনে যাওয়ার কালে বাপের-ঘরের-উঠানে-পাতা খেলাঘর ফেলে যাওয়ার মতো যেতে পারে?

রামহরি প্রথম জীবনে ছিল ছিঁচকে চোর; তারপর হয়েছিল পাকা ধান চোর; বার দুয়েক জেল খাটার পর হঠাৎ রামহরির দেখা গেল ঘোরতর পরিবর্তন; রামহরি কপালে ফোঁটা-তিলক কেটে গলায় কণ্ঠীমালা পরে হয়ে উঠল ঘোরতর ধার্মিক। জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসা শুরু করলে। তরকারির ব্যবসা। চাষীর খেত থেকে তরকারি কিনে হাটে হাটে ঘুরতে লাগল অর্থাৎ ফড়ে হয়ে উঠল। মুখে রামহরি চিরকালই ফড়ে অর্থাৎ কথা সে বেশি চিরকালই বলত—এবার ব্যবসায়েও তাই হয়ে উঠল। লোকের বাড়ি ক্রিয়াকর্মে বরাত এবং বায়না নিয়ে তরকারি সরবরাহ করত। কিন্তু ওর অন্তরালে ছিল তার আসল ব্যবসা। নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে দস্তুরমতো কবিরাজের মৃতসঞ্জীবনী চোলাইয়ের পাকা পদ্ধতিতে মদ তৈরি করত। জঙ্গলের মধ্যেই বোতল এবং টিন-বন্দী করে পুঁতে রাখত। ওখানেই শেষ নয়, নদীর চরের পলিমাটিতে সে গাঁজার গাছ তৈরি করে গাঁজাও উৎপন্ন করত এবং তার কাটতিও ছিল প্রচুর। দেশটা তান্ত্রিকের দেশ ছিল মন্ত্র হোক বা না হোক, জানুক বা না জানুক, লোকে 'কারণ' করত। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মুখে কালী-কালী, তারা-তারা রব আর কারণকরণে শতকরা নিরেনব্বুই জন ছিল সিদ্ধপুরুষ। সুতরাং হাজার দরুনে সিদ্ধপুরুষের প্রসাদে রামহরির লক্ষ্মীলাভের পথে সিংহদ্বার না হোক, বেশ একটা প্রশস্ত ফটক খুলে গিয়েছিল। উদ্যোগী পুরুষ রামহরির সাহস ছিল অপার, নবগ্রামে থানার সামনের রাস্তা দিয়ে কুমড়োকাঁকুড়ের বোঝার তলায় অন্তত চার-পাঁচটা বোতল নিয়ে সে সহাস্য মুখে চলে যেত। এবং হাটে বসে তাই বিক্রি করত। কুমড়োর মুখ কেটে ভিতরের শাঁস বীজ বের করে নিয়ে তার মধ্যে আনত গাঁজা। বাড়িতে দেব-প্রতিষ্ঠা করেছিল সুপবিত্র নিম্ব কাষ্ঠের গৌরহরি। কিন্তু ঠাকুরটির বক্ষ-পঞ্জর ছিল ফাঁপা। দস্তুরমতো মাথা খাটিয়ে বুক এবং পিঠের দুদিক দুখানি স্বতন্ত্র কাঠে গড়ে ভিতরে গহ্বর রেখে পাকা মিস্ত্রী দিয়ে এই দৈব গুদামটি সে তৈরী করিয়ে-

ছিল। এবং পিঠের দিকের কাঠের নিচে উপরে দুটি ঢাকনিযুক্ত মুখ রেখেছিল। উপরেরটি খুলে গাঁজা পুরত এবং প্রয়োজনমতো বের করে নিত। এর পর আর-এক ধাপ উপরে উঠে রামহরি রীতিমতো দাসজী হয়ে উঠেছিল। তরকারির ব্যবসা তুলে দিয়ে মুদীর দোকান এবং ধান কেনার ব্যবসা শুরু করে—ভেক নিয়ে দাস উপাধি নিয়ে গণ্যমান্য হয়ে উঠেছিল কয়েকখানা গ্রামের মধ্যে। শুধু ভেকই নেয় নাই, নিজের স্বজাতীয়া স্ত্রী এবং পুত্রকে দূর করে দিয়ে একটি উচ্চবর্ণের বিধবাকে ঘরে এনে বৈষ্ণবী করেছিল। ক্রমে ক্রমে আরও বোধ হয় দু-তিনটি। এদের জন-দুই প্রৌঢ় বয়সে দুয়োরানীর মতো ঘুঁটে কুড়িয়ে মরে পরিত্রাণ পেয়েছে। একজন পালিয়েছে। শেষেরটি তরুণী—সেইটিই এখন রামহরির সুয়োরানী।

সেই রামহরি সজ্ঞানে মৃত্যু কামনা করে গঙ্গাতীরে চলেছে? মুক্তি চায় সে? বিস্ময় লাগে বই কি!

শশী তামাক টেনে শেষ করে হুঁকোটা হাতে ধরে নিয়ে বললে—কাল চলুন একবার। আমি বেটাকে বলেছি, ফী পাঁচ টাকা লাগবে। ডাক্তারবাবু তো আর কলে যান না, তবু বলে কয়ে রাজি করাব। তা তাতেই রাজি।

কথাটা ডাক্তারবাবুর কানে গেল না। তাঁর মনোরথ চলেছিল ছুটে। পলকে যুগান্তর অতিক্রম করে পিছনের পরিক্রমা সেরে বর্তমান এসে সেই মুহূর্তেই স্থির হল বোধ করি। তিনি হাসলেন।

শশী বললে—হাসছেন যে?

জীবন বললেন—নবগ্রামের কর্তাবাবুর চিকিৎসার জন্যে কলকাতা যাওয়া মনে আছে তোর শশী?

—তা আবার নাই। বাড়ি থেকে পালকি করে বেরিয়ে—সব ঠাকুরবাড়িতে প্রণাম করে—

—সে তো জ্ঞানগঙ্গা যাঁরাই গিয়েছেন—তাঁরা সবাই তা করেছেন রে। সে নয়।

—তবে?

—কর্তা কাশী গেলেন না, উদ্ধারণপুর গঙ্গাতীর গেলেন না, গেলেন কলকাতা। কলকাতাও গঙ্গাতীর। কিন্তু গঙ্গাতীরে দেহ রাখতে ঠিক যান নি। গিয়েছিলেন চিকিৎসা করিয়ে বাঁচতে।

—তা হবে না? বিশাল সম্পত্তি, অগাধ ধন, এত কীর্তি—এ সব ছেড়ে মরতে কেউ চায় নাকি?

—হ্যাঁ রে, তাই তো বলছি। তাঁর হয় নি আর রামহরির সেই বাসনা হল! রামহরি যা করেছে তার পক্ষে তো সেও কম নয় রে! অনেক। তার উপর তরুণী পত্নী।

এবার হাঁ করে শশী জীবন ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জীবনমশায় হেসেই বললেন—হাঁ করে আর তাকিয়ে থাকিস নে। বাড়ি যা। রাত্রি অনেক হয়েছে। কাল যাব। দুপুরের পর গাড়ি পাঠাতে বলিস।

শশী বললে—দু রাস্তার মোড় বুঝি এটা?

—হ্যাঁ।

এইখান থেকেই পাকা রাস্তা থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে জীবন ডাক্তার যাবেন নিজের গ্রামে। পাকা রাস্তায় শশী যাবে নবগ্রাম।

জীবনমশায় বললেন—নেশাভাঙ একটু কম করিস শশী।

শশী মাথা চুলকে লজ্জা প্রকাশ করে বললে—ভাবি তো। পারি না। তারপর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললে—চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়েই যাই। ভারি অন্ধকার আর রাত্রি অনেক হয়েছে।

—হতভাগা! আমাকে দাঁড়াতে হবে না। যা—বাড়ি যা। আমাকে দাঁড়াবে? তোকে দাঁড়াবে কে? পরক্ষণেই একটা কথা মনে করে জীবন দত্ত সচকিত হয়ে উঠলেন, বললেন—আচ্ছা চল, আমিই তোকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরব।

মনে পড়ল।—মাস কয়েক হল—শশীর মা মারা গেছে। শশী হয়তো এত রাত্রে ভয় পাচ্ছে একলা যেতে। একটু আগেই বলছিল—গলাইচণ্ডী থেকে ফিরবার পথে ওর গা ছমছম করেছিল অর্থাৎ ভয় পেয়েছিল শশী। ওঃ! সেই জন্যেই সে দেবস্থানে ঢুকেছিল?

জীবনমশায় বললেন—সত্যি বল তো শশী—কী ব্যাপার? তুই কি ভয় পেয়েছিস?

শশী মাথা চুলকে বললে—মানে—আমার মা—

—তোর মা?

—মনে হয় আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। মনে হয় নয় মশায়, সত্যি।

জীবনমশায় বললেন—চল, ওসব কথা থাক।

শশী বললে—মা আমাকে ভয় দেখায় না—আগলায়। বুঝেছেন না। শশী বকবক করলে সারা পথটা। তার মধ্যে রামহরির কথাই বেশী। ওই বেটার নিদেন হেঁকে দেখিয়ে দেন একবার ছোকরা ডাক্তারকে!

সতেরো

প্রদ্যোত ডাক্তার বারান্দায় বসে ছিল। শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, অসহ্য গুমোটের মধ্যে ঘরে ঘুম আসা এক অসাধ্য ব্যাপার; তার উপর মশারি।' মশা এখানে খুব বেশী ছিল। লোকে বলত বিনা মশারিতে শুয়ে থাকলে মশারা সমবেতভাবে তুলে নিয়ে চলে যেতে পারে। আজকাল মশা কমেছে। ডি. ডি. টি. ক্যাম্পেন শুরু হয়েছে গত বছর থেকে। তবুও প্রদ্যোত বিনা মশারিতে শোয় না। একটি মশাও কামড়াতে পারে এবং সেইটিই অ্যানোফিলিস হতে পারে এবং তার বাহিত বিষটুকুতে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার বীজাণু থাকতে পারে। বাইরে মশারি খাটিয়ে শুলে হয়, কিন্তু তাতে মঞ্জু অর্থাৎ ডাক্তারের স্ত্রী ভয় পায়। শহরের মেয়ে, তার উপর এ অঞ্চল সম্পর্কে ছেলেবেলায় অনেক চোরডাকাত ভূতপ্রেত সাপবিছের গল্প শুনেছে সে। মঞ্জুর মায়ের মাতামহের বাড়ি ছিল এই দেশে। মায়ের মাতামহ অবশ্য

বেঁচে নেই, এবং মামাও কোনো কালে ছিল না অর্থাৎ মঞ্জুই ছিল মা-বাপের এক সন্তান ; থাকবার মধ্যে মঞ্জুর বৃদ্ধা মাতামহী বেঁচে আছে। কানে কালা, চোখেও খুব কম দেখে। সে-ই গল্প করত। ভূতপ্রেত মঞ্জু বুদ্ধি দিয়ে অবিশ্বাস করে, তর্কও করে, কিন্তু অন্ধকারে কোনো শব্দ উঠলেই চমকে ওঠে। সেই কারণে বন্ধ ঘরে শুতে যাবার আগে যতক্ষণ পারে প্রদ্যোত ডাক্তার বসে থাকে। মধ্যে মধ্যে ফ্লিট স্প্রে করে দেয়। চারি পাশে বারান্দার নিচে সিঁড়িতে কার্বলিক-অ্যাসিড-ভিজানো খড় ছিটানো থাকে। আর থাকে ডি ডি টি. পাউডার এবং ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো। সাপ পোকা বিছে আসতে পারে না।

সকালবেলা থেকেই প্রদ্যোতের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। রতনবাবুর ছেলে বিপিন-বাবুর কেসে এখানকার হরেন ডাক্তার তাকে কল দিয়েছিল ; আকস্মিকভাবে হিক্কার উপসর্গ এসে জুটেছে। কল দিয়েছিল কাল সকালে। একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। মনে হয় হয়তো যে-কোনো মুহূর্তে নিষ্ঠুর পরিণতি এসে উপস্থিত হবে। হরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে যা করবার করেছে তারা, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। আজ সকালে কিশোরবাবু প্রস্তাব করলেন—জীবন মশায়কে ডাকা হোক। প্রস্তাবটা বোধ হয় রতনবাবুর, কিশোরকে দিয়ে প্রস্তাবটা তিনিই করিয়েছেন। প্রদ্যোত ডাক্তার কী বলবে? মনে উত্তরটা আপনিই এসে দাঁড়িয়েছিল—'বেশ তো দেখান। আমি কিন্তু আর আসব না'। কিন্তু কথাটা বের হবার আগেই কিশোরবাবু বলেছিল—"আপনি কিন্তু বলতে পাবেন না—আর আসব না। আমার অনুরোধ। আমি শুনেছি আপনি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট। কিন্তু তিনি অসন্তোষের লোক নন।"

ডাক্তার বলেছিলেন—এর মধ্যে সন্তোষ অসন্তোষের কথা কী আছে কিশোরবাবু? আপনাদের রোগী, ইচ্ছে হলে ভূতের ওঝাও ডাকতে পারেন।

- আপনি একটু বেশী বলছেন প্রদ্যোতবাবু। বলছেন না? নিজের মর্যাদাটাকে বড় করে বিচার করবেন না। সত্যকে বড় করে খতিয়ে বলুন প্রদ্যোতবাবু। কিশোরবাবু মানুষটি বিচিত্র। তার মধ্যে কোথায় যেন অলঙ্ঘনীয় কিছু আছে। তাকে লঙ্ঘন করা যায় না। সমগ্র দেশের লোকের প্রীতির পাত্র। আজীবন দেশের সেবাই করে আসছেন। এখানে প্রদ্যোত ডাক্তার এসে অবধি কত ছোটখাটো উপকারে ওঁর কাছে উপকৃত তার আর হিসেব নেই। এখানকার লোকগুলি সহজ নয়। মঞ্জু আধুনিকা, সে সাইকিলে চড়ে একা যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, এর জন্য কুৎসা রটিয়েই শান্ত হয় নি—ওপরে দরখাস্তও করেছিল। প্রদ্যোতের বন্ধু এই জেলারই সদরে ল্যাবোরেটরিতে প্র্যাকটিস করে, সে মধ্যে মধ্যে আসে এখানে—তার সঙ্গে জড়িয়ে কুৎসিত অভিযোগ। এবং হাসপাতালের ওষুধ চুরির অপরাধও ছিল তার সঙ্গে। কয়েকটা কেসে প্রদ্যোত বন্ধুর ল্যাবোরেটরিতে রোগীর রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়েছিল বলে তা নিয়েও অনেক কথা ছিল সে দরখাস্তে। মুখে মুখে এ নিয়ে কথার তো অন্ত ছিল না ; বিচিত্র প্রশ্ন সব।—"ও বাবা এ যে দুই বঁধুতে মিলে বেশ ফাঁদ পেতেছে! রক্ত পরীক্ষা থুথু পরীক্ষা প্রস্রাব পরীক্ষা—দাও টাকা এখন। চোর চোরাটি

আধা ভাগ। এতকাল এসব ছিল না—তা রোগ ভালো হত না?"

কিশোরবাবুই এ সমস্ত অপবাদ এবং প্রশ্ন থেকে রক্ষা করেছেন। অযাচিতভাবে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন।

এখানে থাকলে দুটি বেলা কিশোরবাবু তাদের খবর নেন। কিশোরবাবুর প্রশ্নে এই কারণেই ডাক্তারকে ভেবে দেখতে হয়েছিল। কিশোরবাবু বলেছিলেন—ভালো করে ভেবে দেখুন ভাই। এখানে প্রশ্ন হল মূল্যবান একটি জীবনের। আর মশায়কে তো আমরা আপনাদের উপরওয়ালা করে ডাকছি না; ডাকছি সাহায্য করবার জন্যে। ওঁকে ডাকছি—উনি নাড়ীটা দেখবেন আর হিক্কাটা থামিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। তাতে আপনাদের যে সব শর্ত আছে তা বলে দিন তাঁকে। কই হরেন চারুবাবু এঁরা তো আপত্তি করছেন না!

হরেন ডাক্তার চারুবাবু মত দিয়ে গেছেন। চারুবাবু বলে গেছেন—খুব ভালো কথা। ওঁর অনেক মুষ্টিযোগ আছে। অব্যর্থ ফল হয়। শুধু স্যাকিং ঘটিত কিছু যেন না দেন।

এরপর অগত্যা প্রদ্যোতকে মত দিয়ে আসতে হয়েছে। বলতে সে পারে নি—ওঁদের মত ওঁদের, আমার মত আমার। আমি আর আসব না। কিন্তু এ নিয়ে একটা অস্বস্তি তার মনে সেই সকাল থেকেই ঘুরছে। উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন জীবনমশায় নামক এই দেশজ ভিষগাচার্যের ভেষজের ফলের জন্য। একটা বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে সে। ওই নিদানবিশারদ এক্ষেত্রে নিদান হাঁকে নি। তাদের ভুল ধরে নি। চারুবাবুদের সঙ্গে তার আলোচনার কথা বোধ হয় বৃদ্ধ শুনেছে। তবুও অস্বস্তি রয়েছে। ওই ওষুধের ফলের জন্য অস্বস্তি। তার সঙ্গে আরও যেন কিছু আছে। এর উপর একটি রোগী আজ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার হাতে মারা গিয়েছে।

কী যে হল?

সব থেকে যেটা তাকে পীড়িত করছে সেটা হল তার ভ্রান্তি। সকালবেলা সে দেখে বলে এসেছিল—"রোগী বেশ ভালো আছে। জ্বর ছেড়ে গেছে। কাল পথ্য দেব।" একটু যেন ড্রাউজি ভাব ছিল—আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিল রোগী, কিন্তু ডাক্তার সেটাকে দুর্বলতা মনে করেছিল। ছেলেমানুষ শিশু রোগী। রোগীর বুড়ী ঠাকুমা বলেছিল—ভালো কী করে বলছ বাবা তুমি? বালা রুগী—জ্বর ছেড়েছে, ভালো আছে তো মাথা তুলছে কই, খেতে চাচ্ছে কই?

ডাক্তার তাকে বলে এসেছিল—তুলবে মাথা। একটু দুর্বল হয়ে আছে। ওটা কাটলেই তুলবে। আর আমাদের কথায় বিশ্বাস করুন। না করলে তো চিকিৎসা করতে পারব না।

বিকালবেলা ছেলেটা হঠাৎ কোলাপ্স করলে। ডাক্তার ছুটে গিয়েছিল। ইনজেকশনও দিয়েছিল বার তিনেক, কিন্তু—। সন্ধ্যের সময় মারা গেছে ছেলেটা।

ডাক্তার ভাবছিল। কোথায় ভুল হল তার? আগাগোড়া? ডায়গনোসিসে?

হ্যাঁ তাই। ম্যালেরিয়া বলে ধরেছিল সে। কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। ভুল হয়ে

গিয়েছে সেইখানে। কুইনিন ইনজেকশনও সে দিয়েছিল।

ফলটা হয়েও স্থায়ী হল না। ইনট্রাভেনাস দেওয়া উচিত ছিল।

ডাক্তার অকস্মাৎ চকিত হয়ে ইজিচেয়ারের উপরেই সোজা হয়ে বসল। কুইনিন অ্যাম্পুলটা—? সেটার ভিতর ঠিক কুইনিন ছিল তো? বিনয়ের দোকান থেকে কেনা অ্যাম্পুল। একালের এই ঔষুধ ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস নেই। না—নেই। এরা সব পারে। কলকাতায় জাল ওষুধ তৈরী করার একটা গোপন কিন্তু বিপুল-আয়তন আয়োজনের কথা অজানা নয়। এবং তাদের সঙ্গে ওষুধের দোকানদারদের যোগাযোগের কথাও অপ্রকাশ নেই। বিনয়চন্দ্র পাকা ঝানু ব্যবসাদার। মিষ্টি মুখের তুলনা নেই। সাধুতার সততার এমন সুকৌশল প্রচার করতে পারে লোকটি যে মনে সম্ভ্রমের উদয় হয়। কিন্তু প্রদ্যোত নিজে ডাক্তার—তার কাছে বিনয়ের লাভের প্রবৃত্তির কথাও তো অজ্ঞাত নয়। চার পয়সা যে দাগে ওষুধের খরচ তার দাম চার আনা। এ নিয়ে কথা তার সঙ্গে হয়েছে। কিন্তু বিনয় সবিনয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে—ওর কমে দিলে লোকসান অবশ্যম্ভাবী। বছরের পর বছর বিনয় জমি কিনছে, সঞ্চয় বাড়াচ্ছে। এবার নাকি নতুন একটা বাড়ি করবে। বিনয় সব পারে। প্রদ্যোতের কান দুটো উত্তপ্ত হয়ে উঠল, মনের মধ্যে একটা অসহায় ক্ষোভ জেগে উঠল। ইজিচেয়ার থেকে উঠে নিজের কলবাক্সটা টেনে বের করে বসল। ছোট ছোট কাগজের বাক্সে নানান ইনজেকশন। কুইনিনের বাক্সটা বের করে তার ভিতর থেকে একটা অ্যাম্পুল বের করে সে ভেঙে ফেললে। জিভে চেখে দেখলে। সারা মুখটা তেতো হয়ে গেল।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বাইরে এসে বসল। ডাকলে—মঞ্জু মঞ্জু। ডাক্তারের স্ত্রী মঞ্জু, মঞ্জুলা।

মঞ্জু রান্নাঘরে রয়েছে। রান্নার লোকটা কিছুই জানে না। এটা যাকে বলে খাঁটি গাঁইয়ার দেশ। শাক শুক্তো চচ্চড়ি, থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়, এ ছাড়া কিছু জানে না। আর জানে খেঁড়ো নামক একটি বস্তু—কাঁচা তরমুজের তরকারি, আর কড়াইয়ের দাল আর টক। অম্বলকে বলে টক। এবং কাঁচা মাছে অম্বল রাঁধে। বড় বড় মাছের মাথা অম্বলে দিয়ে খায়। ভাল রান্না মানে তেলমসলার শ্রাদ্ধ। ডিসপেপসিয়া রোগটি জন্মানোর জন্যে—উৎকৃষ্ট সার দিয়ে জমি প্রস্তুত করা। ডাক্তারের রুচি আধুনিক—স্টু, সুপ, সিদ্ধ, সালাদ। এখানকার ওই গ্রাম্য লোকটি আজও পর্যন্ত নামগুলো আয়ত্ত করতে পারে নি। অগত্যা মঞ্জু দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দেয়। তা ছাড়া একটি কোর্স সে নিজে হাতে রান্না করে নেয়। ওটা মঞ্জুর শখ।

—মঞ্জু! আবার ডাকলে প্রদ্যোত।

—আসছি। এবার সাড়া দিলে মঞ্জু।

দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটির শ্রীটুকু বড় মধুর এবং কোমল, এর উপরে ওর বর্ণচ্ছটার মধ্যে একটা দীপ্তি আছে যা সচরাচর নয়, সাধারণ নয়। চোখ জুড়িয়ে যায়, মোহ জাগে মঞ্জুকে দেখে।

প্রাণচঞ্চলা আধুনিকা মেয়ে মঞ্জু। গান গাইতে পারে, আই. এ. পর্যন্ত পড়েছে; বাইসিক্ল চড়তে শিখিয়েছে ডাক্তার, বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়েছে।

—কী বলছ? আমার রান্না পুড়ে যাবে।

—কী রাঁধছ?

—টক। হাসতে লাগল মঞ্জু। কাঁচা মাছের টক। আমার ভারি ভালো লাগে। আগে বুড়ী দিদিমা বলত—আমরা হাসতাম। কিন্তু সত্যি চমৎকার সরষে ফোড়ন দিয়ে আর কাঁচা তেল ছড়িয়ে।

—বোসো তুমি এখানে। একা ভালো লাগছে না। গানটান গাও। মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। ওদের ছেলেটা এমন হঠাৎ মরে গেল—।

—রাঁধুনীটা বলছিল।

—কী বলছিল? ডাক্তার আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

—বলছিল—পাঁচজনে বলছে পাঁচ রকম।

—তবু ভালো, পাঁচজনে পঞ্চাশ রকম বলে নি। হাসলে প্রদ্যোত।

—তুমি কি সকালে বলে এসেছিলে কাল পথ্য দেবে?

—হ্যাঁ, কেন?

—ওই কথাটাই বেশী বলছে লোকে। তাতে চারুবাবু বলছেন শুনলাম—ওরে বাবা মৃত্যুর কথা কি কেউ বলতে পারে? ওর ওপরে ডাক্তারের হাত নাই।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। নিশ্ছিদ্র মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। পৃথিবীর উপরে একটা ছায়া ফেলেছে এই রাত্রিকালেও।

চকিত একটু বিদ্যুতাভাস খেলে গেল সীমাহীন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে। মৃদুগম্ভীর গর্জনে মেঘ ডেকে উঠল দূরে—অনেক দূরে। ডাক্তার মৃদুস্বরে বললে—শ্রাবণরাত্রির একটা গান গাও।

—আসছি আমি। ওকে বলে আসি—অম্বলটা ও-ই নামাবে।

—যাক। পুড়ে যাক। না নামায় তো কাল ওটাকে দূর করে দিয়ো।

মঞ্জু মৃদু গুনগুনানি সুরে ধরলে—

এসো শ্যামল সুন্দর।
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে।

ডাক্তার চোখ বুজলে। সত্যি বৃষ্টি হলে দেশটা জুড়োয়। প্রাণটা বাঁচে। গান শেষ করে মঞ্জু উঠল, বললে—আমি আসছি। ততক্ষণ রেডিয়ো খুলে দিয়ে যাই। রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে। মন তার এখনও পড়ে আছে রান্নাশালে। ছ্যাঁক করে সম্বরা দিতে তার ভারি ভালো লাগে। ডাক্তার চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। তাহলে চারুবাবু তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন নি। প্রৌঢ় মোটের উপর লোক ভালো।

রেডিয়োতে যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে। গীটার। সুরটা কাঁপছে, কাঁদছে।

চারুবাবু কিন্তু ডিফিটেড সোলজার। হার মেনেছেন ভদ্রলোক। যাকে সাধু বাংলায় বলে আত্মসমর্পণ করেছেন। সারেণ্ডার করেছেন। "মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না। ওর ওপর ডাক্তারের হাত নাই।"

আছে। হাত আছে। এখানে যদি একটা ক্লিনিক থাকত। গোড়াতেই যদি ব্লাড কালচার করে নেওয়া যেত। এবং ওষুধ যদি খাঁটি হত। কে বলতে পারে—বাঁচত না ছেলেটা?

রেডিয়োতে গান বেজে উঠল—মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান। ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করে উঠে গিয়ে রেডিয়োটা বন্ধ করে দিলে।

কম্পাউণ্ডের ফটকটায় হর্নের শব্দ উঠল। সাইকেল রিক্শার হর্ন। কে এল? কেন? কল? ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে থেকে ছোট স্টোভল্যাম্পটা বের করে নিয়ে এল। দুটো রিক্শা। একটি রিক্শায় একটি তরুণী, অজ্ঞান অবস্থা বলে মনে হচ্ছে। এ গাঁয়ের দাইটা তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। সর্বাঙ্গ কাপড় দিয়ে ঢাকা। মাথাটা দাইয়ের কাঁধের উপর ঢলে পড়েছে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে নীল হয়ে যাচ্ছে, বিকৃত হচ্ছে। কাপড়খানার নিচের দিকে রক্তের দাগ। ডেলিভারি কেস। বোধ করি প্রথম সন্তান আসছে। ডাক্তারের আলোটা হাতে নেমে পড়ল। ডাকলে—হরিহরবাবু! মিস দাস!

কম্পাউণ্ডার আর মিডওয়াইফ। কিন্তু ও কে? পিছনের রিক্শায়?

স্থূলকায় বৃদ্ধ? জীবনমশায়?

জীবনমশায় শশীকে পৌঁছুতে গিয়েছিলেন। শশীর প্রতিবেশী গণেশ ভটচাজের প্রথম সন্তান-সম্ভবা কন্যা—তখন সূতিকাগারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। জীবনমশায়কে পেয়ে তারা তাঁকে ছাড়ে নি। জীবন মশায় এক্ষেত্রে কী করবেন? তবু তারা মানে নি। বলেছিল—হাতটা দেখুন।

—হাত দেখে কী করব? আগে তো প্রসব করানো দরকার। যারা প্রসব করাতে পারে তাদের ডাকো। নয়তো হাসপাতালে নিয়ে যাও।

তাই নিয়ে এসেছে। কিন্তু জীবনমশায়কে ছাড়ে নি।

—আপনি থাকুন মশায়। কণ্ঠস্বরে মেয়ের বাপের সে কী আকুতি!

মশায় উপেক্ষা করতে পারেন নি।

শার্টের আস্তিন গুটিয়ে যথানিয়মে হাত ধুয়ে, বীজাণুনাশক লোশন মেখে ডাক্তার তৈরী হয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

—আপনি প্রসবের জন্য কোনো ওষুধ দিয়েছেন?

—না।

—গুড। আপনি কি অপেক্ষা করবেন?

—হ্যাঁ। একটু থাকি। হাসলেন মশায়।

—আচ্ছা। বসুন ওই চেয়ারটায়। নাড়ী দেখে কিছু বলেছেন নাকি?

—নাড়ী দেখেছি। কিন্তু—

ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় জান্তব গোঙানির মতো গোঙানি উঠল।

—ডাক্তারবাবু! মিস দাসের কণ্ঠস্বর।

প্রদ্যোত ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। জীবনমশায় শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। একটা অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। কেন তিনি এলেন? ওদের ইচ্ছে প্রসবের পর তিনি একবার নাড়ী দেখেন। কিন্তু প্রসব হতে গিয়েই যদি—

—বসুন মশায়। বললে হরিহর কম্পাউণ্ডার। হরিহর গরম জল, তুলো, পরিষ্কার ন্যাকড়া ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে।

—বেশ আছি হে। হাসলেন মশায়। মেয়েটির বয়স হয়েছে। প্রায় তিরিশ। চিন্তা হচ্ছে তাঁর।

চমকে উঠলেন মশায়। মেয়েটি আবার যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে—আরও কিছু। হ্যাঁ ঠিক। নবজাতকের প্রথম কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। জয় পরমাপ্রকৃতি! জয় গোবিন্দ!

—হরিহরবাবু, গরম জল। তুলো। প্রদ্যোত ডাক্তারের ধীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আশ্চর্য ধীর এবং শান্ত এবং গম্ভীর।

*　　　*　　　*

তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। মেয়েটির বাবা বললে—ডাক্তারবাবু!

—সেফ ডেলিভারি হয়েছে। খোকা হয়েছে।

—নীহারের জ্ঞান হয়েছে?

—না।

—হয় নি?

—না। আজ বাড়ি যান। যা করবার আমি করব। এখানে থেকে গোলমাল করলে কোনো উপকার হবে না। যান, বাড়ি যান। আপনিও বসে আছেন? মাফ করবেন, এখন নাড়ীটাড়ী দেখতে দেব না আমি। কিছু মনে করবেন না যেন। আমার জ্ঞানমতো নাড়ী ভালোই আছে, এই পর্যন্ত বলতে পারি।

ডাক্তার চলে গেলেন নিজের বাসায়।

—মঞ্জু!

—চা ছাঁকছি।

—মেনি থ্যাঙ্কস, মেনি মোর থ্যাঙ্কস, জলদি আনো—চা খেয়ে গিয়ে দরকার হলে আবার ইনজেকশন দেব।

—কেস কি—?

—নট্ গুড্, আবার খারাপও নয় খুব। বাট্ শী মাস্ট লিভ্, বাঁচাতে হবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললে—প্রথমটা আমার কিন্তু ভারি রাগ হয়ে গেছল। হোয়াট্ ওল্ড্ ম্যান, ফেমাস মহাশয় অব্ দিস্ প্লেস—সে সঙ্গে এসেছিল।

—কোনো খারাপ কথা বল নি তো?

—না। তবে এখন ওরা চাইছিল—মশায় একবার নাড়ী দেখে। আমি বলে দিয়েছি, না—তা আমি দেব না।

—ওঁকে চা খেতে ডাকলে না কেন?

—ডাকা উচিত ছিল, না?

—নিশ্চয় ছিল।

চায়ের কাপ নামিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রদ্যোত আবার হাসপাতালের দিকে চলল। আর একটা ইনজেকশন দিতে হবে। মশায় চলে গেছেন। একটু অন্যায় হয়ে গেল। ঢং ঢং শব্দে ঘড়ি বাজছে। রাত্রি বারোটা। রোগীর ঘর থেকে মৃদু যন্ত্রণার শব্দ শোনা যাচ্ছে। যন্ত্রণা কমে এসেছে। শী মাস্ট লিভ; বাঁচাতে হবে মেয়েটাকে। হরিহর বেরিয়ে এল।

—কেমন আছে এখন?

—ভালোই মনে হচ্ছে।

—ভালোই থাকবে। ইনজেকশন বের করুন।

ডাক্তার সিরিঞ্জটা উঁচু করে আলোর সামনে ধরলেন। আবার যেন ফটফটা খুলল? কে এল আবার?

এগিয়ে গেল হরিহর। রতনবাবুর লোক।

—কী, হিক্কা খুব বেড়েছে?

—আজ্ঞে না। সেই শহর থেকে রেপোর্ট এসেছে, তাই বুড়োবাবু বললেন—ডাক্তারবাবু যদি জেগে থাকেন তো দিয়ে আয়।

বিপিনবাবুর ইউরিন রিপোর্ট।

—হিক্কা কেমন আছে?

—তেমনিই আছে। একটুকু কম বলে লাগছে।

একটা ক্লিনিক যদি এখানে থাকে! এক্স-রে—ইলেকট্রিসিটি না হলে উপায় নাই। ময়ূরাক্ষী স্কীম হতে আরও কয়েক বছর লাগবে। তার আগে সে আর হবে না। কিন্তু একটা ক্লিনিক। কত লোক যে বাঁচে! আজ কি এই মেয়েটাই বাঁচত? হাসপাতাল যন্ত্রপাতি—এসব না থাকলে এ মেয়েটাও আজ মরত।

জীবনমশায় হাত দেখে ঘাড় নেড়ে বলত—কী করবে? এ কার হাত? তোমার, না—আমার?

আঠারো

জীবন দত্ত ডাকে গেলে আতর-বউ ঘুম পেলে ঘুমকে বলেন—চোখের পাতায় অপেক্ষা করো, এখন চোখে নেমো না। সে আসুক, তারপর। শুয়ে শুয়েও জোর করে জেগে থাকেন। চোখের পাতা ঢুলে নেমে আসে, আতর-বউ জোর করে চোখ মেলেন,—পাশ ফেরেন, রাধাগোবিন্দ বলে ইষ্টনাম করেন; বেশী ঘুম পেলে উঠে বসে পানদোক্তা খান—মধ্যে মধ্যে নন্দকে তিরস্কার করেন; নন্দকে নয়, নন্দর নাকডাকাকে—বলেন, নাক মানুষের ডাকে; কিন্তু তাই বলে এমনি করে ডাকে? শিঙের ডাক হার মানে! শুধু শিঙের ডাক? মনে হচ্ছে কেউ যেন করাত দিয়ে দরজা কাটছে! নন্দ, অ-নন্দ। শুনছিস, একটু কম করে নাক ডাকা বাপু। পাশ ফিরে শো।

জীবন দত্ত এলেই এ সব সমস্যার সমাধান হয়। তিনি কোনো দিন জিজ্ঞাসা করেন—কেমন দেখে এলে গো? কোনদিন কোন প্রশ্ন করেন না, নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়েন—এবং আধ মিনিটের মধ্যেই তাঁর নিজের নাক ডাকতে শুরু করে।

নন্দ উঠে হাতমুখ ধোবার জল দেয়, হাতমুখ ধুয়ে ইষ্ট স্মরণে বসেন, তারপর খাবারের ঢাকা খুলে খেতে বসেন। নন্দ তামাক সাজে, হুঁকো-কল্কে হাতে দিয়ে নন্দও গিয়ে শুয়ে পড়ে; খেয়ে উঠে মশায় তামাক খান—আর ভাবেন। রোগের কথা। কোনোদিন মৃত্যুর কথা। যেদিন রোগী মারা যায়—সেদিন ফিরে এসে চিকিৎসাপদ্ধতির কথাটা ভেবে দেখেন, ক্রটি মনে হলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন; না-হলে মৃত্যুর কথাই ভাবেন। তারপর গোবিন্দ স্মরণ করে শুয়ে পড়েন। যেদিন ডাক থাকে না, সেতাবের সঙ্গে দাবা খেলে কাটে, সেদিন ভাবেন—দাবার চালের কথা। একটার আগে কোনোদিন ঘুমোনো হয় না। আজ বাজে বোধ হয় দুটো—আড়াইটে।

* * *

পরদিন ঘুম ভাঙতে দেরি হল।

প্রথমেই মনে হল—গণেশ ভটচাজের মেয়েটির কথা। কেমন আছে? ডাকতে গেলেন নন্দকে; জিজ্ঞাসা করবেন গণেশ ভটচাজের বাড়ির কেউ এসেছে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই সাধারণের চেয়ে আয়তনে বড় তাঁর মাথাটি বার বার 'না—না' বলে যেন দুলে উঠল। এবং গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে উঠলেন—জয় গোবিন্দ পরমানন্দ!

হাত জোড় করে জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন—নমঃ বিবস্বতে ব্রহ্মণভাস্বতে বিষ্ণু-তেজসে জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে—নমঃ!

মৃত্যুধ্রুব এই পৃথিবীতে এত চঞ্চল হলে চলবে কেন?

মুখহাত ধুয়ে চা খেতে বসলেন। তামাক সেজে দিয়ে নন্দ হুঁকোটি বাড়িয়ে ধরল; বললে—আজকে আট-দশজন রুগী এসেছে।

হুঁকোয় টান দিয়ে মশায় বললেন—নবগ্রামের কেউ এসেছে? গণেশ ভটচাজ?

—না তো।

—হুঁ। মশায় ক্ষুণ্ণ হলেন একটু। কাল রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তিনি গণেশের জন্য বসে ছিলেন, ওই প্রদ্যোত ডাক্তারের রূঢ় কথা শুনে এলেন, আর আজ একটা খবরও দিলে না? বেশ বুঝলেন—মেয়ে ভালো আছে। উৎকণ্ঠা কমে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গিয়েছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

নন্দ বললে—চেঁচামেচি করছে সেই বামুন, দাঁতুঠাকুর।

—কেন? কাল তো তাকে এক সপ্তাহের ওষুধ দিয়েছি?

—সে আবার এসেছে। গাঁজা না খেয়ে তার ঘুম হয় নাই। বলছে হয় গাঁজা খেতে বলুক, নয় ঘুমের ওষুধ দিক। এসে থেকে চেঁচাচ্ছে।

—চেঁচাক। পরান খাঁ এসেছে?

—না। এখনও আসে নাই। এইবার আসবে।

বার কয়েক হুঁকোয় টান দিয়ে হুঁকোটা নন্দর হাতে দিয়ে মশায় উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—রোগীদিকে বসতে বলবি। আমি এখন যাব—একবার মহাপীঠে মহন্তকে দেখতে।

নন্দ মাথা চুলকে বললে—তা ওদিকে একবার দেখে ওষুধপাতি লিখে দিয়ে গেলেই তো হত। পরান খাঁ গাড়ি নিয়ে আসবে, সেই গাড়িতেই পথে গোসাঁইকে দেখে আসতেন।

মশায় জবাব দিলেন না। শুধু ফতুয়াটা গায়ে দিয়ে পকেটে স্টেথোসকোপটা পুরে পুরনো জুতো জোড়াটা পরতে লাগলেন। নন্দ গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল—যত বেগারের কাজ; সকালে বিনি পয়সায় রুগী দেখা! এমন করলে রুগী আসবে কেন? হুঁ। এই করেই এমন হয়! সেই মিত্তিরিবাবু বলে গিয়েছিল—মহাশয় লোকের কথা—সে কি মিছে হয়?

মশায় হাসলেন। মনে পড়েছে। প্রৌঢ় জমিদার গো·হার মিত্তিরের কথা বলছে নন্দ। নন্দ ছিল তখন সেখানে, শুনেছিল।

* * *

আরোগ্য-নিকেতনে তখন সে কী ভিড়! চল্লিশ পঞ্চাশ ষাটজন রোগী!

জগৎমশায়ের মৃত্যুর পর আরোগ্য-নিকেতনের দৈন্যদশা এসেছিল। সে দৈন্যদশাকে জীবন দত্ত তখন কাটিয়ে আবার সমৃদ্ধি ফিরিয়ে এনেছেন। রঙলাল ডাক্তারের কাছে শিক্ষা শেষ করে তখন তিনি অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি, মুষ্টিযোগ—তিন ধারার ওষুধ নিয়ে চিকিৎসা করেন। গুরু রঙলাল রহস্য করে বলেছিলেন—ট্রাইসিকেলে চেপে চল তুমি। সে ট্রাইসিকল তাঁর ভাগ্যগুণে এখনকার মোটরলাগানো তিন চাকার ভ্যান হয়ে উঠেছিল।

আরোগ্য-নিকেতন নাম তখন হয়েছে। তিন-তিনজন লোক খাটত। অ্যালোপ্যাথি ওষুধের কম্পাউণ্ডার ছিল শশী। শশী বলত—'রম্‌রম্‌ প্র্যাকটিস।'

মদ খেলে বলত—জীবনমশায়ের প্র্যাকটিস—শা—; পানসী রে বাবা, পানসীর মতো চলছে—সন্ সন্ সন্ সন্।

মদ হতভাগা অল্প বয়স থেকেই খায়। নবগ্রামের বামুনবাড়ির ছেলে। ওর দৌরাত্ম্যে

ভাইনাম গ্যালেসিয়া, মৃতসঞ্জীবনী লুকিয়ে রাখতে হত। কোনোক্রমে পেলেই বোতলে মুখ লাগিয়ে খেয়ে নিত খানিকটা। বলত—রঙলাল দি সেকেণ্ড!

জীবনমশায়ের আকাঙ্ক্ষার কথা না জেনেই বলত।

বাড়িয়ে বলত। সে আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূর্ণ হয় নি। রঙলাল ডাক্তারের স্থান পূর্ণ করবার সাধ্য বা ভাগ্য তাঁর নয়; রঙলালের স্থান পূর্ণ হয় না। তবুও কতকটা পূর্ণ করেছিলেন—কীর্নাহারের নবীন ডাক্তার। সদর শহরে অবশ্য তখন একজন প্রতিভাবান ডাক্তার এসেছেন; গোকুল ডাক্তার। মেডিক্যাল কলেজের সোনার মেডেল পাওয়া ছাত্র। আশ্চর্য মানুষের ভাগ্য, এমন ডাক্তারেরও শেষ পর্যন্ত দুর্নাম হয়েছিল। লোকে বলত—গোকুল ডাক্তার ছুঁলে রোগী বাঁচে না। গোকুল ডাক্তারও তাঁকে সম্মান করতেন। নাড়ীতে কী পেলেন—সে কথা জিজ্ঞাসা করে মন দিয়ে শুনতেন।

নবগ্রাম অঞ্চলে তখন তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

জগৎ মশায়ের মৃত্যুর পর এখানে তিনজন ডাক্তার এসে বসেছিল। দুর্গাদাস কুণ্ডু প্রথম পাশকরা ডাক্তার। দুর্গাদাস তাঁকে উপহাস করে বলত—ঘাস-পাতা জড়িবুটির চিকিৎসক।

তারপর হরিশ ডাক্তার। হরিশ তাঁকে মানত। কিশোরের অসুখের সময় ডায়াগনিসিসে তাঁর কাছে ঠকে তার শিক্ষা হয়েছিল।

আর এসেছিল এক পাগল। খেতু বাড়ুরী। সে নিজে বলত—কে এম. ব্রারোরী, হোমিওপ্যাথ। ভালো লোক, সরল লোক, কিন্তু পাগল। চুরোট খেত, চায়না-কোট পরত। বলত—ওদিকে হরিশ ডাক্তার, এদিকে আমি, মাঝখানে দত্তটা চাপা পড়ে মারা গেল। ওকে আর কেউ ডাকবে? নাড়ী দেখে কেমন আছে—এর জন্যে ওকে কে ডাকবে? ফুঃ!

দুর্গাদাস কুণ্ডু সর্বপ্রথম এসেছিল—চলেও গিয়েছিল সর্বপ্রথম। বলে গিয়েছিল—জানতাম না এটা গোরুভেড়ার দেশ। ঘাসপাতা জড়িবুটিতে এদের অসুখ সারে। অ্যালোপ্যাথি বিলিতী ওষুধ খাটে না।

এরপর বাড়ুরীও পালাল। ছিল শুধু হরিশ। নবগ্রামের ব্রজলালবাবু চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি স্থাপন করলেন, সেখানে চাকরি পেয়ে থাকতে পেরেছিল। মাইনে ছিল তিরিশ টাকা।

জীবন দত্ত তখনই হলেন মশায়। আয় কত মনে নাই। হিসেব নাই। দিনরাত্রিতে বিশ্রাম ছিল না। আরোগ্য-নিকেতনে রোগী দেখতে বেলা তিনটে বেজে যেত।

হিন্দু, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, মুসলমান; পুরানো মহগ্রামের খাঁয়েরা, পশ্চিম-পাড়ার শেখেরা, ব্যাপারীপাড়ার ব্যাপারীরা, মীরপাড়ার মিয়ারাও এসেছেন গোরুর গাড়ি করে। ডুলি এসেছে, গাড়ি এসেছে, পালকি এসেছে। সেদিন পাঁচ ক্রোশ উত্তর থেকে এসেছিলেন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের এই গৌরহরি মিত্র মহাশয়। খোলা দরজার ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে পালকিতেই শুয়ে ছিলেন।

তিনিই সেদিন আরোগ্য-নিকেতনে প্রথম এসেছিলেন। কিন্তু জীবন মশায় শেষ রাত্রে কলে গিয়েছিলেন নবগ্রামে। ওই নিঃস্ব জমিদার রায়চৌধুরীদের এক শরিকের বাড়ি। বৃদ্ধ গৌরাঙ্গ রায়চৌধুরী অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাস রোগ। তাঁকে দেখেই ওঁর কর্তব্য শেষ হয় নি, তাঁর জীবন থাকতে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাতেও থাকতে হয়েছিল। বৃদ্ধকে পালকিতে গঙ্গাতীরে রওনা করে দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। এবং প্রথমেই দেখেছিলেন মিত্র মহাশয়কে। তাঁর কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন।

—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে আপনাকে। কিন্তু কী করব? আমাদের এখানকার প্রবীণ জমিদার, প্রাচীন জমিদারবংশ—।

সংক্ষেপে বিবরণটুকুও বলতে হয়েছিল।

মিত্র হেসে বলেছিলেন—দত্ত মহাশয়। না, দত্ত আর নয়, আপনি এবার আপনাদের পৈতৃক স্বত্ব মহাশয়ত্বের অধিকারী হয়েছেন। এ অবশ্য আপনারই যোগ্য কাজ। কিন্তু এদিকেও একটু লক্ষ্য রাখবেন। দূরদূরান্তর থেকে আসে সব, এরাই আপনার লক্ষ্মীর দূত। কষ্ট পেলে অবহেলা করলে ততদিনই আসবে যতদিন আর একজনকে না পাবে।

জীবন মহাশয়ের মনে একটু লেগেছিল। কথাটা লাগবার মতোই কথা। তিনি বলেছিলেন—অবহেলা আমি করি না। সে করলে আমার পাপ হবে, সে সম্পর্কে আমি অবহিত। কষ্ট লাঘবের চেষ্টাও আমি সাধ্যমতো করি।

তাও করতেন। বেলা বেশী হলে—রোগীদের শরবত সাগু বার্লি দিতেন। আরোগ্য-নিকেতনের পাশে তখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য নিয়ে কুয়ো করিয়েছিলেন।

বাতাসা পাটালি চিঁড়ে মণ্ডার দোকানও একটা বসত তখন।

মশায় আরও বলেছিলেন—আর পসারের কথা। সে ভগবানের দয়া, গুরুর শিক্ষা আর আমার নিষ্ঠা। সবচেয়ে বড় কথা—ভাগ্য। যতদিন থাকবার ততদিন থাকবে। এখন বলুন, আপনার কষ্টের কথা বলুন। কী কষ্ট? যিনি দেখেছিলেন—তিনি কোনো ব্যাধি বলেছেন?

মিত্র বলেছিলেন—একটু নিরালা হলে ভালো হয়।

ওই নন্দই ছিল ঘরে। মশায় নন্দকে বাইরে যেতে ইশারা করেছিলেন। নিরালায় বলেছিলেন—কন্যার বাড়ি যাচ্ছি। শেষ বয়সে তারই স্কন্ধে ভার হয়ে পড়তে হল। বিষয়-সম্পদ সব গিয়েছে মামলায়। স্ত্রী গিয়েছেন। এটা ওটা করেই চালাচ্ছিলাম, মদ্যপান করি প্রচুর। আত্মহত্যা করতে পারি না ভয়ে। কন্যা নিয়ে যাচ্ছে, আমারও না গিয়ে উপায় নাই। পথে বের হয়ে ভাবলাম আপনাকে একবার দেখিয়ে যাই। কতদিন বাঁচব বলতে পারেন? আপনার নাড়ীজ্ঞানের প্রশংসা শুনেছি। দেখুন তো আমার হাতটা।

দমে গিয়েছিলেন ডাক্তার। বলেছিলেন—আমার সে শক্তি নাই। সে শক্তি কদাচিৎ কারও শোনা যায়। রোগ নাই—

—রোগ আছে! লিভার বেদনা। মাথায় গোলমাল হয়।

—ও মদ্যপানের ফল। মদ্যপান করলে বাড়বে। ছাড়লে কমে যাবে। নীরবে দুটি

টাকা রেখে গৌরহরি উঠলেন। জীবন বললে—আমাকে মাফ করবেন। ফী আমি নিতে পারব না। বাড়িতে এই আরোগ্য-নিকেতনে ফী নেওয়া আমাদের পূর্বপুরুষের নিষেধ আছে।

—কোনো গরিব রোগীকে টাকা দুটো সাহায্য হিসেবে দিয়ে দেবেন। আমি তো ফী না দিয়ে দেখাই না। দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ ঈষৎ কুব্জ মানুষটি ধীরে ধীরে চলে গিয়েছিলেন। স্পষ্ট মনে পড়ছে তাঁর ছবি। এর পরই এসেছিলেন আর-এক অভিজাত বংশের সন্তান—ঠাকুরপাড়ার মিঞা।

—আদাব গো ডাক্তার।

—আদাব আদাব, বসুন। কী ব্যাপার?

এককালে মিঞা সাহেবেরা ছিলেন এ অঞ্চলের অধিপতি—নবাব। খেতাব ছিল ঠাকুর। তাঁরা নাকি যোগী বংশ। মুসলমান সমাজের গুরু। কিন্তু পরবর্তী কালে সম্পদে বৈভবে বিলাসে হয়েছিলেন ভ্রষ্ট। তখন সর্বস্বান্ত। শুধু তাই নয়—বংশধারা পর্যন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে মিঞা বলেছিলেন—গায়ে যে চাকা-চাকা দাগ দেখা দিচ্ছে মশায়। পিঠে জানুতে—এই দেখেন পায়ের ডিমিতে একটা হয়েছে।

পা-জামাটা তুলে দেখালেন মিঞা সাহেব।

—হুঁ! সাড় আছে?

—উঁহু।

ডাক্তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। চোখে পড়ে—কানের পেটি নাকের ডগা ঈষৎ লাল হয়েছে। বংশের অভিশাপ! সেই ব্যাধি! তাতেই মৃত্যু হয়েছে কয়েক জনের। দুজন এখনও ভুগছেন।

—ডাক্তার!

—বলুন ঠাকুরসাহেব।

—বলেন?

—কী বলব? বংশের রোগ বলেই মনে হচ্ছে। আপনি সময় থেকে চিকিৎসা করান। আমাদের এখানে ওষুধ নাই। তৈরী করতে অনেক খরচ। আপনি কলকাতা থেকে ওষুধ আনিয়ে ব্যবহার করুন।

—তাই লিখে দেন ডাক্তার।

উঠলেন মিঞা সাহেব।

ডুলি করে এসেছেন নারায়ণপুরের ভটচাজ মশায়।

বহুমূত্র হয়েছে।

বহুমূত্র, বাত, নবজ্বর, পুরানো জ্বর, গ্রহণী, অতিসার।

প্রহ্লাদ বাগ্দী এসেছে। দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল। ডাকাত। জেলখাটা আসামী।

—কী রে, তোর আবার কী?

—আর কী ডাক্তারবাবু—জল-ঘা।

—আবার? জল-ঘা অর্থাৎ উপদংশ। এবার বোধ হয় প্রহ্লাদের পঞ্চমবার।

মাথা চুলকে প্রহ্লাদ বলে—যে গোরু অখ্যাত্তি খায়, সে কি ভুলতে পারে মশায়?

হাসলেন ডাক্তার।

নবগ্রামের বড়কর্তার বাড়ি যেতে হবে, ডাক আছে। তাঁর ছোট ছেলের চতুর্থবার প্রমেহ দেখা দিয়েছে।

তাঁর বাবার কথা মনে পড়ত। তিনি বলতেন—জীবনে আয়ু আর পরমায়ু কথা দুটো শুধু কথার মারপ্যাঁচ নয় বাবা! ওর অর্থ হল নিগূঢ়। দীর্ঘ আয়ু হলেই পরমায়ু হয় না, আর আয়ু স্বল্প হলেই সেটা পরমায়ু হয় না এমন নয়। যার জীবন পবিত্র পরমানন্দময়, পরমায়ু হল তার। নইলে বাবা—শক্তি চর্চা করেও মানুষ দীর্ঘায়ু হয়। রোগকে সহ্য করে, এমন কি জয় করে।

কথাটা তিনি এই প্রহ্লাদ সম্পর্কেই বলেছিলেন। প্রথমবার উপদংশের আক্রমণে প্রহ্লাদ চিকিৎসা করায় নি। এটা ওটা মলম ব্যবহার করেছিল। দ্বিতীয়বার এসেছিল জগৎ মশায়ের কাছে। সেই উপলক্ষেই বলেছিলেন। প্রহ্লাদ সেবার বলেছিল—লোকে দেখাতে বলছে, তাই—। নইলে—ও আপুনিই ভালো হয়।

প্রহ্লাদ আজও বেঁচে আছে। আজও লাঠি খেলে বেড়ায়। আজও মাটির উপরে বাহু ঠুকে আছাড় খেয়ে পড়ে।

প্রহ্লাদ বলত—তবে চিকিৎসাতে তাড়াতাড়ি সারে। তা ওষুধ দেন।

তখন ইনজেকশন ওঠে নি। ওষুধ নিয়ে—টাকা দিয়ে প্রণাম করে চলে যেত প্রহ্লাদ। এক টাকা ফী-ও দিত।

ডাক্তার বলতেন—এ কী রে? ফী কেন? বাড়িতে আমি ফী নিই কবে?

—এই দেখেন, বখিপেনামী না দিলে রোগ যে দেহ ছাড়ে না! আর তো দোব না!

এতকালের খাতার মধ্যে প্রহ্লাদের নামে বাকি হিসাব নেই।

তারপর একের পর এক আসত রোগী। আমাশয়, জর, ম্যালেরিয়া, রেমিটেন্ট, টাই-ফয়েডও দু-একটা আসত; গ্রহণী, তা ছাড়া কত রোগ। এক এক রোগীর তিন-চারটে রোগে মিশে সে এক জটপাকানো জটিল ব্যাপার। তাঁর বাবা বলতেন—শাস্ত্রে আছে সকল বিকারের অর্থাৎ রোগের আবিষ্কার আজও হয় নি। যদিও কোনো রোগ নতুন মনে হয় তবে তার নাম জান না বলে সংকুচিত হবে না, লজ্জিত হবে না। লক্ষণ দেখে তার চিকিৎসা করবে। এ যুগে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে ল্যাবোরেটরি হয়েছে। সে যুগে তাঁদের সে সুযোগ ছিল না।

তারপর আরম্ভ হত 'পাইকিরি দেখা'। এ নামটা শশীর আবিষ্কার।

রোগীরা এলে—কার কী অসুখ জেনে কম্পাউণ্ডারেরা দুই ভাগে ভাগে করে রাখত। সহজ রোগীদের আলাদা করে একদিকে বসাত। অবশ্য অবস্থাপন্ন মান্যগণ্য রোগীদের রোগ

সহজই হোক আর কঠিনই হোক—তাদের দেখার কাল ছিল প্রথমেই।

পাইকিরি দেখার সময় ডাক্তার এসে বাইরে দাওয়ার উপর বসতেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকত গোপাল কম্পাউণ্ডার। রোগী দেখে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন বলতেন—সে লিখত। শশীর উপর তিনি নির্ভর করতে পারতেন না। অন্যমনস্ক শশী কী লিখতে কী লিখবে কে জানে? তা ছাড়া লেখার পর শশী নিজেই পড়তে পারত না কী লিখেছে। ডাক্তারকেই এসে জিজ্ঞাসা করত—কী বলেছেন বলুন তো! লেখাটা ঠিক পড়তে পারছি না।

আরোগ্য-নিকেতনে তখন তিনজন কম্পাউণ্ডার। শশী, গোপাল, আর কবিরাজি বিভাগে ছিল বাপের আমলের বুড়া চরণদাস সিং। নীরবে ঘরের মধ্যে বসে শুঁঠ আমলকী চূর্ণ করত, মোদক পাকাত, পুরিয়া বাঁধত।

ডাক্তার বলে যেতেন কুইনিন সালফেট ১০ গ্রেন, অ্যাসিড সাইট্রিক ২০ গ্রেন, ম্যাগসালফ ১০ গ্রেন, স্পিরিট এনেসি ৫ ফোঁটা, জল—।

—আগে এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে দাও।

সে যেত। আর একজন আসত। আমাশয়। অনেক দিনের। ডাক্তার ডাকতেন—সিংমশায়। চরণদাস এসে দাঁড়াত।

—একে 'রেসা খাদ্যে' দেবেন তো। ওটা তাঁদের মুষ্টিযোগ।

—তোমার কী?

—সূর্য্যিফোড়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে মাথা ধরা শুরু হয়—সূর্যাস্তের পর ছাড়ে। এর মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা।

জীবন দত্ত আবার ডাকতেন—সিংমশায়! সূর্য্যিফোড়ের মুষ্টিযোগ বলে দিয়ে নতুন রোগীর দিকে মন দিতেন। হঠাৎ চকিত হয়ে উঠতেন।

তিনদিন অল্প জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা। একজ্বরী। জিভ দেখি—জিভ দেখেই ডাক্তার সতর্ক হয়ে বসেন—দেখি, নাড়ী দেখি। নাড়ী ধরে চোখ বোজেন। ও হাতটা দেখি।

—হুঁ, এসো তো বাপু, টেবিলের উপর শুয়ে পড়ো তো। পেটটা দেখি। ফাঁপ আছে কি না?—হুঁ।

—তুমি বাপু সাবধানে থাকবে। তোমাকে দুদিন ঘোরাবে বোধ হয়। বুঝেছ?

নাড়ীতে যেন শক্ত রোগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। স্পষ্ট বিকাশ এখনও হয় নি। তবে মনে হচ্ছে। জিভ পেটও তাই সমর্থন করছে। টাইফয়েড।

—গোপাল, কাগজ আনো।

প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতেই ডাক্তার বললেন—দেখো, দুবার জ্বর ওঠানামা করে কিনা লক্ষ্য রেখো।

—আজ্ঞে না। জ্বর তো নাই। ওই একভাবে—সুতোর সঞ্চারে—

—না না। ভালো করে লক্ষ্য কোরো। ভাত-মুড়ি—এসব খেয়ো না। সাগু খাবে। সাগু। দুধ? উঁহু—দুধ খেয়ো না। আর নিজে এমন করে এসো না। বুঝেছ? হ্যাঁ,

ঘোরাতে পারে দুদিন।

ব্যস। এইবার গ্রামের কটি রোগীর বাড়ি যেতে হবে। তারপর নবগ্রাম। সাহাদের বাড়িতে একটা নিউমোনিয়া কেস, সুবর্ণবাবুর ছেলের রেমিটেন্ট ফিবার, রমেন্দ্রবাবুর ছোট ছেলের প্রমেহ, নেপালের স্ত্রীর সূতিকা। কেউ ফী দেবে কেউ দেবে না। যারা দেবে, তাদেরও দু-একজনের বাকি থাকবে।

এ ছাড়া পথে আরও কত জন কত বাড়ি থেকে তাঁকে ডাকত।—মশায়, একবার আমার ছেলেকে দেখুন। ছেলে কোলে নিয়ে পথের ধারেই দাঁড়িয়ে থাকত দু-একজন। কারও কারও বাড়ি যেতে হত। বৃদ্ধ, শয্যাশায়ী যারা—তারা পথের ধারে দাঁড়ায় কী করে?

—মশায়, একবার যদি আমার মাকে দেখে যান!

মনে পড়ছে, সেদিন সেতাব তাঁকে যোগী বাঁড়ুজ্জেকে দেখতে ডেকেছিল।

—জীবন, একবার বাপু যোগী বাঁড়ুজ্জেকে দেখে যা। ছেলেপুলে নাই, আমাকেই বললে যোগী—যদি জীবনমশায়ের সঙ্গে দেখা হয় বোলো, একবার যেন দেখে যান আমাকে। চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারির ওষুধে তো কিছু হল না।

সেতাব নেপাল এরা দুজনে এই সব রোগীদের পৃষ্ঠপোষক ছিল। ওরা তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকত।

জীবন দত্ত হাসিমুখেই যেতেন। ওদের বলতেন—বলিস, বুঝলি, খবর দিয়ে বলিস। আমি দেখে যাব।

নেপাল খবর আনত—হরিহর ডোম খুব ভুগছে। চল একবার যাবি। গোপলা বাউড়ীর মায়ের জ্বর, তাকেও একবার দেখে যাবি চল।

হরিহরের অসুখ ভালো হলে তার কাছে একটা পাঁঠা আদায় করবে নেপাল। সে জীবন দত্ত জানতেন। এবং সেই পাঁঠাটা নিয়ে চাল ডাল ঘি মশলা তরিতরকারি নেপাল নিজে দিয়ে একদিন ফিস্ট করবে। জীবন দত্তকে দিতে হবে—মাছ-মিষ্টি।

বাড়ি ফিরতে অপরাহ্ণ। পকেটে টাকায় আধুলিতে দশ-বারো টাকা। ফী ছিল তখন এক টাকা। দিনান্তে ফী একবার। দ্বিতীয়বারের ফীয়ের রেওয়াজ ছিল না। জামাটা খুলে দিতেন আতর-বউকে। ছেলে বনবিহারী মেয়ে সুষমা এসে দাঁড়াত।

—বাবা পয়সা!

জীবন দত্ত ফেরবার পথে আধুলি ভাঙিয়ে নিয়ে ফিরতেন। তার মধ্যে পয়সা কিছু থাকতই। বনুর চারটি, সুষমার দুটি। বনু নিত ডবল পয়সা, বলত, বড় পয়সা নোব। সুষমার ছোটবড় বিচার ছিল না; দুটি হলেই সন্তুষ্ট হত। ছেলে আর মেয়ে। নোট-বইটা খুলে লিখে রাখতেন—রমেন্দ্রবাবুর বাড়ির ফী বাকি রইল।

বাড়ির বাইরে তখন আরোগ্য-নিকেতনের সম্মুখে বামনি গাঁয়ের শেখেদের গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণপুরের লোক এসেছে। কায়স্থপ্রধান সমাজ কৃষ্ণপুর। মিত্রদের বাড়ির চিঠি নিয়ে এসেছে—"দত্ত মহাশয়, একবার দয়া করিয়া আসিবেন। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একজ্বরী

জ্বর। রাঘবপুরের কবিরাজ দেখিতেছিলেন কিন্তু কিছু হইতেছে না। ইতি সুরেশচন্দ্র মিত্র।"

গৌরহরি মিস্ত্রিরের কথাটি নন্দ মনে করে রেখেছে। যখন-তখন বলে। জীবন মশায় হাসলেন ; আসলে ওটা নন্দর ক্ষোভ। সেকালের আরোগ্য-নিকেতনের গৌরবের যে ওরাও অংশীদার ছিল। পাওনাও হত অনেক। সেকালে ছিল কাঠের কলবাক্স। যেখানে মশায় পায়ে হেঁটে যেতেন সেখানে নন্দ বা ইন্দির যেত কলবাক্স মাথায় নিয়ে। কারুর বাড়ি দু আনা কারুর বাড়ি চার পয়সা প্রাপ্য হত ওদের। আজ বলতে গেলে সময়মতো ওরা মাইনেই পায় না।

দিন যায়, ফেরে না। দিনের সঙ্গে কাল যায়। কালের সঙ্গে গতকালকার নূতনের বয়স বাড়ে, পুরনো হয়, জীর্ণ হয়, যা জীর্ণ তা যায়। তাঁর খ্যাতিও গিয়েছে। তাতে আক্ষেপ নেই, কিন্তু দুঃখ একটু হয় বই কি। উপেক্ষা সহ্য হয় না। তাঁকে উপেক্ষা করলেও তিনি দুঃখ পেতেন না। এ যে বিদ্যাকে উপেক্ষা!

—আসুন! তাকে আহ্বান জানালে মোহান্তের শিষ্য ভোলানাথ। পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মহাপীঠের চারিপাশের বনভূমির একটি বিচিত্র গন্ধ আছে। কত রকমের ফুল এবং বিচিত্রগন্ধা লতা যে আছে এর মধ্যে! অনন্তমূলের রাজ্য বললে হয়।

ভোলানাথ বললে, সকাল থেকে আপনার জন্যে তাগাদা লাগিয়েছে বুড়ো। ডাকো মহাশয়কে! নাড়ী দেখুক!

উনিশ

সন্ন্যাসী সকালে সুস্থভাবেই অল্প মাথা তুলে শুয়ে রয়েছেন। যন্ত্রণা নেই। বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। জীবন দত্তকে দেখে বললেন—আইসো রে ভাই মহাশয়, আইসো! কাল রাতে তুমি আসিয়েছিলে ভাই, তখন আমি ঘুমিয়েছি। ওহি—শশী বেটা কী একঠো দাওয়াই দিলে—ব্যস, পাঁচ মিনিট কো ভিতর বে-হোঁশ হইয়ে গেলাম।

—আজ তো ভালো আছেন। ওষুধে তো ভালো ফলই হয়েছে। হাসলেন জীবন।

—কে জানে ভাই! ঘাড় নাড়লেন।

—কেন? কোনো যন্ত্রণা রয়েছে এখন? আর অসুখ কী?

—ঠিক সমঝাতে পারছি না। হাতটা তুমি দেখো ভাই। দেখো তো দাদা, ছুটি মিলবে কিনা!

—ছুটি নিতে ইচ্ছে হলেই মিলবে। ইচ্ছে না-হলে তো আপনাদের ছুটি হয় না।

—সে পুণ্য আমার নাই ভাই।

সে পুণ্য সন্ন্যাসীর নাই তা জীবন দত্ত বুঝেছেন। থাকলে বুঝতে পারতেন—কালকের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে গাঁজা না-খাওয়ার যন্ত্রণাটাই ছিল ষোলো আনার মধ্যে বারো আনা কি

চোদ্দ আনা। সে সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁর গিয়েছে, মন জীর্ণ হয়েছে বেশী। যাঁদের যোগের সাধনা থাকে তাঁদের মন অদ্ভুত শক্তিশালী, দেহের জীর্ণতা তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না, মনে তখন বাসনা জাগে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নূতন দেহ লাভের। এ কথা এ দেশের পুরনো কথা—বাবার কাছে শুনেছেন, আরও অনেক প্রবীণের কাছে শুনেছেন। প্রদ্যোতেরা একথা বিশ্বাস করবে না—হাসবে; কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন। মশায় সন্ন্যাসীর হাতখানি তুলে নিলেন।

সন্ন্যাসী ক্ষীণ কণ্ঠেই বললেন—মনে নিছে ভাই কি ছুটি মিলবে। কাল রাতে যেন মনে হইল রে ভাই কী—উধার থেকে দশ-বারোঠো খড়মকে আওয়াজ উঠছে। আউর মনে হইল—রঘুবরজীর আওয়াজ মিলছে। ওহি জঙ্গলের পঞ্চতপার আসনসে হাঁকছে, আও ভাইয়া! আও!

কথাগুলির অর্থ বুঝতে জীবনমশায়ের বিলম্ব হল না।

ও-ধারে—জঙ্গলের মধ্যে এখানকার পূর্বতন মহান্তদের সমাধি আছে। সেখান থেকে খড়মের আওয়াজ শুনেছেন সন্ন্যাসী। অর্থাৎ তাঁরা এসেছিলেন এঁকে আহ্বান জানাতে। রঘুবরজী এই সন্ন্যাসীর গুরুস্থানীয় এবং এঁর ঠিক আগের মহান্ত। তিনি ছিলেন সত্যকারের যোগী। যোগ সাধনায় দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলিকে যেমন শক্তিশালী করেছিলেন, বিচিত্র ব্রত পালন করে বাইরে প্রকৃতির প্রভাব সহ্য করবার শক্তিও তিনি তেমনি আয়ত্ত করেছিলেন। বৈশাখে পঞ্চতপা ব্রত করতেন—সূর্যোদয়ের সঙ্গে পাঁচটি হোমকুণ্ড জেলে—ঠিক মাঝখানে আসন গ্রহণ করতেন, সারাদিন আসনে বসে পর পর কুণ্ডে কুণ্ডে আহুতি দিয়ে সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর সে দিনের মতো হোম শেষ করে উঠতেন। আবার শীতে ওই গাছতলায় অনাবৃত দেহে বসে জপ করতেন; প্রথম পাখির ডাকের পর আসন ছেড়ে হিমশীতল পুষ্করিণীতে নেমে সূর্যোদয় পর্যন্ত অর্থাৎ উত্তাপ সঞ্চয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকতেন তিনিও তাঁকে ডেকেছেন, বলছেন!

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর পূর্বে মৃত স্বজনকে দেখেন। তাঁরা নাকি নিতে আসেন। সন্ন্যাসীর স্বজন বিস্মৃতির গহনে হারিয়ে গিয়েছে। এখানকার মহান্তেরাই তাঁর স্বজন, পূর্বপুরুষ—তাঁদেরই তিনি দেখেছেন।

নাড়ী দেখে হাত নামিয়ে জীবন দত্ত বললেন—হাঁ বাবা। ছুটি আসছে আপনার। আজ সন্ধ্যার পর। কাল যখন অসুখ খুব বেড়েছিল—সেই সময়। সেই রকম মনে হচ্ছে বাবা।

এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল সন্ন্যাসীর বিশীর্ণ বার্ধক্যশুষ্ক ঠোঁট দুটিতে। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললেন তিনি।

আজ চল্লিশ বৎসর সন্ন্যাসী এখানে আছেন। তিরিশ বৎসরের উপর তিনি এই দেবস্থানের মহান্ত। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে এখানে প্রথম এসেছিলেন তিনি। কিন্তু দেখে মনে হত তিরিশ বছরের জোয়ান। লম্বা-চওড়া কুস্তি-করা পালোয়ানী শরীর। শাস্ত্র-টাস্ত্র জানতেন না, গাঢ় বিশ্বাস আর কয়েকটি নীতিবোধ নিয়ে মানুষটির সন্ন্যাস। সন্ত না-হোক

সাধু মানুষ ছিলেন।

প্রথম পরিচয় হয়েছিল বিচিত্রভাবে।

দেশের তখন একটি ভয়াবহ অবস্থা। মড়ক চলছে, মহামারী কলেরা লেগেছে দেশে। এক গ্রাম থেকে আর-এক গ্রাম—সেখান থেকে আর-এক গ্রাম; বৈশাখের দুপুরে খড়ের চালের আগুনের মতো লেলিহান গ্রাস বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ল। সেকালে তখন কলেরার কোনো ওষুধ ছিল না। ক্লোরোডাইন সম্বল। কবিরাজিতে ওলাউঠার ওষুধ তেমন কার্যকরী নয়। ক্লোরোডাইন দেবারও চিকিৎসক নাই। যারা আছে তারা নিজেরাই ভয়ে ত্রস্ত। হরিশ ডাক্তার কলেরায় যেত না। হোমিওপ্যাথ ব্রারোরি তখন পালিয়েছে। থাকলে সেও যেত না। নতুন একজন ডাক্তার এসেছিল নবগ্রামে, সেও একদিন রাত্রে পালিয়ে গেল—কলেরা কেসে ডাকের ভয়ে।

চারদিকে নানা গুজব। সেকালের বিশ্বাসমতো ভয়ঙ্কর গুজব। কলেরাকে নাকি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার মুখে তাকে দেখা যায়। শীর্ণ কঙ্কালসার শরীর, চোখে আগুনের মতো দৃষ্টি, পিঙ্গল রুক্ষ চুল, দন্তুর একটি মেয়ে; পরনে তার একখানা ক্লেদাক্ত জীর্ণ কাপড়, বগলে একটা মড়া-বওয়া তালপাতার চাটাই নিয়ে সেই পথ ধরে গ্রামে ঢোকে—যে পথ ধরে গ্রামের শব নিয়ে শ্মশানে যায়। সন্ধ্যায় ঢোকে, যার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় সেই হতভাগ্যই সেই রাত্রে কলেরায় আক্রান্ত হয়। মরে। তারপর রোগ ছড়ায় ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায়।

লোকে পালাতে লাগল গ্রাম ছেড়ে।

অবস্থাপন্নেরা আগে পালাল। নবগ্রামের বাবুরা তার মধ্যে সর্বপ্রথম। তারপর সাধারণ লোকেরা।

থাকল গরিবেরা আর অসমসাহসী জনকয়েক, তার মধ্যে মাতাল গাঁজালেরা সংখ্যায় বেশী। মদ খেয়ে গাঁজা টেনে ভাম হয়ে বসে থাকত। কালীনাম হরিনাম করে চীৎকার করত।

তিনিও হরিনাম করতেন।

চিরকালই তিনি সংকীর্তনের দলের মূলগায়েনী করেন। গলা তাঁর নাই, সুকণ্ঠ তিনি নন, তবে গান তিনি বোঝেন এবং গাইতেও তিনি পারেন। হ্যাঁ, তা পারেন। দশকুশীতে সংকীর্তন এখনও তিনি গাইতে পারেন। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেবার লোক এখন আর নাই। থাকবে কোথায়? এ সব বড় তালের গানের চর্চা উঠে গেল। কতই দেখলেন! হারমোনিয়ম—গ্রামোফোন, এখন রেডিয়ো' নবগ্রামের কয়েকজনের বাড়িতেই রেডিয়ো এসেছে। শুনেছেন তিনি। সে গান আর এ গান! সেই—"দেখে এলাম শ্যাম—সাধের ব্রজধাম—শুধু নাম আছে।" হায় হায়! "শুধু নামই আছে আর কিছু নাই শ্যাম! রাধা স্বর্ণলতা তমালকে শ্যাম ভেবে জড়িয়ে ধরে ক্ষতবিক্ষত দেহে ধুলায় ধূসরিতা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে হতচেতন হয়ে!"

তিনি প্রতি সন্ধ্যায় সংকীর্তনের দল নিয়ে পথে পথে ঘুরতেন। বিশ্বাস করতেন এই নামকীর্তনে অকল্যাণ দূর হয়। গ্রামে গ্রামে মদ্যপায়ীরা রক্ষাকালী পূজা করাত। তাদেরও সে বিশ্বাস ছিল গভীর।

গভীর রাত্রে পথ-কুকুরে চিৎকার করে চিরকাল। সে চিৎকার যেন বেশী হয়েছে। এবং সে চিৎকারের একটি যেন গূঢ় অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। চিৎকারের মধ্যে ক্রোধ নাই—ভয় আছে। তারা রাত্রে ওই পিঙ্গলকেশিনীকে পথে বিচরণ করতে দেখতে পায়। ভয়ার্ত চিৎকার করে তারা। ঘরে ঘরে অর্ধ-ঘুমন্ত মানুষেরা শিউরে ওঠে।

জীবন ডাক্তারের মৃত্যুভয় ছিল না। তিনি ঘুরতেন। কিন্তু কী করবেন ঘুরে?

শেষে ছুটে গিয়েছিলেন রঙলাল ডাক্তারের কাছে। বলুন—ওষুধ বলে দিন!

দীর্ঘকাল পরে বৃদ্ধ রঙলাল তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেডিকেল জার্নাল পেড়ে বসলেন। তারপর প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন—ওয়ান সিক্সথ গ্রেন ক্যালোমেল আর সোডা বাইকার্ব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াও। এ ছাড়া এখানে এ অবস্থায় আর কিছু করবার নাই।

অনেক প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল ওই ওষুধে। দিন নাই রাত্রি নাই জীবন মশায় ঘুরতেন। পিতৃবংশের সম্মান! গুরু রঙলালের আদেশ! নিজের প্রাণের বেদনা!

রঙলাল ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভালো কথা, জীবন, তুমি নাকি খুব তারস্বরে চিৎকার করে হরিনাম সংকীর্তন করে কলেরা তাড়াচ্ছ?

অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন।

জীবন লজ্জিত যে একেবারে হন নি তা নয়। তা হলেও অপ্রতিভ হন নি। বলেছিলেন—কী করব? লোকেরা বিশ্বাস করে ভরসা পায়।

—তুমি নিজে?

জীবন একটু বাঁকা উত্তর দিয়েছিলেন—সবিনয়ে বলেছিলেন—আপনি তো জানেন আমি কোনোদিনই নাস্তিক নই।

—তাতে আমি অসন্তুষ্ট নই, আপত্তিও করি না জীবন। নাম সংকীর্তন করলেও আপত্তি করব না, তবে সে সংকীর্তন শুধু সপ্রেমে কীর্তনের জন্য হওয়া উচিত। আমাকে দাও, আমাকে বাঁচাও, আমার শত্রু নাশ করো, এই কামনায় সংকীর্তন আমি পছন্দ করি না। ওতে ফলও হয় না।

জীবন বলেছিলেন—আগুন-লাগা বনের পশুর মতো মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছে। জানেন, আমি যেন চোখে দেখছি—। উত্তেজিত হয়ে আবেগের সঙ্গেই জীবন সেদিন রঙলাল ডাক্তারের সামনে দার্শনিকতা করে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন—মরণ তেড়ে নিয়ে চলেছে জীবনকে। একেবারে এলোকেশী এক ভয়ঙ্করী—হাত বাড়িয়ে ছুটেছে, গ্রাস করবে, অনন্ত ক্ষুধা! আর পৃথিবীর জীবকুল ভয়ে পাগলের মতো ছুটছে। ছুটতে ছুটতে এলিয়ে পড়েছে, মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে। অহরহই ওই তাড়ায় তেড়ে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যু। এখানে ভগবানের নাম করে তাকে ডেকে ভরসা সঞ্চয় করা ছাড়া করবে কী মানুষ?

রঙলাল ডাক্তার এর উত্তরে সেদিন ব্যঙ্গ করেন নি। প্রসন্ন হেসে বলেছিলেন, ব্যাপারটা তাই বটে জীবন। হারজিতের একটা লড়াই-ই বটে। কিন্তু ওইটেই যেমন চোখে পড়েছে—তেমনি চোখ যদি আরও তীক্ষ্ণ হত তবে দেখতে পেতে, এক-একটা মানুষ কেমন করে ঘুরে দাঁড়ায়, বলে,—এসো! তুমি যে ওই ভয়ঙ্কর বেশে আসছ, তোমার আসল রূপটা দেখি। কিংবা বলে—তোমাকে আমি ধরা দিচ্ছি, কিন্তু যারা পালাচ্ছে তাদের বাঁচতে দাও। তখন মরণের ভয়ঙ্কর মুখোশটা খসে যায়। দেখা যায় সে বিশ্ববিমোহিনী। তা ছাড়া তুমি জান না, মরণ যত গ্রাস করছে তার দ্বিগুণ জীবন জন্ম নিয়ে চারদিক থেকে কুক দিয়ে বলছে—কই ধরো তো! হারছে না তারা। আরও একটা কথা বলি। মানুষ হারে নি। মহামারীতে কতবার কত জনপদ নষ্ট হয়েছে। আবার কত জনপদ গড়েছে। শুধু গড়েই ক্ষান্ত হয় নি। সে রোগের প্রতিষেধক বার করে চলেছে। ওখানেই তাকে হারানো যায় নি। সে হারে নি। মরবে সে। কিন্তু এইভাবে সে মরবে না। মহাগজের মতো মরবে না। যেদিন বৃদ্ধ হবে, জীবনের আস্বাদের চেয়ে মৃত্যুর আস্বাদ ভালো লাগবে, সেইদিন মহাগজ যেমন নিবিড় অরণ্যে গিয়ে বহু শত বৎসরের এক খাদের মধ্যে আকাশ বিদীর্ণ করে ধ্বনি তুলে আমি চললাম বলে দেহত্যাগ করে, তেমনি করে মরবে। হাতিরা এইভাবে পুরুষানুক্রমিক শ্মশানভূমিতে গিয়ে দেহত্যাগ করে থাকে। কেন জান? পাছে তার রোগ বা পচনশীল দেহ থেকে রোগ উৎপন্ন হয়ে অন্য হাতিদের আক্রমণ করে।

এই মহামারী থামবার পর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ। এই মহামারীর পর এখানে তিনি সমাজের প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। নবগ্রামের বাবুদের উপেক্ষা করে সরকার তাঁকে প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত মনোনীত করেছিলেন। সেই প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত হিসাবে একটি কলহের মীমাংসায় তিনি এসেছিলেন এই মহাপীঠে।

সন্ন্যাসী এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আরে ভাইয়া, তুমহারা নাম জীওন মহাশা। তুমি না কি বড়া ভারী বীর? আও তো ভাই পাঞ্জা লড়ে এক হাঁত।

পাঞ্জার লড়াইয়ে তিনি হেরেছিলেন, কিন্তু সহজে হারাতে পারে নি সন্ন্যাসী। বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয়েছিল।

তারপর কতদিন কত কথা আলাপ হয়েছে।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। এই চণ্ডীতলার মেলায় জুয়া খেলার আসরে শেষ কপর্দক হেরে সন্ন্যাসীর কাছে এসে বলেছিলেন—আমায় একশো টাকা দিতে হবে গোসাঁইজী। কাল পাঠিয়ে দেব।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে গোসাঁই টাকাটা তাঁকে দিয়েছিলেন—এই দেবস্থলের তহবিলের টাকা। ডাক্তার এসে আবার বসেছিলেন জুয়ার তক্তাপোশে। ঘণ্টা-খানেক পরেই গোসাঁই এসে তাঁকে হাত ধরে টেনে বলেছিলেন—আব উঠো ভাই। বহুত হুয়া।

জুয়াড়ীকে বলেছিলেন—জানতা হায় ইন্ কোন হায়? হিঁয়াকে বড়া ডাগডরবাবু আওর

প্রেসিডেন পঞ্চায়েত। ইনকা রুপেয়া যো লিয়া—দে দেও ইনকে।

ডাক্তার বলেছিলেন—না। আর মাত্র কুড়ি টাকা হেরে আছি। ওটা ওর প্রাপ্য। চলুন।

পথে সন্ন্যাসী বলেছিলেন—কথাটা তাঁর অন্তরে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে—বলেছিলেন—কাহে ভাই মহাশা—তুম মহাশা বন্‌শের সন্তান মহাশা—তুম ভাই জুয়া খেলো, রাতভর দাবা খেলো, খানাপিনামে এইসা হল্লা করো—এ কেয়া ভাই? ভগবান তুমকো কেয়া নেহি দিয়া, বোলো? কেঁও, তুমহারা ঘরকে মতি নেহি?

ওঃ! সে একটা সময়! দেহে অফুরন্ত সামর্থ্য, মনে দুরন্ত সাহস, বিপুল পসার, মান-সম্মান; ঘরকন্না সংসার কোনো কিছুই মনে থাকত না। তবে কোনো অন্যায় করতেন না। জুয়ো খেলাটা ছিল শখ। ওটা সে আমলের ধারা। তবে সংসারে যদি—।

অকস্মাৎ তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

একটা প্রশ্ন জেগে উঠল মনের মধ্যে। বিপিন—রতনবাবুর ছেলে বিপিনের জীবনে কি—? সংসার-জীবনে বিপিনের গোপন দুঃখ ছিল? অশান্তি? বাইরে ছুটে বেড়াত—প্রতিষ্ঠা যশ কুড়িয়ে বেড়াত কিন্তু তবু তৃষ্ণা মিটত না, ক্ষুধা মিটত না। ছুটত—ছুটত—ছুটত। অথবা রিপু? মানুষের সাধনার পথে আসে সিদ্ধি। সে আসার আগে আসে প্রতিষ্ঠা। জাগিয়ে তোলে লালসা। আরও চাই। ওই তো রিপু। ওর তাড়নায় ছুটতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মানুষ। সামনে এসে দাঁড়ায় সেই পিঙ্গলকেশিনী।

* * *

রতনবাবুর ছেলে বিপিনের হেঁচকি থামে নি, তবে কমেছে। রক্তের চাপও খানিকটা নেমেছে। রতনবাবু প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গেই বলছেন—তোমার ওষুধে ফল হয়েছে জীবন। তুমি একবার নাড়ীটা দেখো। আমার তো ভালোই লাগছে।

জীবন মশায়ও একটু হাসলেন। হাসির কারণ খানিকটা কথাগুলি ভালো লাগার জন্য; খানিকটা কিন্তু ঠিক বিপরীত হেতুতে। হায় রে, সংসারে ব্যাধি-মুক্তি যদি সহজে সম্ভবপর হত! এত সহজে যদি ভালো হয়ে উঠত মানুষ!

হাসির কারণ আরও খানিকটা আছে। রতনবাবুর মতো মানুষ। পণ্ডিত মানুষ, জ্ঞানী ব্যক্তি, একমাত্র সন্তানের এই ব্যাধি হওয়ার পর তিনি ডাক্তারি বই আনিয়ে এই ব্যাধিটি সম্পর্কে পড়াশুনা করে সব বুঝতে চেয়েছেন, বুঝেছেনও; এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের মর্মান্তিক তত্ত্বও তিনি ভালো করেই জানেন—তাঁকেও এইটুকুতে আশান্বিত হয়ে উঠতে দেখে হাসলেন।

রতনবাবু আবার বললেন—দেখো, আমার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল যে, কবিরাজি মতেই চিকিৎসা করাই। বিলাতী চিকিৎসার অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ওদের ওষুধগুলো আমাদের দেশের মানুষের ধাতুর পক্ষে উগ্র। আমাদের ঠিক সহ্য হয় না। ক্রিয়ার চেয়ে প্রতিক্রিয়ার ফল গুরুতর হয়।

বৃদ্ধ এই নৈরাশ্যের তুফানের মধ্যে একগাছি তৃণের মতো ক্ষীণ আশার আশ্রয় পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন, কথা বলতে তাঁর ভালো লাগছে।

—তবে আমার মনের কথা আমি কাউকে বলি না। বুঝেছ ভাই! ওটা আমার প্রকৃতি-ধর্ম নয়। বিপিনের নিজের বিশ্বাস নাই। বউমার নাই। বিপিনের বড় ছেলে এম. এ. পড়ছে, সে তো একটু বেশী রকমের আধুনিক-পন্থী। তাদেরও বিশ্বাস নাই। আমি বললে তারা কেউ আপত্তি করবে না, সে আমি জানি ; মুখ ফুটে কেউ কোনো কথা বলবে না কিন্তু অন্তরে অন্তরে তো তাতে সায় দেবে না ; মনের খুঁতখুঁতুনি তো থাকবে। সে ক্ষেত্রে আমি বলি—না, বলব না। তবে কাল যখন ডাক্তারেরা সকলেই বললেন যে, হেঁচকি থামাবার আর কোনো ওষুধ আমাদের নাই, তখন আমি তোমার কথা বললাম। আজ সকালে ডাক্তারদেরও ডেকেছি, তাঁরাও আসবেন ; হাসপাতালের প্রদ্যোত ডাক্তার, হরেন সবাই আসবেন। সকলে মিলে পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা করো ভাই।

গম্ভীর হয়ে উঠলেন জীবনমশায়। বললেন—দেখো রতন, শুধু হেঁচকি বন্ধ করবার জন্য আমাকে তোমরা ডেকেছ। আমি তাই তার ব্যবস্থাই করেছি। তা কমে এসেছে, হয়তো আজ ওবেলা পর্যন্ত হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর একটা পথ ধরতে হবে। আমি কবি-রাজিও জানি—অ্যালোপ্যাথিও করি। আমি বলছি ভাই—দু নৌকায় দু পা রেখে চলা তো চলবে না। হয় কবিরাজি নয় অ্যালোপ্যাথি—দুটোর একটা করতে হবে। ওঁরাও ঠিক এই কথাই বলবেন।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—আর আজ এখন তো আমি অপেক্ষা করতে পারব না। আমার বাড়িতে কয়েকজন রোগীই বসে আছে। ভোরবেলা চণ্ডীতলার মোহান্তকে দেখতে গিয়েছিলাম। পথে বিপিনকে দেখে যাচ্ছি। হেঁচকি কমেছে, আমি নিশ্চিন্ত। আমি বিপিনকে দেখে যাই, তারপর ওঁরা আসবেন দেখবেন, পরামর্শ করে যা ঠিক হবে আমি ও-বেলা এসে শুনব।

বৃদ্ধ রতনবাবু বিষণ্ন হলেন, তবুও যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে প্রসন্নভাবেই বললেন—বেশ! তাই দেখে যাও তুমি। তুমি যা বলবে ওঁদের বলব।

বিপিন সত্যই একটু ভালো আছে। নাড়ীতে ভালো থাকার আভাস পেলেন জীবন দত্ত। কিন্তু ভালো থাকার উপর নির্ভর করে আশান্বিত হয়ে উঠবার মতো বয়স তাঁর চলে গেছে। বললেন—হাঁ, ভালোই যেন মনে হচ্ছে। তবে ভালো থাকাটা স্থায়ী হওয়া চাই রতন।

—নাড়ী কেমন দেখলে, বলো।

—যা দেখলাম তাই বলেছি রতনবাবু। তোমার মতো লোকের কাছে রেখে-ঢেকে তো বলার প্রয়োজন নাই এবং তা আমি বলবও না। তোমাকে আমি জানি।

রতনবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

জীবন মশায় হেসে বললেন—আমি কিন্তু নৈরাশ্যের কথা কিছু বলি নি রতন। এই

ভাবটা যদি স্থায়ী হয় তা হলে ধীরে ধীরে বিপিন সেরে উঠবে। হেঁচকি আজই থামবে। তারপর আর যদি কোনো উপসর্গ না বাড়ে তাহলে দশ-বারো দিনের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি হবে। ভালো থাকাটাকে স্থায়ী ভাব বলব, বুঝেছ? বলব—হ্যাঁ আর ভয় নাই। সাবধানে থাকতে হবে। আর এখান ওখান প্র্যাকটিস করে বেড়ানো চলবে না। ওই বাড়িতে বসে যা হয়, তাও বেশী পরিশ্রম চলবে না।

—ওই তো! ওই তো রোগের কারণ। বার বার বারণ করেছি। বার বার। কিন্তু শোনে কি? কী বলব? কী করব? উপযুক্ত ছেলে। গণ্যমান্য ব্যক্তি। জীবনের কোনো-খানে কোথাও কোনো দোষ নাই, অমিতাচার নাই, অন্যায় নাই; আহারে লোভ নাই, অন্যায় পথে অর্থোপার্জনের মতি নাই, কোনো নেশা নাই; সিগারেট পান পর্যন্ত খায় না; ক্রোধ নাই; বিলাসী নয়; শুধু ওই প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস। তাও তোমাকে বলছি ভাই, প্র্যাকটিস যে অর্থের জন্যে তাও নয়। ওই মামলা জেতার নেশা। এ জেলা ও জেলা, এ কোর্ট ও কোর্ট সে কোর্ট। তারপর মাসে দুবার তিনবার হাইকোর্টে কেস নিয়ে গিয়েছে। ওই মামলা জেতার নেশা, যে মামলার হার হয়েছে, হাইকোর্টে তাই ফিরিয়ে আনতে হবে। তা এনেছে। ও নেশা কিছুতেই গেল না। ঘর দেখে নি, সংসার দেখে নি, ছেলেপুলে স্ত্রী নিয়ে আনন্দ করে নি, আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে ওই নিয়ে থেকেছে। আমি কতবার বলেছি—বিপিন এও তোমার রিপু। রিপুকে প্রশ্রয় দিয়ো না। প্রশ্রয় পেলে রিপুই ব্যাধি হয়ে দেহ-মনকে আক্রমণ করে, হয়তো—। বাপ হয়ে কথাটা তো উচ্চারণ করতে পারতাম না ভাই।

জীবন দত্ত বললেন—যাক এবার সেরে উঠুক। সাবধান আপনিই হবে।

একটি কিশোর ছেলে এসে দাঁড়াল, আপনার ফী। এইটিই বিপিনের বড় ছেলে। চমৎকার ছেলে।

—এ কি? চার টাকা কেন? আমার ফী দু টাকা!

দুটি টাকা তুলে নিয়ে জীবন মশায় পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়লেন। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। বলল—আপনি কি ডাক্তাররা যখন আসবেন তখন থাকবেন না?

—আমি? আমি থেকে কী করব?

—আপনার মতামত বলবেন।

—আমি তো শুধু হিক্কার জন্য ওষুধ দিয়েছি। ওটা একটা উপসর্গ। মূল চিকিৎসা তো ওঁরাই করছেন। হাসলেন জীবন ডাক্তার।

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ বললে—ওবেলা একবার আসবেন না?

—আসব? আচ্ছা আসব।

ডাক্তার চলে গেলেন।

বিপিন বোধ হয় বাঁচবে না। ভালো খানিকটা মনে হল বটে কিন্তু আজ যেন স্পষ্টই তিনি নাড়ী দেখে অনুভব করেছেন—মৃত্যু আসছে। আসছে কেন—ইতিমধ্যেই এসে

দাঁড়িয়েছে। ছায়া পড়ছে তার। রতনবাবুর কথা ভাবলেন। বড় আঘাত পাবে রতন। নিজের কথা মনে পড়ল। তাঁর ছেলে বনবিহারী মারা গেছে। বিপিনেরই বয়সী সে। একান্ত তরুণ বয়সে বনবিহারী মারা গেছে; নিজের অমিতাচারে, মদ্যপান এবং তার আনুষঙ্গিক অনাচার করে নিজেকে জীর্ণ করেছিল, তার উপর ম্যালেরিয়ায় ভুগে নিজেকে ক্ষয় করেছিল সে। বিপিন নিজেকে অতিরিক্ত কর্মভারে পীড়িত করে ক্ষয় করেছে।

রতনবাবুর কথাগুলি মনে পড়ল। 'ঘর দেখে নি, সংসার দেখে নি, ছেলেপুলে স্ত্রী নিয়ে আনন্দ করে নি। শুধু কাজ, কাজ, মামলা মামলা মামলা।' কতবার রতনবাবু বলেছেন—'বিপিন এও তোমার রিপু—।'

রিপুই বটে। বড় ভয়ঙ্কর রিপু। বড় ভয়ঙ্কর। তিনি নিজে ভুগেছেন যে। জীবন্তে মৃত্যু ঘটেছে বলে তিনি তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। বনবিহারীর মৃত্যুর পর তিনি চিকিৎসায় অমনোযোগী হয়েছেন এবং কাল অগ্রসর হয়ে তাঁকে পুরানো জীর্ণ বলে ঘোষণা করেছে। আজ তাঁর অবস্থা গজভুক্ত কপিত্থের মতো। সত্য বলতে গেলে এ তো তাঁর মৃত্যু।

—কেমন দেখে এলি? রতনবাবুর ছেলেকে?

—সেতাব?

সেতাবের বাড়ি এসে পড়েছেন, খেয়াল ছিল না।

—কী দেখলি?

—দেখব আর কী? আমি তো দেখছি না। দেখছে ডাক্তাররা। আমাকে ডেকেছিল হিক্কা বন্ধের জন্যে। তা কমেছে। বোধ হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত হিক্কা থেমে যাবে।

—কিন্তু নাড়ী দেখলি তো?

—দেখেছি।

—কী দেখলি তাই তো শুধাচ্ছি রে!

—প্রদ্যোত ডাক্তার সুদ্ধ যখন দেখছে তখন কী দেখলাম তা বলা তো ঠিক হবে না সেতাব। একালে ওদের ওষুধপত্রের খবর তো সব জানি না ভাই, কী করে বলব?

—হুঁ। তা তুই ঠিক বলেছিস। তবে রতনবাবু তো আমাদের গাঁয়ের লোক, ঘরের লোক—সেই জন্যে। বুঝলি না, অবস্থা আছে, চিকিৎসা করাতে পারেন। কলকাতা নিয়ে যেতে পারেন।

—কলকাতা থেকে আসাটাই ভুল হয়েছে। 'কলকাতায় থাকলেই ভালো করতেন। এলেন বিশ্রাম হবে বলে। কিন্তু হঠাৎ রোগ বাড়লে কী হবে সেটা ভাবলেন না। ওই হয় রে। সংসারে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করে এইটেই দেখলাম যে, ভ্রম হয়, সেবার ত্রুটি হয়, এটা-ওটা হয়। কলকাতা নিয়ে যাওয়া আর চলবে না। মানে—

—তা হলে? কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে সেতাব কথা বলে উঠল; কিন্তু নিজেও কথাটা শেষ করতে পারলে না, নিজেই থেমে গেল।

—না-না সে বলি নি, বলবার মতো কিছু পাই নি। তবে—বুঝলি না—? তবু যেন

ভরসা পাচ্ছি না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।

এরপর দুজনেই চুপ করে বসে রইলেন।

ডাক্তার হঠাৎ উঠে বললেন—চললাম, রোগী বসে আছে বাড়িতে। চণ্ডীতলা হয়ে যাব। গোসাঁই এখন-তখন, জানিস?

—শুনেছি কাল। আজ বোধ হয় ভালো আছেন একটু। নিশি ঠাকরুন গিয়েছিল চণ্ডীতলা—মায়ের স্থানে জল দিতে; সে বলছিল। শশী নাকি ভালো করেছে গোসাঁইকে একদাগ ওষুধে। বলছিল—কাল জীবনমশায় ভাইঝিটাকে দেখে বললে, জলবারণ খাওয়াতে হবে। তা—শশীবেই দেখাব আমি।

চমকে উঠলেন জীবন দত্ত। শশীকে দেখাবে? হতভাগিনী মেয়েটার মুখ মনে পড়ল। কচি মেয়ে। কত সাধ কত আকাঙ্ক্ষা মনে। মেয়েটাকে হত্যা করবে। শশী একটা পাপ হয়ে দাঁড়াল! সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি তরুণীর মুখ মনে পড়ল।

সেতাব বললেন—তুই কাল নিশির ভাইঝিকে দেখেছিলি নাকি? জলবারণের কথা বলেছিলি?

—বলেছিলাম। আমার বিদ্যেতে ওই এখন একমাত্র ওষুধ। কিন্তু ও কথা থাক। কী বলে—গণেশ ভটচাজের মেয়ের খবর কিছু জানিস? কাল রাত্রে --

—খুব কাহিল। এখন-তখন অবস্থা শুনছি। কাল তো তুই শুনলাম বলে দিয়েছিলি নাড়ী দেখে।

—না তো? জীবন মশায় চমকে উঠলেন।—আমি তো নাড়ী দেখিনি প্রসবের পর। হাসপাতালের ডাক্তার—

কথার উপর কথা দিয়ে সেতাব বললে—হাসপাতালের ডাক্তার শুনলাম কোমর বেঁধে লেগেছে। শুনলাম খুব ইনজেকশন দিচ্ছে। অক্সিজেন দিয়ে রেখেছে। গণেশকে বলেছে আর-একটা অক্সিজেন আনতে হবে।

চললাম। জীবন মশায় অকস্মাৎ চলতে শুরু করলেন যেন। তরুণ ছোকরাটি বাহাদুর বটে, বীর বটে। শক্তিও আছে, নিজের উপর বিশ্বাসও আছে। যুদ্ধ করছে বলতে গেলে। একবার দেখে যাবেন।

প্রদ্যোত গম্ভীর মুখে বসে আছে আপিসে। গণেশ নাই, গণেশের স্ত্রী আধ-ঘোমটা দিয়ে বসে আছে বারান্দায়। মশায়কে দেখে সে মৃদুস্বরে কেঁদে উঠল—ওগো মশাই আমার অর্চনার কী হবে গো? একবার—

—কাঁদবেন না। গম্ভীর স্বরে প্রদ্যোত বললে।

মশায় বললেন—কেঁদো না মা। দেখো, ভগবান কী করেন। এ তো তাঁর হাত মা।

প্রদ্যোত ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে— আপনি কি নাড়ী দেখতে চান নাকি?

মশায় বললেন—না-না। আমি যাচ্ছিলাম পথে, ভাবলাম একবার খবর নিয়ে যাই। বলেই তিনি ফিরলেন।

—একটু বসবেন না?

—না। দু-চারটে রোগী এখনও আসে তো। তারা বসে আছে।

প্রদ্যোত বললে—মতির মায়ের এক্সরের রিপোর্ট এসেছে। দেখবেন? বিশেষ কিছু হয় নি। এতক্ষণে একটু হাসলে প্রদ্যোত।

—ভালোই তো। আপনার দয়াতেই বুড়ী বাঁচল। মশায় গতি দ্রুততর করলেন। একবার মনে হল—বলেন—'বিপিনের হিক্কা থেমে এসেছে।' কিন্তু তা তিনি বলতে পারলেন না।

কুড়ি

দাঁতু ঘোষাল চীৎকার করছিল।

এসেছে সকালবেলা—আটটা না-বাজতে। এখন সাড়ে দশটা। নবগ্রাম ইস্টিশানে সাড়ে দশটার গাড়ি চলে গেল, এখনও বসে থাকতে হয়েছে! কেন? এত গুমোর কেন জীবন-মশায়ের? কী মনে করে মশায়? দেশে ডাক্তারের অভাব? না—দাঁতু ঘোষাল এতই অবহেলার মানুষ?

নবগ্রামে চারটে ডাক্তার বসে ফ্যা-ফ্যা করছে। চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি ছিল—চার বিছানার হাসপাতাল—তারপর যুদ্ধের সময় দেশে 'মন্বন্তর' হলে দশ বিছানার হাসপাতাল হয়েছিল—এখন পঞ্চাশ বিছানার হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। একজন ছোট ডাক্তার ছিল—এখন দুজন ডাক্তার হয়েছে—নার্স এসেছে। সেখানে গিয়ে 'এলাম' বলে একটা বিছানায় শুয়ে পড়লেই হল। সময়ে খাওয়া—সময়ে ওষুধ—য-বার খুশি ডাকলেই ডাক্তার। কেবল জাত থাকবে না আর মান থাকবে না বলে যায় না। এ ছাড়া কবরেজ দুজন, তার মধ্যে ভূদেব কবরেজ দস্তুরমতো পাস-করা, হোমিওপ্যাথ দুজন—আলি মহম্মদ আর বাঙাল ডাক্তার। দোকানে গেলে কেউ পয়সা নেয় না। জীবনমশায়ের মতিভ্রম হয়েছে, নইলে রোগীদের এমন অবহেলা কখনও করত না। কেবল পুরনো লোক—ধাত চেনে, মশায় বংশের বংশধর—তাই আসে। আর আসবে না। কালই হয় ভূদেব কবরেজের কাছে নয় হরেন ডাক্তারের কাছে যাবে। যে দেশে গাছ থাকে না—সে দেশের ভেরেণ্ডা গাছই 'বিরিঞ্চি'। সেকালে ডাক্তার-বৈদ্যের অভাব ছিল, তাই জীবনমশায় ছিল ধন্বন্তরি -নিদান হাঁকত। যেটা ফলত, সেটাই জাহির করত; যেটা ফলত না—সেটার বেলা চুপচাপ থাকত। মরার বদলে বাঁচলে, কে আর তা নিয়ে ঝগড়া করে? এবার এই বাঘা প্রদ্যোত ডাক্তারের হাতে পড়েছে; এইবার মজাটা বুঝবে। এই তো মতি কর্মকার বর্ধমান হাসপাতালে মাকে ভর্তি করে দিয়েছে। পায়ের ফটো নিয়েছে, ভিতরে হাড়ের কুচি আছে, কেটে বার করবে—বাস, ভালো হয়ে

যাবে। প্রদ্যোত ডাক্তার বলেছে, আসুক ফিরে মতির মা। তারপর নাড়ী দেখার—নিদান হাঁকার ফাঁপা বেলুন ফুটিয়ে দেব।

ঘরে এদিকে রোজগারের অভাবে হাঁড়ি ঢনঢন—আর রোগীদের অবহেলা। বকেই চলেছে দাঁতু।

নন্দ বার কয়েকই বলেছে—এই দেখো ঠাকুর, ভালো হবে না। যা-তা বোলো না বলছি। কিন্তু দাঁতু ঘোষাল গ্রাহ্য করে নি। বলেছে—তুই বেটা বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়, পীর চেয়ে খাদিম জিন্দে—সকাল থেকে পাঁচবার বলেছি তামাক দিতে। গ্রাহ্যই করলি না। তোর কি, মাস পোহালেই মাইনে নিবি। চুরি করে মশায়বাড়ির যাও ছিল শেষ করলি। এইবার রোগী তাড়িয়ে লক্ষ্মী ছাড়িয়ে তুই ছাড়বি।

পরান খাঁও প্রতিবাদ করেছিল—দেখো ঘোষাল, কথাগুলান তুমি অন্যায় বলছ। কঠিন রোগী দেখতে গেছেন মশায়, তাতে দেরি যদি হয়েই থাকে—তবে ই সব কথা তুমি কী বলছ? ছি! আর কারে কী বলছ?

—বলুক খাঁ, ওকে বলতে দাও। ওই কথা ছাড়া অন্য কথা এখন ওর মুখে আসবে না। ওর বুদ্ধিই এখন বিপরীত বুদ্ধি। সর্বনাশকালে মানুষের বিপরীত হয়। আর মৃত্যুকালের চেয়ে সর্বনাশের কাল তো মানুষের আর হয় না। ঘোষাল যাবে। যাবার কাল যত কাছে আসবে—তত এইটা ওর বাড়বে।

হেসেই কথাগুলি বললেন জীবনমশায়। তিনি আরোগ্য-নিকেতনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। চণ্ডীতলা থেকে গ্রামে ঢুকবার পথটাই সদর-রাস্তার উলটো দিকে। সেই পথে কবিরাজখানার পিছন থেকে ঢুকে তিনি বেরিয়ে এলেন সামনে।

দাঁতু ঘোষাল এক মুহূর্তে যেন জমে পাথর হয়ে গেল। ভয়ার্ত বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল জীবনমশায়ের দিকে। হতবাক হয়ে গিয়েছে সে। হাত দুটো শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে।

জীবনমশায় চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসলেন, বললেন—দেরি একটু হয়ে গেল আজ। চণ্ডী মায়ের স্থানের গোসাঁইজীর অসুখ। হয়তো বা যাচ্ছেন গোসাঁই। সেখানে যেতে হয়েছিল সকালে উঠেই। নবগ্রামের রতনবাবুর ছেলে বিপিনবাবুর কঠিন অসুখ, সেখানেও যেতে হয়েছিল। যারা এতদূর দেখাতে এসেছে তাদের তো এমন জরুরী অবস্থা নয়।

দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন জীবনমশায়। রোগীর দল তবুও কেউ কোনো কথা বলতে পারলে না। দাঁতু ঘোষালের দিকেই তারা তাকিয়ে ছিল। দাঁতু দাঁড়িয়ে ছিল মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর মতো।

অকস্মাৎ সে ভাঙা গলায় বলে উঠল—কী বললে মশায়? আমি বাঁচব না? আমি মরব?

জীবনমশায় নিস্পৃহ নিরাসক্তের মতো বললেন—এ রোগ তোমার ভালো হবে না ঘোষাল। এই রোগেই তোমাকে যেতে হবে। এ তোমার ভালো হবার রোগ নয়। তবে দুমাস কি ছমাস কি দুবছর পাঁচ বছর—তা কিছু বলছি না আমি।

দাঁতু এবার চীৎকার করে বলে উঠল—তুই গো-বদ্যি—তুই গো-বদ্যি—হাতুড়ে, মানমারা।

জীবনমশায় বলেই গেলেন—এ যদি তোমার ভালো হবার হত ঘোষাল তবে দুদিন যেতে না যেতেই তুমি কী খাব কী খাব করে ছুটে আসতে না, তামাক গাঁজার জন্যে তুমি খেপে উঠতে না। মৃত্যু-রোগের এ হল একটা বড় লক্ষণ। রোগের সঙ্গে রিপুর যোগাযোগ হলে আর রক্ষে থাকে না। তোমার তাই হয়েছে।

দাঁতু এবার পট করে তার পৈতেগাছটা ছিঁড়ে ফেলে চীৎকার করে উঠল—আমি যদি বামুন হই তবে ছ মাস যেতে-না-যেতে তোর সর্বনাশ হবে বামুনের মেয়ের অভিশাপে তোর ব্যাটা মরেছে—এবার ব্রহ্মশাপে তোর সর্বনাশ হবে।

বলেই সে হনহন করে নেমে পড়ল, আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ার উপর খানিকটা গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—চললাম আমি হাসপাতালে বড় ডাক্তারের কাছে। আজই আমি হাসপাতালে ভর্তি হব। বাঁচি কিনা দেখ।

মশায় হাসলেন। তারপর বললেন—কার কী বলো?

এসে দাঁড়াল একটি লোক। কামলা—জণ্ডিস হয়েছে। মানুষটা যেন হলুদ মেখে এসেছে। প্রতিবিধান অনেক করেছে। কামলার মালা নিয়েছে—মালাটা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হয়েছে; তাতে সারে নি। হাসপাতালে গিয়েছে—তাতেও বিশেষ কিছু হয় নি। অবশেষে মশায়ের কাছে এসেছে।

জীবন দত্ত বললেন—তাই তো বাবা। হাসপাতালে যখন কিছু হয় নি তখন সময় নেবে। আর ওষুধ যদি কবিরাজি মতে খাও—বোধ হয় তাই ইচ্ছে, নইলে আমার কাছে আসতে না, —মুশকিল হচ্ছে আমি তো ওষুধের কারবার তুলে দিয়েছি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আমি মোটামুটি চিকিৎসা করাই ছেড়ে দিয়েছি। নতুন কাল, নতুন চিকিৎসা, নতুন রুচি এ তো আমার কাছে নাই। তা ছাড়া আমার নিজেরও আর ভালো লাগে না। তবু এককালে চিকিৎসা করতাম; দু-চারজন পুরনো লোক আজও ছাড়ে না, তাই তাদের দেখি। বুঝেছ না?

একটু হাসলেন। বোধ হয় দাঁতু ঘোষালের প্রসঙ্গটা তাঁর মনের মধ্যে তখনও ঘুরছিল।

—তুমি বরং ভূদেব কবরেজের কাছে যাও। সে ওষুধপত্র রাখে। আর নতুন কালে কবিরাজি শিক্ষার কলেজ হয়েছে, সেখানে পাস করেও এসেছে। বুঝেছ না? কবিরাজিতে নিজের ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা করে ফল হয় না।

—আজ্ঞে না ডাক্তারবাবু, আপনি দেখুন আমাকে। নইলে আমি হয়তো বাঁচব না। আমার বাবা দাদা সবাই ঠিক এই বয়সে মারা গিয়েছে। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের ভিতর। আমাকে বাঁচান।

—না-না। না-বাঁচবার মতো তোমার কিছু হয় নি বাপু। আর, বাঁচা মরার ব্যাপারটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ওর উপরে যদি মানুষের হাত থাকত—! হাসলেন ডাক্তার। শুনলে না, দাঁতু বলে গেল—আমার ছেলের কথা! সে নিজেও ডাক্তার ছিল।—এ কি, কাঁদছ

কেন তুমি ? আচ্ছা—আচ্ছা। আমিই দেখব। তুমি বসো। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ভূদেবের কাছে কিনে নিয়ে যাও। তারপর আমি ঘরে তৈরি করে দেব। বুঝেছ! ভয় নেই। ভালো হয়ে যাবে। এত ভয় পেয়েছ কেন ?

দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন ডাক্তার। লোকটি বড় ভয় পেয়েছে। ভয় রোগের জন্য নয়। বাবা দাদা ঠিক এই বয়সে মরেছে বলে ও বেচারীও ভয় পেয়েছে। ভয়টা খুব অহেতুকও নয়। এমন হয়। বিচিত্রভাবে হয়।

পরান হেসে লোকটিকে বললে—আর কিছু ভয় তুমি করিয়ো না বেটা। মশায় বলেছেন ভয় নাই। উ একেবারে বেদবাক্যি!

পরান তাঁর মন রাখছে সে জীবনমশায় জানেন—কিন্তু এ মন-রাখাটুকু তাঁর ভালো লাগে। পরান লোক ভালো। কৃতজ্ঞতা আছে। সেই তার প্রথম জীবনে জীবন দত্ত তাকে টাইফয়েড থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তখন পরানের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, দিনমজুরি করত। জীবন দত্তের বাড়িতেই মজুরি খেটেছে ; তখন তিনি তার বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছিলেন—সে কথা পরান আজও ভুলে যায় নি। সে এখন বড় ডাক্তার ডাকতে পারে। দৈনিক চার টাকা ফী দিতেও তার গায়ে লাগে না, তবু সে জীবন দত্ত দাড়া কাউকে দেখায় না। শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়—জীবন-মরণ প্রশ্ন নিয়ে রোগ আসে মানুষের শরীরে, সেখানে কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্র খুব বড় নয়, বড় বিশ্বাসের কথা—সেই বিশ্বাস আছে পরানের। যে তাঁকে এত বড় বিশ্বাস করে, তাকে স্নেহ না করে কি পারেন তিনি ? তবে বিবির জন্য পরানের ভাবনায় ডাক্তার কিঞ্চিৎ কৌতুক না করে পারেন না। একবার তিনি নিজেই বলেছিলে, 'পরান! বিবিকে একবার না হয় কলকাতা নিয়ে যাও। এখন সব নানা রকম পরীক্ষা হয়েছে—পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে এসো।' ডাক্তার কথাটা গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন। কৌতুক করেন নি।

ডাক্তার বলেছিলেন—তা হলে এক কাজ করো, হাসপাতালের ওই বড় ডাক্তারকে একদিন কল দাও। ওঁকে দেখাও। উনি বলে দেবেন—চিঠি দিয়ে দেবেন—কোথায় কার কাছে দেখাতে হবে।

প্রদ্যোত ডাক্তার রোগিণীকে দেখে একটু হেসেছিলেন। বলেছিলেন—অসুখ মনের, শরীরের নয়। এবং—। একটু থেমে বলেছিলেন—কোনো মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারকে দেখালে ফল হতে পারে।

মশায় কথাটা বুঝেছিলেন, পরান বুঝতে পারে নি ; কিন্তু তবুও পরান ওই নতুন ডাক্তারের উপর বিরক্ত হয়েছিল। তার বিবি তার চোখের সামনে রোগে ভুগছে—সে তার সেবা করছে, চোখে দেখে স্পর্শ দিয়ে সে অসুখ অনুভব করছে—আর ডাক্তার বলছে অসুখ নয়!

সে শুধু প্রদ্যোত ডাক্তারকেই বাতিল করে নি—কলকাতায় যাওয়ার কথাও বাতিল করে দিয়েছিল। শুধু প্রশ্ন করেছিল—আপুনি কী বুঝছেন বলেন যদি, বুঝেন কি পরানের ভয় আছে—মিত্যু হতে পারে—তা হলে না হয়—

—না, সে ভয় নেই। তবে ভুগতে পারে। বুঝছ না ?

—তা ভুগুক। না হয় ভুগবে কিছুদিন। আপুনি ছাড়া কারুর দাওয়াই আমি খাওয়াব না।

সে অবধি এই চলছে। ডাক্তার তিন দিন অন্তর যান। কিন্তু পরানের ইচ্ছা রোজ যান তিনি। ডাক্তার তা যান না। পরান রোজ আসে। খবর বলে যায়, বলে—কিছু বদল করবেন নাকি?

—না—না। ওই যা চলছে—চলুক।

—এই পোষ্টাই যদি কিছু দিতেন! আর এই ঘুম হবার ওষুধ! রাতে একবারও চোখ বোজে না, ছটফট করে। এ পাশ আর ও পাশ। আর ঢুকঢুক করে জল খাবে।

একটা কিছু দিলেই পরান খুশী।

আজও পরানের একটা ওষুধ চাই। সে ভয়ার্ত জোয়ানটিকে জীবনমশায়ের অদ্ভুত চিকিৎসা-পারঙ্গমতার কথা বোঝাতে বসেছে সেই উদ্দেশ্যেই।

ডাক্তার রোগীর পর রোগী দেখে চলেছেন। এই সময়ে এসে দাঁড়াল এক ছ-ফুট লম্বা মানুষ—মশায়, একবার যে দেখতে হবে। গম্ভীর ভরাট গলা।

—কী? তোমার কী হল?

—কী হল বুঝতে তো পারছি না। কাশী সর্দি—মধ্যে মধ্যে জ্বর; কিছুতেই ছাড়ছে না।

হাতখানা বাড়িয়ে দিলে—ছ-ফুট লম্বা—তেমনি কাঠামো—এক পরিণত বয়সের জোয়ান। ঘাট মহেশপুরের রানা পাঠক। এ অঞ্চলে রানা পাঠক শক্তিশালী জোয়ান; লাঠি খেলা, কুস্তি করা, নদীর ঘাটে নৌকা খেয়া দেওয়া, দেবস্থানে বলিদান করা তার কাজ। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত প্রতি বৎসর অম্বুবাচীতে কুস্তি-প্রতিযোগিতায় রানা পাঠকের নাম একবার কয়েক দিনের জন্য মুখে মুখে ফিরত। আর-একবার রানার নাম শোনা যেত কালীপূজার সময়। রানার মহিষবলির কৃতিত্ব লোকের মুখে গল্পের কথা। বাড়িতে কিছু জমি-জেরাত আছে—তার ধানে ফসলে আর খেয়াঘাটের নৌকার আয়ে রানা পাঠকের বেশ ভালোই চলে যায়। মহেশপুরের ঘাটের ডাক তার একচেটে। ও ঘাটে অন্য কেউ ডাক নিয়ে নৌকা পার করতে পারে না। রানা পাঠকের অসুখ কখনও শোনেন নি মশায়। কিন্তু আজ রানাকে দেখে জীবনমশায় বিস্মিত হলেন। এ কী চেহারা হয়েছে রানার? চোখের কোলে কালি পড়েছে, শক্ত বাঁশের গোড়ার দিকের মতো মোটা কব্জির হাড় বেরিয়ে পড়েছে—জামার ফাঁক দিয়ে কণ্ঠ দেখা যাচ্ছে!

—রানা, বাবা এ তুমি ভালো করে দেখাও। তুমি বরং বর্ধমানে গিয়ে দেখিয়ে এসো। নয় তো এখানেই আজকালকার ভালো ডাক্তারদের দেখাও। এ তোমার টোটকাতে কি মুষ্টিযোগে যাবে না।

রানা মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে বললে—উঁহু! ওরা গেলেই বলবে যক্ষ্মা হয়েছে। বুঝলেন না—ওদের এইটে বাতিক। তার পর ফর্দ দেবে ইয়া লম্বা। বুকের ফটো তোলাও, গয়ের থুথু পরীক্ষা করাও—এই করো—তা করো। চিকিৎসা তারপর। যক্ষ্মা হয়তো আমার

হয়েছে। বুঝেছেন•••একটা মেয়েছেলের কাছ থেকে ধরার কথাই বটে। তার আবার পরীক্ষা কিসের? এত পরীক্ষাই যদি করতে হবে তো—ডাক্তারি কিসের? আপনি হাত দেখুন। বলে দেন কী করতে হবে। ওষুধ দেন। আমি সব ঠিক ঠিক করব। তারপরে আমার পেরমায়ু আর আপনার হাতযশ। আর ওই সব ফোঁড়া-ফুঁড়ি আমার ধাতে সইবে না মশায়। যক্ষ্মার ওষুধ তো আপনাদেরও আছে।

—আছে। কিন্তু এখন যে সব ওষুধ বেরিয়েছে—সে সব অনেক ভালো ওষুধ রানা। অনেক ভালো।

—আপনি বলছেন?

—বলছি রানা। তাতে তো লজ্জা নাই বাবা। তুমি বরং হরেন ডাক্তারের কাছে যাও। আর ওই বুকের ফটো তোলানোর কথা বললে না বাবা, ওটা করানো ভালো। এক্সরে করলে বোঝা যাবে, চোখে দেখা যাবে কতখানি রোগ হয়েছে। আবার ভালো হলে একবার এক্সরে করলে বুঝতে পারবে—একেবারে নির্দোষ হল কিনা। এখন ধরো—হয়তো একটু থেকে গেল। শরীর ভালো হয়েছে—সেটা ধরা গেল না। সেই একটুই আবার বাড়বে—কিছু দিন পর।

রানা ঘাড় নাড়লে।

বার কয়েক ঘাড় নেড়ে বললে—উঁহু। তা হলে আমি ভূদেব কবরেজের কাছে যাই। উ সব কড়া ডাক্তারী ওষুধ আমার ধাতে সইবে না। তা ছাড়া মশায়, ডাক্তারদের কথা বড় চ্যাটাং চ্যাটাং। বুঝছেন—আমাদিগে যেন মানুষই মনে করে না। আপনি দেখতেন সেকালে—সে পসার তো দেখেছি আমি।—এরা টাকা রোজগার করে অনেক, ফী বেশী। ফী ছাড়ে না। কিন্তু সে পসার নাই। আপনারা রোগীর সঙ্গে আপনার লোকের মতো কথা বলতেন। ঘরের লোকের মতো। আমার আবার মেজাজ খারাপ। কে জানে ঝগড়া হয়ে যাবে কবে! তার চেয়ে কবরেজি ভালো। লোহাতে মাথা বাঁধিয়ে তো কেউ আসে নাই সংসারে, মরতে তো হবেই। আজ নয় কাল। তা কড়া কথা শুনে—খারাপ কথা শুনে মরি কেন?

রানা উঠে চলে গেল।

—রানা! অ-রানা!

—আজ্ঞে?

—কবিরাজিই যদি করবে বাবা তবে পাকুড়িয়া যাও। সেন মশায়দের বংশ বড় বংশ—বড় আটন। বিচক্ষণ বৈদ্য আছেন—ভালো ওষুধ রাখেন—সেখানে যাও। বুঝেছ? এ অবহেলার রোগ নয়।

—পাকুড়ে যাব বলছেন?

—হ্যাঁ তাই যাও। ভূদেব এখনও ছেলেমানুষ! বুঝেছ? ইচ্ছে কর তো ভূদেবকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

—দেখি! টাকাতে কুলানো চাই তো! হাসলো রানা।—আপনার কাছে আসা—

সেজন্যেও বটে যে! কম টাকায় চিকিৎসা—এ আর কোথায় হবে?

চলে গেল রানা পাঠক। শক্তিশালী বিপুলদেহ অকুতোভয় রানা বন্যার সঙ্গে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে; কিন্তু অসহায় হয়ে পড়েছে আজ। মৃত্যুর কাছে মানুষ নিতান্ত অসহায়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জীবনমশায়। রানার কথাই ভাবছিলেন। কথাটা মিথ্যা বলে নি রানা। দরিদ্র দেশ, দরিদ্র মানুষ, টাকা পাবে কোথায়? ডাক্তারেরাই বা করবে কী? তারাই বা খাবে কী? নিজের অবস্থা ভেবেই কথা বলছেন জীবনমশায়। আজ সকাল থেকে চারটি টাকা ফী পেয়েছেন। তাঁর পিতামহ, পিতা, তিনি—এতকাল পর্যন্ত যে সম্পত্তি করেছিলেন তার অনেক চলে গিয়েছে এই পনেরো-কুড়ি বছরের মধ্যে। আজ তিনি প্রায় নিঃস্ব। লোকে বলে ভাগ্য। আতর-বউ নিজের কপালে করাঘাত করে। কিন্তু তিনি তো জানেন—দায়ী তিনি নিজে। তা ছাড়া আর কে দায়ী?

সশব্দে একখানা গোরুর গাড়ি এসে দাঁড়াল।

—কই, গুরুদেব কই?

নামল শশী। শশীর চোখ লাল। মদ খেয়েছে এই দিনে দুপুরে। রামহরিকে দেখবার জন্য নিতে এসেছে। রামহরি মৃত্যু-কামনায় জ্ঞানগঙ্গা যাবে। গত রাত্রের কথাগুলি আবার সব মনে হল মশায়ের। রামহরি যাবে মৃত্যুবরণ করতে?

চারটি টাকা নামিয়ে দিলে শশী।

—আমি বলেছি চারটাকা দিয়ে সারলে হবে না রামহরি। জীবনমশায়কে শেষ দেখা দেখাবে, আরও লাগবে বাবা। আমাদিকে বরং সেকালে চোলাই মদ খাইয়েছ—পাঁটা খাইয়েছ, জীবনমশায়কে তো কিছু খাওয়াও নি। খাইয়ে থাকলে বড় জোর লাউ-কুমড়ো। বেটা উইল-টুইল করছে। বললে, মশায়কে সাক্ষী করব। পেনামী দোব তখন। নিশ্চয় দোব।

হাসতে লাগল শশী।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে—দাঁতু ঘোষাল বেটা মরত, ও বেটার নিদান হাঁকলেন কেন? বেটা কাঁদছে—প্রদ্যোত ডাক্তার তড়পাচ্ছে।

মশায় সেকথা গ্রাহ্য করলেন না। দাঁতু মরবে, এই রোগেই মরবে, প্রবৃত্তিকে এমন প্রবল রিপু হয়ে উঠতে কদাচিৎ দেখা যায়। কোনোমতেই বাঁচাতে পারবে না প্রদ্যোত। বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন তিনি, বললেন—দাঁড়া, গিন্নী বকছে কেন দেখি। আতর-বউয়ের তীক্ষ্ণ তিরস্কার তিনি শুনতে পেয়েছেন।

আতর-বউ তিরস্কার করছেন তাকেই যাকে আজীবন তিরস্কার করে আসছেন—নিজের অদৃষ্টকে। হায়রে অদৃষ্ট, হায়রে পোড়াকপাল!

নন্দ ও-পাশে চুপ করে বসে আছে, মাথা হেঁট করে মাটি খুঁটছে। নন্দ জড়িত আছে, তাতে সন্দেহ রইল না তাঁর।

মশায় দুজনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—কী হল?

—কিছু না।

নন্দ বললে—দাঁতুকে উ-সব বলবার আপনার কী দরকার ছিল? হাসপাতালের ডাক্তার যা তা বলছে—আমি শুনে এলাম। নিজের কানে।

—নিদান হাঁকবে তো আমার নিদান হাঁকো। দেখো হাত দেখো।

—তোমার নিদান হাত না-দেখেই আমি হাঁকতে পারি।

—বলো, বলো—তাই বলো, কবে মরব আমি? এ জ্বালা আমি আর সইতে পারছি না। শুধু নাই, শুধু নাই আর নাই। আর তুমি ন্যায়ের অবতার সেজে বসে আছ। রতনবাবুরা চার টাকা ফী দিতে এসেছিল—তুমি দু টাকা নিয়ে দু টাকা ফেরত দিয়ে এসেছ। তুমি যাকে দেখছ তাকেই বলে আসছ—মরবে তুমি মরবে।

জীবনমশায় হা-হা করে হেসে উঠলেন এবার। সে হাসিতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন আতর-বউ। জীবনমশায় বললেন—মরবার জন্যেই জন্ম আতর-বউ। সবাই মরবে, সবাই মরবে, কেউ অমর নয়।

ঘোরটা কাটিয়ে আতর-বউ অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠলেন—পৃথিবীর কথা আমি জানতে চাই না। আমি কবে মরব তাই বলো।

—আমার মৃত্যুর পর।

নিষ্ঠুর বজ্রের মতো কঠোর কথা! আতর-বউ নির্বাক বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

—আমার মৃত্যু কবে হবে সেইটেই বুঝতে পারছি না। পারলে দিন-তারিখ বলে দিতাম। বনবিহারীর মৃত্যু জানতে পেরেছিলাম। তোমাকে বলেছিলাম, তুমি বিশ্বাস করো নি। এটা বিশ্বাস কোরো।

জীবনমশায় বেরিয়ে এলেন। শশী রাঙা চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

—চল। শশী!

শশীর যেন এতক্ষণে চেতনা ফিরে এল। বললে—চলুন। হঠাৎ হেসে বললে—ঠিক বলেছেন। মরবে না কে? সবাই মরবে। ওই হাসপাতালের ডাক্তার, ও বেটা কি অমর নাকি?

ডাক্তার বললেন—চুপ কর। ও সব কথা থাক।

হায়রে মানুষ! না—না, হায় কেন? এই তো রামহরি, হাসতে হাসতে মরতে চলেছে।

সত্য সত্যই প্রদ্যোত ডাক্তার কঠিন ক্রোধে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। গণেশ ভট্টাচাজের মেয়েকে আর-একবার দেখে একটু আশান্বিত হয়েই এসে আপিসে বসেছে ঠিক এমনই মুহূর্তেই দাঁতু এসে হাউ হাউ করে কেঁদে পড়ল।

প্রদ্যোত ডাক্তারের প্রায় পা চেপে ধরে বললে—ডাক্তারবাবু গো! আমাকে বাঁচান আপনি।

—কী হয়েছে? উঠুন। ভালো করে বলুন। চেঁচাবেন না মেলা।

—ওগো আমাকে বাঁচান গো। আমি আর বাঁচব না।

—কী হয়েছে যে তাই বাঁচবেন না ?

—মশায় বললে গো ! জীবনমশায় !

—কে ? জীবন দত্ত ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে এই তোর মৃত্যুরোগ। শিবের বাবা এলেও বাঁচাতে পারবে না।

—জীবন ডাক্তারের সঙ্গে শিবের বাবার আলাপ-পরিচয় আছে না কি? না—মাথা খারাপ হয়েছে লোকটার।

—আজ্ঞে ? ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল দাঁতু ঘোষাল।

—উঠুন, কী হয়েছে দেখি। চলুন ওই ঘরে, টেবিলের উপর শুয়ে পড়ুন। বলুন কী হয়েছে।

সমস্ত শুনে ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—এই সমস্ত লিখে আপনি আমাকে দিতে পারবেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হাজার বার। এখুনি লিখে দিতে পারি। বেটা কায়েত—

ডাক্তার ধমক দিয়ে বলল—ও সব কী বলছেন ? 'বেটা কায়েত' কী ? জানেন আমিও কায়স্থ ?

জিভ কেটে দাঁতু বললে -আপনাকে তাই বলতে পারি ? আমি বলছি ওই জীবনকে। বেটা হাতুড়েকে। কিন্তু আমি বাঁচব তো ? ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে দাঁতু।

—কী হয়েছে তাই বাঁচবেন না। ওষুধ খান—নিয়ম করে চলুন—

কম্পাউণ্ডার হরিহর পাশের ঘরে ওষুধ তৈরি করছিল। সে বললে—তা দাঁতু পারবে না। রোগ তো ওর ডেকে আনা। খেয়ে খেয়ে করেছে। দুদিন ভালো থাকলেই ব্যস ছুটবে কারুর বাড়ি—আজ তোমাদের বাড়ি দুটো খাব। হাসতে লাগল সে।

ডাক্তার বলল—হাসপাতালে থাকতে হবে আপনাকে। থাকবেন ?

—তাই থাকব। দাঁতু বাঁচতে চায়। সে মরতে পারবে না।

—ওকে ভর্তি করে নিন। বলেই ডাক্তার একটা কাগজ টেনে নিল—ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখবে এই কথা। এই ধরনের নিদান হেঁকে মানুষের উপর মর্মান্তিক পীড়ন—এ যুগে এটা অসহনীয় ব্যাপার। এর প্রতিকার করা প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ পরে আধলেখা দরখাস্তখানা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। থাক।

লোকটিকে যেন একটা বাতিকে পেয়েছে। মৃত্যু ঘোষণা করে আনন্দ পাচ্ছে। আশ্চর্য! মৃত্যু পৃথিবীতে নিশ্চিতই বটে, সে কে না জানে ? তাকে জয় করবার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই। সে সাধনা অব্যাহত চলে আসছে। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হয়ে চলেছে। আজও তাকে রোধ করা যায় নি। আজও সে ধ্রুব—তবু তো মর্মান্তিক, বিয়োগান্ত ব্যাপার। তার মধ্যে যেন একটা আধ্যাত্মিক কিছু আরোপ করে এই মৃত্যুদিন ঘোষণা—চমকপ্রদ বটে, রোমান্টিকও বটে—কিন্তু নিষ্ঠুর। ঠিক পশুকে বলি দেওয়ার মতো। পূজা-অর্চনার আড়ম্বরে আধ্যাত্মিকতার ধূম্রজালে আচ্ছন্ন এক কল্পলোক সৃষ্টি করে মৃত্যুকে

মুক্তি বলে ঘোষণা করে খড়্গাঘাত করার মতোই নিষ্ঠুর প্রথা। জীবন দত্ত তারই পুরোহিত সেজে বসে আছে।

হি মাস্ট স্টপ; থামতে হবে তাকে। না থামে—থামাতে হবে, হি মাস্ট বি স্টপ্‌ড্‌।

এই অর্চনা মেয়েটির হাত দেখলেও ও নিদান হেঁকে যেত। ওকে তা না দেখতে দিয়ে ভালো করেছেন তিনি। অদৃষ্টবাদী এই দেশের এই নিদান-হাঁকিয়েরাই যোগ্য চিকিৎসক ছিল। কবচ মাদুলি জড়িবুটি চরণামৃত কিছু দিতে বাধে না এদের।

লোকটা নিজের ছেলেরও নাকি মৃত্যু ঘোষণা করেছিল এবং করেছিল মায়ের অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর সম্মুখে। উঃ, কী নিষ্ঠুর! কল্পনা করা যায় না।

প্রদ্যোত ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নার্সদের অফিসের দিকে গেল। নার্সকে ডাকল—বলল—ওই পেশেণ্ট—ওই বুড়ো বামুনকে ভর্তি করা হয়েছে। ভালো করে নজর রাখবে। ওর স্টুল একজামিনেশন দরকার। আজই করে রাখবে।

তারপর সমস্ত ওয়ার্ডট ঘুরে বেড়িয়ে এসে দাঁড়াল ফাঁকা মাঠে—নতুন বাড়িটার সামনে। সুন্দর হচ্ছে বাড়িখানা। ডিসেণ্ট বিল্ডিং। চারিদিকে চারটে উইং থাকলে আরও সুন্দর হত। হবে, স্কীম আছে। পরে হবে।

নতুন কাল। বিজ্ঞানের যুগ। অদৃষ্ট নিয়তি নির্বাসনের যুগ। ব্যাধিকে জয় করবে মানুষ। মৃত্যুর সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত খুঁজেছে মানুষ—অসহায় হয়ে। এবার জীবনের মধ্যে অমৃত সন্ধানের কাল এসেছে। একালে অনেক আয়োজন চাই। অনেক কিছুর আয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন—এই লোকগুলির নির্বাসন। এই জীবনমশায়দের। নিদান! নিদান! মৃত্যুর সঙ্গে যেন একটা প্রেম করে বসে আছে এদেশ! গঙ্গার ঘাটে গিয়ে জলে দেহ ডুবিয়ে মরাই এখানে জীবনের কাম্য। মতির মায়ের এক্সরের রিপোর্ট পেয়ে প্রদ্যোত যেন প্রেরণা পেয়েছে একটা। এক্সরে রিপোর্ট নিয়ে মতি আজ সকালে বর্ধমান থেকে ফিরে এসেছে। বর্ধমানের হাসপাতালের ডাক্তার প্রদ্যোতের চেয়ে সিনিয়র হলেও তার সঙ্গে প্রদ্যোত ডাক্তারের বেশ একটি সম্প্রীতি আছে। সে তাকে লিখেছিল—"আমাকে যেন সমস্ত রিপোর্ট অনুগ্রহ করে জানাবেন। কারণ এই কেসটিতে আমি খুবই ইণ্টারেস্টেড; এই বুড়ীকে 'মরণ ধ্রুব' বলে খোল করতাল সহযোগে নাম সংকীর্তন করে জ্ঞানগঙ্গা পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল—এখানকার সে আমলের এক জ্ঞানবৃদ্ধ বৈদ্য মহাপ্রভু নিদান হেঁকেছিল—কয় মাস, কয় দিন, কয় দণ্ড, কয় পলে যেন বৃদ্ধার প্রাণ-বিহঙ্গ পিঞ্জর ত্যাগ করবে; এই পায়ের-ব্যথা রোগেই মরবে; সেই কেস আমি জোর করেই হাসপাতালে পাঠাচ্ছি। এখানকার লোকেরা নাকি মনে মনে হাস্য করছে এবং বলাবলি করছে—জীবন দত্ত যখন নাড়ী দেখে বলেছে বুড়ী মরবে তখন ওকে বাঁচায় কে?"

এই কারণেই সেখানকার ডাক্তার রিপোর্টের পুরো নকল মতির হাতে পাঠিয়েছেন।

সেই রিপোর্ট পড়ে প্রদ্যোতের মুখে ব্যঙ্গহাস্য ফুটে উঠেছিল—তার সঙ্গে বিরক্তিও জমা হয়েছিল। পড়ে গিয়ে বুড়ীর একটা পায়ের গাঁঠে আঘাত লেগেছে, খানিকটা হাড়ের কুচি ভেঙে সেখানে থেকে গিয়েছে, সেই হেতুই বৃদ্ধার এই অবস্থা। ওই জায়গাটা কেটে হাড়ের কুচিটাকে বের করে দিতে হবে এবং হাড়ের যদি আর কোনো অংশ বাদ দিতে হয় দিতে হবে, দিলেই বুড়ী সেরে উঠবে। এতে আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।

নিদান! নিদান! নিদান!

কাল সন্ধ্যাতেও এই নিদানের কথা একদফা শুনে এসেছেন। এই বি কে মেডিক্যাল স্টোর্সের মালিক বিনয়দের ওখানে। ওই—ওই একটি রক্তশোষণকারী রোগের সুযোগে মানুষকে সর্বস্বান্ত করে। জাল ওষুধ বিক্রি করে। মুখে বড় কথা বলে। বাধ্য হয়ে প্রদ্যোতকে ওখানে যেতে হয়, নইলে ওকে ঘৃণা করে প্রদ্যোত।

প্রদ্যোত ডাক্তার ওখানে গিয়েছিল একটা বিশেষ জরুরী ইনজেকশনের অর্ডার দিতে। কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত পাওয়া চাই-ই। তার সঙ্গে আরও দু-চারটে ওষুধ। বিনয়ের দোকানের একটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে যে, প্রতিদিন রাত্রি দশটার ট্রেনে তার লোক কলকাতা যায়, সকালে পৌঁছে বরাতী জিনিস কিনে আবার দুপুরেই রওনা হয়ে সন্ধ্যার সময় নবগ্রাম ফিরে আসে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও লাগে না। এর জন্য সে হাওড়া পর্যন্ত মাস্থলি টিকিট করেছে।

ওদের ওখানে মজলিশের মাঝখানেই এই কথা হচ্ছিল। এই মতির মায়ের কথা। কাল যে ছেলেটি তার হাতে মারা গেছে তার কথা। বিপিনবাবুর হিক্কার কথা। বিনয় নিজে ওষুধের দোকান করে, লাভও করে প্রচুর কিন্তু নিজে অ্যালোপ্যাথিতে খুব বিশ্বাসী নয়, কবিরাজিতেই তার নিজের রুচি এবং মধ্যে মধ্যে ডাক্তারদের বলে—আপনাদের এ আমলের চিকিৎসা, ও তো কানাতেও পারে মশায়: রক্ত পরীক্ষা, মল মূত্র থুথু গয়ের পরীক্ষা, এক্সরে, এ সব হবে, তারপর আপনারা চিকিৎসা করবেন। সে আমলে নাড়ী টিপে ধরেই বলে দিত এই হয়েছে! বলে দিত—আঠারো মাস কি ছ মাস কি সাতদিন মেয়াদ। এই আমাদের জীবনমশায়—

জীবনমশায়ের নিদান হাঁকার গল্প বলেছে। শেষে বলেছে—মতির মাকে মশায় যখন বলেছেন ডাক্তারবাবু—তখন—

এক্সরে রিপোর্ট এবং চিঠিখানা পেয়ে প্রদ্যোত মনে বল পেয়েছে, প্রেরণা পেয়েছে। এখানকার লোকে এমনভাবে বলে যে মধ্যে মধ্যে নিজেকে যেন দুর্বল মনে হয়। চারুবাবু সুদ্ধ ওদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলেন। হরেন ডাক্তার তরুণ। কিন্তু সে এখানকার ছেলে। সে বিশ্বাস হয়তো করে না, কিন্তু অবিশ্বাস করার মতো দৃঢ়তাও তার নেই। বাল্যস্মৃতি তাকে নাড়া দিয়ে দুর্বল করে দেয়। মশায় নাকি তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এবং তার গল্প নাকি আশ্চর্য। তার বাল্যজীবনের আরও অনেক আশ্চর্য স্মৃতি আছে।

এবার সে প্রমাণ করবে।

মতির মা বাঁচবে, দাঁতু বাঁচবে।

ডাক্তার বাসার দিকে চলল।

গানের সুর এসে কানে ঢুকল। মঞ্জু গান গাইছে। বেলা প্রায় একটা। রান্নাবান্না হয়ে গেছে—কাজ নাই—গান গাইছে মঞ্জু। আশ্চর্য জীবনময়ী মেয়ে মঞ্জু। মূর্তিমতী জীবনের ঝরনা। উচ্ছ্বসিত আবেগে সম্মুখের পানে বেয়ে চলেছে। বহু যুদ্ধ করে ডাক্তার তাকে জয় করেছেন। তাঁর বাড়িতে এই কারণেই মঞ্জুকে পছন্দ করে না। বলে—দুলালীপনা কি ভালো!

ডাক্তারের ভালো লাগে। মঞ্জুকে ডাক্তার সাইকেল চড়া শিখিয়েছেন। বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়েছেন। মোটর ড্রাইভিং শেখাবেন। বাধা তিনি দেবেন না।

এই তো—এই তো জীবন! গতিশীল, উল্লাসময়, ওইখানেই তো আছে সবল জীবনের আনন্দ! দিস্ ইজ লাইফ।

সিঁড়ির উপর ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো আছে। তাই মাড়িয়ে ডাক্তার জুতোর তলা পরিশুদ্ধ করে নিয়ে উপরে উঠলেন। ওদিকে সাবান, জল, লোশন, তোয়ালে সাজানো রয়েছে।

মন্থর গতিতে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ তুলে একখানা ছইওয়ালা গাড়ি আসছে। হাসপাতালের পাশ দিয়েই রাস্তা। শ্রাবণের আকাশে মেঘ ঘুরছে—ছায়াচ্ছন্ন ম্লান দ্বিপ্রহর—টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে মধ্যে মধ্যে। গাড়িখানার ছইয়ের ভিতর ঠিক সামনেই বসে কে? পাকা দাড়ি, পাকা চুল, স্থূল স্থবির—মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে, গাড়ির চাকা খালে পড়ছে, ইটে হোঁচট খাচ্ছে, তার সঙ্গে দেহখানা ঝাঁকি খাচ্ছে—ভ্রূক্ষেপ নাই।

জীবনমশায় তো! ডাকে চলেছেন কোথাও।

একুশ

জীবন মশায়ই বটে। গলাইচন্দী গ্রামে ডাকেই চলেছেন। শশীর রোগী রামহরি লেটকে দেখতে চলেছেন। আকাশের দিকেই চেয়ে আছেন। গাড়ির ঝাঁকি খাচ্ছেন—ভ্রূক্ষেপ নাই। এই ধারাই জীবন দত্তের চিরকালের ধারা। গোরুর গাড়িতে চড়লেই এমনি ভাবেই গভীর চিন্তামগ্ন বা শূন্য মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

পিছনে বসে শশী বকেই চলেছে। সে বলছিল, মেয়েছেলেদের ওই বটে গো। টাকা লোকসান সয় না।

জীবনমশায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। বের হবার আগে আতর-বউকে যে কথা তিনি বলেছেন—শশী তা শুনেছে। তারই জের টেনে চলেছে সে। আরম্ভ করেছে—প্রদ্যোত ডাক্তারও একদিন মরবে—এই কথা বলে। মশায়ের কাছে ধমক খেয়ে এখন এসেছে ফীয়ের কথায়।

শশী একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, তা ওরা যখন নিজে থেকেই দিতে এল তখন

নিলেন না কেন? তাতে কী দোষ হত?

জীবনমশায় এতেও সাড়া দিলেন না।

শশী আবার বললে—রাগলে আর বউঠাকরুনের মুখের আগল থাকে না। ওই দোষটা ওঁর আর গেল না!

জীবনমশায় আকাশের দিকেই তাকিয়ে আছেন। আতর-বউয়ের কথাগুলি মনে ঘুরছে। কথা নয় বাক্যবাণ; কিন্তু জীবনমশায় ও বাণে বিদ্ধ হয়েও আহত হন না। স্থবির হাতির মতো চলেন—বাণগুলি গায়ে বিঁধে থাকে, কিন্তু কোনো স্পর্শানুভূতি অনুভব করেন না, তারপর কখন খসে পড়ে যায়। সমস্ত দেহই তো কিছু কিছু ক্ষতচিহ্নে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

শশী কিন্তু বিরক্ত হয়। এই বুড়োর মেজাজটা চিরকাল একরকম গেল। একশোটা কথা কইলে একটা উত্তর দেয়। বুঝতে পারা যায় না কোন কথায় লোকটার মন নাড়া খাবে—সাড়া দেবে। বউঠাকরুন মুখরা বটেন; কিন্তু সে ওই স্বামীর কারণেই মুখরা। ঝগড়া কলহ সবই জীবনমশায়ের সঙ্গে। বাইরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে বউঠাকরুন অন্য মানুষ। শশীর প্রথম জীবনটা কেটেছে এই বাড়িতে; সে তো জানে! পুরো তিন বছর ওই বাড়িতে কেটেছে। বউঠাকরুন সে সময় যে আত্মীয়তা করেছেন সে তো তার মনে আছে। ডেকে জল খাইয়েছেন, না খেলে তিরস্কার করেছেন। কথাটি বড় ভালো বলতেন—রোজার ঘাড়েও ভূতের বোঝা চাপে শশী, ডাক্তার কবরেজেরও অসুখ করে। সময়ে খা। পিত্তি পড়াস নে।

শুধু এই নয়, বাড়িতে যখন যে জিনিস তৈরি করেছেন, ডেকে খাইয়েছেন। বলতেন—খা তো শশী। দেখ তো ভাই কেমন হল।

ভালো জিনিস ন্যাকড়ায় বেঁধে দিয়েছেন—শশী নিয়ে যা বাড়ি। বউকে খাওয়াবি।

শশীর তখন নতুন বিয়ে হয়েছে। শশীর বউয়ের মুখ দেখে একটি আংটি দিয়েছিলেন বউঠাকরুন।

বউঠাকরুনকে তেতো করে দিয়েছে এই বৃদ্ধ! এই মত্ত হস্তী!

মত্ত হস্তীই বটে। কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। বসে আছে দেখ তো? যেন একটা পাথর।

কী বলবে শশী! শশীর আজ নিজের গরজ! গা চুলকাতে চুলকাতে শশী আবার স্তাবকতা শুরু করলে, বউঠাকরুনের দোষ নাই মশায়। সে আমল মনে পড়লে দুঃখ হয়, আপসোস হয়—হবার কথাই বটে। ওঃ, সে কী পসার, কী ডাক, দিনে রাত্রে খাবার শোবার অবসর নাই। সেই সাদা ঘোড়াটা, এত বড় ঘোড়া দু-বছরের মধ্যেই 'কুমরে' ধরে গেল! আর দেশেও কী জ্বর! হোঁ-হোঁ করে কাঁপুনি—কোঁ-কোঁ করে জ্বর! তার ওপর প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত। ওরে বাবা রে বাবা! সে একটা আমল বটে! গঙ্গায় নৌকা চলা যাকে বলে। সেই হরিশ ডাক্তারের ছেলের মৃত্যু মনে আছে আপনার? এদিকে ঘরে

ছেলের এখন-তখন। ওদিকে মনের ভুলে মালিশের শিশিতে খাবার ওষুধ লিখে দিয়েছিল হরিশ—তাই খেয়ে নোটন গড়াঞীর পুত্রবধূ যায় যায়, রাত্রি বারোটায় খোকা চাটুজ্জে ছুটে এসে পড়ল—তার বোন গলায় দড়ি দিয়েছে। দারোগা পুলিস ছুঁক ছুঁক করছে ঘুষ খাবার জন্যে—আপনি ওদিকে মেলায় পাঞ্জাবী খেলোয়াড়ের ছকের সামনে বসেছেন শোঁচার খুঁটে টাকা নিয়ে, বাপরে বাপরে! সে কী রাত্রি! মনে আছে।

জীবন ডাক্তার একটা লম্বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। একটু নড়ে বসলেন।

না। সেদিনের কথা ঠিক মনে নাই, স্পষ্ট মনে পড়ে না! মনে পড়িয়ে দিলে মনে পড়ে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনি একটা অস্বস্তি জেগে ওঠে। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন। কেন এমন হয়েছিল? কেন?

চঞ্চল হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। মনে পড়ে গেল সেই গোপন সংকল্পের কথা। ঘোড়া কিনে ঘোড়ায় চড়ে আতর-বউকে পালকিতে চড়িয়ে একদিন কাঁদী যাবেন। ঘোড়া তিনি কিনেছিলেন। বড় সাদা ঘোড়া। আতর-বউকে অলঙ্কার দিয়েছিলেন অনেক। কিন্তু কাঁদী যাওয়া হয় নি। কেন যে যান নি তা আজও বুঝতে পারলেন না। সংকোচ না ভয়, কে জানে! হয়তো বা দুই-ই। যে কারণেই হোক, পারেন নি। শুধু প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের মাদকতায় অঞ্চলটাতেই প্রমত্তের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রতিষ্ঠার সেই বোধ করি শ্রেষ্ঠ সময়! চিকিৎসার খ্যাতি তাঁকে সর্বজনমান্য করে তুলেছিল। সরকার পর্যন্ত তাঁকে খাতির করে—এখানকার প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত করেছিল। কিন্তু কিছুতেই মন ভরে নি। যা পেয়েছেন তা দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মনই তৃপ্তি পায় নি তো সঞ্চয় করবেন কোন্ আনন্দে? যদি বল—প্রতিষ্ঠার আনন্দে, বলতে পার, কিন্তু সেও ফাঁকিতে পরিণত হয়েছে। তাই তো হয়। বাবা বলতেন—রঙলাল ডাক্তারও বলতেন—প্রতিষ্ঠা যদি সত্যকারের আনন্দ না হয়, মনকে যদি ভরপুর করে না দেয়, তবে সে জেনো মিথ্যে—তার আয়ু সামান্য কয়েকটা দিনের, সে দিন কটা গেলেই সে প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় ভুয়ো মিথ্যে। রঙলাল ডাক্তার হেসে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে বলতেন—এই এর নেশার মতো। একদিন বলেছিলেন—নবদম্পতির আকর্ষণের মতো। সেটা যদি নিতান্তই রূপ যৌবন ভোগের আনন্দের মতো আনন্দ হয়—তবে রূপ যৌবন যাবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ বিস্বাদ হয়ে তেতো হয়, মিথ্যে হয়। কিন্তু সে যদি ভালোবাসা হয়, তবে সে কখনও যায় না জীবন! যদিও আমি ও দুটোর স্বাদ জানি না। বলে হা হা করে হেসেছিলেন।

বাবা বলতেন—পরমানন্দ মাধবের কথা। তাঁকে না পেলে কিছুই পাওয়া হয় না। তাঁকে পাওয়া যায় কিনা জীবনমশায় ঠিক জানেন না। তবে তিনি পান নি। সম্পদের মধ্যে পান নি, প্রতিষ্ঠার মধ্যে পান নি, সংসারে আতর-বউ ছেলে-মেয়ে সুষমা সুরমা নিরুপমা বনবিহারী কারুর মধ্যে না।

নেশা তিনি করতেন না। নেশা ছিল রোগ সারানোর, রোগীকে বাঁচানোর। আর ছিল দাবা এবং মেলার জুয়ো খেলা। মনে আছে, হাতের কঠিন রোগী বাঁচবে কি মরবে

অন্তরে অন্তরে তাই বাজি রেখে জুয়োর ছকে দান করতেন। জিতলে বাঁচবে, হারলে মরবে। মেলে না। তবুও ধরতেন।

সে আমলে জুয়ো খেলাটা দোষের ছিল না, অন্তত বড়লোকের ছেলের দোষের ছিল না। ছেলেবয়স থেকেই অভ্যাস ছিল কিছু কিছু। তারপর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। সেটাকে বাড়িয়ে দিলে আবার আতর-বউ।

শশী বলছে সেই এক রাত্রির কথা। মনে পড়ছে বই কি! সব মনে পড়ছে। রাত্রি শুধু নয়—রাত্রি দিন, সেকাল, সেকালের মানুষ-জন সকলকে মনে পড়েছে। সেকালের জল-টলমল দীঘি, ধানভরা খেত-খামার, শান্ত পরিচ্ছন্ন ছায়াঘন গ্রামগুলি, লম্বা-চওড়া দশাসই মানুষ, মুখে মিষ্ট কথা, গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ, উঠানে মরাইয়ে ধান, ভাঁড়ারে জালায় জালায় চাল, কলাই মুগ মসুর ছোলা অড়হর মাসকলাই, মণ মণ গুড়—সে কাল—সে দেশ দেখতে দেখতে যেন পাল্টে গেল।

ম্যালেরিয়া ছিল না তা নয়। ছিল। পুরনো জ্বর দু-চারজনের হত। শিউলিপাতার রস আর তাঁদের বাড়ির পাঁচনে তারা সেরে উঠত। হঠাৎ ম্যালেরিয়া এল সংক্রামক ব্যাধির মতো।

শশী হি-হি করে হাসছে। বলছে—হোঁ-হোঁ করে কোঁ-কোঁ করে জ্বর। শশীর প্রকৃতি অনুযায়ী ঠিকই বলেছে শশী। জীবন ডাক্তারের সে স্মৃতি মনে পড়লে সমস্ত অন্তরটা কাতর আর্তনাদ করে উঠে। উঃ, কত যে শিশুর মৃত্যু হয়েছিল সেবার, তার সংখ্যা নাই। শিশুমড়ক বলা চলে। মায়ের কান্নায় আকাশ ভরে উঠেছিল।

এ অঞ্চলে তখন তাঁর বিপুল পসার। তিনি ছাড়া ছিলেন হরিশ ডাক্তার। কিশোরের বাবা কৃষ্ণদাসবাবু যাকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। সে তখন ব্রজলালবাবুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে কম্পাউণ্ডার হয়েছে। দেখতে দেখতে আর দুজন ডাক্তার এসে বসল। পাশকরা ডাক্তার নয়, কম্পাউণ্ডারি করত—রোগের মরসুমে ডাক্তার হয়ে এসে বসল। এই নবগ্রামের নরপতি রায় চৌধুরী একখানা হোমিওপ্যাথিক বই কিনে আর ওষুধ কিনে এক পাড়াগাঁয়ে গেল চিকিৎসা করতে। বরদা রায় চৌধুরীর ছোট ছেলে ইস্কুলের পড়া ছেড়ে চলে গেল কলকাতা—আর. জি. কর মেডিক্যাল ইস্কুলে পড়তে। পাগলা নেপালের ছোট ভাই—সেও খানিকটা পাগল ছিল—পাগলা সীতারাম, সে খুলে বসল ওষুধের দোকান। 'নবগ্রাম মেডিক্যাল হল।' খুচরা ও পাইকারি ওষুধের দোকান।

এই মড়ক মহামারীর মধ্যে মানুষ চিকিৎসা ব্যবসায়ে উপার্জনের প্রশস্ত পথ দেখতে পেলে।

ঘরে ঘরে মানুষ নিলে শয্যা। তাঁকে ঘুরতে হত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। বাবুপাড়া, বণিকপাড়া, শেখপাড়া, মিয়াপাড়া, জেলেপাড়া, ডোমপাড়া, কাহারপাড়া, বাউরিপাড়া। হরিশ ডাক্তারের দু পকেট বোঝাই হত টাকায়। তাঁর হত তিন পকেট—চার পকেটও হতে পারত। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তাঁর বংশের ধারা তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নি। অর্থ কাম্য

ছিল না তা নয়—কিন্তু তার সঙ্গে পরমার্থও ছিল কামনা। ওরই ওপর তো মহাশয়দের মহাশয়ত্ব। হায় আতর-বউ, আজ সেই তিনি কি রতনবাবুরা চার টাকা দিতে এসেছিল বলেই চার টাকা নিতে পারেন? ছি—ছি!

তিনি ডাকে বের হতেন—পথে যে তাঁকে ডেকেছে তার বাড়িই গিয়েছেন, যে যা দিয়েছে তাই না দেখেই পকেটে ফেলেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে সাহায্য করে এসেছেন। হরিশ এখানে আগন্তুক, সে রোজগার করতেই এসেছিল। জীবন দত্ত, এখানকার তিনপুরুষের চিকিৎসক, মশায়ের বংশ, শুধু তাই নয়—নিজের গ্রামের তিনি শরিক জমিদার, তাঁর কাছে কি উপার্জন বড় হতে পারে? কখনও কোনোদিন মনেও হয় নি। বরং পকেট থেকে মেকি এবং খারাপ-আওয়াজ টাকা আধুলি সিকি বের করে আতর-বউ বকাবকি করলে তিনি কৌতুক অনুভব করতেন।

আতর-বউ বলতেন—হেসো না! আমার গা জ্বালা করে।

জীবনমশায় তাতেও হাসতেন। কারণ আতর-বউয়ের গাত্রজ্বালা স্থায়ী ব্যাধি। ওই জ্বালা চিতাকাষ্ঠে সঞ্চারিত হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে তবে নির্বাপিত হবে।

সে সময়ে পর পর দুটো ঘোড়া কিনেছিলেন তিনি। একটা বড় একটা মাঝারি। পায়ে হেঁটে ঘুরে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। বছর তিনেকের মধ্যেই দুটো ঘোড়াই অকর্মণ্য হয়ে গেল। কুমরি রোগ—অর্থাৎ কোমরে বাত হল। জীবন ডাক্তারের বিপুল ভার বয়ে দুটো জীব প্রায় অক্ষম হয়ে গেল। জানোয়ার দুটোর শেষ জীবন হাটের তামাক-ব্যবসায়ীর তামাক বয়ে অতিবাহিত হয়েছে। এর পর আর ঘোড়া কেনেন নি জীবন ডাক্তার। তাঁর শক্তির তো অভাব হয় নি, অভাব হত সময়ের, তা হোক, চারটের পাঁচটায় খাওয়া—তাই খেয়েছেন। মাঠের পথ ভেঙে ডাক্তার হাঁটতেন। লোকে বলত—হাতি চলছে। হাতিই বটে। একদিন সকালে জুতোর কাদা ঘোচাতে গিয়ে ইন্দির লাফিয়ে উঠেছিল—বাপরে! সাপ! একটা মাঝারি কেউটে সাপের মাথা তাঁর জুতোর তলায় চেপটে লেগেছিল। ঠিক জুতোর তলায় কে নিপুণ হাতে কেউটের মাথা এঁকে দিয়েছে। ভাগ্যক্রমে অন্ধকারে ভ্রূক্ষেপহীন মাতঙ্গপদপাতটি ঠিক সাপটার মাথার উপরেই হয়েছিল! ইন্দির জুতোটা এনে তাঁকে দেখাতে তিনি হেসেছিলেন। আতর-বউ শিউরে উঠে মনসার কাছে মানত করেছিলেন—তাঁকে তিরস্কারও করেছিলেন। এমনই কি মানুষের উপার্জনের নেশা! দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে টাকার জন্যে! তাতেও তিনি হেসেছিলেন—এই কদিন আগেই আতর-বউ যে যা দেয়, ফী নেওয়ার জন্য বলেছিলেন, দাতাকর্ণদের ছেলের গলায় ছুরি দিতে হয় তা জান? তুমি তাই দেবে। সে আমি জানি।

বন্ধুরা তাঁদের রহস্য করে বলত—দেশের লোকের সর্বনাশ আর ডাক্তারদের পৌষ মাস।

তাতেও তিনি হাসতেন। বুঝতেন বন্ধুদের ফিস্ট খাবার অভিপ্রায় হয়েছে। বলতেন—তাহলে পৌষ মাসে তো কিছু খেতে হয়! ফিস্টি-টিস্টি কিছু করো তাহলে।

—দে, টাকা দে!

সেতাব সুরেন্দ্র· নেপাল ফিস্টের আয়োজনে লেগে যেত। গন্ধে গন্ধে শশীও জুটত। হরিশ ডাক্তারকেও নিমন্ত্রণ পাঠাতেন।

এ সব হত রাত্রে। দিনে অবকাশ কোথায়? ভোরে উঠে আরোগ্য-নিকেতনে রোগী দেখে ডাক থেকে ফিরতেই হয়ে যেত অপরাহ্ণ, বেলা চারটে। চারটের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে দূরান্তের ডাক। সেখান থেকে ফিরতে নটা, দশটা, বারোটা। তিনটেও হত। বারোটা পর্যন্ত সেতাব সুরেন নেপাল তাঁর অপেক্ষায় থাকত। আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ায় আলো জলত, ইন্দির যোগাত চা আর তামাক, তারা খেলত দাবা। আর বসে থাকত চৌকিদারেরা। জীবনমশায় তখন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত। জীবনমশায় ফিরে এসে অন্তত একহাত দাবা খেলে চৌকিদারের হাজিরার খাতায় সই করে তবে বিশ্রাম করতেন। কতদিন রাত্রি প্রভাতও হয়ে যেত। খাওয়া-দাওয়ার দিনে ইন্দির আর শশী যেত নবগ্রামের বাজারে। ডাক্তার চিট দিতেন। তেল ঘি নুন মশলা এমন কি সাহাদের দোকান থেকে আসত মদ। সুরেন নেপাল হরিশ ডাক্তার শশী এদের মদ নইলে তৃপ্তি হত না। নেপাল সুরেন যেত পাঁঠার খোঁজে। চৌকিদার যেত, জেলে ডেকে আনত, সে পুকুর থেকে মাছ ধরে দিত। ডাক্তার আত্মবিস্মৃতই হয়েছিলেন। সে যেন একটা নেশার ঘোর।

মনে পড়ছে সে রাত্রির কথা। হ্যাঁ, জীবনের একটা স্মরণীয় রাত্রি বটে। বাড়ি, সেদিন বিকেলে বাড়ি থেকে বের হবেন—প্রথমে যাবেন হরিশ ডাক্তারের বাড়ি, হরিশের ছেলের অসুখ শুনেছেন। তারপর যাবেন মেলায়। মেলা চলছে সে সময়। ভাদ্র মাসে, নাগপঞ্চমীতে মনসা পুজোর মেলা। মেলার কর্তারা এসে নিমন্ত্রণও করে গেছে। জীবনমশায় গিয়ে পুলিসের সঙ্গে একটা রফা করে জুয়ো খেলার বন্দোবস্ত করে দেবেন। এবং সেখানে জুয়ো খেলে জীবনমশায় দশ-বিশ টাকা জুয়াড়িকে দিয়েও আসবেন। ঘরের মধ্যে জামা পরবার জন্যে ঢুকেই দেখলেন আতর-বউ জামার পকেট থেকে টাকা বের করে নিচ্ছেন। স্বামীর সঙ্গে চোখোচোখি হতেই আতর-বউয়ের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কোনো কথা বলবার আগেই আতর-বউ বলেছিলেন—জুয়ো খেলে তুমি টাকা দিয়ে আসবে, সে হবে না। তোমার লজ্জা হয় না জুয়ো খেলতে? জীবনমশায় বলেছিলেন—জুয়ো খেলবো না; টাকা বের করে নিয়ো না। ছেলেদের দেব, চাকরদের দেব—ওরা সব মেলা দেখতে যাবে; মেলার মধ্যে দু-চারজন হাত পাতে; দিতে হয়। টাকা রাখো।

—রইল পাঁচ টাকা।

—পাঁচ টাকায় কী হবে?

—না। আর দেব না। কিছুতেই দেব না।

—ভালো।

জামাটা টেনে নিয়ে পাঁচটা টাকার নোটটাও ফেলে দিলেন। তারপর জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলে বনবিহারী, নতুন বাইসিক্ল হাতে নিয়ে বাপের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে, মেলা দেখতে যাবে, টাকা চাই। গায়ে ডবলব্রেস্ট কোট, পায়ে পামশু।

বনবিহারী বাবুদের ছেলেদের সমান বিলাসী। চাকর ইন্দির দাঁড়িয়ে, নন্দ তখন ছেলেমানুষ, সেও দাঁড়িয়ে ; তারা জানে—মশায় মেলার সময় বকশিশ দেবেন। সকলের দিকে তাকিয়ে যেন আগুন জ্বলে গেল। আতর-বউ পাঁচ টাকার নোটখানা কুড়িয়ে নিয়ে ছেলের হাতে দিলেন। জীবনমশায় বললেন—ইন্দির আমার সঙ্গে আয়।

তিনি ভুলে গেলেন—হরিশের ছেলের অসুখের কথা। শুনেছিলেন, ছেলেটির অসুখ করেছে। গত রাত্রে হরিশকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন খাওয়ার জন্য ; হরিশ আসতে পারে নি, লিখেছিল—"ছেলেটার হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। মেয়েরা ভয় পাইতেছে, যাইতে পারিলাম না।" জীবনমশায় ভেবেছিলেন একবার খোঁজ নেবেন। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভুলে গেলেন। নবগ্রামে সাহাদের মদের দোকানে এসে সাহাকে ডেকে বললেন—পঞ্চাশটা টাকা চাই সাহা।

সাহা শুধু মদের দোকানই করত না, টাকা দাদনেরও কারবার করত, সাধারণকে টাকা দিত গহনার উপর, সম্মানী ব্যক্তিকে হ্যাণ্ডনোটে।

অবাক হয়ে গেল সাহা—মশায়ের টাকা চাই!

—চাই। কাল-পরশু চেয়ে নিস। আন টাকা।

বিনা বাক্যব্যয়ে সাহা টাকা এনে তাঁর হাতে তুলে দিলে। কোনো স্মরণ-চিহ্নও চাইলে না।

টাকা নিয়ে ইন্দিরকে দুটো টাকা দিয়ে বাকি টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন—মেলা। মেলা ঘুরে গিয়ে বসেছিলেন জুয়োর আসরে। রাত্রি তখন আটটা। বসে গেলেন জুয়োর আসরে। মনে মনে সেদিন কী বাজি রেখেছিলেন মনে নেই। বোধ হয় এক বছরের মধ্যে তিনি যদি মরেন, তবে তিনি জিতবেন।

দশটার সময় ছুটে এসেছিল—এই শশী। শশী তখন হরিশের অধীনে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির কম্পাউণ্ডার। তার মেলাতে থাকারই কথা, কিন্তু হরিশের ছেলের অসুখের জন্য আসতে পারে নি। ছেলের অবস্থা সংশয়াপন্ন ; ওদিকে হরিশের হাতের রোগী নোটন গড়াঞীর পুত্রবধূ মালিশ খেয়ে বসে আছে। ভুল হরিশের। ছেলের অসুখ ; বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক হরিশ মালিশের শিশি দিয়ে বলেছে—এইটে খাবার।

—এখুনি চলুন আপনি।

উঠেছিলেন তাই, তখন কোঁচার খুঁটে গোটা বিশেক টাকা অবশিষ্ট, ডাক্তার উঠেই টাকা কটা গোছ করে জাহাজের ঘরে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—সই! জাহাজ ডোবে তো গেল, ওঠে তো রেখে দিয়ো—কাল নেব।

জাহাজ ডুববে, অর্থাৎ তিনি হারবেন সে তিনি জানতেন। অর্থাৎ তিনি মরবেন না এক বছরের মধ্যে। অনেক দেখতে হবে তাঁকে। এখন হরিশের ছেলেকে দেখতে হবে, চলো।

যেতে যেতে হরিশের ছেলে শেষ হয়ে গিয়েছিল। জীবনমশায়কে দেখে বুক চাপড়ে

কেঁদে উঠেছিল হরিশ।—জীবন! এ কী হল আমার! জীবন! তুমি যদি সকালে একবার আসতে ভাই, তবে হয়তো বাঁচত আমার ছেলে।

জীবনমশায় মৃদু তিরস্কার করেছিলেন হরিশকে—তুমি না ডাক্তার হরিশ! ছি! তোমার তো এমন অধীর হওয়া সাজে না। 'অহন্যহনি ভূতা'নি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্' এ কথা জানেন যিনি নিয়ন্তা তিনি, আর জানেন তত্ত্বজ্ঞানী—আর এ সমস্ত না বুঝেও এ কথা তো ডাক্তারের অজানা নয়। চুপ করো। মেয়েদের সান্ত্বনা দাও। আমি যাই গড়াঞীর বাড়ি।

মুহূর্তে হরিশের শোকের উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

গড়াঞীর বাড়ির সামনে তখন নানা গবেষণা চলছে। হরিশের ভাগ্য ভালো; সময়টা মেলার। লোকজন সবই গিয়েছে মেলায়। নইলে এতক্ষণ হরিশের বিরুদ্ধে থানায় ডায়রি হয়ে যেত। জীবনমশায় এসে বসলেন। প্রথমেই শিশিটা হস্তগত করে পকেটে পুরলেন। তারপর নাড়ী ধরলেন। বিষের ক্রিয়ার লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন করলেন—ওষুধটা সবটা খেয়েছে? পেটে গিয়েছে? যায় নি। ঝাঁঝালো ওষুধ রোগী বমি করে ফেলে দিয়েছে। ভয় নাই। শশীকে বললেন—ডিসপেনসারিতে স্টমাক্ পাম্প আছে—নিয়ে আয়।

সেই রাতেই রাত বারোটায় খোকা চাটুজ্জে এসে পড়ল—মশায় রক্ষা করুন। আমার বোন নলিনী গলায় দড়ি দিয়েছে।

চিকিৎসার জন্য খোকা চাটুজ্জে তাঁকে ডাকে নি। অন্য কারণে ডেকেছিল।

জীবনমশায় প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত। তিনিই পারেন পুলিস-লাঞ্ছনার হাত হতে বাঁচাতে। তা তিনি বাঁচিয়েছিলেন। গড়াঞীর পুত্রবধূর পেটের মালিশ বমি করিয়ে বের করে মরণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নতুন ওষুধ দিয়ে রাত্রি আড়াইটার সময় খোকা চাটুজ্জের বাড়ি এসে বাইরের দাওয়ার উপর বসলেন। রিপোর্ট লিখে বসলেন, শ্মশানে নেবার ব্যবস্থা করো। আমি রয়েছি।

সেতাবকে বললেন—দাবাব ছক ঘুঁটি আন সেতাব। শুধু তো বসে থাকা যায় না। পাত, ছক পাত।

সব মনে পড়ছে। মনে আছে সবই; মনে পড়ালেই মনে পড়ে। সেদিন রাত্রি চারটে পর্যন্ত দাবা খেলেছিলেন—বাজির পর বাজি জিতেছিলেন। সেতাব বলেছিল—"তোর এখন চরম ভালো সময় রে জীবন! ডাঙায় নৌকো চলছে।"

তাঁরও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু—!

হঠাৎ আটকে গেল নৌকো।

এই মেলার পরই কিন্তু বনবিহারী প্রমেহ রোগে আক্রান্ত হল। শুনলেন মেলায় সে নাকি মদও খেয়েছিল।

ডাঙায় চলমান নৌকাটা আটকেই শেষ হয় নি, অকস্মাৎ মাটির বুকের মধ্যেই ডুবে গেল। জীবনমশায় ছেলে বনবিহারীকে ডেকে বলেছিলেন, ছি-ছি-ছি। বনবিহারী মাথা হেঁট

করে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে নতমুখে তার কঠিন ক্রোধ ফুটে উঠেছিল। জীবনমশায় বলেছিলেন—বংশের ধারাকে যে কলুষিত করে সে কুলাঙ্গার। বাপ লজ্জা পায়, মা লজ্জা পায়, ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ শিউরে ওঠেন—পরলোকের সমাজে তাঁদের মাথা হেঁট হয়! জানতে পারেন নি, দরজার ওপাশে কখন আতর-বউ এসে কান পেতে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—একটা ভুলের জন্য এত বড় কথা বললে তুমি ওকে? আমার গর্ভের দোষ দিলে! চোদ্দ পুরুষের মাথা হেঁট করেছে বললে? তুমি লজ্জা পেয়েছ বললে! তুমি নিজের কথা ভেবে দেখে কথাটা বলেছ? নিজে তুমি কর নি? ও হয়তো সঙ্গদোষে কোন ভ্রষ্টার পাল্লায় পড়ে একটা ভুল করে ফেলেছে! কিন্তু তুমি? মঞ্জরীর জন্যে তুমি কী কাণ্ডটা করেছিলে—মনে পড়ে না?

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন জীবনমশায়।

আতর-বউ ছেলের সামনে মঞ্জরীর কথা বর্ণনা শেষ করে ছেলের হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।—উঠে আয়!

জীবনমশায় বসে রইলেন অপরাধীর মতো। এবং যে মঞ্জরীকে তিনি অপরাধিনীর মতো জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন—আতর-বউ সেই মঞ্জরীকেই তাঁর সামনে মাথা তুলিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল; পাওনাদারের মতো।

প্রতিষ্ঠার এই উৎসবমুখরিত কালে দীর্ঘদিন মঞ্জরীকে তাঁর বারেকের জন্যও মনে পড়ে নি। সেদিন মনে পড়িয়ে দিয়েছিল আতর-বউ। মদ্যপানের ফলে, ব্যভিচারের পাপে ভূপী বোসের ব্যাধি মঞ্জরীর ভাগ্যকে করেছিল মন্দ; তাতে কি তিনি মনে মনে আনন্দ পেয়েছিলেন? তারই জন্যই কি তিনি পেলেন এই আঘাত? সেইদিনই তিনি বুঝেছিলেন বনবিহারীর জীবনে মৃত্যুবীজ বপন হয়ে গেল। মানুষের জীবনে মৃত্যু ধ্রুব, জন্মের মুহূর্ত থেকে ক্ষণে ক্ষণেই সে তার দিকে চলে; মৃত্যু থাকে স্থির, হঠাৎ একদিন মানুষ রিপুর হাত দিয়ে তাকে নিমন্ত্রণ পাঠায়; তখন মৃত্যুও তার দিকে এগিয়ে আসে। এক-একজন অহরহ ডাকে। ওই দাঁতুর মতো। দাঁতু মরবে। বনবিহারীর মতোই মরবে। প্রদ্যোত ডাক্তার ওকে বাঁচাতে পারবে না।

হঠাৎ জীবনমশায় সচেতন হয়ে উঠলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন।

শশী এতক্ষণ পিছনে বসে বৃদ্ধ হস্তীকে আপন মনেই গালাগাল দিয়ে চলেছিল। এর মধ্যেই পকেট থেকে ক্যানাবিসিণ্ডিকা-মেশানো পানীয়ের শিশি বের করে সে এক ঢোক খেয়ে নিয়েছে। গাড়িতে তামাক সেজে খাওয়ায় বিপদ আছে। খড়ের বিছানায় আগুন লাগতে পারে। সেই ভয়েই ও ইচ্ছা সম্বরণ করে দুটো বিড়ি, চার পয়সায় দশটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের একটা সিগারেট শেষ করেছে। এবং মধ্যে মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষে ভেবেছে—বুড়োর পিঠে গোটা দুয়েক কিল বসিয়ে দিলে কী হয়? না-হয় তো—জলন্ত সিগারেটের ডগাটা পিঠে টিপে ধরলে কী হয়? চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে?

মশায়কে নড়েচড়ে বসতে দেখে, ছইয়ের বাইরে মুখ বের করে তাকাতে দেখে শশী বললে—নেমে একবার দেখব নাকি?

—কী?

—ব্যাটা দাঁতু সত্যিই ভর্তি হল কিনা হাসপাতালে?

ঠিক হাসপাতালের সামনে এসে পড়েছে গাড়িখানা।

—না। কে বল তো? গলাখানি বড় মিঠে। গাইছেও ভালো। গানখানিও চমৎকার! ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—ডাক্তার ছোকরা নয়?

উৎসাহিত হয়ে শশী ছইয়ের পিছন দিক থেকে ঝপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল। বললে—হ্যাঁ ডাক্তারই বটে। ডাক্তারের পরিবার গান করছে। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। সে একেবারে খাঁটি মেমসাহেব। বাইসিকিলে চড়ে গো। আর চলে যেন নেচে নেচে। গান তো যখন তখন! অঃই। অঃই, দেখুন না।

সামনের বারান্দাতেই স্বামী-স্ত্রী প্রায় ছোট ছেলেমেয়েদের মতো খেলায় মেতেছে। তরুণী স্ত্রী ডাক্তারের হাত চেপে ধরেছে, হাত থেকে জলের মগটা কেড়ে নেবে। সে নিজে জল দেবে। ডাক্তার বোধ করি হাত-পা ধুচ্ছিল।

ডাক্তার দেবে না। সে তাকে নিরস্ত করতে বালতি থেকে জল নিয়ে তাঁর মুখে ছিটিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি ছুটে চলে গেল ঘরের মধ্যে। আবার ছুটে বেরিয়ে এসে কিছু যেন ছুঁড়ে মারলে ডাক্তারের মুখে। ডাক্তারের মুখ সাদা হয়ে গেল। পাউডার। পাউডার ছুঁড়ে মেরেছে!

শশী খুকখুক করে হাসতে লাগল।

মশায়ের মুখেও একটি মৃদু হাস্যরেখা ফুটে উঠল। গাড়ি মন্থর গমনে চলতে লাগল। গণেশ ভটচাজের মেয়ে তা হলে ভালো আছে। আশা হয়েছে। পরমানন্দ মাধব! না হলে ডাক্তার এমন আনন্দের খেলায় মাততে পারত না। ছোকরার সাহস আছে, ধৈর্য আছে। জেদ আছে। বড় হবার অনেক লক্ষণ আছে। শুধু একটা জিনিস নাই। অন্যমতকে মানতে পারে না। অবিশ্বাস করতে হলে আগে বিশ্বাস করে দেখা ভাল। বিশ্বাস করে না-ঠকে অবিশ্বাস করলে যে ঠকা মানুষ ঠকে সেইটেই হল সবচেয়ে বড় ঠকা। তাতেই মানুষ নিজেকে নিজে ঠকায়। আর বড় কটুভাষী! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মশায়। আবার নড়ে বসলেন। কিন্তু দাঁতু বাঁচবে না। দাঁতু নিজেকে নিজে মারছে, তাকে কোন্ চিকিৎসক বাঁচাবে? অবশ্য পরিবর্তন মানুষের হয়।

এই তো নবগ্রামের কানাইবাবু। তিনি আজ নাই, অনেকদিন মারা গেছেন। জীবন দত্ত তাঁকে দেখেছেন। মাতাল, চরিত্রহীন, দুর্দান্ত রাগী, কটুভাষী লোক ছিলেন তিনি। প্রথম পক্ষ বিয়োগের পর আবার বিবাহ করলেন—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর স্পর্শে লোহা থেকে সোনা হয়ে যাওয়ার মতো আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। মদ ছাড়লেন, ব্যভিচার ছাড়লেন, কথাবার্তার ধারা পাল্টালেন, সে রাগ যেন জল হয়ে গেল; শুধু তাই নয়, মানুষটি শুধু সদাচারেই শুদ্ধ হলেন না, পড়াশুনা শাস্ত্রচর্চা করে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন জীবনে। তাও হয়। কিন্তু বনবিহারীর হয় নি। দাঁতুরও হবে না। আবার মনে হল রামহরির কথা। বার বার প্রশ্নটা ঘুরে ঘুরে জাগছে মনের মধ্যে। কী আর হল? তবে কি এই নতুন স্ত্রীটি তার জীবনে এমন

মধুর আস্বাদ দিয়েছে—যার মধ্যে সে মাধবের মাধুর্যের আভাস পেয়েছে?

হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে হল। তিনি মুখ বাড়িয়ে শশীকে ডাকলেন—লিউকিস!

শশী ইতিমধ্যে রাস্তায় নেমে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে—তামাক সেজে হুঁকো টানছে। হুঁকোটা নামিয়ে সে সবিস্ময়েই জীবন মশায়ের মুখের দিকে তাকালে। হঠাৎ বুড়োর হল কী? লিউকিস বলে ডাকে যে!

এ নাম তার সে আমলের নাম। ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবের সময় পাগলা নেপালের ভাই সীতারাম, যে 'নবগ্রাম মেডিক্যাল হল' খুলেছিল—সেই সীতারামের দেওয়া নাম। সেও ছিল আধপাগল। সত্তর বছরের বৃদ্ধ থেকে ষোলো বছরের ছেলে পর্যন্ত সবাই ছিল তার ইয়ার। সকলের সঙ্গেই সে তামাক খেত। অথচ তার চরিত্রের মধ্যে কোথায় ছিল একটি মাধুর্য যে এতটুকু বিরক্ত হত না কেউ।

সে কলকাতার বড় বড় সাহেব-ডাক্তারের নাম নিয়ে এ অঞ্চলের ডাক্তারদের নামকরণ করেছিল।

জীবন দত্তের নাম দিয়েছিল—ডাক্তার বার্ড।

হরিশ ডাক্তারকে বলত—ডাক্তার ম্যানার্ড।

শশীকে বলত—লিউকিস।

নতুন ডাক্তার এসেছিল হাসপাতালে—কলকাতার মিত্তিরবাড়ির ছেলে, তাকে বলত—ডাঃ ব্রাউন!

সীতারামের এই রসিকতা সেকালে ভারি পছন্দ হয়েছিল লোকের। ডাক্তারেরা নিজেরাও হাসতেন এবং মেজাজ খুশী থাকলে পরস্পরকে এই নামে ডেকে রসিকতা করতেন।

এতকাল পরে সেই নাম? বিস্মিত হল শশী। কিন্তু এই নামে সেকালে ডাকলে যে উত্তর সে দিত—সেই উত্তরটি দিতে ভুল হল না তার। ঘাড়টা একটু হেঁট করে সায়েবী ভঙ্গীতে সে বললে—ইয়েস সার!

জীবনমশায় বললেন—সে আমলটা বড় সুখেই গিয়েছে, কী বলিস শশী?

—ওঃ তার আর কথা আছে গো! সে একেবারে সত্যযুগ।

হেসে ফেললেন ডাক্তার। শশীর সবই একেবারে চরম এবং চূড়ান্ত। ভালো তো তার থেকে ভালো হয় না, মন্দ তো—একেবারে মন্দ। হয় বৈকুণ্ঠ নয় নরক।

তারপরই শশী বললে—সীতারাম বেটা শাপভ্রষ্ট দেবতা ছিল, বুঝলেন? তা—হঠাৎ সীতারামকে মনে পড়ল ডাক্তারবাবু?

—নাঃ। তোর নামটা মনে পড়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম রামহরির কথা।

—বললাম তো বেটার অবস্থা আজকে খারাপ, বোধ হয় অনিয়ম-টনিয়ম করেছে। তা শুধাবার তো উপায় নাই। মারতে আসবে বেটা। বলে—মরার চেয়ে তো গাল নাই, মরতে তো বসেইছি, না খেয়ে মরব কেন, খেয়েই মরব।

—সে তো গিয়েই দেখব রে। আমি শুধুচ্ছি ব্যাপারটা কী বল দেখি, মানে নতুন

বিয়ে করে—

মশায়ের কথার মাঝখানে তাচ্ছিল্যভরে শশী বলে উঠল—বেটার মতিগতি কী রকম পালটেছে আর কি!

—হুঁ। রামহরির এই স্ত্রীটি বোধ হয় খুব ধার্মিক মেয়ে, দেখতেও বোধ হয় খুব সুন্দরী?

শশী একটু ভেবেচিন্তে বললে—তাই বোধ হয় হবে।

—হুঁ। ডাক্তার স্মিতহাস্য প্রসন্ন মুখে আবার আকাশের দিকে চোখ তুললেন।

নবগ্রামের বাজার সম্মুখে।

ডাক্তার বললেন—বাইরে বাইরে চল বাবা মাঠের পথে। ভিড় ভালো লাগে না।

বাইশ

মাঠের পথেই গাড়ি ভাঙল।

জীবনমশায় এবার একটু দেহ এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। শশী বললে—তাই গড়ান একটু। আমি হেঁটেই চলি। আঃ! এ সময় একটু বিশ্রাম না করলে চলবে না। এ সময়টায় জীবনে বোধ করি কখনই তিনি বের হন নি। কোনো ডাক্তারই যায় না। ডাক্তারেরাও তো মানুষ।

অনাবৃষ্টির শেষ শ্রাবণের দুপুরবেলা; মেঘাচ্ছন্নতা রয়েছে, বৃষ্টি নাই। মাঠ শুকনো না হোক, অনাবাদী পড়ে রয়েছে। ফসল নাই কিন্তু আগাছা বেড়েছে। মাঠের এখানে ওখানে বাঁশ উঁচু হয়ে রয়েছে। পুকুর থেকে দুনি করে জল তুলে চাষ করছে উদ্যোগী চাষীরা। একেবারে সব থেকে নিচু মাঠে চাষ চলছে। সেখানে মানুষ গোরুর মেলা বসে গেছে, গাড়িখানা চলেছে উঁচু মাঠের মাঝখান দিয়ে, দু-চার জন চাষী এখানে কায়ক্লেশে কাজ চালাচ্ছে। দেশে শস্য নাই, আকাশে মেঘ দুর্লভ, মেঘ যদি আসে তাতে বৃষ্টি আরও সুদুর্লভ। বৃষ্টি হলে রোগটা কম হয়। এ তিনি ভালো করে লক্ষ্য করেছেন—যেবার বৃষ্টি ভালো হয়—সেবার ম্যালেরিয়া অন্তত কম হবেই। কত আবিষ্কার হল; মশা ম্যালেরিয়ার বীজ বয়ে নিয়ে বেড়ায়; কলেরার বীজাণু জলের মধ্যে বাড়ে, খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মানুষকে আক্রমণ করে—মাছিতে বয়ে নিয়ে বেড়ায়, ছড়ায়; কলেরার টিকা আবিষ্কার হল; কালাজ্বরের চেহারা ধরা পড়ল; কত কত রোগ আবিষ্কার! হ্যাঁ, দেখে গেলেন বটে। সাধ অবশ্য মিটল না; বড় একজন চিকিৎসক হয়ে এর তত্ত্ব-তথ্য পুরো দেখা এবং বুঝে ওঠা ঘটল না, শুনলেন—বিশ্বাস করে গেলেন—কার্য-কারণের রহস্য দেখবার দিব্য-দৃষ্টি লাভ হল না এ জন্মে—তবুও অনেক, অনেক দেখে গেলেন। একটি সাধ হয় মধ্যে মধ্যে—অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বীজাণুগুলিকে চোখে দেখা যায়—তাদের বিচিত্র চেহারা বিচিত্র ভঙ্গি—সেই দেখবার ইচ্ছা হয়, আর ইচ্ছে হয় এক্সরে করানো যখন হয় তখনকার ব্যাপারটা। মানুষের রূপময় দেহ অদৃশ্য হয়ে যায়—দেখা যায় কঙ্কাল—অন্ত্রপাতি—তার ক্ষত। মতির মায়ের পায়ের এক্সরের প্লেটটা একবার দেখতে তাঁর ইচ্ছে হয়।

হঠাৎ জীবনমশায়ের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। শশী হাত নেড়ে ও কী করছে? কাকে ও যেন ইশারা করছে। কে? কাকে?

—কে রে শশী?

—আজ্ঞে?

—কাকে কী বলছিস হাত নেড়ে?

—পুতকী আর মাছির বাচ্ছা গো। ঝাঁকের মতো উড়ছে মুখের চারিপাশে। বর্ষাতে বৃষ্টিবাদলের নাম নাই, এ বেটাদের পঙ্গপাল ঠিক আছে, বেড়েছে—এ বছর বেড়েছে। শশী বার বার শূন্যমণ্ডলে হস্ততাড়না শুরু করলে।

—গাড়িতে উঠে আয়।

—এই তো—আর এসে পড়েছি। সামনেই তো ডাঙাটা। ডাঙাতে এ আপদ থাকবে না।

সামনেই মস্ত বড় উঁচু টিলা। টিলার ওপারেই ঢালের উপর গলাইচণ্ডী ঢুকবার মুখেই রামহরির বাড়ি। এখন আখড়া। সিধে লাল রাস্তা চলে গিয়ে বেঁকেছে। একজন সাইকেল আরোহী চলেছে। পাড়াগাঁয়েও আজ সাইকেল হয়েছে। দু-চারখানা পাওয়া যাবেই; মশায়ের জীবনে একসময় দুটো ঘোড়া এসেছিল—তারপর গোরুর গাড়িতেই যাত্রা শেষ করলেন।

প্রদ্যোতের সঙ্গে পারবার তাঁর কথা নয়। হাসলেন ডাক্তার। প্রদ্যোত ডাক্তার নাকি মোটর কিনবে। অন্ততপক্ষে মোটর সাইকেল। চার ঘণ্টায় বিশ মাইল পথ সদর গিয়ে আবার ঘুরে আসবে।

লোক ছুটে আসছে। গাড়ি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—শিগগির আসুন।

* * *

রামহরির বাড়ির দরজায় কজন শুষ্কমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

জীবন ডাক্তার দেখে বা শুনে চকিত হন নি। হার্টফেল করে মৃত্যু হয়ে থাকবে। বিস্মিত হবার কী আছে? ভিতরে শশী তাঁর পিছনে বসে ছিল; সে সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলে—কী হল? বলি—হ্যাঁ হে?

—আপনি যাওয়ার পর বার দুই দাস্ত করে কেমন করছে ডাক্তারবাবু।

মশায় উঠে বসলেন। তাঁর কল-বাক্সটায় হাত দিয়ে ভেবে নিলেন। এ অবস্থায় রোগীর একটা দুটো ইনজেকশন হলে ভালো হয়। তাঁর মকরধ্বজ, মৃগনাভি আছে, কিন্তু ইনজেকশন বেশী ফলপ্রদ; শশী এসব বিষয়ে নিধিরাম সর্দার। ইনজেকশন দেয় বটে, একটা সিরিঞ্জ তার আছে, কিন্তু সূচগুলো তার নিজের বেশভূষা শরীরের মতোই অপরিচ্ছন্ন। যে পকেটে তামাক-টিকা থাকে—সে পকেটেও সময়ে সময়ে বাক্স রাখতে শশী দ্বিধা করে না। তার উপর ওষুধ শশীর থাকে না। ওষুধ না থাকলে শশী একটা শিশি থেকে অ্যাকোয়া নিয়ে অম্লান বদনে ইনজেকশন দিয়ে দেয়।

থাক ইনজেকশন। যা হয় মকরধ্বজেই হবে। রামহরি যখন এতটাই প্রস্তুত তখন ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যু খানিকটা বিলম্বিত করেই বা হবে কী? জ্ঞানগঙ্গা? নাই বা হল!

মৃত্যু স্থির জেনে তাকে বরণ করতে চাওয়ার মতো মনটাই সবচেয়ে বড়! নেহাতই যদি আয়োজন হয়, তবে মধুর অভাবে গুড় দিয়েই কাজ চলবে। তীর্থপুণ্য-বিশ্বাসী, নামপুণ্য-বিশ্বাসী রামহরির চোখের সামনে দেবতার মূর্তি এবং নাম-কীর্তন তীর্থের অভাব অনেকটা পূরণ করবে। তা ছাড়া জ্ঞানগঙ্গায় মুক্তির কথা মানতে গেলে ভাগ্যের কথাটাও তো ভাবতে হবে, মানতে হবে। রামহরির সে ভাগ্য হবে কী করে?

সঙ্কল্প প্রায় স্থির করেই ঘরে ঢুকলেন জীবন ডাক্তার। রামহরিকে কী বলবেন তার খসড়াও মনে মনে করে নিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে রোগীকে দেখেই তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে উঠলেন। এ কী? একখানা তক্তাপোশের উপর রামহরি শুয়ে আছে—নিস্পন্দের মতো। বিবর্ণ পাণ্ডুর দেহবর্ণ। চোখের পাতায় যেন আকাশ-ভাঙা মোহ। দুর্বলতার ঘোর তার পাণ্ডুর দৃষ্টিতে। ক্ষণে ক্ষণে চোখের পাতা নেমে আসছে। আবার সে মেলছে। মেললেও সে দৃষ্টিতে ঔৎসুক্য নাই, প্রশ্ন নাই, কিছু চাওয়া নাই। এ কী অবস্থা? সমস্ত মিলিয়ে এই অবস্থা তো কয়েকটা দাস্তের ফলে সম্ভবপর নয়। তাঁর বহু-অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এক নজরেই যে বুঝতে পারছেন—এ রোগী তিলে তিলে এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ঘরের গন্ধে, রোগীর আকৃতিতে এবং লক্ষণে রোগ যে পুরাতন অজীর্ণ অতিসার—তাতে আর তাঁর সন্দেহ নাই। অ্যালোপ্যাথরা আজকাল একে বলবেন ইনটেস্টাইন্যাল টিউবারকিউলোসিস্। অণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ক্ষয়রোগের বীজও পাওয়া যাবে। ক্ষয়রোগ—ধীরে ধীরে ক্ষয় করে মানুষকে। এ অবস্থা আকস্মিক নয়। অন্তত দু দিন তিন দিন থেকে এই অবস্থাতেই আছে, তিলে তিলে বেড়ে আজ এই অবস্থায় এসেছে।

শশী নিজেই একটা মোড়া এনে বিছানার পাশে রেখে রামহরির মুখের কাছে ঝুঁকে ডেকে বলল—রাম, রাম! ডাক্তারবাবু এসেছেন। রাম!

—থাক, শশী। ওর সাড়া দিতে কষ্ট হবে। সরে আয়—আমি দেখি।

শশী উঠল—উঠেই আবার হেঁট হয়ে বললে—এখন আবার দলিলপত্র কেন রে বাপু। একখানা দলিল সে তুলে নিলে বিছানা থেকে। দলিলটা বিছানায় পড়ে ছিল।

এবার এগিয়ে এল রামহরির তরুণী পত্নীর ভাইটি। উচ্চবর্ণের বিধবা ভগ্নী রামহরিকে বরণ করে তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে থাকলেও রামহরির এই অসুখে ভগ্নীর বিপদের সময় না এসে পারে নাই। পনেরো-কুড়ি দিন হল এখানে এসে রয়েছে। সে বললে—উইল ওটা। ওর ইচ্ছে ছিল ডাক্তারবাবু এলে তার সামনে টিপছাপ দেবে, ডাক্তারবাবুকে সাক্ষী করবে, তা হঠাৎ এই রকম অবস্থা হলে বললে—কী জানি, যদি ডাক্তারবাবু আসবার আগেই কিছু হয়! বলা তো যায় না! বলে নিজে উইল নিয়ে বুড়ো আঙুলের টিপ দিলে, সাক্ষীদের সই করালে; তারপর দেখতে দেখতে এই রকম।

মাথার কাছে একটি তরুণী মেয়ে বেশ ঘোমটা টেনে বসে ছিল। সে গুনগুন করে

কেঁদে উঠল। ডাক্তার তার দিকে চাইলেন একবার, তারপর নাড়ী ধরে চোখ দুটি বন্ধ করলেন। ক্ষীণ নাড়ী, রোগীর মতোই দুর্বল—মন্দ গতিতে বয়ে চলেছে, যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ওকে চলতেই হবে। থামবার অবকাশ নাই, অধিকার নাই, উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে যেন কাঁপছে; চন্দ্রে গ্রহণ লাগলে চাঁদ যেমন কাঁপে—তেমনি কম্পন। মৃদু এবং অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিসাপেক্ষ। অন্ত্রের মধ্যে যে ক্ষয়রোগের কীট গ্রাস করে চলেছে, রেশমকীটের তুঁত পাতা খাওয়ার মতো—তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে আপাত মৃত্যুলক্ষণ তিনি অনুভব করতে পারলেন না।

স্টেথোসকোপ দিয়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করলেন। এ অবস্থায় কোনোমতেই আকস্মিক পরিণতি হতে পারে না। নাড়ীর গতির সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গতি—ঠিক যেন মিত্রভাবাপন্ন যন্ত্রী ও বাদকের মতো! দুর্বল হলেও সঙ্গত তো ব্যাহত হচ্ছে না!

ওদিকে শশী অনর্গল বকছিল, এ সব হল খলব্যাধি! হঠাৎ দাস্ত হল, বাস্ নাড়ী গেল। রোগী চোখ মুদল। আমি আজ সাত দিন থেকে বলছি—ওরে বাপু যা ব্যবস্থা করবার করে ফেল। গঙ্গাতীর যাবি তো চলে যা। ডাক্তারবাবুকে দেখাবি তো ডাকি। তা রোজই বলে—কাল। নিত্য কালের মরণ নাই, ও আর আসে না। ভদ্রলোকের এক কথা—কাল। নে, হল তো?

মেয়েটি আবার কাঁদতে লাগল।

শশী আবার বকতে শুরু করলে—হবে কেন? ভাগ্যে থাকলে তো হবে। কর্মফল কেমন দেখতে হবে! গঙ্গায় সজ্ঞানে মৃত্যু, এর জন্তে তেমনি কর্ম চাই। আমাদের শাস্ত্রে বলে—চিকিৎসকেই বা কী করবে—হোক না কেন ধন্বন্তরি—নীলরতনবাবু কি ডাক্তার রায়; আর ওষুধই বা কী করবে—সে হোক না কেন সুধা—আর দশ-বিশ টাকা দামের টাটকা তাজা ওষুধ; আয়ু না থাকলে কিছুতেই কিছু না। এও তেমনি ভাগ্য—কর্ম। সুমতি হলে কি হবে, মতিভ্রম ঠিক সময়ে এসে সুমতির ব্যবস্থা সব পালটে দেবে।

মশায় উঠলেন। দেখা তাঁর শেষ হয়েছে।

এবার মেয়েটি এসে পায়ে আছড়ে পড়ল—ওগো ডাক্তারবাবু গো! আমার কী হবে গো!

মশায় একবার সবারই মুখের দিকে চাইলেন। তারপর বললেন—ভয় নাই, ওঠো তুমি, ওঠো; ওঠো।

শশী ব্যস্ত হয়ে বললে—ওঠো, ওঠো। উনি যখন বলছেন ভয় নাই তখন কাঁদছ কেন? উনি দু কথার মানুষ নন! ওই হয়েছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। সরো সরো। ওঠো!

বাইরে এলেন মশায়। এবার তাঁর সর্বাগ্রে চোখ পড়ল—সাইকেলখানা।

মশায় ডাকলেন—শশী!

শশী বকছিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই হবে, ওঁর মতো মানুষ, উনি কি দেখবেন যে ওই অবলাটা ভেসে যাবে? ভালো ঘরের মেয়ে, সৎ জাতের কন্যা, মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম—

মস্তিভ্রমের বশে যা করেছে তার ফল শাস্তি সে ভগবান দেবেন। আমরা মানুষ—আমরা ওকে ভেসে যেতে দোব না। বাস্।

ডাকবার আগেই ক্রমশ তার স্বর নিস্তেজ হয়ে আসছিল। এবার স্তব্ধ হয়ে গেল।

—ওকে মেরেই ফেলেছিস শশী? ইচ্ছে করে? না জানিস নে, বুঝতে পারিস নি?

—আজ্ঞে?

—এ অবস্থা তো আজ তিনদিন থেকে হয়েছে। বুঝতে পারলি নে তো ডাকলি নে কেন?

—আজ্ঞে না। মা-কালীর দিব্যি!

—শশী! ধমক দিয়ে উঠলেন জীবন ডাক্তার।

—মাইরি বলছি, ঈশ্বরের দিব্যি, গুরুর দিব্যি—

এবার মৃদুস্বরে মশায় বললেন—তোদের কজনকে পুলিসে দেওয়া উচিত। থাম—চেঁচাস নে। যাক এখন শোন, ওই যে ছোকরা সাইকেল চেপে আমাদের গাড়ি দেখতে গিয়েছিল, সে কই? এই যে! ওহে ছোকরা, শোনো। কই দোয়াত-কলম দেখি। আমি লিখে দিচ্ছি ওযুধ। যাও নিয়ে এসো বিনয়ের দোকান থেকে। আর বাজারের ডাক্তার হরেনবাবুকে এই চিঠি দেবে। বুঝেছ? জলদি যাবে আর আসবে।

শশীকে দমানো যায় না। শশী ওই শক্তিতেই বেঁচে আছে। সে ছোকরার হাত থেকে প্রেসক্রিপশন এবং চিঠি দুই নিয়ে দেখলে। বললে, গ্লুকোজ ইনজেকশন দেবেন? ইনট্রাভেনাস?

—হ্যাঁ। তা হলেই কিছুটা ঘোর কাটবে। তার আগে মকরধ্বজ দেব আমি।

—ঘোর কাটবে?

—হ্যাঁ। রামহরির রোগটা মৃত্যু-রোগই বটে। এতেই যাবে। তবে মৃত্যু-লক্ষণ এখনও হয় নি।

—হয় নি? আপনি ইনজেকশন দেবেন তো?

—হরেন ডাক্তারকে আসতে লিখলাম। সে দেবে। না আসে আমিই দেব।

—যদি মরে যায়?

—সে আমি বুঝব শশী। আমার মনে হচ্ছে রামহরি এখন বাঁচবে। অন্তত মাস কয়েক। তখন উইল-টুইল যা করবার করবে। আমি বরং সাক্ষী হব। উইলটার জন্যেই রামহরির মাথা তুলে দাঁড়ানো দরকার।

শশী চুপ করলে এবার।

মশায় আবার বললেন—উইলে কী আছে জানি না। এই শেষ পরিবারকেই এক রকম দানপত্র করেছে সব—এই তো?

একটু চুপ করে ঘাড় নেড়ে বললেন—সে তো হবে না শশী। রামহরির অভিপ্রায় জানতে হবে আমাকে। তার প্রথম পক্ষের ছেলে ছিল—সে মারা গেছে। কিন্তু তার ছেলে—রামহরির নাতি আছে, পুত্রবধূ আছে। সে তো হবে না। বাঁচবেই মনে হচ্ছে। কিন্তু

তার জন্তও চিকিৎসা প্রয়োজন। চেষ্টা করতে হবে। সে আমি করব।

রামহরি এই জ্ঞানগঙ্গা যেতে চেয়েছিল? রামহরির ছটা রিপুই বোধ করি ঐকতান তুলে মৃত্যুকে ডাক দিচ্ছে আজীবন। স্থির মৃত্যুর দিকে সহজ ছন্দে এগিয়ে যেতে জীবন ভয় পায় না। ভয় পায় মৃত্যু যখন নিজে এগিয়ে আসে। তখন সে ভয়ে আর্তনাদ করে। সে কি জ্ঞানগঙ্গা যেতে পারে? বনবিহারী পারে নি। দাঁতু পারবে না। রামহরিও পারে না। রামহরির ক্লান্ত জীর্ণ দেহ, ক্ষীণ কণ্ঠ, মুহূর্তে মুহূর্তে চোখে আচ্ছন্নতার ঘোর নেমে আসছে; দু-একবার চোখ মেলছে, তার মধ্যেই দৃষ্টিতে কী আতঙ্ক কী আকুতি!

হরেন ডাক্তার আসা পর্যন্ত বসে রইলেন মশায়। মাঝখানে আর-একবার নাড়ী দেখলেন। নাড়ীর গতি ঈষৎ সবল হয়েছে; ছন্দ এসেছে। মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। হরেন এসে পৌঁছতেই তিনি তাকে সব বলে বললেন—একটা গ্লুকোজ ইনজেকশন তুমি দাও। আমি বলছি—তুমি দাও। আমি দায়ী হব হে। ভয় নাই তোমার।

হাতখানা আর-একবার দেখেছিলেন—মকরধ্বজের উষ্ণতা এবং শক্তি তখন নাড়ীতে এবং শরীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হাত নামিয়ে বললেন—দাও তুমি।

ইনজেকশন শেষ করে হরেন হাত ধুয়ে রোগীর অবস্থা দেখে হাসিমুখেই বললেন—এটি আপনার অদ্ভুত মশায়! অদ্ভুত!

জীবনমশায় হাসলেন। আর কী করবেন? এ কথার উত্তরই বা কী দেবেন!

হরেন বললে—আর একটা সুখবর দিই, বিপিনবাবুর হিক্কা থেমে গেছে। এই আসবার আগে খবর পেলাম। উঃ, ভদ্রলোকের হিক্কা দেখে আমি তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আজ চার রাত্রি ঘুমুতে পারেন নি, পেটে খাদ্য থাকে নি। আমি আসবার আগে দেখে এলাম ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছেন। আপনাকে ওরা ডেকেছিল সকলের আগে, খবর দিয়েছিল কিন্তু তখন আপনি বেরিয়ে এসেছেন। বুড়ো রতনবাবু যে কী কৃতজ্ঞ হয়েছেন সে কী বলব! প্রদ্যোত ডাক্তারও এসেছিল। সে বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছে। গম্ভীর হয়ে বললে—এ বিষয়ে এখনি কিছু বলতে পারি নে। আবার আরম্ভ হতে পারে, এবং এ ওষুধের রি-অ্যাকশনও আছে; তবে এখন অবশ্য ক্রাইসিসটা কাটল বটে। বেশ আশ্চর্য হয়েছে প্রদ্যোত ডাক্তার। আসতে আসতে পথে বললে—বৃদ্ধের ব্যাপার ঠিক আমি বুঝি নে। এ ব্যাপারটায় আমার সন্দেহ হচ্ছে কেন জানেন? আজ আবার একটা ডিসপেপসিয়ার রোগী—অবশ্য একটু শক্ত ধরনের বটে—তাকে বলেছে তুই আর বাঁচবি নে। কত দিনের মধ্যে যেন মরবে বলেছে। হরেন এবার মশায়ের দিকেই তাকিয়ে তাঁকেই প্রশ্ন করলে—তাই বলেছেন—না কি?

জীবনমশায় হরেনের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরেই বললেন—আমি ভুল বলি নি বাবা হরেন। দাঁতু এই রোগেই মরবে। তবে কোন সময় আমি নির্দিষ্ট করে বলি নি। এই রোগই ওর মৃত্যুরোগ হয়ে উঠবে। এতে আমি নিশ্চিত। গম্ভীর এবং গভীর স্বরে বললেন—দাঁতুর এ রোগের সঙ্গে ওর প্রধান রিপুর যোগাযোগ হয়েছে। ঘরে আগুন লাগলেই সব ঘরটা পুড়বে

তার মানে নাই, জল ঢাললে নিভতে পারে, নেভেও। কিন্তু আগুনের সঙ্গে বাতাস যদি সহায় হয় বাবা, তবে জলের কলসী ঢাললে নেভে না, বাতাসের সাহায্যে আগুন আঁচের ঝাপটায় ভিজে চাল শুকিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে ছাড়ে। দাঁতুর রোগ উদরাময়—তার সঙ্গে ওর লোভ রিপু হয়েছে সহায়। সহায় কেন? ওটা এখন রোগের অঙ্গ উপসর্গে পরিণত হয়েছে। আমার বাবা বলতেন—

জগৎমশায় বলতেন—বাবা, সংসারে মানুষ সন্ন্যাসীদের মতো শক্তি না পেলেও, সব রিপু-গুলিকে জয় করতে না পারলেও গোটা কয়েককে জয় করে। কেউ দুটো কেউ তিনটে—কেউ কেউ পাঁচটা পর্যন্তও জয় করে। কিন্তু একটা—।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—পারে না। একটা থেকে যায়! ওইটেই হল দুর্বল প্রবেশপথ। মৃত্যুবাহিনী ওই দ্বারপথেই মানুষের দেহে প্রবেশ করে। তার উপর বাবা যে দরজার রক্ষক সে যদি সেধে দরজা খুলে ডাকে তবে কি আর রক্ষা থাকে হরেন? রক্ষক তখন রিপু। প্রবৃত্তি তো খারাপ নয় বাবা। সংসারে প্রবৃত্তিই তো রুচি। প্রবৃত্তি যতক্ষণ সুরুচি—ততক্ষণ কুখাদ্য খায় না, পেট ভরে গেলে সুরুচি তখন বলে—আর না। তৃপ্তিতে তার নিবৃত্তি আসে। আর প্রবৃত্তি যখন কুরুচি হয়—তখন সে-ই শত্রু, সে-ই রিপু। তখন তৃপ্তি তার হয় না; নিবৃত্তি তখন পালায়। তাই রিপুর যোগাযোগে যে রোগ হয়, সে রোগ অনিবার্যরূপে মৃত্যুরোগ।

কথা হচ্ছিল ফেরবার পথে। মশায় পায়ে হেঁটেই ফিরছিলেন। শশী অদৃশ্য হয়েছে। গাড়িখানাও আর পান নি। হরেনও অগত্যা সাইকেল ধরে তাঁর সঙ্গেই হাঁটছিল। হরেন ডাক্তার চুপ করে শুনেই যাচ্ছিল। মাটির দিকে চোখ রেখে পথ চলছিল। কথাগুলি শুনতে মন্দ নয়। অস্পষ্ট বা ভাবালুতা-মেশানো যুক্তি হলেও অসঙ্গত মনে হচ্ছিল না। কিন্তু এত বড় বিজ্ঞান পড়ে এসে এসব কি পুরো মানা যায়? তবুও পাড়াগাঁয়ের ছেলে সে, বাল্যকালের সংস্কারে ঠিক এরই একটা চাপাপড়া স্রোত ভিতরে ভিতরে আছে; সেই মজাখাতের চোরা-বালিতে এই ভাবধারা বেমালুম শুষে যাচ্ছিল—মিশে যাচ্ছিল। এবং জীবনমশায়ের মতো প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক করতেও তার অভিপ্রায় ছিল না।

হরেনের নীরবতায় কিন্তু জীবনমশায় উৎসাহিত বোধ করছিলেন। তিনি বলে বললেন—ওই দেখো না বাবা, রানা পাঠককে। এত বড় শক্তি! একটা দৈত্য। রিপু হল কাম। বুঝেছ, ওর প্রমেহে চিকিৎসা করেছি, উপদংশ হয়েছে কয়েকবার, আমি কাটোয়ায় মণিবাবু ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে—এবার যক্ষ্মা হয়েছে। বললে, একটি মেয়ে-ছেলের কাছ থেকে ধরিয়েছে। তার মানে মেয়েটাকে যক্ষ্মারোগী জেনেও নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি।

এবার হরেন মৃদু হাসলে।

জীবনমশায় কিন্তু বলেই চললেন—তোমরা দেখ নি—নাম নিশ্চয় শুনেছ। মস্ত বড় কীর্তন-গাইয়ে। সুন্দর দাস গো! নামেও সুন্দর, কাজেও সুন্দর, রূপে সুন্দর, গানে সুন্দর

—লোকটিকে দেখলে মানুষের চোখ জুড়োত, মন সুন্দর হয়ে উঠত। লোকে বলত—সাধক। তা সাধনা লোকটার ছিল। নির্লোভ, অক্রোধ, মিষ্টভাষী, বিনয়ী—মোহ মাৎসর্য এও ছিল না ; শুধু কাম। কামকে জয় করতে পারেন নি। শেষ জীবনে তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন—পঙ্গু হলেন। লোকে বললে—কোনো সাধনা করতে গিয়ে এমনটা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ছিল তাই। কিন্তু গুরু রঙলাল ডাক্তারের কাছে যখন ডাক্তারি শিখছি তখন একদিন যে কথা তোমাকে বললাম সেই কথাই বললেন রঙলাল ডাক্তার। যেন আমার পিতৃপুরুষের কথার প্রতিধ্বনি করেই বললেন—জীবন, কথাটা তুমি হয়তো সত্যিই বলেছ হে। সুন্দর দাসকে দেখতে গিয়েছিলাম। মারা গেছে এই তো কিছুদিন। কিন্তু কথাটা প্রায়ই মনে হয়। কখনও ওই বোষ্টম-কীর্তনীয়াদের উপর রাগ হয়—কখনও কিছু। লোকটা অসহায়ভাবে রিপুর হাতে মরেছে হে। ও পাগল হয়েছিল—উপদংশ-বিষে, প্রমেহ-বিষে!

মশায় আবার একটু থেমে বলেছিলেন—দেখ না বাবা, রতনবাবুর ছেলে বিপিনের কেস। বাবা, এখানেও সেই রিপুর যোগাযোগ। প্রতিষ্ঠার মদও এক রিপু বাবা। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি যার নাই সে কি মানুষ? কিন্তু সে যখন রিপু হয় তখন কি হয় দেখ!

চকিত হয়ে হরেন প্রশ্ন করেছিল—তা হলে বিপিনবাবু সম্পর্কে আপনি—?

প্রশ্নটা সে সম্পূর্ণ উচ্চারণ করতে পারে নি।

—না। সেকথা ঠিক বলি নি আমি। তবে বাবা, অত্যন্ত কঠিন—অত্যন্ত কঠিন।

—আজ তো ভালোই আছেন। আমার ভালোই লাগল। হিক্কাটা থেমে গেছে। সুস্থ হয়েছেন—ঘুমুচ্ছেন।

—ভালোই থাক। ভালো হয়েই উঠুক। কিন্তু ভালো হয়ে উঠেও তো ভালো থাকতে পারবে না ও, হরেন। আবার পড়বে। প্রবৃত্তি রিপু হয়ে দাঁড়ালে তাকে সম্বরণ করা বড় কঠিন।

—এ যাত্রা তা হলে উঠতে পারেন বলছেন?

—তাও বলতে পারছি না বাবা। মাত্র তো দুদিন দেখছি। তার উপর মন চঞ্চল হচ্ছে। রতনকে দেখছি। বিপিনের ছেলেকে দেখছি, বুঝেছ, ওই ছেলেটিকে দেখে বনবিহারীর ছেলেকে মনে পড়ে গেল।

মশায় দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললেন আবার হাসলেনও। এবং হঠাৎ বললেন—চণ্ডীতলায় যাব একবার। আসবে নাকি? মহান্ত আজ যাবেন। একবার দেখে যাই। আজ রাত্রেই যাবেন।

মহান্ত তখন আবার বার তিনেক দাস্ত গিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন, আঙুলের ডগাগুলি ঠাণ্ডা হয়েছে, চোখের পাতা নেমে এসেছে একটা গভীর আচ্ছন্নতার ভাবে। মধ্যে মধ্যে মুখ বিকৃত করছেন—একটা যেন যন্ত্রণা হচ্ছে, নিষ্ঠুর যন্ত্রণা।

হরেন বললে—বলেন তো একটা ইনজেকশন দিই।

মশায় বললেন—চিকিৎসক হয়ে আমি নিষেধ করতে পারি? দেবে, দাও।

মহান্তের শিষ্য বললে—বাবার নিষেধ আছে। তিনি বার বার নিষেধ করেছেন—সুই কি

কোনো ইলাজ যেন না দেওয়া হয়। মশায় বলেছে আজ ছুটি মিলবে। ছুটি চাই আমার। ইয়ে শরীর বিলকুল রদ্দি হো গয়া!

শ্রদ্ধার প্রসন্নতায় মশায়ের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি এবার হরেনের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—থাক হরেন।

হরেন স্তব্ধ হয়ে মহান্তের প্রায়-নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। হরেন এই গ্রামের ছেলে। ডাক্তার সে হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের মৃত্যুর অনেক গল্প সে শুনেছে। আজও এখানে মৃত্যুকালে ওষুধ পাশে সরিয়ে রেখে মুখে দুধ গঙ্গাজল দেয়। আগেকার কালের আরও অনেক বিচিত্র গল্প সে শুনেছে। তবু আজকের এ মৃত্যুদৃশ্য তার কাছে নতুন এবং বিস্ময়কর।

দীর্ঘকায় কঙ্কালসার মানুষটি নিথর হয়ে পড়ে আছে। শ্বাস হচ্ছে যেন। তার গতি অবশ্য মৃদু। হঠাৎ মনে হল অত্যন্ত ক্ষীণভাবে ঠোঁট দুটি নড়ছে।

ইঙ্গিত করে সে মশায়কে দেখালে।

মশায় বললেন—ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন। ভিতরে জ্ঞান রয়েছে। গ্রহণীর রোগীর জ্ঞান শেষ পর্যন্ত থাকে।

হরেন তর্ক করলে না। কিন্তু তর্ক আছে।

মশায় বললেন—হাতের দিকে দেখো।

মহান্তের হাতের আঙুল করজপের ভঙ্গিতে ধরা রয়েছে।

শিষ্য ভোলানাথ এসে বললে—তা হলে বের করি মশায়?

—হ্যাঁ বের করবে বই কি। দেহ ছাড়বেন, এখন ঘর কেন?—আকাশের তলায়, মায়ের আঙিনায়।

বাইরে তখন অনেক লোক। সকালবেলা মশায়ের নিদান কথা শুনে মহান্ত শিষ্য ভোলাকে বলেছিলেন—দু-তিন গাঁওয়ের হরিনামকে দলকে খবর ভেজো রে ভোলা। বলো—হমকো আজ ছুটি মিলবে। যায়েগা হম। তুম লোক ভাই, দল লেকে আও। নাম করো। ওহি শুনতে শুনতে হম যায়েগা। বন্ধন টুটেগা। ভরোসা মিলেগা।

মশাই নিজেই বেরিয়ে এসে বললেন—হরিবোল, হরিবোল! ধরো, ধরো নাম ধরো। জয় গোবিন্দ!

বেজে উঠল খোল করতাল। মশায় নিজেই এসে দাঁড়ালেন সর্বাগ্রে—"নামের তরী বাঁধা ঘাটে—হরি বলে ভাসাও তরী।"

সন্তর্পণে বহন করে এনে আকাশের তলায় দেবীর পাটঅঙ্গনে মহান্তকে শুইয়ে দিলে সকলে। শ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে।

হরেন অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। চিকিৎসক হিসেবে তার চলে আসবার কথা মনে হল না। মনটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। বিচিত্র!

তেইশ

মাস দেড়েক পর।

মশায় এবং সেতাব দাবায় বসেছেন। ভাদ্র মাস—আকাশ এরই মধ্যে এবার নির্মেঘ নীল ; অনাবৃষ্টির বর্ষা শেষ হয়েছে প্রায় সপ্তাহখানেক আগে এবং এই এক সপ্তাহের মধ্যেই মাঝ-শরতের আবহাওয়া ফুটে উঠেছে আকাশে মাটিতে। আজ দাবা খেলার আসরও জমজমাট। শতরঞ্জির পাশে দুখানা থালা নামানো রয়েছে, চায়ের বাটি রয়েছে। জন্মাষ্টমী গিয়েছে—আতর-বউ আজ তালের বড়া করেছেন, একটু ক্ষীরও করেছেন—সেই সব সহযোগে চা পান করে দাবায় বসেছেন। মশায় অবশ্য খান নি। অসময়ে তিনি কোনো কালেই এক চা ছাড়া কিছু খান না। ডাক্তারি শেখার সময় রঙলাল ডাক্তারের ওখানে ওটা অভ্যাস করেছিলেন। লোককে কিছু খেয়ে চা খেতে উপদেশ দিলেও নিজে বিকেলবেলা খালি পেটেই চা খেয়ে থাকেন। খেতে তাঁর বেলা যায়, ক্ষিদে থাকে না—এ একটা কারণ বটে, কিন্তু আসল কারণ অন্য। সন্ধ্যার পর অর্থাৎ দাবা খেলা অন্তে—সে সাতটাই হোক আর আটটাই হোক আর বারোটাই হোক,—মুখহাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইষ্ট স্মরণ করে তবে আহার করেন। পরমানন্দ মাধব!

আতর-বউয়ের মেজাজ আজ ভালো আছে। গতকাল জন্মাষ্টমীর উপবাস করেছিল—আজ সেতাবকে নিমন্ত্রণ করে দুপুরে ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছে; বিকেলে জলযোগ করিয়েছে। এবং সেতাবের ভোজন-বিলাসিনী স্ত্রীর জন্য তালের বড়া ক্ষীর বেঁধে দিয়ে খুব খুশীমনেই আছে। শুধু ব্রাহ্মণভোজন নয়, দম্পতিভোজন করানো হয়ে গেল। ব্রত উপবাস করলে আতর-বউ ভালো থাকে। বোধ করি, পরলোকের কল্পনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আয়োজনও ভালো ছিল। অভিযোগ করতে পায় নি আতর-বউ। মশায়ের পরমভক্ত পরান খাঁকে ডাক্তার কয়েকটি ভালো তালের কথা বলেছিলেন, খাঁ একঝুড়ি খুব ভালো এবং বড় তাল পাঠিয়ে দিয়েছিল। এবং রামহরি লেটের বাড়ি থেকে এসেছিল একটি ভালো 'সিধে'—মিহি চাল, ময়দা, কিছু গাওয়া ঘি, কিছু দালদা, তেল, তরিতরকারি এবং একটা মাছ। রামহরি সেই মরণাপন্ন অবস্থা থেকে বেশ একটু সেরে উঠেছে। এবং রামহরির পুত্রবধূ পৌত্র ফিরে এসেছে, তারাই এখন সেবা-শুশ্রূষা করছে। মশায়ের কাছে তাদের আর কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। রামহরির নতুন বউ তার ভাইকে নিয়ে পালিয়েছে। রামহরির মেজাজ অবশ্য খুবই খিটখিটে—শশীর উপরে শব্দভেদী বাণের মতো কটুবাক্য প্রয়োগ করে। পুত্রবধূ পৌত্রকেও অবিরাম বিদ্ধ করছে। কিন্তু এই খিটখিটে মেজাজের মধ্যেও রামহরি মশায়কে দেখে সজল চোখে বলে—বাবা, আর জন্মে আপনি আমার বাপ ছিলেন। সেই দিন থেকে ক্রমান্বয়ে কুড়িদিন তিনি নিত্যই রামহরিকে দেখে এসেছেন।

সিধেটা বোধ করি সেই সম্বন্ধ ধরেই পাঠিয়েছে রামহরি। নইলে একালে চিকিৎসককে উপঢৌকন কি সিধে পাঠানো উঠে গিয়েছে। একালে নগদ কারবার। বুড়ো রামহরি পূর্ব

জন্মের বাপের বন্দনা করছে। একদিন মশায় হেসে রামহরিকে বলেছিলেন—শশী তা হলে কাকা ছিল—না কী বলিস? তোকে তো পথে বসিয়েছিল! অ্যাঁ!

রামহরিও হেসেছিল। মশায় বলেছিলেন—দেখ, তোর আর জন্মের বাবা হয়ে যদি তোর উপর আমার এত মায়া—তবে তোর এই জন্মের বেটার ছেলের উপর কি এত বিরূপ হওয়া ভালো? তবে একটা কথা বলব বাবা। তুমি সেরে এখন উঠলে—কিন্তু এ রোগ তোমার একেবারে ভালো হবে না। সাবধানে থাকবে। বুঝেছ! উইল-টুইল যদি কর—তবে করে ফেলো। আর একটি কথা, যে মেয়েটিকে তুমি শেষে মালাচন্দন করেছ তাকেও বঞ্চিত কোরো না।

রামহরির এই তরুণী স্ত্রীটিও এর মধ্যে খিড়কির পথে আতর-বউয়ের কাছে এসে ধরনা দিয়েছিল। পরামর্শ যে শশীর তাতে মশায়ের সন্দেহ নাই। বোধ হয় কিছু প্রণামীও দিয়ে গিয়ে থাকবে। বোধ হয় নয়, আতর-বউ যখন ওকালতি করেছে তার জন্য তখন ফী নিশ্চয় নিয়েছে। মশায় এ নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু কোনো প্রশ্ন করেন নি। তিনি নিজেই রামহরিকে এ কথা বলেছেন। আতর-বউ যা করেছে তার দায়িত্ব নিজের। তবে স্বামীকে যদি স্ত্রীর পাপের ভাগ নিতে হয় নেবেন; ইহলোকে আতর-বউয়ের অগ্নিদাহের জ্বালার উত্তাপ জীবনভোর সইতে পারলেন, পরলোকে আর পাপের ভাগের বোঝা বইতে পারবেন না?

খুব পারবেন!

ডাক্তারেরা বলছে বিপিন ভালো আছে। হিক্কা তার আর হয় নাই। সেখানেও নিত্য যেতে হয়। তিনি নাড়ী না দেখলে রতনবাবুর তৃপ্তি হয় না। প্রদ্যোত ডাক্তারও আসে। সে আসে তাঁর পরে। কোনো কোনো দিন দেখা হয়ে যায়। দু-একটা কথাও হয়। সে শুধু নমস্কার-বিনিময় মাত্র। তিনি হাত দেখেই চলে আসেন। বলে আসেন ভালোই আছে। এর বেশী কিছু না। মনের মধ্যে সেই কথাগুলিই ঘুরে বেড়ায়, মহান্তের তিরোধানের দিনে যে কথাগুলি তিনি হরেনকে বলেছিলেন।

হুঁকোটা হাতে ধরেই সেতাব চাল ভাবছিল।

মশায় বললেন—ও বাবা, ন হরি ব্রহ্মা ন চ শঙ্কর! ওর নিদান হেঁকে দিয়েছি মানিক। তিন চাল। তিন চালেই তোমার মন্ত্রী অকস্মাৎ গজের মুখে পড়ে কাত।

মশায় সেতাবের মন্ত্রীকে নিজের গজের মুখে চাপা দিয়ে রেখেছেন। এদিকে কিস্তি দিয়েছেন। সেতাব ভাবছে।

মশায় সেতাবের হুঁকো থেকে কল্কেটা ছাড়িয়ে নিয়ে টানতে শুরু করলেন। তামাকটা কেন পোড়ে মিছিমিছি! সেতাব বল ফেলে দিয়ে, কল্কের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—দে! তোর পড়তা ভালো আজ।

মিথ্যে বলে নি সেতাব! মশায় আজ পর পর দুবাজি জিতলেন। সেতাব কঠিন খেলোয়াড়। ওর সঙ্গে জেতা কঠিন। প্রায়ই চটে যায় বাজি। একশো বাজির নব্বুই

বাজি চটে যায়—দশ বাজিতে হারজিত হয়! সে-ও সমান সমান।

কঠিন-রোগী থাকলে মশায় অনেক সময় খেলতে বসবার আগে সেকালের জুয়ার বাজির মতো ভাবেন—আজ যদি সেতাব হারে তবে রোগকে হারতে হবে; সেরে উঠবে রোগী। সঙ্গে সঙ্গেই হাসেন। নাড়ী দেখার অনুভূতি মনে পড়ে যায়। ও মিথ্যা হয় না। হবার নয়। রোগের কথাই মাথায় ঘুরতে থাকে। যন্ত্রচালিতের মতো খেলে যান, সেতাব একসময় বলে ওঠে—মাত।

সেতাব তামাক খেয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলে—তোর পড়তা ভালো, সত্যিই ভালো জীবন। রামহরিকে তুই যা বাঁচালি! খুব বাঁচিয়েছিস!

জীবনমশায় বললেন—পরমায়ু পরম ঔষধ সেতাব। রামহরির আয়ু ছিল। সারাটা জীবন কুস্তি-কসরত করেছে—সেও এক ধরনের যোগ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের তফাত আছে। ওর সহ্যশক্তি কত! সেইটেই বিচার করেছিলাম আমি। শক্তিই হল আয়ুর বড় কথা। রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি ওষুধ? করে জীবনীশক্তি, আয়ু।

সেতাব হেসে বললে—হ্যাঁ, তা হলেও হাতযশটা তো তোমার বটে। সে তোমার চিরকাল আছে। নতুন ছক সাজাতে লাগল সেতাব। সাজাতে সাজাতে বললে—শশীর কথা শুনেছিস?

শুনেছেন, তাও শুনেছেন।

গুটি সাজাতে সাজাতেই ডাক্তার হাসলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর কপালের দুপাশে রগের শিরা দুটো মোটা হয়ে ফুলে উঠল। ক্ষোভে থমথমে হয়ে উঠল স্থবির মুখখানা।

সেই প্রথম দিনই শশী রামহরির ওখান থেকে একরকম পালিয়ে এসে মদ্যপান করে সারা নবগ্রামের প্রতি ডাক্তারখানায় চীৎকার করে বেড়িয়েছে—আমি তো তবু কম্পাউণ্ডার। বর্ধমানে রীতিমত পাশ করে এসেছি। ওটা যে হাতুড়ে! পুঁজি তো রঙলাল ডাক্তারের খানকতক প্রেসক্রিপশন আর বাপ-পিতামহের মুষ্টিযোগের খাতা! আর নাড়ী ধরে চোখ উলটে—খানিকক্ষণ আঙুল তুলে টিপে—তারপর বায়ু পিত্ত কফ! মনে হচ্ছে দশ দিন। না হয় ঘাড় নেড়ে—তাই তো,—এই বলা! রামহরিকে বাঁচাবে! কই বাঁচাক দেখি! তাও তো গ্লুকোজ ইনজেকশন দিতে হরেন ডাক্তারকে ডাকতে হয়েছে! আসল কথা রামহরির টাকা—বিষয়! সব, সব বুঝি বাবা, সব বুঝি! রামহরি তো হরে হরে করবে, এখন বাঁচবে বাঁচবে রব তুলে ইনজেকশন, ওষুধ, ফী, গাড়ি-ভাড়া, হেনো তেনো গোলযোগ বাধিয়ে পঞ্চাশ একশো দেড়শো যা মেলে—তাই বুড়োর লাভ। এ আর কে না বুঝবে! আমার নামে তো যা তা বলেছে; কিন্তু গোসাঁইকে—চণ্ডীতলার গোসাঁইকে কে মারলে? উনি নন? আগের দিন রাত্রে এক ডোজ ওষুধে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। সকালে ভালো রইল। উনি গিয়ে ফুসমন্তর দিয়ে এলেন—সন্ধ্যেতে যাবেন। ওষুধবিষুধ আর খাবেন না। সারাদিন ওষুধ না পড়ে বিকেলে আবার দাস্ত হল। হবেই তো। বাস, নিদান সার্থক হয়ে গেল।

প্রদ্যোত ডাক্তারও তাই বলে।

বলে—সন্ন্যাসী মরেছে, তার জন্যে কারই বা মাথাব্যথা! কিন্তু ওই লোকটির জীবনের মূল্যে জীবনমশায় নিজেকে নাড়ীজ্ঞানে অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু আমি বলব—উনি তো ওকে মেরেছেন। ইয়েস, ইন দি ট্রু সেন্স অব দি টার্ম। ওষুধ দিলে এবং ওইভাবে ঘর থেকে টেনে বের না করলে সন্ন্যাসী আরও দু-একদিন—অন্তত আরও ঘণ্টা-কয়েক বাঁচত—এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। এ তো নিজের নিদান সত্য করবার জন্য টেনে-হেঁচড়ে, খোল করতালে রোগীকে চমকে দিয়ে উত্তেজিত করে মেরে ফেলেছে।

কথাগুলি মনে পড়লেই রগের শিরা দপদপ করে উঠে।

কথাটা উঠতেই এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন জীবনমশায় যে, এ দানটায় হেরেই গেলেন তিনি। খপ করে দাবাটাই মেরে বসল সেতাব! বললে—এইবার!

তাই বটে। এই বারই বটে। বাঁকা পায়ে আড়াইপদ আড়ালে অবস্থিত একটা ঘোড়ার জোরে একটা বড়ের অগ্রগমন সম্ভাবনা তিনি লক্ষ্য করেন নি।

সেতাব হেসে বললে—দেখবি নাকি?

ছকের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে মশায় বললেন—না। সবটাই এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। তুই ও কথা তুলে মনটা চঞ্চল করে দিলি। নন্দ রে, তামাক দে তো বাবা!

—আর একবার চা করতে বল। খেয়ে উঠি। দেরি হলে সে বুড়ী আবার পঞ্চ-উপচার সাজিয়ে বসবে।

অর্থাৎ রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা শুরু করবে। গৃহিণীর খাওয়ার আয়োজন সেতাবের পক্ষে প্রায় বিভীষিকা। যাবার পথে তাঁকে দোকান থেকে দালদা কিনে নিয়ে যেতে হয়। যা হোক কিছু রসনাতৃপ্তিকর তৈরি করেন তিনি। সেতাব উপলক্ষ্য। নিজেই সেতাব মধ্যে মধ্যে বলে—বুঝলি জীবন, এ সেই ষোলো কইয়ের ব্যাপার! সেই যে একজন জোলা ষোলোটা কই মাছ কিনে এনে বউকে বলেছিল—ভালো করে রান্না কর, বেশ পেঁয়াজ গরম-মশলা দিয়ে—মাখো-মাখো করে ঝোল রেখে,—লঙ্কাবাটা দিয়ে—যেন জিভে দিলেই পরানটা জুড়িয়ে যায়। বউ রান্না করতে লাগল—জোলা মাকু ঠেলতে বসল ঘরে। একটি করে ছ্যাঁক শব্দ উঠল আর জোলা একটি করে দাগ কাটলে মাটিতে। তারপর ছ্যাঁক শেষ হতেই উঠে গিয়ে বলল—দে খেতে। বউ খেতে দিলে কিন্তু একটি কই মাছ।

—এ কী, আর গেল কোথায়?

—একটা মাছ বেড়ালে খেয়ে গেল।

—তা হলেও তো পনেরোটা থাকে।

—খপ করে গর্ত থেকে একটা ইঁদুর বেরিয়ে একটা নিয়ে গেল।

—দুটো গেল। বাকি থাকে চোদ্দটা।

—ভূতে নিয়েছে দুটো। ওই সেওড়া গাছের ভূত মাছের গন্ধে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে—

—তাই গেল, তবু থাকে বারোটা।

—ভয়ে নড়ে বসতে গিয়ে হাতের ধাক্কায় দুটো পড়ল আগুনে।

সেতাব হাসেন আর বলেন—বুঝলি, এইভাবে জোলার বউ হিসেব দিলে পনেরোটা কই মাছের। সেগুলি উনোনশালে রান্না করতে করতে গুবগুব করে তিনি ভক্ষণ করেছেন। তারপর পনেরোটা মাছের যথাবিহিত হিসেব দিয়ে তিনি চেপে বসে বললেন—

'আমি যাই ভালোমানুষের ঝি—
তাই এত হিসেব দি।
তুই যদি ভালোমানুষের পো—
তবে ন্যাজাটা মুড়োটা খেয়ে মাঝখানটা খো।'

বলে পরম কৌতুকে সেতাব হা-হা করে হাসেন।

* * *

বাইরে থেকে কে ডাকলে—মশায়! কই? কোথায়?

মশায় একটু চকিত ভাবেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন; কিশোরের গলা। কিশোর কলকাতায় গিয়েছিল; ফিরেছে তা হলে। বোধ হয় কিছু নিয়ে এসেছে। সে কলকাতায় গেলেই তাঁর জন্য কিছু না কিছু আনে। একা তাঁর জন্য নয়, অনেকের জন্য। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারই প্রিয়জন কিশোর। ছেলেদের জন্য পেন্সিল, বই; মেয়েদের জন্য সেলায়ের সরঞ্জাম; দুঃস্থ মধ্যবিত্ত ছেলেদের জন্য জামা, প্যাণ্ট নিয়ে আসে। তাঁকে চার-পাঁচবার ফাউণ্টেন পেন এনে দিয়েছে, প্রেসক্রিপশন লিখতে। সব হারিয়েছে। মধ্যে মধ্যে জুতো এনে দেয়। যেবার ওসব কিছু আনে না সেবার অন্তত কিছু ফল। কিশোর চিরদিন নবীন কিশোর দুলাল হয়েই রইল। তিনি সাড়া দিলেন—কিশোর!

—কোথায়? বেরিয়ে আসুন; অনেক লোক আমার সঙ্গে।

মশায় বেরিয়ে এলেন, কিশোর কোন্ দায় এনে ফেললে কে জানে? কোনো গ্রামে মহামারীর দায়, কোনোখানে হাঙ্গামার দায়—সব দায়েই মাথা পাতা ওর স্বভাব।

বেরিয়ে এসে মশায় বিস্মিত হয়ে গেলেন, কিছু বুঝতে পারলেন না তিনি। এ যে সম্ভ্রান্ত নাগরিকের দল। কোট-প্যাণ্ট-পরা, মার্জিতকান্তি, শিক্ষা-ও বুদ্ধি-দীপ্ত-দৃষ্টি বিশিষ্ট ব্যক্তি সব। থানার দারোগা সঙ্গে; আরও কজন এখানকার সরকারী কর্মচারীও রয়েছে; প্রদ্যোত ডাক্তারও রয়েছে। নবগ্রামের ধনী ব্রজলালবাবুর উত্তরাধিকারীরা এখন সদর শহরে বাস করে, ব্রজলালবাবুর বড় নাতিও রয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট রয়েছে। তাঁরা এখানে? তাঁর দরজায়?

তবে কি প্রদ্যোত ডাক্তার সেই দরখাস্ত করেছে? হৃদয়হীন মূর্খ হাতুড়ে নিদান হেঁকে রোগগ্রস্তকে অকালে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। মহান্তকে তিনি কয়েক দিন—অন্তত কয়েক ঘণ্টা আগেও মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছেন।

রগের শিরা দুটো তাঁর দাঁড়িয়ে উঠল। তিনি কিছু বলবার আগেই কিশোর ভদ্রলোকদের লক্ষ্য করে বললে—ইনিই আমাদের মশায়। তিন পুরুষ ধরে এখানকার আতুরের মিত্র।

আলুরস্তু ভিষঙ্‌মিত্রং। এই ভাঙা আরোগ্য-নিকেতনই একশো বছরের কাছাকাছি আমাদের হেল্‌থ সেণ্টার ছিল।

দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগুলির মুখে স্মিত হাস্য-রেখা দেখা দিল। তার কতকটা যে কৃত্রিম তাতে সন্দেহ ছিল না। তাঁরা নমস্কার করলেন মশায়কে। তিনিও প্রতিনমস্কার করলেন।

কিশোর তাঁর হয়ে ওকালতি করছে। এককালে কত করেছেন—সেই কথা বলে একালের অপরাধ মার্জনা করতে বলছে। প্রদ্যোত গম্ভীরমুখে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন কোট-প্যাণ্ট-পরা তরুণ মৃদুস্বরে তাকে কী বলছে। হরেনও রয়েছে একপাশে।

কিশোর বললে—আর এঁরা হলেন আমাদের নতুন পশ্চিম বাঙলা গড়বার কর্তাব্যক্তি সব। বিশ্বকর্মার দল। কমিউনিটি প্রজেক্টের কথা শুনেছেন তো? একশোখানা গ্রাম নিয়ে নতুন আমলের দেশ তৈরি হবে। এখানেও আমাদের একটা প্রজেক্ট হচ্ছে। নবগ্রাম হবে সেণ্টার। নতুন রাস্তা-ঘাট, ইস্কুল-হাসপাতাল-ইলেকট্রিক, অনেক ব্যাপার। সেই জন্যে এ অঞ্চল দেখতে এসেছেন। পথে আপনার 'আরোগ্য-নিকেতনে'র সাইনবোর্ড দেখে জিজ্ঞাসা করলেন। তাই বললাম—'আরোগ্য-নিকেতন' ভেঙেছে, কিন্তু তার প্রাণ এখনও আছে, মশায় এখনও আছেন। তাঁকে না দেখলে এখানকার প্রাণের কি দাম কী শক্তি তা বুঝতে পারবেন না।

অকস্মাৎ মশায়ের মনে হল—শুষ্ক সমুদ্রের বালুরাশির মতো তাঁর অন্তরে কোন গভীর অন্তরতল থেকে উথলে বেরিয়ে আসছে উচ্ছ্বসিত লবণাক্ত জলরাশি। ঠোঁট দুটি তাঁর থরথর করে কেঁপে উঠতে চাইছে। কঠিন দৃঢ়তার সঙ্গে চোয়ালে চোয়ালে চেপে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

কিশোর বললে—আপনার নাড়ীজ্ঞানের কথা বলছিলাম। সেই ডাঃ সেনগুপ্ত এসেছিলেন কলকাতা থেকে—ব্রজলালবাবুর নাতিকে দেখতে। মশায় পাঁচ দিনের দিন প্রথম রোগী দেখেছিলেন। রোগী দেখে বেরিয়ে এলেন। আমিও এলাম; আমিও ছিলাম সেখানে। তখন আমি আমাদের সেবাসঙ্ঘের সেক্রেটারি; আমি নার্সিং করছিলাম। মশায়ের সঙ্গে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম—

* * *

সে অনেক দিনের কথা। অনেক দিন।

টাইফয়েডের ওষুধ হিসেবে 'ফাজ' তখন এদেশে সবে ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে।

ব্রজলালবাবুর নাতির অসুখেই মশায় এই ফাজের ব্যবহার দেখেছিলেন। কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার সেনগুপ্ত এসে ব্যবহার করেছিলেন ফাজ। মহাশয় মহাপ্রাণ ধার্মিক লোক এই ডাক্তারটি।

জীবনমশায় তখন এ অঞ্চলের ধন্বন্তরি। ব্রজলালবাবু লক্ষপতি মানুষ, কীর্তিমান মহাপুরুষ, উইলিয়ম্‌স্‌ চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির প্রতিষ্ঠাতা। তিনিও তাঁকে স্নেহ করতেন—শুধু

স্নেহই নয় তার সঙ্গে সম্ভ্রমও। তিনি মশায়কে আধুনিক সাজে সাজিয়েছিলেন। দেখা হলেই হেসে বলতেন—জীবন, এত বড় চিকিৎসক তুমি—তুমি ভালো পোশাক করো। জান, একবার কলকাতায় থিয়েটার দেখলাম। তাতে এক হাল ফ্যাশানের বাড়িতে এক বড় ডাক্তার দেখতে এল রোগী। তা সে রোগী বলে—ওর পায়ে মোজা নেই ও কেমন ডাক্তার? চার টাকা ফী ওকে কক্ষনো দিতে পাবে না। পালাটি চমৎকার। তা কথাটিও সত্যি হে, ভেক চাই।

জীবনমশায় বলতেন—আজ্ঞে কর্তাবাবু, ওসব যদি এ জন্মেই গায়ে দিয়ে শেষ করে শখ মিটিয়ে যাব তবে আসছে জন্মে এসে শখ মেটাব কিসে?

কর্তাবাবু হা-হা করে হেসে বলতেন—কোট-প্যাণ্ট পরবে মশায়, বিলেত-ফেরত সাহেব ডাক্তার হবে।

জীবনমশায়ও হটতেন না, বলতেন—সে ডবল প্রমোশন হবে, কর্তাবাবু, সামলাতে পারব না। শেষে বলতেন—কর্তাবাবু আপনার কথা আলাদা। আপনার মুক্তি কর্মযোগে। বাড়িতে কালী প্রতিষ্ঠা করেছেন, বৃন্দাবন তৈরি করেছেন—ভগবানকে বেঁধেছেন, ইস্কুল দিয়েছেন, চিকিৎসালয় দিয়েছেন, মুক্তি আপনার করতলগত। আমরা সাধারণ মানুষ, ভক্তি-টক্তি করে ত্রাণ পাব। ওসব জামা-কাপড়-পোশাকের গরমে ভক্তি উপে যায়, থাকে না। ওসব আমাদের নয়।

কর্তাবাবু কিন্তু এতেও মানেন নি। তাঁর সেবার কলকাতার কাঁকড়া খেয়ে খেয়ে হয়েছিল আমাশয়, সেই আমাশয় মশায় ভালো করেছিলেন। তখন শীতকাল। ভালো হয়ে উঠে ব্রজলালবাবু দর্জি পাঠিয়ে মশায়ের গায়ের মাপ নিয়ে কলকাতা থেকে দামী চায়না কোট তৈরি করে এনে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রজলালবাবুর বাড়িতে অসুখ একটু বেশী হলেই তাঁর ডাক পড়ত। সাধারণত দেখত তাঁর চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির ডাক্তার। তাঁর ডিসপেনসারির ডাক্তারকে তিনি বাড়িতে না ডাকলে অন্য লোকে ডাকবে কেন?

ব্রজলালবাবুর নাতি—তাঁর দৌহিত্রের অসুখ। একজ্বরি জ্বর। কলকাতা থেকে মাতামহের বাড়ি এসে জ্বরে পড়েছে। ডিসপেনসারিতে এসেছে তখন একজন তরুণ ডাক্তার। হরিশ প্রায় বছর আষ্টেক আগে চলে গেছে। তারপর দুজন এসেছে, দুজনই পসার না হওয়ায় চলে গেছে। তারপর এই তরুণটি, চক্রধারী। যে চক্রধারী এখন চিকিৎসা ছেড়ে প্রায় সন্ন্যাসী। চক্রধারী তাঁর ছেলে বনবিহারীর বন্ধু। চক্রধারীই দেখছিল, পাঁচ দিনেও জ্বরের বৃদ্ধিমুখ কম না পড়ায় তাঁকে ডেকেছিলেন ব্রজলালবাবু। অবশ্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ ঘটে নি তখন। তবু ধনী মানুষ, দৌহিত্র এসেছে কলকাতা থেকে—তাই তাঁকে ডেকে একজনের স্থলে দুজন ডাক্তার দেখানো। শীতকালের দিনে জীবনমশায় চায়না কোটটি গায়ে দিয়েই দেখতে গিয়েছিলেন। কর্তাবাবু রসিকতা করেছিলেন,—কোট গায়ে দিয়েছ জীবন? ভক্তিকে উপিয়ে দিলে নাকি?

মশায় বলেছিলেন—আজ্ঞে, ভক্তিকে এ জন্মের মতো শিকেয় তুলে রাখলাম কর্তাবাবু।

সে যা হয় আসছে জন্মে হবে। তা ভক্তিই যখন শিকেয় তুললাম তখন কোট গায়ে দিতে দোষ কী বলুন।

ছেলেটির নাড়ী দেখবার আগে তাঁর কানে এসেছিল কয়েকটি মৃদুস্বরের কথা। কলকাতারই কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে পাশের ঘরে বলছিল—এ সব কী করছেন এঁরা! হাতুড়ে ডেকে হাত দেখানো—এগুলো ভালো নয়!

জীবনমশায়ের পায়ের ডগা থেকে রক্তস্রোত বইতে শুরু করেছিল মাথার দিকে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে হাত দেখতে বসেছিলেন।

তাঁর বাবা বলেছিলেন—ধ্যানযোগে নাড়ী পরীক্ষা করতে হয়। সেদিন সেই যোগ যেন মুহূর্তে সিদ্ধিযোগে পরিণতি লাভ করেছিল। সেই ধ্যানযোগে তিনি অনুভব করেছিলেন কঠিন সান্নিপাতিক-দোষদুষ্ট নাড়ী!

নাড়ী ছেড়ে উঠে বাইরে এসে হাত ধুয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন—ছেলেটির জ্বর সান্নিপাতিক, মানে টাইফয়েড, কর্তাবাবু। এবং—

—কী জীবন?

—বেশ শক্ত ধরনের টাইফয়েড। ভালো চিকিৎসা চাই। সদর থেকে কাউকে এনে দেখান।

ওই পাশের ঘরের কথা তাঁর কানে না গেলে হয়তো এমনভাবে তিনি বলতেন না। একটু ঘুরিয়ে বলতেন।

সদরের ডাক্তার এসে দেখে বলেছিলেন—যিনি বলেছেন তিনি বোধ হয় একটু বাড়িয়ে বলেছেন। টাইফয়েড বটে—তবে কঠিন কিছু নয়। সেরে যাবে।

জীবনমশায় তাঁর সামনেই ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—আজ্ঞে না। আমার জ্ঞানে রোগ কঠিন। তবে যদি বলেন আমি হাতুড়ে, সে অন্য কথা।

কিশোর তখন তরুণ। সে বাইরে তাঁর সঙ্গে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী দেখলেন ডাক্তারবাবু? খুব শক্ত?

মশায় তাকে বলেছিলেন—ব্যাপারটা জটিল বাবা কিশোর। সদরের ডাক্তার বুঝতেই পারছে না। জিভের দাগ, পেটের ফাঁপ, দুবার জ্বর ওঠানামা, জ্বরের ডিগ্রি দেখে ও বিচার করছে। আমি নাড়ী দেখেছি। ত্রিদোষদুষ্ট নাড়ী। এবং—। তুমি বোলো না কিশোর, এ রোগ আর ব্রহ্মা-বিষ্ণুর হাতে নাই! এক শিব—যিনি নাকি মৃত্যুর অধীশ্বর, তিনি যদি রাখেন তো সে আলাদা কথা।

দশ দিনের পর থেকে রোগ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। শহরের ডাক্তার আবার এসে বললেন—হ্যাঁ, দ্বিতীয় সপ্তাহে এ রোগ বাড়ে। তাই বেড়েছে। তা হোক, ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি আমি। কমে যাবে এতেই।

তেরো দিনের দিন রোগ হয়ে উঠল কঠিনতর।

কিশোরকে মশায় বললেন—বিকার আসছে কিশোর। আঠারো দিন অথবা একুশ দিনে ছেলেটি মারা যাবে। মনে হচ্ছে তার আগে সান্নিপাত দোষে একটি অঙ্গ পঙ্গু হয়ে

যাবে। কিশোর, আমি দেখতে পাচ্ছি। সান্নিপাতিক জ্বর এমন পূর্ণ মাত্রায় আমি আর দেখি নি বাবা।

চোদ্দ দিনের দিন ছেলে অজ্ঞান হয়ে গেল। মেনিন্‌জাইটিস যোগ দিলে। কলকাতায় লোক গেল, বড় ডাক্তার চাই। যা লাগে।

জীবনমশায় বললেন—তা হলে অবিলম্বে কর্তাবাবু। আজই। নইলে আক্ষেপ করতে হবে। রোগ বড় কঠিন কর্তাবাবু।

সে মুহূর্তেই চোখ পড়েছিল কলকাতার সেই আত্মীয়টির দিকে। একটু হেসে বলেছিলেন—আমার অবিশ্যি হাত দেখে মনে হচ্ছে রোগ অত্যন্ত কঠিন।

কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এসেছিলেন, এম. ডি ; অল্প বয়স হলেও বিচক্ষণ চিকিৎসক। জাতিতে বৈদ্য ; নাড়ী দেখার অধিকার রাখেন ; ধীর স্থির মিষ্টভাষী। ডাক্তার সেনগুপ্ত সত্যকারের চিকিৎসক।

তিনি রোগের বিবরণ শুনে ফাজ নিয়ে এসেছিলেন। ফাজ সেই প্রথম ব্যবহার হল এ অঞ্চলে।

জীবনমশায়ের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেছিলেন। নাড়ী দেখে অনুমানের কথা শুনে বলেছিলেন—আপনার অনুমানই বোধ হয় ঠিক। তবু আমাকে চেষ্টা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। কর্তব্য করে যেতে হবে। কী করব ?

আঠারো দিনের দিনই ব্রজলালবাবুর দৌহিত্র মারা গিয়েছিল। আঠারো দিনের সকালবেলা বাম অঙ্গ পড়ে গিয়েছিল, বাঁ চোখটি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

চারদিকে জীবনমশায়ের নাড়ী-জ্ঞানের খ্যাতি রটে গিয়েছিল এর পর।

কিশোর বলে চলেছিল—সেকালের জীবনমশায়ের কথা।

শুধু খ্যাতিই নয়—একটা দৃষ্টিও তাঁর খুলে গিয়েছিল এর পর থেকে। তিনি বুঝতে পারতেন। সে আসছে কি না আসছে, নাড়ী ধরলে অনুভব করতে পারতেন অনায়াসে। এবং সে কথা ক্ষেত্রবিশেষে অর্থাৎ রোগী প্রবীণ হলে স্পষ্টই বলতেন ; মণি চাটুজ্জের মায়ের বেলা বলেছিলেন—বাবাজী, এবার বুঝি মাথা কামাতে হয় গো!

মণি চাটুজ্জের চুলের শখ ছিল অসাধারণ।

রাম মিত্তিরকে তার বাপের অসুখে প্রথম দিন দেখেই বলেছিলেন—রাম, বাবার কাছে যা জানবার শুনবার জেনেশুনে নিয়ো। উনি বোধ হয় এ যাত্রা আর উঠবেন না।

রোগী অল্পবয়সী হলে ইঙ্গিতে বলতেন—তাই তো হে, রোগটা বাঁকা ধরনের, তুমি বরং ভালো ডাক্তার এনে দেখাও।

কাউকে অন্যভাবে জানাতেন।

এরই মধ্যে একদিন সুরেনের ছেলে শশাঙ্কের বড় ভাই এসে বললে—মশায়কাকা, একবার শশাঙ্ককে দেখে আসবেন।

—কী হয়েছে শশাঙ্কের ?

—জ্বর হয়েছে আজ দিন চারেক।

—আচ্ছা যাব। কাল সকালে যাব বাবা। আজ বন্ধু এল কলকাতা থেকে। বাঁশি, বাঁয়া-তবলা এনেছে; গান-বাজনা হবে। একটু খাওয়া-দাওয়াও হবে। আসিস বাবা তুই। আমি কাল সকালেই যাব।

বনবিহারীর বন্ধু শশাঙ্ক। বছরখানেকের ছোট। জমিদারী সেরেস্তার হিসাবনবীশ তাঁর সেই বাল্যবন্ধু সুরেনের ছোট ছেলে। বাল্যকালেই মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। সুরেন বেঁচে থাকতেই তার বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দিয়ে গেছে। ভালো ছেলে, মিষ্টভাষী ছেলে শশাঙ্ক। কী হল ছেলেটার?

* * *

পরের দিন সকালেই গিয়েছিলেন শশাঙ্ককে দেখতে।

সুরেনের গৃহিণীহীন সংসারে বধূরাই আপন-আপন স্বামী নিয়ে স্বাধীনা। তরুণী বধূটিই শশাঙ্কের শিয়রে বসে ছিল। সম্ভবত শশাঙ্কের জ্বরোত্তপ্ত কপালে নিজের মুখখানি রেখেই শুয়ে ছিল। মশায়ের জুতোর শব্দে উঠে বসেছে।

শশাঙ্কের কপালে সিঁদুরের ছাপ লেগে রয়েছে। একটু হাসলেন ডাক্তার। মেয়েটি ছেলেটি দুজনেই তাঁর স্নেহাস্পদ। বধূটিও তাঁর জানাশোনা ঘরের মেয়ে, বাল্যকাল থেকেই দেখে এসেছেন। স্নেহের বশেই মশায় মেয়েটির দিকে চাইলেন। চোখ তাঁর জুড়িয়ে গেল। লালপাড়-শাড়ি-পরা ওই গৌরতনু বধূটির নতুন রূপ তাঁর চোখে পড়ল। একটি অপরূপ ছবি দেখলেন যেন। তাঁকে দেখে মেয়েটির মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। মাথায় ঘোমটা টেনে সে সরে বসল। মনে হল মেয়েটির এই বধূরূপেই তার সকল রূপের চরম প্রকাশ।

ডাক্তার বসে শশাঙ্কের হাত ধরলেন। তাঁর নিজের হাত কেঁপে উঠল, চোখ দুটি চকিতে যেন খুলে গেল, একবার বধূটির দিকে তাকালেন। আবার চোখ বুজলেন।

এ কি? আজ তৃতীয় দিন। এরই মধ্যে এত স্পষ্ট লক্ষণ! আবার দেখলেন। না, ভ্রান্তি তো নয়! ভ্রান্তি নয়। এই বধূটির এমন অপরূপ রূপ মুছে দিয়ে শশাঙ্ককে যেতে হবে? দু সপ্তাহ?

হ্যাঁ তাই! ভ্রান্তি নয়, তিনি বিমূঢ় নন, অন্যমনস্ক তিনি হন নাই। শশাঙ্ককে যেতে হবে। এমন স্পষ্ট মৃত্যুলক্ষণ তিনি কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করেছেন নাড়ীতে। শেষ রাত্রের পাণ্ডুর আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণাংশে অগ্নিকোণে শুক্রাচার্যের প্রদীপ্ত স্পন্দিত উদয় যেমন রাত্রি-শেষ ঘোষণা করে—এমন কি দণ্ড পলে উদয়কালের বিলম্বটুকু পর্যন্ত পরিমাপ করে দেয়, তেমনিভাবে—ঠিক তেমনিভাবে—নাড়ী-লক্ষণ বলছে দু সপ্তাহ! চোদ্দ দিন।

মনে আর অশান্তির সীমা ছিল না। বেদনার আর অন্ত ছিল না। শশাঙ্ক বনবিহারীর বয়সী, কিছু ছোট। মাতৃহীন ছেলেটা তাঁর ডাক্তারখানার সামনে খেলে বেড়াত। তাঁর চোখের সামনে বড় হল। আর এই বধূটি? লালপাড় শাড়িতে শাঁখায় রুলিতে, সিঁথিতে

সিঁদুরের রেখায় সুন্দর ছোট কপালখানির মাঝখানে সিঁদুরের টিপে লক্ষ্মীঠাকরুনের মতো এই মেয়েটি ?

এই সমস্ত শোভার সব কিছু মুছে যাবে ? থান কাপড়, নিরাভরণা মূর্তি—কল্পনা করতে পারেন নি জীবনমশায়। মনে পড়েছে মেয়েটির বাল্যকালের কথা। পাশের গাঁয়ের মেয়ে। এ অঞ্চলে জাগ্রত কালী ঠাকুরের সেবায়েতের মেয়ে। বড় সমাদরের কন্যা। মেয়েটিকে ছেলেবয়সে বাপমায়ে বলত—বিল্লী। পুষি।

ওই আদর-কাঙালীপনার জন্য আর আমিষে রুচির জন্য। একখানি ডুরে কাপড় পরে কালীস্থানের যাত্রীদের কাছে সিঁদুরের টিপ দিয়ে বেড়াত আর পয়সা আদায় করে পেঁয়াজ-বড়া কিনে খেত। অন্তরটা বেদনায় টনটন করে উঠল।

দুদিন পর শশাঙ্কের নাড়ী দেখে তিনি একেবারে আর্ত হয়ে উঠলেন। স্থির জেনেছেন—শশাঙ্ককে যেতে হবে। নাড়ীতে যেন পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, সে আসছে। ওষুধ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

সেই আর্ত মানসিকতার আবেগে একটা কল্পনা করে আতর-বউকে ডেকে বললেন—দেখো, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি—মা-কালীকে ভোগ দিচ্ছি, মা যেন সেই ভোগ নিজে হাত পেতে নিচ্ছেন। আর আশ্চর্য কী জান ? কালী মা যেন আমাদের শশাঙ্কের বউ।

আতর-বউ বলেছিলেন—তা আর আশ্চর্য কী ; শশাঙ্কের বউ কালীমায়ের দেবাংশীর মেয়ে! হয়তো—।

—এক কাজ করো আতর-বউ, শশাঙ্কের বউকে কাল নেমন্তন্ন করে খাওয়াও।

—বেশ তো।

আমিষের নানা আয়োজন করে এই বধূটিকে খাওয়াতে চেয়েছিলেন। বড় একটা মাছের মুড়ো তার পাতে দিতে বলেছিলেন। শশাঙ্কের তখন ছদিন জ্বর। জ্বরটা শুধু বেড়েছে ; অন্য কোনো উপসর্গ দেখা দেয় নি। বাকুলের কালীবাড়ি থেকে প্রসাদী মাংসও আনিয়েছিলেন। কী যে ভ্রান্তি তাঁর হয়েছিল! মাছের মুড়োটা নামিয়ে দিতেই বধূটি চমকে উঠেছিল।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সমস্ত আয়োজনের দিকে তাকিয়ে হাত গুটিয়ে উঠে পড়েছিল। আতর-বউ ব্যস্ত হয়ে উঠে বলেছিলেন—কী হল ? কী হল ?

স্থির কণ্ঠে মেয়েটি বলেছিল—আমার শরীর কেমন করছে। আমি বাড়ি যাচ্ছি।

সন্ধ্যায় ডাক্তার শশাঙ্ককে দেখে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। মৃত্যুলক্ষণ নাড়ীতে উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবলার বোলে—ঠিক মাঝখানে এসেছে। সেই গতিতে বাজছে। কাল সপ্তাহ শেষ—আর এক সপ্তাহ একদিন, অষ্টাহ।

বাড়ির মুখেই একটা গলি।

ডাক্তারের ভারী পা আরও ভারী হয়ে উঠেছে। পিছন থেকে ডাক শুনলেন—দাঁড়ান। ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলেন একটি কেরোসিনের ডিবে হাতে দাঁড়িয়ে আছে শশাঙ্কের

বউ। ডিবের আলো তার মুখের উপর পড়েছে, গৌরবর্ণ মুখের উপর রক্তাভ আলো। সিঁথিতে সিঁদুর ডগডগ করছে। চোখে তার স্থির দৃষ্টি। তাতে প্রশ্ন। মশায়েরও সে দৃষ্টি অসহ্য মনে হল ; চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি।

বললেন—কিছু বলছ ?

—ও বাঁচবে না ? লুকোবেন না আমার কাছে। আশ্চর্য ধীরতা তার কণ্ঠস্বরে।

প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না ডাক্তার।

মেয়েটি বললে—না যদি বাঁচে তো কী করব ; আপনিই বা কী করবেন ? কিন্তু এমনি করে আপনার নিজের ছেলের মৃত্যু জেনে—তাকে মাছের মুড়ো, মাংস খাওয়াতে পারবেন ? সেই কথা মনে পড়ছে মশায়ের।

অবশ্য সেদিন তিনি এতে বিচলিত হন নি। সেদিনের জীবনমশায় অন্য মানুষ ছিলেন। গরলাভরণ নীলকণ্ঠের মতো দৃকপাতহীন। লোকে বলত, মশায় সত্য কথা বলবেই, সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক। অনেকে বলত, ডাক্তার-কবিরাজেরা মৃত্যু দেখে দেখে এমনিই হয়ে পড়ে। ঘাঁটা পড়ে যায় মনে। অনেকে বলত, পসার বাড়ায় জীবনমশায় পালটে গিয়েছে—দাম্ভিক হয়েছে খানিকটা।

কারও কথাই মিথ্যে নয়। সবার কথাই সত্য। তবে এগুলি উপরের সত্য—ফুলের পাপড়ির মতো। মাঝখানে যেখানে থাকে মর্মকোষ—সেখানকার সত্য কেউ জানে না। সেখানে একদিকে ছিল বিষ অন্যদিকে অমৃত। সংসার-জীবনের অশান্তি—আতর-বউয়ের উত্তাপ—মঞ্জরীর অভিশাপ—বনবিহারীর মধ্যে ফলেছিল সে অভিশাপ ; তিনি জানতে পেরে-ছিলেন, এ বংশের মহাশয়ত্ব বনবিহারীর মধ্যেই হবে ধূলিসাৎ এবং বনবিহারী যে দীর্ঘজীবী হবে না সেও তিনি জানতেন। অন্যদিকে হয়েছিল ধ্যানযোগে নাড়ী-জ্ঞানের অদ্ভুত বিকাশ। দুইয়ে মিলে তাঁর সে এক বিচিত্র অবস্থা। কখনও আধুনিকদের ব্যঙ্গে বলে ফেলতেন নিষ্ঠুর সত্য। কখনও করুণায় আত্মহারা হয়ে বলে ফেলতেন।

জীবনমশায় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটিকে বলেছিলেন—মা, শশাঙ্ককে যদি বাঁচাতে পারি তবেই এর উপযুক্ত উত্তর হয়। কিন্তু—

কথাটা পালটে নিয়েছিলেন—আমার ছেলের কথা বললে মা! শশাঙ্ক আর বনবিহারী একসঙ্গে খেলা করেছে, পড়েছে—সে সবই তুমি জান। শশাঙ্কও আমার ছেলের মতোই। আজ তার কথাই যখন বলতে পারলাম ইঙ্গিতে, তখন বনবিহারীকে যদি অকালে যেতে হয় —আর আমি যদি জানতে পারি—তবে শশাঙ্কের বেলা যেমন জানিয়ে দিলাম তেমনি ভাবেই জানাব, রকমটা একটু আলাদা হবে। তোমাকে তো ইঙ্গিতে জানিয়েছি। বন্ধুর বেলা— তোমার কথাই যদি ফলে মা, তবে আতর-বউকে স্পষ্ট বলব—বন্ধুর বউকেও স্পষ্ট বলব—বন্ধু বাঁচবে না। এবং তার যদি কোনো সাধ থাকে তাও মিটিয়ে নিতে বলব। আমার উপর মিথ্যে ক্রোধ করলে মা। মৃত্যুর কাছে আমরা বড় অসহায়।

অন্ত কেউ বললে নূতন কালের পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞান-প্রভাবিত ব্যক্তিগুলি বিশ্বাস তো করতেনই না—উল্‌টে ব্যঙ্গ-হাস্ত করতেন। কিন্তু কিশোর গোটা বাংলাদেশে পণ্ডিত এবং কর্মী হিসেবে সুপরিচিত, শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়াও আর একটি মহৎ গুণের সে অধিকারী। সে সত্যবাদী। পৃথিবীতে কোনো গুরুতর প্রয়োজনেও সে মিথ্যা বলে না এবং কারও মনোরঞ্জনের জন্তও সত্যকে সে অতিরঞ্জিত করে না।

গল্প দুটি শুনে সকলের মুখেই প্রশংসা-প্রসন্ন বিস্ময় ফুটে উঠল। একজন বললেন—সত্যিই অদ্ভুত।

কিশোর হেসে বললে—কী করছিলেন? দাবা খেলছিলেন বুঝি? এরই মধ্যে সেতাব ঘর থেকে উঠে এসে জীবনমশায়ের পিছনে দাঁড়িয়েছে। ধোঁয়া দেখে আগুন অনুমানের মতো কিশোর অভ্রান্ত অনুমান করেছে।

মশায় আজ ছোট ছেলের মতো লজ্জিত হলেন। মাথা হেঁট করে হেসে বললেন—বৃদ্ধ বয়সে অবলম্বন তো একটা চাই! কী করি বলো? তুমিও তো শুনেছি এখনও ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে যাও। অবিশ্যি—তুমি নামেও কিশোর কাজেও চিরকিশোর। লোকে বলে কিশোরবাবু আর সাবালক হল না, চিরকাল নাবালকই থেকে গেল। তাই থেকো বাবা—চিরদিন যেন তুমি তাই থেকো।

বলতে বলতেই তাঁর চোখ দিয়ে দুটি জলের ধারা গড়িয়ে এল। দীর্ঘকাল পর, সুদীর্ঘকাল পর, কতকাল পর তার হিসেব নাই। হিসেব নাই।

মশায়ের চোখে জল দেখে কিশোর একটু অভিভূত হয়েই বললে, আচ্ছা চলি। এঁদের সব দেখিয়ে আনি।

রওনা হয়ে গেলেন তাঁরা। সকলেই যেন কেমন হয়ে গেছেন, নিঃশব্দে অগ্রসর হয়ে গেলেন। কথা যেন হারিয়ে গেছে। দাঁড়াল শুধু হরেন। হরেন এসে বললে—একটা ভালো খবর আছে। বিপিনবাবুর আজ আবার ইউরিন রিপোর্ট এসেছে। দোষ খুব কমে গিয়েছে। ওবেলা যাবেন তো বিপিনবাবুকে দেখতে? আজ আমরা যখন যাব তখনই যদি যান তো ভালো হয়। আজ একবার সকলে মিলে ভালো করে দেখব।

অন্তমনস্কের মতো মশায় বললেন—সকলে মিলে দেখবে!

চব্বিশ

বিপিন সুস্থ আছে। নিজেই বললে—ভালোই মনে হচ্ছে।

রতনবাবু বললে—আজ ইউরিন রিপোর্ট এসেছে। যে দোষটুকু ছিল—অনেকটা কমেগিয়েছে।

মশায় যখন গেলেন, তখনও ডাক্তারেরা আসে নি। বিপিনের হাতের জন্ত হাত বাড়িয়ে মশায় বললেন—ভালো হবার হলে এইভাবেই কমে। আমাদের সে আমলের একটা কথা ছিল রতন—তোমার নিশ্চয় মনে আছে—রোগ বাড়বার সময় বাড়ে তালপ্রমাণ, কমবার সময়

কমে তিলে-তিলে।

—তুমি একবার নাড়ী দেখে আমাকে বলো। কী বুঝছ? কী পাচ্ছ?

—রোজই তো বলছি রতন।

—না। আজ কেমন দেখলে—এখন কেমন আছে এ কথা নয়। সেই পুরনো আমলের নাড়ী দেখা দেখো। কত দিনে বিপিন উঠে বসতে পারবে।

বিপিন বললে—এ শুয়ে শুয়ে আর পারছি না। চাকাওয়ালা ইনভ্যালিড চেয়ারে যদি একটু বারান্দায় বসতে পাই—কি একটু বাইরে ঘুরে আসতে পারি তা হলে মনের অবসাদটা কাটে। তা ছাড়া এ যেন লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের করুণার পাত্র। লোকে আহা উহু করছে, গোটা সংসারের লোকের বোঝা হয়ে ঘাড়ে চেপে রয়েছি—এ আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মশায় চমকে উঠলেন মনে মনে। প্রতিষ্ঠাবান বিপিনের অন্তরলোকের অবস্থাটা যেন রঞ্জনরশ্মির মতোই কোনো এক রশ্মিচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। মশায়ের কাছে এটিও একটি উপসর্গ।

বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন। নাড়ীতে উত্তেজনার আভাস ফুটে উঠেছে।

হাতখানি নামিয়ে রাখতেই বিপিন বললে—কবে উঠতে দেবেন?

মশায় বললেন—কাল বলব। আজ তুমি নিজেই চঞ্চল হয়ে রয়েছ।

—চঞ্চল উনি অহরহই। সেইটেই আপনি নিষেধ করুন ওকে। বিপিনের খাটের ওদিকে দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে—বিপিনের স্ত্রী। রোজই থাকে। কথা বলে না। আজ সে বোধ করি থাকতে পারলে না, আজ সে কথা বলে ফেললে। প্রাণস্পর্শী সেবার মধ্যে এ উপসর্গটি তার মনে কাঁটার মতো ঠেকেছে; সব থেকে গভীরভাবে বিদ্ধ করছে বলে মনে হয়েছে। তাই বোধ করি থাকতে পারে নি।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসর বয়স; শান্ত শ্রীময়ী মেয়ে; কপালে সিঁদুরের টিপ—সিঁথিতে সিঁদুর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। ঘোমটা সরিয়ে আজ প্রাণের আবেগে তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করে দাঁড়িয়েছে।

তিনি উত্তর দেবার আগেই উত্তর দিলে বিপিন—দুর্বল কণ্ঠস্বর কাঁপছে, চোখ দুটি ঈষৎ প্রদীপ্ত। সে বলে উঠল—নিষেধ করুন! নিষেধ করুন! নিষেধ করলেই মন মানে? মেয়ে জাত! কী করে বুঝবে তুমি আমার এ যন্ত্রণা!

মশায় ব্যস্ত হয়ে বললেন—বিপিন, বাবা! বিপিন!

রতনবাবু ডাকলেন—বিপিন! বিপিন!

দুটি জলের ধারা গড়িয়ে এল বিপিনের দুটি চোখ থেকে। শ্রান্ত ভগ্ন কণ্ঠে সে বললে—আমি আর পারছি না। আমি আর পারছি না।

রতনবাবু গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। বিপিনের স্ত্রী পাখা নিয়ে এগিয়ে এল;

বিপিন অভিমানভরেই বললে—না। শ্রীমন্ত, তুমি বাতাস করো।

শ্রীমন্ত বিপিনের ছেলে। সে পাখাখানি নিলে মায়ের হাত থেকে।

মশায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন—রোগীর দিকে লক্ষ্য রেখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলস্যের ভারে চোখের পাতা দুটি ভেঙে পড়ল বিপিনের। হাতখানি স্পর্শ করলেন মশায়। বিপিন আয়ত চোখ দুটি মেলে দেখে আবার চোখ বুজলে। বিপিনের নাড়ীতে স্তিমিত উত্তেজনা অনুভব করতে পারছেন মশায়। দীর্ঘক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা করে তিনি বেরিয়ে এলেন।

—জীবন! পিছন থেকে মৃদুস্বরে ডাকলেন রতনবাবু।

—চিন্তিত হবার কারণ নাই রতন। অনিষ্ট কিছু ঘটে নি। কিন্তু সাবধান হতে হবে। এ রকম উত্তেজনা ভালো নয়, সে তো তোমাদের বলতে হবে না।

—সচরাচর এ রকম উত্তেজিত বিপিন হয় না। আজ হল। কিন্তু আমি যা জানতে চাইছি। তোমাদের বংশে নিদান দেবার মতো নাড়ীজ্ঞানের কথা আমি জানি—বিশ্বাস করি। আমি তাই জানতে চাচ্ছি।

হেসে মশায় বললেন—সে নাড়ী দেখার আমল চলে গিয়েছে রতন। এ আমল এ কাল আলাদা। আজ কত ওষুধ কত চিকিৎসা আবিষ্কার হয়েছে। এখন কি আর সে আমলের বিদ্যেতে চলে? ধরো ম্যালেরিয়ার জ্বর, আমার বিদ্যেতে ন দিনে জ্বর ছাড়বে, কিন্তু এখন ইনজেকশন বেরিয়েছে, প্যালুড্রিন এসেছে, তিনদিনে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। টাইফয়েড দেখে আমরা বলব আঠারো দিন, একুশ দিন, আটাশ দিন, বত্রিশ দিন, আটচল্লিশ দিন। অথচ নতুন ওষুধে দশ-বারো দিনে জ্বর ছেড়ে যাবে। আজ নাড়ী দেখে আমি কী বলব? আজ তো ডাক্তারেরা আসছেন, দেখবেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করো।

—আপনি বলছেন না, আপনি লুকোচ্ছেন! কিন্তু নিজের ছেলের বেলায় তো লুকোন নি! নারীকণ্ঠে এই কথাগুলি শুনে চমকে উঠলেন মশায়। ফিরে পিছনের দিকে তাকালেন। পিছনে দাঁড়িয়ে বিপিনের স্ত্রী। কপালে সিঁদুর-বিন্দু, সিঁথিতে সিঁদুরের দীর্ঘ রেখা। উৎকণ্ঠিত মুখে স্থির দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্মৃতি যেন তাঁকে চাবুক দিয়ে নির্মম আঘাত করলে। নিজেকে প্রাণপণে সংযত করে তিনি বললেন—সত্যি বলছি মা, আমি ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার বাড়ি এলেই আমার নিজের ছেলেকে মনে পড়ে। চঞ্চল হয়ে পড়ি। বুঝতে ঠিক পারি না। এর মধ্যে কোনো লুকোনো অর্থ নাই। আমাকে তোমরা ভুল বুঝো না।

জীবনমশায় হনহন করে বেরিয়ে এলেন।

—ডাক্তারবাবু, ফী-টা; ডাক্তারবাবু।

—কাল। কাল দিয়ো। কাল।

* * *

মর্মান্তিক স্মৃতি একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছে—ঠিক যেন সেই! প্রভেদ আছে। সে ছিল তরুণী—ষোলো-সতেরো বছরের নিতান্তই গ্রাম্য মেয়ে। ঠিক

এমনি দৃষ্টি নিয়েই প্রথম তার দিকে তাকিয়েছিল শশাঙ্কর স্ত্রী।

সে তাঁকে একরকম অভিসম্পাত দিয়েদিল। সে অভিসম্পাত পূর্ণ হয়েছে। বনবিহারী মরেছে। শশাঙ্ক মরেছিল আগন্তুজ ব্যাধির আক্রমণে। তার নিজের কোনো অপরাধ ছিল না। নিজের প্রবৃত্তি রিপু হয়ে মৃত্যুকে সাহায্য করে নি। একালের বীজাণু পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং একালের বিস্ময়কর বীজাণুনাশক ওষুধ থাকলে হয়তো—। না। আপন মনেই ঘাড় নাড়লেন মশায়। বাঁচত না শশাঙ্ক। একালেও পেনিসিলিন প্রয়োগ করে সকল রোগীকে বাঁচানো যায় না। রোগের কারণ, বীজাণুর স্বরূপ নির্ণয় করেও ফল হয় না। তবু শশাঙ্কের কোনো অপরাধ ছিল না। তার মৃত্যু মানুষের চিকিৎসাবিজ্ঞানে অপূর্ণতা অসম্পূর্ণতা। মৃত্যু ধ্রুব—কিন্তু সে মৃত্যু—আয়ুর পরিপূর্ণ ভোগান্তে—সূর্যাস্তের মতো; প্রসন্ন-সমারোহের মধ্যে। সেই কারণেই শশাঙ্কের কোনো অপরাধ ছিল না এবং ওই বধূটির প্রতি মমতায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। মুখে বলতে পারেন নি, ওই বধূটিকে নিমন্ত্রণ করে জীবন শেষবারের মতো মাছ-মাংস খাইয়ে মনের বেদনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে মেয়ে বিচিত্র মেয়ে! এই অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত মেয়ে। যারা সেই কোন্ আদিকাল থেকে বৈধব্য পালন করে আসছে, দেহের ভোগকে ছেড়ে দিয়ে ভালবাসাকে বড় করতে চেয়েছে, এ মেয়ে সেই জাতের মেয়ে। অসাধারণ মেয়ে। বুঝতে পারেন নি মশায়।

সে তাঁকে অভিসম্পাত দিয়েছিল।

বিচিত্র যোগাযোগ, বনবিহারী এই অভিসম্পাত ফলবতী করবার জন্ম আগে থেকেই সকল আয়োজন করে রেখেছিল তার জীবনে। সেই মেলার পর—প্রমেহ হয়েই শেষ হয় নি। বনবিহারী ক্ষান্ত হয় নি। আবারও হয়েছিল তার ঐ ব্যাধি।

সে স্মৃতি তাঁর মর্মান্তিক।

দেহ যতক্ষণ জীর্ণ না হয় ততক্ষণ মৃত্যু কামনা করা পাপ, সে কামনা আত্মহত্যার কামনার সামিল। তিনি তাই করেছিলেন। আহার, বিহার সমস্ত কিছুর মধ্যে জীবনমশায় হয়ে উঠেছিলেন আর-এক মানুষ। কুলধর্মকে তিনি লঙ্ঘন করেন না। লঙ্ঘন করেছিলেন আয়ুকে রক্ষা করার, দীর্ঘ করার নিয়মকে। কোনো ব্যভিচারের পাপে কলঙ্কিত করেন নি বংশকে—কিন্তু নিজের উপর অবিচারের আর বাকি রাখেন নি। মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। দুহাতে উপার্জন করে চার হাতে খরচ করেছেন। অন্তর্দাহে যত পুড়েছেন তত সমারোহ বাড়িয়ে তুলেছেন বাইরের জীবনে। শুধু চিকিৎসা-ধর্মেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, নানান কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মদ খেয়ে নেশা করে লোক শোক দুঃখ ভুলতে চায়। তিনি কাজের নেশায়, নামের নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর আরোগ্য-নিকেতনের পাশে এই ইন্দারা করিয়েছিলেন তখনই। সেই শুরু। নিজে ছিলেন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত—সরকারকে ধরে তিনভাগ টাকা আদায় করে সিকি টাকা নিজেই দিয়েছিলেন। গ্রাম থেকে হাসপাতালের সামনে দিয়ে সেই দুর্গম পথ—চোরধরার

খানা, ঠ্যাঙভাঙার খন্দ-সঙ্কুল পথকে সুগম করে তুলেছিলেন। তাতেও দিয়েছিলেন সিকি টাকা।

দু-তিনখানা গাঁয়ের মজুরেরা মজুরি না পেলে আরোগ্য-নিকেতনের সামনে এসে দাঁড়াত। তিনি যে-কোনো কাজে লাগিয়ে দিতেন।

মশায় বংশের মহাশয়ত্ব তো যাবেই, যাবার আগে রক্তসন্ধ্যার মতো সমারোহ করে তবে যাক।

নিজের দেহের উপর অবিচারেরও শেষ ছিল না।

সারাটা দিন না খেয়ে ঘুরেছেন। কল থাক বা না থাক, ঘুরেছেন—নেপালের ভাই সীতারামের ওষুধের দোকানে বসে গল্প করেই একবেলা কেটে গেছে। যে ডেকেছে গিয়েছেন—চিকিৎসা করেছেন, ফীজ দিয়েছে নিয়েছেন—না দিয়েছে নেন নি। আবার পরদিন গিয়েছেন। সারারাত দাবা খেলা তখনই শুরু। গানবাজনায় আসর বসিয়েছেন' যে-কোনো ওস্তাদ এলে সংবর্ধনা করেছেন, তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার সমারোহ জুড়ে দিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে উল্লাস করেছেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময় কালীমায়ের নাটমন্দিরে জনকয়েককে নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতে বিস্মৃত হন নি। কল থেকে ফিরতে রাত্রি হলেও একবার মায়ের ওখানে গিয়ে একা হাত জোড় করে গেয়ে এসেছেন—

রাধাগোবিন্দ জয়, রাধাগোবিন্দ!

ওটুকু ভুলে যান নি। মশায় বংশের বৈষ্ণব মন্ত্রের চৈতন্য তাঁর জীবনে হল না। পরমানন্দ মাধবকে পাওয়া তাঁর ভাগ্যে নাই—তবে স্মরণ কীর্তন করতে ভুলে যান নি। উদ্দাম উদ্‌ভ্রান্ত-তার মধ্যেও ওইটুকু স্থিতি প্রশান্তি ছিল।

আতর-বউ বার বার আপত্তি করত, বলত—পস্তাবে শেষে বলে রাখছি।

হা-হা করে হাসতেন মশায়—কাছাকাছি কেউ না থাকলে বলতেন—আরে মঞ্জরীর জন্যে সে আমলে বাজারে ধার করে খরচ করেও পস্তাই নি আমি। তার বদলে তোমাকে পেয়েছি। আজ রোজগার করে খরচ করছি—তাতে পস্তাব?

—কত রোজগার কর শুনি? আতর-বউয়ের মুখ লাল হয়ে উঠত।

—কত দরকার বলো না! কত টাকা! আজই এখুনি দিচ্ছি তোমাকে। বলো কী গয়না চাই! কী চাই?

—কিছু চাই না। আমি তোমার কিচ্ছু চাই না। মেয়েদের বিয়ে—ছেলের লেখাপড়া হলেই হল। আমি দাসীবাঁদী হয়ে এসেছিলাম—তাই হয়েই থাকব।

—মিছে কথা বলছ। তুমি এসেছিলে শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে। সেই শাসন চিরকাল করছ। বুঝছ না, তোমার ছেলের জন্যে বড় আটন উঁচু আসন তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছি। ছেলে তো তোমার আমার মতো হাতুড়ে হবে না। হবে পাশকরা ডাক্তার। কিন্তু আমাদের ঘর তো নবগ্রামের ব্রাহ্মণ বনেদী জমিদারদের চেয়ে খাটো হয়েই আছে আজও। তাকে উঁচুতে তুলে ওদের সঙ্গে সমান করে দিয়ে যাচ্ছি।

এইখানে আতর-বউ চুপ করত। স্তব্ধ হয়ে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের দোলার মধ্যে স্থির-দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত।

না থেকে উপায় ছিল না। বনবিহারী ওই রোগাক্রান্ত হয়েই ক্ষান্ত হল না; রোগমুক্ত হওয়ার পরই সে লজ্জা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিলে অশোভন বেশভূষার মতো। বৎসর খানেকের মধ্যেই বাপ এবং মায়ের যুধ্যমান অবস্থার সুযোগে প্রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসল। একদা সে এসে বললে—স্কুলে পড়া আর হবে না আমার দ্বারা।

মশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—হবে না?

—না। সংস্কৃত, অঙ্ক—ও আমার মাথায় ঢোকে না।

—ততঃ কিম্? হেসেই জীবনমশায় প্রশ্ন করেছিলেন।

অন্তরালবর্তিনী জননী প্রবেশ করে বলেছিলেন—কলকাতায় নতুন ডাক্তারি স্কুল হয়েছে—সেইখানে পড়বে ও। এখানে বছর বছর কত ফেল করবে?

—সেখানেও যদি ফেল করে?

—তখন তোমার মতো ডাক্তার হবে। তুমি তো না পড়ে না পাশ করে মুঠো মুঠো টাকা আনছ। বাপ যখন, তখন কুলবিদ্যেটা না হয় দয়া করে ছেলেকে শিখিয়েই দেবে।

—আমাদের কুলবিদ্যেতে যে সংস্কৃত বিদ্যে কিছু দরকার হয় ভদ্রে!

—কী, কী বললে আমাকে?

—ভদ্রে বলেছি। ভালো কথাই। মন্দ নয়।

—কিন্তু ঠাট্টা করে তো! তোমার মতো অভদ্র আমি দেখি নি। বাপ হয়ে ছেলের উপর মমতা নাই?

চুপ করেই ছিলেন জীবনমশায়। কী বলবেন? ছেলের উপর মমতা? বনবিহারীকে এম. বি. পড়াবার বাসনা ছিল তাঁর। সে বাসনার মর্ম আতর-বউ-বুঝবে না। ইচ্ছা ছিল—ইচ্ছা ছিল বনবিহারী এম. বি—হ্যাঁ তখন এল. এম. এস. উঠে এম. বি. হয়েছে—পড়তে আরম্ভ করলে তার বিয়ের আয়োজন করবেন। ঘটক পাঠাবেন। কান্দীতে কোনো জমিদার-ঘরের মেয়ে আনবেন। গ্রামের জমিদারির এক আনা অংশ নবগ্রামে জমিদারি বলে গ্রাহ্য হলেও কান্দীতে গ্রাহ্য হয় না; বনবিহারী এম. বি. ডাক্তার হলে সে অগ্রাহ্য সাদর সাগ্রহ গ্রাহ্যে পরিণত হবে। কান্দী যাওয়ার বাসনা পূর্ণ করবেন। ওই ভূপীদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ঘরের মেয়ে আনবেন। থাক, সে থাক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মশায় বলেছিলেন—ভালো, তাই হবে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—তুমি তো বেলগাছিয়া আর. জি. কর. মেডিক্যাল স্কুলের কথা বলছ?

—হ্যাঁ, সেখানে পাশটাশের দরকার হয় না।

—জানি বাবা, জানি। কিন্তু সেখানেও ফেল হয়, আমাদের নবগ্রামের রায়বাবুদের অতীন পাশ করতে পারে নি। স্কুলে পাশ করতে না পার সেখানে পাশ করতে হবে তো। সেইটে যেন মনে রেখো।

—সে পাশ ঠিক করবে। তিন পুরুষ এই বিন্তে ঘাঁটছে। দেখিস বাবা, ভালো করে পড়িস। হাতুড়ে বলে লোকে যেন মুখ না বাঁকায়। মশায় বংশের এই অখ্যাতিটা তোকে ঘুচোতে হবে।

ডাঃ আর. জি. কর. মহাপুরুষ। অল্পবিত্তা অল্প-সম্বল গৃহস্থ ছেলেদের মহা উপকার করেছিলেন। দেশে তখন ম্যালেরিয়ার মহামারণ চলেছে—বিলাতী ডাক্তারির হাঁকেডাকে, সরকারী অনুগ্রহে, তার পসারে কবিরাজদের ঘরগুলি বন্ধ হতে শুরু হয়েছে। দেশের বৈদ্যের অভাব। সেই সময়ে এই সব আধাডাক্তারেরা অনেক কাজে এসেছিল। 'শতমারি ভবেদ্ বৈদ্য, সহস্রমারি চিকিৎসক'। হাজার হাজার লোক হয়তো এদের ভুলে ত্রুটিতে মরেছে ভুগেছে—কিন্তু হাজারের পর লোকেরা বেঁচেছে, সেরেছে।

হাসলেন বৃদ্ধ জীবনমশায়। আর. জি. কর. মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে গেল বনবিহারী। বনবিহারীর সঙ্গে গেল মামুদপুরের গন্ধবণিকদের ছেলে—বনবিহারীর অন্তরঙ্গ বন্ধু রামসুন্দর। মাস ছয়েক পরে বনবিহারী প্রথম ছুটিতে বাড়ি এল। গায়ে ডবল ব্রেস্ট কোট, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সে আর এক বনবিহারী। বনবিহারীর মুখে সিগারেট। গায়ে কাপড়ে জামায় সিগারেটের গন্ধ; ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দুটির আগায় হলদে রঙের দাগ ধরেছে। সিদ্ধ জ্যোতিষী যেমন মানুষের আচারে আচরণে বাক্যে রূপে কর্মে নিজের গণনার রূপায়ণ দেখতে পন, অনিবার্য অবশ্যম্ভাবীকে সংঘটিত হতে দেখেন এবং লীলাদর্শন-কৌতুকে মৃদু হাস্য করেন, ঠিক তেমনি হাসিই তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। পরমুহূর্তেই সে হাসি বিস্ময়ে পরিণত হয়েছিল তাঁর। ইন্দির গাড়ি থেকে নামিয়ে রেখেছিল হারমোনিয়মের বাক্স, এক জোড়া বাঁয়া-তবলা, একটা পিতলের বাঁশি, জোড়া দুই মন্দিরা, একজোড়া ঘুঙুর।

তা ভালো, তা ভালো। নৃত্যগীত-কলাবিদ্যা চৌষট্টি কলার শ্রেষ্ঠ কলা, তা আয়ত্ত করা ভালো। নাদব্রহ্ম। সঙ্গীতে ঈশ্বর-সাধনা হয়, প্রেম জন্মায়; তা ভালো! এবং দীনবন্ধু মশায় নাম-সংকীর্তন করতেন—জগৎ মশায় পদাবলী শিখেছিলেন, জীবনকে শিখিয়েছিলেন; তিন পুরুষের তিনটে মৃদঙ্গ—আরোগ্য-নিকেতনেরই উপরের ঘরে যত্ন করে রাখা আছে। হাল আমলে তাঁর কেনা বড় খোলখানাই এখন ব্যবহার হয়, এর পর নূতন কালে এবং কালের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে বংশের কর্মফলে—অর্থাৎ তাঁর কর্মফলে পরবর্তী পুরুষ খোল তিনখানার সঙ্গে বাঁয়া-তবলা মন্দিরা বাঁশি হারমোনিয়ম ঘুঙুর যোগ করলে। তা ভালো! তা ভালো!

সময়টা ছিল সন্ধ্যা। আকাশে মাথার উপরে ছিল একাদশী দ্বাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্না ফুটি-ফুটি করছে। স্থানে স্থানে গাছপালা ঘরবাড়ির ছায়ার মধ্যে অন্ধকার যেখানে গাঢ় হয়েছে—সেইসব স্থানে ফাঁকে ফাঁকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফালি ফালি ধোয়া কাপড়ের মতো এসে পড়েছে। কোথাও কোথাও মনে হচ্ছে ধোয়া কাপড় পরে কেউ যেন রহস্যময়ী আড়ালে গোপনে দাঁড়িয়ে সংকেত জানাচ্ছে। অতর্কিতে এই ছায়া দেখে চমকে উঠেছিলেন জীবন-মশায়। প্রশ্ন করেছিলেন—কে? কে ওখানে?

হঠাৎ মঞ্জরীকে মনে পড়ে গিয়েছিল।

বনবিহারীর কুৎসিত রোগ প্রথম প্রকাশ হলেও তাকে মনে পড়েছিল। মনে হয়েছিল ভূপীর কুৎসিত রোগে তিনি হেসেছিলেন, তাই বোধ হয় বনবিহারী সেই রোগ ধরিয়ে তাঁকে উপহাস করলে।

পরক্ষণেই হেসেছিলেন—না কেউ নয়। জ্যোৎস্না পড়েছে দুটি ঘরের মাঝের গলিতে।

মঞ্জরী নয়, কৌতুকে সে হাসছে না।

মঞ্জরী তো মরে নি; সে ছায়ামূর্তি ধরে আসবে কী করে? তবে এ তারই অভিশাপ। তাঁর অভিশাপে মঞ্জরীর জীবন ব্যর্থ হয়েছে। মঞ্জরীর অভিশাপ তাঁকে লাগবে না? অথবা তাঁর নিজের অভিশাপ মঞ্জরীর মতো একটা সামান্য মেয়ের জীবন পুড়িয়ে শেষ হয় নি—ফিরে তাঁকে নিজেকেই লেগেছে।

মঞ্জরী বিধবা হয়েছে। ভূপী বোস মরেছে। ওই সেদিন আতর-বউ ছেলের সামনে মঞ্জরীর কথা তুলে তাঁকে মনে করিয়ে দিলে নতুন করে। তারপর তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন। মঞ্জরী বিধবা হয়েছে। সন্তান বলতে একটি মেয়ে। সে পেয়েছে বাপের সোনার মতো রঙ আর মায়ের তনুমহিমা, মুখশ্রী। ভূপী সর্বস্বান্ত হয়ে মরেছে। মেয়েটির কিন্তু ওই রূপের জন্য এবং বংশগৌরবের জন্য বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। মঞ্জরী এখন মেয়ের পোষ্য। মেয়ের মেয়েকে নিয়ে সে নাকি সব ভুলেছে। পরমানন্দে আছে।

দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন জীবনমশায়।

আতর-বউ এসে ডেকেছিল—বাড়ির মধ্যে এসো! ছেলে এল। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে।

জীবনমশায় বলেছিলেন—আজ রাত্রে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটা খাওয়াদাওয়া করব ভাবছি। বন্ধু এল।

—তা করো না।

জীবনমশায় ইন্দিরকে ডেকে একটা ফর্দ তৈরি করে দিলেন—"কালাচাঁদ চন্দ রোকায় অবগত হইবা। ফর্দ অনুযায়ী জিনিষগুলি ফর্দবাহককে দিবা। দাম পরে পাইবা।" ফর্দের শেষে পুনশ্চ লিখে দিলেন—"আমার নামে বরং একটা হিসাব খুলিবা। অতঃপর তোমার দোকান হইতেই জিনিস আনিব। মাহ চৈত্র ও আশ্বিনে দুই দফায় হিসাবমতো টাকা পাইবা।"

নন্দ তখন ছোট। নন্দকে ডেকে বলেছিলেন—নোটন জেলেকে ডেকে আন, বল চার-পাঁচজন জাল নিয়ে আসবে। মাছ ধরানো হবে পুকুরে।

আর ডাকতে পাঠালেন বিখ্যাত পাখোয়াজী বসন্ত মুখুজ্জেকে। গাইয়েও তিনি নিয়ে আসেন।

হোক, গানবাজনা হোক। বাকি যে কটা দিন আছে—সে কটা দিন খেলে হৈ হৈ করেই কাটুক। পরমানন্দ মাধবকে পাওয়া তাঁর ভাগ্যফলও নয়, কর্মফলও নয়।

পঁচিশ

গলির সেই লম্বা ফালি জ্যোৎস্নাটা ধীরে ধীরে আকাশে চাঁদের অগ্রগতির সঙ্গে গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে গলির মুখে তখনও যেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঠিক মানুষের মতো দাঁড়িয়েছিল। ওইটেই শশাঙ্কের বাড়ির গলি। ওই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েই শশাঙ্কের স্ত্রী তাঁকে অভিসম্পাত দিয়েছিল।

বনবিহারী অকালেই মারা গিয়েছে। কিন্তু বনবিহারীর মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে বিচলিত বিহ্বল হয়ে মনেমনেও কোনোদিন পুত্রশোককে ওই মেয়েটির অভিশাপ বলে স্বীকার করেন নি।

নিজে ডাক্তার হয়েও বনবিহারী মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করেছিল—মৃত্যু ফিরে যাবে কেন? ডেকে এনে তার সে কী ভয়! সে কী বাঁচবার ব্যাকুলতা! ওই দাঁতুর মতো! ওই মতির মায়ের মতো! যখন মনে পড়ে তখন শোকের চেয়ে দুঃখ হয় বেশী। যে মানুষ মরতে চায় না, জলমগ্ন মানুষের মতো দুহাত শূন্যে বাড়িয়ে আমাকে বাঁচাও বলে ডুবে যায়—তার জন্যেই শোক হয় মর্মান্তিক। নইলে শোক তো শুভ্র শান্ত—জীবনের মহাতত্ত্ব। শান্ত শোক জীবনকে কয়েকটা দিনের জন্য বৈরাগ্যের গৈরিক উত্তরীয় পরিয়ে নিয়ে মনোহর করে তোলে। কানের কাছে সত্যসঙ্গীত ধ্বনিত করে তোলে—বাউল বৈরাগীর মতো। "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।" অন্য বংশে অন্য কুলে এ হয়তো সম্ভব নয় কিন্তু মশায় বংশে—সে তো অসম্ভব ছিল না। মনে পড়ছিল প্রথম যৌবনে বিখ্যাত শখের দলের অভিমন্যুবধ পালার কথা। সেই প্রসঙ্গে চণ্ডীতলার সাধক মহান্ত রঘুবর গোসাঁই কয়েকটি কথা বলেছিলেন যাত্রাদলের অধিকারীকে—সেই কথাগুলি মনে গেঁথে আছে। সপ্তরথীর অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে কুরুক্ষেত্রের মাটিতে পড়ে ষোলো বছরের কিশোর অভিমন্যু কাতর স্বরে কেঁদেছিল; সুকণ্ঠ প্রিয়দর্শন ছেলেটি কান্নামেশানো সুরে গান ধরেছিল—

অন্যায় ঘোর সমরে অকালে গেল প্রাণ আমার—
তৃতীয় পাণ্ডব পিতা মাতুল গোবিন্দ যার।

একে একে মা সুভদ্রা, প্রিয়া উত্তরার নাম ধরে সে এক মর্মচ্ছেদী করুণ সঙ্গীত! সারা আসরের লোকের চোখের জলে বুক ভেসে গেল।

গান শেষ হল; অভিমন্যু টলতে টলতে চলে গেল সাজঘরে। অঙ্ক শেষ হল—ঐকতান-বাদন শুরু হল। রঘুবর গোস্বামী গম্ভীর কণ্ঠে অধিকারী মশায়কে ডেকে বললেন—অধিকারী মশায়, এ কি হইলো ভাই?

—আজ্ঞে? অধিকারী প্রশ্ন বুঝতে না পেরে প্রশ্নই করল—খুলে বলুন?

—অভিমন্যু এমন করে কাঁদল কেনো ভাই? অর্জুনের ছাওয়াল—কিষণজীর ভাগনা—সে মরণকে ডরে এমন করে কাঁদবে কেনো ভাই? কাঁদবে তো লড়াইমে সে আইলো কেনো দাদা? এমন করে সাত সাত বীরের সাথে লড়াই দিলো কাহে ভাই? সে তো

ভাই, হাত ছুটা বঢ়ায়ে দিয়ে বন্ধন পরে বাঁচতে পারতো ভাই? ভাঙা রথের চাকা নিয়ে লড়তে কেনো গেলো? অভিমন্যু তো কাঁদবে না। বীর বংশের সন্তান—সে তো ভাই মরণকে ডরবে না!

অধিকারী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। এমন প্রশ্ন তো সাধারণত কেউ করে না! মানুষ কেঁদে সারা হয়ে আসর জমিয়ে তোলে। ধন্য ধন্য পড়ে যায়। তিনি সবিনয়ে সেই কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন—বাবা মানুষ এতে কাঁদে—

কথা কেড়ে নিয়ে গোস্বামী বলেছিলেন—তাই বলে দুখ দিয়ে কাঁদাবে ভাই; যাতনা দিয়ে কাঁদাবে? কাঁদন খুব ভালো জিনিস, মনকে ময়লা ধুয়ে যায়—দিল সাফা হয়—ঠিক বাত। কিন্তু তার জন্তে মাথায় ডাণ্ডা মারকে কাঁদাবে দাদা? প্রেমসে কাঁদাও; আনন্দসে কাঁদাও। তবে তো ভাই! অর্জুন মহাবীর। কিরাত বেশ ধরকে শিব আইলেন, তার সাথে লড়লেন; তার ছাওয়াল মরণকে ডর না করে বলুক, আওরে তু মরণ! মরণ আসুক—হাত জোড় করকে আসুক। বলুক—হামারা পুরী ধন্য—হামি আজ ধন্য হইলো। মরণকে ডরসে পরিত্রাণকে পথ দেখে মানুষ আনন্দসে কাঁদুক; তবে তো ভাই!

যাত্রার দলের অভিমন্যুর চেয়ে বহুগুণ দীনতার সঙ্গে কাতর কান্না কেঁদে মরেছিল বনবিহারী। অবশ্য আসল নকলে তফাত আছে—কিন্তু যাত্রাদলের ওই মৃত্যুর অভিনয় সত্যও যদি হত—তবুও তাঁর তুলনা ভুল নয়। বনবিহারী মারা গিয়েছে ম্যালেরিয়ায়। বনবিহারী রিপুর প্ররোচনায় দেহখানাকে করে রেখেছিল রোগের বীজের পক্ষে অতি উর্বর ক্ষেত্রের মতো অনুকূল। দাহ্য বস্তুতে সামান্য একবিন্দু আগুন যেমন সর্বধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হয়—ঠিক তেমনভাবেই ম্যালেরিয়া মৃত্যুরোগে পরিণত হল। আর. জি. কর. স্কুল থেকে পাশ করেই সে এসেছিল। বিলাসী তরলচিত্ত উল্লাসচঞ্চল উচ্ছৃঙ্খল বনবিহারী। তখন তার ধারণা সে ধনীর সন্তান। জমিদারের সন্তান।

হায়রে সেই এক আনা অংশের জমিদারি! তাঁকেও একদিন অহংকৃত করেছিল। তার উপর বনবিহারী তখন এক অবস্থাপন্ন মোক্তারের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে তার সম্পত্তিরও ভাবী উত্তরাধিকারের স্বপ্ন দেখছে। বিবাহ অবশ্য তিনিই দিয়েছিলেন। তবে পছন্দ আতর-বউয়ের! তিনিও অমত করেন নি। পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে তিনি পছন্দ করেছিলেন। শ্বশুর দিয়েছিল দামী সাইকেল, জামাই সাইকেল চড়ে ডাকে যাবে; দিয়েছিল ভালো ঘড়ি, ঘড়ি দেখে নাড়ীর বিট গুনবে, হার্টের বিট গুনবে। নতুন চমৎকার বার্নিশ-করা আলমারি চেয়ার টেবিল, ডাক্তারখানার সরঞ্জাম। আরোগ্য-নিকেতনের ওই দিকে একখানা ছোট কুঠরীতে বনবিহারী ডাক্তার বসতে শুরু করল। নতুন সাইন-বোর্ড টাঙালে 'সঞ্জীবন ফার্মেসি'। তিনি সকল কাজই করেছিলেন কিন্তু নিজে থেকে কিছু করেন নি। মনের মধ্যে ঘুরেছিল শশাঙ্কের স্ত্রীর কথা। তখন অবশ্য পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে। বনবিহারীও মৃত্যুকে নিমন্ত্রণের পথে অনেকটা এগিয়েছে। মদ ধরেছে।

জীবনমশায় সহজ রোগী বনবিহারীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য, এই মশায়

বংশের কুলগত চিকিৎসাবিদ্যার বুদ্ধির এতটুকুও বোধ বন্ধুর মধ্যে স্ফুরিত হয় নি।

হবে কী করে! যে ধ্যানযোগে বিজ্ঞান ধারণায় ধরা পড়ে সে ধ্যান সে কোনদিনই করে নি, করতে চায় নি। রোগীর চেয়ে ভিড় বেশী হত বন্ধুর। নবগ্রামের ব্রাহ্মণবাবুদের ছেলেরা আসত বন্ধুর ডিসপেনসারিতে। কাপের পর কাপ চা আসত। হাস্যধ্বনিতে আতুরালয়ের মৌন বিষণ্ণতা যেন চাবুকের আঘাতে মুহুর্মুহু চকিত ত্রস্ত হয়ে উঠত। রোগীরা বসে থাকত। সংশয়াপন্ন রোগীর স্তিমিত জীবনদীপের শিখাকে সমুজ্জ্বল করবার জন্য শাস্ত্রোক্ত সঞ্জীবনী তৈলের মতো ওষুধ যে ব্র্যাণ্ডি, সে ব্র্যাণ্ডি চলত উল্লাসের জন্য।

এখানে পড়বার সময় ব্যভিচার থেকে তার ব্যাধি হয়েছিল। কলকাতায় পড়তে পড়তে আবারও ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিল। সে কথা সে তাঁকে জানায় নি। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, সালসা খাওয়া দেখে ধরেছিলেন। তখন সালভারশন ইনজেকশন উঠেছে বটে কিন্তু খুব প্রচলন হয় নি। রক্তপরীক্ষার এত ব্যাপক প্রসার হয় নি, সহজ সুযোগও ছিল না। দুটি তিনটি ইনজেকশনে ক্ষত নিরাময় হলেই লোকে ইনজেকশন বন্ধ করত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তখন সালভারশনের দাম অনেক এবং ওষুধ দুষ্প্রাপ্য। ক্ষত নিরাময়ের পর লোকে সালসা খেত। উইলকিনসন্স্ সারসা পেরিলা।

তখন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার চক্রধারী ঘোষ, বনবিহারী থেকে কয়েক বছরের বড়, বনবিহারীর বন্ধু। বনবিহারীর মজলিসে চক্রধারী আসত, বিকেলবেলা এখানেই চা খেত; সন্ধ্যার পর বনবিহারী যেত চক্রধারীর বৈঠকে। সেখানে গানবাজনার আসর বসত—নিরুদ্বেগে নিরুপদ্রব উল্লাস চলত। গানবাজনা পানভোজন। গভীর রাত্রে বনবিহারী ফিরত। যেদিন মশায় বাড়িতে থাকতেন সেদিন বনবিহারীর জড়িত কণ্ঠস্বর তাঁর কানে আসত। বনবিহারীর সঞ্জীবন ফার্মেসিতেও মধ্যে মধ্যে নৈশ আড্ডা বসত—পান-ভোজন চলত। সকালবেলা উঠে জীবনমশায় দেখতে পেতেন উচ্ছিষ্ট পাত', ভুক্তাবশেষ; দাওয়ার ধারে দুর্গন্ধ উঠত, দেখতে পেতেন বমি-করার চিহ্ন, অম্লগন্ধের সঙ্গে বিকৃত মদ্যগন্ধ পেতেন—ভনভন করে মাছি উড়ত; দু-একটা কুকুর তাই চাটত আর মশায়কে দেখে লেজ নাড়ত। কিন্তু বলবার উপায় থাকত না। এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই জড়িত থাকতেন—জামাতা। সুরমা সুষমার তখন বিবাহ হয়েছে।

দুটিই পয়সাওয়ালা বাপের সন্তান; উচ্চ কুলীন। কী করবেন? সেকালের বিচারে তারাই সুপাত্র। তবু তিনি খুঁতখুঁত করেছিলেন। পেয়েছিলেন ভালো ছেলে। স্কুল-মাস্টার। কিন্তু সে অন্য কারও পছন্দ হয় নি। চল্লিশ টাকা মাইনে কি উপার্জন? লোকে নিন্দা করে বলেছে—ছি-ছি-ছি—ওই বিশ-পঁচিশ বিঘে জমি-সম্বল পরিবার কি মশায় বংশের যোগ্য কুটুম্ব? সবচেয়ে বেশী বলেছিল আতর-বউ এবং বনবিহারী। শুধু ওরাই নয়, তিনি নিজেও দায়ী। তাঁর মনও এতে সায় দিয়েছিল। তবে একটা বিষয়ে তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন; তার জন্য মানুষ দায়ী নয়, কাল তাঁকে প্রতারিত করেছিল। তিনি বুঝতে পারেন নি যে কালধর্মে উত্তরপুরুষ কুলধর্ম ত্যাগ করেছে জীর্ণ কন্থার মতো। এ অঞ্চলের বৈষ্ণব মন্ত্র উপাসক

কায়স্থ সমাজের ছেলেরা কালধর্মে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়েছে বা হবে এটা তিনি অনুমান করতে পারেন নি।

মহাসমারোহ করেই তিনি মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন। তারা আসত। তাদের আসার অজুহাতেই মশায়বংশের অন্দরের রান্নাশালে মাংস প্রবেশ করেছিল।

অতীত কথা মনে করতে করতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ জীবনমশায়।

ওই চক্রধারী ডাক্তারকে মশায় বলেছিলেন—চক্রধারী, বনবিহারী এত সারসা পেরিলা খায় কেন হে? জিজ্ঞাসা কোরো তো।

চক্রধারী হেসে বলেছিল—বনবিহারী তো নিজেই ডাক্তার; ও সব ওর উপরে ছেড়ে দিন।

—হুঁ। কিন্তু—

—ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। সে সব সেরে গিয়েছে। সারসা পেরিলা খায় শরীর ভালো হবে বলে। আমিও খাই।

—ভালো।

কিন্তু প্রকৃতি অনাচার সয় কতদিন? অমিতাচারী অসতর্ক বনবিহারী পড়ল ম্যালেরিয়ায়। বিচিত্র ব্যাপার; ডাক্তার বনবিহারী কুইনিন খেত না; কুইনিনের বদলে প্রতিষেধক হিসাবে খেত ব্রাণ্ডি। মশায় নিজে খেতেন শিউলি পাতার রস, মধ্যে মধ্যে কুইনিনও খেতেন। বনবিহারী হাসত। দেশে তখন প্রবল ম্যালেরিয়া। বছরের পর বছর—পাহাড়িয়া নদীর বন্যার মতো দেশকে বিধ্বস্ত করে চলেছে। ওই দাঁতুর মতো। জ্বর হলে বনবিহারী ম্যালেরিয়া মিকশ্চারের সঙ্গে আউন্স দুয়েক ভাইনাম গ্যালেসিয়া মিশিয়ে নিত। নিজেই প্রেসক্রিপশন করে নিজের ডাক্তারখানা থেকেই আনিয়ে নিত। নিজের ডাক্তারখানায় না থাকলে পাঠাত নবগ্রামে সীতারামের দোকানে। সীতারাম বনবিহারীর সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। সীতারামও মরেছে অকালে। অমিতাচারের নিমন্ত্রণে মৃত্যু তার জীবনে এসে প্রবেশ করেছিল কদর্যতম মূর্তিতে। কুষ্ঠ হয়েছিল সীতারামের। কখন হয়েছিল উপদংশ—তাকে গোপন করেছিল। তারই বিষজর্জরতায় সীতারামের দেহ-রক্ত কুষ্ঠবীজ সংক্রমণের গুপ্তপথ খুলে দিয়েছিল। হতভাগ্য সীতারাম।

হতভাগ্য বনবিহারী। ক্রমে ক্রমে অমিতাচার অনিয়মের প্রশ্রয়ে রোগ হয়ে উঠল জটিল। আয়ুও ক্ষয় হল, দেহ জীর্ণ হল।

লিভার, প্লীহা, পুরানো ম্যালেরিয়া, রক্তহীনতা, পানভোজনের প্রতিক্রিয়া—সব জড়িয়ে সে এক জটিল ব্যাধি।

জীবনমশায় মনে মনে বনবিহারীর অকালমৃত্যুর কথা অনুমান করেছিলেন। মশায় বংশের আয়ু—মহৎ সাধনার পরমায়ু সে পাবে না, পাবার অধিকারীই নয়। কিন্তু এত শীঘ্র যাবে, ভাবতে পারেন নি। অকস্মাৎ একদিন চোখে পড়ে গেল। সকালবেলা বাড়ির ভিতরে দাওয়ায় বসে বনবিহারী চা খাচ্ছিল। আরোগ্য-নিকেতন থেকে কী একটা বিশেষ প্রয়োজন

—বোধ করি টাকা নেবার জন্ত তিনি বাড়ি ঢুকেছিলেন। পূর্বদ্বারী কোঠাঘরের বারান্দায় বসু বসেছিল, পরিপূর্ণ রৌদ্র উপভোগের জন্ত।

বনবিহারীর রৌদ্রালোকিত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। রক্তহীন বিবর্ণ মুখ বনবিহারীর, দৃষ্টি ক্লান্ত এবং ওই বিবর্ণ পাণ্ডুরতার উপরে যেন একটা পাংশু অর্থাৎ ছাই রঙের সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়েছে—নয়?

সেদিন তিনি বিধিলঙ্ঘন করে গোপনে ঘুমন্ত বনবিহারীর নাড়ী পরীক্ষা করেছিলেন; সন্তর্পণে হাতখানি নামিয়ে রেখে নেমে এসেছিলেন। তিনিই সেদিন নিজে চক্রধারীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বনবিহারীর রোগ কি কমেছে চক্রধারী? কী বুঝছ?

চক্রধারী একটু চিন্তিত হয়েই বলেছিল—আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অন্তরকম। আমি বলব বলব ভাবছিলাম। বনবিহারীকে আমি বলেছি। আমার মনে হচ্ছে কালাজ্বর।

—কালাজ্বর?

—হ্যাঁ। বনবিহারীকে একবার কলকাতায় পাঠান। একবার দেখিয়ে আসুক।

—যাক। তাই যাক। তুমি যখন বলছ। যাক।

—আপনি একদিন দেখুন ভালো করে।

—না। দেখা উচিত নয়। আর—যাক। যাক, কলকাতা গিয়ে দেখিয়ে আসুক।

বনবিহারী কলকাতা গেল, সঙ্গে আতর-বউ গেল। মশায় বলেছিল—বউমাকেও নিয়ে যাও সঙ্গে।

—বউমাকে? কেন? না। ওই সর্বনাশীকে বিয়ে করেই বসু আমার গলে গেল রোগে। না। ওর নিঃশ্বাস আমি লাগতে দেব না।

মশায় আবার বলেছিলেন—ওসব বলতে হয় না আতর-বউ। ওতে ছেলে বউ দুজনের মনেই কষ্ট হয়। বউমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, আমার কথা শোনো, তোমারও সাহায্য হবে, তা ছাড়া বসুর মন ভালো থাকবে। এখন মন ভালো থাকাটা আগে দরকার।

এই শশাঙ্কর বধূটির কথা সেদিন মনে পড়েছিল। মনে মনে বলেছিলেন—তোমাকে মাছের মুড়ো খেতে দিয়েছিলাম। এবং তোমাকে দেওয়া কথা অনুযায়ী আমার পুত্রবধূকে স্বামীসঙ্গ ভোগের জন্তই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আসামের কালব্যাধি কালাজ্বর। এককালে মৃত্যু-আশ্রিত ম্যালেরিয়াই বলত লোকে। তারপর কালাজ্বরের স্বতন্ত্র স্বরূপ ধরা পড়েছে। জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঙালী ডাক্তার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী তার ওষুধ আবিষ্কার করেছেন।

তাঁর বাবা বলতেন—আসামে এক ধরনের বিষজ্বর আছে। সাক্ষাৎ মৃত্যু; মহামারীর মতো গতিপ্রকৃতি। সেই রোগে ধরল বনবিহারীকে?

না। চক্রধারী নূতন ডাক্তার, নূতন কালের রোগ এবং নূতন ওষুধের উপর একটি ঝোঁক আছে। তিনি নাড়ী দেখে বুঝেছিলেন জীর্ণ জ্বর—পুরনো ম্যালেরিয়া—জীবনকে ক্ষয় করে শেষ সীমান্তে উপনীত করেছে। অন্ধকার মৃত্যুলোকের ছায়ার আভাস ওই আস্তরণ।

তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। রক্তপরীক্ষায় কালাজ্বরের বীজাণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। কলকাতায় বনবিহারীর শিক্ষকেরা যত্ন করেই দেখে ব্যবস্থাপত্র করে তাকে বায়ুপরিবর্তনে যেতে আদেশ করেছিলেন।

কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এল জীর্ণতর হয়ে।

রোগ মৃত্যুরোগে পরিণত যখন হয়—তখন রিপুই জীবনের বুদ্ধিদাতা। অমৃত বলে বিষ খাওয়ার দুর্মতি দেয় সে। পোর্টওয়াইন খেতে দিয়েছিলেন ডাক্তার। বনবিহারী দুদিনে একবোতল পোর্ট খেত, তার সঙ্গে দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য মুরগী খেতে শুরু করেছিল।

মৃত্যুর তিনদিন আগে মশায় আতর-বউকে বলেছিলেন—বুক বাঁধতে হবে আতর-বউ। বন্ধুর ডাক এসেছে।

আতর-বউ বজ্রাহতের মতো কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত থেকে বজ্রবহ্নিতে জ্বলে উঠেছিলেন, বলেছিলেন—বলতে তোমার মুখে বাধল না? তুমি বাপ!

—আমার যে মশায় বংশে জন্ম আতর-বউ। আমার যে একটা কর্তব্য আছে। বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করানো আমার কর্তব্য।

—না-না-না।

বনবিহারী সে কথা শুনতে পেয়েছিল। হাউ হাউ করে কেঁদেছিল সে।—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করিয়ো না। তা হলে আমি আরও বাঁচব না।

—বেশ, তা হলে কিছু খেতে যদি সাধ থাকে—খেতে দিয়ো।

আতর-বউ তাও পারেন নি।

সেদিনের জ্বরটা ছেড়ে গেলে বনবিহারী নিজেই আচার চেয়ে খেয়েছিল।

আতর-বউ দেন নি, দিয়েছিল বনবিহারীর স্ত্রী। পরের দিন বনবিহারী ভালো রইল। চক্রধারী কুইনিন ইনজেকশন দিয়ে গেল।

জীবনমশায় জানতেন—এরপর একটা প্রবল জ্বর আসবে। আগামী কালের মধ্যে।

কখন আসবে জ্বর?

বিনিদ্র হয়েই শুয়ে ছিলেন। ভাবছিলেন।

গভীর রাত্রে সেদিন আবার ডাক এসেছিল।

—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

—কে?

—আজ্ঞা, পশ্চিম পাড়ার হাজি সাহেবের বাড়ির লোক।

—কী? ছেলে কেমন আছে? ডাক্তার উঠে বসেছিলেন। হাজির ছেলের সান্নিপাতিক চিকিৎসা তিনিই করেছেন।

—আসতে হবে একবার। বড় বাড়াবাড়ি।

—যাচ্ছি। চলো।

পথ সামান্য। মাইল দেড়েক। কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে পথ।

মশায় ভারী পায়ে শব্দ তুলে ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন। লোকটা চলেছিল আলো হাতে কাঠের কলবাক্স মাথায় নিয়ে আগে আগে। যমে মানুষে লড়াই। রোগে ভেষজে দ্বন্দ্ব। মনে আছে, সব ভুলে শুধু চিন্তা করেছিলেন—স্ট্রিকনিন, ডিজিটেলিস, এড্রেনেলিন। হার্ট, নাড়ী, রেসপিরেশন। গভীর চিন্তায় মগ্ন মশায় যেন ঘুমের ঘোরে পথ চলেছিলেন সেদিন, রাত্রির অন্ধকার, দুপাশের ধানক্ষেত এসব যেন কিছু ছিল না। মধ্যে মধ্যে নক্ষত্র-ঝলমল আকাশের দিকে চোখ পড়েছিল। ক্ষণিকের জন্য, আবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন।

সেখানে গিয়ে রোগীর বিছানার পাশে বসে নাড়ী পরীক্ষা করে আলো তুলে ধরে রোগীর উপসর্গ লক্ষ্য করে চেহারা দেখে গন্ধ বিশ্লেষণ করে অনেক চিন্তা করে ওষুধ দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ বসে ওষুধের ক্রিয়া লক্ষ্য করে বাড়ি ফিরেছিলেন। হাজির নাতির ক্রাইসিস কাটবে। প্রশান্ত অথচ অবসন্ন মনেই আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানের কাছে বনবিহারীর মঙ্গল কামনা করেছিলেন। সবই জানেন—তবু কামনা করেছিলেন।

পূর্বদিগন্ত থেকে পাণ্ডুর জ্যোৎস্নাকে গ্রাস করে অন্ধকার সম্প্রসারিত হচ্ছে, দূরের গ্রামান্তর অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে হয়ে অন্ধকারে ঢাকা পড়ছে।

ঠিক রোগীর দেহে মৃত্যুলক্ষণ সঞ্চারের মতো; নখের কোণ নীল হয়ে উঠছে, হাতপায়ের তালুর পাণ্ডুরতা ক্রমশ সর্বদেহে ব্যাপ্ত হচ্ছে।

বাড়ি ফিরে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

নাঃ। তখনও জ্বর আসে নি। ভালোই আছে বঙ্কু। সকলে গাঢ় ঘুমে ঘুমুচ্ছে।

তিনিও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল—তাঁর ঘরের দরজায় কে তাঁকে ডাকছে।—বাবা!

বঙ্কু!

কী হল? তাড়াতাড়ি দরজা খুলেছিলেন; সামনে উঠানে অন্ধকার থমথম করছে, গাঢ় নির্জনতার মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কই বঙ্কু? কে ডাকলে? সম্ভবত তাঁর মনে বঙ্কু ডেকেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বঙ্কুর ঘরের দরজায় গিয়ে ডেকেছিলেন—আতর-বউ!

—অ্যাঁ! সাড়া পেয়ে চমকে উঠেছিলেন জীবনমশায়। আতর-বউ জেগেছে। তবে আসছে!

—বঙ্কু কেমন আছে?

—শীত-শীত করছে বলছে, হয়তো জ্বর আসবে।

আসবে নয়, তখন এসেছে! উঃ, সে কি ভীষণ কম্প!

* * *

সেই কম্পই শেষ কম্প বঙ্কুর।

মশায় সেদিন শেষরাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ার উপর। উত্তর-পশ্চিম কোণে কালীতলা, দাওয়ার পাশেই কুয়ো, করবীর

গাছ দুটো ফুলে ভরা। সামনে শিশির-ভেজা ধুলোয়-ভরা নিথর পথখানা পড়ে ছিল। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে তারাগুলিকে দেখছিলেন, কোথায় কোন্ তারা? কোথায় সপ্তর্ষি-মণ্ডল, অরুন্ধতী কোথায়? ধ্রুব? ধ্রুবতারা গেল কোথায়? কালপুরুষ? পূর্বদিগন্তে তখন দণ্ড দুয়েক আগে চাঁদ উঠেছে; কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদ। তাঁদের মতে ক্ষয়-রোগগ্রস্ত চাঁদ; পাণ্ডু বিবর্ণ, ক্ষয়িত কলেবর, পাঁচভাগের চারভাগ ক্ষয়ে গিয়েছে; ক্লান্তির আর পরিসীমা নাই যেন। জ্যোৎস্নাও ম্লান। আকাশে ছড়িয়েছে কিন্তু তাতে আকাশের দ্যুতি খোলে নাই। নীলিমার মধ্যেও যেন পাণ্ডুরতার ছায়া পড়েছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই শশাঙ্কের বউয়ের কথা মনে পড়েছিল। দৃষ্টি নামিয়ে তাকিয়েছিলেন শশাঙ্কের বাড়ির গলিপথটার দিকে। সেদিনও ওই গলিটার মুখে তখন জ্যোৎস্নার একটা ফালি মলিন-থানকাপড়-পরা একটি বিষণ্ণ নারীমূর্তির মতো দেওয়ালের গায়ে লেগেছিল; কিন্তু সেদিন আর শশাঙ্কের স্ত্রী বা মঞ্জরী বলে ভ্রম হয় নাই।

ঠিক এই সময়েই বঙ্কুর উচ্চ চিৎকার শোনা গিয়েছিল—গেল! গেল! গেল! ধর! ধর! ধর! আঃ! হা-হা-হা! মা! মা! মা! প্রলাপ বকতে শুরু করেছিল বঙ্কু।

—বাবা! বঙ্কু! বঙ্কুরে! সাড়া দিয়েছিলেন আতর-বউ।

শেষ সময়ে বঙ্কুর একবার জ্ঞান ফিরেছিল। কেঁদেছিল সে।

—আমাকে বাঁচাতে পারলে না!

মশায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আতর-বউ ডেকেছিলেন—একবার দেখে যাও। কিছু ওষুধ দাও। লোকে বলে তোমার ওষুধে মরণ ফিরে যায়!

—যায় না। কারুর ওষুধে যায় না। আমাকে ডেকো না।

চক্রধারী অবশ্য এসেছিল; শিয়রে সে-ই বসেছিল। দুটো ইনজেকশনও সে দিয়েছিল। কিন্তু—। মৃত্যুকে ডাকলে সে কোনো প্রতিরোধই মানে না। সে শক্তির আবিষ্কার হয় নি, হবে না। যতক্ষণ ব্যাধি ততক্ষণ ওষুধ, কিন্তু ব্যাধির হাত ধরে মৃত্যু এসে আসন পাতলে, সব ব্যর্থ।

শুধু দুঃখ হয়েছিল বঙ্কুর জন্তে। কাঁদছে বঙ্কু!

মনে পড়েছিল হাসিমুখে যারা মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের কথা।

* * *

দেখেছেন বই কি এমন রোগী। কদাচিৎ নয়—একটি দুটি নয়। অনেক, অনেক দেখেছেন তিনি। একালের ডাক্তারেরা দেখতে পায় না, পাবে না। তিনি দেখেছেন। অনেক দেখেছেন, নিতান্ত সাধারণ মানুষের মধ্যেই দেখেছেন।

নবগ্রামের রায় বংশের ভুবন রায়ের কথা মনে পড়ছে।

তখন মশায়ের বাবার আমল। জীবনমশায়ের তরুণ বয়স। ভুবন রায় তখন প্রায় সর্বস্বান্ত। জগৎমশায়কে ডেকে পাঠালেন—মশায়কে বোলো, আমাকে যেন একবার দেখে যায়।

জগৎমশায়ের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন ভুবন রায়। দরিদ্র বৃদ্ধ নিজের বাড়ির ভাঙা দেউড়িতে হুঁকো হাতে বসে থাকতেন। অভাব এমনই প্রচণ্ড যে, যে-কোনো পথচারীকে তামাক খেতে দেখলে তাকে ডাকতেন, কুশল প্রশ্ন করতেন, পরিশেষে বলতেন—দেখি, তোমার কল্কেটা একবার দেখি।

তরুণ জীবন দত্ত সেদিন ভুবন রায়ের ডাক শুনে মনে মনে হেসেছিলেন; অবশ্য জগৎ মশায়কে বলতে সাহস করেন নি। ভেবেছিলেন, উঃ, মানুষের কী বাঁচবার লালসা! এই বয়স—সংসারের কোথাও কোনো পূর্ণতার আকর্ষণ নাই—তবু ভুবন রায় মরতে চায় না।

জগৎমশায়ের সঙ্গে তিনিও গিয়েছিলেন। ছেঁড়া ময়লা বিছানায় শুয়ে ভুবন রায় ক্ষীণ কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন—এসো মশায়, এসো। এসো।

—কী হল?

—যেতে হবে কি না দেখ তো ভাই।

—যেতে তো হবেই রায়মশাই। বয়স মানেই কাল—

হেসে রায় বলেছিলেন—সে কথা ভুবন রায় ভুলে যায় নি জগৎ। সেই কাল পূর্ণ হল কিনা দেখো। কাল পূর্ণ না করে অকালে যাওয়া যে পাপ। সেও ভুবন রায় যাবে না। লোকে বলে গেলেই খালাস। তা অকালে জেলখানা থেকে পালালে কি খালাস হয় রে ভাই? পালিয়ে যাবেই বা কোথা? আবার এনে ভরে দেবে। এখন খালাসের সময় যদি হয়ে থাকে—দেখো দেখি। এখানকার কটি কৃত্য আছে আমাকে সারতে হবে।

ভুবন রায়ের বিষয় থাকতে বন্ধুর কাছে পাঁচশো টাকা নিয়েছিলেন। সে টাকার দলিল ছিল না, বন্ধুও সর্বস্বান্ত ভুবন রায়কে কোনোদিন তাগাদা করতেন না, কিন্তু ভুবন রায় সেটি ভুলতে পারেন নি। অনেকবারই এ সম্পর্কে তাঁর কর্তব্য করবার চেষ্টা করেছিলেন—পারেন নি। কিন্তু কল্পনা ছিল। বন্ধুর কাছে মাফ চেয়ে নিতে হবে। কিন্তু সে কি সহজ? ভেবে রেখেছিলেন—মৃত্যুর পূর্বে—তা সে বন্ধুরই হোক আর নিজেরই হোক, চেয়ে নেবেন মুক্তি। তাই নিজের মৃত্যুর কথা স্থির জেনে তবে বন্ধুকে ডেকে হাত জোড় করে বলবেন—আমাকে মুক্তি দাও।

অবশ্য বিঘাখানেক নিষ্কর জমি রেখেছিলেন, সেইটুকু দেবারও সংকল্প ছিল ভুবন রায়ের।

একটি টাকা বালিশের তলা থেকে বের করে মশায়ের হাত দিয়েছিলেন। জগৎমশায় হাত জোড় করে বলেছিলেন—আমাকে মার্জনা করুন, রায়মশাই।

—তা হয় না জগৎ। বৈদ্যপ্রণামী না দিলে মুক্তি আসবে না আমার। তারপরেই হেসে বলেছিলেন—আমার শ্রাদ্ধ তো একটা হবেই, তাতেই তুমি এক টাকার জায়গায় দু টাকা নৌকুতো দিয়ো।

বন্ধুর কাছে মুক্তি নিয়ে ভুবন রায়ের হাসিমুখে চোখ বোজার কথা অনেকদিন পর্যন্ত মানুষ স্মরণ করে জীবনে ভরসা সঞ্চয় করেছে। তিনি নিজেও করেছেন।

শুধু কি ভুবন রায়? গণেশ বায়েন! এ তো বিশ বছর আগের কথা। তাঁর আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ার সামনে খোলা একখানা গাড়িতে চেপে আশি-পঁচাশি বছরের বুড়ো গণেশের সেই আসার কথা আজও চোখের উপর ভাসছে। লম্বা লাঠিখানায় ভর দিয়ে বুড়ো নেমে শোরগোল তুলেছিল সেদিন। চিরদিনের কালা গণেশের শোরগোল তুলে কথা বলাই অভ্যাস।—ছোটমশায় কই গো? আমাকে আগে দেখো। কই? পরের গাড়ি চেয়ে-চিন্তে এসেছি। ওরা আবার চলে যাবে, নবগেরামের নটকোণের দোকানে জিনিস লেবে। বুড়োকে আগে বিদেয় করো।

লোকজন সকলেই অবাক হয়েছিল গণেশের দাপট দেখে।

মশায়ও গণেশকে দেখে প্রথমটা চিনতে পারেন নি। কে?

শীর্ণ দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ! কে? গণেশ বায়েন নয়? চিতুরার গণেশ বায়েন। হ্যাঁ সেই তো!

গণেশ তাঁর চেয়েও বয়সে বড়। দশ-পনেরো বছরের বড়। গণেশ তাঁর বিয়েতে ঢোল বাজিয়েছে, মায়ের চন্দনধেনু শ্রাদ্ধে, বাবার বৃষোৎসর্গে ঢাক বাজিয়েছে, বন্ধুর বিয়েতেও বাজনা বাজিয়েছে; গণেশ দাবি করে দীনবন্ধু মশায়ের অর্থাৎ তাঁর পিতামহের শ্রাদ্ধেও সে ঢাক বাজিয়েছে। আশি-পঁচাশি বৎসর বয়স হবে গণেশের। সেই কারণেই গণেশ তাঁকে ছোটমশায় বলত।

জীবনমশায় প্রশ্ন করেছিলেন—গণেশ? কী রে? তোর কী হল?

—অ্যাঁ? কান দেখিয়ে গণেশ বললে—জোরে বলো!

ভুল হয়ে গিয়েছিল তাঁর, গণেশ চিরদিন কালা, বৃদ্ধ বয়সে বেশী হয়েছে। নিজেই চীৎকার করছে অর্থাৎ নিজেই শুনতে পাচ্ছে না নিজের কথা। মশায় কণ্ঠস্বর উঁচু করেই বলেছিলেন—কী ব্যাপার?

—অসুখ! ব্যাধি ধরেছে।

—তোরও অসুখ হল শেষে?

—হবে না? যেতে হবে না?

—হবে নাকি?

—তাই তো দেখতে বলছি গো। দেখো। মনে যেন তাই লাগছে, বুঝেছ?

—অসুখটা কী তাই বল আগে।

—পেটের গোলমাল গো!

—পেটের গোলমাল?

—হ্যাঁ। হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে মুখর বৃদ্ধ বলেই গিয়েছিল—বুঝেছ, আরও হয়তো ছমাস একবছর বাঁচতাম। তা সেদিন ঢাক বাজিয়ে ভাইপো একটা পাঁঠার চরণ এনেছিল; তা মনে হল জীবনে এলাম পিথিমীতে, মাংস তো খেলাম না। সারাজীবনে বাদ্যি বাজিয়ে পেসাদী মাংস পেলাম অনেক, মুখে দিলাম না। অথচ সাধ তো আছে। ও না খেলে তো ছুটি হবে না। তাই বাপু খেলাম। ভালোই লাগল। কিন্তু ওতেই লাগল ফ্যাসাদ। পেটের ব্যামো

হল—দুদিন খুব পেটে মোচড় দিলে, তা-পরেতে ঘাটে গেলাম একদিন ; খুব সে ঘাটে যাওয়া। সেই সূত্রপাত। এখন তোমার দুমাস হয়ে গেল—সেই চলেছে। এখন আবার আমেশা হয়েছে। কী রকম মনে হচ্চে বাপু।

জীবনমশায় ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন—এ অবস্থায় এলি কেন? আসা ঠিক হয় নি। খবর দিলেই তো পারতিস!

কে একজন বলেছিল—তোমার তো টাকা আছে শুনতে পাই হে। না হয় মশায়কে দু টাকা দিতে।

—অ্যাঁ, কী বলছে এঁটে বলো গো!

—বলি, তোমার তো টাকা আছে হে।

—আছে। সাতকুড়ি টাকা আমার আছে। পুঁতে রেখেছি। তাই তো এয়েচি মশায়ের কাছে, মশায় বলুক। আমি তা হলে জীবন-মচ্ছবটা করে ফেলি। ছেলে নাই পরিবার নাই—ভাইপোরা টাকা কটা নেবে, কিছুই করবে না। জমি আছে—সে ওদের পাবার, ওরা নিক। টাকাটা আমি জীবন-মচ্ছবটা করে আর মা চণ্ডীর পাট-অঙ্গন বাঁধিয়ে খরচ করে যাব। তা দেখো। ভালো করে দেখে বলো কতদিন আর বাকি।

—বোস। একটু জিরিয়ে নে।

গণেশ খুব সমঝদারের মতো ঘাড় নেড়ে বলেছিল—হ্যাঁ। সে বুঝেছ, ওই রোগ হতেই আমি বুঝেছি। উ-হু ইনি যে-সে নয়। ইনি সে-ই তিনি। মন ঠিক বলে দিয়েছিল। তবু বলি, কে জানে মুরুক্ষু-সুরুক্ষু মানুষ, যাই ছোটমশায়কে দেখিয়ে আসি। তার তো ভুল হবে না! তা হলে ঠিক আছে! চণ্ডীমায়ের পাট-অঙ্গন বাঁধাবার কাজ লাগিয়ে দিই। তা-পরেতে জীবন-মচ্ছব। হরি হরি বলো মন। হরি হরি বলো।

বলে প্রণাম করে দুটো টাকা নামিয়ে বলেছিল—'না' বোলো না। চ্ছেরকাল বিনাপয়সায় দেখেছ। এই দুই টাকাতে শোধ!

মনে মনে সেদিন প্রশ্ন জেগেছিল—গণেশ কি সত্যিই বুঝতে পেরেছিল?

শরৎ চন্দের দিদিমার কথা মনে পড়েছিল। বন্ধুর মৃত্যুর মাস আষ্টেক আগের কথা। তাঁকে হাত দেখতে ডেকেছিল।

সেও বুঝতে পেরেছিল। ডাক শুনতে পেয়েছিল। বৃদ্ধা চিরদিনই খেতে-দেতে ভালোবাসত। খাওয়া-দাওয়া আয়োজন করতেও জানত। শরতের দিদিমার হাতের ফুলবড়ি আর পাঁপর ছিল উপাদেয় সামগ্রী। সেই কারণেই মশায় হাত দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী খেতে ইচ্ছে হয় গো?

জিভ কেটে বৃদ্ধা বলেছিল—আমার পোড়াকপাল। এই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করলে বাবা?

—তবে কী সাধ হয় বলো।

—শরৎকে দেখব শুধু। দেখে বলো, কদিন বাঁচব। শরৎ ফিরে আসা পর্যন্ত থাকব?

শরৎ তখন বি, এ, পরীক্ষা দিচ্ছে। শরতের মা বলেছিল—বলুন, টেলিগেরাপ করব কিনা।

—নাঃ, দিন পনেরো দে-বউ আছে। শরৎ তো সাতদিন পরে আসবে?

—হাঁ।

—তা হলে ঠিক আছে। নাতি দেখতে তুমি পাবে দে-বউ। কিন্তু কষ্ট কী বলো। খোরাক কয়েক ওষুধ দেব।

—কষ্ট অস্বস্তি। আর কী? মনে হচ্ছে—গেলেই সুখ। নিশ্চিন্দি। বাঁচি।

এমন অনেক মানুষকে দেখেছেন। এই যাওয়াই তো যাওয়া। মৃত্যুর সমাদরের অতিথি। একালে তেমন অতিথি বোধ করি মৃত্যু পায় না।

আর কি হবে না? ঠিক এই সময়েই আতর-বউ চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন—ওরে বনু রে!

* * *

বিপিন সম্পর্কে তিনি বলতে পারবেন না।

বিপিন বনবিহারীর মতো অসহায় আর্তের মতো চীৎকার করে নি, করার কথাও নয়। সে কর্মবীর। সে কাঁদবে না। কিন্তু প্রসন্ন প্রশান্ত ভাবেও আত্মসমর্পণ করতে পারবে না। তার বেদনা ক্ষোভের হাহাকারে ফেটে পড়বে।

অন্ধকারের মধ্যে আত্মমগ্নের মতো পথ হাঁটছিলেন তিনি। সত্যসত্যই যেন স্থানকাল সম্পর্কে চেতনা ছিল না তাঁর। চেতনা ফিরে এল নবগ্রামের বাজারের আলোয়।

চৌমাথাটায় দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে। সেকালের মতো ম্লান আলো নয়। উজ্জ্বল আলো। পেট্রোম্যাক্স, লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি—আড়াইশো বাতি, পঁচিশ বাতি, চল্লিশ বাতি। এই আলোর ঝলক তাঁর চোখে লেগে তাঁকে সচেতন করে দিল। সামনে একটা মনিহারির দোকানের ঝকমকে জিনিসগুলি চোখে যেন রঙ ধরিয়ে দেয়। হরেন ডাক্তারের দোকানে ওরা কারা?

প্রদ্যোত ডাক্তারের স্ত্রী আর সেই আগন্তুক বন্ধুটি। তারা দুজনেই বেরিয়ে এল এই সময়। ডাক্তারের স্ত্রী সুন্দরী মেয়ে, তার উপর সেজেছে। মনোরমা করে তুলেছে নিজেকে। মশায় দাঁড়ালেন। তারা দুজনে চলে গেল, টর্চ জ্বালিয়ে ডানপাশের অন্ধকার পথ ভেদ করে। ওই পথে তাঁকেও যেতে হবে।

কোলাহল উঠছে চারিদিকে। বাজারের কেনাবেচা চলছে। বেছে অল্প আলো যেদিকটায় পড়েছিল সেই দিকটা ধরে তিনি চৌমাথাটা পার হয়ে মোড় ফিরলেন। এবার পথ আবার অন্ধকার। বাঁচলেন তিনি। বিপিনের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে কী বলতেন তিনি? অনেকটা আগে ডাক্তারের স্ত্রী আর ডাক্তারের বন্ধুটি চলেছে।

অন্ধকার রাস্তায় বালি-কাঁকরের উপর মশায়ের পায়ের জুতোর শব্দ উঠছে। এই জায়গাটা নির্জন, বসতিহীন। অনেকটা পিছনে নবগ্রামের বাজারপটির আলোর ছটা শূন্যলোকে ভাসছে। এতটা দূরে বাজারের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে, ক্ষীণ হয়ে আসছে

ক্রমশ। বর্ষার মাঠে ব্যাঙের ডাকের ঐকতান উঠছে। কলরব করছে। ওটা কী যন্ত্রণাকাতর শব্দ! ওঃ, সাপে ব্যাঙ ধরেছে! মশায় থমকে দাঁড়ালেন। আবার চললেন।

বড় পুকুরটার পাশ দিয়ে এসে মাঠের মধ্যে রাস্তার একটা বাঁক ফিরতেই আলো পেলেন মশায়। হাসপাতালের কোয়ার্টারের জানলায় বারান্দায় আলোর ছটা পড়েছে; হাসপাতালের বারান্দায় আলো জ্বলছে। প্রদ্যোত ডাক্তারের বারান্দায় পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। ওই যে ডাক্তারের স্ত্রী আর বন্ধুটি। প্রদ্যোত ডাক্তার বসে রয়েছে। চারুবাবু ডাক্তার। আরও কজন।

এতক্ষণে ফিরছেন ডাক্তারবাবু?

হাসপাতালের বাইরের দেওয়ালের পাশ থেকে কে একটি লোক বেরিয়ে এল। কে? বিনয়? চিনতে পেরে আশ্চর্য হলেন মশায়। বি-কে মেডিক্যাল স্টোর্সের মালিক বিনয়।

—ডাক্তারদের মিটিং হচ্ছে।

—মিটিং?

—হ্যাঁ। আমাকে বয়কটের ব্যবস্থা হচ্ছে।

—তোমাকে বয়কটের?

—হ্যাঁ। কাল যাব আমি আপনার কাছে। মিটিং শুধু আমাকে নিয়েই নয়, আপনিও আছেন। বলব, কাল সকালে সব বলব। যাব আমি। এখানকার সব ডাক্তার এসেছে। ওই দেখুন না। এখন হরেন শুধু আসে নি। চারুবাবু প্রদ্যোতবাবু যাচ্ছে, হরেনকে নিয়ে বিপিনবাবুকে দেখে আসবে; এসে মিটিং হবে। আপনি দেখে এলেন বিপিনবাবুকে? আপনি থাকলেন না? ও আপনাকে বলে নাই বুঝি?

মশায় কোনো জবাব দিলেন না। না, কোনো কথাই তিনি বলবেন না।

বিনয় বললে—আজ সকালে কিশোরদাদা তো খুব বলেছে আপনার কথা। সারা গাঁয়ে একেবারে হৈ হৈ করছে।

এ কথারও কোনো উত্তর দিলেন না মশায়। বিনয় বলেই গেল—প্রদ্যোত ডাক্তার শুনলাম খুব চটেছে।

মশায় এবার বললেন—আমি যাই বিনয়।

বিনয় চকিত হয়ে উঠল—হ্যাঁ। ওরা আসছে। আমিও যাই। কাল যাব আমি আপনার কাছে।

সে আবার দেওয়ালের পাশ দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। চারুবাবু, প্রদ্যোত, প্রদ্যোতের বন্ধু বারান্দা থেকে নেমে চলে আসছে।

ছাব্বিশ

প্রদ্যোত ডাক্তারের বাসায় সেদিন এ অঞ্চলের পাশকরা ডাক্তারেরা সকলেই এসে জমেছিলেন। প্রদ্যোতই উদ্যোগী হয়ে সকলকে ডেকেছে। এখানে একটি কো-অপারেটিভ মেডিক্যাল স্টোর্স খোলার কথা হবে।

বিনয়কে বয়কটের জন্য ঠিক নয়; তবে বিনয়কে মুশকিলে পড়তে হবে বই কি। শুধু তাই নয়, এখানে ছোটখাটো ক্লিনিকও সে করতে চায়। ডাক্তারের বন্ধু ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করেন এই জেলার সদরে। সদর থেকে বিপিনবাবুর ইউরিন ও ব্লাড রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার নিজেই এসে গতকাল থেকে বসে আছেন। বিপিনের রিপোর্ট আশাপ্রদ বটে কিন্তু পরীক্ষক ডাক্তারের কী একটি সন্দেহ হয়েছে। তিনি আবার একবার ইউরিন ব্লাড নিজে নিয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে এই মিটিংয়েও যোগ দিয়েছেন তিনি। প্রদ্যোতের অনুরোধেই যোগ দিয়েছেন। প্রদ্যোত ডাক্তারের মত, একালে ক্লিনিকের সাহায্য ছাড়া চিকিৎসা করা অন্যায়; যে বিজ্ঞান নিয়ে সাধনা, সেই বিজ্ঞানকে এতে লঙ্ঘন করা হয়। সাধারণ ম্যালেরিয়া বা সামান্য অসুখবিসুখে উপসর্গ দেখে, থার্মোমিটার স্টেথোসকোপের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়তো যায়, কিন্তু অসুখ যেখানে একটু জটিল বলে মনে হয়, যেখানে এতটুকু সংশয় জাগে, সেখানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রক্ত মল মূত্র—এসব পরীক্ষা না করে চিকিৎসা করার ঘোরতর বিরুদ্ধে সে। নাড়ী পরীক্ষার উপর বিশ্বাস তার নাই। বায়ু পিত্ত কফও বুঝতে পারে না। এবং চোখে উপসর্গ দেখে, রোগীর গায়ের গন্ধ বিচার করে রোগনির্ণয় দু-চারজন প্রতিভাবানের পক্ষে সম্ভবপর বটে, কিন্তু সাধারণ চিকিৎসকদের সে শক্তি নাই। যাঁরা করেন তাঁরা পাঁচটাতে ঠিক ধরেন—পাঁচটাতে ভুল করে পরে শুধরে নেন—পাঁচটাতে ভুল শেষ পর্যন্ত ধরাই পড়ে না। রোগী যখন মারা যায় তখন মনে হয়—চিকিৎসা আগাগোড়াই ভুল হয়েছে। রোগটা বোধ হয় ম্যালেরিয়া ছিল না, কালাজ্বর ছিল; অথবা কালাজ্বর ছিল না, ছিল ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়াকে টি-বি ভুল করতেও দেখা গিয়েছে। সেদিন একটা ছেলের চিকিৎসার মারাত্মক ভুল হয়েছে। ছেলেটা মরা অবধি তার মন পীড়িত হয়ে রয়েছে।

বিনয়ের দোকানে যে সব প্রেসক্রিপশন সরবরাহ হয়, তার মধ্যে অসাধুতা আছে। কোনো ওষুধ না থাকলে নিজেরাই বুদ্ধিমতো একটা বিকল্প দিয়ে চালিয়ে দেয়। তাও না থাকলে সেটা বাদ দিয়েই চালিয়ে দেয়। কোনো ওষুধটা যথানিয়মে ক্রম রক্ষা করে তৈরি করে না। ওষুধের শিশি স্থির থাকলেই দেখা যায় বিভিন্ন ভেষজ স্তরে স্তরে স্বতন্ত্র হয়ে ভাসছে অথবা তলায় জমে রয়েছে। একদফা ওষুধ এনে তাতেই চালায় ছ মাস, এক বছর। নিস্তেজ, নির্গুণ ওষুধের ক্রিয়া হয় না। সব থেকে বিপদ হয়েছে এখানকার বিশেষ ওষুধগুলি নিয়ে। পেনিসিলিন যে বিশেষ তাপমানে রাখার কথা তা রাখা হয় না। যেসব ওষুধ আলোক-রশ্মিতে বিকৃত হয় সেগুলিও নিয়মমতো রাখে না এরা। মানুষের জীবনমরণ নিয়ে যেখানে প্রশ্ন—সেখানে অবহেলা, অজ্ঞতা এবং কুটিল ব্যবসায়-বুদ্ধির স্বেচ্ছাচারে ব্যভিচারে মানুষের জীবন হচ্ছে বিপন্ন। এ ছাড়া জাল ওষুধ চালায় বলেও প্রদ্যোত বিশ্বাস করে।

তার উপর দাম। দরিদ্র মানুষ—সরল গ্রামবাসী অসহায়ভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে এই লোলুপতার খড়্গের নিচে ঘাড় পেতে দিতে বাধ্য হচ্ছে। শুধু দামই নয়, বাকির খাতায় বাকি বেড়েই চলে। এদের পীতপাণ্ডুর চোখের দৃষ্টি দেখলে প্রদ্যোতের করুণাও হয়, রাগও ধরে। এক-এক সময় মনে হয়—মরুক, এরা মরুক, মরে যাক। শেষ হয়ে যাক। নির্বোধ

মূর্খেরা নিজেদের অজ্ঞতা মূর্খতা নির্বুদ্ধিতা কিছুতেই স্বীকার করবে না। বললে শুনবে না। বুঝিয়ে দিলে বুঝবে না, বিশ্বাস করবে না। আজও কবচ-মাদুলি জড়ি-বুটি ঝাড়-ফুঁক ছাড়লে না এরা। এদের বিজ্ঞানবোধ জীবনমশায়ের নাড়ীজ্ঞান পর্যন্ত এসে থেমে গেছে।

তাই অনেক চিন্তা করে সে এখানকার ডাক্তারদের এবং এই বন্ধুটিকে নিয়ে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায়। বড় একটি ওষুধের দোকান। তার সঙ্গে একটি ছোটখাটো ক্লিনিক।

এখানকার অবস্থা দেখে সে যা বুঝেছে তাতে বড় একটি কারবার বেশ সমৃদ্ধির সঙ্গেই চলবে। নবগ্রামে একটি মাঝারি ওষুধের দোকান আজ তিরিশ বৎসরেরও বেশী কাল ধরে ভালোভাবেই চলে আসছে। তার আগে হরিশ ডাক্তারের বাড়িতে এক আলমারি ওষুধ নিয়ে তাঁর নিজস্ব কারবার চলত। জীবন-মশায়ের আরোগ্য-নিকেতন নাকি সমারোহের সঙ্গে চলেছে দীর্ঘকাল। আজ উনিশশো পঞ্চাশ সালে কি এখানে ক্লিনিক ও বড় ওষুধের দোকান চলবে না?

আজ নবগ্রামেই দুজন এম. বি. দুজন এল. এম. এফ. রয়েছেন। আশেপাশে চারিদিকে দশ-বারো মাইলের মধ্যে আরও চারজন এল. এম. এফ. আছেন। তাঁদের সকলেরই কোনো রকমে চলে যাচ্ছে। তাঁদের সকলকেই আজ নিমন্ত্রণ করেছেন প্রদ্যোত ডাক্তার। সকলে মিলে অংশীদার হয়ে এই কারবার গড়ে তোলার কল্পনা। তাতে সকলেরই লাভ। তাঁরা ব্যবসায়ীর মতো লাভ করবেন না, তবুও যেটুকু লাভ হবে তাঁরাই পাবেন। প্রেসক্রিপশনে কমিশনও যে যেমন পান পাবেন। এখানকার লোকেও অপেক্ষাকৃত কম দামেই ভালো ওষুধ পাবে।

কোয়ার্টারের বারান্দায় চেয়ার-টেবিল বিছিয়ে আসরটি বেশ মনোরম করেই পাতা হয়েছিল। সন্ধ্যার সময়ে চা-পর্ব থেকে শুরু হয়েছে। মাঝখানে একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলছে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া আছে। কিছু পাখি শিকার করা হয়েছে—তার সঙ্গে কয়েকটি মুরগীও আছে। রান্না করছে হাসপাতালের কুক। মঞ্জু ঘুরেফিরে রান্নাবান্নার তদ্বির করছে। বারান্দার আসরে একপাশে একটি অর্গান রাখা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে গান গাইবে সে।

* * *

এখানে নবগ্রামের আশেপাশে যারা প্র্যাকটিস করে—তারা সকলেই স্থানীয় লোক। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ডাক্তারিই সব পেশার চেয়ে ভালো পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপই এর প্রধান কারণ। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে আছে দু-চারটে টাইফয়েড, দু-দশটা রেমিটেণ্ট, তার সঙ্গে আমাশয়, পেটের অসুখ। বসন্ত হয়, কিন্তু মহামারী হয়ে দেখা বড় দেয় না, তবে কলেরা মাঝে মাঝে হয়। সেকালে কলেরা হত মহামারীর মতো, একালের টিকার কল্যাণে তা হয় না। এ ছাড়া এটা-ওটা নানান ব্যাধি লেগেই আছে। সেই কারণে ডাক্তার হতে পারলে নিশ্চিন্ত; উপার্জন হবেই। আগে লেখাপড়া শিখে

সকলেই আইনটা পড়ত। চাকরি না পেলে উকিল হবে। কিন্তু উকিলদের পেশা অনিশ্চিত, যার কপাল খুলল সে রাজা, যার হল না সে ফকির বললেও চলে। ডাক্তারিতে তা নয়, কিছু হবেই। কপাল খুললে কথাই নাই। তার উপর বাড়িতে বসে চলে। দশ বছর আগে এখানে চারিপাশে দুজন পাশকরা ডাক্তার ছিল। হাতুড়ে অনেক কজনই করে খেত। এখন এখানে ছজন পাশকরা ডাক্তার। কেউ বর্ধমানে, কেউ বাঁকুড়ায়, জনচারেক কলকাতায় ক্যাম্বেল এবং মেডিক্যাল স্কুলে পড়ে পাশ করে এসেছেন। এঁরা সকলেই বিনয়ের পাইকিরি খদ্দের। বিনয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁদের নেই এমন নয়, আছে; পুরনো ওষুধ বিনয় চালায়। দাম বেশী ঠিক নেয় না তবে কো-অপারেটিভে দাম আরও কম হবে। ক্লিনিকের তেমন প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। তবে হলে মন্দ কী? শক্ত রোগে দু-এক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতেও পারে। এবং প্রদ্যোত ডাক্তারকে একটু তুষ্ট রাখারও প্রয়োজন তাদের আছে। দু-একটা শক্ত রোগী, বিশেষ করে অপারেশন কেস, নিয়ে এলে হাসপাতালে সেগুলি করে দেবে প্রদ্যোত ডাক্তার। কিছুটা বিজ্ঞানের প্রেরণার তাগিদও অবশ্যই আছে। তারা সকলেই অপেক্ষা করে রয়েছে। বিপিনবাবুকে দেখে ডাক্তারেরা ফিরলেই আলোচনা আরম্ভ হবে।

প্রদ্যোতেরা বিপিনের কেস আলোচনা করতে করতেই ফিরলেন। বিপিনবাবু আজ বলেছেন—আপনারা কী বলছেন বলুন। এইভাবে আমি আর বেঁচে থাকতে চাইনে। জীবনমশায় বলে গেছেন আমি বাঁচব না।

রতনবাবু বলেছিলেন—না, তা তো তিনি বলেন নি বিপিন। তাঁর উপর ইনজাস্টিস কোরো না তুমি।

দৃঢ়ভাবে বিপিনবাবু বলেছিলেন—না, ইনজাস্টিস করি নি আমি। তিনি যেভাবে 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না' বলে চলে গেলেন, কী না নিয়েই চলে গেলেন—তার মানে ও ছাড়া আর কিছু হয় না। বলুন না, আপনিই বলুন, তাঁর মতামত সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়েছে?

বিপিনবাবুর ছেলেটিও বলেছে—হাঁ। উনি একরকম তাই-ই বলে গেছেন ইঙ্গিতে।

বিপিনবাবু বলেছেন—এখন আপনারা বলুন আপনাদের মত। এবং কতদিনে আমি বিছানা ছেড়ে—অন্তত ইনভ্যালিড চেয়ারেও একটু-আধটু ঘুরতে পারব বলুন। আমার রাশীকৃত কাজ পড়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে প্রাণের দায়ে মক্কেলরা আসে, তাদের সঙ্গে আপনারা দেখা পর্যন্ত করতে দিচ্ছেন না। তাই বা কখন থেকে দেবেন বলুন। ফ্র্যাঙ্কলি বলুন। আমি শুনতে চাই।

চারুবাবু একটু বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন—আপনার মতো লোক অধীর হলে আমরা কী করব বিপিনবাবু! আপনি তো নিজেই জানেন এ রোগের কথা। তা ছাড়া চঞ্চল হচ্ছেন আপনি, এতে আপনার অনিষ্ট হবে।

—জানি। জেনেই বলছি। আমি এইভাবে থাকতে পারছি না। জীবনমশায় তাঁর

কথা বলেছেন এবং চলে গেছেন একরকম। এখন আপনাদের পালা। আপনারা বলছেন ভালো আছি আমি। বেশ। এখন বলুন কতদিনে আমি উঠব। অবশ্য পূর্বের জীবন ফিরে পাব না আমি জানি, কিন্তু তার সামান্য অংশ। বলুন।

প্রদ্যোত বলেছে—কলকাতায় ডাঃ চ্যাটার্জি আপনাকে দেখছিলেন। তাঁর নির্দেশমতো এখানে আমরা চিকিৎসা করছি। মতামত তিনি দেবেন। আপনি তাঁকে আনান। আমরা বলতে পারি জীবনমশায়ের সঙ্গে আমরা একমত নই। আপনি আগের থেকে ভালো আছেন এবং এই উন্নতির যদি ব্যাঘাত না হয় তবে ক্রমে ক্রমে সেরে উঠবেন আপনি। কতদিনে, সে বলতে হলে ডাঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

—বেশ, তাই হোক। ডাঃ চ্যাটার্জি আসুন। হরেন, তুমি যাও—তাঁকে নিয়ে এসো। যা চাইবেন দেব। লজ্জায় ঘেন্নায় আমি দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। এর শেষ কথা জানতে চাই আমি। আর—

মাথা তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে বলেছেন—জীবনমশায়কে যেন আর না ডাকা হয়। আমি মরব কিনা জানতে চাই না। মরবে সবাই একদিন। এ রোগে আমি বাঁচব কিনা জানতে চাই।

কথাটা বলেছেন বাপকে লক্ষ্য করে।

সেই কথা বলতে বলতেই ফিরে এলেন ওঁরা। চাকর চা এনে সামনে নামিয়ে দিলে। হরিহর কম্পাউণ্ডার চারুবাবুর সামনে নামিয়ে দিলে একটি কাচের গ্লাসে দু আউন্স ব্র্যাণ্ডি এবং একটি সোডার বোতল। চারুবাবুরই এ প্রস্তাবে উৎসাহ বেশী। তিনিই হবেন সোসাইটির চেয়ারম্যান। ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে চারুবাবু পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে বললেন—নটা পাঁচ। কাজ শুরু করে দিন প্রদ্যোতবাবু। সময় এখন ভালো। দুর্গা দুর্গা—সিদ্ধিদাতা গণেশ! করুন আরম্ভ।

চারুবাবু আগে থেকেই পাঁজি দেখে রেখেছেন। প্রদ্যোত এসব মানে না, বরং মানা অপছন্দই করে, তবু এক্ষেত্রে চারুবাবুর ইচ্ছায় বাধা দেয় নি।

প্রদ্যোত কাগজ-কলম টেনে নিয়ে বসল।

চারুবাবু হেসে বললেন—কি রকম মিটিং মশায়? একটা ওপ্‌নিং সঙ হবে না? হারমোনিয়ম—মিসেস বোস উপস্থিত থাকতে!

ডাক্তারের স্ত্রী অত্যন্ত সপ্রতিভ মেয়ে। সে মাথাটি নত করে সসম্ভ্রমে বললে—সভাপতির আদেশ শিরোধার্য। এবং অর্গ্যানটার সামনে বসে গেল।

একটা ব্যাঘাত পড়ল।

হঠাৎ হাসপাতালের ফটকে চার-পাঁচজন লোক এসে ঢুকল। একটি মেয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছিল—ওরে সোনা রে, ও মানিক রে! ওরে বাবা রে!

প্রদ্যোত একমনে হিসেব কষে যাচ্ছিল। কান্না শুনে কাগজ-কলম ধীরতার সঙ্গে গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।—এত রাত্রে এমন বুক চাপড়ে কাঁদছে—হাসপাতালে ছুটে এসেছে—

নিশ্চয় অ্যাকসিডেন্ট। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের কেস। কিন্তু এখানে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড মানে দুটি বেড এখন। একটি বেড ছিল, প্রদ্যোত এসে অনেক চেষ্টা করে কিশোরবাবুকে দিয়ে চেষ্টা করিয়ে আর-একটা বাড়িয়েছে। থানা হেলথ সেণ্টার হলে পাঁচটা বেড হবে। কিছু নূতন ব্যবস্থাও করেছেন। কিন্তু ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সব থেকে বড় প্রয়োজন রক্তের। রক্ত কলকাতার ব্লাড ব্যাঙ্কে—দেড়শো মাইল দূরে।

—আমি আসছি। দেখি কী হল। প্রদ্যোত চলে গেল।

চারুবাবু বললেন—এমন কর্তব্যপরায়ণ লোক আমি দেখি নি। আমিও একসময় এখানে ছিলাম তো। আমারও খুব কড়াকড়ি ছিল। বুঝলেন মিসেস বোস, আমিও খুব কড়া লোক ছিলাম। তবে করব কী? সে কালই ছিল আলাদা। তখন হাসপাতাল ছিল বাবুদের, ডি-বি গ্রাণ্ট ছিল এই পর্যন্ত। বাবুরাই হর্তাকর্তা বিধাতা। ডিসপেনসারিতে কাজ করছি, বাবুদের কল এল, আসুন, আরজেণ্ট। কী করব, যেতে হল। গিয়ে দেখি ছোট ছেলে খুব চীৎকার করছে। তারস্বরে। বাবুর মেয়ের প্রথম ছেলে, বারো বছরের মেয়ের ছেলে—বুঝছেন ব্যাপার?

—বারো বছরের মেয়ের ছেলে? মঞ্জুর বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

—তার আর আশ্চর্য কী? সে আমলে এ তো হামেশাই হত। এগারো বছরের মেয়ের ছেলে আমি দেখেছি। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে না হলে সেকালে হায় হায় পড়ত সংসারে। আর ছেলে হল না। দেবতাস্থানে মানত করত।

মঞ্জু বললে—আমার মায়ের মায়ের মা, গ্রেট-গ্র্যাণ্ডমা—তাঁর ছেলে হয়েছিল তেরো বছরে, আমার মায়ের মা। তাই শুনি যখন তখন আশ্চর্য হয়ে যাই সে বুড়ী আজও বেঁচে আছে। ওঃ, যা কালা হয়েছে বুড়ী! জানেন—

হঠাৎ একটা ভয়ার্ত চীৎকারে সকলে চমকে উঠল। কী হল? চীৎকারটা ডাক্তারের বাসার ভিতরে।

কেউ যেন বু-বু করে চেঁচাচ্ছে। কে? ঠাকুরের গলা বলে মনে হচ্ছে।

মঞ্জু দাঁড়িয়ে উঠে ছুটল। সঙ্গে সঙ্গে প্রদ্যোতের বন্ধুও ছুটল।

চারু ডাক্তার বললেন—কী হল, চোরটোর নাকি?

হরেন বললে—কী জানি।

—না, কড়াই-কড়াই উলটে ফেললে পায়ে? না কি? চারুবাবু বললেন—দেখো হরেন! সকলেই সচকিত হয়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

চারুবাবু শেষ ব্রাণ্ডিটুকু পান করে ডাকলেন—ও মশায়। ও মিসেস বোস! হল কী।

ওদিকে ভিতরে হাউমাউ করে কী বলছে ঠাকুরটা। কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না। প্রদ্যোতের বন্ধু ধমকাচ্ছে। ডাক্তারের বউ খিলখিল করে হাসছে।

চারু ডাক্তার বললেন—বলি হরেন!

—আজ্ঞে!

—এ মেয়েটা কী হে ? কী হাসছে দেখো তো ? আবার বন্দুক নিয়ে নাকি শিকার করে !

হরেন বললে—হাঁ, সাইকেলও চড়েন !

চারু ডাক্তার এবার বললেন—এ একটা গেছো মেয়ে ! ডাক্তারটি লোক ভালো কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই গেছো মেয়ের পাল্লায় পড়ে গাছে উঠে না বসতে হয় ; লেজ না গজায় !

সব ডাক্তারেরাই হেসে উঠল।

চারুবাবু মাথার টাকে হাত বুলিয়ে সরস হেসে বললেন—কিন্তু ওরা আছে বেশ। কপোত-কপোতী সম। বেশ ! হাসছে খেলছে গাইছে। বেশ আছে ! মাঝে মাঝে মনে আপসোস হয় হে। বলি একালে জন্মালাম না কেন ? ডাক্তার এবার নিজেই হেসে উঠলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খিলখিল করে হেসে যেন বর্ষার ঝরনার মতো ঝরে পড়তে পড়তে ওদিক থেকে বেরিয়ে এল প্রদ্যোত ডাক্তারের গেছো বধূটি। ডাক্তারের বন্ধুও হাসছিল, সে বললে—ইডিয়ট কোথাকার ! কাণ্ড দেখুন তো !

চারু ডাক্তার বললেন—হল কী ?

মঞ্জু বললে—ভূত। চারুবাবু—ভূত এসেছিল। আবার সে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে লাগল।

ভূত ! চারু ডাক্তারের আমেজ ছুটে গেল।

হাঁ্যা। চাকরটা ঘরে খাবার জায়গা করছে, ওদিকে রান্নাঘরে ঠাকুর গরমমশলা বেটে মাংসের সঙ্গে গুলে দিচ্ছে ; সারি সারি থালা বাটি সাজানো হঠাৎ টুপটাপ শব্দে ঢিল পড়তে শুরু করে। ঠাকুর তাইতে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, আপাদমস্তক সাদা কাপড় পরে কে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই বলেছে—এঁকটু মাংস দেঁ। এঁকটু—দেঁ! বাস—ঠাকুর অমনি বু-বু করে উঠেছে।

প্রদ্যোতের বন্ধু বললে—আমার ইচ্ছে হল ব্যাটার গালে ঠাস করে চড় কষিয়ে দিই গোটা কয়েক।

চারু ডাক্তার বললেন—উঁহু। এতটা উড়িয়ে দিলে চলবে না। জায়গাটা ভালো নয়। বহু লোকে বহুবার ভয় পেয়েছে এখানে। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বড় গাছ ছিল। সেখানে নানা প্রবাদ ছিল। আর হাসপাতাল যেখানে—ওখানটা তো ছিল মুসলমানদের কবরস্থান। ওই ভয়ে হাসপাতালে সেকালে রোগী হত না। গোটা সাত বছরে সাতটা রোগী হয় নি। যা গোটা চারেক হয়েছিল তাও মরণদশায় ভিখিরী আর নাকারি—গোটা দুয়েক অ্যাকসিডেন্ট কেস—প্রায় আনক্লেমড্ প্রপার্টির মতো। সে সব ওই কিশোরবাবুর সোনাল সার্ভিসের দল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ভরে দিত। একটা ছাড়া মরেছেও সব কটা। এবং সব রোগীতেই ভয় পেত।

মঞ্জু আবার খিলখিল করে হেসে উঠল, বললে—আপনি ভূত বিশ্বাস করেন নাকি ডাক্তারবাবু ?

চারুবাবু বললেন—হাঁ্যা। মানে, করি আবার করিও না। করি না আবার করি, দুই-ই বটে। মানে, কী যে আছে কী যে নাই—এ ভারি মুশকিল।

প্রদ্যোত ফিরে এলেন। গম্ভীর মুখ। আস্তিন পর্যন্ত জামা গুটানো। ডিসইনফেকট্যাণ্টের মৃদু গন্ধ উঠছে। চেয়ারের উপর বসে পড়ে বললেন—ছোট ছেলে, ছ-সাত মাস বয়স। গরম দুধ পড়ে একেবারে—।

চারু ডাক্তার আপনার অজ্ঞাতসারেই একটা জৈবিক যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে উঠলেন—আঃ!

অন্য সকলে শিউরে উঠল। উঃ!

প্রদ্যোতের বন্ধু প্রশ্ন করলে—টিকবে?

—মরে গেছে। টেবিলের উপরে শোওয়াবার পর মিনিট কয়েক ছিল। তারপর বার কয়েক স্প্যাজ্‌ম্—ব্যস। আমি আর করি নি কিছু। শুধু দেখলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

মঞ্জু স্থির হয়ে গিয়েছে। তার সকল চঞ্চলতা, হাসি, কৌতুক—সব যেন শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রদ্যোতের বন্ধু বললে—এখানে আবার আর-এক হাঙ্গাম।

—হাঙ্গাম? মানে?

—তোমার ঠাকুর ভূত দেখেছিল। বু-বু শব্দে চীৎকার—সে এক কাণ্ড!

—ননসেন্স! বদমায়েশি করছে বেটা! বোধ হয় মাংস-টাংস সরিয়েছে। পরে বলবে ভূতে খেয়ে গেছে।

চারু ডাক্তার বললেন—উঁহু। সব ওরকম করে উড়িয়ে দেবেন না! উঁহু।

প্রদ্যোত হেসে উঠল।—আপনি ভূত মানেন নাকি?

চারু ডাক্তার বললেন—মানি মানে? এই গোরস্থানে—ওদিকে একটা মানুষের বাচ্চা মল অপঘাতে, এদিকে মাংসের গন্ধে হবে চেলা পড়ল; খোনা-সুরে কথা কইলে। ব্র্যাণ্ডির আমেজ কেটে গেল। দিন, এখন আমাকে আর-এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি দিন। সব মাটি। এক আউন্সের বেশী না। ব্যস, ব্যস।

প্রদ্যোত গ্লাসটি বাড়িয়ে দিয়ে বললে—সে যা হোক, ভূত থাক বা না থাক, মারামারি নাই। এদিকের কথা বলুন। তা হলে আমাদের এদিকের সব ঠিক তো!

—হ্যাঁ। ঠিক বই কি। না কি হে সব?

—তা হলে কাগজখানা দেখুন, সই করে দিন!

—আপনি পড়ুন ডাক্তার। ইউ সি—ব্যাণ্ডি খেয়ে চালশের চশমা চোখে দিলে বড্ড বেশী উঁচু-নীচু লাগে আমার। আরে, ওই জন্যে রাত্রে কল এলে আমি যাই না। নে-ভার। রাত্রে রোগী মরলে চারু ডাক্তার ইজ নট রেসপনসিবল। পড়ুন—আপনি পড়ুন।

প্রদ্যোত বলে গেল—কোম্পানির নাম হবে নবগ্রাম কো-অপারেটিভ মেডিক্যাল স্টোর অ্যাণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবোরেটরি।

চারু ডাক্তার বললেন—গুড।

—ক্যাপিটাল পাঁচ হাজার টাকা। শেয়ার দশ টাকা হিসেবে। চারুবাবু একশো শেয়ার নিচ্ছেন। মঞ্জু বোস একশো। আমার বন্ধু নির্মল সেন একশো। হরেনবাবু পঞ্চাশ।

—না মিঃ বোস। আমার পঁচিশ করুন।

—কেন হে হরেন? তোমার তো চলতি ভালো হে। জীবনমশায় তোমায় ডেকে ইনজেকশন দেওয়াচ্ছেন, ওদিকে রতনবাবুর ছেলে বিপিনবাবুর অ্যাটেণ্ডিং ফিজিশিয়ান তুমি, এই দুটো কেসেই তো তোমার পঞ্চাশের দাম উঠে যাবে হে!

হরেনের মুখখানা লাল হয়ে উঠল। কুসুমাহারের ডাক্তার হরিহর পাল এতক্ষণে বললে—তা রামহরিকে জীবনমশায় আর হরেনবাবু বাঁচিয়েছেন খুব। আমাকেই প্রথম ডেকেছিল পাগলা শশী। একেবারে সরাসরি কথা বলেছিল। উইল একখানা করে রেখেছে রামহরি—তাতে সাক্ষী হতে হবে তোমাকে। টিপসই আমরা দিয়ে নোব। তুমি সাক্ষী হয়ে যাও। হাঙ্গামা-হুজ্জুত কিছু হবে না, ভয় কিছু নাই। যদি হয় বলবে—সজ্ঞানেই টিপসই করেছে রামহরি। টনটনে জ্ঞান ছিল। পঞ্চাশ টাকা—শেষে বলে একশো টাকা। কিন্তু আমি বললাম—ওতে আমি নাই শশীবাবু। মাফ করবেন আমাকে। টাকায় আমার কাজ নাই। আমি যা দেখেছিলাম—তাতে তো প্রায় শেষ অবস্থা। ও কেসটা খুব বাঁচিয়েছেন জীবনমশায়।

চারুবাবু বললেন—ওইটেই জীবনমশায়ের ভেল্‌কি। আমি ভেল্‌কি বলি বাপু। বুঝছ না! রোগটা ঠাওর করতে পারে। তা পারে। নাড়ীজ্ঞানই বল আর বহুদর্শিতাই বল, যাই বল—লোকটা এগুলো প্রায় ঠিক ঠিক বলে দেয়। আর লোকটির গুণ হচ্ছে—ধার্মিক। কিন্তু ওই একটা ব্যাপার—ওই, এ রোগী বাঁচবে না—ওই নিদান—ওইটেতে যেন একটা কেমন ঝোঁক আছে।

প্রদ্যোত ডাক্তার বললে—আমি কিন্তু কথার মধ্যে একটু ইণ্টারাপ্ট করছি। আমরা আসল কথা থেকে সরে যাচ্ছি। আমাদের কাজটা পাকা করে নিতে হবে।

হরেন বলেন—আমার তা হলে চল্লিশখানা শেয়ার লিখুন।

চারুবাবু বললেন—তোমার দশখানার দাম আমি এখন দিয়ে দেব হে। তুমি আমাকে মাসে মাসে দিয়ো। যাও যাও, আপত্তি কোরো না, বস্ খতম। ওয়ান্ টু থি।

টেবিলের উপর চড় মেরে হাসতে লাগলেন। তারপর আবার বললেন—এই তো সাড়ে তিন হাজার উঠে গেল। বাকি দেড় হাজার রইল—এরা দিক। এরা রয়েছে পাঁচজনে, ওরা দুশো করে—মানে, কুড়িখানা করে দেবে। আর বাকি পাঁচশো—আমি বলি ওপন থাক—দু-চারজন কোয়াক আছে—তারা যদি—

প্রদ্যোত দৃঢ় কণ্ঠে বললে—আমি কিন্তু এর বিরোধী ডাক্তারবাবু।

টাকে হাত বুলিয়ে চারুবাবু বললেন—আপনার এখন নতুন রক্ত প্রদ্যোতবাবু। অনেক কোয়াক ভালো চিকিৎসা করে, তাদের ভালো প্র্যাকটিস, তাদের টাহন। এই ধরুন জীবনমশায়।

বাধা দিলে প্রদ্যোতবাবু। বললে—এ নিয়ে তর্ক আমি করব না। কিন্তু এ ইনস্টিটিউশন খাঁটি পাশকরা ডাক্তারদের। এখানে খাঁটি সায়ান্স ছাড়া ভেল্কিকে আমরা প্রশ্রয় দেবার

কোনো দরজা খোলা রাখব না। ডাক্তারবাবু, আপনি অস্বীকার করবেন না যে এখানে এখনও দৈব ওষুধ অনেক চলে। কবচ মাদুলি চলে। এই তো আপনাদের এখানকার ধর্মঠাকুরের বাতের তেল ওষুধের খুব খ্যাতি। কলকাতা থেকে লোক আসে। কিন্তু আপনি ডাক্তার হয়ে প্রেসক্রিপশনে অবশ্য লিখবেন না—ধর্মঠাকুরের তেল এক আউন্স। এবং সে তেলও আপনি এই ডাক্তারখানায় রাখতে বলবেন না। কবচ মাদুলিও আমাদের মেডিক্যাল স্টোর থেকে অবশ্যই বিক্রি হবে না।

—আপনি আমাকে দমিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। চারু ডাক্তার ঘাড় নাড়তে লাগলেন।—যুক্তি আপনার কাটবার উপায় নেই। উকিল হলে আপনি ভালো উকিলও হতে পারতেন। কিন্তু—

—বলুন কিন্তু কী? খুব গম্ভীর মুখেই প্রদ্যোত প্রশ্ন করলে। এবং টেবিলের উপর হাত রেখে চারুবাবুর দিকে একটু ঝুঁকেও পড়লে আগ্রহ প্রকাশ করে।

হেসে ফেললেন চারুবাবু, বললেন—কিন্তু এটা এমন কিছু নয়, মানে ভাবছিলাম আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া অবশ্যই হয়, তাতে জেতে কে?

সমস্ত মজলিশটাই হো-হো করে হেসে উঠল। মিসেস বোস হেসে উঠল সর্বাগ্রে।

হাসি একটু কমে আসতেই চারুবাবু বললেন—তবে ওই পঞ্চাশটা শেয়ার পাবলিকের জন্যে খোলা থাক। কেউ একটার বেশী শেয়ার পাবে না। যারা কিনবে তারা ওষুধ পাবে একটা কনসেশন-রেটে।

—তাতে আমি রাজী। এবং ওটাকে বাড়িয়ে পঞ্চাশের জায়গায় একশো করার পক্ষপাতী আমি।

—বাস-বাস। দিন সই করে দি। নাও, সব সই করো।

সই করে চারু ডাক্তার কাগজখানা প্রদ্যোত ডাক্তারকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—খাবার দেরি কত মিসেস বোস? অন্নপূর্ণার দরবারে শিব ভিখারী—তাকে চুপ করেই হাত পেতে থাকতে হয়। কিন্তু শিবের চ্যালারা হল ভূত। তারা খিদে লাগলে মানবে কেন?

—হয়ে গেছে। জায়গা করতে বলে এসেছি। হয়ে যেত এতক্ষণ। ঠাকুরটা যে ভয় পেয়ে মাটি করলে। চাকরটা তাকে আগলাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে সব এ ঘরে এনে তবে জায়গা করবে।

—ওই দেখুন। ভূতের চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে।

—দেখছি আমি।

—দাঁড়ান।

—কী?

—আমি বলি কি, মাংসটা—ওটা না খাওয়াই ভালো।

—মাংস বাদ দেব? আপনি কি পাগল হলেন ডাক্তারবাবু?

—উঁহু। মুসলমানের কবরখানা—তার উপর মুর্গীর মাংস। উঁহু! মানে ভূত মানি

চাই নাই মানি, আমরা ডাক্তার—ভূত মানা আমাদের উচিত নয়—মানবই বা কেন? তবে যখন একটা খুঁত হয়ে গেল, মানে বু-বু করবার সময় ঠাকুরটার থুতু-টুতু পড়ল কিনা কে জানে? কিংবা আরও কিছু হল কিনা কে বলতে পারে—তখন কাজ কী? মানে—আমি, মানে আমার ঠিক রুচি হচ্ছে না।

খাওয়ার সময় দেখা গেল মাংসে রুচি সমাগত স্থানীয় ডাক্তারদের কারুরই প্রায় হল না।

প্রদ্যোত ডাক্তার রেগে আগুন হয়ে উঠলেন ঠাকুরটার উপর। এ ওর বদমাইশি। আপনারা এটা বুঝতে পারছেন না? একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেছে এইবার। এই রকম একটা ব্যাপার করলে আপনারা কেউ মাংস খাবেন না। লোকাল লোক—এখানকার বিশ্বাস অবিশ্বাস জানে। ঠিক ফিট করেছে। এইবার ব্যাটারা গোগ্রাসে গিলবে।

চারুবাবু বললেন—তাই থাক। ব্যাটারা খেয়েই মরুক। বুঝেছ না, হেভি ডোজে ক্যাস্টর অয়েল ঠুকবে। তবে বুঝেছ না, আমাদের রুচি মানে বললাম তো। থাক না। যা আসল কাজ তা তো হয়ে গেল—নবগ্রাম কো-অপারেটিভ মেডিকেল স্টোর অ্যাণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবোরেটরি। এ একটা মস্ত কাজ আপনি করলেন। ক্লিনিক্যাল টেস্ট ছাড়া এ যুগে এক পা এগুনো যায় না। উচিত না। অ্যাণ্ড—আপনি ওই কথাটা যা বললেন সেটা আমি মানি। ঠিক বলেছেন। কবচ মাদুলি দৈব ওষুধ ফল যদি হয়—আমরা প্রতিবাদ করব না, কিন্তু ওকে প্রশ্রয় দেব না।

তাঁরা চলে গেলেন একে একে।

প্রদ্যোত চাকর এবং ঠাকুরকে ডেকে বললেন—কালই দুজনে মাইনে মিটিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

মঞ্জু বললে—এটা তোমার অন্যায় হল।

—না, হয় নি।

—তুমি সে সময়ে ঠাকুরের চেহারা দেখ নি। লোকটা ঠকঠক করে কাঁপছিল। কী, বলুন না মিস্টার সেন?

সেন বললেন—ভয় লোকটা পেয়েছিল প্রদ্যোত, সেটা মিসেস বোস ঠিক বলেছেন। হি ওয়াজ ট্রেম্‌ব্লিং লাইক এ লীফ। পাতার মতো কাঁপছিল।

প্রদ্যোত বললেন—তোমাদের কথা মানতে হলে—আমি বুঝব—লোকটা অত্যন্ত ভূত-বিশ্বাসী; এটা কবরস্থান—রাঁধছে মুর্গীর মাংস সুতরাং কবর থেকে ভূত উঠে আসবে এই সব মনে মনে কল্পনা করছিল সন্ধ্যে থেকে এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সে ভিশন দেখেছে। এ লোককে আমি হাসপাতালে রাখতে পারব না। আমার রোগীরা ভয় পাবে। কাল ভোরেই ওদের চলে যেতে হবে।

সাতাশ

সমস্ত রাত্রি জীবনমশায়ের ঘুম হল না। মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গেল সর্বক্ষণ। শশাঙ্ক, শশাঙ্কের স্ত্রী, বনবিহারী, বনবিহারীর স্ত্রী, আতর-বউ, বিপিন, বিপিনের স্ত্রী, রতনবাবু—যেন তাঁর শয্যা ঘিরে বসেছিল। রতনবাবু, বিপিন, বিপিনের স্ত্রী তাঁকে বার বার প্রশ্ন করেছে—বলুন, আপনি বলুন। শশাঙ্ক, বনবিহারী, ওদের স্ত্রী, আতর-বউ ভ্রূকুঞ্চিত করে ইশারা করেছে, না-না না।

নিজেকেও তিনি বার বার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। মনে পড়ছে—তাঁর বাবা বলেছিলেন—নিদান দেবার সময় সর্বাগ্রে অন্তরে অনুভব করতে হয় পরমানন্দ মাধবকে। তাঁর প্রসাদে জন্মমৃত্যু জীবনমরণ হয়ে ওঠে দিবা এবং রাত্রির মতো কালো এবং আলোর খেলা, পরমানন্দময়ের লীলা। তখন সেই মন নিয়ে বুঝতেও পারবে নাড়ীর তত্ত্ব এবং বলতেও পারবে অসংকোচে। জিজ্ঞাসিত না হয়ে এ কথা বলার বিধি নয়—তবে ক্ষেত্র আছে, যে-ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসিত না হয়েও নিজে থেকেই তোমাকে বলতে হবে। পরমার্থসন্ধানী বৃদ্ধকে বলতে হবে, বলতে হবে—বিশ্বাসবশে মুক্তির অভিপ্রায়ে বা আপনার বৈরাগ্যকে পরিপূর্ণ করে তুলবার জন্য যদি কোনো কাম্যতীর্থে যাবার বাসনা থাকে—তবে চলে যান। কোনো গুপ্ত কথা যদি গোপন দুশ্চিন্তার মতো অন্তরে আবদ্ধ থাকে—তাকে ব্যক্ত করে নিশ্চিন্ত হোন। কোনো ভোগবাসনা বা মমতাসংক্রান্ত বাসনা যদি মনে অতৃপ্তির আকারে নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের ছলনায় আপনাকে ছলনা করে—তবে তা পূর্ণ করে পূর্ণ তৃপ্তি সঞ্চয় করে নিন।

আর-এক ক্ষেত্রে নিজে থেকে বলতে হবে রোগীর আত্মীয়কে—স্বজনকে। সেক্ষেত্রে রোগী বৃদ্ধ না হলেও, পরমার্থ-সন্ধানী না হলেও বলতে হবে। কর্মী সম্পদশালী রোগী—যিনি সংসারে, সমাজে বহু কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, জড়িত, যাঁর উপর বহুজন নির্ভর করে, তাঁর ক্ষেত্রে অবশ্যই বলতে হবে তোমাকে। তাঁর আত্মীয়স্বজনকে বলবে; কারণ ওই মানুষটির মৃত্যুতে বহুকর্ম বহুজন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে জানতে পেরে তার যতটুকু প্রতিকার সম্ভব—তা হতে পারবে।

আর এক ক্ষেত্রে বলতে হবে। যে ক্ষেত্রে রোগী প্রবৃত্তিকে রিপুতে পরিণত করে মৃত্যুকে আহ্বান করে নিয়ে আসছে—সেই ক্ষেত্রে তাকে সাবধান করবার জন্য জানিয়ে দেবে; প্রবৃত্তিকে সংযত করো বাপু!

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই পরমানন্দ মাধবকে অনুভব করা প্রয়োজন। কিন্তু সে মাধবকে এ জীবনে তাঁর পাওয়া হল না। তিনি কী করে রতনকে বলবেন? না, সে তিনি পারবেন না। মমতার সংসারে আশ্বাসই আশ্রয়, আশাই অসহায় মানুষের একমাত্র সুখনিদ্রা; জ্ঞানের চৈতন্যের কোনো প্রয়োজন নাই।

কালই তিনি হরেনকে বলে আসবেন। এ তিনি পারবেন না। রতনবাবুকে সে যেন

বলে দেয়—জীবনমশায়ের মতিভ্রংশ হয়েছে, তিনি আর কিছু বুঝতে পারেন না। বড় ভুল হয়ে যায়। গতকালের নাড়ীর অবস্থা পরদিন মনে থাকে না। অনেক বিবেচনা করেই তিনি বলেছেন—তিনি আর আসবেন না।

ভোরবেলাতেই বিছানা থেকে উঠলেন তিনি।

নাঃ, আর না। বিপিন আরোগ্যলাভ করুক। মতির মা সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক। দাঁতু বেঁচে উঠুক। তাঁর সব উপলব্ধি, সব দর্শন ভ্রান্ত মিথ্যা হয়ে থাক।

নিচে নেমে প্রাতঃকৃত্য সেরে দাওয়ায় এসে বসলেন। সমস্যা এক জীবিকার। তা চলে যাবে।

উপার্জন অনেক করেছেন। জীবনে লক্ষ টাকার বেশী উপার্জন করেছেন—সব খরচ করে দিয়েছেন। ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকার মতো ওষুধের দাম বাকি পড়ে শেষ পর্যন্ত আদায় হয় নি। মেয়েদের বিয়েতে দেনা করেছিলেন, যাদের বাড়িতে দেনা—তাদের বাড়ি চিকিৎসা করে ফীজ নেন নি। আশা করেছিলেন—সুদটা ওতেই কাটান যাবে। কিন্তু তা যায় নি, তাঁরা দেন নি। সুদে আসলে নালিশ, ডিগ্রী করে সম্পত্তি নীলাম করে নিয়েছেন। কোনো আক্ষেপ নাই তাতে। তবে হ্যাঁ, যতটুকু জীবনে প্রয়োজন—ততটুকু থাকলে ভালো হত। রাখা উচিত ছিল। তা তিনি রাখতে পারেন নি। সংসারে হিসেবী বিষয়ী লোক তিনি হতে পারলেন না। লোকে বলে, জগদ্বন্ধুমশায়ের ঘরে দুধেভাতে জন্ম, নিজে দুহাতে রোজগার করেছে। নাড়ি টিপে পয়সা। হিসেব শিখবেই বা কখন—করবেই বা কেন? ভেবেছিল চিরকাল এমনিই যাবে। দুহাতে রোজগার করে চার হাতে খরচ করেছে।

তাও খানিকটা সত্য বটে বই কি। কিন্তু ওইটাই সব নয়। না—তা নয়।

আতর-বউ বলেন—এ সংসারে মনই কোনোদিন উঠল না মশায়ের। তেতো, বিষ লাগল চিরদিন। আমি যে তেতো, আমি যে বিষ! হত সে, অমৃত হত সব। তখন দেখতে—সে অর্থাৎ মঞ্জরী! কথা শেষ করে হাসেন আতর-বউ, সে যে কী হাসি—সে কেউ বুঝতে পারবে না; তাঁর সামনে ছাড়া তো ও হাসি আর কারও সামনে হাসেন না।

এও খানিকটা সত্য। মশায়ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাসেন, মনে মনে বলেন—সংসারকে তোমরা তেতো করে দিয়েছ তাতে সন্দেহ নেই। তুমি, বনবিহারী, মেয়ে, জামাই সকলে; সকলে মিলে। তবে তোমার বদলে মঞ্জরী হলেও সংসার অমৃতময় হত না। এবং তাতেও তাঁর সংসারে আসক্তি হত না। না। হত না।

তাঁর মনের একটা কোণ তোমরা কোনোদিন দেখতে পাও নি। মনের সে কোণে তাঁর জীবনের শ্মশান-সাধনার আয়োজন। সেখানে অমাবস্যার অন্ধকারে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন আজীবন। অহরহ সেখানে মধ্যরাত্রি। মৃত্যু, মৃত্যু আর মৃত্যু। এই নামেই সেখানে জপ করে গেলেন আজীবন। মৃত্যু অমৃতময়ী হয়ে দেখা দেয়, বলেছিলেন তাঁর বাবা। সেই রূপ দেখবার যার সাধনা সে বিষয়ের হিসেব, বস্তুর যত্ন করবে কখন? নইলে যে রোজগারটা জীবনে তিনি করেছিলেন—তাতে কি তোমাকে পালকিতে চড়িয়ে নিজে সাদা ঘোড়ায় চেপে কাঁদী ঘুরে আসতে পারতেন না! সাদা ঘোড়া তো হয়েছিল। গহনাও

তোমার কম হয় নি ; পালকি বেহারার খরচ আর কত ? তুমি তো জান না, রোগীর মৃত্যু-শয্যার পাশ থেকে উঠে চলে আসবার সময় রোগীর আপনজনেরা যখন ডাকত—একটু দাঁড়ান মশায়, আপনার ফী। হাত পেতে নিয়ে ভাবতে ভাবতে আসতেন সেই বিচিত্ররূপিণীকে ; আজও আসেন। এই পরিণাম মহাপরিণাম। অনিবার্য অমোঘ। বার বার প্রশ্ন করেছেন—কি রূপ ? কেমন ? বর্ণে গন্ধে স্পর্শে স্বাদে সে কেমন ? কেমন তার কণ্ঠস্বর ? বাবার বলা কাহিনীর রূপও এ সময়ে মনকে পরিতুষ্ট করতে পারে না।

হঠাৎ ধূমকেতুর মতো শশী এসে উপস্থিত হল। এই আশ্বিন মাসেই—শশী তার ছেঁড়া ওভারকোট চড়িয়েছে। হাতে হুঁকো। এই সকালেই চোখ দুটো লাল। নেশা করেছে, কিন্তু মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না, গাঁজার গন্ধও না, বোধ হয় ক্যানাবিসিণ্ডিকা খেয়েছে। বিনা ভূমিকায় বললে—রামহরে বেটা আজ উইল রেজেস্ট্রী করতে আসছে। আপনাকে সাক্ষী করবে। রামহরের এই শেষ বউকে কিছু দেওয়াতে হবে আপনাকে। আর আমার ফীয়ের অনেক টাকা বাকি, তা ঝকমারকগে গোটা বিশেক টাকা আমাকে দেওয়াবেন

শশী বসল চেপে।

শশীকে কী বলবেন—তাই ভাবছিলেন তিনি। হঠাৎ বাইসিক্লের ঘণ্টার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মুখ ফেরালেন তিনি। বাইসিক্ল আজকাল অতি সাধারণ যান, আশপাশে গ্রামের চাষীর ছেলেরাও আজকাল বাইসিক্ল কিনেছে। তবু ওর ঘণ্টার একটা আকর্ষণ আছে। এ গ্রামে রঙ্গই প্রথম বাইক্লিস কিনেছিল।

বাইসিক্ল দুখানা। প্রদ্যোত ডাক্তার আর তার বন্ধু দুজনে চলেছে। এদিকে এত সকালে কোথায় যাবে ?

প্রদ্যোত ডাক্তার নেমে পড়ল সাইক্ল থেকে। বন্ধুটি একটু এগিয়ে গিয়ে নামল। প্রদ্যোতবাবু হঠাৎ নেমেছে বোধ হয়।

—নমস্কার !

প্রত্যাশা করেন নি মশায়। একটু যেন চমকে উঠেই প্রতিনমস্কার করলেন—নমস্কার !

অহীন্দ্র সরকারের বাড়িটা কোথায় বলুন তো ? বলে এল—আপনার বাড়ির কাছাকাছি।

—অহীনের বাড়ি ? এই তো,—এই গলিটা ধরে যেতে হবে। ওদের বাড়ি যাবেন ?

—হ্যাঁ। একটু হাসলেন প্রদ্যোত ডাক্তার।. অহীনবাবুর জামাই আমার ক্লাসফ্রেণ্ড। একসঙ্গে আই. এস. সি. পড়েছিলাম। তার ছেলের অসুখ।

অহীনের জামাইয়ের ছেলে ? দৌহিত্র ? অতসীর ছেলে তা হলে ? মতির মাকে যেদিন দেখে গঙ্গাতীর যাবার কথা বলেছিলেন সেদিন ফিরবার পথে মদনের ছেলে বদনের সঙ্গে জল ঘেঁটে খেলা করছিল একটি ছোট ছেলে—চোখ-জুড়ানো—যশোদা দুলালের মতো ফুটফুটে ছেলেটি, —সেই ছেলেটি ? তার অসুখ ? তিনি এই বাড়ির দোরে রয়েছেন—তাঁকে ডাকে নি, দেখায় নি ? কী অসুখ ?

ততক্ষণে গলির মধ্যে ঢুকে গেছে প্রদ্যোত এবং তার বন্ধু।

—আজকাল লোকের খুব পয়সা হয়েছে, বুঝলেন মশায়। মেলা পয়সা। আপনাকে আমাকে দেখাবে কেন? অথচ অহি সরকারের বাবার কত্তাবাবার আমল থেকে আপনারা চিরকাল বিনা পয়সায় দেখে এসেছেন।

মশায় অকস্মাৎ দাওয়া থেকে পথের উপর নেমে পড়লেন। ধরলেন ওই গলিপথ। অহি সরকারের বাড়ির দিকে।

* * *

শশী অবাক হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলে উঠল—এরই নাম মতিচ্ছন্ন। দেবে, প্রদ্যোত ডাক্তার ঘাড় ধরে বের করে দেবে।

বছর চারেকের শিশু। জ্বরে আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে। এদিকের কর্ণমূল থেকে ওদিকের কর্ণমূল পর্যন্ত গোটা চিবুকটা ফুলেছে, সিঁদুরের মতো টকটকে লাল।

প্রদ্যোত ডাক্তার দেখছে। বন্ধুটিও দেখছে। মা বসে আছে শিয়রে, অহি এবং একটি প্রিয়দর্শন যুবা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। মশায় গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। নীরবে পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা বিষম যন্ত্রণা চলছে রোগীর দেহে, রোগীর অনুভবশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। চেতনা বোধ করি বিলুপ্তির মুখে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মশায়। কোনো ছায়া পড়েছে কী? বুঝতে পারছেন না। দৃষ্টিশক্তি তাঁরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

প্রদ্যোত দেখা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। মুখ গম্ভীর, চিন্তান্বিত। তার চোখ পড়ল মশায়ের উপর।

—আপনি!

—আমি একবার দেখব।

তিনি এগিয়ে এলেন রোগীর দিকে। বিছানায় বসে পড়লেন।

অপ্রস্তুত হল অহি সরকার। অতসীও হল। শশী মিথ্যা বলে নাই। আজ তিন পুরুষ ধরে মশায়দের প্রীতির জন্য সরকারদের চিকিৎসা খরচ ছিল না। আজ তাঁকে উপেক্ষা করে—।

অহি বললে—দেখুন না, কোথা থেকে কী হয়। কাল সকালে জামাই এল। ছেলেটা কোলে নিলে, বলল—ছোট একটা ফুসকুড়ি হয়েছে, একটু চুন লাগিয়ে দাও। সন্ধ্যেবেলা কাঁদতে লাগল—বড্ড ব্যথা করছে। ফুসকুড়িটা—মুড়ো ফোড়ার মতো মুখ-টুক নাই—একটু বেড়েছে দেখলাম। তারপর সারারাত ছটফট করেছে, জ্বর এসেছে। সকালবেলায় দেখি মুখ ফুলেছে আর জ্বর, হুঁশ-চেতন নাই। আমি আপনাকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম, তা জামাই বললে—এ তো ফোড়াটোড়ার জ্বর, হয়তো কাটতে হবে, কি আর কিছু করতে হবে। এতে ওঁকে ডেকে কী করবেন? তা কথাটা মিথ্যেও বলে নি। তার উপর হাসপাতালের ডাক্তারবাবু জামাইয়ের ক্লাসফ্রেণ্ড। তা আমি বললাম—তোমার ধন—তুমি যাকে খুশি দেখাও বাপু। আমার কি দায় এতে কথা বলতে!

মশায় ছেলেটিকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। প্রদ্যোত ডাক্তার ততক্ষণে বেরিয়ে চলে

গিয়েছে। বাইসিকেলে চড়েই চলে গিয়েছে ওষুধ আনতে। ইনজেকশন দেবে। পেনিসিলিন ইনজেকশন।

ছেলেটির মা অতসী ব্যগ্রভাবে বলে উঠল—কেমন দেখলে মশায়দাদু? আমার ছেলে কেমন আছে? কী হয়েছে?

হেসে মশায় বললেন—গালগলা ফুলে জ্বর হয়েছে ভাই! ভয় কী? ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন—আজকাল ভালো ভালো ইনজেকশন উঠেছে। ভালো হয়ে যাবে।

চলে এলেন তিনি; যেমনভাবে এসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই বের হয়ে এলেন। অহি সরকার পিছনে পিছনে এসে রাস্তায় নেমে ডাকলে—কাকা!

—অহি?

—কী দেখলেন?

—নাড়ী দেখে আর কতটা বুঝব বলো? তবে জ্বরটা বাড়বে।

—এখনই তো—

সে বলবার আগেই মশায় বললেন—দুই হবে—একটু ওপরেই। কম নয়।

—হ্যাঁ, দুই পয়েণ্ট দুই। আরও বাড়বে?

—বাড়বে বলেই মনে হচ্ছে, বাবা।

—গাল-গলা ফোলা? এমন লাল হয়ে উঠেছে! সামান্য ফোড়া!

—ওঁরা তো রক্ত পরীক্ষা করছেন! দেখো। নাড়ী দেখে বলে যে বেকুব হতে হবে বাবা!

চলে এলেন তিনি, আর দাঁড়ালেন না। বাড়ির দোরে তখন দুখানি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একখানা পরান খাঁয়ের, অন্যখানা রামহরি লেটের। রামহরি উইলে সাক্ষী করাতে এসেছে।

শশী পালিয়েছে রামহরিকে দেখে।

* * *

পরানের স্ত্রী অন্তর্বত্নী। পরান খুশী হয়েছে। একটু লজ্জিতও যেন, সেইটুকু ভালো লাগল মশায়ের। মনটা ভালো থাকলে হয়তো একটু রসিকতাও করতেন। অন্তত মসজিদে-দরগায়-দেবস্থানে মানত মানতে বলতেন; বলতেন—তা হলে একদিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করো পরান। এবার সন্তান হয়ে বাঁচবে। বুঝেছ? আর বিবিরও সব অসুখ সেরে যাবে। কিন্তু মনটা বিমর্ষ হয়ে আছে। চৈতন্য এবং অচৈতন্যের মাঝখানে—বিহ্বল অবস্থার মধ্যে উপনীত অতসীর ওই ছেলেটির কথাই তাঁর মনকে বিষণ্ণ করে রেখেছে। এখানে রিপু নাই, প্রবৃত্তির অপরাধ নাই—প্রতিষ্ঠা, সম্পদ, লালসা,লোভ—কোনোটার বিশেষ আকর্ষণে বাঁচবার বাসনা উদগ্র নয়। নবীন জীবন বাড়বার, পূর্ণ হবার জন্য বাঁচতে চায় প্রকৃতির প্রেরণায়। কী প্রাণপণ কঠোর যুদ্ধ! নিজের দাবিতে সে যুদ্ধ করছে। প্রচণ্ড দাবি। প্রচণ্ডতম। নিষ্ঠুর ব্যাধিটা দেখা দিয়েছে কালবৈশাখী ঝড়ের মতো। একবিন্দু কালো মেঘে যার আবির্ভাব—সে কিছুকালের মধ্যেই ফুলে ফেঁপে ছেয়ে ফেলবে, ফেলতে শুরু করেছে। তাণ্ডব

এখনও শুরু হয় নি। তবে খুব দেরি নাই। দেরি নাই। নাড়ী ধরে তিনি বাতাসের সোঁ সোঁ ডাকের মতো সে ডাক যেন অনুভব করেছেন। দূরের প্রচণ্ড শব্দের ধ্বনি যেমন মাটিতে অনুভব করা যায়, ঘরের দরজা-জানালায় হাত দিয়ে স্পর্শে অনুভব করা যায়, তেমনিভাবেই অনুভব করেছেন। এ ছাড়া আর উপমা নাই। বিষজর্জরতার মতো একটা জর্জরতা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। গতি তার উত্তরোত্তর বাড়বে—ঝড়ের সঙ্গে মেঘের মতো জ্বরের সঙ্গে বিষ-জর্জরতাও বাড়বে।

গাড়ি এসে থামল আরোগ্য-নিকেতনের সামনে। কে বসে আছে? শশী? আর ওটা? বিনয়? নবগ্রামের বি-কে স্টোর্সের মালিক! কাল ও আসবে বলেছিল বটে।

শশী তাঁকে দেখবামাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—আজ আমি ছাড়ব না, পায়ের ধুলো নোব। জয় গুরুদেব। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং—তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

রামহরির উইলে মশায় তার শেষ স্ত্রীকে পাঁচ বিঘে জমি দিতে রামহরিকে রাজী করিয়েছেন। রামহরি শশীকেও পনেরোটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। মশায় তাকে বাঁচিয়েছেন—তিনি তাঁর পূর্বজন্মের বাপ—তার আজ্ঞা সে কি লঙ্ঘন করতে পারে? রামহরিরা বিচিত্র। ওরা সারা জীবনটাই পাপ করে যায়, কোনো নীতিধর্মই মানে না, কিন্তু দুটি একটি নীতি যা মানে তা কোনো কালে লঙ্ঘন করে না।

—তারপর? বিনয়কুমার, তোমার সংবাদ? বিনয় চুপ করেই বসে আছে। মুখর মানুষ সে। জীবনের সাফল্যের উল্লাসে অহরহই যেন ভেসে বেড়ায়, দুরন্ত হাওয়ার মতো। দুরন্ত কিন্তু উত্তপ্ত হাওয়া নয় বিনয়; সার্থক ব্যবসাদার মানুষ, বর্ষার জলভরা মেঘের স্পর্শে সজল এবং শীতল। বিনয় মিষ্টভাষী মানুষ।

বিনয় বললে—আমার মশায়, অনেক কথা। সংসারে মানুষ দু রকম, এক কমবক্তা আর এক উদ্‌বক্তা। আমি একেই উদ্‌বক্তা, তার উপর অনেক কথা। শশী ডাক্তারের হোক, তারপর বলছি আমি।

—কথা অনেক থাকলে কাল আসিস বিনয়। আজ আমার মনটা ভালো নয়।

—কী হল?

—বোস। আসছি আমি।

বেরিয়ে এলেন মশায়। অতসীর ছেলেটি কেমন আছে? ছেলেটির সেই ফুটফুটে মুখখানি চোখের উপর ভাসছে। তার আজকের রোগক্লিষ্ট অর্ধ-চেতনাহীন বিহ্বল দৃষ্টি মনে পড়ছে। তার চিবুক থেকে কর্ণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত রক্তরাঙা স্ফীতিটা—কালবৈশাখীর মেঘ কতটা ছড়াল? ঝড় কতটা বাড়ল?

বেরিয়ে এসেও থমকে দাঁড়ালেন। যাবেন তিনি? উচিত হবে?

কে বেরিয়ে আসছে? প্রদ্যোত ডাক্তারের সেই বন্ধুটি নয়? হ্যাঁ, সেই তো!

মশায়ই আজ নমস্কার করলেন—নমস্কার। আবার ওখানে গিয়েছিলেন কি?

—নমস্কার। হ্যাঁ, ছেলেটির রক্ত নিলাম, পরীক্ষা করে দেখব।

—কিন্তু সে তো সদরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করবেন। ফল অন্তত কাল না হলে এখানে জানতে পারবেন না।

—হ্যাঁ। কিন্তু তা ছাড়া তো উপায় নাই। তবে পেনিসিলিন দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে—স্ট্রেপ্টোককাস ইনফেকশন হয়েছে। হবেও তাই। দেখি।

—স্ট্রেপ্টোককাস ইনফেকশন?

—হ্যাঁ। আপনারা যাকে বলেন সান্নিপাতিক। গলার ভিতরে ঘা দাঁড়াবে ছোট ছোট মটরের মতো।

—খানিকটা ডাক্তারি পড়েছিলাম—বাড়িতে। স্ট্রেপ্টোককাস শুনেছি। গলায় ঘা দেখেছি। অবিশ্যি সাধারণ লোকে ওকে সান্নিপাতিক বলে। আসলে সান্নিপাতিক ভিন্ন ব্যাপার। সে খুব কঠিন। কিন্তু—

—কিন্তু কী? আপনার মতে কী?

—জ্বর এখন কত দেখে এলেন?

—একশো তিন। কিছু কম। পেনিসিলিন পড়েছে, পেনিসিলিনের জন্যেও জ্বর একটু বাড়বে।

—না। এ জ্বর ওর রোজই বাড়ছে ডাক্তারবাবু। আমি পাশকরা ডাক্তার নই, তবে চিকিৎসা অনেক করেছি। এর মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা। একটা প্রচণ্ড বিষ ঢুকেছে রক্তে। ফুলো কতটা বেড়েছে?

অরুণেন্দ্র ডাক্তার অভিভূত হয়ে গিয়েছিল এই বৃদ্ধের কথার আন্তরিকতায়। জ্ঞানের, অনুভূতির আভাসও সে অনুভব করছিল। মনে মনে চিন্তা করতে করতেই অরুণেন্দ্র উত্তর দিলে—অনেকটা বেড়েছে। বাড়ছে। আমাদের ধারণা স্ট্রেপ্টোককাস ইনফেকশন হয়েছে খুব বেশী। বিকেল পর্যন্ত গলায় ঘা দেখা দেবে। আপনি বলছেন—

—আমি বলছি—আমার আমলের চিকিৎসায় এ রোগের আক্রমণ যা প্রবল তাতে সারবার নয় ডাক্তারবাবু। আমি পারি না। আপনারা ভাগ্যবান—এ আমলে অদ্ভুত ওষুধের সাহায্য পেয়েছেন। যা করবার সময়ে করুন। ঝড়ের মতন আসছে রোগের বৃদ্ধি। টেকাতে পারলেন তো থাকল, নইলে—। আমার এই কথাটা বিশ্বাস করুন।

—আমি বিশ্বাস করি মশায়। আমি বিশ্বাস করি। প্রদ্যোত অবশ্য একটু উগ্র। ছেলেও ও ভালো ছিল আমার চেয়ে। আমি ওকে গিয়ে বলছি।

সাইকেল চেপে সে চলে গেল।

—কী হল গুরুদেব? আবার কী হল প্রদ্যোতের সঙ্গে?

মশায়ের ঘন পাকা ভুরু দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল।—শশী? এখনও রয়েছিস? আজ বাড়ি যা। আজ বাড়ি যা।

—বাড়ি যাব; এই বিনয়ের সঙ্গে যাব।

—বিনয় যাবে পরে। তুই যা। তোর কাজ তো হয়ে গিয়েছে।

বিনয় হেসে বললে—শশী ডাক্তার যাবে কী? সঙ্গ নইলে যেতে পারবে না। একা পথ হাঁটলেই ওর মা পাশে পাশে ফিরবে।

—কে?

—ওর মা গো! মরেও বেচারী ছেলের মায়া ভুলতে পারছে না। শশী কোথায় নালায় পড়বে, কোথায় কোন গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে—তাই সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। জিজ্ঞেস করুন না শশীকে!

শশী নাকি বলে—তার মরা-মা তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। তাকে পাহারা দেয়। লোক থাকলে অবশ্য থাকে না। কিন্তু শশী একলা পথ চললে তখনই বুঝতে পারে যে তার মাও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সে নাকি তার কথাও শুনতে পায়! পথ ভুল হলে, কি খানা-খন্দ থাকলে তাকে সাবধান করে দেয়—দেখিস পড়ে যাবি।

বিনয় হাসলে। জীবনমশায় কিন্তু হাসলেন না।

শশীর মাকে ওরা জানে না যে। তিনি জানেন। এমন মা আর হয় না। সন্তানকে স্নেহ করে না কোন মা? কিন্তু শশীর মায়ের মতো স্নেহ তিনি দেখেন নি।

শশীকে শুধু শশী বলে আশ মিটত না, বলতেন—শশীচাঁদ! আমার পাগল গো! একটু আধটু মদ খায়, নেশা করে—তা ধরে ফেলেছে—করবে কী বলো?

যৌবনে শশী দুর্দান্ত মাতাল হয়ে উঠেছিল। দেশে ম্যালেরিয়া লাগল। শশী চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির কম্পাউণ্ডার। চার আনা আট আনা ফী। কুইনিন আর ম্যাগসাল্‌ফ্‌ ওষুধ—ওই ডিসপেনসারি থেকেই নিয়ে আসে। রোজগার অনেক। তখন শশী চিকিৎসাও খারাপ করত না। ডিসপেনসারির কাজ সেরে শশী প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে বের হত। সর্বপ্রথম খেয়ে নিত আউন্স দুয়েক মদ। তার আগে ডিসপেনসারিতেও আউন্স দুয়েক হত। খেয়ে বোতলে জল মিশিয়ে রেখে দিত। জিনিসটা না থাকলে খানিকটা রেক্টিফায়েড স্পিরিটই জল মিশিয়ে খেত। রোগী দেখা শেষ করে শশী ফিরবার পথে ঢুকত সাহাদের দোকানে। তারপর শুয়ে পড়ত, হয় সেখানেই, নয় তো পথের ধারে কোনোখানে কোনো গাছতলায়। শশীর মা দাঁড়িয়ে থাকতেন বাড়ির গলির মুখে পথের ধারে। ক্রমে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে, শেষে এসে উঠতেন সাহাদের দোকানে। শশীর প্রতি স্নেহের কাছে লজ্জা তাঁর হার মানত। এসে ডাকতেন,

—সাহা!

—কে? মাঠাকরুন! এই, এই আছেন—শশীবাবু আছেন।

—একটু ডেকে চেতন করিয়ে দাও বাবা।

মায়ের ডাকে শশী টলতে টলতে উঠে আসত। মা নিয়ে আসতেন তার জামা হুঁকো কল্কে স্টেথোসকোপ! শশী বলত—ওগুলো নে।

বৈশাখের ঝাঁ-ঝাঁ-করা দুপুরে গামছা মাথায় দিয়ে শশীর মায়ের ছেলের সন্ধানে বের

হওয়ার একটি স্মৃতি তাঁর মনে আছে। জীবনমশায় কল থেকে ফিরছেন গোরুর গাড়িতে। পৃথিবী যেন পুড়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জনমানব নাই, জন্তু-জানোয়ার নাই, কাকপক্ষীর সাড়া নাই, অস্তিত্ব নাই। এরই মধ্যে শশীর গৌরবর্ণা মোটাসোটা মা আসছিলেন, মধ্যে মধ্যে দাঁড়াচ্ছিলেন, এদিক-ওদিক দেখছিলেন। সাহাদের দোকানে সেদিন ছেলের সন্ধান পান নি। সাহা বলেছে, 'শশীবাবু আজ বাইরে কোথা খেয়ে এসেছেন; দোকানে ঢোকেন নি। গিয়েছেন এই পথ ধরে।' মা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন: তাহলে নিশ্চয় রাস্তায় কোথাও পড়ে আছে।

পড়েই ছিল শশী, পথের ধারে একটা বটগাছতলার ছায়ায় শুয়ে বমি করে জামায় কাপড়ে মুখে মেখে পড়ে আছে; পাশে বসে একটা কুকুর পরম পরিতোষের সঙ্গে তার মুখ লেহন করে উদ্গীরিত মাদক-মেশানো খাদ্য খেয়ে মৌজ করছে। মা তাকে ডেকে তুলতে চেষ্টা করে তুলতে পারেন নি। জীবনমশায় তাঁর গাড়োয়ানকে দিয়ে শশীকে তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

মত্ত শশী উঠে, জীবনমশায়কে দেখে বলেছিল—কথাটা আজও মনে আছে জীবনমশায়ের; বলেছিল—মশায়বাবু গুরুদেব, চলে যান আপনি! মা ছুঁয়েছে—আমি ঠিক হয়ে গিয়েছি; আমার মায়ের একবিন্দু চোখের জল পৃথিবী ডুবিয়ে দিতে পারে মহাশয়! ইয়েস, পারে! আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের কথা স্মর! অ্যান্টিপোডাস ডাজ নট নো——অ্যান্টিপোডাস জানে না—আমার মায়ের একবিন্দু চোখের জল—!

জীবনমশায় ধমক দিয়ে বলেছিলেন—যা-যা, বাড়ি যা!

—যাব, নিশ্চয় যাব! নিজেই যাব! কারুর ধমক খাই না আমি।

খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার বলেছিল—হু ইজ টু অ্যাপ্রিসিয়েট মাই মেরিটস? মাই মাদার! মাই মাদার!

মা লজ্জিত হয়ে শুধু একটি কথাই বার বার বলেছিলেন—বাড়ি চল শশী। বাড়ি চল! বাড়ি চল!

সেই মা যদি মরণেও শশীর মতো ছেলের চিন্তা ছাড়তে না পেরে থাকেন তাতে—। আর পরলোক মিথ্যাই যদি হয়, তবে শশী, শশী তার মাকে ভুলতে না পেরে অসুস্থ মস্তিষ্কে যদি এমনি কল্পনা রচনা করে থাকে, অসুস্থ দৃষ্টিতে যদি মায়াকে কায়া ধরতে দেখে থাকে তবে আশ্চর্য কি?

কত রাত্রে তিনি আতর-বউকে দেখেন—বনবিহারীর ঘরে গিয়ে উঁকি মারছেন। তিনি নিজে? কখনো কখনো চেয়েছেন বই কি!

এই অতসীর ছেলেটি যদি—।

মশায় বললেন—কাল, কাল আসিস বিনয়। কাল। কাল। ছত্রিশ ঘণ্টার আঠারো ঘণ্টা গিয়েছে। আরও আঠারো ঘণ্টা। ঠিক মধ্যস্থলে।

কে আসছে? অহি?

জ্বর বাড়ছে কাকা। ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। ফুলো বাড়ছে। মুখখানা এমন ফুলেছে

—অহির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।—আপনি একবার—

—না। তুমি ডাক্তারের কাছে যাও। যদি পারে তো ওরাই পারবে বাঁচাতে। আমি জানি না। আমাদের আমলে এ ছিল না।

আটাশ

বাঁচালে। তাই বাঁচালে প্রদ্যোত ডাক্তার। ধীর অথচ সাহসী, নিজের শাস্ত্রে বিশ্বাসী নির্ভীক তরুণ চিকিৎসক।

তখন বেলা দুটো। মশায় খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে উপরের ঘরে এসে গড়িয়েছেন, অহীন সরকার ছুটে এল—মশায়কাকা! কাকা!

—কে? অহীন? গলা শুনেই চিনেছিলেন মশায়। ঝড় তাহলে এসেছে! শায়িত অবস্থাতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। পারলেন না কিছু করতে প্রদ্যোত? নতুন ওষুধ, যার এত নাম—কিছু হল না তাতে?

—একবার আসুন কাকা!

—কী হল?

—বুঝতে পারছি না। প্রবল জ্বর। ফোলা এমন বেড়েছে যে দেখে ভয় লাগছে। ছেলের সাড়া নাই। বেঘোর। আপনি একবার আসুন!

—উনি গিয়ে কী করবেন বাবা? পাশকরা ডাক্তারও নয়, আজকালকার চিকিৎসাও জানেন না! হাতুড়ে। তার ওপর উনি গেলে তোমাদের নতুন ডাক্তার যদি বলে—হাত ধরব না, দেখব না? মধুর অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথাগুলি বলতে বলতেই বেরিয়ে এলেন আতর-বউ। তার ওপর তোমার জামাই হালফ্যাশানে লেখাপড়া-জানা ছেলে!

—চুপ করো আতর-বউ। ছি! চলো—আমি যাই অহীন।

—চুপ করব? ছি! আতর-বউ বিস্মিত হয়ে রইলেন স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে।

—হ্যাঁ, চুপ করবে বই কি।

বলতে বলতেই বেরিয়ে গেলেন মশায়। আতর-বউয়ের কথার দিকে কান দিলে চলবে না এখন।

স্তব্ধ উৎকণ্ঠায় ঘরখানা যেন নিশীথ রাত্রির মতো গাঢ় হয়ে উঠেছে। ব্যাধির প্রবল আক্রমণে শিশু চৈতন্যহীন—স্তিমিত দৃষ্টি, নিথর হয়ে পড়ে আছে। শুধু জ্বরজর্জর ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ছেলেটির বুক পেট উঠছে নামছে; যেন হাঁফাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে অস্ফুট কাতর শব্দ নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। মুখের ফোলার অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন মশায়। এদিকে বুকের উপর পর্যন্ত চলে এসেছে, ওদিকে দুই কর্ণমূল পার হয়ে পিছনের দিকে ঘাড় লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে। চামড়ার নিচেটা যেন রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে।

ঘরের লোকগুলির মুখে ভাষা নাই, উৎকণ্ঠায় ভয়ে ভাষা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, নিষ্পলক আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। নিশীথ আকাশের তারার মতো জেগে রয়েছে। অসহায় গ্রহ-উপগ্রহ সব—অসহায়; তারা তাকিয়ে দেখছে একটি নবজাত গ্রহ বিচিত্র কারণে নিভে যাচ্ছে।

মশায় এসে দাঁড়ালেন বিছানার পাশে। সন্তর্পণে বসে হাতখানি তুলে দিলেন। অহীন বললে—চার। আপনাকে ডাকতে যাবার আগে দেখেছি। প্রদ্যোত ডাক্তারের বন্ধু অরুণবাবু যখন রক্ত নিয়ে গেলেন তখন ছিল তিন, তিনের কিছু কম ছিল। তারপর দেড়টার সময় বেহুঁশ—ডাকে সাড়া দেয় না দেখে জ্বর লেখা হল—একশো তিন পয়েন্ট দুই। দুটোর সময় প্রায় চার। দু পয়েন্ট কম। তারপর চার দেখে আপনার কাছে গিয়েছিলাম।

হাতখানি নামিয়ে দিলেন মশায়, বললেন—ডাক্তারের কাছে কাউকে পাঠিয়েছ?

—জামাই নিজে ছুটে গিয়েছে।

—তিনি আসুন। তিনি ওষুধ দেবেন।

—আপনি কিছু মুষ্টিযোগ—

—আমার মুষ্টিযোগ কাজ করতে করতে রোগ হাতের বাইরে চলে যাবে বাবা। রোগ রক্তে। ইনজেকশন রক্তে কাজ করবে। তিনি আসুন।

—মশায়দাদু, আমার খোকন— ?

—ভয় কি ভাই? ডাক্তার আসুন। ওষুধ দেবেন। এখন ঝড় উঠেছে দিদি। শক্ত হয়ে হাল ধরে বোসো। ভয় কী? নিষ্পাপ শিশু, বালাধাত; ওষুধ পড়বামাত্র ধরবে। বাইরে বেরিয়ে এসে মশায় বললেন—জ্বর আরও বেড়েছে অহীন—চারের ওপর। এখনও বাড়বে।

—বাড়বে?

—বাড়ছে—এই যে ডাক্তারবাবু এসে গিয়েছেন।

প্রদ্যোতকে নিয়ে এসে পৌঁছল অহীনের জামাই। অহীন বলে উঠল, জ্বর আরও বেড়েছে বাবা। কাকা বলছেন—হাত দেখেছেন—

ডাক্তার ভিতরে চলে গেল বিনা বাক্যব্যয়ে। মশায়ের হাত দেখায় সে অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হল।

মশায় ক্ষুণ্ণ হলেন না। ভিতরেও গেলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন। রোগী এখানে শিশু। তার জীবনের কোনো ত্রুটিতে মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ নাই। এই মৃত্যুই অকালমৃত্যু। এমন মৃত্যু দেখেছেন অনেক। কিন্তু সেখানে যুদ্ধ করেছেন প্রতিপক্ষ হিসেবে। আজ দেখছেন। ব্যাধির সঙ্গে নয়, এ যুদ্ধ মৃত্যুর সঙ্গে, রোগীর খুব কাছে এসে সে দাঁড়িয়েছে, শিয়রে নয়তো পাশে, নয়তো পায়ের তলায়, হয়তো মায়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধ, বধির, পিঙ্গলকেশী!

ব্যস্তভাবে কে বেরিয়ে এল। কে? অহি সরকারের ছেলে। একখানা বাইসিকেল টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। পিছনে এল ডাক্তার নিজে—চীৎকার করে বললে—বলবে, আমি বসে রয়েছি একুনি আসেন যেন!

—ডাক্তারবাবু? মশায় ডাকলেন।

—বলুন।

—কেমন দেখলেন? আমি ছেলেটিকে ভালোবাসি ডাক্তারবাবু।

—আপনি তো নিজে দেখেছেন। প্রদ্যোত একটু হাসলে।—আপনি যা দেখেছেন ঠিকই দেখেছেন, জ্বর বেড়েছে। সাড়ে চারের কাছে।

—কী বুঝছেন?

একটু চুপ করে থেকে প্রদ্যোত বললে—চারুবাবুকে কল দিয়ে পাঠালাম। ওঁর সঙ্গে একটু পরামর্শ করব। আমার একটু ধাঁধা লাগছে। স্ট্রেপ্টোককাসে তো সাধারণত এমনভাবে ফোলে না! এত জ্বর! ভাবছি মামস্ নয় তো?

—মামস্ নয় ডাক্তারবাবু। সেটা আমি আপনাকে বলছি। রোগীর রক্ত বিষাক্ত হয়েছে। বেশী সময় নেই ডাক্তারবাবু, যা করবার এখুনি করুন।

—তা হলে কী বলছেন? সেলুলাইটিস? ইরিসিপ্লাস? বাঁচবে না বলছেন?

—নিদান হাঁকার দুর্নাম আমার আছে। হাসলেন মশায়—কিন্তু না। সে কথা বলছি না আমি। নাড়ীতে এখনও পাই নি। রোগ কখনও গোড়া থেকেই আসে মৃত্যুকে নিয়ে। কখনও রোগ বিস্তারলাভ করে মৃত্যু ঘটায়। আপনি আপনার ওষুধ দিন, মাত্রা দ্বিগুণ করুন। রোগ হু-হু করে বাড়ছে।

—বলছেন দেব পেনিসিলিন? আট ঘণ্টা অবশ্য পার হয়ে গেছে। চিন্তিত মুখে ঘরের মধ্যে চলে গেল প্রদ্যোত ডাক্তার। আবার বেরিয়ে এল। নিজের সাইকেলটা তুলে নিয়ে চলে গেল। বলে গেল—আসছি। পেনিসিলিন নিয়ে আসছি আমি। পাঁচ লাখ চাই। আড়াই লাখ আছে আমার কাছে।

বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মশায় প্রদ্যোতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চারুবাবু আসবার আগেই প্রদ্যোত পাঁচ লাখ পেনিসিলিন দিয়ে বেরিয়ে এল। খাবার ওষুধ তৈরি করতে লাগল। বসে রইল স্তব্ধ হয়ে রোগীর দিকে চেয়ে।

চারুবাবু এলেন। তখন জ্বর একশো চার পয়েন্ট ছয়—বললেন—তাই তো! মাম্‌স্ বলছেন?

—না—সেলুলাইটিস কি—

চোখ বিস্ফারিত করে তাকালেন চারুবাবু। বুঝেছেন তিনি। মশায় দেখেছেন নাকি?

—দেখেছেন। আমি পাঁচ লাখ পেনিসিলিন দিয়েছি।

—দিয়েছেন? তাই দিন। থাকলে ওতেই থাকবে। মশায় কই?

মশায় গিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ বসে আবার নাড়ীটা ধরলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখলেন। ঝড়ের শেষের কিছু পূর্বে যেমন আলোর আভা ফুটে ওঠে বর্ষামুখর ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে—তেমনি যেন মনে হচ্ছে ঝড়ের ঊর্ধ্বগতিতে এখনকার মতো ছেদ পড়ল। জ্বর কমবে এবার। মৃত্যু সরে যাচ্ছে—পায়ে পায়ে পিছনে হটে গেল খানিকটা। আবার

রাত্রি তিনটে-চারটের সময় একবার আসবে।

বেরিয়ে এলেন মশায়। চারুবাবু চলে গিয়েছিলেন। প্রদ্যোত ব্যাগ গোছাচ্ছে। মশায় বললেন—জ্বর বাঁধ মেনেছে ডাক্তারবাবু। এবার কমবে।

—কমবে?

—হ্যাঁ। নাড়ী দেখে এলাম।

—থার্মোমিটার দিয়েছিলেন?

—না। আরও আধঘণ্টা পর দেখবেন। এখন থার্মোমিটারে ধরা যাবে না।

তাই কমল। পাঁচটার সময় জ্বর উঠল তিন পয়েণ্ট ছয়। রোগী চোখ মেললে। কথা কইলে। রোগীর চোখে পলক পড়ল, তাবার মুখরতা ফুটল দৃষ্টিতে।

জীবনমশায় তাকিয়ে রইলেন—রক্তাভ স্ফীতির পরিধির দিকে। পুঞ্জীভূত মেঘের মতো ব্যাধির বিষজর্জরতা জমে রয়েছে, জ্বরের বায়ুবেগ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়েছে। মৃত্যু এখনও ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো ওই কোণে। শিশুটির দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন—ভয় নাই। চৈতন্য ফিরেছে—কথা বলছে, হাসছে কখনও কখনও, চৈতন্য স্তিমিত হলে আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকবে। বাঁচাও বলে চেঁচাবে না, কাঁদবে না। শেষ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যাবে, নিস্তরঙ্গ, স্থির হয়ে যাবে প্রশান্তির মধ্যে।

একটা ভারী গলার আহ্বানে মশায়ের চমক ভাঙল।—মশায় আছেন? মশায়! ভারী দরাজ গলা, কিন্তু ক্লান্ত। ও! রানা পাঠক। রানার টি-বি হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে নয়, তাই-ই বটে। সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজ এই রাত্রে? বেরিয়ে এলেন মশায়। রানাই বটে।

—কী বাবা রানা? এত রাত্রে?

—আর পারছি না মশায়। অনেক জায়গা ঘুরে এলাম। আপনি বলেছিলেন—

—পারুলেতে কবরেজদের কাছে যেতে, তাও গিয়েছিলাম। কিন্তু পোষাল না। কোথাও টাকা, কোথাও কিছু। মন লাগল না। শেষ আপনার কাছেই ফিরলাম।

আরোগ্য-নিকেতনের ভিতরে আলো জ্বলছিল। সেতাব বসেছিল আপন মনে ছকে গুটি সাজিয়ে, একাই দু পক্ষের হয়ে চাল চালছিল। ঘরে ঢুকে রানা একখানা পুরনো চেয়ারে বসতে গিয়ে নেড়ে দেখে বললে—ভাঙবে না তো? যক্ষ্মা রোগে ধরলেও আমি তো রানা পাঠক! ওজন আড়াই মণ! হাসলে সে।

—ওটাও শালবৃক্ষের সার বাবা রানা।

কপালে হাত দিয়ে রানা বললে—আমি রানা পাঠক, আমিও নিজেকে দৈত্যি মনে করতাম গো! বুক ঠুকে চেঁচিয়ে বলেছি, আশি বছরেও পাকা তাল কাঠের মতো সোজা থাকব, হাতির মতো গণ্ডারের মতো হাঁটব। সোজা চলে যাব দশ-বিশ ক্রোশ! তা—। হতাশার হাসি ফুটে উঠল মুখে, ঘাড় নেড়ে আক্ষেপ করে বললে—পাকা তালেও ঘুন ধরে,

পচ ধরে মশায়।

আশ্বাস দিয়ে বললেন—চিকিৎসা করাও বাবা, নিয়ম করো, ভালো হয়ে যাবে, ভয় কী।

—ভয়! হতাশার হাসির একটি বিশীর্ণ রেখা রানার মুখে লেগেই ছিল, সেই হাসির চেহারাটা পালটে গেল মুহূর্তে। এ হাসি সাধারণ লোকে হাসতে পারে না। এ রানারাই পারে। অনেককাল আগে—এক ভালুকওয়ালা এসেছিল প্রকাণ্ড বড় ভালুক নিয়ে; সে নিজে ভালুকের সঙ্গে কুস্তি করত। রানা তখন বছর বিশেকের জোয়ান। সে বলেছিল—আমি লড়ব তোমারা ভালুকাকা সাথ। মারেগা, কামড়ায়ে গা—আঁচড়ায়ে রক্তারক্তি করে গা তো তোমারা কুছ দায় নেহি। এবং মালসাট মেরে এই হাসি হেসে বলেছিল—আওরে বেটা বনকা ভালুকা, আও; চলে আও জঙ্গী জোয়ান! এবং দন্তী ও নখী বিপুলকায় জানোয়ারটাকে পরাভূত করেছিল সে। নিজেও জখম হয়েছিল কিন্তু তাতে তার এ হাসি মিলিয়ে যায় নি।

ভয়? রানা বললে—না—না না মশায়, ভয় নয়।

বাইরে বাইসিকেলের ঘণ্টা বেজে উঠল। কে? মশায় চকিত হলেন। আবার প্রদ্যোত ডাক্তার এল? কেন? এখন তো আসবার কথা নয়?

রানা বলে গেল—ভয় নয় মশায়। ছেলেগুলা ছোট। অসময়ে যাব? বহুরঙের বহুরসের সংসারে এলাম—রঙ্গরস ভোগ করতে পেলাম না! আর যাব যাব—একটা পাপ করে তারই ফলে পাপীর মতো যাব? এই আর কি! এখুনি পথে মতে কামারের দরজায় মতের মা-বুড়ীকে তাই বললাম।

—মতির মা ফিরে এল? মশায় ঈষৎ চকিত হয়ে উঠলেন।

পথের দিকে নিবদ্ধ তাঁর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি রানার মুখের উপর ফিরল। একটা যেন ঝাঁকি খেলেন তিনি। ঘরে ঢুকল বিনয়; বললে—হ্যাঁ এল। দেখে এলাম।

রানা বললে—একটা পা সাদামতো কী দিয়ে ব্যাণ্ডেজের কাপড় লেপন দিয়ে বেঁধে রেখেছে। গোরুর গাড়ি থেকে মতি আর মতির বেটা ধরাধরি করে নামাচ্ছে। আমি মশায় দেখে থমকে দাঁড়ালাম। বললাম—তা তুই একটা রঙ্গ দেখালি মতির মা! তা ভালো। বুড়ী বললে—তা রঙ্গ বটে ঠাকুর। সে কী কাণ্ডকারখানা। কী ঘর-দুয়োর, কী আলো, কী ব্যবস্থা, কী চিকিচ্ছে। কাটলে কুটলে—তো জানতে নারলাম। তা-পরেতে দিন কতক কষ্ট বটে। শুয়ে শুয়ে মল-মূত্র ত্যাগ। তবে যত্ন বটে, ফুটফুটে টুকটুকে ভদ্র-ঘরের মেয়ে ধবধবে পোশাক পরে, মাথায় টুপি দিয়ে—ওষুধ খাইয়ে দেওয়া, পথ্যি দেওয়া, মুখ মুছিয়ে নেওয়া—বাবা, বলব কী—ময়লা মাটির পাত্তর সরানো—সব করছে! আর ডাক্তার কী সব? মশায় তো আমার নিদেন হেঁকে দিয়েছিল—তা দেখো বাবা ফিরে এসেছি। বলেছে মাস তিনেক পরে এই সব খুলে দেবে—তার পরে এক মাস মালিস—তার পরে পা ফিরে পাব। আমি বললাম—আর কী পেলি মতির মা? অমর বর পেলি না?

'গা মতে কামার রেগে উঠল, বললে—যাও ঠাকুর, যাও। নিজে তো বাঁচবার জন্তে পথে পথে এর কাছে ওর কাছে ঘুরছ—এ দেবতা ও দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ছ! বললাম—মতে, তোর মায়ের বয়েস হলে কি রানা বাঁচতে চাইত রে? আমার ছেলে ছুটো নেহাত নাবালক, একটা কষ্টে আছে,—আর আমার দাদা রাঘব বোয়াল, আমি না থাকলে সব গিলে খেয়ে দেবে। বুঝলি? নইলে রানার মরতে ভয় নাই। কতবার মরণের সঙ্গে লড়েছি। বন্তেতে ভেসে-যাওয়া লোক মরণের মুখ থেকে এনেছি। জিতেছি। একবার না হয় হারব। তাতে কী?

জীবনমশায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, কথাগুলি শুনছেন বলেও মনে হল না। মাটির মূর্তির মতো নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেছেন তিনি।

তাঁর মনে পড়ে গেল প্রদ্যোত ডাক্তারের আজকের চেহারা। ধীর নির্ভীক চিন্তাকুল দৃষ্টি, তাতে ইনজেকশনের সিরিঞ্জে স্পিরিট ভরে ধুচ্ছেন। মধ্যে মধ্যে রোগীর দিকে তাকিয়ে দেখছেন। চিবুক, ঠোঁটের রেখায় দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ফুটে রয়েছে।

বিনয় বললে—দাঁড়ান, তিন মাস কেটেছে, এখনও তিন মাস বাকি। ছ মাসের মেয়াদ দিয়েছিলেন মশায়।

—না। ঘাড় নেড়ে মশায় বললেন—মতির মা বাঁচবে।

—তা বাঁচুক। রাবণের মা নিকষা হয়ে বেঁচে থাকুক।

—নারায়ণ! নারায়ণ! বলে উঠলেন মশায়। যেন সমস্ত পরিবেশটা অশুচি অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।—থাক ও কথা।

—থাকুক। কিন্তু আপনি আমার চিকিৎসা করুন। বাঁচি বাঁচি, না বাঁচি না বাঁচি। মরণে আমার ভয় নাই। নিন্দেও আমি করব না। বিনয় আমাকে দয়া করেছে, বলেছে ওষুধ যা লাগে ও দেবে; আপনি চিকিৎসা করুন। আমি শুনলাম, বিনয় আজই বললে—হাটকুড়ো কাহারের ছেলে পরানের মুখ দিয়ে ঝলক ঝলক রক্ত উঠত, আপনি তাকে সারিয়েছিলেন।

মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ তিনি সারিয়েছিলেন—কিন্তু সে এ কালরোগ নয়।

বিনয় বললে—আপনি দেখুন মশায়। ব্রাহ্মণকে বাঁচান।

—ওষুধই যখন তুই দিবি তখন প্রদ্যোত ডাক্তারকে দেখানো ভালো। ভালো চিকিৎসক, ধীর চিকিৎসক; আজ আমি দেখলাম।

—উঁহু; আপনি দেখুন। আপনি বাঁচান রাণা ঠাকুরকে। রামহরিকে বাঁচিয়েছেন। আর একটা চিকিৎসা দেখিয়ে দেন। শুধু তাই নয় মশায়, সকালবেলা আপনি শোনেন নি আমার কথা। বলেছিলেন—কাল। তা রাবন ঠাকুর আমাকে আজই আবার নিয়ে এল আপনার কাছে। আপনাকে আমার ডাক্তারখানায় একবেলা করে বসতে হবে। ডাক্তারেরা নতুন ডাক্তারখানা করে আমাকে মারবার চেষ্টা করছে। আপনি আমাকে বাঁচান।

মশায় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বিনয়ের মুখের দিকে।

—মশায়!

—কাল। কাল বলব। আজ নয়। কাল। রানা তোমাকেও কাল বলব। আজ নয়। অহি সরকারের নাতিই আজ সব ভাবনা জুড়ে রয়েছে। কাল এসো।

—দেখছে তো প্রদ্যোত ডাক্তার। বারো লাখ পেনিসিলিন দিয়েছে আজ। বাঁচাবই বলে খুব হাঁক মেরেছে বুঝি?

—বিনয়, কাল। কাল। আজ আর কথা বলিস নে বাবা। মশায় উঠে পড়লেন। এরা কি সবাই ভাবে মশায় মৃত্যুঘোষণা ছাড়া আর কিছু করে না! ওতেই তাঁর আনন্দ?

সেতাব আপন মনে একলাই দাবা খেলে যাচ্ছিল, সেও সব গুটিয়ে নিয়ে উঠল। —আমিও আজ চললাম রে।

—যা। মন আজ আমার ওইখানে পড়ে আছে। খেলায় বসবে না। লড়াই চলছে, বুঝছিস না?

সত্যই লড়াই। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই। তিনিও জীবনে বহুবার করেছেন। হারলে অগৌরব নাই। কিন্তু বেদনা আছে। বিশেষ করে অতসীর ছেলেটির মতো ক্ষেত্রে। টং শব্দে ক্লক ঘড়িতে একটা বাজল। প্রদ্যোত ডাক্তার সিরিঞ্জ পূর্ণ করে ঠিক করে রেখেছে। সে উঠে দাঁড়াল। ঠিক সাড়ে বারোটায় সে এসেছে। ইনজেকশন শেষ করে সিরিঞ্জ ধুয়ে মুখ তুলে চাইলে। মশায় নাড়ী ধরে বসেছেন তখন। চোখ বুজে বসে রয়েছেন।

প্রদ্যোত বললে—আমার যা করবার করে গেলাম। সকালে ঠিক সময়ে আসব আমি। রোগীকে কিন্তু ঘুমুতে দিন। নাড়াচাড়া করবেন না।

চলে গেল সে। মশায় আরও কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে চাইলেন, চাইলেন দরজার দিকে। সরে যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বললেন—ভালো আছে।

কীর্তিমান যোদ্ধা প্রদ্যোত ডাক্তার। এ যুগের আবিষ্কার বিচিত্র বিস্ময়কর! আর না। তাঁর কাল গত হয়েছে। আর না। কালকের সংকল্পটা মনে মনে দৃঢ় করলেন তিনি। আর না।

ঊনত্রিশ

'আর না' বলে আরও একবার তিনি চিকিৎসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বনবিহারীর মৃত্যুর পর। তখন ভেবেছিলেন—আর কেন? পূর্ণাহুতি তো হয়ে গেল! কেউ ডাকতে এলে বলতেন 'ভেবে নিয়ো মশায় মরে গেছে।' শোক-দুঃখ কতটা তা ঠিক তিনি আজও বলতে পারেন না; তিনি চিকিৎসক, মহাশয় বংশের শিক্ষা, ভাবনা তাঁর মধ্যে, মৃত্যু অনিবার্য এ কথাও তিনি জানেন এবং শোকও চিরস্থায়ী নয় এও জানেন। জীবনের চারিদিকে ছ'টা রসের ছড়াছড়ি; আকাশে বাতাসে ধরিত্রীর অঙ্গে ছয় ঋতুর খেলা; পৃথিবীর মাটির কণায় কণায় যেমন উত্তাপ

এবং জলের তৃষ্ণা, জীবের জীবনেও তেমনি দেহের কোষে কোষে রঙ ও রসের কামনা। ও না হলেও সে বাঁচে না। মানুষের মনে মনে আনন্দের ক্ষুধা। শোক থাকবে কেন, থাকবে কোথায় ? শোকের জন্য নয়, আক্ষেপে ক্ষোভেও নয়, অন্য কারণে ছেড়েছিলেন। প্রথম কারণ জীবনের সব কল্পনা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

বনবিহারীর মৃত্যুর পরই বনবিহারীর স্ত্রী একমাত্র শিশুপুত্রটিকে নিয়ে চলে গেল পিত্রালয়ে। গেল প্রথমটায় কিছুদিন পর ফিরবে বলে। বন্ধুর স্ত্রী মা-বাপের একমাত্র সন্তান, বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। মা-বাপ নিয়ে গেলেন সমাদরের সুখে বৈধব্যের দুঃখ প্রশমিত করে দেবেন বলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুদিন পরই লিখে পাঠালেন—"মনো এবং খোকা এখানেই থাক। আমাদের তো আর কেহ নাই ; ওই একমাত্র সম্বল। আপনাদের মেয়েরা আছে, দৌহিত্রেরা আছে। আমাদের কে আছে ? অবশ্য ক্রিয়াকর্মে যাইবে। আপনাদের দেখিতে ইচ্ছা হইলে যখন খুশি আসিয়া দেখিয়া যাইবেন। ইহা ছাড়াও মনোর ওখানে যাইতে দারুণ আশঙ্কা। তাহার ভয়—ওখানে থাকিলে খোকনও বাঁচিবে না। কিছু মনে করিবেন না, সে বলে—সেখানে রোগ হইলে আরোগ্যের কথা ভুলিয়া মৃত্যুদিন গণনা করা হয়, সেখানে আয়ু থাকিতেও মানুষ মরিয়া যায়।"

এ ছাড়াও আতর-বউ সম্পর্কে অভিযোগ ছিল। "তাঁর কঠোর তিরস্কার কাহারও পক্ষেই সহ্য করা সম্ভবপর নয়।" ইত্যাদি।

সুতরাং আর অর্থ, প্রতিষ্ঠা অর্জন কেন, কিসের জন্য ?

দ্বিতীয় কারণ, মনকে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন কুলধর্ম ও পিতৃনির্দেশ অনুযায়ী পরমানন্দ মাধবের পায়ে। কিন্তু সেও পারেন নি। তার পরিবর্তে ভাবতেন নিজের জীবনের কথা আর ভাবতেন মৃত্যুর কথা। পরলোকতত্ত্ব চিকিৎসাতত্ত্ব সব তত্ত্ব দিয়ে এই অনাবিষ্কৃত মহাতত্ত্বকে বুঝবার চেষ্টা করতেন। কত রকম মনে হয়েছে। আরোগ্য-নিকেতনের পাশের ঘরখানায় চুপ করে বসে থাকতেন। বাড়ির ভিতরে ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদত আতর-বউ। গভীর রাত্রে উঠে গিয়ে বন্ধুর ঘরে বারান্দায় ঘুরে বেড়াত। কখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। প্রত্যাশা করত এত অতৃপ্তি এত বাঁচবার কামনা নিয়ে যে বন্ধু মরেছে, মরবার সময় 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে কেঁদেছে, সে কি গভীর রাত্রের নির্জনতার অবসরে ছায়াশরীর নিয়ে সবকিছুকে ছোঁবার জন্য, পাবার জন্য আসবে না ? তিনি নিজেও মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ভাবতেন—দেখা যদি দেয় বন্ধু তবে প্রশ্ন করবেন—মৃত্যু কী ? মৃত্যু কেমন ? কী রূপ ? কেমন স্পর্শ ? কেমন স্বাদ ? বন্ধু কাঁদল। ভুবন রায় ধীরভাবে হিসেব-নিকেশ চোকালেন। গণেশ বায়েন পরমানন্দে জীবন-মহোৎসব করলে। এই বিচিত্র-রূপিণী বহুরূপার আসল পরিচয়টি কী ?

দীর্ঘ পাঁচ বছর—তাঁর জীবনে আর কেউ ছিল না, কিছু ছিল না। নিজের নাড়ী পরীক্ষা করতেন। কিন্তু কোনো কূলকিনারা পান নি। মধ্যে মধ্যে গ্রামের কারুর জীবনমৃত্যুর যুদ্ধে আত্মীয়েরা এসে ডাকত—একবার ! একবার চলুন !

গিয়েছেন। চিন্তার মধ্যে যাকে ধরতে পারেন নি, ছুঁতে পারেন নি, যার ধ্বনি শোনেন নি, নাড়ী ধরে তার স্পষ্ট অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। তখন মনে হত, তাকে জানতে হলে তাঁর এই পথ।

তারপর একদিন গেলেন তীর্থভ্রমণে। মৃত্যুর কোনো সন্ধান না পেয়ে আবার খুঁজতে গেলেন, পরমানন্দ মাধবকে। গয়ায় বন্ধুকে নিজ হাতে পিণ্ড দিয়ে সরাসরি গেলেন বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে বন্ধুর আত্মার জন্য শান্তি প্রার্থনা করে মন্দিরপ্রাঙ্গণে একখানি মার্বেল পাথর বসিয়ে দিলেন। অন্য একখানা মার্বেল পাথর দেখে কথাটা মনে হয়েছিল। অনেক পাথরের মধ্যে চোখে পড়ল। প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন তিনি।

"কাঁদী-নিবাসী ৺ভূপেন্দ্র সিংহের আত্মার
শান্তির জন্য—
হে গোবিন্দ দয়া করো, চরণে স্থান দাও।
মঞ্জরী দাসী।"

তীর্থ থেকে ফিরে নবগ্রাম স্টেশনে নামলেন; দেখা হল কিশোরের সঙ্গে। কিশোর তখন প্রদীপ্তললাট যুবা। পাঁচ বৎসরই কিশোরকে দেখেন নি মশায়। তিনি নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন ঘরে, কিশোরকে আবদ্ধ রেখেছিল গভর্নমেণ্ট, রাজা।

কিশোর সবিস্ময়ে বলেছিল—মশায়!

তিনিও সবিস্ময়ে বলেছিলেন—কিশোর!

—এই নামছেন আপনি?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি ছাড়া পেলে কবে? ওঃ, কত বড় হয়ে গিয়েছ তুমি!

হেসে কিশোর বলেছিল—তা হয়েছি। আর ক্ষীর চাঁচি ছানা চুরি করে খাই না।

—সে বুঝতে পারছি। মশায় বলেছিলেন হেসে—অবসর কোথায়? রুচিই বা থাকবে কী করে? এখন প্রভু কংসারির সঙ্গে ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রাখবার পথে সঙ্গীর সাজে সেজেছ যে!

কিশোর একটু লজ্জিত হয়েছিল এমন মহৎ পরিচয়ের ব্যাখ্যায়। পরক্ষণে সে লজ্জাকে সরিয়ে ফেলে সহজভাবে বলেছিল—আপনাকে যে কত মনে মনে ডাকছি এ কদিন কী বলব? আপনি এসেছেন—বাঁচলাম।

—কেন কিশোর? কিসে তোমাকে এমন মরণের ভয়ে অভিভূত করেছিল? মরণের ভয় তো তোমার থাকবার নয়!

—কলেরা আরম্ভ হয়েছে মশায়। নিজের মৃত্যুকে ভয়ের কথা তো নয়; মানুষের মৃত্যু দেখে—মানুষের ভয় দেখে ভয় পাচ্ছি। জানেন তো, ডাক্তারেরা কলেরা কেসে যেতে চান না, গেলে ফী ডবল। চারুবাবুর ফী ছ টাকা—আট টাকা। চক্রধারীর ফী চার টাকা। আমি হোমিওপ্যাথিক একটু-আধটু দি, কিন্তু ভালো তো জানি না। আপনি এলেন—এবার বাঁচলাম। আমাদের ছেলেবেলায় যখন কলেরা হয়েছিল তখন আপনিই

গরিব-দুঃখীদের দেখেছিলেন। আজও যে আপনি না হলে উপায় নেই মশায়।

তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারেন নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে ছিলেন কিছুক্ষণ। সেই পুরানো কালের—উনিশশো পাঁচ সালের মহামারীর কথা মনে পড়েছিল। সেই অন্ধ বধির পিঙ্গলকেশিনী দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে; মহাকালের ডমরুতে বেজেছে তাণ্ডব বাদ্য—তারই তালে তালে উন্মত্ত নৃত্যে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছে সব মৃত্যুভয়ভীত মানুষ, আগুনলাগা বনের পশুপক্ষীর মতো আর্ত কলরব করে ছুটে পালাচ্ছে। ছুটে পালাচ্ছে—পিছনের লেলিহান শিখা বাতাসের ঝাপটায় মুহূর্তে নুয়ে দীর্ঘায়ত হয়ে তাকে গ্রাস করছে—আকাশে পাখি উড়ে পালাচ্ছে—আগুনের শিখা লকলক জিহ্বা প্রসারিত করে তাকে আকর্ষণ করছে—পাখির পাখা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে—অসহায়ের মতো পড়ছে আগুনের মধ্যে। মহামারীর স্মৃতি তাঁর ঠিক তেমনি।

কিশোর বলেছিল—মশায়!

—কিশোর!

—আপনি চলুন, চলুন আপনি।

—আমি পারব? আমার কি আর সে শক্তি, সে উৎসাহ আছে কিশোর?

কিশোর বলেছিল—এই কথা আপনি বলছেন? মশায়ের বংশের মশায় আপনি।

কিশোরের কথায় মনে পড়েছিল বাবার কথা। গুরু রঙলালের কথাও মনে হয়েছিল। পরমুহূর্তেই তিনি বলেছিলেন—বেশ, যাব। তুমি ডাক দিলে—নিলাম সে ডাক।

সেইবার কলেরার সময় ইনট্রাভেনাস স্যালাইন ইনজেকশন দেখেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে মেডিক্যাল ভলান্টিয়ার্স এসে উপস্থিত হয়েছিল। একদল সোনার চাঁদ ছেলে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে এল লোকজন। স্যানিটারি ইনস্পেক্টার। আর একদল এল, কী নাম যেন তাদের? কোদালি ব্রিগেড! কোদাল ঘাড়ে করে এল শিক্ষিত যুবকেরা।

শুকনো পুকুরের তলায় কুয়ো কেটে তারা জল বের করলে। তাই তো! কথাটা তো কারুর মনে হয় নি! স্যানিটারি ইনসপেক্টারেরা পুকুরে পুকুরে ব্লিচিং পাউডার গুলে দিয়ে জলকে শোধন করলে। অ্যান্টি-কলেরা ভ্যাকসিন ইনজেকশন দিলে। কলেরার টিকে!

সব থেকে বিস্মিত হয়েছিলেন—স্যালাইন ইনজেকশন দেখে।

অবিনাশ বাউড়ীর বউ—সত্যকারের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, সকালে সে এসে ভদ্রপাড়ার বাসন মেজে ঘরদোর পরিষ্কার করে ঝিয়ের কাজ করে গেল তাঁর চোখের সামনে। দুপুরে শুনলেন তার কলেরা হয়েছে। বিকেলে গিয়ে দেখলেন সেই স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়েটার সর্বাঙ্গে কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে; একগাছা ঝাঁটার মতো কঙ্কালসার দেহের সকল রস কে যেন নিঙড়ে বের করে দিয়েছে। দেখে শিউরে উঠলেন তিনি। মৃত্যুর ছায়া পড়েছে সর্বাঙ্গে। নাড়ী নাই, হাতের তালু পায়ের তলা বিবর্ণ পাণ্ডুর, হাত-পা কনুই পর্যন্ত হিমশীতল।

তরুণ দুটি ডাক্তার তখন তাঁদের দলে এসে যোগ দিয়েছে। চোখে তাদের স্বপ্ন, বুকে তাদের অসম্ভব প্রত্যাশা, ওই কিশোরের জাতের ছেলে। তারা বললে—স্যালাইন দেব একে। বের করলে স্যালাইনের বাক্স।

এ রোগী বাঁচে না একথা মশায় জানতেন, কিন্তু বাধা দেন নি। দাঁড়িয়ে দেখলেন, লক্ষ্য করে গেলেন। নিপুণ ক্ষিপ্র হাতে সাবধানতার সঙ্গে ওরা কাজ করে গেল। শিরা কাটলে, এক মুখ বন্ধ করলে—অন্য মুখে স্যালাইনের নলের মুখটা ঢুকিয়ে দিলে। একজন কাচের নলটুকুর দিকে চেয়ে রইল। বুদ্বুদের মধ্য দিয়ে বায়ু না যায়। সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে।

বুদ্বুদে বায়ু গেলেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। চারিদিকে দূরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়াভিভূত জনতা। জীবনমশায়ের দৃষ্টিতে কৌতূহল—আনন্দ। অদ্ভুত! অদ্ভুত! মেয়েটার দেহ থেকে মৃত্যুছায়া অপসারিত হয়ে যাচ্ছে, কালি মুছে গিয়ে তার গৌরবর্ণ ফুটে উঠছে। রস-শুষে-নেওয়া শুষ্ক দেহ রস-সঞ্চারে আবার নিটোল পরিপুষ্ট কোমল হয়ে উঠছে, জীবনের লাবণ্য ফিরে আসছে। অদ্ভুত, এ অদ্ভুত! যুগান্তর, সত্যই এ যুগান্তর! মৃত্যু ফিরে গেল?

সে বড় কঠিন! যায় না। বৃদ্ধ জীবনমশাই হাসলেন আজ।

মনে পড়ছে যে!

ইনজেকশন শেষ হল—মেয়েটি হাসিমুখে সলজ্জভাবে মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে নিজেই পাশ ফিরে শুলে। ডাক্তারেরা যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে ব্লিচিং-পাউডার মেশানো জলে হাত ধুচ্ছে, এই সময় হঠাৎ জলভরা পাত্র ভেঙে যেমন জল ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবেই মুহূর্তের মধ্যেই একরাশি জল ছড়িয়ে পড়ল, মলের আকারে নির্গত হয়ে গেল। এবং মুহূর্তে মেয়েটা আবার হয়ে গেল সেই মৃত্যুছায়াচ্ছন্না, কালিবর্ণ, কঙ্কালের মতো শুষ্ক। অবিনাশ বাউড়ীর স্ত্রী মারাই গেল। কিন্তু জীবনমশায় সেদিন মনে মনে মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের সাধনাকেও প্রণাম জানিয়েছিলেন। মৃত্যুকে জয় করা যাবে না, কিন্তু মানুষ অকালমৃত্যুকে জয় করবে। নিশ্চয় করবে। ধন্য আবিষ্কার! ইউরোপের মহাপণ্ডিতদের প্রণাম করেছিলেন। হ্যাঁ— আজ বেদজ্ঞ তোমরাই। এই কথাই বলেছিলেন।

আজ পেনিসিলিনের ক্রিয়া দেখে এবং প্রদ্যোতের উত্তম উৎসাহ দেখে ঠিক সেই কথাই বলছেন। তোমরা ধন্য।

সেদিন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছিল। মনে পড়ছে, সংকল্প ছিল কলেরার আক্রমণ ক্ষান্ত হলেই আবার তিনি ঘরে ঢুকে বসবেন। কিন্তু তা পারেন নি। বিচিত্রভাবে শুরু হয়ে গেল। ডাক্তারদের সঙ্গে কলেরা-সংক্রামিত পাড়া ঘুরে রোগী দেখে ফিরে এসে কিশোরদের বাড়িতে বসতেন, হাত-পা ধুতেন—ব্লিচিং পাউডারে মাড়িয়ে জুতোর তলা বিশুদ্ধ করে নিতেন—ততক্ষণে দুজন চারজন এসে জুটে যেত; জ্বরে আমাশয়ে পুরানো অজীর্ণ ব্যাধিতে ভুগছে এমনি রোগী সব।

—একবার হাতটা দেখুন।

জীবনমশায় প্রথম প্রথম বলতেন—এই এদের দেখাও।

—না। আপনি দেখুন।

ডাক্তার দুটি বড় ভালো ছেলে ছিল, তারা বলত—দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনাকেই দেখাতে চায় ওরা।

মশায় দেখতেন। শুধু বলতেন—এই ন দিন না-হয় এগারো দিনে জ্বর ছাড়বে। ওষুধ দিতেন না।

তারপর একদিন ঈশানপুরে পরান কাহার তাঁকে টেনে নামালে।

সংসারে কত বিচিত্র ঘটনাই ঘটে!

সে এক দুরন্ত কালবৈশাখীর ঝড়ের অপরাহ্ণ। ঈশানপুরে কলেরার আক্রমণের খবর পেয়ে কিশোর এবং তরুণ ডাক্তার স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে গিয়েছিলেন ঈশানপুরে। গ্রামে ঢোকবার মুখে হঠাৎ ঝড়। বজ্রাঘাত। বর্ষণ। সবশেষে শিলাবৃষ্টি। আশ্রয় নিয়েছিলেন গ্রামের প্রান্তের প্রথম ঘরখানিতে।

একখানা মাত্র ঘর—কোলে একটা পিঁড়ে, মানে—ঢাকা রোয়াক, মেটে রোয়াক। পাশে আর-একখানা ছিটে-বেড়ার হাত তিনেক মাত্র উঁচু ঘর। রোয়াকেও স্থান ছিল না। সেখানটা ঘিরে তখন আঁতুড়ঘর হয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে কেউ বলেছিল—কোথায় দাঁড়াবা বাবা? বাইরের পিঁড়েতে ঘিরে আমার পরিবারের সন্তান হয়েছে। ভিতরে আমি রোগা মানুষ শুয়ে আছি। তিনটে শুয়োর আছে, পাঁচ-ছটা হাঁস আছে। আপনারা বরং একপাশে কোনোরকমে দাঁড়াও।

তাই দাঁড়িয়েছিলেন; মসীবর্ণ মেঘ থেকে শিল ঝরছিল অজস্র ধারে; বিচিত্র সে দৃশ্য। লাখে-লাখে শূন্য মণ্ডলটা পরিব্যাপ্ত করে ঝরঝর ধারে ঝরছিল। সবুজ পৃথিবী সাদা হয়ে যাচ্ছিল। অনেক কাল এমন শিলাবৃষ্টি হয় নি। মশায়েরা ভাবছিলেন মাঠে আজ কতজন, কত জীবজন্তু জখম হবে, মরবে। আবার পৃথিবী বাঁচল, শান্ত হল, শীতল হল।

কিশোর কর্মী হলেও কবি মানুষ, ছেলেবেলা থেকে পদ্য লেখে। কিশোর মুখে মুখে-পদ্য তৈরী করেছিল—তার একটা চরণ আজও মনে আছে:

'খ্যাপার মাথায় খেয়াল চেপেছে
নাচন দিয়েছে জুড়ে।'

এরই মধ্যে ঘরের দরজার ফাঁক থেকে ক্ষীণ ক্লান্ত কণ্ঠে কে অসীম বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল—মশায়, বাবা! আপনি?

দরজাটা খুলে গিয়েছিল। বসে বসেই নিজেকে ছেঁচড়ে টেনে কোনো রকমে বেরিয়ে এসেছিল এক কঙ্কালসার মানুষ। যুবা না প্রৌঢ় না বৃদ্ধ তা বুঝতে পারা যায় নি। শুধু চুল কালো দেখে সন্দেহ হয়েছিল—রোগেই জীর্ণ, বৃদ্ধ নয়।

—কে রে?

লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলেছিল—আমার যে নড়বার ক্ষ্যামতা নাই মশায়।

আমাকে চিনতে লারছেন বাবা ?

—কে ? ঠিক চিনতে তো পারছি না বাবা ! কী হয়েছে তোমার ?

—আমি হাটকুড়ো কাহারের বেটা পরান। আপনকার গেরামে—আপনার পেজা হাটকুড়ো।

হাটকুড়োর ছেলে পরান !

তাঁরই গ্রামের—তাঁরই পুকুরপাড়ের প্রজাই বটে হাটকুড়ো। পরান, শূরবীর পরান। বছর কয়েক আগে প্রেমে পড়ে পরান বাপ মা জাতি জ্ঞাতি সব ছেড়ে প্রেমাস্পদা একটি ভিন্নজাতীয়া মেয়েকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করেছিল।

সেই পরানের এই কঙ্কালসার মূর্তি দেখে শিউরে উঠেছিলেন মশায়।—তোর এমন চেহারা হয়েছে ? কী অসুখ রে ?

—রক্ত উঠছে মুখ দিয়ে বাবা। বমি হয়।

—রক্ত উঠছে ! টি-বি ? নতুন ডাক্তারেরা শিউরে উঠেছিলেন।

—আজ্ঞে লবগেরামের ডাক্তারখানার ডাক্তার বলছে—রাজব্যাধি যক্ষ্মা ! জবাব দিয়েছে। বলেই সে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তবে এইবার আমি বাঁচব। ভগবান আপনাকে ডেকে এনেছেন ঘরে। আমার কপাল। আপনি একবার দেখো বাবা। আমাকে বাঁচাও। ফুরির আর কেউ নাই বাবা।

'ফুরি' পরানের প্রণয়াস্পদা, তার প্রিয়তমা। যার জন্য সে সব ছেড়েছে। তাকে ও ছেড়ে গেলে তার আর কেউ থাকবে না বলেই পরানের ধারণা। কিন্তু ফুরি আবার বিয়ে করবে। ফুরিও তাঁর গ্রামের মেয়ে, তার কথাও তিনি জানেন, ফুরি লাস্যময়ী স্বৈরিণী। তার জন্য বহু জনেই মোহগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু পরানের মতো তাকে গলায় বেঁধে ঝাঁপ কেউ দেয় নি। সকরুণ হাসিই এসেছিল তাঁর ঠোঁটের রেখায়। কিন্তু সে হাসি স্তব্ধ হয়ে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

ফুরিও এসে দাঁড়িয়েছিল তার আঁতুড়ঘরের দরজায়।—মশায় ! বাবা ! আমার কেউ নাই বাবা। তাকে দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই সেই ফুরি ? সে স্বৈরিণীর কোনো চিহ্ন অবশেষ নাই মেয়েটার মধ্যে। সদ্য সন্তানপ্রসবের পর সে ঈষৎ শীর্ণ পাণ্ডুর ; কিন্তু রূপের অভাব হয় নি। লাবণ্য রয়েছে, স্বাস্থ্য রয়েছে, চিক্কণতা রয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে গঠনে ফুরির একটি মাধুর্য ছিল সে মাধুর্যও রয়েছে, নাই শুধু লাস্যচাপল্য, যার ফলে ওকে আর চেনাই যায় না ফুরি বলে। ঠোঁটের পাশে গালে ওটা কী ? তিল ? ওটা তো মশায় কখনও দেখেন নি ! তিনি অবশ্য ফুরিকে পথে চলে যেতেই দেখেছেন, দূর থেকেই দেখেছেন, তাঁর মতো মানুষের সামনে ফুরির মতো মেয়েরা বড় একটা আসত না। তাঁকে দেখলে সম্ভ্রমে পাশে সরে দাঁড়াত। তিলটা ঠিক বনবিহারীর স্ত্রী—তাঁর বউমার ঠোঁটের পাশের তিলের মত অবিকল।

ওঃ, বনবিহারীর স্ত্রীর—তাঁর পুত্রবধূর ধনী বাপ আছে, মা আছে। এ মেয়েটার সত্যিই

আর কেউ নাই। বাপ-মা মরেছে! এবং ওর মনের ভিতর যে স্বৈরিণী লীলাভরে এক প্রিয়তমকে ছেড়ে তাকে ভুলে গিয়ে আর-একজনকে প্রিয়তম বলে গ্রহণ করতে পারত সে স্বৈরিণীও মরে গেছে। পরান মরে গেলে ওর আর কেউ থাকবে না—এ বিষয়ে আর তাঁর সন্দেহ রইল না।

তিনি দাওয়ায় উঠে পরানের হাত ধরে নাড়ী পরীক্ষা করতে বসেছিলেন।

সেই হল তাঁর নূতন করে নাড়ী-ধরা, চিকিৎসা করতে বসা।

পরানকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন।

যক্ষ্মা বা টি-বি পরানের হয় নি। পুরানো ম্যালেরিয়া এবং রক্তপিত্ত দুইয়ে জড়িয়ে জট পাকিয়েছিল। চারুবাবু, চক্রধারী—রক্তবমি এবং জ্বর, দুটো উপসর্গ দেখেই সাংঘাতিক ধরনের গ্যালপিং থাইসিস বলে ধরেছিল। একালে দেশে যক্ষ্মার ব্যাপক প্রসার হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ ডাক্তারেরা রক্ত এবং জ্বর দুটোকে একসঙ্গে দেখেই টি-বি বলে ধরে নিয়েছিল। বিশেষজ্ঞ দেশে ছিল না, পরানেরও দূর শহরে গিয়ে দেখাবার সাধ্য ছিল না।

মশায় তার চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন। নিজেই আসতেন দেখতে। নিজে হাতে ওষুধ তৈরি করে দিতেন। পরান ভালো হল, তিনি হয়ে উঠলেন ধন্বন্তরি। নূতন করে জীবনের আকাশে সৌভাগ্যের সূর্য উদয় হল তাঁর। মাস কয়েক পর পরান সুস্থ দেহে বল পেয়ে কোদাল ঘাড়ে মজুর খাটতে বের হলে লোকের আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

এর পরই একদিন পরানের এখনকার গ্রাম ঘাট-রামপুরের মিয়াদের বাড়ি থেকে ডুলি এসে নেমেছিল আরোগ্য-নিকেতনের সামনে।

বৃদ্ধ সৈয়দ আবুতাহের সাহেব পুরানো আমলের কাশ্মিরী কাজ-করা শালের টুপি, সাদা পায়জামা শেরোয়ানী পরে ডুলির বেহারাদের কাঁধে ভর দিয়ে এসে ওই যানা আজ যে চেয়ার-খানায় বসেছে ওইখানাতেই বসে বলেছিলেন—আপনার কাছে এলাম মশায়, আপনি পরান কাহারের এত বড় ব্যামোটা সারিয়ে দিলেন। আমারে আরাম করে দ্যান আপনি। আপনারে ঘরে ডাক না দিয়া—নিজে আপনার ঘরে এসেছি। আপনারে ধরবার জন্য এসেছি। আমারে আরাম করে দ্যান কবিরাজ।

বাঁ হাত দিয়ে মশায়ের হাতখানি চেপে ধরেছিলেন। কথা শুনেই বুঝেছিলেন মশায় মিয়া সাহেবের ব্যাধি কী? কথাগুলি জড়িয়ে যাচ্ছিল। মিয়া সাহেবের পক্ষাঘাতের সূত্রপাত হয়েছে, ডান হাতখানি কোলের উপর পড়েছে, ডান দিকের ঠোঁট বেঁকে গিয়েছে, ডান হাত-খানি কোলের উপর পড়ে আছে। ডান পাখানাও তাই।

মশায় ম্লান হেসে বলেছিলেন—এ বয়সে এ ব্যাধির মালিক পরমেশ্বর মিয়া সাহেব। ওই চোখ ওই হাত ওই অঙ্গটা তাঁর সেবাতেই নিযুক্ত আছে ভাবুন। আমার কাছে এর ইলাজ নাই। সে কিস্মতও নাই।

একটু চুপ করে থেকে মিয়া সাহেব বলেছিলেন—বলেছেন তো ভালো মশায়! মশায়-

ঘরের ছাওয়ালের মতোই বাত বলেছেন। কিন্তু কী জানেন—শেষ বয়সে নিজেই বাধিয়েছি ক্যাসাদ, মামলাতে পড়েছি। তাঁর সেবাতে ডান অঙ্গটা দিয়া নিশ্চিন্দি হতে পারছি কই! কিছু করতি পারেন না আপনি?

মশায় বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—আপনার সঙ্গে মামলা কে করছে? সে কী?

রামপুরের মিয়ারা এ অঞ্চলের মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু। তাঁদের সম্পত্তি সমস্তই নানকার অর্থাৎ নিষ্কর। এবং নিঝঞ্ঝাট। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে তিনি কখনও রামপুরের মিয়াদের আদালতের সীমানায় যাতায়াতের কথা শোনেন নি। তাঁরা কাউকে খাজনা দেন না, খাজনা পান বহুজনের কাছে; কিন্তু তাঁদের বংশের প্রথা হল—সুদও নাই, তামাদিও নাই। সে প্রথা তাঁদের প্রজারাও মানে। পঞ্চাশ বছর পরও লোকে খাজনা দিয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে মামলা করলে কে?

মিয়া বলেছিলেন—কে করবে মশায়! করছে নিজের ব্যাটা-জামাই। ঘরের ঢেঁকি কুমির হল মশায়—তাই তো বাঁচবার লাগি এসেছি আপনার কাছে। ডান অঙ্গটা না থাকলে লড়ি, ঠেকাই কী করে?

—কাজটা যে আপনি ভাল করেন নি মিয়া সাহেব; উচিত হয় নি আপনার। মশায় সম্ভ্রমের সঙ্গেই বলেছিলেন কথাটা।

মিয়া সাহেব বছর পাঁচেক আগে নতুন বিবাহ করেছেন। উপযুক্ত ছেলে তিনটি—মেয়ে জামাই নাতি নাতনী, বৃদ্ধা দুই পত্নী থাকতে হঠাৎ বিবাহ করে বসেছেন এক তরুণীকে। এবং সে তরুণীটি মিয়া বংশের ঘরের যোগ্য বংশের কন্যা নয়। স্ত্রী-পুত্রদের পৃথক করে দিয়ে, সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে, পৃথক সংসার পেতেছেন। একটি সন্তানও হয়েছে। এখন ছেলেরা শরিক হয়ে মামলা বাধিয়েছে। এদিকে মিয়া সাহেবের দক্ষিণ অঙ্গ পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

মিয়া সাহেব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—হাঁ, ইকালে কাজটা নিন্দার বটে, তবে মশায় আপনিও সিকালের লোক, আমিও তাই। আমাদের কালের মানুষের কাছে কি পঞ্চান্ন যাট বয়সটা একটা বয়স?

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—কারেই বা বলি ই কথা! আপন-বয়সী ইয়ার-বন্ধু ছাড়া বলিই বা কী করে! মশায় প্রথম যখন কাঁচা উমর আমার—ষোলো-সতেরো বছর উমর,—তখুন—সেই কাঁচা নজরে মহব্বত হয়েছিল এক চাষীর কন্যের সঙ্গে। আমার দিল দেওয়ানা হয়ে গেছিল তার তরে। ধরেছিলাম—উয়াকেই শাদি করব। বাপ রেগে আগুন হলেন। আপনি তো জানেন—আমাদের বংশে বাঁদী কি রক্ষিতা রাখা নিষেধ আছে। নইলে না হয় তাই রেখে দিতেন। আমি গোঁ ধরলাম। বাবা শেষমেষ আমাকে লুকায়ে সেই কন্যের শাদি দিয়া পাঠায়ে দিলেন—একেরে দুটো জেলার পারে। আমাদেরই এক মহলে, পত্তনিদারের এলাকায়। মশায়, এতকাল পরে হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল—এক কন্যে; ঠিক তেমুনি চেহারা—যেন সেই কন্যে নতুন জোয়ানি নিয়ে ফিরে এসেছে। লোকে অবিশ্যি তা দেখে না। তা দেখবে কী করে বলেন? আমার আঁখ দিয়া তো দেখে না!

তাই ভাই, মেয়েটাকে নিকা না করে পারলাম না।

মশায় একটু হেসেছিলেন।

মিয়া সাহেব বলেছিলেন—আপনিও হাসছেন গো মশায়? তবে আপনারে বলি আমি শুনেন। ই শাদি করে আমি সুখী হয়েছি। হাঁ। মনে হয়েছে কি দুনিয়াতে যা পাবার সব আমি পেয়েছি। হাঁ। দুঃখ শুধু আয়ু ফুরায়ে আসছে; দেহখানা পঙ্গু হয়ে গেল; মেয়েটাকে দুনিয়ার মার থেকে বাঁচাতে পারছি না।

তাঁর চোখমুখের সে দীপ্তি দেখে মশায় বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধের চোখ দুটো জলজল করে জলে উঠেছিল। মনে হয়েছিল তাঁর সমস্ত অন্তরটা যেন প্রবল আবেগে ওই দুটো চোখের জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে দেখো, সত্য না মিথ্যা—দেখো!

মিয়া সাহেব বলেছিলেন—মশায়, আমি বলি কি, আপনি আমারে দেখেন—তারপর আমার নসিব। বুঝলেন না?

কম্পিত ডান হাতখানা তোলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বাঁ হাতের আঙুল কপালে ঠেকিয়ে বলেছিলেন—ইটাকে লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা কারুর নাই। সে যা হয় হবে। ইয়ার লেগে এত ভাবছেন কেন আপনি মশায়? যিনি যক্ষ্মার মতুন ব্যামো ভালো করতি পারেন তিনি যদি এই একটা সামান্য ব্যাধি সারাবারে না পারেন—তবে দোষটা আপনারে কেউ দিবে না, দিবে আমার নসিবের লিখনকে।

মশায় সেকথা শুনেও যেন বুঝতে পারেন নি।

তিনি চলে গিয়েছিলেন দূর অতীতকালে। অন্তরের মধ্যে কোথায় লুকানো গোপন আগুনের আঁচ অনুভব করছিলেন; অতি ক্ষীণ ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছিলেন যেন; চোখ যেন জ্বালা করছিল। সত্যসত্যই তাঁর চোখে জল এসেছিল। মনে পড়েছিল মঞ্জরীর কথা।

মিয়ার চোখ এড়ায় নি। তিনি বলেছিলেন—ইয়ারই তরে আপনার বংশকে বলে মশায়ের বংশ, ইয়ারই তরে লোকে আপনারে চায়। রোগীর দুঃখ-দরদে যে হাকিমের চোখে জল আসে—সেই ধন্বন্তরি গো!

মশায় মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেয়েছিলেন; চোখ মুছে মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেছিলেন। মিয়া সাহেবের চিকিৎসার ভারও নিয়েছিলেন তাঁকেই স্মরণ করে। বলেছিলেন—তাই হবে মিয়া সাহেব! চিকিৎসা আমি করব। আপনার ভাগ্য আর ভগবানের দয়া। আমার যতটুকু সাধ্য। কই দেখি আগে আপনার হাতখানি।

নিজেই তুলে নিয়েছিলেন তাঁর হাতখানা।

সেই হয়েছিল আবার শুরু।

প্রবাদ রটেছিল—পাঁচ বৎসর ঘরে বসে মশায় বাকসিদ্ধ হয়েছেন। মশায় যার নাড়ী ধরে বলেন—বাঁচবে, মরণ তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে থাকলেও ফিরে যায়। আর যাকে বলেন বাঁচবে না—সেখানে আপনপুরে মরণের টনক নড়ে; সে মুহূর্তে এসে রোগীর শিয়রে দাঁড়ায়।

বৃদ্ধ মিয়া সাহেবের হাত ধরেই তিনি চমকে উঠেছিলেন। মৃত্যুলক্ষণ তিনি স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন। ধীরভাবে ধ্যানস্থের মতো অনুভব করে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—বিষয় নিয়ে মামলায় আপনি বিব্রত বলছিলেন। মামলা আপনি মিটিয়ে ফেলুন মিয়া সাহেব। মামলা চালাবার সময় আপনার হবে না। একশো আশি দিন। ছ মাস।

—ছ মাস? মামলা মিটায়ে ফেলব?

—আমি তাই পেলাম।

পাঁচ মাসের শেষ দিনে মিয়া সাহেব দেহ রেখেছিলেন। মশায়ের নিজেরও যেন বিস্ময় মনে হয়েছিল। এত স্পষ্ট এবং এমন অঙ্কফলের মতো ধারণা এর আগে ঠিক হত না। যে পিঙ্গলকেশীকে ঘরে বসে চিন্তা করে, ধ্যান করে বিন্দুমাত্র আভাসেও পান নি, তাকে তাঁর চিকিৎসাসাধনার মধ্যে বিচিত্রভাবে অনুভব করছেন। নাড়ীর স্পন্দনের মধ্যে, লক্ষণের মধ্যে, রোগীর গায়ের গন্ধের মধ্যে, তার উপসর্গের মধ্যে, গাত্রবর্ণের মধ্যে, এমন কি আঙুলের প্রান্ত-ভাগের লক্ষণের মধ্যে সেই পিঙ্গলকেশীর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছেন। মধ্যে মধ্যে আরও বিচিত্র অনুভূতি তাঁর হয় এবং হয়েছে। আজই অতসীর ছেলের কাছে বসে বার বার অনুভব করেছেন। তার অশরীরী অস্তিত্ব দরজার মুখ থেকে পা-পা করে এগিয়ে আসছে মনে হয়েছে। আবার পিছিয়ে চলে যাওয়াও স্পষ্ট অনুভব করেছেন। রিপুপ্রভাবমুক্ত নিষ্পাপ শিশু বলেই সে ওষুধের ক্রিয়া মেনে ফিরে গেল। কিন্তু প্রদ্যোত বীর সাহসী যোদ্ধা। বীরের মতো যুদ্ধ করেছে। অস্ত্রও তেমনি অদ্ভুত শক্তিশালী। অদ্ভুত!

নিজের জীবনে আক্ষেপ থেকে গেল, ডাক্তারি পড়া তাঁর হয় নি। হলে—এ বয়সেও এ অস্ত্র নিয়ে ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করতেন তিনি। হয় নি এক সর্বনাশীর জন্য।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজেকেই নিজে বললেন—থাক, আর না।

ত্রিশ

ঘুম আসতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পার হয়ে গিয়েছিল। রাত্রি দেড়টার সময় ইনজেকশন দিয়ে প্রদ্যোত বাড়ি গিয়েছিল, তারপর ছেলেটির নাড়ী দেখে মশায় বাড়ি ফিরেছিলেন। বিছানায় শুয়ে অনেক কথা মনে পড়েছে; ঘুম আসতে তিনটে পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঘুম ভাঙল সকালেই। ছেলেটির জন্য উৎকণ্ঠা নাই। সে তিনি রাত্রেই বুঝে এসেছেন। সংকটের ক্ষণ আসতে আসতে, আসতে পায় নি, গতিকে মোড় ফিরিয়েছে ওষুধ। তবু ঘুম ভাঙল। জ্বর কমেছে, ওই ফুলোটা কিভাবে কমে, কতটা কমেছে দেখতে হবে! রাত্রে ভালো দেখা যায় নি। প্রদ্যোত ডাক্তারকে অভিনন্দন জানাতে হবে, অকুণ্ঠ অভিনন্দন। সে ঘড়ির কাঁটার মতো আসবে, ইনজেকশন দেবে।

আতর-বউ তার আগেই উঠেছেন। নিচে একদফা তেজ বিকিরণ শেষ করেছেন। ভোরবেলা কালীতলায় জল দিতে গিয়ে মতি কর্মকারের মাকে দেখেছেন। কালীতলার

পাশেই মতির বাড়ি; মতির মা কোঠা ঘরের জানালা খুলে কালীমন্দিরের দিকে তাকিয়ে কাতরস্বরে যন্ত্রণা উপশমের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছিল। মতির মায়ের প্লাস্টার-করা পায়ের যন্ত্রণা কাল কোনো কারণে বেড়েছে। সম্ভবত বর্ধমান থেকে এখান আসার পথে কোনো কিছু অনিয়ম ঘটে থাকবে। মতির মাকে দেখে আতর-বউ তারই উপর বর্ষণ করেছেন তাঁর রাত্রির অবরুদ্ধ ক্রোধ।

মানুষের এত বাঁচবার সাধ? এত ভয়? মরণে এত দুঃখ! চিরন্তন প্রশ্নগুলি ভিরস্কারের সঙ্গে মতির মায়ের কাছে উত্থাপিত করেছেন। বাড়ি ফিরেই স্বামীকে নিচে নামতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—এত সকালে উঠলে? শুয়েছ তো রাত্রি দুটোর পর।

—ঘুম ভেঙে গেল। ছেলেটার খবর নি—কেমন আছে?

—ওখানেও কি কিছু হেঁকে বসে আছ না কি?

গম্ভীর স্বরে মশায় ডেকে উঠলেন—নারায়ণ নারায়ণ!

—আর তোমার নারায়ণ নারায়ণ! নিজের সন্তানের মৃত্যুকালে ওষুধ দিতে বললে যে দুধ গঙ্গাজল দিতে বলে, তাকে কিছু বিশ্বাস নাই! কিন্তু সেকাল এককাল ছিল। একাল হলে আর এই ডাক্তারের মতো ডাক্তার হলে আমার বনু মরত না। মতির মাকে দেখে এলাম। কোঠার জানালা খুলে কালীমাকে প্রণাম করছে!

মশায় ক্ষুব্ধ হলেন না। একটু হাসলেন। কী বলবেন আতর-বউকে? জীবনের দুরারোগ্য অথচ অক্ষম ব্যাধির মতো! মৃত্যুর শান্তি কোনোদিন দিতে পারবে না, শুধু ব্যাধির জ্বালা-যন্ত্রণার কষ্ট দেবে।

স্বামীর মুখে হাসি দেখে আতর-বউও হাসলেন। হেসে বললেন—রতনবাবুর ছেলেকে দেখে কী বলে এসেছ? ছি-ছি-ছি! ও-রকম কথা বোলো না, বলতে নাই। বয়স হয়েছে। এখন ভ্রম হবে। সেটা বুঝতে হয়। কাল তখন অনেক রাত, তুমি অহি সরকারদের বাড়িতে। রতনবাবুর লোক এসে চারটি টাকা আর চিঠি দিয়ে গিয়েছে। আমি ব্যস্ত হলাম। কী জানি, এখুনি হয়তো যেতে হবে। বিনয় তখনও বসে ছিল—তাকে ডেকে পড়ালাম। সে বললে—মশায়কে যেতে বারণ করেছে। ডাক্তারেরা সবাই বলছে—ভালো আছে। এক মশায় বলেছেন, মুখে কিছু বলেন নি, ইশারায় বলেছেন—ভালো নয়। তা বিপিনবাবুর ইচ্ছে—। এই নাও চিঠি। রাত্রে দিই নি। কী জানি, মানুষের মন তো!

চিঠি আর চারটি টাকা নামিয়ে দিলেন। মশায় টাকাটা ছুঁলেন না। চিঠিখানাই তুলে নিলেন। হ্যাঁ, তাই লিখেছে রতনবাবু। ক্ষমাও চেয়েছে তাঁর কাছে। লিখেছে—"তোমার ইঙ্গিত যে ধ্রুব সত্য তাহা আমি জানি। এবং সে সত্যকে সহ্য করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুতও করিতেছি। কিন্তু বিপিন তাহা পারিল না। প্রদ্যোতবাবু প্রভৃতি ডাক্তারেরা অন্য মতই পোষণ করেন। সকলেরই মত বিপিন ভালো আছে। এবং কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার চ্যাটার্জি মহাশয়কে আনিবার কথা বলিয়াছে। বিপিনেরও তাই ইচ্ছা। সুতরাং...।"

যাক, মুক্তি! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মশায়। কিন্তু মুক্তিই বা কোথায়? বিপিন

তো—। তাঁকে সে যেতে বারণ করেছে, তিনি যাবেন না, কিন্তু সে পিঙ্গলকেশী তো ফিরবে না। বিপিনের জন্য দুঃখে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল।

—মশায়! উঠেছেন? মশায়?

ভারী গলা, দীর্ঘায়িত উচ্চারণ; এ রানা পাঠক। ওকে আজ আসতে বলেছিলেন কাল।

—মশায়!

রানা অধীর হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে।

—কাল রাত্রে রক্ত একটু বেশী উঠেছে মশায়।

—এ অবস্থায় তোমার হেঁটে আসা উচিত হয় নি, বাবা।

—কী করব? আপনি যে আসতে বলেছিলেন আজ।

একটু চুপ করে থেকে মশায় বললেন—কিন্তু আমি কী করব বাবা, এ রোগে?

—পরমায়ু থাকলে বাঁচাবেন, না থাকলে সময়ে বলে দেবেন, কালী কালী বলে তৈরি হয়ে যাব—আর যতটা পারবেন কষ্টের লাঘব করবেন। আর কী করবেন?

—মশায়!

—রানা!

—দেখুন আমার হাত। কী ভাবছেন আপনি?

মশায় বললেন—ভাবছি, তুমি প্রদ্যোত ডাক্তারদের দেখিয়ে—

বাধা দিয়ে রানা বললে—আজ্ঞে না। ও লোকটির নাম আমার কাছে করবেন না। ওর নাম না, চারুবাবুর নামও না। ওদের দুজনের কাছে আমি গিয়েছিলাম। সব কথা আপনাকে বলি নি। শুধু বলেছিলাম, ওরা লম্বা ফর্দ দিয়েছে। কিন্তু আরও আছে। আমি বলেছিলাম—এক্সরে-টে—যা বলছেন—কমসমে করিয়ে দেন। বামুন বলে, গরিব বলে ক্ষ্যামাঘেন্না করে নিন। তা হাসপাতালের ডাক্তার বললে—বামুন-টামুন আমি মানি না। আর গরিব বলেই বা তোমাকে দয়া করব কেন? তুমি অসচ্চরিত্র লোক, একটা স্ত্রীলোক থেকে অসুখ ধরিয়েছ। চারুবাবু বললে—তোমাদের ঘরে তো মা-কালী রয়েছে গো, অনেক পয়সা পাও তোমরা। তারপর হেসে বললে—মা-কালীর কাছে পড়ো না হে। মা-কালী সারাতে পারবে না?…ওদের কাছে আমি যাব না।

বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল মশায়ের মুখে। রানার অন্তরের ক্ষোভটুকু তিনি অনুভব করতে পারলেন। রানাদের জাত আলাদা। এ কথা ওরাই বলতে পারে।

রানা বলে গেল—আপনাকে বলেছি, একটি মেয়েলোক থেকে আমার মতো অসুরের দেহে রোগটা ঢুকে গেল। কলকাতার এক হতভাগিনী মেয়ে। কলকাতার দাঙ্গার সময় গুণ্ডারা তাকে লুট করে। তারপর এখান ওখান করে তার লাঞ্ছনার আর বাকি রাখে নি। কোথা সেই বেহার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে আবার কলকাতা—কলকাতায় আমাদের গাঁয়ের ওপাশে গঙ্গারামপুরের মুসলমান গুণ্ডা রহমত ওকে পায়, সে তাকে বোরখা

পথিয়ে নিয়ে আসে এখানে। নদীর ঘাটে নৌকোর উপর উঠিয়েছিল। আমি লগি ধরেছিলাম। আমার গলায় পৈতা। এই দেহ। তার ওপর লগিতে ঠেলা দিয়ে হাঁক মারলাম—জয় কালী! সব হরি হরি বলো! নৌকোতে সবই প্রায় হিন্দু। সবাই হরিবোল বলে উঠল। মেয়েটা তখন সাহস পেয়ে বোরখা ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল—আমাকে বাঁচাও, আমি হিন্দুর মেয়ে। ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। রহমত ছুরি বার করেছিল—কিন্তু আমার হাতের লগি তখন উঠেছে। মেরে উঠলাম হাঁক। রানা পাঠককে রহমত জানে। বেটা ঝপ করে নদীতে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীটা। মেয়েটাকে নিয়ে গেলাম বাড়ি। মুসলমানেরা এল। বললে দিয়ে দাও, নইলে ভালো হবে না। আমি বললাম—মন্দকে ভয় করে না রানা। তা তোরা জানিস। পারিস নিয়ে যাস। সেই মেয়ে। বাড়ি ফিরতে চাইলে না। থেকে গেল। তা-পরেতে ঘি আর আগুন। জানতাম না মেয়েটার এ রোগ আছে। মেয়েটাও জানত না ঠিক। ক্রমে জানা গেল। কিন্তু তখন ওকে ছাড়া আমার সাধ্যির বাইরে। চরিত্রহীন বলছে বলুক, আমি ওকে বিয়ে একরকম করেছি। ভালোবেসেছি মেয়েটাকে। ভালোবাসতে গিয়ে রোগ ধরেছে, তার রোগ নিয়েছি, তাতে আমার লজ্জা নাই। সে যে যা বলবে বলুক। মরেও আমার সুখ। আর চারুবাবু বলে কালীর কথা। কালীর কাছে রোগ সারে কি না জানি না। তবে মায়ের ইচ্ছে হলে সারে। কিন্তু কালীর কাছে রোগ সারিয়ে দাও—এ বলতে আমি শিখি নাই মশায়। কালীর কাছে চাই—কালকে যেন ভয় না করি। তাকেই বলে মোক্ষ। কালীর কাছে চাই কালীর কোল। আপনি আমাকে ঘেন্না করবেন না, মা-কালী নিয়েও তামাশা করবেন না আমি জানি। তাই আপনার কাছে আরও আসা।

তা তিনি করবেন না। করেন না। তাঁর বাবা বলতেন—রোগীকে রোগ নিয়ে কখনও কটু কথা বোলো না। কখনও শ্লেষ কোরো না। পাপ-পুণ্যের সংসারে মানুষ পুণ্যই করতে চায়, কিন্তু পারে না। শাসন কোরো, ধমক দিয়ো, প্রয়োজন হলে ভয়ও দেখিয়ো। কিন্তু মর্মান্তিক কথা বোলো না, আর রোগী শরণাপন্ন হলে ফিরিয়েও দিয়ো না।

গুরু রঙলাল বলতেন—মানুষ বড় অসহায়, জীবন। রাগ কোরো না কখনও। ঘৃণাও না।

গুরু রঙলাল অনেক ক্ষেত্রে রোগীর গালে চড় মেরেছেন। ভূপী বোসকে মেরেছিলেন। এক শৌখীন তান্ত্রিক লিভারের কঠিন অসুখ নিয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। তিনি মদ খেতে নিষেধ করেছিলেন। সোজা কথা ছিল তাঁর। বলেছিলেন—'মদ খেলে বাঁচবে না। মদ ছাড়তে হবে।' রোগী বলেছিল—'কিন্তু আমার সাধনভজন?' রঙলাল ডাক্তার বলেছিলেন—'বিনা মদে, কাঁসার পাত্রে নারকেল জল-টল দিয়ে করবে। পাঁঠা বলির বদলে মাষকলাই ছড়িয়েও তো হয় হে।' লোকটা জিভ কেটে বলেছিল—'বাপ রে! তাহলে আর মা দেখাই দেবেন না! ও আমার মায়ের আদেশ! মা আমাকে দেখা দিয়ে বলেছেন ডাক্তারবাবু।' রঙলাল ডাক্তার খপ করে তার চুলের মুঠো ধরে বলেছিলেন—'কী বললি? মা তোকে দেখা দিয়ে এই কথা বলেছেন? মিথ্যেবাদী! মা মদ খায়? খেতে বলে?

যে মদে লিভার পচে—সেই মদ ?'

জীবনমশায় জানতেন—ও রোগী বাঁচবে না। প্রবল রিপুপ্রভাবে সে অসহায়। বাঁচেও নি সে।

মানুষ অসহায়, বড় অসহায় ! প্রবৃত্তির তাড়নায় সে মর্মান্তিক কলঙ্ক-কাহিনী রচনা করে চলে। আজ রচনা করে—কাল অনুশোচনা করে, নিজেকেই নিজে অভিসম্পাত দেয়। মনে মনে ভাবে আকাশে সূর্য নিভে থাক ; কাজ নাই, আলোতে কাজ নাই। অন্ধকারে ঢাকা থাক সব। বহু দেখেছেন তিনি। উপার্জনক্ষম পুত্রের মৃত্যুশয্যায় পিতাকে উইল তৈরি করিয়ে নিতে দেখেছেন, বধূকে বঞ্চিত করে। আরও কঠিন পাপ করতেও দেখেছেন। ভাই-ভাগ্নে এদের কথা তিনি ধরেন না। পুত্রকেও ক্ষমা করেন তিনি। স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায় স্বামীর ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার ইতিহাস অনেক। স্বামীর মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীও ব্যভিচার করে, ভ্রষ্টা স্ত্রী। ভ্রষ্টা নয় এমন অনেককে গোপনে মাছ চুরি করে খেতে দেখেছেন এই কঠিন লগ্নে। শুধু মা, মায়ের পুণ্য অক্ষয়।

মানুষ বড় অসহায় !

মশায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। রানা ডাকলে—মশায় !

—একটু বসে জিরিয়ে নাও বাবা। কথা বোলো না। অনেকটা হেঁটেও এসেছ। একটু পরে দেখব। বোসো। আমি এদের এই ছেলেটাকে দেখে আসি।

অতসীর ছেলে আজ ভালো আছে। জ্বর কম, ফুলোটাও কমেছে। ফুলোর উপরের রক্তাভার গাঢ়তাও কম হয়েছে। পরিধি কমে নি, কিন্তু বাড়ে নি, থমকে দাঁড়িয়েছে। কাল সকালে জ্বর ছিল একশো দুইয়ের কাছাকাছি, আজ সকালে জ্বর একশো একের নিচে। চৈতন্যের উপর আচ্ছন্নতার যে একটি আবরণ পড়েছিল, সেটি কেটে এসেছে ; কুটকুট করে দু-চারটি কথা বলছে। ঠিক সাতটার সময় প্রদ্যোত ডাক্তারের বাইসিকেলের ঘণ্টা বেজে উঠল। ভোর পাঁচটার ট্রেনে সদর শহর থেকে অরুণেন্দ্র ব্লাড রিপোর্ট পাঠিয়েছে। কঠিন রোগ, মারাত্মক সংক্রমণ হয়েছিল—অরুণেন্দ্র রিপোর্টে লিখেছে—"উইথ এ টেণ্ডেন্সি টু ইরিসিপ্লাস।' চিকিৎসা তার নির্ভুল হয়েছে। রিপোর্টের জন্য কী উৎকণ্ঠাতেই কাল দিনরাত্রি সে কাটিয়েছে ! পৃথিবীতে অমৃতই শুধু ওষুধ নয়, বিষও ওষুধ। কাল দিনরাত্রে এমনি ওষুধ অনেকটাই সে দিয়েছে। বৃদ্ধ মশায় অবশ্য তাকে বলেছিলেন—কিন্তু তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা করতে সে পারে নি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেই কত ক্ষেত্রে কত ভ্রম হয়, কত ক্ষেত্রে প্রথম দু-তিনবার পর্যন্ত রোগ ধরা পড়ে না। এ তো মানুষের অনুভব-অনুমান। কাল বিকেলে তার যখন সন্দেহ হয়েছিল মাম্‌স বলে এবং যখন ওই বৃদ্ধ বলেছিলেন—"মাম্‌স নয় ; কঠিন বিষ-জর্জরতা রক্ত দূষিত করেছে, ঝড়ের মতো বাড়ছে এবং বাড়বে" —তখন তার খানিকটা রাগ হয়েছিল। বৃদ্ধ যদি বলত 'এ মৃত্যুরোগ', তবে প্রদ্যোত হয়তো রাগে নিজেকে হারিয়ে ফেলত। মৃত্যুরোগ-নির্ণয়-শক্তির একটা সুপিরিয়রিটি-কমপ্লেক্স বৃদ্ধের মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

দাঁতু ঘোষাল ভালো আছে। বিপিনবাবু ভালো আছেন। মতির মা বর্ধমান থেকে ফিরে এসেছে কাল। বুড়ীর পায়ের যন্ত্রণা কাল রাত্রে বেড়েছে একটু। এই এখুনি এখানে আসার পথে, মতি মুখ-শুকনো করে দাঁড়িয়ে ছিল। বলেছে—"ডাক্তারবাবু, মায়ের পায়ের যন্ত্রণা যে বেড়ে গেল কাল রাত্রি থেকে! তাহলে—?"

প্রদ্যোতের বুঝতে বাকি থাকে নি—মতি যা বলতে চাইছে অথচ মুখে উচ্চারণ করতে পারছে না, সে কথাটা কী? একবার মনে হয়েছিল বলে, তাহলে মশায় যা বলেছিল তাই করো। খোল করতাল বাজিয়ে নিয়ে যাও গঙ্গাতীরে। কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছে। বলেছে আসবার সময় দেখব। কিছু নয়, ট্রেনে আসবার সময় পা নিয়ে নড়াচড়া হয়েছে, সেইজন্য বেদনা হয়ে থাকবে।

প্রদ্যোতকে সাদর সম্ভাষণ মশায়ই জানালেন—আসুন। রোগী আপনার দিব্যি কথা বলছে। ভালো আছে।

কপালে হাত ঠেকিয়ে নীরবে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে রোগীর বিছানার পাশে বসল।

মশায় বললেন—আমি দেখেছি—

মধ্যপথে বাধা দিয়ে প্রদ্যোত বললে—আমি দেখি।

—বিপদ কেটে গিয়েছে।

—না। বলেই প্রদ্যোত প্রশ্ন করলেন—রাত্রে প্রস্রাব কেমন হয়েছে বলুন তো?

বৃদ্ধ বুঝতে পারছেন না, ওষুধের প্রতিক্রিয়া আছে। প্রস্রাব বন্ধ হতে পারে। পেটে ফাঁপ দেখা দিতে পারে।

প্রস্রাব কমই হয়েছে। রাত্রি বারোটা থেকে সকাল পর্যন্ত একবার। পেটে ফাঁপ রয়েছে একটু। রোগী বেশ কয়েকবার জলের মতো তরল মলত্যাগও করেছে, পেটের দোষ হয়েছে। প্রদ্যোত ডাক্তার গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখে তারপর ইনজেকশনের সিরিঞ্জ বের করলে।

ইনজেকশন শেষ করে প্রদ্যোত উঠল।—কই? মশাই কই?

নাই। চলে গিয়েছেন। অহি সরকার বললে, ওঁর আরোগ্য-নিকেতন থেকে ডাকতে এসেছিল।

প্রদ্যোত একটু দাঁড়িয়ে ভেবে নিল। সে কি কোনো রূঢ় কথা বলেছে? না। বলে নি।

অহি বললে—উনি বলে গেলেন আমাকে ডেকে, বিপদ কেটে গিয়েছে। আপনার খুব প্রশংসা করে গেলেন। বললেন, খুব বুঝেছে। খুব সাহস। খুব ধীর।

প্রদ্যোত বললে, প্রস্রাবের উপর নজর রাখবেন। একটু দেরিতেই হবে। তবু লক্ষ্য রাখবেন। আর পেটে ফাঁপ একটু রয়েছে—ওই ফাঁপটা দেখবেন। বাড়ছে মনে হলেই আমাকে খবর দেবেন। আর একটা কথা, মশায় নাড়ী দেখছেন বার বার, এটা ঠিক হচ্ছে

না। আপনারাও চঞ্চল হতে পারেন। আমারও একটু কেমন মনে হয়। বেরিয়ে এল সে।

সাড়ে আটটা বাজছে। হাসপাতালে কত কাজ, কত কাজ! কম্পাউণ্ডার হরিহর এখানকার লোক, বয়স হয়েছে। লোকটি আশ্চর্য রকমের শিথিল-চরিত্র। হবে-হচ্ছে করেই চলা স্বভাব। দু-দশ মিনিটে কী আসে যায়? নার্সরাও সুবিধে পায়।

মঞ্জুকে বলে এসেছে। সে অবশ্য দেখবে। নিয়মিতভাবে সে এসব দেখে। এদিক দিয়ে সে ভাগ্যবান। মঞ্জু তার কর্মের বোঝার ভার মাথায় তুলে নিয়েছে। রোজ সকালে একবার নিজে সে রোগীদের খোঁজ নিয়ে আসে, মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দিয়ে আসে। হাসপাতালটির পরিচ্ছন্নতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার। নিজের বাড়ি থেকে মধ্যে মধ্যে পথ্য তৈরি করে দিয়ে আসে। মেয়েদের সম্পর্কে বলতে গেলে মঞ্জুর জন্যই সে নিশ্চিন্ত। রোগিণীদের ও দিদি। ষাট বছরের রোগিণীও দিদি বলে।

এই দাঁতু ঘোষালটা তো মঞ্জুকে পেয়ে বসেছে। হাসপাতালের ভাতের সঙ্গে মঞ্জুর পাঠানো তরকারি ভিন্ন চিৎকার করবে। মঞ্জুকে রাজ্যের ভূত-প্রেতের গল্প বলে ভাব জমিয়েছে দাঁতু ঘোষাল। লোকটা অত্যন্ত পাজী। হাসপাতালে থেকেও কী করে যে ও গাঁজা খায়—গাঁজা পায়—বুঝতে পারে না প্রদ্যোত। ওকে তাড়িয়েই দিত সে। কিন্তু মশায়ের নিদানটার জন্যই রেখেছে। দেখবে সে।

আরোগ্য-নিকেতনের সামনে দিয়ে যাবার পথে নজরে পড়ল—মশায় কার হাত দেখছেন। ঘাড়টি ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। বোধ করি চোখ বন্ধ করে রয়েছেন। প্রদ্যোত হাসলে। সে শুনছে বিনয় মশায়কে তার দোকানে বসবার জন্য ধরেছে। অন্তত কিছুকালের জন্য। যতদিন সে কোনো পাসকরা ডাক্তারকে এনে বসাতে না পারে!

রানার হাতই দেখছিলেন মশায়। ভুজঙ্গগতি। কুটিল সর্পিল ভঙ্গি। এ সাপ রাজ-গোক্ষুরই বটে, দেহ-বিবরের মধ্যে বাসা বেঁধেছে; তার বিষ-নিশ্বাসে সারাটা দেহ অহরহই জরজর্জর। গায়ের গন্ধ থেকেও বুঝতে পারছেন। সাপের গায়ের গন্ধ চেনে যে প্রবীণ বিষবৈদ্য, গর্তের বাইরে বসেও তার গায়ের গন্ধ পায়। সে গন্ধ তিনিও পাচ্ছেন। ধীরে ধীরে এবার চোখ খুলে চাইলেন। রানার মুখের দিকে তাকালেন। চোখের চারিপাশে কালো ছায়া পড়েছে; চোখ দুটি ক্লান্তিতে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মতো বিষণ্ণ, তার চারিপাশে রাহুর উদ্যত গ্রাসের মতো গাঢ় কৃষ্ণমণ্ডল। রানার হাতখানি ছেড়ে দিয়ে বিষণ্ণ হেসে বললেন—রোগ তাই বটে বাবা।

রানা হেসেই বললে—সে তো আমি জানি গো! নিজে তো গোড়া থেকেই বলছি। তা কী বুঝছেন? বাঁচব? ভালো হবে? না? একটু হেসে বললে—যদি মরি তো কতদিনে মরব? বলুন আপনি, অসঙ্কোচে বলুন। রানা ভয় করে না।

মশায় চুপ করে রইলেন। ভাবছিলেন—নূতন ওষুধ উঠেছে 'স্ট্রেপ্টোমাইসিন', তার কথা। সে নাকি অব্যর্থ।

রানা আবার বললে—বলুন গো! আপনি মশায়, আপনি ভয় করছেন কেন গো!

মশায় বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আজও কিছু বলব না বাবা। তুমি কাল বিকেলে আসবে—এখানে নয়, বিনয়ের দোকানে। ওখানেই আমাকে পাবে। কিন্তু হেঁটে এমন করে এস না, গোরুর গাড়ি করে আসবে। হাঁটাহাঁটি পরিশ্রম এসব এখন স্থগিত রাখো। আর সেই মেয়েটির সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করতে হবে। বুঝেছ?

রানা খুশী হয়ে উঠল। বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। যা বললেন আমি তাই করব। কাল আমি গাড়ি করে বিনয়ের দোকানেই আসব। আর একটা কথা আছে আমার, রাখতে হবে।

—কী বলো। হাসলেন মশায়।

—সে মেয়েটার ব্যামো আমার চেয়েও বেশী। বাঁচবে না। তবে রোগ তো একই। তাকেও আমার সঙ্গে দেখুন না কেন? আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তাকে ছোঁব না। কিন্তু তাকে যখন আশ্রয় দিয়েছি—আর ধরুন—তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। একটা দায় তো আমার আছে। তাকে আজ তাড়িয়ে দেওয়াটা কি আমার পাপ হবে না? সে হতভাগী আবার কোথায় কার ঘরে যাবে, বিষ ছড়াবে!

—এনো। তাকেও এনো। দেখব।

রানা চলে গেল।

মশায় বিনয়কে বললেন—এই জন্যেই রানাকে আমি এত ভালোবাসি।

বিনয় হেসে বললে—আমাকেও বাসেন। আমার দোকানে বসতে রাজী হয়ে আমার কী মুখটা যে রেখেছেন আপনি—সে কী বলব?

ইন্দির এসে দাঁড়াল। একখানা ফর্দ হাতে দিলে। বললে—একবারে মাসকাবারি হিসেব করে জিনিস নিয়ে এলাম। এই ফর্দ।

মশায় হাসলেন, বললেন—উত্তম। গিন্নীকে দাও গে, রেখে দেবে। না হয় ফেলে দেবে। কমিশনে কুলোয় ভালো, না হলে বিনয়কে তালগাছ দিলেই হবে।

বিনয়ের দোকানে বিকেলবেলা বসতে তিনি রাজী হয়েছেন। অহি সরকারের বাড়ি থেকে এসে রানার পাশে বিনয়কে বসে থাকতে দেখেই বলেছেন—এসেছিস? আচ্ছা তাই হল, বসব তোর দোকানে। ইন্দির চলে যেতেই সেতাবের দিকে তাকিয়ে মশায় বললেন—বলছিলম না, সংসারচক্র! এই দেখ। বিনয়চন্দ্র মাসকাবারি জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেতাব বসে ছিল ঘরের কোণে। সামনে দাবার ছকটি বিছিয়ে দুদিকেই গুটি সাজিয়ে নিবিষ্ট মনে খেলে যাচ্ছিল।

এতক্ষণে মুখ তুলে সেতাব বললে—তালগাছ বেচতে গিন্নী রাজী হয়েছে?

জীবনমশায়ের লাইকার পুকুরে পঁচিশটা তালগাছ আছে। সোজা এবং সুদীর্ঘ আর বহু পুরনো। এ অঞ্চলে গাছ কটির খ্যাতি বহুবিস্তৃত এবং সর্বজনস্বীকৃত। এমন পাকা সোজা

তালগাছ একালে সুদুর্লভ। ওই গাছ কটি আতর-বউয়ের সম্পত্তি, তাঁর বক্ষপঞ্জর বললেও অত্যুক্তি হয় না। যুদ্ধের আগেই এসব গাছের দাম ছিল তিরিশ টাকা। এখন আশি-নব্বুই টাকা লোকে হাসিমুখে দিতে চায়। কিন্তু আতর-বউ তা দেবেন না। ছন্নমতি লক্ষ্মীছাড়া ভাগ্যহীন স্বামীর উপর তাঁর আস্থা নাই। পঁচিশটির দশটি নিজের এবং দশটি স্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য রেখেছেন। পাঁচটি রেখেছেন আপৎকালের জন্য।

জীবনমশায় হেসে বলেন—কুড়িটি হল ভবসাগর পারের ভেলা। আর পাঁচটি হল শেষ বয়সে খানা-খন্দ পার হওয়ার নড়ি। তা বিনয় বলেকয়ে ওই পাঁচটি নড়ির থেকে একটা দিতে রাজী করেছে। বলেছে, টাকাটা পোস্টাপিসে জমা রেখে দেব।

একত্রিশ

"এ লজ্জা রাখবার আমার আর জায়গা নাই। মৃত্যু হবার আগেই আমি মরে গেলাম লজ্জায়। আমি আপনাকে দুঃখ দিয়ে গেলাম। শত্রু-পুত্রের কাজ করে গেলাম।"

কথাগুলি বিপিনবাবুর প্রায় শেষ কথা। বলে গেছে বাপকে। রতনবাবুকে। এ দেশে চলতি একটা প্রাচীন ধারণা আছে;—পূর্বজন্মের ক্ষুব্ধ শত্রু পরজন্মে পুত্র হয়ে জন্মায়, বড় হয়, মা-বাপের মনে বিপুল প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে, তারপর একদিন সে মরে, নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে—পূর্বজন্মের শত্রু এ জন্মের বাপের উপর শোধ নিয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে উচ্চশিক্ষিত বিপিনও এ ছাড়া বলবার কথা খুঁজে পায় নি।

দিন বিশেক পরের কথা।

মশায় বসে ছিলেন বিনয়ের দোকানে। কথাগুলি বলছিল কিশোর। গতকাল বিপিন রাত্রি সাড়ে এগারোটায় মারা গিয়েছে। দশদিন আগে ডাক্তারেরা বলেছিলেন—বিপিনবাবু ভালো আছেন। অন্তত এবারের মতো বিপদ কেটেছে। এবং আর অবস্থা খারাপ না-হলে ধীরে ধীরে সেরে উঠবেন। আটদিন আগে কলকাতা থেকে ডাক্তার চ্যাটার্জি এসেছিলেন। তিনি ডাক্তারদের মত সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু উৎসাহের সঙ্গে নয়।

রতনবাবু একবার মশায়ের কথা তুলতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন—আমাদের এখানে একজন নাড়ী দেখার বিশেষজ্ঞ আছেন। তিন পুরুষ ধরে নাড়ী দেখার সুনাম। নিদান দিয়েছেন—।

বাধা দিয়ে প্রদ্যোত বলেছিল—তাঁর কথা বিশ্বাস করলে—

ডাঃ চ্যাটার্জি ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেছিলেন—কী বলেছেন তিনি? নিদান-টিদান দিয়েছেন না কি?

—না। তা ঠিক বলেন নি—তবে—।

ডাঃ চ্যাটার্জি বলেছিলেন—হাত দেখায় অবিশ্বাস আমি করি না, আমার বয়স

হয়েছে। প্রথম জীবনটা হাত দেখার উপর নির্ভর করতে হত অনেকটা। আমাদের ডাক্তারেরাও অনেকে খুব ভালো হাত দেখতে পারতেন। পারেনও। কিন্তু চিকিৎসা যখন আমরা করছি আমাদের কথাই বিশ্বাস করুন। তিনি হয়তো বলেছেন—রোগ একেবারেই অসাধ্য। এই এতদিনের মধ্যে—কিছু হবে। আমরা বলছি—না হতেও পারে। অসাধ্য রোগ আমরা বলব না। শেষ পর্যন্ত লড়াই করব। তাঁর কথায় বিশ্বাস করলে রোগীকে—আত্মীয়-স্বজনকে হাল ছেড়ে দিয়ে চরম দুর্ঘটনার জন্যই শুধু অপেক্ষা করতে হবে।

তারপর আবার বলেছিলেন—একটু হেসেই বলেছিলেন—আমিও এদেশের লোক, ডাক্তারি করি অবশ্য। কিন্তু যা তিনি বলেছেন—তা তো বুঝছি। সে তো একটা বড় জিনিস। কষ্টদায়ক দুঃসাধ্য ব্যাধি, কোনো ক্রমে বাঁচলেও সে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা। এবং সংসারে জন্ম হলেই যেখানে মৃত্যু ধ্রুব সেখানে যদি অনায়াসে স্বচ্ছন্দে জীর্ণ অকেজো দেহটার পতনই কাম্য মনে করতে পারেন, সে তো বড় জিনিস। সেটা আপনাদের দিকের কথা, আমরা বলব কেন?

ডাঃ চ্যাটার্জি চলে যাবার তিন দিন পর রোগ হঠাৎ বেঁকে দাঁড়াল। প্রস্রাবের রঙ খারাপ হল, পরিমাণে কমে গেল। এবার প্রস্রাব পরীক্ষার ফল দাঁড়াল শঙ্কাজনক। হার্টের অবস্থা খারাপ দাঁড়াল। হার্টরেট একশো তিরিশ। এবং গতি তার বাড়বার দিকে।

হরেন আবার ছুটে গেল কলকাতা। ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন—ওইটেই আমার আশঙ্কা ছিল। তাই দাঁড়াল। এখন—

একটু চিন্তা করে বলেছেন—হাত আর কিছু নেই।

ঘাড় নেড়েছেন বার বার।—নাঃ। হাত নেই। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন—ডিজিটিলিস ইনট্রাভেনাস দিয়ে দেখ।

হরেন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল শুনে।—ডিজিটিলিস? ইনট্রাভেনাস? আপনি চলুন তা হলে।

—আমি? আমি গিয়ে আর কী করব? আমি তো বলছি—সামনে চরম অবস্থা। ধ্রুব বললেই হয়। এখন চান্স নিয়ে দেখতে পার। যদি ভালো করে, ক্রাইসিসটা কাটবে। ক্রাইসিসটা কাটলে দরকার হয় যাব।

কিন্তু সে ঝুঁকি এখানে কেউ নিতে চায় নি। হরেন চারুবাবু কেউ না। প্রদ্যোত একটু ভেবেছিল। শেষ পর্যন্ত সেও সাহস করেনি। মনে অস্বস্তিরও শেষ ছিল না।

বিপিনবাবুর তখনও জ্ঞান ছিল। কলকাতার ডাক্তার না আসতেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। নিজেকে প্রস্তুত করতে গিয়েই বৃদ্ধ পিতার দিকে লক্ষ্য করে ওই কথাগুলি বলেছিলেন।

—এ লজ্জা রাখবার আমার ঠাঁই নাই। মরণের আগেই আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। আপনাকে দুঃখ দিয়ে গেলাম। শত্রু-পুত্রের কাজ করে গেলাম।

অসাধারণ মানুষ রতনবাবু। বিষণ্ণ হেসে তিনি ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—

তুমি আমার বীরপুত্র। জীবন-সংগ্রামে ভয় পাও নি, পিছু হট নি, বিশ্রাম নাও নি—যুদ্ধ করতে করতেই পড়লে ; তার জন্য লজ্জা কী ?

—লজ্জা ? বৃদ্ধ বয়সে আবার আপনাকে বর্ম পরতে অস্ত্র ধরতে হবে। এ থেকে আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না। এই লজ্জা। এই তো আমার চরম হার।

রতনবাবু ছেলের মাথায় হাত রেখে চোখের জলের সঙ্গে ঠোঁটের বিচিত্র হাসির সঙ্গে বলেছিলেন—কার কাছে হার ? যার কাছে তোমার হার তার কাছে—রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ থেকে ভীষ্ম দ্রোণ নেপোলিয়ান—হার মেনেছে। ও কথা ভেবো না।

ঘাড় নেড়ে বিপিন বলেছে—না। হার আমার নিজের কাছে। ডাক্তার চ্যাটার্জি আমাকে বার বার বলেছিলেন, এ কর্মজীবন আপনি ছাড়ুন। এ রোগ রজগুণের রোগ, রাজসিকতা সব ছেড়ে—সাত্ত্বিক জীবন না হলে আপনার রোগ সারবে না, বাড়বে। আমি বলি নি কাউকে। চেষ্টা করেও পারি নি ছাড়তে। হার আমার নিজের কাছে।

এরপর আর কিশোর ঘরে থাকতে পারে নি। বেরিয়ে চলে এসেছিল। এর আগের দিন থেকেই বিপিনের প্রস্রাব বন্ধ হয়েছিল। তারই পরিণতিতে ক্রমশ মোহাচ্ছন্ন হয়ে বিকেলবেলা পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। রাত্রি এগারোটার সময় মৃত্যু হয়েছে।

সমস্ত গ্রামটা—শুধু গ্রামটা কেন,—এ অঞ্চলটা—বিপিনের মৃত্যুতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। এত বড় একটা মানুষ, কর্মবীর, স্বনামধন্য পুরুষ। তার মৃত্যুতে হওয়ারই কথা। সকালবেলা শবযাত্রার সময় কাতারে কাতারে লোক ভেঙে এসেছে। ম্লান বিষণ্ণ মুখ। সমস্ত অঞ্চলটার আকাশে যেন একটা ছায়া পড়েছে। জীবনমশায়ও উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। মৃত্যুমুখরা পৃথিবী! হেন ক্ষণ নাই যে ক্ষণে লয় না ঘটছে, মৃত্যুর রথ না চলছে। জীবন জন্ম দিয়ে মৃত্যুকে ছেয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে। তবু তাকে জানা যায় না, জানবার উপায় নাই। তাই তাকে এত ভয়। মধ্যে মধ্যে তো ভয় ঘোচে, মানুষ তো জয় করে মৃত্যুভয়কে, দলে দলে তো ছুটে চলে মৃত্যুবরণ করতে। তখন তো মৃত্যু অমৃত হয়ে যায়। বিপিন যে ধরণের মানুষ, যে শিক্ষা সে পেয়েছিল, তাতে তার দেশের জন্যে মৃত্যুবরণ করা আশ্চর্যের কথা ছিল না, তাই যদি সে করত, তবুও কি এমনি ছায়া পড়ত ? তা তো পড়ত না! অকস্মাৎ মশায়ের খেয়াল হল, কিশোর কখন উঠে গিয়েছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মশায়। তারপর নিজের নাড়ীটা ধরে বসলেন।

কিছু বুঝতে পারা যায় ? কোনো বৈলক্ষণ, কোনো ইঙ্গিত ? না।

—হাত দেখছেন ? নিজের ? বিনয় এসে ঢুকল।

—হ্যাঁ।

—শরীর-টরীর—

—না। হাসলেন মশায়।

—কদরু এসেছে। ওর আজ ইনজেকশনের দিন।

—কই ?

—হুজুর! এসে দাঁড়াল বুড়ো জুতো-সেলাইওয়ালা।

বিনয়ের এখানে কদ্রুই তাঁর প্রথম রোগী। রানা সেদিন এখানে আসবার আগেই সে এসেছিল। বুড়ো, আমাশয়ের রোগী। পুরানো রোগ। কিন্তু আশ্চর্য রোগী। এমন সাবধানী রোগী আর দেখা যায় না। রোগ তার দুরারোগ্য, আজও সারল না। কিন্তু কদ্রুকে কখনও পাকড়াও করতে পারলে না। রোগ বাড়লেই কদ্রু খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দেয়। চিকিৎসক যদি বলেন—এক পোয়া খাবে তবে সে আধ পোয়ার বেশী খাবে না।

বাতিক তার ওষুধের। বারোমাসই একটা-না-একটা ওষুধ তার খাওয়া চাই-ই। তা সে ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমি, টোটকা যা হোক। পালা আছে। কিছুদিন ডাক্তারী তারপর কিছুদিন কবিরাজী।

কদ্রু তাঁর পুরনো রোগী। কদ্রু এ দেশের লোক নয়। বোধ করি বিলাসপুর অঞ্চলের চর্ম-ব্যবসায়ী। সেকালে এ দেশে তাদের যে প্রথম দল এসেছিল তাদের মধ্যে ছিল কদ্রু। কদ্রু তখন নূতন জোয়ান, সঙ্গে বউ আর একটি ছেলে।

মশায় সেকালে ওর ছেলেটাকে কঠিন রোগ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই কারণে কদ্রু মশায়কে দেখলেই এসে পথ রোধ করে দাঁড়াত। জুতোটা বুরুশ করে দিব মহাশা।

জুতো পরিষ্কার না করিয়ে উপায় ছিল না তাঁর। দাঁড়াতেই হত। সে যেখানেই হোক। বাজারে, হাটে, ইস্কুলের সামনে, সবরেজিষ্ট্রি অফিসের অশথতলায়—কদ্রু এক-একদিন এক-এক জায়গায় পালা করে বসত। সেদিক দিয়ে যেতে হলেই কদ্রুকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নিতে হত।

পয়সা অবশ্যই দিতেন মশায়। কদ্রুর আগ্রহের দাম দেওয়া যায় না। বনবিহারীর মৃত্যুর পর যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন না তখনও মধ্যে মধ্যে কদ্রু বাড়ি গিয়ে জুতো পালিশ করে দিয়ে এসেছে। তখন কোনোদিন পয়সা পেয়েছে কোনোদিন পায় নি। আজ বছর কয়েক কদ্রু বুড়ো হয়ে অক্ষম হয়েছে। সবরেজেষ্ট্রি অপিসের অশথতলাটি ছাড়া অন্য কোথাও আর যায় না, যেতে পারে না। বিনয়ের দোকান সবরেজিষ্ট্রি অপিসের কাছেই। এবার কদ্রু ঠিক এসে হাজির হয়েছে। জুতোও সাফ করে দিয়েছে। এবার অসুখটা বেশী।

কদ্রুর মৃত্যুকাল নিরূপণ করা কঠিন। কদ্রু রোগকে প্রশ্রয় দেয় না। সাবধানী লোক। কিন্তু রোগটা যেন ক্রমশ গ্রহণীতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে মনে হচ্ছে। তার পায়ের ধ্বনি এইবার কোনোদিন বেজে উঠবে।

এবার কদ্রু বলেছে—সুই দাও বাবা মহাশা। বেশ ভালো তেজী টাটকা আমদানী দাওয়াই দিয়ে সুই দাও।

—সুই? ইনজেকশন? মশায় হাসলেন—জলদি আরাম চাই কদ্রু?

—হাঁ বাবা। বিনা কামসে খাই কী করে?

কদ্রুর ছেলেরা বড় হয়ে বাপকে ফেলে অন্যত্র চলে গেছে। স্ত্রী মরেছে। কদ্রু এখন একা। কাজেই খাটতে হবে বইকি।

মশায় বলেছিলেন—তার থেকে তুই হাসপাতালে যা না কদরু ! তোর সাহেবকে ধরলেই তো হয়ে যাবে।

কদরুর সাহেব হল কিশোর। কিশোরকে, কেন কে জানে, কিশোরের ছেলেবেলা থেকেই কদরু বলে সাহেব। ওই আর-একজন তার ভালোবাসার জন। কিশোরকে সে ভারি ভালোবাসে।

কিশোরের সঙ্গে কদরুর আলাপ ফুটবল মেরামতের সূত্র ধরে। তখন কিশোর হাফপ্যাণ্ট, জারসি পরে ফুটবল খেলত। ছেলেদের দলের ক্যাপ্টেন ছিল, বোধ করি সেই কারণেই বলত সাহেববাবু। পরে খদ্দরধারী কিশোর কত আপত্তি করেছে, কখনও কখনও ধমকও দিয়েছে কদরুকে, তবু কদরু সাহেববাবু নাম ছাড়ে নি।

কদরু হাসপাতালে যেতে রাজী হয় নি।—নেহি মা-বাপ। উসমে হামি যাবে না। উ সব বাবু লোক—মেমসাহেব লোক ওষুধ পিলায়, আর তা ছাডা বাবা, দিনরাত বিস্তারায় শুয়ে থাকা, ওই সব লোকের সেবা নেওয়া কি আমার মতো চামারের কাজ ?

—আরে ! ওই জন্যেই তো ওরা আছে। হাসপাতাল তো সবারই জন্যে। রোগী তো হল হাসপাতালের দেবতা রে। তার জন্যে তুই সরম করিস না।

—না বাবা। না।

—কেন রে ? আমি বলছি ভালো হবে। তুই যে রকম নিয়ম করিস তাতে চট করে সেরে যাবি। আর রোগ বলে শুয়ে থাকাই তো নিয়ম।

—তাই তো থাকি বাবা। গাছতলায় চ্যাটাই পেড়ে বসে থাকি, বসে বসেই কাম করি। ঘুম পেলে ঘুমুই।

—সেই হাসপাতালে ঘুমোবি।

—আমি দাওয়াইয়ের দাম দেব বাবা।

—তার জন্যে আমি বলি নি কদরু। হাসপাতালে গেলে তোর ভালো হবে।

—নেহি বাবা। হাসপাতালে যে যাবে সে বাঁচবে না। আম বলে দিলাম।

—কেন ?

—হাসপাতালে দেও আছে বাবা। রাতমে ঘুমে ঘুমে বেড়ায়। কবরস্তানের উপর হাসপাতাল ; সেই কবর থেকে ভূত উঠেসে।

মশায়ের মনে পড়ে গেল কথাটা। সেদিন রাত্রে প্রদ্যোত ডাক্তারের রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ভূতে নাকি মাংস চেয়েছিল। ডাক্তারেরা কেউ মাংস খান নি। পরের দিন দাঁতু ঘোষাল হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে।

মশায় ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। একটা কথা তাঁর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে—কিন্তু থাক সে কথা। ভূত একবার তিনি দেখেছিলেন। সে মাছ খাচ্ছিল। রাত্রি তখন একটা। তিনি ডাক থেকে রোগী দেখে ফিরছিলেন। পথে নবগ্রাম ঢুকবার মুখে বাগানওয়ালা পুকুরটার ঘাটের পাশে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল একটা আপাদমস্তক সাদা-কাপড়-ঢাকা মূর্তি। কিছু

যেন খাচ্ছিল। জ্যোৎস্নার মধ্যে হাত মুখের কাছে তোলা বুঝতে পারা যাচ্ছিল।

গাড়োয়ানটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভয় পান নি। গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়েছিলেন। দেখেছিলেন প্রেতই বটে। মাছ খাচ্ছে। সে ছবিটা যেন চোখের উপর ভেসে উঠেছে। দেখেছেন তিনি।

এবার তাঁর মুখে এক বিচিত্র ধরণের হাসি দেখা দিল। এ সংসারে সবই আছে। ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য সবই আছে। নাই কে বলে? যদি সত্যকারের সেই দৃষ্টি থাকে তবে নিশ্চয় দেখতে পাবে।

কদ্রুকে ইনজেকশন দিয়েই চিকিৎসা তিনি শুরু করেছিলেন। বিনয়ের দোকানে নতুন আটনে কদ্রু তাঁর প্রথম রোগী। আজ আবার কদ্রুর ইনজেকশনের দিন। ঠিক সে এসে দাঁড়িয়েছে।

মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছিস?

—না—না। ঘাড় নাড়লে কদ্রু। ভালো না বাবা মহাশা। ভালো না। থোড়াথুড়ি বুখার ভি হয়।

—দেখি, হাত দেখি। হাত ধরে মশায় বললেন—বড় যে দুর্বল হয়ে পড়েছিস কদ্রু অসুখ বেড়েছে? বেশী ঝাড়া যাচ্ছিস?

—না বাবা। কম হোয়েসে। সো তো কম হোয়েসে।

—তবে? খাচ্ছিস কী?

—কী আর খাব বাবা? থোড়াসে বালিকে পানি। ব্যস। আর কুচ্ছু না। কুছ না।

—কিন্তু খেতে যে হবে রে। না খেয়েই এমন হয়েছে।

—ডর সে মারে, খেতে পারি না বাবা মহাশা।

—ডর করলে হবে না। খেতে হবে। না খেয়েই তুই মরে যাবি।

—মরণকে তো ডর নোহি বাবু। বেমারির দুঃখকে ডর করি বাবা। খানাপিনা করব, যদি বেমারি বাড়ে? পেটকে দরদ যদি বেড়ে যায় বাবা? শেষে কি ময়লা মিট্টি মেখেই মরব বাবা?

মশায় আজও বললেন—তুই হাসপাতালে যা। তোর সাহেববাবু রয়েছেন—বলে দিলেই হয়ে যাবে। আর তুই যেরকম রোগী, হয়তো অল্পেই ভালো হয়ে যাবি।

কদ্রু বললে—ওই তো বাবু, এতনা বড়া বাবু এতনা কিস্মত—কাঁচা উমরমে চলিয়ে গেল। এতনা দাওয়াই, ভারী ভারী ডাকডর! কী করলে হুজুর? কুছ না। হুজুরকে বাতই সাচ হইয়ে গেলো।

—কী? মশায় আর্ত চকিত স্বরে প্রশ্ন করলেন।

—হুজুর তো বলিয়ে দিয়েছিলেন—বাবু নেই জীয়েগা, ওহি তো সত্যি হইল হুজুর। কলকাত্তা সে ডাকডর আইল—কুছ হইল না।

মশায়ের সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল। এ কী বলছে কদ্রু! চুপ করে বসে রইলেন

তিনি, আত্মসম্বরণ করছিলেন।

কদ্রু বলেই গেল—আওর বাত আছে বাবা। উ রোজ আপনাকে বলিয়েছি, বিনয় বাবা ভি জানে—হাসপাতালমে পিরেত আছে. উঁয়া কোই নেহি বঁচেগা।

বিনয় বাইরে দাঁড়িয়েছিল—ঘরে এসে ঢুকল। বললে—মিথ্যে বলে নি কদ্রু। সেদিন প্রদ্যোত ডাক্তারের বাসায় খাওয়া-দাওয়ার জন্যে মাংস রান্না হয়েছিল। জানালার বাইরে থেকে ভূতে মাংস চেয়েছিল। ডাক্তারের রাঁধুনী বামুন চোখে দেখেছে। গণেশ ভটচাজের মেয়ের প্রসব হয়েছিল হাসপাতালে, ডাক্তার কেসটা খুব বাঁচিয়েছে। সে মেয়ে ভয়ে বাঁচে না। গণেশ তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

মশায় যেন আগুনের ছেঁকা খেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে সবিস্ময়ে বললেন—ভূত?

বিনয় বললে—দাঁতু দেখেছে! কবরস্থান থেকে—

—দাঁতু?

—হ্যাঁ। আজ সকালে মহা হাঙ্গামা করেছে। থাকবে না সে হাসপাতালে। কাল সারা রাত্রি নাকি ঘুমোয় নি ভয়ে।

এ কথায় মশায় যা করলেন তা বিনয়ের কল্পনাতীত। ক্রোধে ঘৃণায় তিনি যেন ফেটে পড়লেন।—দাঁতু মরবে। নিদানে আমার ভুল হয় না। প্রেত দেখা দিয়েছে দাঁতুকে নেবার জন্যে। এ প্রেত দাঁতুর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। অন্যে পায় না দেখতে, আমি পাই।

কদ্রু বিনয় স্তম্ভিত হয়ে গেল কথা শুনে। বিনয়ের মনে হল—মশায়ের মাথার গোলমাল হল না তো?

মশায় বললেন—ডাক যারা রোগী আছে। উঠব। সেতাব এল না কেন?

বিনয়ের দোকানেই এখন সেতাব আসে ছক গুটি নিয়ে। এখানেই বসে দাবার আসর। বেশ একটি মজলিশ জমে যায়।

* *

সেতাব আসে নি, সেতাবের বাড়ির দোরে নিশিঠাকরুনের ভাইঝি মারা গিয়েছে। সেই পনেরো বছরের মেয়ে, দুটি সন্তানের জননী—সূতিকায় যার দেহবর্ণ হয়েছিল অতসী ফুলের মতো। মশায় যার নাড়ী দেখে মৃত্যু স্থির বলে জেনে এসেছিলেন। নিশি শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছিল শশীকে। শশী বিচিত্র উদ্ভট চিকিৎসা-পদ্ধতিতে মেয়েটাকে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিয়েছে খেয়ার ওপারে।

শেষ তিনদিন অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় নিশি হরেনকে ডেকেছিল।

গ্রামের লোক হরেন বিনা ফীজেই দেখেছিল। কয়েকটা ইনজেকশনও দিয়েছিল। আধুনিক মূল্যবান ওষুধ।

নিশি এখন গালাগাল করছে হরেনকে।

মশায় বাড়ি ফিরবার পথে সেতাবের বাড়ি এসেছিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে

গেলেন। কাল রাত্রে বিপিন মারা গিয়েছে ; আজ সূর্যোদয়ের পূর্বে বিপিনের শবযাত্রায় এ অঞ্চলের আবালবৃদ্ধ-বনিতা ভিড় করে রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়েছিল, শ্মশান পর্যন্ত বিরাট জনতা অনুসরণ করেছে। সারাটা দিন জীবনের জ্যোতির উপর একটা ম্লান ছায়া ফেলে রেখেছে। মানুষ ক্লান্ত, শোকার্ত ; আর তারা পারছে না। নিশির ভাইঝির মৃতদেহের পাশে নিশি বিলাপ করে কাঁদছে, ডাক্তারকে গাল দিচ্ছে। দু-তিনটি প্রতিবেশিনী বসে আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর আর তিন-চারজন কিশোরপন্থী জোয়ান ছেলে। তারাই নিয়ে যাবে শবদেহ।

বাজারটা আজ ম্রিয়মাণ। আলো আছে। কয়েকটাই হ্যাজাক-বাতি জ্বলছে। বাতির সংখ্যা বেড়েছে এখন। ডাক্তারদের নতুন কো-অপারেটিভ মেডিক্যাল স্টোর্সে দুটো আলো জ্বলছে। একটা ভিতরে একটা বাইরে। এখনও সব ওষুধের চালান আসে নি, কিছু কিছু নিয়ে দোকান খোলা হয়েছে। চারুবাবু বসে আছেন বাইরে। হরেনও রয়েছে। বিপিনের কথাই হচ্ছে।

মশায় ভাবছিলেন নিশির ভাইঝির কথা। সেদিন ওকে দেখেই মনে পড়েছিল তাঁর জীবনে নাড়ী-পরীক্ষা বিদ্যায় দীক্ষার দিন—তাঁর বাবা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন একটি কঠিন রোগী দেখতে। ঠিক এই রোগী। এমনই বয়সের মেয়ে, এমনি দুটি সন্তানের জননী, আর একটি গর্ভে। বাবা আসবার পথে বলেছিলেন—এই হল মৃত্যুরোগের নাড়ী! মেয়েটি বাঁচবে না, বাবা। আর একটি লক্ষণ দেখলে ? মেয়েটির রুচি যাতে রোগ বাড়ে তাতেই।

মেয়েটির হাতে তেলেভাজার তৈলাক্ততা এবং গন্ধ তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। নিশির ভাইঝিও সেদিন আচার চুরি করে খাচ্ছিল। ওঃ, সেদিন মেয়েটিকে খুকী বলাতে ওর কী হাসি। বারো বছর বয়সেই মেয়েটির প্রথম সন্তান হয়েছিল ; সাড়ে তেরোতে দ্বিতীয় সন্তানের মা হয়েছে ; পনেরোতে তৃতীয়টিকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছে। সে খুকী!

মেয়েটা হাসলে গালের দুদিকে দুটি টোল পড়ত।

অন্ধকার রাত্রে ছায়ামূর্তির মতো কে যেন মনশ্চক্ষুর সামনে দাঁড়াল। কালো কোঁকড়া একপিঠ খাটো চুল। এও মুখে কাপড় দিয়ে হাসে। এও হাসলে গালে টোল পড়ে।

মঞ্জরী বোধ হয় মরেছে। মধ্যে মধ্যে নির্জন অবসরে ঠিক এমনিভাবে চকিতের মতো ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়।

হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে প্রদ্যোত ডাক্তারের বারান্দায় আলো জ্বলছে। প্রদ্যোত আজ চুপ করে বসে আছে। বোধ হয় ভাবছে ডাক্তার। ডাক্তার মাত্রই ভাবে। ভাবে কোথাও কোনো ত্রুটি তার ঘটেছে কিনা!

ত্রুটি ঘটে থাকলে নীরব অনুশোচনায় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবে। অন্তরটা হায় হায় করবে। ত্রুটি না থাকলে এমনি গ্লানিহীন উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকবে। মনটা শূন্য হয়ে যায়। হঠাৎ বাতাস জাগে শূন্য-মণ্ডলে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চিকিৎসক ভাবে—অসহায়, মানুষ বড় অসহায়! কারও মনে বিদ্যুচ্চমকের মতো প্রশ্ন জেগে ওঠে—ডেথ! হোআট ইজ ডেথ!

বত্রিশ

বিছানায় শুয়েও মশায় জেগেই ছিলেন। ঘুম আসে নি। তাঁর মনটাও উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঘুম আসছে না। বিপিনের মৃত্যু এবং নিশির ভাইঝির মৃত্যু তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দাঁতুর কথা, ওই লোকটার উপর তিক্ততা, মনে কোণে কোণে ঢাকা পড়ে গেছে। পাশের বিছানায় আতর-বউ ঘুমুচ্ছে। পাশের খোলা জানালাটা দিয়ে খানিকটা রাত্রির আকাশ দেখা যাচ্ছে। শরতের গাঢ় নীল নক্ষত্রখচিত আকাশের খানিকটা অংশ। কানে আসছে ঝিল্লির অবিরাম একটানা ডাকের শব্দ। তিনিও ভাবছিলেন—মৃত্যু কী? অনিবার্য পরিণতি, দুর্জ্ঞেয় রহস্য—এসবে মন ভরে না। পুরাণের সেই পিঙ্গলকেশিনীর কাহিনীতেও মনের তৃপ্তি হয় না। অজ্ঞান মুমূর্ষু রোগী বিচিত্রভাবে বেঁচে উঠেছে, তাদের দু-একজন বিচিত্র কাহিনী বলে। কেউ বলে সে যেন শূন্যলোকের মধ্য দিয়ে ভেসে যেতে যেতে ফিরে এসেছে; সে শূন্যলোক বিচিত্র। কেউ বলে—সে যেন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। দুজনের অভিজ্ঞতা একরকম নয়! এতেও নানা প্রশ্ন জাগে মনে। মন ভরে না। একটি কিশোর ছেলের কথা মনে পড়ছে। সে যা বলে গেছে তা অদ্ভুতভাবে মনে গেঁথে রয়েছে তাঁর। অনেকদিন আগের কথা। নবগ্রামের গোবিন্দ পাঠকের ছেলে নসীরাম। মৃত্যুশয্যায়—মৃত্যুর বোধ করি মিনিট পনেরো আগে বলেছিল। সে কী ঘাম! এমন ঘাম তিনি তাঁর সুদীর্ঘ চিকিৎসক-জীবনে কম দেখেছেন। আবীর, শুঁটগুঁড়ো মাখিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেল শুশ্রূষাকারীরা, ফুরিয়ে গেল আবীর, শুঁটগুঁড়ো—যা আনা হয়েছিল। রোমকূপের মুখগুলি থেকে অনর্গল ঘাম বের হচ্ছিল জলাজমি থেকে জল-ওঠার মতো। স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে কিন্তু জ্ঞান ছিল ছেলেটির। তিনি দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে দেখছিলেন। নাড়ী তার আগে থেকেই নেই। কে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল- নসু, নসু, নসু—! অ নসু!

ধীরে ধীরে ক্লান্ত চোখের পাতাদুটি খানিকটা খুলে গিয়েছিল, চোখের দৃষ্টিতে সাড়া দেওয়ার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল—অ্যাঁ?

—কী কষ্ট হচ্ছে তোমার? খুব কষ্ট?

ক্লান্তির সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—না।

—তবে?

একটু চুপ করে থেকে চোখ বুজতে বুজতে বলেছিল—মনে হচ্ছে—আমি—

—কী?

—আমি যেন অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। তোমাদের কথা ভালো শুনতে পাচ্ছি না। তোমাদের ভালো দেখতে—

ঘাড় নেড়ে জানাতে চেষ্টা করেছিল—পাচ্ছে না দেখতে। যেন আবরণ পড়েছে এবং সে আবরণ ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে।

এর চেয়ে ভালো বিবরণ তিনি আর শোনেন নাই।

ঠিক এই সময়টিতেই কে ডাকল—মশায়!

—কে? কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে জানালা দিয়ে বাইরের পথের দিকে তাকালেন মশায়। আলো হাতে দুজন লোক। কারা? কার কী হল?

—কে?

—আজ্ঞা আমরা পরান খাঁ সাহেবের বাড়ি থেকে আসছি।

—কী হল? বিবি তো ভালো আছে।

—আজ্ঞা না। বড় বিপদ! বিবি বিষ খেয়েছে মালুম হচ্ছে।

—বিষ খেয়েছে? কী বিপদ? ধড়মড় করে উঠলেন মশায়। আশ্চর্য। মানুষ আবার বিষও খায়, গলায় দড়িও দেয় কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়েও মরে, জলে ঝাঁপ দেয়!

পরান খাঁ দু হাতে মাথা ধরে চুপ করে বসে ছিল। মুখখানা তার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বিবি কল্কেফুলের বীজ বেটে খেয়েছে। পরান তাঁকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল, পরানেরও চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। বললে—সরকারী ডাকতার ঠিক বলেছিল মশায়। রোগ-টোগ উয়ার সব মিছা কথা; মেয়েটা নষ্ট মেয়ে। আমার মতো বুড়ো ওকে চোয় তাই রোগের ছলা করে পড়ে থাকত। বিষ খেয়ে গলগল করে বুলছে সব।

বাঁধা বন্য মহিষের মতো গর্জে মাথা নেড়ে পরান বললে—ওই হারামি গোলাম—ছামুতে পেলে বেটার গলার নলিটা আমি ছিঁড়ে নিতাম। ওই হারামির হারামি—রব্বানি। আর উয়ার মা। হারামজাদী বাঁদী। এককালে হারামজাদী আমার—

অশ্লীল কথা উচ্চারণ করলে পরান।

মশায় বললেন—এখন ওসব কথা থাক পরান। এখন ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে।

—মরে যাক, মরে যাক। কসবী শয়তানী জাহান্নামে যাক মাশায়, আপুনি শুধু শুনে যান উয়ার নিজের মুখে যে শয়তানী বিষ খেয়েছে। ওই নফর ওই হারামি রব্বানির লেগে খেয়েছে। নইলে আমাকে ফাঁসাবে ওই শয়তানেরা!

পরান দুহাতের মুঠোয় নিজের বাবরি চুল ছিঁড়ে দন্তহীন মুখের মাড়িতে মাড়িতে টিপে বললে—আঃ, নিজের ঘরে আমি নিজে শয়তান ঢুকায়েছি! আঃ!—সরকারী ডাকতার ঠিক বুলেছিল!

পরানের বিবি নিজে-মুখেই সব বলছে। গোঙাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে কথা বলছে। গোঙাতে গোঙাতেই বলছে।—পোড়া নসিব! পোড়া নসিবের সবই তো মানায়ে নিয়েছিলাম কোনো রকমে। খাঁ, রব্বানিকে তুমি ঘরে ঢুকালেই বা ক্যানে; উয়ার মাকেই বা রাখলা ক্যানে? রেখে, যা হবার হয়ে যখন গেল, তখুন তারে দূর করেই বা দিলা ক্যানে?

ঘটনাটা ঘটেছে এই:

কাল বিকেলবেলা থেকে পরানের বিবি বমি করতে আরম্ভ করেছিল। প্রথমটা ওটাকে অন্যতম গর্ভলক্ষণ বলেই মনে হয়েছিল সকলের। কিন্তু বার-বার বমি এবং সেই বমির সঙ্গে কয়েতবেল-বনকুল, লঙ্কার খোসা ইত্যাদি উঠতে দেখে প্রশ্ন ওঠে—এসব বিবি পেলে কোথায় ? কে এনে দিলে ?

বিবির তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। অনুসন্ধান করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। পরানের বিবির খাস-ঝি রব্বানির মা অত্যন্ত সমাদর এবং অনেক তরিবত করে কয়েতবেল গুড় লঙ্কা নুন মিশিয়ে চাটনি করে এনে খাইয়েছে। তার সঙ্গে কাঁচা বনকুল। এ আজ নূতন এবং একদিন নয়, এ চলছে কয়েক দিন ধরেই। কোনোদিন বাজারের মিষ্টি, কোনোদিন তেলেভাজা, কোনোদিন অন্য কিছু আসছেই। নিজের হাতে মুখে তুলে দিয়ে সাকিনা বেওয়া বিবিকে খাইয়েছে। এনে যুগিয়েছে রব্বানি। নতুন নক্সাপেড়ে শাড়িও নাকি দিয়েছে বুড়ী পরানের বিবিকে। পরানের বড় বিবি কথাটা বলেছে। সে নিজের চোখে দেখেছে রব্বানিকে কাপড় হাতে বাড়ি ঢুকতে, নিজের মায়ের হাতে দিতে ; এবং সেই কাপড় নতুন বিবির পরনেও সে দেখেছে।

পরানের বুকের মধ্যে লোহার ডাঙশ পড়েছিল। রাগের মাথায় সে প্রথমেই বড় বিবির চুলের মুঠো ধরে টেনে বলেছিল—ঝুটা বাত !

বড় বিবি আল্লার নামে কসম খেয়েছিল। বড় বিবিকে ছেড়ে দিয়ে পরান খুঁজেছিল সাকিনা বেওয়া আর বাঁদীর বাচ্চা রব্বানিকে। কিন্তু তারা দুজন তখন ফেরার। খুব হৈ চৈ করতে পরান পারে নি। আশপাশ গ্রামে হিন্দু মুসলমান দুই জাতের মধ্যেই তার দুশমন আছে। আজ চার-পাঁচ বছর ধরে নতুন-কেনা জমি নিয়ে তাদের সঙ্গে পাঁচ-সাতটা মামলা চলছে। রব্বানি মাকে নিয়ে তাদেরই কারুর বাড়িতে যে আশ্রয় নিয়েছে এতে সন্দেহ নাই। পরান বিষদাঁতভাঙা সাপের মতো নিষ্ঠুর আক্রোশে ঘুরে আক্রমণ করেছিল নতুন বিবিকে। প্রায়-অচেতন অবস্থার মধ্যেই তার চুলের মুঠো ধরে বার বার টেনে তাকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিল। হয়তো মেরেই ফেলত। কিন্তু নিবারণ করেছিল বড় বিবি।—'করছ কি সাহেব, ক্ষ্যাপে যে মরে যাবে। মরে গেলে যে ফাঁসিকাঠে বেঁধে টান দিবে গো! খেদায়ে দাও ওরে।'

তাও পরান পারে নাই। তাকে তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দেবে, হারামজাদী হাসিমুখে মাঠ পার হয়ে রব্বানির হাত ধরে তার আশ্রয়ে গিয়ে উঠবে—তা হবে না। ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। আজ সন্ধ্যেবেলা ঘাটে যাবার জন্য মিনতি জানিয়েছিল নতুন বিবি। খুলে দিয়েছিল বড় বিবি। ঘাটে অবশ্য পাহারা ছিল। ঘাটের পাশে ছিল কলকে ফুলের গাছ। পাহারাদারের চোখ এড়িয়ে কয়েকটা ফল পেড়ে আঁচলে লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। তারপর কখন খেয়েছে। এখন অর্ধ-চেতন অবস্থা। মরে গেলে ক্ষতি নাই। জাহান্নামে যাক নষ্টদুষ্ট আওরত, কসবী খানকী হারামজাদী। মশায় শুধু নিজের কানে শুনে রাখুন—হারামজাদী নিজে বিষ খেয়েছে। পরানের এতে কোনো দায় নাই। সে নির্দোষ।

*   *   *   *

সুন্দরী তরুণী মেয়ে। বিষের ঘোরে অর্ধ-অচেতন। বিষের যন্ত্রণায় ভেতরটায় মোচড় দিচ্ছে। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। মুখ নাক দিয়ে গেঁজলা বেরিয়ে আসছে, বুকে চাড়া দিয়ে উঠছে, যেন বুকটা শতধা বিদীর্ণ হয়ে যেতে চাইছে। চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত, লাল, সর্বনাশের ঘোর লেগেছে। বিস্রস্ত বেশবাস, মাথার একরাশ চুল খুলে এলিয়ে ধুলায় ধূসর হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে চারিপাশে। লোকেদের টানাটানিতে চিমটিতে মধ্যে মধ্যে জ্ঞান আসছে, তখন মুখর হয়ে উঠছে সে।

—আঃ। মরতেও আমারে দিবা না? মরণেও আমার একতিয়ার নাই? হায়ে নসিব। হারে নসিব!

হেসে আবার বলে—পারবা না মিয়া; পারবা না। রব্বানি শ্যাকের কাছে যাতি দিতে আমারে না পার। কিন্তু ইবার যে বঁধুর সাথে আসনাই করে তার হাত ধরেছি—তার হাত ছাড়াইতে তুমি পারবা না—পারবা না—পারবা না। আঃ আমারে একবার ছেড়ে দাও, খানিক ঘুমায়ে লই।

—অঃ—। আঃ—।

বলতে বলতে আবার বিষের ঘোরের একটা ঝলক ছড়িয়ে পড়ে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়; ঢলে পড়ে মেয়েটি, মাথাটা হেলে পড়তে চায়।

মশায় বললেন—পরান, তুমি হাসপাতালে নিয়ে যাও বিবিকে।

—হাসপাতালে? না। আমি তো বুলেছি মশায়—

—মাথা খারাপ কোরো না পরান। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। আমি আর সে মশাই নই পরান। যখন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত ছিলাম তখন এরকম অনেক কেসের হাঙ্গামা আমার হুকুমে মিটে গিয়েছে। আজ সেদিন নাই। আজ আমাকে যখন ডেকেছ, আমি যখন এসেছি, দেখেছি, তখন আমাকেই খবর দিতে হবে থানায়। তা ছাড়া আমি চিকিৎসক। আমি রোগীকে বাঁচাতে আসি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরণ দেখতে আসি না।

পরান গুম হয়ে বসে রইল কয়েক মিনিট। তারপর বললে, গাড়ি জুড়ে নিয়ে আয় রে হানিফ। জলদি! আপুনি তা হলে সঙ্গে চলেন মশায়।

রাত্রি তখন দুটো। মশায় ডাকলেন—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

প্রদ্যোত উঠে এল—কে?

—আমি জীবন দত্ত।

—আপনি এত রাত্রে?

—বিষ খেয়েছে একটি মেয়ে! কল্কেফুলের বীজ। তাকে নিয়ে এসেছি। পরান খাঁয়ের স্ত্রী।

—আমি আসছি এক্ষুনি। ওদিকে কম্পাউণ্ডার নার্সরা উঠেছে? তাদের ডেকেছেন?

—ডেকেছি।

—এক মিনিট। আসছি আমি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে, একটা হাফশার্ট গায়ে দিয়ে সে বেরিয়ে এল। কোনো প্রশ্ন করলে না, কোনো মন্তব্য করলে না। হাসপাতালে এসে সামনেই কম্পাউণ্ডার হরিহরকে দেখে প্রশ্ন করলে, সব তৈরি করতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

হরিহর বললে, মিনিট পনেরো লাগবে বৈকি? পটাশ পারমাঙ্গানেট লোশন আমি খাইয়ে দিয়েছি খানিকটা।

ডাক্তার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, পরান বললে—আমি চললাম ডাক্তারবাবু, মেয়েটা বাঁচলে পর পুলিসে দিবেন, না বাঁচে লাশ সদরে চালান দিবেন; সেখানে ফেড়েফুড়ে দেখে যা করবার করবে। সালাম!

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বললে—আঃ, তখুনি যদি আপনার কথায় গোসা না করতাম। আপনাকেই যদি দেখাইতাম! মশায় বুড়ো লোক, সিকালের লোক, নাড়ী দেখে মরণ ডাকতে পারে। ই ধরতে পারে না। চলে গেল পরান।

প্রদ্যোত ঘরে ঢুকে গেল। মশাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই হতভাগিনী মেয়েটাকে ফেলে যেতে তাঁর পা উঠছে না। হতভাগিনীর এতখানি ছলনা তিনি বুঝতে পারেন নি। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন, তা তিনি পারেন নি। তবে এটা তিনি জানতেন; বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি তরুণীর বিরূপ মনোভাবও তাঁর অজানা নয়; কিন্তু তার এমন বিচিত্র প্রকাশের স্বরূপটি তিনি অনুমান করতে পারেন নি। পরানের অতিরিক্ত সমাদর ও পত্নীপ্রীতিকেই এর কারণ বলে ধরেছিলেন। এবং আদরিণী ভাগ্যবতী মেয়ের দুলালীপনাকে পিতা যেমন স্নেহের চক্ষে দেখেন সেই চক্ষেই দেখেছেন। তিনি ভাবছিলেন সন্তান হলেই সেই সন্তানের স্নেহে তার জীবনের অপূর্ণতা পূর্ণ হয়ে যাবে। তার সন্তানধারণশক্তিকেই তিনি সবলতর করবার চেষ্টা করে এসেছেন। সে চেষ্টা তাঁর ফলবতীও হয়েছে। কিন্তু সে যে যৌবনপ্রভাবাচ্ছন্ন মনের বিচিত্র তৃষ্ণার তাড়নায় এই কুটিল পথে ফলবতী হতে পারে সে তিনি ভাবেন নি। প্রদ্যোত ডাক্তার বোধ করি ভেবেছিল। মশায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মেয়েটার প্রতি শত মমতায় যেন তিনি জড়িয়ে গেছেন। মেয়েটি কতবার তাঁর দিকে সজল চোখে চেয়ে বলেছে, বুঝতে পারি না মশায়-বাবা! মনে হয় হেথায় অসুখ, হেথায়, হেথায়, হেথায়। সব্বখানে গো বাবা, কুনখানে লয়। কী অসুখ তাও ঠিক ধরতে নারি। কনকনানি, বেথা, যেন বল নাই, সাড় নাই। আবার সময়ে সময়ে ছুঁলে পরেতেই যেন চিড়িক মেরে ওঠে। বলতে বলতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত। কতদিন প্রশ্ন করেছে, মশায়-বাবা, আমি বাঁচব তো?

চোখে দেখেছেন, সে কী ভয়!

সেই মেয়ে আজ বিষ খেয়েছে। মুখরা হয়ে উঠেছে। বলেছে—পারবা না মিয়া, পারবা না। যে বঁধুর হাত ধরেছি সে বঁধুর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবা না।

হরিহর বেরিয়ে এল, বলল—আপনি কি বসবেন মশায় ?

—হ্যাঁ বসব হরিহর। পরান তো চলে গেল। আমি পারছি না। হতভাগিনীর শেষটা না দেখে যেতে পারছি না।

দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল প্রদ্যোত ডাক্তার। কম্পাউণ্ডিং রুমে গিয়ে একটা কি নিয়ে এল। হরিহর বললে—উনি থাকবেন স্যার।

—থাকবেন ? বেশ তো। তা একা বাইরে বসে থাকবেন ? আসুন না, ভিতরে।

মশায় হেসে বললেন—আমি বাইরেই থাকি। বেশ থাকব।

শেষ রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বসে রইলেন। আকাশে নক্ষত্রদের স্থান পরিবর্তন ঘটছে। কালপুরুষ অনেকটা সরেছে। বৃশ্চিকের বাঁকা লেজের ডগায় ওই দেখা যাচ্ছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল পাক খাচ্ছে। ওই বশিষ্ঠের নিচে অরুন্ধতী। অরুন্ধতী যে দেখতে পায়, সামনে অন্তত আরও ছমাস পরমায়ু নাকি নিশ্চিত। আরও ছমাস তিনি তা হলে নিশ্চয় বাঁচবেন। সে অবশ্য তিনি নাড়ী দেখেও বলতে পারেন। কিন্তু ? হঠাৎ মনে হল—যদি তিনি বিষ খান এই মেয়েটার মতো, তা হলেও কি বাঁচবেন ? নাড়ী দেখে সে কথা তো বলা যায় না। অরুন্ধতী দেখে কি তা বলা যায় ? অবশ্য বিষ তিনি খাবেন না, কখনই খাবেন না। অধিকাংশ লোকই খায় না। মর্মান্তিক শোকে ক্ষোভে ব্যর্থতাতেও খায় না। মরণকে মানুষের বড় ভয়। মদ খেয়ে মরে, ব্যভিচার করে মরে, অনাচার করে মরে। বনবিহারীর মতো, ওই নিশির ভাইঝির মতো। বিপিনের নাম তিনি এদের সঙ্গে করবেন না। কিন্তু এরাও বিষ খেয়ে মরতে পারে না। সে এক আলাদা জাত আছে। এই মেয়েটার জাত। মেয়েদের মধ্যেই এ জাত বেশী।

'নারায়ণ! নারায়ণ! গোবিন্দ হে!'

হঠাৎ গভীর কণ্ঠে ডেকে উঠলেন মশায়। গোবিন্দ রক্ষা করেছেন, ভূপীকে না পেলে সে এমনিভাবে বিষ খেতে পারত। হ্যাঁ পারত। সে এই জাতের মেয়ে ছিল।

চঞ্চল হয়ে মশায় বারান্দা থেকে নিচে নেমে এসে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ালেন। পরমানন্দ মাধব!

হাসপাতালের লম্বা ঘরটার মধ্যে থেকে মৃদু আলোর আভাস বেরিয়ে আসছে। রোগীরা ঘুমুচ্ছে। তন্দ্রার মধ্যে কেউ কেউ অসুখে এ-পাশ ও-পাশ করছে। আশপাশে কোয়ার্টার্সগুলি নিস্তব্ধ। অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো ছবির মতো দেখাচ্ছে। পরিত্যক্ত কবরস্থানটার মাঝখানে বটগাছটার পত্রপল্লবের মধ্যে বাতাসের বেগে সরসর শব্দ উঠছে একটানা। হঠাৎ পায়ের তলায় পট করে একটা শব্দ উঠল : এঃ, একটা ব্যাঙ!

—কে ? একটি সাদা-কাপড়পরা মূর্তি, হাসপাতালের বারান্দার উপর। নারীমূর্তি একটি। মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—কে!

মৃদুস্বরে উত্তর এল—আমি একজন নার্স। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে ? বসুন।

—নাঃ, বেশ আছি। কেমন আছে মেয়েটি ?

—ভালো না।

—নারায়ণ হে! গভীর স্বরে আবার ডাকলেন মশায়। নার্সটি চলে গেল ঘরের মধ্যে।

ব্যাঙটা তার পায়ের চাপে ফেটে পিষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিচিত্র। তিনিই হলেন এই মুহূর্তে মৃত্যুর দূত। কোথায় নেই মৃত্যু? কিসে নেই মৃত্যু?

—মশায়।

—কে? হরিহর?

—হ্যাঁ।

—কী হল?

—আর কি? শেষ হয়ে গেল। হল না কিছু।

প্রদ্যোত ডাক্তার বেরিয়ে এল। বললে—পারলাম না কিছু করতে। দেখবেন নাকি?

—নাঃ। আমি যাই তা হলে।

—আচ্ছা। প্রদ্যোত যেন হঠাৎ প্রশ্ন করলে—আপনি ওদের বাড়িতে গিয়ে তো মেয়েটিকে দেখেছিলেন! তখন কি নাড়ী দেখে জানতে পেরেছিলেন বাঁচবে না?

—ওর হাত আমি দেখি নি ডাক্তারবাবু।

—দেখেন নি?

—না। আমি আপনার এখানেই আনবার ব্যবস্থা করেছিলাম। আপনি দেখবেন, চিকিৎসা করবেন, আধুনিক চিকিৎসা আপনাদের। আমি নাড়ী দেখি নি।

তেত্রিশ

দুদিন পর মশায় বসে ছিলেন আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ায়। সামনে পড়ে রয়েছে একখানা পত্র। সাদা কাগজের চারিধারে কালো বর্ডার দেওয়া ছাপা নিমন্ত্রণপত্র। বিপিনের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণলিপি। মশায় বাড়ির ভিতর থেকে আসবার আগেই রতনবাবুর লোক এসে দিয়ে গিয়েছে। কৃতী প্রতিষ্ঠাবান বিপিনের শ্রাদ্ধ যোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই করতে হবে বইকি। রতনবাবু তা করবেন। মশায় শুনেছেন, রতনবাবু বলেছেন—তা না করলে চলবে কেন?

পরানের বিবির দেহটা পোস্টমর্টেমের জন্য চালান গেছে। হতভাগিনীর সৎকারও হল না?

গতকাল সন্ধ্যায় নবগ্রামে একটি শোকসভাও হয়ে গিয়েছে। মশায় যান নি। এসব সভায় সমিতিতে কেমন অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। কিশোর এ সভার উদ্যোক্তা। সভায় গ্রাম-গ্রামান্তরের লোক এসেছিল। ডাক্তারেরা সকলেই ছিলেন। বিপিন এখানকার হাসপাতালে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছে। রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালের সঙ্গে ক্লিনিক হবে ওই টাকায়। বিপিনের যোগ্য কাজই বিপিন করে গিয়েছে। রোগার্তের বন্ধুর কাজ করেছে। অকালমৃত্যুর গতি রুদ্ধ হোক। বাপকে যেন সন্তানের শ্রাদ্ধ করতে না হয়।

নবগ্রামের তরুণ ছেলে একটি, নতুন উকিল হয়েছে, সে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছে—"আমাদের

এখানে ডাক্তার এসেছে, হাসপাতাল হয়েছে—নতুনকালের ওষুধপত্রও এসেছে, তবুও হাতুড়ের যুগের অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে আমাদের যায় নি। বিপিনবাবুর দানে সেই অন্ধকার দূর হল।"

কথাটা মিথ্যা নয়। অধিকাংশ ডাক্তারেরাই হাত দেখতে জানেন না, যা জানেন তাকে ঠিক নাড়ীজ্ঞান বলা চলে না। কিন্তু তবু যেন কথাটা তাঁকে একটু লেগেছে।

নারায়ণ! নারায়ণ! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। মনটা খচখচ করছে। এই তরুণ ছেলেটির সঙ্গে প্রদ্যোত ডাক্তারের বন্ধুত্বটা একটু গাঢ়।

আট-দশজন রোগী এসেছে। রোগী আবার দু-একজন করে বাড়ছে। সেদিন থেকে তিনি বিনয়ের দোকানে বসেছেন সেই দিন থেকেই এর সূত্রপাত হয়েছে।

বিনয় মধ্যে মধ্যে হেসে বলে—দেখুন। দেশে ম্যালেরিয়া কমে গিয়েছে। ডি-ডি-টি ছড়িয়ে মশার বংশ নির্বংশ হয়ে গেল, থাকবে কোথা থেকে! টাইফয়েড এখানে কম। ওদিকে হাসপাতাল হয়েছে। রোগীরা ওসব রোগে হাসপাতাল যাচ্ছে। চারুবাবু হরেন বসে আছে। আপনার রোগী বাড়ছে।

তা বাড়ছে। কতকগুলি পুরনো রোগে রোগীরা তাঁর কাছে আসে। তিনি সারাতে পারেন। বিশেষ করে পুরনো রোগে ডাক্তারেরা যখন রোগ নির্ণয় করতে না পেরে রক্তপরীক্ষা এক্স-রে ইত্যাদির কথা বলেন তখন তারা তাঁর কাছে আসে। আর আছে এ দেশের বিচিত্র কতকগুলি ব্যাধি। যেসব রোগের নাম পর্যন্ত দেশজ; যার সঠিক পরিচয় এখনও নূতন মতে সংগ্রহও হয় নি।

রোগীগুলিকে বিদায় করছিলেন মশায়, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে লাঠি হাতে এসে দাঁড়াল 'মরি' বষ্টুমী।

—জয় গোবিন্দ! মশায় বাবা গো, পেনাম।

ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে 'মরি'। মাথার চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা, কপালে তিলক, পঞ্চান্ন-ষাট বছরের প্রৌঢ়া মরি বষ্টুমী দীর্ঘদিন পর এল। একসময় নিত্য আসত। ওর ছেলে এবং মেয়ে দুজনেরই হয়েছিল যক্ষ্মা। তাদের জন্য ওষুধ নিতে আসত। সে অনেক দিনের কথা। মরির বোষ্টমও মরেছিল যক্ষ্মায়। কিন্তু মরির কিছু হয় নি। এতকাল পর মরিকে সেই কালে ধরল নাকি? এতকাল পর?

মরি এখানকার নিয়মকানুন জানে। মশায়ও জানেন মরির ধরনধারণ। এখন 'কী হয়েছে' প্রশ্ন করলে মরি বলবে—'সকল জনাকে বিদেয় করুন বাবা, তারপর বলছি!'

সকলের হয়ে গেলে তাঁর দুটি পায়ে হাত রেখে বলবে—বাবা ধন্বন্তরি, আপনার অমৃতের ভাণ্ডার, আমি অভাগিনী আমি পাপী—আমার ভাগ্যে বিষ, বিষের জ্বালায় ছুটে এসেছি। দয়া করুন।

দয়াতে অবশ্য মরির জ্বালা জুড়ায় নি। যক্ষ্মাতেই স্বামী-পুত্রকন্যা গিয়েছে।

মরি ছেলেমেয়ের মৃত্যু বসে বসে দেখেছে। কাঁদে নি। বলেছে—যার ধন সে-ই নিলে—

আমি কেঁদে কী করব? আমি কাঁদব না। শুধু ঠাকুর, তোমার চরণে এইটুকুন নিবেদন, আমাকে নাও। আশ্রয় দাও। বড় তাপ। প্রভু, চরণছায়ায় আমাকেও জায়গা দাও, এক-পাশে এককোণে।

শেষ রোগীটিকে বিদায় করে মশায় বললেন—কী হল মরি, ডাক এল না কি তোর? হঠাৎ তুই?

মরি এগিয়ে এসে ঠিক আগের মতন পা দুটি ধরে বললে—না বাবা, মরির সে ভাগ্যি হয় নাই। ছেলেবেলায় বারোমাস রোগে ভুগতাম; দু-তিনবার মর-মর হয়েছিলাম, তাই বাবা-মায়ে নাম রেখেছিল মরি। তাই সেই ছেলে-কালেই সকল ভোগ শেষ হয়েছে, এখন মরি পাকা তালগাছের মতো শক্ত। আমি এসেছি বাবা আপনার কাছে, এসেছি কালীর দেবাংশী ওঝা মশায়ের কন্যে অভয়ার জন্যে। আপনকার বন্ধু মিশ্র মশায়ের বেটার বউ—

শশাঙ্কের বউ?

চঞ্চল অধীর হয়ে উঠলেন মশায়। শশাঙ্কের স্ত্রী! সমস্ত শরীরে একটা যেন কম্পন বয়ে গেল।

—হ্যাঁ বাবা। সে-ই পাঠালে। বললে—তুমি একবার মশায় জেঠার কাছে যাও মরি। আমার স্বামীর দুদিনের জ্বরে হাত দেখে—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। কিন্তু কিসের জন্যে—কী হয়েছে?

—বড় অসুখ বাবা। বললে—আমাকে একবার দেখে যেতে বলবি—আমাকে বলে যান আর কতদিন আমার বাকি।

—গোবিন্দ! গোবিন্দ! নারায়ণ নারায়ণ। কিন্তু হয়েছে কী?

—রোগ নানানখানা। ভুগছে আজ ছ মাস। গুসগুসে জ্বর, খুসখুসে কাশি; সবই সেই কালরোগের মতো।

—যক্ষ্মা?

ডাক্তারেরা তাই বলেছে। হরেন ডাক্তার দেখেছে, চারুবাবুও দেখেছেন; সেদিন হাস-পাতালের প্রদ্যোতও দেখে এসেছে। ইনজেকশন অনেক হয়েছে। পেনিসিলিন অনেক কয় লক্ষ। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। কাশি সমান রয়েছে। জ্বর ছাড়ে নি। কোনো জটিলতার একটি পাকও এতটুকু শিথিল হয় নি।

মরি বললে—বাবা আপনি তো জানেন, এখানে স্বামী গেল হতভাগী মেয়ের, বাপ এখানকার সম্পত্তি বেচে এক তোড়া নোট নিয়ে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে গেল। বাপের বাড়িতে সর্বময় কর্তা হয়ে ছিল। ভাইয়ের ছেলে নিয়ে আর মাকালীর সেবা নিয়ে সংসারে সে কি আঁটসাঁট। বাপ গেল, মা গেল, ভাইরা ভিন্ন হল, অভয়া যে ভাইপোকে মানুষ করেছিল—তার বিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে ভিন্ন হয়েছিল। এখন ভাইপোর হাতে সব, অভয়ার হাত শূন্য, এখন এই রোগ শুনে ভাইপো তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে। বাবা, গোয়াল-বাড়িতে একখানা ঘর নিকিয়ে চুকিয়ে পরিষ্কার করে সেইখানে নির্বাসন দিয়েছে। কেউ আসে না, উঁকি মারে না, নিশ্বাসে রোগ ধরে যাবে।

মরি হাসলে এইখানে। হেসে বললে—আমি শুনলাম। শুনে বলি—আমার স্বামী পুত্র কন্তে তিন গিয়েছে এই রোগে, আমি বিছানার পাশে বসে থেকেছি। আমার তো কিছু হয় নাই। তা আমি যাই, ব্রাহ্মণকন্তে অনাথা—তার শয্যের পাশে শেষ কালটা থাকি। কাল আমাকে হঠাৎ বললে—মরি, তুমি একবার মশায়ের কাছে যাও। আমি তো হেঁটে যেতে পারব না, ক্ষমতা নাই। গোরুর গাড়িও ভাইপোরা দেবে না। তাঁকেই বোলো আমাকে একবার দেখে যেতে। অন্য কিছু নয়, কতদিন আর বাকি সেইটা জানব।

* * *

বৈশাখের শস্যক্ষেত্রের মতো ধূলিধূসর শুষ্ক রুক্ষ ; মুখে-চোখে কোথাও একবিন্দু সরসতার চিহ্ন নাই। সমস্ত অঙ্গে যেন একটা আবরণ পড়েছে। শীর্ণ দেহ ভেঙে পড়েছে। জীর্ণ মলিন শয্যার উপর শুয়ে আছে। ঘরখানার চারিদিকে অন্ধকার জমে আছে। শশাঙ্কের স্ত্রী হেসেই বললে—দেখুন তো মুক্তি আমার কতদূরে? কতদিনে খালাস পাব? আপনি ছাড়া আর তো কেউ বলে দিতে পারবে না।

কথাগুলি স্পষ্টভাবে বোঝা গেল না। কাশিতে স্বরভঙ্গ হয়েছে। কণ্ঠনালী যেন রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। ধরা ভাঙা গলায় স্বর-বিকৃতির মধ্যে কথা যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে ফুটো-হাপর-থেকে-বের-হওয়া ফসফস আওয়াজের মতো কণ্ঠস্বরে কথা হারিয়ে যাচ্ছে। হাত-খানি সে তুলে ধরলে মশায়ের সামনে।

—দেখছি মা। একটু পরে।

তিনি তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। মরি দাঁড়িয়ে ছিল ; তাকে বললেন—দরজাটা ভালো করে খুলে দে তো মরি।

মুক্ত দ্বারপথে আলো এসে পড়ল অভয়ার মুখের উপর। আলোকিত ললাটের উপর হাত-খানি রাখলেন মশায়। অভয়া তাকিয়ে রইল হেমন্তের আকাশের দিকে। ক্লান্তি আছে, কষ্টভোগের চিহ্ন আছে, কিন্তু ক্ষোভ নাই, ভয় নাই, প্রসন্ন তার দৃষ্টি।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে দেখে হাতখানি তুলে নিলেন। এ হাত নামিয়ে রেখে ও হাত।

—কতদিনে যাব? হাতখানা নামিয়ে রাখতেই অভয়া প্রশ্ন করলে।

—দেখি মা!

প্রশ্নোত্তরের মধ্যে বিবরণ জেনে ভালো করে পরীক্ষা করে মশায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সংসার কি তেতো হয়ে গেছে মা? সইতে পারছ না?

একটু হাসলে অভয়া। বিচিত্র হাসি। এ হাসি অভয়ারাই হাসতে পারে। সকল মেয়ে পারে না। অভয়া বললে—তেতো খেয়েই তো জন্ম কাটল বাবা। সইছে না তো বলি নি।

—জানি মা। সে হলে শশাঙ্ক যেদিন গিয়েছিল সেই দিনই তুমি কিছু করে বসতে। পুকুরে জলের অভাব হয় নি, বাড়িতে দড়ির অভাব হয় নি, সংসারে বিষের অভাব নেই। সে জানি। তাই তো বলছি মা। আরও সইতে হবে। এ তোমার জটিল রোগ—পাঁচটি রোগে জট পাকিয়ে জটিল করেছে। মৃত্যুরোগ নয়। যক্ষ্মা তোমার নয়।

—নয় ? উঠে বসল অভয়া।

—না।

—ডাক্তারেরা যে সকলে একবাক্যে বলে গেল।

—তাঁরা তো এক্সরে করতে বলেছেন ?

—হ্যাঁ।

—এক্সরে করবার দরকার নাই মা। ওঁরা বুঝতে পারেন নি। ভুল চিকিৎসা হয়েছে। তুমি এক মাস দেড় মাসের মধ্যেই সেরে উঠবে মা। সংসারে তোমাকে আরও কিছুদিন থাকতে হবে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অভয়া।

—আমি ওষুধ পাঠিয়ে দেব। নিয়মের কথা তোমাকে বলতে হবে না। তুমি শুদ্ধাচারিণী নির্লোভ—আমি তো জানি।

অকস্মাৎ দুটি জলের ধারা নেমে এল মেয়েটির দুই চোখের দুটি কোণ থেকে। চোখ ফেটে যেন জল বের হল। কিন্তু নিনিমেষ দৃষ্টিতে যেমন সে বাইরের শূন্যলোকের দিকে চেয়ে ছিল তেমনিই চেয়ে রইল।

—মা!

—আপনি আমাকে সেদিন বাপের মতো স্নেহ করে নেমন্তন্ন করেছিলেন—আমি—

—ও সব কথা থাক মা। অল্পদিনেই তুমি সেরে উঠবে, আমি বলে যাচ্ছি। আমি একদিন অন্তর এসে দেখে যাব তোমাকে।

অভয়া আবার বললে—বনবিহারী ঠাকুরপোর অসুখের সময় আমি মা-কালীর কাছে মানত করেছিলাম, পুজো দিয়েছিলাম। ইচ্ছে হয়েছিল পুষ্প নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু পারি নি। তিনি মারা গেলে মনে হয়েছিল জিভটা কেটে ফেলি।

মশায় হেসে বললেন—ও নিয়ে তুমি ভেবো না মা। মানুষের শাপে মানুষ মরে না। মানুষ মরে মৃত্যু ধ্রুব বলে। তবে অকালমৃত্যু আছে। বনবিহারী মরেছে নিজের কর্মফলে।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল অভয়ার ভাইপো। অভয়া যাকে সন্তানস্নেহে মানুষ করেছে; যে তার যথাসর্বস্ব নিয়ে যক্ষ্মার ভয়ে এই ঘরে নির্বাসন দিয়েছে। তাকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন মশায়। পরক্ষণেই নিজেকে শান্ত করলেন। বেচারীর চোখে মুখে কী উদ্বেগ—কী ভয়!

—দেখলেন মশায় ?

—হ্যাঁ, কোনো ভয় নাই। এক মাস দেড় মাসের মধ্যেই বউমা ভালো হয়ে উঠবেন।

—ডাক্তারেরা যে বলে গেছেন—

—যক্ষ্মা ? না, যক্ষ্মা নয়। পার তো এক্সরে করে দেখতে পার। না পার, এক মাস অপেক্ষা করো। পনেরো দিন। পনেরো দিনেই ফল বুঝতে পারবে। বলতে বলতে মশায়

নিজেই একটু সংকোচ অনুভব করলেন। কণ্ঠস্বর একটু বেশী উঁচু হয়ে উঠেছে, কথাগুলি যেন বেশী শক্ত হয়ে গেল।

নারায়ণ নারায়ণ! মনে মনে নারায়ণ স্মরণ করলেন তিনি।

চৌত্রিশ

দেখো, বিনয়, মৃত্যু সংসারে ধ্রুব। যে জন্মায় তার মৃত্যু হবেই। মৃত্যুর বহু পথ, সে অনিবার্য। কেউ রোগে মরে, কেউ আঘাতে মরে, কেউ ইচ্ছে করে মরে,—আত্মহত্যা করে। তবে রোগই হল মৃত্যুর সিংহদ্বারের পাকা সড়ক। রোগমাত্রেই মৃত্যুর স্পর্শ বহন করে; সব রোগে মানুষ মরে না কিন্তু খানিকটা এগিয়ে দেয়; জীবনীশক্তি ক্ষয় করে ঠেলে দেয় খানিকটা। চিকিৎসক চিকিৎসা করে, তার জ্ঞানমতো যে বাঁচবে বলে মনে হয় তাকে সে মরবে বলে না। যে মরবে বলে মনে হয় তার ক্ষেত্রে কেউ আকারে ইঙ্গিতে জানায়, বলে বড় ডাক্তার আনুন, কেউ নিজের মত স্পষ্ট করে বলে দেয়। তারও ক্ষেত্র আছে। শশাঙ্কের বউ আমার মতে বাঁচবে। তাই বলেছি।

বিনয়ের দোকানে বসেই কথা বলছিলেন মশায়। আরও একদিন পর। শশাঙ্কের স্ত্রীকে দেখে মশায় যা বলে এসেছেন তাই নিয়ে এখানে বেশ খানিকটা উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে। নবগ্রামের ডাক্তারেরা—হরেন, চারুবাবু, প্রদ্যোত তিনজনে ভ্রূ কুঞ্চিত করেছেন। প্রদ্যোত বলেছে—হাত দেখে বলেছে যক্ষ্মা নয়?

কথাটা নিয়ে হৈ চৈ করছে শশী ডাক্তার। সে বলে বেড়াচ্ছে—শতমারী ভবেদ্ বৈদ্য, সহস্রমারী চিকিৎসক। দু-চার হাজার রোগী মেরে জীবনমশায় আবার মরা বাঁচাতে লেগেছে। রামহরে বেটাকে আমাশা পেটের অসুখ থেকে বাঁচিয়ে এবার শশাঙ্কের বউকে যক্ষ্মা থেকে বাঁচাবে। রানা পাঠককে বাঁচাবে।

শশীর দোয়ারকি করছে দাঁতু ঘোষাল। বিনয় বললে—সে বামুন হাসপাতাল থেকে কাল চলে এসে শশীর সঙ্গে জুটেছে। শশী তাকে বলেছে, দেঁতো, জীবন দত্ত যদি যক্ষ্মা ভালো করতে পারে তো আমি আর তোর বদহজম সারাতে পারব না! খুব পারব। ক্যানাবিসিণ্ডিকা খাইয়ে তোকে সারিয়ে দোব।

মশায় চকিত হয়ে উঠলেন—দাঁতু হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে, না ডাক্তার ছেড়ে দিয়েছে?

—জোর করে চলে এসেছে। হাসপাতালে ভূত ভূত গুজব শুনেছে—তার উপর পরশু রাত্রে পরানের বিবি মরেছে বিষ খেয়ে—হাসপাতালের টেবিলের ওপর। দাঁতু কাল বণ্ড লিখে দিয়ে চলে এসেছে।

মশায় অকস্মাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, বাইরের জানালা দিয়ে গাছের পল্লবের মাথায় আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনটা যেন খোলা পথে শূন্যলোকের অন্তহীনতার মধ্যে

কিছু খুঁজে বেড়াতে লাগল। মুখে ফুটে উঠল ক্ষীণ রেখায় একটু হাসি।

—মশায়!

ভারী গলায় ডাক দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল রানা পাঠক।

—আমি একটু ভালো আছি মশায়। দু-তিন দিন থেকে জ্বর কম হয়ে গিয়েছে। কাল বোধ হয় হয়ই নাই।

সে এসে বেঞ্চে বসল। মেঝের উপর নামিয়ে দিলে সের পাঁচেক একটা মাছ।

মশায় রানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ওকে দেখতে লাগলেন। রানার মুখে কোনো পরিবর্তনের ছাপ দেখা যায় কি না। রানা বললে—হাসপাতালের ডাক্তার, হরেন ডাক্তার, চারুবাবু ওদের আজ দুটো কথা বলে এলাম গো!

মুখের দিকে দেখতে দেখতেই ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—কী বলে এলে?

রানা বললে—ওই ওদের কো-অপারেটিভ না কো-অপারেটিভ ডাক্তারখানা হয়েছে, সেইখানে ওরা শশাঙ্কের বউয়ের রোগ নিয়ে, আমার রোগ নিয়ে আপনার নামে পাঁচ কথা বলছিল। আমি দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। শুনে আমিও দু-কথা বললাম। তা ওই নতুন ডাক্তার ফট করে বললে—তুমি বাঁচবে না বাপু। মশায় তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। বাঁচতে চাও তো কোথাও কোনো যক্ষ্মা-হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হও। তা আমিও দু-চার কথা বললাম।

—কটু কথা বলেছ নাকি?

—তা দু-চারটে শক্ত কথা বলেছি। কটু নয় এমন কিছু। বলেছি দু-চারটে। কত বড় শক্ত রোগ আরাম করেছেন তার কথা। সেই কাহারের রক্তবমি-করা যক্ষ্মা ভালো করার কথা বলেছি।

—না-না। সে কাহারের রোগটা যক্ষ্মা ছিল না বাবা। রক্তাপিত্ত হয়েছিল তার।

—তা চক্রধারী তো বলেছিল যক্ষ্মা। চারুবাবুও বলেছিল।

—মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় বাবা।

—এই তো শশাঙ্কের স্ত্রীকেও বলেছিল যক্ষ্মা। আপনি বলেছেন যক্ষ্মা নয়।

—হ্যাঁ। আমার বিচারে এটাও ওঁরা ভুল করেছেন। শশাঙ্কের স্ত্রী সেরে উঠবে। এক্স-রে করলে এখুনি বুঝতে পারবেন। ভালো নাড়ী দেখতে পারলেও ধরতে পারতেন। আসল হল যকৃতের দোষ। বিধবা মেয়ে, শরীরকে বড় কষ্ট দেয়, অবেলায় খায়, উপবাস মাসে তিন-চারটে। লিভার খারাপ থেকেই কাশিটা হয়েছে। তার উপর পুরনো জ্বর। ওঁরা ধরতে পারেন নি।

—আমার তো যক্ষ্মা বটে। তা আমিও তো ভালো আছি।

—ভালো আছ?

—তাই তো মনে হচ্ছে। জ্বর আজ দুদিন কমে গিয়েছে। সামান্য, খুব সামান্য। নিজেও তো নাড়ী দেখতে জানি। ওদের ওই পারাকাঠি আমার লাগে না। নিয়ম করে

খাই-দাই। ভালো লাগছে একটু। তা ছাড়া সে সব্বনাশী তো খালাস দিয়েছে আমাকে।

সেই মেয়েটি মরেছে। আশান্বিত হয়ে উঠেছে রানা।

—দেখুন, হাতটা দেখুন।

হাত দেখে বুক দেখে মশায় বললে—ওই ওষুধই খেয়ে যাও। ওই নিয়মই করে যাও বাবা। দেখো।

—কী দেখলেন বলুন। আমার কাছে আপনি লুকুবেন না মশায়। আপনি তো রানাকে জানেন। মরণকে আমার ভয় নাই। মরতে সাধও নাই। মরব শুনলে কাঁদব না আমি। তবে যদি ভালো হই, আর কিছু কাল বাঁচি, তা কেন চাইব না! যক্ষ্মা যখন হয়েছে, তখন যাবার নোটিশ আমার হয়ে গিয়েছে, সে আমি জানি। এখন যদি দশদিন মানে কিছুদিন জামিনে খালাস পাই তো সাধ-আহ্লাদটা মিটিয়ে নি। এই আর কি! ভগবানের নাম ভালো করে করি নাই, তাও করে নি। এই আর কি। আপনি নির্ভয়ে বলুন।

—বলবার সময় এখনও হয় নাই বাবা। তবে খারাপ হয় নাই—এটুকু বলতে পারি। আরও পনেরো দিন পরে তুমি এসো বাবা।

—ব্যস, ব্যস! তাই আসব। এখন মাছটা রইল। ওটা আপনার জন্যে এনেছিলাম।

—মাছ কেন আনলে রানা? আমার বাড়িতে খাবে কে?

—পেলাম পথে, নিয়ে এলাম আপনার জন্যে। ইচ্ছে হল। জেলেরা নদীতে মাছ ধরছিল, নদী আমার এলাকা, জমা পাই। দাঁড়ালাম। দেখলাম বেশ মণ তুই-আড়াই মাছ উঠল। এ মাছটা চমৎকার লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আপনাকে—নিয়ে এলাম। ঘরে খান, বিনয়-টিনয়কে দেন। পাড়ায় দেন। আমাকে আশীর্বাদ করুন। বাঁচি মরি—শিগগির শিগগির হয়ে যাক, যেন না ভুগি। চললাম তা হলে।

বিচিত্র মানুষ রানা। ভয় নাই। কিন্তু রানা বাঁচবে না।

বিনয় বললে—আজ রাত্রে তা হলে আপনার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া। বাজার করে মাছ নিয়ে দি গিন্নীমায়ের কাছে।

মশায় হাসলেন—দে! বিনয় চলে গেল।

ঘরে একা বসে নিজের নাড়ী দেখছিলেন। আজকাল প্রায় দেখেন। মৃত্যুর পদধ্বনি যদি শুনতে পান। এখন ওই একটি কামনা তাঁর মনে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে। তিনি তাকে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করবেন। সতর্ক হয়ে বসে থাকবেন। তার পদধ্বনি, তার রূপ, তার স্বর, তার স্পর্শ, তার স্বাদ তিনি প্রত্যক্ষ করবেন। রূপ থাকলে দেখবেন, স্বর থাকলে শুনবেন, স্পর্শ যদি থাকে—তা তিনি অনুভব করবেন। পারলে বলে যাবেন।

সে আতর বউ? সে মঞ্জরী? সে কেমন? সে কে?

● ● ●

একটি তরুণী মেয়ে এসে তাঁর ঘরে ঢুকল। সবিস্ময়ে তিনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শান্ত দৃষ্টি, বড় বড় দুটি চোখ, প্রসন্ন মুখশ্রী, ফরসা রঙ, বাইশ-তেইশ বছরের একটি মেয়ে। সাদা ব্লাউজ, ফিতেপাড় সাদা শাড়ি, গলায় একছড়া সরু হার চিকচিক করছে, হাত দুখানি নিরাভরণ, বাঁ হাতে একটি কালো স্ট্র্যাপে বাঁধা ছোট হাতঘড়ি। প্রসন্নতা মেয়েটির সর্বাঙ্গে।

দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

মেয়েটি বললে—আমি এখানে নার্স হয়ে এসেছি। আপনার নাম শুনেছি। হাসপাতালের সামনে দিয়ে আসেন যান দেখি। বড় ইচ্ছে হয় কথা বলতে। আজ বাজারে এসেছিলাম, দেখলাম আপনি একা বসে আছেন।

—বোসো মা, বোসো। আলাপ করতে এলে, দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন? আর আমার মতো বুড়ো মানুষকে তোমার সঙ্কোচ কী? বোসো। সেদিন রাত্রে হাসপাতালের দাওয়ায় তুমিই দাঁড়িয়ে ছিলে?

—আপনাকে দেখছিলাম।

—আমাকে?

—আপনার অনেক গল্প শুনেছি আমি।

—কার কাছে?

—আমার মা'র কাছে। আমার মাকে, আমাকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন। আমি তখন খুব ছোট। আমার জন্ম এইখানে। ওই আপনাদের গ্রামে।

—কে মা তুমি? আমি তো—। বিস্ময়ের আর সীমা রইল না তাঁর।

—কী করে চিনবেন? আমার মায়ের বাবা এখানে চাকরি করতে এসেছিলেন। সে আপনার মনে থাকবে কী করে? কত লোককে আপনি বাঁচিয়েছেন—আপনার কি মনে আছে? কিন্তু যারা বেঁচেছে তাদের মনে থাকে।

—থাকে? হাসলেন জীবনমশায়।

—আমার তো রয়েছে। আমি প্রায় মরে গিয়ে ছিলাম। মা বলে। তাই তো আমি হাসপাতালে সকলের সঙ্গে তর্ক করি। ওরা বলে পাস-করা তো নন, কোয়াক তো!

মশায় হাসলেন।

মেয়েটি বললে—আমি বলি, না। তা উনি নন। আমি মায়ের কাছে শুনেছি। আপনারা মশায়। মানে মহাশয়ের বংশ।

বিস্ময়ের আর সীমা রইল না মশায়ের।—তোমার মা কে ভাই?

হেসে বললেন—ভাই বললাম, তুমি আমার ছেলের ছেলের বয়সী, কিছু মনে কোরো না।

—না। আপনি আমার দাদুই তো। আমার মা আপনাকে জ্যেঠামশায় বলত।

—কে? কে তোমার মা?

চুপ করে রইল মেয়েটি। একটু পর বললে—একদিন আপনার বাড়ি যাব। সব বলব।

মেয়েটি হেঁট হয়ে টুপ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। মশায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—আমাকে প্রণাম করছ? আমি কায়স্থ। তুমি ব্রাহ্মণ কি বৈদ্য নও তো?

—না। আর হলেই বা কী? আপনি মশায়।

আর মশায়! শেষে হয়ে গিয়েছে মহাশয়ত্ব। কিন্তু আশ্চর্য। পৃথিবীতে এমন কৃতজ্ঞতাও আছে? কবে কোন কালে ওকে ওঁর স্মৃতির কালের সীমার বাইরে কোন অসুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন—তার জন্য ওর এত কৃতজ্ঞতা!

—আজ আমি যাই দাদু।

সচেতন হয়ে উঠলেন মশায়, বললেন—তোমার পরিচয় তো ঠিক পেলাম না। কিন্তু তোমার নাম?

—সীতা।

—সীতা?

লঘুপদক্ষেপে চলে গেল মেয়েটি।

—মহাশা। কদ্রু এসে দাঁড়াল।—ভালো আছি মহাশা। আওর থোড়া দাওয়াই।

পঁয়ত্রিশ

মাস কয়েক পর—মাস তখন চৈত্র। বেশ গরম পড়েছে। অপরাহ্ণবেলায় আরোগ্য-নিকেতনের বারান্দায় সেতাবের সঙ্গে মশায় দাবায় বসেছিলেন।

মশায় ক্রমাগত হারছিলেন। বাঁ হাতে ডান হাতের কব্জিটি ধরে বসে চাল ভাবছিলেন। হঠাৎ বললেন—নাঃ, মাত ঠেকানো যাবে না। আমার হার।

সেতাব বললে—তোর হল কী বল দেখি?

মশায় হাসলেন।

—খেলায় মন নেই একেবারে? কী হয়েছে আজকাল? কেবল নাড়ী দেখছিস। বাঁ হাতে ডান হাতের নাড়ী ধরেই বসে থাকিস! হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে সেতাব বললে—জীবন?

মশায় হেসে বললেন—নাঃ, কিছু না। তবে ভালো লাগে না রে আর, তাই দেখি। কিন্তু নাঃ, কিছু পাই না।

সেতাব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদাস হয়ে বসে রইল। দান সাজাতে ভালো লাগল না।

বাড়ী থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে এল সীতা। সেই নার্স মেয়েটি। চায়ের বাটি হাতে এসে বাটি দুটি নামিয়ে দিয়ে বললে—চললাম দাদু। আজ সন্ধ্যে থেকেই ডিউটি।

—এসো। সস্নেহে পিঠে হাত দিয়ে মশায় বললেন—কাল কখন আসবে?

—সকালে স্নান করে ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর আসব?

—চলো, বিনয়ের ওখানে যাবার পথে একবার কদ্রুকে দেখে যাব।

মেয়েটি চলে গেল।

সেতাব ঘাড় নেড়ে উৎসাহ প্রকাশ করে বললে—হাসপাতালের ডাক্তার কদ্রু বেটাকে খুব বাঁচালে।

—নিশ্চয়। কেউ ভাবে নি—এ অপারেশন করে ডাক্তার ওকে বাঁচাতে পারবে। চারুবাবু হরেন এরাও ভাবে নি। চারুবাবু তো বলেছিলেন, হাত পাকিয়ে নিচ্ছে বুড়োর উপর ছুরি চালিয়ে, নিক। কদ্রু বেটাও মলে খালাস। স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া এখানে অপারেশন হয়?

হয় সবই, চাই সাহস আর আত্মবিশ্বাস। তা প্রদ্যোত ডাক্তারের আছে।

স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া হয়েছিল কদ্রুর। প্রথমটায় পেটের দরদ বলে কদ্রু নিজের ঘরেই পড়ে ছিল। কিশোর খোঁজ পেয়ে তাকে জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। অপারেশন না করলেও কদ্রু মরত। প্রদ্যোত কারুর কথা শোনে নি, সে অপারেশন করেছে; এবং কদ্রু বেঁচেছে। ধীরে ধীরে সেরে উঠছে সে। মশায় রোজ একবার করে দেখে যান কদ্রুকে। প্রদ্যোতের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, সে হেসে নমস্কার করে বলে—"আপনার কদ্রু ভালোই আছে।" একদিন বলেছিল—"ওর হাত দেখে ওকে একটু বলে যান যে ভালো আছে। নইলে ও বিশ্বাসই করে না যে ও ভালো আছে। এমন রোগী পাওয়া ভাগ্যের কথা!"

সেতাব আবার ছকে গুটি সাজাতে আরম্ভ করে বললে—তুই কিন্তু ওই মেয়েটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছিস জীবন।

ওই সীতা মেয়েটির কথা বললে সেতাব। ওই মেয়েটির সঙ্গে কয় মাসেই মশায়দের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ শুধু মশায়ের সঙ্গে নয়, মশায়গিন্নীর সঙ্গেও।

মশায় হাসলেন—বাড়াবাড়ির উপরে কি মানুষের হাত আছে রে? দাঁতুকে দোষ দিতাম। লোভ—লোভ—লোভ। এও দেখছি মায়া, মায়া; মায়া ছাড়াবার উপায় নাই। ছাড়ব ভাবতে গেলে অন্তর ছটফট ক'রে আরও নিবিড় পাকে জড়িয়ে পড়ে।

মশায় উদাস দৃষ্টি তুলে আকাশের নীলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সেতাব স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এতটা মাখামাখি সেতাবেরও একটু কটু ঠেকে। সেই সূত্র থেকে এ যেন শত সহস্র লক্ষ পাকে জড়িয়ে পড়ল জীবন। জীবন যদি যুবা হত, এমন কি প্রৌঢ়ও হত এবং জীবন যদি জীবনমশায় না হত তবে লোকে তার দুর্নাম রটাত। তবুও লোকে প্রশ্ন করে—এত কিসের মাখামাখি বলতে পার? সেতাবকেই প্রশ্ন করে। জীবনমশায়কে রক্ষা করবার জন্যই সে বলে—এটাও বোঝ না বাপু? ছেলেগুলে নাতি-নাতনী সব যখন ছাড়লে তখন ওটা এসে পড়ল, ওরাও জড়িয়ে ধরলে আর কি! লোকে তবুও ছাড়ে না। বলে—নার্স-টার্সদের জাতফাত তো সব গোলমেলে ব্যাপার। সেতাব বলে—সে বাপু আগেকার কালে ছিল—একালে নয়। জীবনের স্ত্রীও মেয়েটিকে ভালোবেসেছে। আতর-বউ ভালোবেসেছে সেটা তো কম নয়। নিত্যই মেয়েটি একবার করে আসে। আতর-বউকে বই পড়ে শোনায়। আতর-বউয়ের দুঃখের কাহিনী শোনে। এ সব জেনেও সেতাবের মনে সন্দেহ হয় যে, মেয়েটি অত্যন্ত সুচতুরা; সে এই বৃদ্ধ-দম্পতির জীবনের শূন্যতার সুযোগ নিয়ে তাদের দোহন করছে। টাকাপয়সাও নেয়, এঁরাও—অন্তত জীবনও—দেয়।

শেষ বয়সে জীবনের ভাগ্যটা যেন ফিরে গেল। জীবনের নামডাক আবার অনেকটা ফিরে এসেছে। রামহরি লেটকে বাঁচিয়ে সূত্রপাত হয়েছিল, তারপর এই শশাঙ্কের বউয়ের রোগে জীবনের চিকিৎসা দেখে লোকে অবাক হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারেরা বলেছিল যক্ষ্মা, জীবন বলেছিলেন—যক্ষ্মা নয়। অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। মাস দেড়েকের মধ্যেই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছে শশাঙ্কের স্ত্রী। সে কী পরিশ্রম আর সে কী নিষ্ঠা বৃদ্ধ জীবনমশায়ের! নিজের হাতে ওষুধ তৈরি করেছেন। নিয়মিত একদিন অন্তর ভোরবেলা উঠে দু-মাইল পথ হেঁটে গিয়ে জীর্ণ ঘরখানির সামনে দাঁড়িয়ে ডাকতেন—মা!

মরি বষ্টুমি ঠিক উপস্থিত থাকত। হাসিমুখে বলত—আসুন বাবা।

—মা উঠেছেন?

—মা আপনার সেই ভোরে উঠে বসে আছেন। জপ সারা হয়ে গেল।

সাদা থান-কাপড়-পরা শীর্ণ ক্লান্তদৃষ্টি গৌরাঙ্গী মেয়েটি প্রসন্ন হেসে মাথায় একটু কাপড় টেনে দিয়ে অভ্যর্থনা করে বলত—কেন কষ্ট করে এলেন বাবা? ওষুধ পাঠিয়ে দিলেই হত। আমি ভালো আছি বাবা।

—ভালো তো থাকবেই মা। রোগ তোমার জট পাকিয়েছে কিন্তু কঠিন তো নয়! তার উপর তোমার সত্ত্বগুণ, সেই জোরে শরীরের চেয়ে মন বেশী ভালো আছে। হাতটা যে দেখতে হবে। সেইজন্যে এলাম।

লজ্জিত হত মেয়েটি। মধ্যে মধ্যে বলত—আমাকে বাঁচাবার জন্যে এত কষ্ট কেন করছেন, আমি লজ্জা পাই। আমার জীবন যাবার নয়। আমি গেলে কষ্টভোগ করবে কে?

মশায় উত্তর দিয়েছিলেন—সুখদুঃখের সংসার মা। যত সুখ, তত দুঃখ। এই সইতেই জন্ম মা।

হেসে সে বলেছিল—তাই বটে বাবা, যত তেতো তত মিষ্টি। না পারা যায় গিলতে, না পারা যায় ওগরাতে।

—ঠিক বলেছ মা। আমাকে দেখো। তবু মা সংসারে মৃত্যুকামনা করতে নেই। আবার মরণকে ভয় করে পিছন ফিরে সংসার আঁকড়ে ধরে কাঁদতেও নেই। দুটোই পাপ।

—সেই পাপের ভয়েই তো বাবা। নইলে—।

মশায় একদিন বলেছিলেন—পাপ তোমার নেই মা। কিন্তু অন্যায় কিছু আছে। রাগ কোরো না আমার ওপর।

চমকে উঠেছিল মেয়েটি—কী অন্যায় বাবা?

—মা, আত্মা—যাকে নিয়ে মানুষের এত, তিনি হলেন দেহাশ্রয়ী। দেহ নইলে তিনি নিরাশ্রয় নিরালম্ব—তাঁর আর কিছু থাকে না। সেই দেহকে একটু যত্ন কর তুমি। যে মন্দিরে দেবতা থাকেন, সে মন্দিরের অযত্ন হলে দেবতা থাকবেন কী করে? দেহকে পীড়া দিয়ে তাঁকে অকালে চলে যেতে বাধ্য করলে—সেও যে এক ধরনের আত্মহত্যা হয়। শরীরের একটু যত্ন নিতে হবে।

শশাঙ্কের স্ত্রী সে কথা পালন করেছে।

কোনো কোনো দিন সকালে যেতে না পারলে, বৃদ্ধ মশায় দুপুরের রোদ মাথায় করেই গিয়েছেন।

শশাঙ্কের স্ত্রী সেরে উঠেছে। ভাইপোর ঘরে আবার ফিরে গিয়েছে। ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আগে ভাইপোটি পিসীকে শহরে নিয়ে গিয়ে এক্সরে করিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে নিয়েছে। এক্সরেতে জীবনমশায়ের কথাই সত্য হয়েছে। আজও মধ্যে মধ্যে মরি বষ্টুমী ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ভিক্ষার পথে এসে 'জয় গোবিন্দ' বলে তাঁর কাছে দাঁড়ায়। ঝুলির ভিতর থেকে বের করে দেয় কিছু মিষ্টান্ন। অভয়া মা, কালীমায়ের প্রসাদ পাঠিয়েছেন বাবা!

আরও সত্য হয়েছে জীবনমশায়ের কথা। দাঁতু ঘোষাল মরেছে। হাসপাতাল থেকে ভূতের ভয়ের জন্য দাঁতু জোর করে চলে এসেছিল। জুটেছিল শশীর সঙ্গে। কদিন পরেই বিপিনের শ্রাদ্ধ হল সমারোহের সঙ্গে। সেই শ্রাদ্ধে দাঁতু খেয়ে এল, সে খাওয়া বিস্ময়কর!

তার পরই সে পড়ল।

শেষ চিকিৎসা তার জীবনমশায়ই করেছেন। সে অন্য কাউকে ডাকেও নি। মশায়কেই ডেকেছিল। শশীই এসেছিল ডাকতে।

মশায়ের দুটি হাত ধরে কেঁদেছিল।

মশায় বলেছিলেন—আমি কী করব দাঁতু? কেই বা কী করবে? হাসপাতাল থেকে তুই শ্রাদ্ধের খাওয়ার লোভে পালিয়ে এলি?

দাঁতু অস্বীকার করে বলেছিল—গুরুর দিব্যি, না। ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি। ভূতের ভয়ে। হাসপাতালের ডাক্তারের বাড়িতে পর্যন্ত—

—দাঁতু! তিরস্কারের সুরে মশায় বলে উঠেছিলেন—দাঁতু!

—দাঁতু চুপ হয়ে গিয়েছিল এক মুহূর্তে। মশায় বলেছিলেন—সে তুই। ডাক্তারের রান্নাঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে তুই ভূত সেজে মাংস চেয়েছিলি। আমি জানি। দোষ তোর নয়, এ লোভ তোর রিপু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুই ছাড়তে পারবি নে। তোর ইতিহাস আমি জানি, তাই এত জোর করে বলেছিলাম—দাঁতু এতেই তোকে যেতে হবে। হাসপাতালের ডাক্তার জানে না তোর ইতিহাস, হয়তো আমার মতো বিশ্বাস করে না, তাই বলেছিল তোকে বাঁচাবে।

দাঁতু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।

মশায় বলেছিলেন ভয় কী? মরবে তো সবাই একদিন। আমিও মরব। মানুষ জন্মায়—সে কী হবে, তার কত সুখ কত দুঃখ এ কেউ বলতে পারে না, সবই তার অনিশ্চিত, নিশ্চিত কেবল একটি কথা—সে মরবে একদিন। আর বয়স তো কম হল না। সাহস কর, ভগবানের নাম নে। মরণকে যত ভয় করবি তত কাঁদতে হবে। ভয় করিস নে, দেখবি মরণই তোর সত্যিকারের সুখ। এ ভাঙা জরা দেহ—এ দিয়ে করবি কী? পালটে ফেল। পালটে ফেল।

দাঁতু অনেকক্ষণ কেঁদে তারপর বলেছিল—এবার আমাকে বাঁচাও, আর লোভের খাওয়া খাব না আমি। দেখো।

মশায় হেসেছিলেন, বলেছিলেন—চেষ্টা আমি করব। তবে বলাই ভালো যে দাঁতু! দেহে আর তোর কিছু নাই। নাড়ীতে বলছে—

—'ছি—ছি—ছি। ছি—ছি—ছি!'

মশায়ের কথায় মাঝখানেই দাঁতু চীৎকার করে উঠেছিল—মৃত্যুর সময়েও মশায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান ছিল দাঁতুর, শুধুই কেঁদেছিল, চোখ দিয়ে অনর্গল ধারে জল পড়েছিল। মশায় একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী হচ্ছে তোর?

ঘাড় নেড়ে দাঁতু ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল—জানি না। ভয় লাগছে।

সেই বহুকালের—সেই আদিকালের সেই পুরানো কথা। মহাভয়, মহাভয়! মহা অন্ধকার! মহাশূন্য। নিশ্বাস নেবার বায়ু নেই! দাঁড়াবার স্থান নাই! কিছু নাই! কেউ নাই—আমি নাই।

ক্ষণেকের জন্য মশায়কেও যেন তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। গভীর স্বরে তিনি ডেকে উঠেছিলেন—পরমানন্দ মাধব হে! সেতাবও ছিল মশায়ের সঙ্গে। দাঁতু তারও পাঠশালার সহপাঠী। দেখতে গিয়েছিল। সেতাব মশায়ের হাতখানা চেপে ধরেছিল।

সেই অবধি জীবনের সময় ভালো চলেছে। উপার্জনও বেড়েছে। সেতাবের ধারণা, এই সীতা মেয়েটি এইসব দেখেশুনেই এমন করে আঁকড়ে ধরেছে মশায়কে, আলোকলতার মতো আকাশপথে এসে বুড়ো শালের মাথায় পড়ে তাকে ছেয়ে ফেলেছে, তার রস শোষণ করছে। এই কারণেই সেতাব সন্তুষ্ট নয়। সে বলে—। আজও বললে—তবুও বলব জীবন, বাড়াবাড়ি লোকের চোখে ঠেকছে। কোথাকার কোন বংশের কী ধরনের মেয়ে, তার ঠিক নাই! আর তোর হল মশায়ের বংশ!

হেসে মশায় বললেন—মশায়ের বংশের অবস্থাটাও ওই মেয়েটির মতোই সেতাব। কী তফাত আছে বল? আর—। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন।

কথা বন্ধ করে মশায় যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন—কে কাঁদছে নয়? সেতাব?

কাঁদছে? হ্যাঁ। কার অসুখ ছিল? হ্যাঁ, কাঁদছেই তো!

মশায় উঠলেন। বললেন—ছক তোল সেতাব, একবার দেখি।

বৃদ্ধ সেতাব এসব বিষয়ে নিরাসক্তির কোঠায় পৌঁছেছে। সে আর একবার বললে—কার কী হল? বলেই হুঁকোটা তুলে নিলে।

—বোধ হয় মতি কর্মকারের বাড়িতে কারও কিছু হয়েছে। ওর মায়ের সেই ব্যাপার থেকে ওরাই শুধু আমাকে ডাকে না। কথায় কথায় হাসপাতালে ছোটে দেখি।

অন্য কারও বাড়িতে অসুখ থাকলে অবশ্যই তিনি জানতেন।

মশায়ের তার জন্য ক্ষোভ নাই। মতির উপর রাগ করেন না। তিনি জানেন—তাঁর

চেয়ে কেউ ভালো জানে না যে, তারা যে তাঁকে ডাকে না, আসে না—সেটা অবিশ্বাসের জন্য নয়। ডাকে না লজ্জায়। মতির মা তাঁর নিদান ব্যর্থ করে বেঁচেছে সেই লজ্জায় তাঁকে ডাকতে পারে না। মতি পর্যন্ত তাঁর সামনে আসে না। আড়াল দিয়ে হাঁটে। কিন্তু হল কী?

মশায় তাড়াতাড়ি জুতো পরে বেরিয়ে পড়লেন। খানিকটা গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। মতির মা-ই কি তবে গেল? না—!

কান্না মতির বাড়িতেই বটে। কিন্তু সকলের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে উঠছে মতির মায়ের কণ্ঠস্বর—ওরে বাবারে! আমার একি সর্বনাশ হল রে! তোমাকে আমি ছাড়ব নারে। তুমি আমার নাতিকে বাঁচিয়ে দিয়ে যাও। নইলে কেন তুমি আমাকে বাঁচালে রে?

মশায় দ্রুত হেঁটে মতির বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এই মুহূর্তেই হাসপাতালের ডাক্তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। মশায়ের সঙ্গে তাঁর চোখোচোখি হয়ে গেল। পিছনে পিছনে বাড়ি থেকে পাগলিনীর মতো বেরিয়ে এল মতির মা। খুঁড়িয়ে চলেও ছুটে এসে সে হাসপাতালের ডাক্তারের সামনে দাঁড়াল।—না-না-না। তুমি বাঁচিয়ে দিয়ে যাও। বাঁচিয়ে দিয়ে যাও। পায়ের উপর আছড়ে পড়ল সে, হাসপাতালের ডাক্তার দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। বললেন—ছাড়ো ছাড়ো, পথ ছাড়ো।

চীৎকার করে উঠল মতির মা—তবে আমাকেও মেরে দিয়ে যাও। বিষ দাও। মরণের ওষুধ দাও।

জীবনমশায় গম্ভীর স্বরে বললেন—মতির মা!

মতির মা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে নতুন করে বিলাপ শুরু করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু জীবনমশায় সেই গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন—ওগো, চুপ করো। সবেরই একটা সীমা আছে। কিন্তু হল কী? কার অসুখ করেছিল?

চীৎকার করেই মতির মা কী বলতে গেল। মশায় বললেন—এমন করে নয় মতির মা—এমন করে নয়। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরে বলো।

এবার হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—মতির বড় ছেলেটি মারা গেল।

—আঃ, ছি! ছি! ছি! মশায় বলে উঠলেন। বারো-তেরো বছরের যে—পাথরে গড়া ছেলের মতো শক্ত ছিল!—কী হয়েছিল?

—বোধহয় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। মাত্র দুদিন জ্বর। হঠাৎ হার্টফেল করল। ডাক্তার বলছিলেন, কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে আবার মতির মা চীৎকার করে আর্তনাদ করে উঠল—ওরে আমার সচল-বচল ছেলে রে, অসুরের কাঁড়ি সেই ছেলে আমার—।

বুক চাপড়াতে লাগল—মাথা ঠুকতে লাগল।—ওরে তুমি আমাকে কেন বাঁচালে রে? কেন বাঁচালে রে?

হাসপাতালের ডাক্তার বিব্রত হয়ে উঠলেন। ওদিকে তাঁর সাইকেল পাংচার হয়ে গেছে। চারপাশে লোক জমেছে। মৃদু গুঞ্জনে তারা বলছে—কি রকম? রোগ ডাকতেই

পায়ে নাই—না কি ?

জীবনমশায় ডাকলেন—মতি !

মতি দুই হাতে মাথা ধরে বসে ছিল। এবার সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল—ডাক্তার জেঠা, আপনাকে দেখালে হয়তো আমার—

জীবনমশায় বাধা দিয়ে বললেন—না। আমাকে দেখালেই বাঁচত কে বললে? সংসারে ডাক্তার-বৈদ্যতে রোগ সারাতে পারে, মৃত্যুরোগ সারাতে পারে না বাবা।

মতির মা আবার চীৎকার করে উঠল।—আমি কী করব গো? আমাকে বলে দাও।

—কী করবে? সহ্য করবে। সংসারে যখন বহু সংসার হয় তখন মুক্তি নিতে হয়—নয় সইতে হয়। সংসারে মৃত্যু অবিরাম। বিরাম নাই। মৃত্যুর কাছে বালক বৃদ্ধ নাই। কী করবে? সইতে হবে।

—আমাকে বাঁচালে কেন গো? আমাকে বাঁচালে কেন?

—এই শোক তোমার কপালে ছিল বলে। তাছাড়া তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে মতির মা।

কে একজন বলে উঠল—এ তো চিরকালের নিয়ম গো। সংসারে প্রবীণ মানুষ মৃত্যুশয্যা পেতে যদি উঠে বসে, তবে সে শয্যেতে আর কাউকে শুতে হবে। মাশুল দিতে হবে।

নীরবে জীবনমশায় অগ্রসর হলেন, তাঁর সঙ্গে হাসপাতালের ডাক্তার। হঠাৎ তিনি বললেন—এখানে ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া তো এখন নাই, আমি সন্দেহ করি নি। আমাকে বলেও নি। আজ বললে—কয়েকদিন আগে মামার বাড়ি গিয়েছিল। সেখান থেকেই এনেছে।

জীবন ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—রোগীর রোগ-বর্ণনায় ভুল, চিকিৎসকের ভ্রান্তি, ওষুধ অপ্রাপ্তি, এসব মৃত্যুরোগের উপসর্গ না হোক—হেতু। নইলে চিকিৎসা বিজ্ঞান—আমাদের বলে আয়ুর্বেদ পঞ্চম বেদ। বিজ্ঞান বেদ, এ তো মিথ্যা নয়। মিথ্যা এমনি করেই হয়। মৃত্যু আসে। অবশ্য একালের রোগপরীক্ষার উন্নতি আরও হবে। তখনকার কথা বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি, ভ্রান্তি মানুষের হবেই।

একটু চুপ করে থেকে প্রদ্যোত বললে—নাড়ী দেখে আপনি বুঝতে পারতেন ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া?

—এ ক্ষেত্রে হয়তো পারতাম না। পারলেও বাঁচাতে পারতাম না।

—ওটা ঠিক কথা নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ অচিকিৎসায় অকালে মরছে।

—হ্যাঁ তা মরছে।

এরপর দুজনেই নীরবে পথ হাঁটতে লাগলেন। মশায় ভাবছিলেন ডাক্তারের কথাই। মরে, অকালে অচিকিৎসায় অনেক লোক মরে। এ স্বীকার আজ করতেই হবে।

হঠাৎ হাসপাতালের ডাক্তার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, কিন্তু মতির মাকে আজ আপনি যে কথাগুলি বললেন সে আমার বড় ভালো লাগল। ঠিক কথা মশায়, জীবনে যখন সময় আসে তখন মুক্তি নিতে হয়। আমার শাশুড়ীর দিদিমা আছেন। তিন কুলের

সব গিয়েছে, কেবল তিনি আছেন। আমি গেলেই তিনি বলেন, তুমি তো ডাক্তার! আমার কান আর চোখ দুটো সারিয়ে দাও তো। এই মতির মা! আপনি ওকে যা বলেছিলেন—অপারেশন না হলে তাই হত। মরত বুড়ী। কিন্তু আপনি ওকে গঙ্গা-তীরে যেতে বলায় ওর সে কী কান্না তখন! আমার পায়ে ধরে বলে আমাকে বাঁচান। এ রোগে আমি মরতে পারব না। এ অপঘাত মৃত্যু। এতে মরে আমি শান্তি পাব না। আমার গতি হবে না।

—ওটা ছলনা ডাক্তারবাবু। মানুষ যেখানে অতি মায়ায় অতি মোহে বদ্ধ হয়, মৃত্যুভয়ে কাতর হয়, তখন নানা ছুতোয় বলে—আমি এই জন্যে বাঁচতে চাই, বাঁচাও আমাকে। মৃত্যুভয় যে মানুষের একটা বড় লজ্জা! তাই ঢাকে।

—ঠিক বলেছেন, এমনি কথাই আমাকে বলেছিল মতির মা। বলেছিল—আর সাধ আমার একটি আছে। বড় নাতির বউ দেখতে সাধ আছে।

মশায় একটু হাসলেন—মতির মা আবারও অসুখ করলে নতুন সাধের কথা বলে বাঁচবে। কিন্তু ছেলেটার যাওয়া বড় মর্মান্তিক। বড় সবল স্বাস্থ্য ছিল ছেলেটার! একজন বলশালী লোক হত। ইস্কুলে পড়ত; বাপের কামারশালে বাপকে সাহায্য করত; হাতুড়ি পিটত। ওকে দেখলেই মনে পড়ত মঙ্গলকাব্যের বালক কালকেতুকে।

অকালমৃত্যুর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু নাই। একে রোধ করাই এ সংসারে সবচেয়ে বড় কল্যাণ। সবচেয়ে সুখের। মৃত্যু এইখানে মৃত্যু, বৃদ্ধ বয়সে সে অমৃত।

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—আজকের কথা চিরদিন মনে থাকবে আমার। আমি বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম।

না—না—না। আপনি কেন বিব্রত হবেন? আপনি তো চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। আপনি কী করবেন?

হাসপাতালের সামনে এসে পড়েছিলেন তাঁরা। ডাক্তারের চাকর ভিতর থেকে ছুটে এসে ফটকটি খুলে দিলে। ডাক্তারের স্ত্রী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বোধ করি সবিস্ময়ে দেখছে। দূরে হাসপাতালের কাছাকাছি ছোট কোয়ার্টারটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সীতা। সেও দেখছে।

ডাক্তার আহ্বান জানালে—আসুন। একটু বসবেন না? অনেকবারই এসেছেন হাসপাতালে, এখনও আসেন; কদ্রুকে দেখে যান। আমি কখনও ডাকি নি, একটু বসবেন না আজ আমার বাসায়?

মশায় হাত জোড় করে বললেন—আজ নয় ডাক্তারবাবু। আসব অন্যদিন।

প্রদ্যোত একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে—আপনার কাছে হয়তো আমার ত্রুটি হয়ে থাকবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে আমি ইচ্ছে করে করি নি। আপনার চিকিৎসা-পদ্ধতি আর আমার পদ্ধতিতে অনেক প্রভেদ। আমার মত ছেড়ে আপনার মতে আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। তাতে আমাকে বিব্রত হতে হয়। আমার চিকিৎসা করা চলে না। তবে হ্যাঁ—মতির মায়ের নিদান হাঁকার কথা শুনে আর ওর সেই কান্না দেখে আমার রাগ

হয়েছিল। আজ অবশ্য দেখলাম—মতির মা মরলেই ওর পক্ষে ভালো হত। কিন্তু আমরা তো ঠিক ওই চোখে দেখি না।

হেসে মশায় বললেন—জানি। আমরা সেকালে ওই চোখেই দেখতাম। বিশেষ করে পরিণত বয়সের রোগী হলে, আর রোগ কঠিন হলে রোগের যন্ত্রণা উপশমের চেষ্টাই করতাম, মৃত্যুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম না। বলে দিতাম, ইঙ্গিতেও বলতাম, স্পষ্ট করে বলতাম, আর কেন? অনেক দেখলে, অনেক ভোগ করলে, এইবার মাটির সংসার থেকে চোখ ফিরিয়ে উপরের দিকে তাকাও। সাধারণ মানুষ আকাশের নীলের মধ্যে তো ধরবার কিছু পায় না, তাই বলতাম তীর্থস্থলে যাও, সেখানকার দেবতার মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বসে থাক। তবে অবশ্য যে প্রবীণ, যে বৃদ্ধ বয়সেও বহুজনের আশ্রয়, বহুকর্মের কর্মী, তাকে বাঁচাতে কি আর মরণের সঙ্গে লড়ি নি? লড়েছি।

প্রদ্যোত ডাক্তার বললে—অন্যদিন হলে তর্ক করতাম। আজ করব না। আমার নিজেরই দিদিশাশুড়ীর কথা বললাম। আমরাই বলি, বুড়া গেলেই খালাস পায়। সেও পায়—হয়তো আমরাও পাই।

মশায় বললেন—তা হয় বৈ কি। ওটা আবার সংসারের আর একদিক। সুস্থ জীবন—রঙে রসে ভরপুর জীবন জীর্ণ বস্তুকে সহ্য করবে কেমন করে?

প্রদ্যোত বললে—কয়েকটা কেসেই আমি আপনাকে হাত দেখতে দিই নি। আমার ভয় হত, আপনি কী পাবেন—কী বলে দেবেন। আপনার হাত দেখাকে আমার সময় সময় ভয় লাগে। বিশেষ করে অহি সরকারের নাতির অসুখে।

—ও আপনি অদ্ভুত বাঁচিয়েছেন। অদ্ভুত চিকিৎসা করেছেন। আমি প্রথম নাড়ীতে মৃত্যুর যেন পায়ের সাড়া পেয়েছিলাম। আমি বার বার হাত দেখেছিলাম কেন জানেন? মৃত্যুকে পিছন হঠে চলে যেতে দেখলাম।

অবাব হয়ে প্রদ্যোত তাকিয়ে রইল মশায়ের মুখের দিকে। কথাটা সে জানে না নয়—কিন্তু সে কথাকে এইভাবে সে প্রকাশ করত না, এমন করে সে অনুভব করে না।

—আজ চলি তা হলে।

—আর একটা কথা। রানা পাঠকের কথা।

—রানা বাঁচবে না ডাক্তারবাবু। রানা সে কথা জানে। সে এক অদ্ভুত মানুষ। সে তো ভয় করে না মরতে। আপনাদের এখনকার অদ্ভুত চিকিৎসায় বাঁচাতে পারত। কিন্তু সে বলে কী জানেন—ভালো হলেও সে-আমি আর হব না। অক্ষমের শামিল হয়ে বাঁচতে হবে, লোকে ভয়ে পাশে বসবে না। ছেলেপিলে ভয় করবে। সে বাঁচা বাঁচতে এত কষ্ট, এত খরচ করব কেন? তার চেয়ে যা-হয় আপনি করুন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন—আর তো রানা আমাকেও দেখায় না। ওষুধপত্র সব ছেড়ে দিয়েছে সে। এখন দেবস্থানের ওষুধ খাচ্ছে।

মশায় ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরলেন। রানাকে যদি বাঁচাতে পারতেন।

রানাকে সারাতে পারত প্রদ্যোতরা। হ্যাঁ, পারত। তাদের চিকিৎসাও ছিল—কিন্তু সে চিকিৎসার তাঁর আয়োজন নাই। আর এতখানি শক্তিও ছিল না; না—ছিল না।

এ চিকিৎসা-শাস্ত্র বিপুল গতিবেগে এগিয়ে চলেছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র খুলে দিয়েছে দিব্যদৃষ্টি। বীজাণুর পর বীজাণু আবিষ্কৃত হচ্ছে। রোগোৎপত্তির ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আজ সবই প্রায় আগন্তুক ব্যাধির পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল। সবের মূলেই বীজাণু। বীজাণু, জীবাণু, কৃমিজাতীয় সূক্ষ্মকীট—তারপর আছে ভাইরাস। খাদ্যে জলে বাতাসে তাদের সঞ্চরণ। মানুষের দেহে তাদের প্রবল বিস্তার। তাঁদের শাস্ত্রে পড়েছিলেন—দক্ষযজ্ঞে রুদ্রমূর্তি শিবের ক্রোধ নিঃশেষে হয়েছিল জ্বরের সৃষ্টি; নানান আকার, নানা প্রকার; আচার্যেরা তাদের প্রকৃতি নির্ণয় করে নামকরণ করেছিলেন। চন্দ্র দেবতার উপর দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপ থেকে যক্ষ্মার উৎপত্তি হয়েছিল। অতিরমণ দোষই যক্ষ্মার আক্রমণের বড় কারণ বলে ধরতেন। আজ, খাদ্যাভাব যক্ষ্মার প্রধান কারণ। প্রতিটি জ্বরের কারণ আজ ওরা অণুবীক্ষণে প্রত্যক্ষ করছে। কত নূতন জ্বর! এই তো কালাজ্বর ধরা পড়ল তাঁর আমলেই।

কালাজ্বরের ওষুধ ব্রহ্মচারী সাহেবের ইনজেকশন। প্রণ্টসিল, সালফাগ্রুপ, তারপর পেনিসিলিন, টেরামাইসিন, ওষুধের পর নতুন ওষুধ। শুনছিলেন সেদিন হরেনের কাছে। পেনিসিলিন চোখে দেখেছেন। বাকিগুলি দেখেন নি। আরও কত ওষুধ বেরিয়েছে—তিনি হয়তো শোনেন নি। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি দিয়ে চিকিৎসা।

রক্ত, পুঁজ থুথু, মল-মূত্র, চামড়া পরীক্ষা।

ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা।

এক্স-রে পরীক্ষা। যক্ষ্মায় আক্রান্ত শ্বাসযন্ত্র চোখে দেখা যায়। তেমনি ওষুধ।

টি-বিতে স্ট্রেপ্টোমাইসিন শক্তিশালী ওষুধ। স্ট্রেপ্টোমাইসিন ছাড়াও পি-এ-এস বলে একটা ওষুধ বেরিয়েছে বলে শুনেছেন। দুটোর একসঙ্গে ব্যবহারে না কি আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। এ ছাড়া—অস্ত্র-চিকিৎসার কথা শুনেছেন।

অকস্মাৎ একটা পুরানো কথা মনে পড়ে গেল।

গুরু রঙলালের কাছে কলেরার প্রেসক্রিপশন আনতে গিয়ে—মৃত্যুভয়ত্রস্ত মানুষদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন—মৃত্যু যেন দু-হাত বাড়িয়ে উন্মাদিনীর মতো ভয়ঙ্করী মূর্তিতে তাড়া করে ছুটেছে; মানুষ পালাচ্ছে; আগুন-লাগা বনের পশুর মতো দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছে।

রঙলাল ডাক্তার বলেছিলেন—শুধু পালানোটাই চোখে পড়ছে তোমার; মানুষ তার সঙ্গে অবিরাম লড়াই করছে দেখছ না? পিছু হঠেই আসছে সে চিরকাল—কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে আসে নি। নূতন নূতন অস্ত্রকে উদ্ভাবন করছে, আবিষ্কার করছে; সে চেষ্টার তো বিরাম নাই তার। মৃত্যুকে রোধ করা যাবে না, মৃত্যু থাকবেই। কিন্তু

রোগ নিবারণ সে করবে। পরিণত বয়সে যোগীর মতো মানুষ দেহত্যাগ করবে। চিকিৎসকের কাছে এসেই বলবে—আর না ; ছুটি চাই। ঘুমুতে চাই। পুট মি টু স্লীপ প্লীজ।

জীবন সেদিন মনে মনে বলেছিল—হ্যাঁ। নিদ্রা নয়, মহানিদ্রা।

ছত্রিশ

অপ্রত্যাশিত না হলেও সংবাদটা এল যেন হঠাৎ। আরও মাস খানেক পর। বৈশাখের শেষ সপ্তাহে।

রানা পাঠক মরেছে।

সংবাদটা নিয়ে এল কিশোর। কিশোর গিয়েছিল সেখানে। রানাই তাকে সংবাদ পাঠিয়েছিল। নবগ্রামের জেলেরা গিয়েছিল নদীতে মাছ ধরতে, তাদেরই একজনকে বলেছিল—কিশোরবাবুকে একবার আসবার জন্যে বলিস। আমি বোধ হয় আর দু-একদিন আছি, বুঝলি!

শেষ কিছুদিন রানা গ্রাম ছেড়ে নদীর ঘাটে একখানা কুঁড়ে তৈরি করে সেইখানেই থাকত। নদীর ঘাট, নদীর জলকর তার ইজারা নেওয়া ছিল। নদীর ঘাটটি তার অত্যন্ত প্রিয় স্থানও ছিল। ওই নদীর ঘাটেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ উল্লাস ভোগ করেছে। নদীতে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে সাঁতার কেটেছে, রাত্রে খেয়াঘাটের চালায় অথবা নৌকায় বসে মদ্যপান করেছে, নারী নিয়ে উল্লাস করেছে, খাওয়া-দাওয়া অনেক কিছু করেছে। আবার বসে মোটা গলায় প্রাণ খুলে কালীনাম করেছে। ইদানীং সে সন্ন্যাসী হয়েছিল। ওখানে সন্ন্যাসীর মতোই বাস করত। গেরুয়া কাপড় পরত, দাড়ি-গোঁফ রেখেছিল, খুব আচারেই থাকত। দেবস্থানের ওষুধই ব্যবহার করত। কিন্তু রানার গোঁড়ামি, রানার বিশ্বাস অদ্ভুত। ওকে টলানো যায় না। মৃত্যুশয্যাতেও স্বীকার করে নাই। বলেছে—এই আমার অদৃষ্ট, তার দেবতা কী করবে ?

কিশোরকেই বলেছে। কিশোর যখন পৌঁছেছিল, তখন তার শেষ অবস্থা। ঘণ্টা কয়েক বেঁচেছিল। কিশোর ডাক্তার-বৈদ্য ডাকতে চেয়েছিল—তারই উত্তরে ওই কথা বলে বলেছিল, ডাক্তার-বদ্যির জন্য তোমাকে ডাকি নাই কিশোরবাবু। শোনো, তোমাকে যার জন্যে ডেকেছি। মনে হচ্ছে, আজই হয়তো মরব। বড় জোর কাল। এখন রাত্রে একজন লোক চাই, কাছে থাকবে। জল চাইলে জল দেবে আর এই শেয়াল এলে তাড়াবে। বুঝেছ, নদীর ধারের মড়াখেকো শেয়াল তো, বেটারা ভারি হিংস্র। আজ দিন দু-তিন থেকে ওরা আশেপাশে ঘুরছে রাত্রে। তক্তাতে লাঠি ঠুকে, ধমক দিয়ে কালও তাড়িয়েছি। আজ আর পারব না। তা ছাড়া—

বলতে গিয়ে থেমে রানা একটু হেসেছিল। হেসে বলেছিল—মরণের আগে সব আসে তো। ভয় রানা পাবে না। তা পাবে না। ক্ষমতা থাকলে বলতাম—আয়রে বাবা, লাড়ু এক

হাত। তা ক্ষমতা নাই। একজন লোক থাকলে ভালো হয়। এই এক নম্বর। দু নম্বর হল—মরে গেলে দেহটার একটা ব্যবস্থা চাই। গাঁয়ের লোক ভয়ে যক্ষ্মারোগীর দেহ ছোঁবে না। তার একটা ব্যবস্থা কোরো। তিন নম্বর হল, ছেলে-মেয়ে। মা-মরা ছেলে—বাবাও যাবে। তুমি এখানকার ভালো লোক, ক্ষমতাও রাখ, পার তো ওদের দেখো একটু। আর চার নম্বর হল —মশায় আমার কাছে চিকিৎসার দরুন কিছু পাবে। তা মশায়কে বোলো—ওটা আমাকে মাফ দিতে। ব্যস।

বিনয়ের দোকানে বসে শুনলেন মশায়। শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। দু ফোঁটা জল তাঁর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে; দীর্ঘ দাড়ির মধ্যে পড়ে হারিয়ে গেল শিবের জটার গঙ্গার মতো। অনেকক্ষণ পর তিনি ডেকে উঠলেন—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

ডাক শুনেই মশায় বুঝতে পারলেন—মরি বোষ্টুমী এসেছে। কিন্তু এই অবেলায়? মরি সাধারণত আসে সকালে; ভিক্ষেয় বের হয়ে তাঁর বাড়িতে আরোগ্য-নিকেতনে এসে অভয়ার পাঠানো প্রসাদী মিষ্টান্ন তাঁকে দিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে যায়। অবেলায় এই সন্ধ্যায় বিনয়ের দোকানে সে কোথা থেকে এল? অভয়ার কি আবার অসুখ করেছে? রানার শেষকৃত্য করে ক্লান্ত কিশোর ওপাশের চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে গিয়েছে। মশায় নির্জন অবসরে নিজের নাড়ী ধরে বসে ছিলেন। ওটা একটা অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মরির কণ্ঠস্বর শুনে তিনি হাত ছেড়ে দিয়ে ডাকলেন—মরি!

—প্রণাম বাবা!

—তুই এই অসময়ে?

মরি হেসে বললে—আজ ফিরবার পথে বাবা। ঝুলি থেকে পাঁচটি আম বের করে নামিয়ে দিলে।

হেসে বললে—মায়ের গাছের আম প্রথম পেকেছে। মা-কালীর জন্যে 'সব্বাগ্যে' কটি তুলে রেখে পাঁচটি আপনার তরে দিয়ে বললে—দিয়ে এসো মরি। তা আজ আবার আমাদের গুপীনাথপুরে আখড়াতে অষ্টপ্রহরের ধুলোট ছিল। বৈষ্ণবসেবার রান্নাবান্নার কাজ করে হাত ধন্যি করতে গিয়েছিলাম। ফল জিনিস তো 'দিবসের' মধ্যে নষ্ট হবে না; বরং মজে মিষ্ট হবে, খাবার উপযুক্ত হবে।

বোষ্টুমী মরিদের কথাবার্তার এই ধরনটি আজ বিরল হয়ে এসেছে; কথার ও কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা মাধুর্য চিরকালই দুর্লভ; মরির মধ্যে দুই-ই আছে; মশায় ভারি তৃপ্তি পান।

মরি বললে—সেখান থেকেই ফিরছি। সায়ংকালে আজকাল আপনি এইখানে অধিষ্ঠান করেন আমি জানি তো! তাই এইখানে দিয়ে গেলাম।

আঁটির গাছের দেশী আম। কিন্তু শ্রদ্ধার ও কৃতজ্ঞতার মিষ্টতায় ও মাধুর্যে অমৃতফল। মুহূর্ত-পূর্বের বৈরাগ্য-গৈরিক উদাসীন পৃথিবী যেন এক মুহূর্তে গাঢ় মমতার সবুজে কোমল হয়ে উঠল।

মরি বললে—আর-একটি কথা বলেছেন মা।

—কী কথা ?

—এই জ্যৈষ্ঠি মাসে মায়ের সাবিত্রী চতুৰ্দ্দশীর ব্রেতো। সেদিন আপনাকে নেমন্তন্ন করেছে।

মনে পড়ে গেল, শশাঙ্কের মৃত্যু ধ্রুব জেনে তিনি অভয়াকে নিমন্ত্রণ করে পরিপাটি করে আমিষ খাওয়াতে চেয়েছিলেন। মনে পড়ল, গলির মুখে প্রদীপ হাতে ধরে দাঁড়ানো অভয়ার সেই ছবি; আলোর ছটা পড়েছে সিঁথির সিঁদুরের উপর, চোখের তারা দুটির মধ্যে ভাসছে তার প্রতিবিম্ব। শিউরে উঠলেন মশায়! চোখ বুজলেন তিনি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সাবিত্রী চতুর্দশীর ব্রতের খাওয়ান রাত্রে। এই বুড়ো বয়সে রাত্রে তো যেতে পারব না মরি!

মরি বললে—সেকথা আমি বলেছিলাম বাবামশায়। তা অভয়া মা বললে—তা তো বুঝি মরি, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়। তুই বলে একবার দেখিস। আর একটি কথা বলেছে।

—বলো।

—কিছু মাছের জন্তে বলেছে। এবারে ওদের পুকুরে মাছ একেবারে নাই।

মশায় খুশী হয়ে উঠলেন—মাছ! মাছ চেয়েছে অভয়া? তা দেব। পাঠিয়ে দেব।

—আম কটি কিন্তু খাবেন বাবা।

—নিশ্চয় খাব।

পৃথিবীকে মধুর করে দিয়ে চলে গেল মরি।

আবার তিনি ডাকলেন মরিকে—মরি! ওরে মরি!

—বাবা! ফিরল মরি।

—বলিস আমি যাব। সাবিত্রীব্রতে যাব। চলে যাব, ইন্দিরকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব। পৃথিবীতে আজ সব সঙ্কোচ ঘুচে গিয়েছে, সব তিক্ততা মুছে গিয়েছে। তিনি যাবেন।

* * *

মনের মধ্যে গান গুনগুন করছিল। নাম গান। রাত বেশ হয়েছে। নবগ্রামের লেনদেনের বাজারের আলোগুলোও ঝিমিয়ে পড়েছে। লণ্ঠনের কাচে কালি পড়েছে, পলতেতে মামড়ি জমেছে। শিখাগুলো কোনোটা দুভাগ হয়ে জ্বলছে, কোনোটার একটা কোণ ধোঁয়াটে শিখা তুলে লম্বা হয়ে উঠেছে। ডেলাইট পেট্রোম্যাক্সগুলোরও সেই দশা, ম্যান্টেল লালচে হয়েছে, খানিকটা বা কালো, কোনোটা বা মধ্যে মধ্যে দপদপ করছে! অধিকাংশ ক্যাশবাক্সে চাবি পড়েছে; বাক্সের উপর খেরোবাঁধা খাতাগুলো থাকবন্দী সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ জল ছিটিয়ে ধুনো দিচ্ছে, তালাচাবি হাতে লোক দাঁড়িয়ে আছে, দোকান বন্ধ করবে। ধ্বজু দত্তের বড় দোকান—ওখানে এখনো থাকবন্দী সিকি-আধুলি সাজানো রয়েছে, নোটের থাক গুনতি হচ্ছে। দোকানটার পাশে একটা খোলা জায়গায় খানকয়েক গোরুর গাড়ি আঁট লাগিয়েছে, গাড়ির তলায় খড় বিছিয়ে বিছানা পেতেছে। চৌমাথার মোড়ে চায়ের দোকানটায়

এখনও জন চারেক আড্ডা জমাতে বসে আছে। ওপাশে সাধুখাঁদের নূতন একতলা বাড়িটার বারান্দায় চারুবাবু আর প্রদ্যোত বসে রয়েছে। এইটেই ডাক্তারদের কো-অপারেটিভ মেডিক্যাল স্টোর্স। এদের হ্যাজাক-আলো নতুন, এখনও সমান তেজে জ্বলছে।

প্রদ্যোত ডাক্তার কবে ফিরল?

সেই মতির ছেলের মৃত্যুর পর প্রদ্যোত হঠাৎ ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক কলকাতা চলে গিয়েছিল। লোকে গুজব করেছিল—"প্রদ্যোত ডাক্তার মতির ছেলের মৃত্যুর ওই ব্যাপারটায় মনে মনে খুব ঘা খেয়েছে। সেই লজ্জায় এখান থেকে ট্রান্সফারের জন্য চেষ্টা করতে ছুটি নিয়ে কলকাতা চলে গেল।"

সীতা বলেছিল—না। উনি কলকাতায় গেলেন এখানকার ক্লিনিকের জন্যে। বিপিনবাবু পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেলেন, ওই টাকাটা গভর্নমেণ্টের হাতে দিয়ে, আরও কিছু স্যাংশন করিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি হয় তারই চেষ্টা করতে গিয়েছেন। কলকাতার অ্যাসেম্বলির কোনো মেম্বারকে ধরে চীফ মিনিস্টার ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। বলে গেছেন—অন্ততঃ যে টাকাটা হাতে পেয়েছেন তা দিয়ে যতটুকু হয়—সে সব কিনে তিনি ফিরবেন।

প্রদ্যোত ডাক্তার শক্ত লোক; তা হলে সে যন্ত্রপাতি নিয়েই ফিরেছে।

সীতা আরও বলেছিল—তবে ডাক্তারবাবু 'মনমরা' একটু হয়েছেন বটে। আপনাকে উনি মুখে যাই বলে থাকুন—মনে মনে আপনার ওপর বেশী চটেছেন।

তাই কি? সে কথা মশায়ের ঠিক মনে হয় না। সীতার কথার কঠিন প্রতিবাদ করতে পারেন নি কিন্তু মিষ্টি মৃদু প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন—না—না। তুমি ভাই, ভুল করেছ।

সীতা ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করেছে—উঁহু। ভদ্রলোককে আপনি ঠিক জানেন না দাদু। একটি কথা ভুলে যান না উনি। আর অত্যন্ত 'হামবড়া' লোক! এখানকার কোনো ডাক্তারকেই ভালো বলেন না উনি। আপনাকে আমি দাদু বলি, আপনার বাড়ি আসি বলে আমার উপরেও মনে মনে চটা।

দুঃখ পেয়েছিলেন শুনে।

একটি অতি সাধারণ মেয়ে—তার জীবনের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ, শুধু কৃতজ্ঞ এইটুকু মাত্র। এর জন্যে রাগ? সামান্য মানুষ! তার কৃতজ্ঞতা—তার প্রশংসা—তার কতটুকু মূল্য? তবে বিচিত্র! কতকাল আগে ওর নিতান্ত শৈশবে মেয়েটিকে বাঁচিয়েছিলেন। সে কথা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। মনে করিয়ে দিয়েছিল ওই মেয়েটিই।

উনিশশো তিরিশ সাল। এখানকার সবরেজেস্ট্রি আপিসে এসেছিল এক হেড-ক্লার্ক। রামলোচন সরকার। একমাত্র বিধবা মেয়ে, স্ত্রী আর বিধবা মেয়ের কোলে একটি শিশু মেয়ে নিয়ে এসে মশায়দের গ্রামেই বাসা নিয়েছিল। এখানে ছিল মাত্র মাস আষ্টেক। ওর মা—সরকারের বিধবা মেয়েটির খুব অসুখ নিয়েই এসেছিল। বাঁচবে বলে কেউ আশা করে নি, মশায়ই চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছিলেন। এ মেয়েটি তখন কঙ্কালসার শিশু। একত্রিশ সালের আশ্বিনে যে মারাত্মক ম্যালেরিয়ায় শিশুমড়ক হয়েছিল সেই ম্যালেরিয়ায় এ মেয়েটিও যায়-

যায় হয়, তাকেও তিনিই নাকি বাঁচিয়েছিলেন। সেদিন বাড়িতে এসে পরিচয় দিয়ে ও যখন এসব কথা বললে, তখনও তিনি চিনতে পারেন নি—চিনেছিলেন আতর-বউ। বললেন—সেই হাড়জিরজিরে মেয়েটা তুই? এমন হয়েছিস? আমি যে তোকে কত কোলে করে তেল মাখিয়ে রোদে ভেজেছি। তখন তাঁর ধীরে ধীরে মনে পড়েছিল। অত্যন্ত মধুর মনে হয়েছিল। অকস্মাৎ যেন রৌদ্রদগ্ধ আকাশ থেকে একবিন্দু মধু ছিটিয়ে দিয়েছিলেন বিধাতা। পৃথিবীতে এ দুর্লভ কিন্তু মূল্য তো এর কিছু নাই! মধ্যে মধ্যে মনে হয় চিকিৎসক-জীবনে নিদান হাঁকার পাওনা বিধাতা মিটিয়েছেন—শশাঙ্কের বউয়ের অভিশাপে, আর মানুষ বাঁচানোর পাওনা মিটিয়েছেন এই সীতা মেয়েটির কৃতজ্ঞতায়। মেয়েটার জ্ঞানও ছিল না তখন, মায়ের কাছে শুনে মনে রেখেছে।

—মশায় নাকি?

আলোকোজ্জ্বল চৌমাথাটায় আত্মগোপন করে যাওয়া যায় না। চারুবাবু ডাক্তার দেখতে পেয়েছেন। দাঁড়াতে হল। মশায় ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—হ্যাঁ। বসে আছেন? তারপর প্রদ্যোতবাবু, কবে ফিরলেন? নমস্কার!

প্রতি-নমস্কার করে প্রদ্যোত বললে—আজ চার দিন হয়ে গেল।

—চার দিন? তা হবে। আজ কয়েক দিনই সীতা আসে নি। দেখা হয় নি।

—একবার আসুন গো এখানে। আপনার জন্যেই আমরা বসে আছি। ডাকলেন চারুবাবু।

—আমার জন্যে?

শঙ্কিত হলেন মশায়। আবার কোন অভিযোগ? কী হল? কী করেছেন তিনি? মনের মধ্যে অনেক সন্ধান করলেন। কই কারুর নিদান তো তিনি হাঁকেন নি! তবে কি রানার কথা? এঁরা কি বলবেন যে তিনি আশা দেন নি বলেই হতাশাতে রানা দেবস্থলে চিকিৎসার নামে অচিকিৎসায় মারা গেল? অথবা বলবেন—দেবস্থলে যেতে তিনিই তাকে উৎসাহিত করেছিলেন?

চারুবাবু বললেন—প্রদ্যোতবাবুর স্ত্রীর জ্বর। একবার দেখতে হবে।

—প্রদ্যোতবাবুর স্ত্রীর জ্বর, আমাকে দেখতে হবে?

—হ্যাঁ। কলকাতা থেকেই জ্বর নিয়ে এসেছেন। জ্বরটা যেন কেমন লাগছে—। এণ্টেরিক তো বটেই। টাইফয়েডের লক্ষণ রয়েছে। আর চারদিন না গেলে তো রক্তপরীক্ষায় ধরা পড়বে না! আপনি একবার নাড়ীটা দেখুন। টাইফয়েড হলে খুব ভিরুলেণ্ট টাইপ; চার-দিন আজ, ফার্স্ট উইক—এরই মধ্যে জ্বর তিন ছাড়াচ্ছে। প্রদ্যোতবাবু আমাকে ডেকে-ছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বলতে আমি পারব না। আপনি পারেন। নাড়ী দেখে আপনি পারেন—সে আমি উঁচু গলা করে বলি। ওঁকেও বলেছি। প্রদ্যোতকে দেখিয়ে দিলেন চারুবাবু।

এতক্ষণে প্রদ্যোত কথা বললে—ডায়োগনসিস আপনার অদ্ভুত। আপনি শুধু বলে দেবেন

টাইফয়েড কি না!

একটু হেসে মুখ তুলে ওদের দিকে তাকালেন, এতক্ষণ মাটির দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। মুখ তুলে প্রদ্যোতের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—চলুন।

লাবণ্যবতী দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি নেতিয়ে পড়েছে। মুখখানি জ্বরোত্তাপে ঈষৎ রক্তাভ এবং ভারী হয়ে উঠেছে। ভ্রমরের মতো কোঁকড়ানো রুক্ষ চুল বালিশের নিচে খোলা রয়েছে, কপালের উপর কতকগুলি উড়ছে। কপালে জলের পটি রয়েছে। চোখ বুজে শুয়ে আছে। স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। ঘরে একটি বিচিত্র গন্ধ উঠছে। ধূপকাঠি, ওডিকোলন, ফিনাইল, ওষুধ—এই সবের একটা মিশ্রিত গন্ধ। মাথার শিয়রে বসে রয়েছে নার্স। সীতা! হ্যাঁ, সীতাই বসে রয়েছে।

বাবা তাঁর নাড়ী-পরীক্ষা বিদ্যার গুরু। তাঁকে স্মরণ করে তিনি মেয়েটির হাতখানি তুলে নিলেন। সেখানি রেখে আর একখানি। সেখানিও পরীক্ষা করে রেখে দিলেন। জ্বর অনেকটা—সাড়ে তিনের বেশী মনে হচ্ছে। চারের কাছে।

সীতা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতীক্ষা করছে কী বলবেন। প্রদ্যোত ডাক্তার স্ত্রীর মাথার কাছে ঝুঁকে মৃদুস্বরে সস্নেহে ডাকলেন—মঞ্জু!

ভুরু দুটি ঈষৎ উপরের দিকে তুলে চোখ বুজে মেয়েটি সাড়া দিলে—উঁ।

—এখানকার জীবনমশায় এসেছেন তোমাকে দেখতে।

মেয়েটি চোখ খুললে, বড় বড় দুটি চোখ, এদিক থেকে ওদিক চোখ বুলিয়ে মশায়কে দেখে আবার চোখ বন্ধ করলে।

প্রদ্যোত ডাক্তার বললেন—তোমার জিভটা দেখাও তো!

মেয়েটি জিভ দেখালে।

চারুবাবু সীতাকে বললেন—থার্মোমিটার দাও।

জীবনমশায় বললেন—থাক। এর আগে কত ছিল?

ডাক্তার একখানা খাতা এনে চোখের সমনে ধরলেন। একশো তিন পয়েণ্ট চার।

মশায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন—আর কিছু বেড়েছে। আধ ডিগ্রী।

প্রদ্যোত এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল, মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে—টাইফয়েড?

জীবনমশায় একটু দ্বিধা করলেন। বললেন—আজ ঠিক বলতে পারব না। কাল সকালে দেখে বলব। আজ আমার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে।

—কিন্তু আমি যে ক্লোরোমাইসেটিন দেবো ভাবছি। প্রথম সপ্তাহে জ্বর—বলেই ঘরের দিকে ফিরে বললেন—সীতা, কত দেখলে জ্বর?

সীতা থার্মোমিটার হাতে বেরিয়ে এল, প্রদ্যোত ডাক্তারের হাতে দিয়ে নীরবেই চলে গেল। কিন্তু একটি স্মিতহাস্যে মুখখানি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কারণ থার্মোমিটারে কালো

দাগটি একশো চারের দাগের এক সুতো পিছনে এসে থেমে রয়েছে। প্রদ্যোত ডাক্তার দেখে বললে—চারই বটে।

জীবনমশায় বললেন—আর আজ বাড়বে না। আমি কাল সকালেই আসব।

—আমি ক্লোরোমাইসেটিন আনিয়েছি। আজ দিতে পারলে—

—কাল। কাল সকালে। এ রোগে আট ঘণ্টায় কিছু যাবে আসবে না। আর—হাসলেন জীবনমশায়।—রাগ করবেন না তো ?

—না। বলুন।

—আপনি উতলা হয়েছেন। আপনার চিকিৎসা করা তো উচিত হবে না।

—নাঃ! আমি ঠিক আছি। আর আমি তো চিকিৎসা করছি না। চারুবাবু চিকিৎসা করছেন।

* * *

পরদিন সকালে জীবনমশায় নাড়ী ধরে দীর্ঘ সময় প্রায় ধ্যানস্থের মতো বসে রইলেন।

সকালবেলা। প্রসন্ন সূর্যালোকে ঘর ভরে উঠেছে। দরজা জানালা খোলা, ঘরখানিকে ইতিমধ্যেই জীবাণুনাশক ওষুধ-মেশানো জল দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। এক কোণে ধুপ-কাঠি জ্বলছে। বিছানা চাদর পরিচ্ছন্ন। খাটের পাশে টি-পয়ের ওপর ওষুধের শিশি, ফীডিং কাপ, কয়েকটা কমলালেবু, টেম্পারেচার চার্ট। রোগিণী এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ। জ্বর কমেছে। ঠোঁট দুটি শুকিয়ে রয়েছে। আচ্ছন্ন ভাবটা কম। তবু চোখ বুঁজেই রয়েছে। মধ্যে মধ্যে মেলছে, কিন্তু আবার নেমে পড়ছে চোখের পাতা। কপালে এখন জলের পটি নাই, কপাল মুখ রক্তাভ শুষ্ক। পরিপূর্ণ আলোর প্রসন্নতা এবং বৈশাখের প্রভাতের স্নিগ্ধতার মধ্যেও রোগিণীর যেন স্বস্তি নাই, মধ্যে মধ্যে নাক খুঁটছে।

নাড়ীর গতি তিনি অনুভব করলেন, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল :

মন্দং মন্দং শিথিলং শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা—

অতি মন্থর ভারাক্রান্ত পদক্ষেপ স্খলদ্গতিতে চলছে—অসহায় আকুলতার প্রকাশ রয়েছে তার মধ্যে। যেন—যেন ব্যাকুল জীবনস্পন্দন ত্রস্ত হয়ে কোনো আশ্রয় খুঁজছে। সান্নিপাতিক পাতিক জ্বরের সমস্ত লক্ষণ সুপরিস্ফুট। ত্রিদোষের প্রকোপ তীব্র। মনে হচ্ছে।—যাক সে কথা। জীবনমশায় চোখ খুলে তাকালেন হাসপাতালের ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন। সন্তর্পণে জীবনমশায় হাতখানি নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। চাকর দাঁড়িয়ে ছিল সাবান জল তোয়ালে নিয়ে। হাত ধুয়ে মশায় তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বললেন—রোগ টাইফয়েড। নিঃসন্দেহে টাইফয়েডের চিকিৎসা চলতে পারে।

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—সন্দেহ আমারও হয়েছিল। কিন্তু মঞ্জুই আমাকে ধোঁকা ধরিয়েছে ; আমরা নিয়মিতভাবে টাইফয়েডের টিকে নিয়ে থাকি। চার মাস আগেও একবার কলকাতা গিয়েছিল। ছিল মাসখানেক। এই সময়েই আমাদের নতুন ইনঅকুলেশনের সময়টা পার হয়েছে। আমি এখানে ইনঅকুলেশন নিয়ে ওকে লিখেছিলাম—কলকাতায়

রয়েছ, নিশ্চয় যেন টি-এ-বি-সি নেবে। ও লিখেছিল—নিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম। এখানে ফিরলে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম—ভ্যাকসিন নিয়েছ? বলেছিল—নিয়েছি। এবার জ্বর হতে প্রথম দিন থেকে জিজ্ঞাসা করেছি—ভ্যাকসিন নিয়েছিলে তো? ও বলেছে—নিয়েছি। আজ সকালে স্বীকার করলে, নেয় নি। আমি বললাম—মশায় আমাকে বলে গেছেন টাইফয়েড। তখন বললে—না, নিই নি। যাক এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ক্লোরোমাইসেটিন দেব। চারুবাবু, হরেনবাবু দুইজনেই আসছেন। ওঁরা আসুন—একবার জিজ্ঞেস করে নিই।

সীতা এসে ঘরে ঢুকল। সে স্নান করে সঞ্জীবিত হয়ে এসেছে যেন। সে বড় প্রসন্ন আজ বোধ করি, প্রদ্যোত ডাক্তারের এই স্বীকৃতিতে সে উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

চারুবাবুরা এসে পৌঁছুলেন। মশায়কে দেখে বললেন—ব্যস, প্রদ্যোতবাবু, উনি বলছেন তো! তা হলে দিন ক্লোরোমাইসেটিন। নিশ্চিন্তে দিয়ে দিন।

ক্লোরোমাইসেটিন। নূতন যুগের আবিষ্কার। এ না কি অদ্ভুত ওষুধ।

দুঃসাধ্য টাইফয়েড; সাক্ষাৎ মৃত্যু-সহচরী সান্নিপাতি; তার গতিবেগ বর্ষার পাহাড়িয়া নদীর প্রচণ্ড বন্যার মতো—যাকে ফেরানো যায় না, বাঁধা যায় না। আপন বেগে প্রবাহিত হয়ে বন্যার মতোই নিজেকে নিঃশেষ করে তবে ক্ষান্ত হয়। সেই শেষ হওয়ার পর যদি জীবন থাকে তো রোগী বাঁচে। তাও বাঁচে বন্যাপ্লাবনে মাটি-খুলে-যাওয়া, সমস্ত উর্বরাশক্তি ধুয়ে রিক্ত-হয়ে-যাওয়া পুষ্পোদ্যানের মতো। শীর্ণ-উষর ভূমিখণ্ডের মতো তার অবস্থা হয়।

ব্রজলালবাবুর দৌহিত্রের টাইফয়েডে ব্যাকটিরিওফাজ দেখেছিলেন। সে ক্ষেত্রে কাজ করে নাই। কিন্তু পরে ফাজ ব্যবহারে ফল দেখেছেন। ক্লোরোমাইসেটিন না কি অমোঘ। সান্নিপাতাশ্রয়ী মৃত্যুকে না কি তর্জনীহেলনে অগ্রগমনে নিষেধ করবার মতো শক্তিশালিনী। বৃদ্ধ জীবনমশায় বসে রইলেন উদগ্রীব হয়ে, তিনি দেখবেন। শিশি তিনি দেখেছেন—বিনয়ের ওখানে আছে কয়েক শিশি। তিন শিশি বোধ হয়। একটা কেসে ওই তিন শিশিই যথেষ্ট। কাল থেকেই না কি জ্বর কমবে। তৃতীয় দিনে জ্বর ছাড়বে। বিস্ময় বই কি!

প্রদ্যোত ডাক্তার ডাকলে—মঞ্জু! মঞ্জু! হাঁ করো। ট্যাবলেট।

সীতা জল তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মুখে জল ঢেলে দিলে। চারুবাবু ক্যাপস্যুলটা মুখে ফেলে দিলেন।

সন্ধ্যায় আবার গেলেন জীবনমশায়। নাড়ী ধরে দেখলেন জ্বর বেড়েছে। আজ বোধ হয় সাড়ে চার—মাথার শিয়রে বসে আছে আজ অন্য নার্স। সীতাকে বোধ হয় ছুটি দিয়েছে।

পরদিন সকালেও জ্বর কমল না। আগের দিনের থেকে বেশী।

রোগীর আচ্ছন্নতাও বেশী। পেটের ফাঁপ বেশী।

তৃতীয় দিন। আজ জ্বর উপশম হওয়ার কথা। ছাড়ার কথা। কিন্তু? কোথায়? মশায়

গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন—কই, ভেষজের ক্রিয়া কই?

হাসপাতালের ডাক্তার—চারুবাবু, হরেন সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠলেন—তাই তো। তবে কী—?

জীবনমশায় দৃঢ়স্বরে বললেন—রোগ টাইফয়েড। নাড়ীতে রোগ অত্যন্ত প্রবল। এইটুকু আমি বলতে পারি।

প্রৌঢ় চারুবাবু অল্পতেই ভড়কান, এবং অল্পেই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তিনি দমে গেছেন।—তাই তো। সংসারে মুনিরও মতিভ্রম হয় যে!

জীবনমশায় দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন—না। ভ্রম তাঁর হয় নি।

প্রদ্যোত ডাক্তারের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল। বললেন—আবার ক্লোরোমাইসেটিন দিন চারুবাবু। নিজের হাতে খুললেন শিশি। তুলে দিলেন তাঁর হাতে।

সন্ধ্যায় জীবনমশায় দেখলেন প্রদ্যোত ডাক্তার বারান্দায় দু হাতে দুটো রগ ধরে বসে আছেন। রোগিণীর মাথার শিয়রে বসে সীতা। সীতাই বললে—রক্তদাস্ত হয়েছে। জ্বর সমান।

জীবনমশায় আজ নিজেই ঘরে ঢুকে রোগীর পাশে বসে হাত তুলে নিলেন। বেরিয়ে এসে প্রদ্যোতের কাঁধের উপর হাত রাখলেন।

প্রদ্যোত মুখ তুললেন—মশায়?

—হ্যাঁ। আপনি মুষড়ে পড়বেন না। রক্তদাস্ত হোক। এ রোগে ও তো হয়। এবং হয়েও বাঁচে। রোগীর নাড়ী আমি ভালো দেখলাম। ত্রিদোষপ্রকোপের মাত্রা কমেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমার ভুল হয় নি।

ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জীবনমশায় বললেন—আমি আপনাকে মিথ্যা প্রবোধ দিই নি।

দীর্ঘক্ষণ বসে রইলেন তিনি।

স্টেশন থেকে একখানা গোরুর গাড়ি এসে ঢুকল। দুটি মহিলা নামলেন। দুজনেই বিধবা, একজন অতিবৃদ্ধা। ডাক্তার এগিয়ে গেলেন।—মা!

—মঞ্জু কেমন আছে বাবা?

—অসুখেই আছে। কিন্তু—ওঁকে আনলেন কেন? ডাক্তার বিরক্ত হয়েছেন। বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করে কথাটা বললেন।

—কোথায় ফেলে দেব বাবা? ও তো আমায় ছাড়বে না।

—কিন্তু কোথায় ওঁকে রাখি? কী করি?

—একপাশে থাকবে পড়ে। এখন আর উপদ্রব করে না। কেমন হয়ে গেছে কিছুদিন থেকে। চুপ করেই থাকে। নইলে আনতাম না।

—আসুন।

জীবনমশায়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন—বসুন ডাক্তারবাবু, যাবেন না।

আমি আসছি। ইনিই আমার শাশুড়ীর সেই দিদিমা। এই রোগের ঝঞ্ঝাটের উপর উনি হবেন বড় ঝঞ্ঝাট।

বসে রইলেন জীবন ডাক্তার।

বৈশাখের আকাশ। গতকাল দুপুরের দিকে সামান্য একটু ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে আজ ধূলিমালিন্য নাই। নক্ষত্রমালা আজ ঝলমল করছে। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন জীবনমশায়। এমন অবস্থায় মন যেন ফাঁকা হয়ে যায়। কোনো কিছুতে দৃষ্টি আবদ্ধ করে না রাখলে মন ছুটতে শুরু করবে। কী করলে কী হবে? হাজার প্রশ্ন জাগবে। কোথায় কী হল? কোন ত্রুটি? জীবন হাঁপিয়ে উঠবে। ছুটতে পারে না তবু ছুটবে—ছুটতে হবে।

আকাশের ঝলমলানির মধ্যে মন হারিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে বেঁচেছে।

—মাঃ! মাঃ!

—এই যে মা! মঞ্জু! আমি এসেছি মা।

—মাঃ!

—কী বলছিস? কোথায় যন্ত্রণা? কী হচ্ছে? মঞ্জু?

—অ্যাঃ! মাঃ!

—কী বলছিস?

—বাবাঃ! আঁ!

জীবনমশায় হাসলেন।

মা! মা বলছেন—এই যে আমি। তবু রোগী ডাকছে—হয়তো বা পাশ ফিরে শুয়ে ডাকছে—মা মা! সুদীর্ঘ চিকিৎসকের জীবনে এ কত দেখে এলেন। হায় রে মানুষ! সে মা কি তুমি? সে মা—আরোগ্যরূপিণী যিনি—তিনি। তাঁর সর্বাঙ্গে অমৃত—তাঁর স্পর্শে স্নিগ্ধ হবে রোগীর দেহের রোগজর্জরতা; উত্তাপ কমে আসবে; অশান্ত অধীরতা শান্ত হয়ে আসবে; আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে জাগবে চৈতন্য; জীবকোষে-কোষে জীবনবহ্নির দাবদাহের প্রজ্বলন সংবৃত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে জ্বলবে প্রদীপের মতো। সকলযন্ত্রণাহরা সর্বসন্তাপহরা আরোগ্যরূপিণী তিনিই মা; কে তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি অমৃতরূপিণী; অভয়া; মৃত্যু তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নমস্কার করে চলে যায়। মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হলেন মশায়। মনে হল মৃত্যু এসে যেন দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। কোনো কোণে সে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে রয়েছে। রোগিণী বোধ করি তারই আভাস অনুভব করে ডাকছে সেই অমৃতরূপিণীকে। সতর্ক হয়ে তিনি রোগিণীর দিকে চেয়ে রইলেন।

সাঁইত্রিশ

পরের দিন সকালে।

জীবনমশায় আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারের বাড়ি যাবেন। হঠাৎ প্রদ্যোত ডাক্তার নিজেই সাইকেল চড়ে এসে রোয়াকে পা দিয়েই সাইকেলটার গতিরোধ করলেন; নামলেন না। হাঁপাচ্ছেন।

—মশায়, আজ জ্বর নাইন্‌টিনাইনে নেমেছে।

—নেমেছে ?

—হ্যাঁ। নাইন্‌টিনাইন পয়েন্ট দুই। ভোরবেলা থেকেই মঞ্জু কথা বলছে—সহজ কথা। বলছে ভালো আছি।

—ভগবানের দয়া আর আপনার অদ্ভুত সাহস, আর দৃঢ়তা!

তরুণ ডাক্তারটি কোনো প্রতিবাদ করলেন না এ প্রশংসার। নিঃসঙ্কোচে হাসিমুখে গ্রহণ করলেন, শুধু বললেন—আপনার নাড়ীজ্ঞানের সাহায্য না পেলে এতটা সাহস পেতাম না মশায়। আচ্ছা, আমি যাই। মনের খুশিতে ছুটে এসেছি।

ঘুরল সাইকেল; ডাক্তার দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। সকালের বাতাসে তার রুক্ষ চুলগুলি উড়ছে।

পরমানন্দ মাধব! পরমানন্দ মাধব হে! পরমানন্দ—! কলিটা অসমাপ্ত রেখেই ডাক্তার একসঙ্গে হাসলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সুখীদের মধ্যে এই লোকটি একজন। ওই মেয়েটিকে সে জীবন ভরে পেয়েছে। ছেলেটি আর মেয়েটিতে মিলে মানস সরোবর।

কিশোর সেদিন বলেছিল—এই পাওয়াই শ্রেষ্ঠ পাওয়া। এ পাওয়া যে পায়—তার সব পাওয়া হয়ে যায় ডাক্তারবাবু। সৃষ্টি হয় মানস সরোবরের।

কিশোরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বিয়ে করছ শুনলাম, কিন্তু কী হল ?

সে বলেছিল—ভয় হল মশায়!

—বিয়ে করলে বউ পাওয়া যায় মশায়, কিন্তু যা পাওয়ার জন্যে বিয়ে করে মানুষ—তা পাওয়া যায় না। নারী আর প্রকৃতি ও দুই সত্যিই এক। দুদিন পরেই বুকে পা দিয়ে দলে আপনার পথে চলে যায়। কখনো নিজের মুণ্ডু কেটে নিজেই রক্তস্নান করে, কখনো নিজে স্বামীকে গ্রাস করে ধূমাবতী সাজে, কখনও আবার নিজের বাপের মুখে স্বামীনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করে। কদাচিৎ পুরুষের প্রেমে পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে শান্ত অচঞ্চল হয়ে ধরা দেয়। যাদের ভাগ্যে এই পাওয়া ঘটে, তাদের আর কিছু প্রয়োজন নাই। প্রতিষ্ঠা প্রশংসা সাম্রাজ্য—এমন কি মুক্তিও না। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর নাই। এ কেউ পায় না। ভয়ে পা বাড়িয়ে পিছিয়ে নিলাম। কে জানে—কী ফাঁকি আছে আমাদের দুজনের মধ্যে। ফাঁক থাকলে তো রক্ষে নাই। নারী তখন নদীর মতো ছুটবে আর আমি তীরের মতো বাহু

বাড়িয়ে সাগরের কূল পর্যন্ত ছুটেও তাকে পাব না। ও থাকে বাহুবন্ধনের মধ্যে, ধরা পড়লেই ওরা মানস সরোবর।

কথাটা সত্য। ভুল নাই। মনে মনে বার বার বললেন জীবনমশায়। হাসপাতালের ডাক্তারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, সন্ধ্যাবেলায় আরও ভালো করে এই সত্যটি অনুভব করলেন। সন্ধ্যার দিকে রোগিণীর জ্বর ধীরে ধীরে ছেড়ে এসেছে এখন।

সীতা স্মিতমুখ ডাক্তার-গৃহিণীর মুখখানি মুছিয়ে দিয়ে বললে—যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!

—তোমায় খুব খাটতে হয়েছে, না? শীর্ণ হাসি ফুটে উঠল ডাক্তারের বউয়ের মুখে।

ডাক্তার ছেলেমানুষের মতো ছুটে গিয়ে কম্পাউণ্ডারকে বলে এলেন। নার্সদের ওদিকে গেলেন। হাসপাতালের রান্নাশালায় ঝাড়ুদার মতিয়া জমাদারকে বলে এলেন—ওরে জ্বর ছেড়ে গেছে। জীবনমশায়ের উপস্থিতিও ভুলে গেছেন ডাক্তার।

রোগীর ঘরে ডাক্তারের শাশুড়ী প্রবেশ করলেন—যে ভয় তুই ধরিয়েছিলি মঞ্জু! সে কী বলব!

—কে জানে! তিন-চার দিনের কথা আমার কিছুই মনে নেই।

—থাকবে কি? একেবারে বেহুঁশ। মা—মা বলে চেঁচিয়েছিস, আমি ডাকলাম—এই যে আমি। তা একবার ফিরেও তাকালি না।

—তুমি কবে কখন এসেছ—আমি কিছুই জানি না।

—তোর এই অবস্থা, ওদিকে জামাইয়ের সে কী মুখ! মুখ দেখে আমার কান্না উপে গেল। মনে হল, মঞ্জুর যদি কিছু হয় তবে জামাই আমার পাগল হয়ে যাবে।

—পাগল হত না। তবে সন্ন্যাসী হত, নয়তো আত্মহত্যা করত।

জীবনমশায় বারান্দায় দাঁড়িয়েই মনশ্চক্ষে দেখলেন—রোগিণীর শীর্ণ ক্লান্ত শুষ্ক অধরে স্মিত হাস্যরেখা ফুটে উঠেছে, কৃষ্ণাচতুর্দশীর শেষরাত্রের এককলা চন্দ্রোদয়ের মতো সে হাসির রূপ। এবং মেয়েটি এই হাসিতে কোনো লজ্জা অনুভব করছে না। সগৌরবে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পুষ্পবিকাশের মতোই অকুণ্ঠ প্রকাশে হাসিমুখে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

পরমানন্দ মাধব হে!

ডাক্তার ফিরছেন। পদক্ষেপে উল্লাস ফুটে উঠছে।

—ধরা! ধরিত্রী! শুনছিস?

ডাক্তারের শাশুড়ীকে ডাকছেন তাঁর সঙ্গের সেই মেয়েটি। এই কদিনই এই কণ্ঠস্বর তিনি শুনেছেন। ভিতরের দিকে বারান্দা থেকে এই ডাক ডাকেন। আবছা চোখেও পড়েছে—একটি দীর্ঘাঙ্গী প্রৌঢ়া বিধবা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চুপ করে বসে থাকেন। গালে একটি হাত, মাটির উপরে একটি হাত, বসেই থাকেন। মধ্যে মধ্যে ডাকেন—ধরা, ধরিত্রী!

এদিক থেকে সাড়া দিত না কেউ—রোগীর শিয়রে বসে সাড়াই বা দেবে কী করে? চুপ করে যেতেন ভদ্রমহিলা। মহিলাটিকে দেখে মনে হয় একদিন জীবনে তাঁর জীবনমহিমা

ছিল! কিছুক্ষণ পর আবার ডাকতেন—ধরা! ধরিত্রী! অ-ধরিত্রী! হ্যাঁ লা, মেয়ে তোর রয়েছে কেমন? বল্? ঘরে ঢুকতে বারণ করেছিস—ঢুকি নে। তবু খবরটা বল্!

সাড়া এতেই বা কে দেবে? তিনি চুপ করতেন।

আজও সেই তিনিই ডাকছেন। সেই ডাক। আজ ধরিত্রী সাড়া দিলেন—বলো! কী চাই?

—কী চাইব? হ্যাঁ লা তুই নাতনী—মেয়ের মেয়ে, মঞ্জু তোর মেয়ে, তার এখানে এসেছি—সেই তো বড় লজ্জা! এর পর আবার চাইব কী?

—তবে? কী বলছ?

—বলছি, মঞ্জু তো ভালো রয়েছে—একবার যাই না ওঘরে, ওকে দেখি! চোখে তো দেখব না, একবার মুখে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

—একটু ওডিকলন মাখাব না? এ কণ্ঠস্বর মঞ্জুর। সে হেসে উঠল, দুর্বল কিন্তু সশব্দ হাসি।

—তা ভাই দিস যদি মাখব। কদিন এখানে এসেছি—মাথায় তেল দিই নি। নারকেল তেল দেয় নামিয়ে। ও তো ভাই মাখতে পারি নে, কী করব। রুক্ষু মাথাতেই চান করি। ওডিকলন নয়, একটু গন্ধতেল দিস।

—চুপ করো, জামাই আসছেন—দিদিমা, চুপ করো।

ডাক্তার আসছেন—মঞ্জুর মা দেখতে পেয়েছেন। তিনি সতর্ক করে দিচ্ছেন বৃদ্ধাকে।

একটু বেদনা অনুভব না করে পারলেন না জীবনমশায়।

—কই তোর জামাই, কই? একবার ডেকে দে না আমার কাছে। আমি আজ না হয় পথের ধুলোর অধম হয়েছি, ঘরে গেলে ঘর নোংরা হয়; ছুঁলে হাত ময়লা হয়। কিন্তু চিরদিন তো এমন ছিলাম না! আমারও রূপ যৌবন ছিল। আদর সম্ভ্রম ছিল। তার উপর আমি মঞ্জুর মায়ের মা। সেদিক থেকেও তো আমার সঙ্গে কথা বলতে হয়!

—কী? কী বলছেন? ডাক্তার শুনেতে পেয়েছেন কথাগুলি। বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। এ অবস্থায় মঞ্জুর মায়েরও দিদিমাকে সাবধান করার উপায় ছিল না। ডাক্তারের মন পরম প্রসন্নতায় ভরা। তিনি হেসেই উত্তর দিলেন—নিশ্চয়; কথা বলব বৈ-কি। আপনি গুরুজন। তবে মঞ্জুর অসুখ নিয়ে—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ ভাই। তা বটে। যে লজ্জা, যে ভয় হয়েছিল আমার। ভেবেছি—কেন এলাম? আমি সর্বস্বখাগী। স্বামী খেয়েছি, তাকে খেয়ে গেলাম মেয়ের ঘরে, সেখানে মেয়েকে খেলাম। তোমার শাশুড়ীকে মানুষ করলাম—সেই জামাইয়ের ঘর, তার অন্ন খেয়ে। মেয়ের সতীন এল—তার কথা শুনে সেখানে রইলাম; তারপর ধরার বিয়ে হল। ধরার বাড়ি এলাম, ধরা বিধবা হল। আবার এখানে—এখানে কেন এলাম? তা যার জন্যে এসেছি—সে জান তো? আমার চোখ দুটি ভালো করে দাও। বড় ডাক্তার তুমি!

—আচ্ছা, আচ্ছা। কালই আমি ওষুধ দোব।

—ওষুধ নয়, অপারেশন করে দাও।

—অপারেশন কি হবে? ছানি তো না!

—উহু, অপারেশন না করলে ভালো হবে না। অপারেশন করলেই ভালো হবে। কতজনের ভালো হল।

—আচ্ছা, দেখব কাল ভালো করে। তা হলে আমি বাইরে যাই। আপনার কোনো কষ্ট-টষ্ট হচ্ছে না তো?

—হচ্ছে ভাই। মাথায় একটু ভালো তেল চাই। আর কাপড়গুলি বড় পুরনো হয়েছে।

ঘরের ভিতর থেকে ডাক্তারের লজ্জিতা শাশুড়ী বললেন—করবে কী? উপায় কী বল? কাপড়ের কণ্ট্রোল—বিশ্বশুদ্ধ লোক কাপড়ের অভাবে ছেঁড়া পরে দিন কাটাচ্ছে।

—তা বটে, তা বটে ভাই। তবু মঞ্জুর দুখানা আধপুরনো শাড়ি দিস। তাই পরব।

মঞ্জু হেসে উঠল।—রঙীন ডুরে শাড়ি—

—তাই পরব। তবু ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো কাপড় পরতে পারি না।

ডাক্তার বারান্দায় জীবনমশায়কে দেখে একটু লজ্জা পেলেন। তাঁর মনেই ছিল না জীবনমশায়ের অস্তিত্বের কথা। মনের উল্লাসে ভুলেই গেছেন।

—আমার দেরি হয়ে গেল মশায়।

—তা হোক।

—ও ভাই—ও মঞ্জুর বর! শুনছ!

কী বিপদ! প্রদ্যোত ডাক্তার এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। হয়তো বা ওই মহিলাটির কথা জীবনমশায় শুনেছেন বুঝে মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মহিলাটির উপর তো বটেই—হয়তো জীবনমশায়ের উপরেও বিরক্ত হয়েছে। জীবনমশায়ের শোনা উচিত হয় নি, চলে যাওয়া উচিত ছিল।

জীবনমশায় বললেন—আমি আজ যাই।

—বসবেন না একটু?

—না, আবার কাল আসব।

—আচ্ছা। মঞ্জু যেদিন পথ্য পাবে সেদিন একটা খাওয়া-দাওয়া করব।

—বেশ তো।

—পথ্যের দিন নির্ণয় কিন্তু আপনি করবেন। ক্লোরোমাইসেটিনে জ্বর ছাড়ে, কিন্তু আবার রিল্যাপ্স করার একটা ভয় আছে। আপনি যেদিন বলবেন নাড়ী নির্দোষ হয়েছে—এবার পথ্য দেওয়া যেতে পারে, তখন দেব। রক্তদাস্ত যখন হয়েছে, তখন ইনটেস্টাইনে পারফোরেশন হয়েছে নিশ্চয়। পথ্য খুব হিসেব করে দিতে হবে।

ওদিকে সর্বরিক্ত দিনাতিদীন মহিলাটি ডেকেই চলেছেন—অ-ভাই! শুনছ! একটু অপেক্ষা করে আবার ডাকছেন—মঞ্জুর বর! আবার ডাকছেন—অ-ডাক্তার সায়েব!

মঞ্জুর মা একবার চাপা গলায় বললেন—থামো দিদিমা। কথা বলছেন জামাই মশায়ের সঙ্গে।

—মশায়ের সঙ্গে? সে কে?

—যিনি খুব ভালো নাড়ী দেখেন, এখানকার প্রবীণ বৈদ্য। চুপ করলেন মঞ্জুর মা।

—তা—। বলেই স্তব্ধ হয়ে যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন বৃদ্ধা।

কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন এবং ডাকলেন—ধরা, কথা শেষ হল? আমি একটা কথা বলছিলাম।

এবার প্রদ্যোত ডাক্তার বোধ হয় খেপে উঠবে। মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—বলেছি তো কাল চোখ কেটে দেব। যা হয় হবে আপনার।

—না। তা বলি নি ভাই।

—তবে? কাপড়? তাও এনে দেব।

—না—না।

—তবে কী?

—ওই যে মশায় না কি—যিনি নাড়ী দেখেন ভালো—

—হ্যাঁ—তিনি কী করবেন? তিনি তো অপারেশন করেন না!

—না—না। তাঁকে একবার হাত দেখাব।

—হাতে কী হল আবার? বেশ তো শক্ত রয়েছেন। এখন তো কোনো অসুখ নেই।

—অসুখ অনেক আমার, তোমরা ধরতে পার না। ওই সব পুরনো লোকে ঠিক ধরতে পারবে। তুমি ওকে বলেই দেখো না। তোমাদের কাছে তো আমি নগন্যি লোক। ওকে বলো—কাঁদীর জমিদার অমুক বোসের স্ত্রী। অমুক বোসকে চেনে না—এমন লোক এ চাকলায় নাই। তা ছাড়া এসব তো আমাদেরই জমিদারি ছিল গো। বলে দেখো, কত খাতির করে দেখবে। তা ছাড়া আমার বাবা—ওঁর—।

প্রদ্যোৎ এবার ধৈর্য হারিয়ে সত্যসত্যই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু কী বলবে খুঁজে পেলে না। —মশায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

মঞ্জুর মা বৃদ্ধার হাত ধরে চাপা দিয়ে বললে—দিদিমা—চুপ করো। দিদিমা!

মশায় বাইরে থেকে ডাকলেন—প্রদ্যোতবাবু!

প্রদ্যোত বেরিয়ে এল, এবং সর্বাগ্রে হাতজোড় করে বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না ওঁর কথায়। উনি সেই সেকালের জমিদারের বউ। মাথা খারাপ হয়ে গেছে—

হেসে বাধা দিয়ে মশায় বললেন—না—না—না। আপনি এমন সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন? উনি হাত দেখাতে চাচ্ছেন—চলুন হাত দেখি। দেখলেই তো খুশী হবেন। কাঁদীর কাদের বাড়ির বউ? কার স্ত্রী?

—ভূপেন বোস। লোকে বলত ভূপী বোস। যত অমিতাচারী তত অমিতব্যয়ী—সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন, তবু মদ ছাড়তে পারেন নি।

—হাত দেখাব,. শুনেছি নাকি হাত দেখে নিদান হাঁকতে পারেন। কবে মরব, সেইটে জানব। তুমি ওঁকে বলো, মঞ্জরী—মঞ্জরীর হাত দেখতে হবে। ওঁর মাস্টারের মেয়ে মঞ্জরী আমি। কাঁদীর অমুক বোসের স্ত্রী মঞ্জরী। উনি চিনবেন।

জ্যৈষ্ঠ রাত্রির রুক্ষ নির্মেঘ নক্ষত্র-ঝলমল আকাশ অকস্মাৎ কোমল নীলাভ দীপ্তিতে ভরে গিয়ে একটা উল্কা খসে গেল বুঝি। জীবনমশায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

—মঞ্জরী!

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—চিনতেন তাঁকে?

—চিনি, খুব চিনি। আপনার আপত্তি না থাকলে ওঁকে আমি দেখব!

—বেশ তো। আজই দেখবেন!

—ক্ষতি কী! দেখি।

প্রদ্যোত বললেন—বহু রোগ ওঁর শরীরে। স্বামীই দিয়ে গেছেন অনেক বিষ। বললাম তো তাঁর কথা। আর আপনিও জানেন বলছেন।

—জানি।

—তাঁর অমিতাচারের বিষ আছে রক্তে। নিজের রসনার লোভের ফলে—স্টমাক-ইন্টেস্টাইন হয়েছে ব্যাধিগ্রস্ত, পুষ্টির অভাবে দেহকোষ হয়েছে দুর্বল। মনের অশান্তি—তাও ক্রিয়া করেছে। চোখ গেছে। কানেও একটু খাটো। কোলাইটিস লেগেই আছে, শীতে হাঁপানি হয়, শিরঃপীড়া আছে, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়। আশ্চর্য শক্ত দেহ, সব সহ্য করেই বেঁচে রয়েছেন। চুরি করে খান—।

থেমে গেল ডাক্তার। মনে হল আর বলা অন্যায় হবে।

মঞ্জরী চুরি করে খায়, চুরি করে গন্ধদ্রব্য মাখে, হাতে অনুভব করে যার হোক খরখরে দেখে পরিচ্ছন্ন বুঝে কাপড় টেনে নিয়ে পরে।

সে সব তথ্য এ কদিন ওঁদের কথাবার্তা থেকে জেনেছেন।

মশায় প্রদ্যোত ডাক্তারকে বললেন—চলুন।

প্রদ্যোত বলল—সেদিন ওঁকে আমি মতির মায়ের গল্প বলেছি। আপনি যা বলেছিলেন—তাও বলেছি, কিন্তু কাকে বললাম—কে শুনবে? বললেন—মঞ্জুর একটি ছেলে দেখি—তার পর ভাই, তার পর। আর মরলেই তো ফুরিয়ে গেল ভাই।

* * *

মঞ্জরীর সামনে দাঁড়িয়ে মশায় কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; কপালে সারি সারি রেখা জেগে উঠল, চোখে ফুটে উঠল অদ্ভুত দৃষ্টি। পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে পরলেন তিনি। ভালো করে দেখলেন। দূর থেকে কয়েকদিনই বৃদ্ধাকে দেখেছেন তিনি, আজ চশমা চোখে কাছ থেকে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। পেলেন না; কোথাও তার বিন্দুমাত্র অবশেষ নাই।

—দেখি আপনার হাতখানি।

জ্বর লেগেই আছে নাড়ীতে। ব্যাধিজর্জর অভ্যন্তর। উদ্বেগকাতর চিত্ত নাড়ীর স্পন্দনে স্পন্দনে বলছে। দেহকোষে-কোষে, আকাশের নক্ষত্রমালার মতো যে জীবনশিখাগুলি অহরহ প্রাণদেবতার আরতি করে জ্বলে, প্রাণকে মধুময় উত্তাপে অভিষিক্ত করে জাগ্রত করে রাখে জীবদেহে, সেগুলি স্তিমিত-দ্যুতি, অনেকগুলি নিভেই গিয়েছে। প্রাণদেবতার চারিদিকে ছায়া জেগে উঠছে, ছায়ায় হিমস্পর্শ ছড়াচ্ছে; শেষ সীমারেখায় উপনীত হতে আর অল্প পথই বাকি। নাড়ীর স্পন্দনে জাগে যে জীবনসঙ্গীত—তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে বিলম্বিত ছন্দে সমাপ্তির অবিলম্বতা ঘোষণা করছে।

হাতখানি নামিয়ে রেখে বললেন—ও হাতখানি দেখি।

সেই একই কথা—একই ছন্দ একই ধ্বনি।

—কী দেখলেন গো? চোখ-কান পাব? ভালো করতে পারবেন?

—না।

—মাথার যন্ত্রণা? শিরঃপীড়া?

—ভালো হবে না, তবে এখন অনেক ভালো ওষুধ উঠেছে খাবেন, যন্ত্রণা কমে যাবে। আমি একটা টোটকা বলে দেব—ব্যবহার করলে কমবে খানিকটা, তবে একেবারে ভালো হবে না।

—পেটের গোলমাল?

—ওই তো আপনার আসল রোগ।

—ভালো করে দেন।

—ভালো?

—হ্যাঁ। মঞ্জুর একটি খোকা দেখি!

—জন্মান্তরে তো বিশ্বাস করেন! মঞ্জুর কোলে খুকী হয়ে আপনিই ফিরে আসবেন, সে তো আরও ভালো হবে।

একটু চুপ করে থেকে বৃদ্ধা বললেন—তা হলে এবারের মতো যেতে বলছেন! আর বাঁচব না? কিন্তু—! কিন্তু ভারি যে ভয় লাগে গো!

—ভয় কিসের? এ তো মুক্তি।

—মুক্তি?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া আর কী? সেখানে আপনার স্বামী, মা, বাপ, ভাই, মেয়ে, জামাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন।

বৃদ্ধার মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টিহীন চোখে সামনের দিকে চেয়ে আত্মমগ্ন হয়ে বসে রইলেন।

মশায় উঠলেন। বৃদ্ধা সচেতন হয়ে উঠলেন চেয়ার ঠেলার শব্দে। বললেন—তা হলে আমাকে যেতে হবে বলছেন? কতদিনের মধ্যে যেতে হবে?

প্রদ্যোত ডাক্তারের অস্তিত্ব ভুলে গেলেন জীবনমশায়, নিদান সম্পর্কে তার আপত্তির

কথাও তাঁর মনে হল না, তিনি আবার একবার বসে—বৃদ্ধার হাতখানি ধরে ভালো করে দেখে বললেন, তিন মাস থেকে ছ মাস। এর মধ্যেই মুক্তি পাবেন আপনি। তবে একালের ওষুধ খেলে হয়তো আরও কিছুদিন দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে। একালের ওষুধ বড় শক্তিশালী।

—নাঃ। তা আর খাব না। আপনি আমাকে ভালো কথা মনে করে দিয়েছেন—তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। যত শীগগির মুক্তি আসে ততই ভালো। এই কথাটি কেউ এমন করে আমাকে বলে নাই। ওঃ, কতকাল তারা আমার পথ চেয়ে আছে! আর আমি—।

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। দৃষ্টিহীন চোখ দুটি নির্নিমেষ হয়ে গেল। এবার জল গড়াবে।

চোখ ফিরিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে গিয়ে তিনি চমকে গেলেন; সামনের আয়নাতে তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব পড়েছে। শুভ্রকেশ, রেখাঙ্কিত ললাট, পাণ্ডুর মুখ, এক স্থবির দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়ে গেল একটি কথা। তাঁর বাবার কথা। বলেছিলেন—জন্মমাত্রেই মৃত্যু সঙ্গ নেয়; দিনে দিনে সে বাড়ে, সেই বৃদ্ধির মধ্যেই সে তার ক্ষয়ের ক্রিয়া করে যায়, ঠেলে নিয়ে যায় তার পথে; জীবন-যুদ্ধ করে মানুষ যেদিন ক্লান্ত হয়—সেদিন আসে জরা, তারপর আসে শেষ। বলতে গেলে আজকের আমি জন্মাই সূর্যোদয়ে, মরি নিদ্রার সঙ্গে দিনান্তে রাত্রির অন্ধকারে, আবার জন্মাই নূতন প্রভাতে জন্মান্তরে।

প্রদ্যোত ডাক্তার মশায়ের এই নিবিষ্ট একাগ্র দৃষ্টিতে দেখা দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। চেয়ারখানা একটু সরিয়ে দিয়ে বলল—বসুন।

মশায়ের রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাসটি এতক্ষণে ঝরে পড়ল। তিনি মুখ ফিরিয়ে চেয়ারখানা দেখে নিয়ে বললেন—কী কষ্ট আপনার?

বৃদ্ধা বললেন—আপনি জীবনমশায়? নবগ্রাম দেবীপুরের জীবন দত্ত? আমি মঞ্জরী। কাঁদীর বঙ্কিমের বোন, মাস্টার নবকৃষ্ণ সিংহীর মেয়ে।

একটু হেসে মশায় বললেন—হ্যাঁ। শুনেই চিনেছি আমি। অনেক কালের কথা, আবছা আবছা মনে পড়ে।

—ঠিক বলেছেন। আবছা আবছা। সব ঝাপসা। এখানে এসে শুনি জীবনমশায়, জীবনমশায়। নবগ্রাম, নবগ্রাম। মনে হয় চেনা-চেনা। নাম শোনা। তারপরেতে, আপনার কথা শুনে—ওই ঝোঁক দিয়ে কথা বলা শুনে মনে হল আপনিই তিনি। তাঁরাও তো মশায় ছিলেন। বাড়িও নবগ্রাম ছিল। তা মাথার গোলমাল তো, এই মনে পড়ে, আবার গোলমাল হয়ে যায়! শেষে বলি, তিনিই হোন আর যিনিই হোন, এত বড় বৈদ্য—হাতটা দেখাই না কেন—যদি ভালো হই!

মশায় নীরবে উঠে বেরিয়ে এলেন।

হাসপাতাল থেকেই বেরিয়ে এলেন তিনি। প্রদ্যোত ডাক্তার ফটকের মুখ পর্যন্ত এসেছিল,

সে বললে, মশায়, এই আপনাদের নিদান হাঁকা ?

জীবনমশায় শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে, কথাটা তাঁর মাথায় ঢুকল না। প্রদ্যোত বললে—এ আপনার কাছে আমার শিখতে ইচ্ছে করছে।

মশায়ের মনের মধ্যে ঘুরছিল সেই পিঙ্গলবর্ণা কন্যার কথা। পিঙ্গলবর্ণা, পিঙ্গলকেশিনী, পিঙ্গলচক্ষু কন্যা—কৌষেয়বাসিনী, সর্বাঙ্গে পদ্মবীজের ভূষণ ; অন্ধ বধির ! অহরহই সে সঙ্গে রয়েছে, কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো। শ্রমের সঙ্গে বিশ্রামের মতো, শব্দের সঙ্গে স্তব্ধতার মতো ; সঙ্গীতের সঙ্গে সমাপ্তির মতো ; গতির সঙ্গে পতনের মতো ; চেতনার সঙ্গে নিদ্রার মতো। মৃত্যুদূত তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়, অন্ধবধির কন্যা, অমৃতস্পর্শ বুলিয়ে দেন তার সর্বাঙ্গে। অনন্ত অতলান্ত শান্তিতে জীবন জুড়িয়ে যায়। তেমনি করে জুড়িয়ে যায় যেন মঞ্জরী। মৃত্যুদূত সে যেন আসে ভূপীর রূপ ধরে।

পরমানন্দ মাধব ! তোমার মাধুরীতে সৃষ্টিতে ছড়ানো মধু, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত।

নিজের হাতখানা ধরলেন। রক্তস্রোত আজ দ্রুত চলেছে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়েছে। দেহের রোমকূপের মুখগুলি স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল এমন উত্তেজনা তিনি অনুভব করেন নি। তিনি কী—তাঁর কী ? কিন্তু তাঁর মৃত্যুদূত কোন্ রূপে আসবে ? মঞ্জরী নয়। মঞ্জরী জীবনে ভ্রান্তি। মিথ্যা। আতর-বউয়ের রূপে ? তাঁর বাবা জগৎমশায়ের রূপ ধরে ? গুরু রঙলালের মূর্তিতে ? অথবা নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে সে থাকবে—তাকে দেখা যাবে না ? সে বনবিহারী ?

—কে ?

আরোগ্য-নিকেতনের সামনে এসে পড়েছিলেন তিনি। একটি আলো জ্বলছে।

কে বসে রয়েছে ! ভ্রূকুঞ্চিত করে তিনি প্রশ্ন করলেন—কে ?

—মশায় বাবা ! আমি প্রভু, আমি 'মরি'।

মরি বষ্টমী ! এত রাত্রে ?—কী রে মরি ?

—আজ যে সাবিত্রীচতুর্দশী বাবা ! অভয়া মা বললেন—কৃষাণ মান্দেরকে কী করে পাঠাব মরি ? ওদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে তুমি যাও।

আজ সাবিত্রীচতুর্দশী ! একদিন বৈধব্যের দুঃখ কল্পনা করে তিনি বাপের মতো স্নেহে অভয়াকে খাইয়েছিলেন, সে তাকে অভিসম্পাত দিয়েছিল। আজ অবৈধব্য ব্রত উপলক্ষে তাঁকে খাওয়াবে। কন্যার মতো শ্রদ্ধা করেই নিমন্ত্রণ করেছে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে তির্যক ভঙ্গিতে সেই অন্ধকারের মধ্যেই তিনি তাকালেন একবার। বোধ করি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন। আর-একবার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের মণিবন্ধ চেপে ধরলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিলেন। বললেন—চল।

চার মাস পর।

উনিশশো একান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাস। আশ্বিন সন্ধ্যা। প্রদ্যোত ডাক্তার বাইরের বারান্দায় কলব্যাগ, ব্লাডপ্রেসার পরিমাপের যন্ত্র নিয়ে কলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। পাশে ছোট টুলের উপর চায়ের কাপ নামানো।

মঞ্জু ঘর থেকে বেরিয়ে এল, সেও বাইরে যাবে বোধ হয়। চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে সে বললে—এ কী, খেলে না চা?

—নাঃ। ভালো লাগল না।

—ভালো হয় নি? আমি তৈরি করে আনব?

—না, ভালোই লাগছে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রদ্যোত বললে—শেষটায় ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেলাম! তোমার অসুখের সময় সাহায্য সব ডাক্তারেই করেছিলেন, কিন্তু মশায়ের সাহায্যের চেয়ে ভালোবাসা বড়।

একটু চুপ করে বোধ করি ভেবে বললে—ওটা বোধ হয় প্রবীণের ধর্ম। আমরা পারি না। বয়স না হলে হয় না। কিন্তু—।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে—কিন্তু তুমি আজই এলে, এই ঘণ্টা খানেক আগে ট্রেন থেকে নেমেছ, আজ তুমি না গেলেই পারতে। শরীর তোমার এখনও ঠিক সুস্থ হয় নি।

অসুখের পর মঞ্জুকে চেঞ্জে পাঠিয়েছিলেন। আজই মঞ্জু বিকেলের ট্রেনে ফিরেছে।

মশায়ের অসুখ; প্রদ্যোত দেখতে যাচ্ছে শুনে সেও যাবে বলে তৈরি হয়েছে। মশায়ের অসুখ; আজ চার মাসই তিনি অসুস্থ। মধ্যে মধ্যে শয্যাশায়ী হয়েছেন, আজ তিন দিন অসুখ বেশী। রোগ রক্তের চাপ, ব্লাডপ্রেসার; আক্রমণ হৃৎপিণ্ডে; করোনারি থ্রম্বসিস।

মঞ্জু বললে—না-না। আমার কিছু হবে না। আমার শরীর ঠিক আছে।

—ঠিক আছে? হাসলে প্রদ্যোত।—মনের ইমোশনে বোঝা যায় না। প্রথম অসুখের খবর পেয়ে যখন মশায়কে দেখতে গেলাম, তখন মশায় যন্ত্রণার মধ্যেও হেসে বলেছিলেন—স্নেহ, দয়া, ভালোবাসা কোনো কিছুরই আতিশয্য সে ক্ষমা করে না ডাক্তারবাবু। পাপ পুণ্য যার জন্যেই হোক, জীবনের উপর পীড়ন করলেই সেই ছিদ্রে তার দূত এসে আশ্রয় নেয়। আমারও নিয়েছে। কাল খুব দূরে নয় ডাক্তারবাবু।

বাঁ হাতে নিজের ডান হাতের মণিবন্ধ ধরে নাড়ী অনুভব করে হেসে বলেছিলেন—মনে হচ্ছে, গ্রামের বাইরে—গ্রামে ঢুকবার মুখে সে পদার্পণ করেছে। গ্রামে ঢুকেছে।

সেদিন মনের অবস্থা ছিল বিচিত্র।

মঞ্জরীকে দেখে বেরিয়ে যখন এসেছিলেন তখন তাঁর বৃদ্ধ দেহের শিরায় উপশিরায় রক্তস্রোত দ্রুতবেগে বইছিল।

মন তখন এক বিচিত্র উপলব্ধির আস্বাদ অনুভব করেছে! সে এক আশ্চর্য উল্লাস!

তার উপর হাসপাতালের ফটকে প্রদ্যোত তাঁকে বলেছিল—এই আপনাদের নিদান হাঁকা? এ যে শিখতে ইচ্ছে করছে!

বাড়ি ফিরবার পথে মনে হয়েছিল—সেই অন্ধকারের মধ্যে তিনি আরণ্য গজের মতো বেরিয়ে পড়েন মৃত্যুগহ্বরের সন্ধানে। জনহীন দিকহারা প্রান্তর খাঁ-খাঁ করছে, অথবা গভীর নিবিড় মহা অরণ্য থমথম করছে; অসংখ্যকোটি ঝিল্লীর ঐকতান ধ্বনিত হচ্ছে; মৃত্যুর মহাশূন্যতার মধ্য দিয়ে জীবনপ্রবাহ চলেছে জন্ম থেকে জন্মান্তরে; সেইখানে উল্লাসধ্বনি করে সেই মহাগহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন নবজন্মের আশায়। নিজের নাড়ী ধরে পথ হেঁটেছিলেন, কিন্তু আনন্দের আবেশে অনুভূতিযোগ স্থির হয় নি। বাড়িতে গিয়ে মরি বষ্টুমীকে দেখে তারই সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন অভয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

আতর-বউ বারণ করেছিলেন, কিন্তু শোনেন নি। শুধু তাই নয়, আতর-বউয়ের কথায় দুরন্ত ক্রোধে তিনি যে চীৎকার করেছিলেন—সে চীৎকার আজও মশায়ের নিজের কানের পাশে বাজছে। জীবনে এমন চীৎকার তিনি কখনও কোনোদিন করেন নি।

আতর-বউই প্রথম ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—এই বয়সে, এই রাত্রে নিমন্ত্রণ খেতে চলেছ! এমন অভর পেট তোমার; বনবিহারীকে খেয়ে ভরে নি?

মুহূর্তে প্রচণ্ড চীৎকারে রাত্রির আকাশ চমকে উঠেছিল—তিনি চীৎকার করে উঠেছিলেন—আতর ব-উ—!

মরি বষ্টুমী চমকে উঠেছিল, সঙ্গের লোকটার হাত থেকে লণ্ঠনটা পড়ে দপ করে নিভে গিয়েছিল।

অভয়া অন্ধকারের মধ্যে দাওয়ার উপর তাঁর প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। সারাটা দিন নিরম্বু উপবাসিনী, কুশাগ্রে জল পর্যন্ত খায় নি। কালও অর্ধ উপবাস। নিজের ঘরের গাছের ফল আর মধু খেয়ে থাকবে। আগামী জন্মে পাবে অবৈধব্য ফল। যতদিন সে জীবিত থাকবে ততদিন মৃত্যু ওর স্বামীর সান্নিধ্যে আসতে পারবে না। সাক্ষাৎ মৃত্যুবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও মৃত্যুকে ফিরে যেতে হবে অভয়ার এ জন্মের এই ব্রতচারণের পুণ্যফলের প্রভাবে। সাবিত্রী করেছিলেন এই ব্রত। সত্যবানের প্রাণ গ্রহণ করে মৃত্যুর অধিপতি চলেছিলেন মৃত্যুপুরীর মুখে। অপার্থিব পথ অপার্থিব রহস্যলোক সেখানে। পার্থিব দৃষ্টি সেখানে অন্ধ। কিন্তু এই ব্রতপালনের পুণ্যে সাবিত্রী মৃত্যুপতিকে অনুসরণ করেছিলেন; এই পুণ্যবলে মৃত্যুপতিকে পরাভূত করে ফিরিয়ে এনেছিলেন স্বামীর জীবন। সাবিত্রীর কাহিনী সত্য কিনা, এই ব্রত করে আজও এমন ভাগ্য হয়েছে কারো কি হয় নি, এ বিচার কেউ করে না; আবহমান কাল গভীর বিশ্বাসে এই ব্রত করে এসেছে এদেশের মেয়েরা। অভয়ার উপবাসশীর্ণ মুখে সে বিশ্বাসের গাঢ়তম ছাপ দেখেছিলেন। তাঁকে দেখে অভয়ার মুখে শুক্লা প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মতো একটি বিশীর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। সে দেখে মশায়ের মন থেকে ক্রোধের অস্বস্তির রেশ নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল, আশ্বিনের পূর্ণিমার নির্মেঘ আকাশের মতো সারা মনটা ঝলমল করে উঠেছিল। মনে মনে বলেছিলেন—চিকিৎসক

হিসেবে আমি জানি, মৃত্যু পাপের বিচার করে না, পুণ্যের করে না ; সে আসে ক্ষয়ের পথে, ক্ষয় যেখানে প্রবল সেখানে সে অপরাজেয়, সে ধ্রুব ! তবু আজ আমি বার বার আশীর্বাদ করছি, এ সত্য হোক, এ সত্য হোক, পরজন্মে তোমার স্বামীর জীবনে ক্ষয় প্রবল হলেও যেন তোমার পুণ্যবলের কাছে মৃত্যু হার মানে।

তাঁর সামনে খাবারের থালা নামিয়ে দিয়ে অভয়া বলেছিল--আমার এ অনেক দিনের সাধ। প্রতিবার সাবিত্রী ব্রতের সময় মনে হয়েছে ব্রাহ্মণভোজন করিয়েও পূর্ণ হল না। আপনি খেলে তবে পূর্ণ হয়।

হেসে তিনি বলেছিলেন—পূর্ণ হোক মা এবার।

—আপনাকে কী দেব বলুন ? আপনি তো রাত্রে শুনেছি দুধ আর ফল বা থই, এ ছাড়া খান না। তাই দি ? দুধ, আম, কলা, এইসব আর মিষ্টি !

—তুমি যা দেবে মা, তাই খাব। তাই অমৃত।

—একখানা লুচি ? একটু ঝোল ? একটু তরকারি ?

—যা তুমি নিজে হাতে রান্না করেছ তাই দাও।

সত্যই অমৃতের মতো মনে হয়েছিল। দীর্ঘদিন এমন প্রসন্ন রুচির সঙ্গে খান নি তিনি। খেয়ে উঠে মনে হয়েছিল খাওয়ার পরিমাণ যেন বেশী হয়ে গেল।

শেষ রাত্রে এইটুকু ছিদ্রপথে তার দূত এসে বুকের উপর চেপে বসল। বুকের মধ্যে মনে হল পাষাণভার চেপেছে ; হৃৎপিণ্ড পরিত্রাহি আক্ষেপে মাথা কুটতে লাগল ; মস্তিষ্কের স্নায়ু শিরা আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, অনুভূতি একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে গেল , শুধু জৈবিক অনুভবশক্তিটুকু নিজেকে প্রবুদ্ধ করে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল, যন্ত্রণাকাতর চীৎকার ! একটা গোঙানি।

আতর-বউ ঘুমান নি। মনের আক্ষেপে সারাটা রাত্রিই তিনি চোখের জল ফেলেছেন নিঃশব্দে। মুহূর্তে তিনি উঠে আলোটা জোর করে দিয়ে তাঁর শিয়রে এসে বসেছিলেন। চিকিৎসকের পুত্রবধূ, চিকিৎসকের গৃহিণী, ছেলেও চিকিৎসক হয়েছিল, আতর-বউ বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়েননি, বিহ্বল হয়ে কান্নাকাটি করেন নি ; মাথায় মুখে চোখে জল দিয়ে বাতাস করে শুশ্রূষা করেছিলেন। অর্থহীন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মশায় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

আতর-বউ ইন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিশোর এবং বিনয়ের কাছে, সেতাবকেও সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। কিশোর এবং বিনয়ই সংবাদ দিয়েছিল হরেনকে এবং প্রদ্যোতকে। তারা যখন এসেছিল তখন মশায় খানিকটা সুস্থ হয়েছেন।

রক্তের চাপ দুশো চল্লিশ ; হৃদপিণ্ডে আক্রমণ হয়েছে।

বিকেলবেলা মশায় বলেছিলেন ওই কথা।

পাপপুণ্যের বিচার মৃত্যুর কাছে নাই। বলেছিলেন, জলমগ্নকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার

পাকে জড়িয়ে পড়লেও মৃত্যু আসে, আবার কঠিন হিংসায় কাউকে ছুরি মারতে গিয়ে ছুরি খেলেও মৃত্যু আসে। ওখানে সে নির্বিকার।

নিজের নাড়ী ধরে বলেছিলেন—সে আসছে। মনে হচ্ছে গ্রামের বাইরে তার পায়ের শব্দ উঠছে; গ্রামে ঢুকবার মুখে ধর্মরাজ স্থানের বকুলতলায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। হেসেছিলেন একটু।

প্রদ্যোত বলেছিল, আপনাকে কিছু বলা আমার উচিত নয়, এটা ঠিক আপনার থ্রম্বসিস নয়, একটা স্প্যাজ্‌মের মতো। এ তো চলে যাচ্ছে। পার হয়ে যাবে।

দিন পনেরোর মধ্যে সুস্থ হয়েও উঠেছিলেন। তখন বলেছিলেন গঙ্গাতীরে যাবেন।

সে যাওয়া তাঁর হয় নি। নিজেই মত পরিবর্তন করেছিলেন। আতর-বউয়ের কথা ভেবে বলেছিলেন, না থাক। আতর-বউ একা পড়বে। ওর দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকবে না। এখানে আপনারা আছেন—দুঃখকষ্টের ভাগ নিচ্ছেন। সেখানে? কে নেবে ভাগ?

আতর-বউ একটি কথাও বলেন নি। তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন। বনবিহারীর স্ত্রী, তার ছেলে একবার এসেছিল, দেখে চলে গেল। মশায় প্রথম আক্রমণের পর সামলে উঠেছিলেন। উঠে-হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন।

প্রদ্যোত বলেছিল, আমি বলেছিলাম, আপনি সেরে উঠবেন।

মশায় হেসেছিলেন। কোনো কথা বলেন নি।

প্রদ্যোত অনুযোগ করে বলেছিল—আমাদের কিন্তু একটা কথা বলবার আছে। আপনি নিজের নাড়ী বার বার দেখেন!

মশায় জবাব দিয়েছিলেন—সে আমি অনেকদিন থেকেই দেখি ডাক্তারবাবু।

—না। ওটা দেখতে পাবেন না।

হেসে মশায় বলেছিলেন—বহুলোকের নাড়ী দেখে তার মৃত্যুদিন বলে এলাম। নিজে যখন সুস্থ ছিলাম—তখন দেখেছি—তার হদিস পাবার জন্য। আর আজ যখন সে কাছে এল—তখন তার পায়ের শব্দ যাতে শুনতে না পাই, তার জন্যে তুলো গুঁজে কান বন্ধ করে বসে থাকব ডাক্তারবাবু?

প্রদ্যোত এ কথার জবাব দিতে পারে নি। মশায় আবার বলেছিলেন—মৃত্যুর জন্যে আমার আতঙ্ক নাই ডাক্তারবাবু। সুতরাং ওতে উদ্বেগের জন্যে আমার রক্তের চাপ বাড়বে না। তবে—

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তবে প্রথম দিন প্রস্তুত ছিলাম না তো; একেবারে অকস্মাৎ ঘুমের মধ্যে হৃৎপিণ্ডে আক্রমণ হল। তখন ভয় পেয়েছিলাম, একেবারে অসহায় শিশুর মতো আতঙ্কে চীৎকার করে উঠেছিলাম। মতির মাকে তিরস্কার করেছিলাম, কিন্তু ওর দোষ নেই। মৃত্যুভয়ের তুল্য ভয় নেই, মৃত্যুরোগের যন্ত্রণার তুল্য যন্ত্রণা নেই। কিন্তু সে ভয়কে পার হয়ে আজ কি আমি উটপাখির মতো বালির মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকব?

* * *

তিন মাস পর দ্বিতীয় আক্রমণ হয়েছিল। আক্রমণের পূর্বদিন নিজেই বলেছিলেন—

ডাক্তারবাবু, এইবার সে বকুলতলা থেকে বিশ্রাম সেরে উঠে দাঁড়াল।

কথাটা প্রদ্যোতের মনে ছিল না। তাই বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেছিল, আজ্ঞে?

—আবার একটা ঝাপ্‌টা আসবে ডাক্তারবাবু। রক্তের চাপ বাড়বে।

—কই না তো! প্রেসার তো সেই একই আছে!

—বাড়বে। নাড়ীতে বুঝতে পারছি আমি।

তাই বেড়েছিল। পরের দিন প্রেসারের গতি উর্ধ্বমুখী দেখা গিয়েছিল। সন্ধ্যাতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। আজ চারদিন আগে হয়েছে তৃতীয় আক্রমণ।

প্রদ্যোত ডাক্তার বললে—কাল থেকে প্রায় ধ্যানে বসেছেন। চোখ বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে বসে রয়েছেন। আমাকে বললেন—ঘুমের ওষুধ আমাকে দেবেন না, ঘুমের মধ্যে মরতে আমি চাই না। আমি সজ্ঞানে যেতে চাই।

মঞ্জু বললে—মায়ের দিদিমার মৃত্যুর খবরটা শুনেছেন? বলেছ?

—বলতে চেয়েছিলাম, উনি শোনেন নি। পত্রখানা পকেটে করেই নিয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, আমার শাশুড়ীর সেই বুড়ী দিদিমা, কাঁদীর ভূপীবাবুর স্ত্রী, তাঁর হাত দেখে যে বলেছিলেন—! উনি হাত নেড়ে বারণ করলেন। মৃদুস্বরে বললেন—ওসব থাক।

* * *

বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় মশায় চোখ বুজে অর্ধ-আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিলেন। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। সে আসছে তিনি জানেন। তার পায়ের ধ্বনি যেন তিনি শুনতে পেয়েছেন। সেই প্রথম আক্রমণের দিন থেকেই জানেন। কিন্তু তা তো নয়, শেষ মুহূর্তে সজ্ঞানে তার মুখোমুখি হতে চান। তার রূপ থাকলে তাকে তিনি দেখবেন; তার স্বর থাকলে সে কণ্ঠস্বর শুনবেন; তার গন্ধ থাকলে সে গন্ধ শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করবেন; তার স্পর্শ থাকলে সে স্পর্শ তিনি অনুভব করবেন। মধ্যে মধ্যে ঘনকুয়াশায় যেন সব ঢেকে যাচ্ছে। সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অতীত, বর্তমান, স্মৃতি, আত্মপরিচয়, স্থান, কাল সব। আবার ফিরে আসছেন। চোখ চাইছেন। সে এল কি? এরা কারা? বহুদূরের অস্পষ্ট ছায়াছবির মতো এরা কারা?

অতি ক্ষীণভাবে ওদের স্বর যেন কানে আসছে। কী বলছে? কী?

—কী হচ্ছে?

মশায় ঘাড় নাড়লেন, জানি না। ঘাড় নাড়তে নাড়তেই ক্লান্ত চোখের পাতা দুটি আবার নেমে এল। প্রদ্যোত দেখলে—প্রগাঢ় একটি শান্তির ছায়া শীর্ণ মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে।

মশায় কী দেখলেন—প্রদ্যোত বুঝতে পারলে না।

সেই মুহূর্তেই আতর-বউ মশায়ের মুখখানি ধরে বললেন—ধ্যান সাঙ্গ হল? মাধবের চরণাশ্রয়ে শান্তি পেলে? আমি? আমাকে? আমাকে সঙ্গে নাও!

শান্ত আত্মসমর্পণের মতো তিনি স্বামীর বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন।

ডাকহরকরা

সেদিন বর্ষাকালের কৃষ্ণপক্ষের একটি ঘনমেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। সারাদিন প্রায় বর্ষণ হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় পর বর্ষণ থেমেছে কিন্তু দুর্যোগ কাটে নাই। আকাশে দিগন্ত থেকে দিগন্ত বিস্তৃত মেঘ রয়েছে। এলোমেলো বর্ষার বাতাস বইছে। বইছে প্রবল বেগেই। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশের মেঘের ঘন আবরণের ছায়ায় চামড়ার মতো পুরু হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যেন সে-অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে শুধু অসংখ্য, লক্ষ লক্ষ জোনাকির জলা আর নেভা। জলছে আর নিভছে।

মধ্যে মধ্যে কোন দূর দিগন্তে মেঘ চমকাচ্ছে। তার ক্ষীণ আলোয় পারিপার্শ্বিকের একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ঘন অরণ্যভূমির মধ্যে একটি পথ।

মৃদু গম্ভীর মেঘগর্জন উঠছে পর পর। কিন্তু অবিরাম উঠছে গাছের সঙ্গে বাতাসের মাতনের শব্দ। ঝর-ঝর, ঝর-ঝর, ঝর-ঝর। তার সঙ্গে ব্যাঙের উল্লাস-কলরব যুক্ত হয়ে একটি যেন ঐকতানের শব্দ। ঠিক তালে তালে বেজে চলেছে। হঠাৎ একবার প্রবল বিদ্যুৎ চমকে উঠল—অরণ্যভূমির মাথার উপর। আলোয় আলো হয়ে গেল বনভূমি; সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে দেখা গেল চারিদিক।

দুপাশে ঘন শালবনের মধ্য দিয়ে চলে গেছে একটি সুগঠিত পথ। সেই পথ ধরে দূরে চলেছে একটি মানুষ। চলেছে নয়—দীনু ডাকহরকরা ডাক নিয়ে ছুটছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে বাজছে লাঠির ডগায় ঘণ্টা-ঘুঙুরের ঝুন-ঝুন শব্দ। আরও দেখা গেল, বাতাসে শালবন দুলছে।

আলো নিভে গেল। ঘনতর হয়ে উঠল অন্ধকার। উচ্চ মেঘগর্জন উঠল।

অন্ধকারের মধ্যে আবার জলতে লাগল জোনাকি। ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে বাতাসের মাতামাতি প্রকট হয়ে উঠল। বেজে চলল ঝুন-ঝুন শব্দ।

এইবার বাঁকের মাথায়—যে মুখে দীনু চলেছে তার আগে—বিপরীত দিক থেকে বাঁকের গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাথায় মাথায় ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো দীর্ঘ আলোর ছটা জেগে উঠল। ওপার থেকে কোনো মোটরকার আসছে। তার হেড-লাইট স্পট-লাইটের আলোর শিখা বিস্তার করে এগিয়ে আসছে। মোটর দেখা যাচ্ছে না।

মিনিটখানেক পরেই মোটরখানা বাঁকে মোড় নিয়ে সোজা এগিয়ে এল। দেখা গেল আলো। রাজপথ, দুপাশের জলসিক্ত অরণ্যভূমি চারিপাশের অন্ধকার বেষ্টনীর মধ্যে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীনু ডাকহরকরাও স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে ছুটছে। পিছন দিক হতে অদ্ভুত লাগছে তাকে।

মোটরে আসছেন ডাক্তারবাবু।

হুডওয়ালা টুরারবডি মোটরটা এগিয়ে দীনুর কাছাকাছি এসে বারেকের জন্য মন্থর হল। এই দুর্যোগের মধ্যে এমন করে কে যায়?

দীনুকে স্পষ্ট দেখা গেল।

পেশী-সবল কালো মানুষটি। মাথায় একটা ছোট টোকা। ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। পরনে

মালকোঁচা সেঁটে কাপড় পরা। হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত খালি। কাঁধে একটা লাঠির সঙ্গে ডাকের ব্যাগ বাঁধা রয়েছে, লাঠির ডগায় বাঁধা দুটি ঘণ্টা, লাঠিতে লাগানো একটি বল্লমের ফলা। হাতে রয়েছে একটি লণ্ঠন।

মোটরের আলো চোখে পড়তেই সে রাস্তার পাশে সরে গিয়ে চলতে শুরু করল ঈষৎ মন্থর গতিতে।

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন—কে?

দীনু চলতে চলতেই উত্তর দিল—ডাকহরকরা, সরকার বাহাদুরের ডাক।

—কে, দীনু?

দীনু গাড়ির পিছন দিক থেকে উত্তর দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। কে? ডাক্তারবাবু?

বলতে বলতেই সে অন্ধকারের মধ্যে যেন মিশে গেল।

ডাক্তারবাবু আবার গাড়িখানার গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন। গাড়ি চলতে লাগল—দুপাশের শালগাছের ভিজে পাতায় হেড-লাইটের তীব্র আলো পড়ে ঝকমক করে উঠল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পড়ল গিয়ে আলো। উর্ধ্বাকাশে খানিকটা দূর পর্যন্ত শূন্যলোকে আলো যেন ভাসতে ভাসতে চলল। তার ওপারে নিঃসীম অন্ধকার। অন্ধকার চিরে দু-একবার মেঘে দূরান্তের বিদ্যুচ্ছটা ভেসে গেল। কিছু দূর গিয়েই আর-একটা বাঁক। সেখানে ডাক্তারের গাড়ি মোড় নিচ্ছে, এমন সময় একটা চিৎকার শোনা গেল।

—অ্যা—ও, খবরদার!

ডাক্তার গাড়ির ব্রেক টিপে ধরলেন।

আবার চিৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠল—খবরদার! ডাক। সরকার বাহাদুরের ডাক।

ডাক্তার গাড়ি থেকে মুখ বের করে পিছন দিকে তাকালেন।

ওপাশ থেকে দরজা খুলে নেমে পড়ল ড্রাইভার। সে দেখলে পিছনের দিকে তাকিয়ে।

অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

মৃদু বিদ্যুৎ চমকাল। সেই মৃদু বিদ্যুতালোকে ড্রাইভার এবং ডাক্তার দেখলেন—দূরে দুটি যুধ্যমান ব্যক্তি। কাউকে চেনা গেল না। একটি লোক—সে নিশ্চিতরূপে দীনু। উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। একজন তার কাছ থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। এ-ছবি একটা চকিতের ছবি। ওই বিদ্যুৎ-চমকের মধ্যে দেখা গেল মাত্র। বিদ্যুৎ-চমক মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। অন্ধকারের মধ্যে চিৎকার উঠল। না—না—না! না!

ডাক্তার ড্রাইভারকে বললেন—উঠে এসো গাড়িতে। জলদি।

ড্রাইভার উঠে বসল—গাড়ি ঘুরল। হেড-লাইট পড়ল দূরে যুধ্যমান লোক দুটির উপর। তখন আক্রমণকারী লাঠি উদ্যত করেছে। সে পিছন ফিরে আছে আলোর দিকে। দীনু চিৎকার করে উঠল। ডাকাত! ডাকাত! এর পরই লাঠি পড়ল। দীনুর চিৎকার শোনা গেল—আঃ—!

গাড়ি অগ্রসর হল। লোকটি একবার চেষ্টা করল ব্যাগটা টানতে। কিন্তু গাড়ির আলো এগিয়ে আসতেই ছেড়ে দিয়ে বনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

গাড়িটা এসে দাঁড়াল।

দীনু উপুড় হয়ে ডাকের ব্যাগ আঁকড়ে পড়ে আছে। তার মাথার পিছন দিকটা ফেটে গেছে। লণ্ঠনটা গড়াচ্ছে।

ডাক্তার টর্চ ফেলে চারিদিক দেখলেন। ড্রাইভার গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা নিয়ে নামল। ডাক্তারও নামলেন। দীনুকে দেখলেন। হাত দেখলেন। বুকে হাত দিলেন। আঘাতটা দেখলেন। বললেন—এঃ, ঘা-টা বড় জোর লেগেছে।

ড্রাইভার বললে—কিন্তু ডাকের ব্যাগটা ছাড়ে নি।

—ওকে ফার্স্ট এড দেওয়া দরকার। চারিদিকের বন ও অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেখে বললেন—কিন্তু এখানে আর নয়। দলে নিশ্চয় একজন ছিল না। বনের মধ্যে সরে নিশ্চয় লুকিয়ে আছে। আমাদের দুজন দেখে আবার আসতে পারে। তুমি ওদিকে ধরো। আমি এদিকে।

ধরলেন দুজনে। দীনুকে তুললেন—দীনুর বুকে আঁকড়ে ধরা ডাকের ব্যাগটাও উঠতে চাইল। ডাক্তার টেনে ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর গাড়িতে তুললেন।

গাড়ি এসে উঠল সদর হাসপাতালে।

ডাক্তার নেমে ভিতরে গিয়ে সর্বাগ্রে টেবিলে বসে খসখস করে চিঠি লিখে ফেললেন।

ড্রাইভারকে ডাকলেন—শম্ভু!

শম্ভু এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে ব্যাগটা রেখে গেল।

এই চিঠি নিয়ে তুমি এখুনি থানাতে যাও। চিঠি দিয়ে এসো। বোলো—আমি দীনুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। আঘাতটা জোর বলেই মনে হচ্ছে। ওঁদের এসে ব্যাগটা দেখে নিতে বোলো। পোস্টাপিসে খবর ওঁরাই দেবেন।

শম্ভু চিঠি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার বের হলেন—বিপরীত দিকের বারান্দায়। তার আগে খুলে ফেললেন কোটটা। আস্তিন গুটিয়ে নিতে নিতে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে যাবার সময় দরজা বন্ধ করলেন চাবি দিয়ে

বারান্দায় বেরিয়ে ডাকলেন—রামলাল!

রামলাল এসে দাঁড়াল। ডাক্তার বললেন—তুমি এই দরজায় পাহারা থাকো। খুব সাবধান!

ওদিকে স্ট্রেচারে দীনুকে বয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালের লোকেরা। ডাক্তার তাদের অনুসরণ করলেন।

ওপাশ থেকে মোটরের শব্দ হল। দেখা গেল শম্ভু মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এদিকে দেখা গেল টেবিলের উপর দীনুকে শোয়ানো হয়েছে।

ডাক্তার হাত ধুয়ে হাত মুছলেন।

তখন ইলেকট্রিক হয় নি মফস্বলে। জোরে টর্চের আলো ফেলা হল ক্ষতস্থানে। ক্ষতটা বেশ গভীর। চারিপাশের চুল তখন কাটা হয়ে গেছে। ডাক্তার দেখলেন ভালো করে। তারপর হাতে নিলেন সার্জারির যন্ত্র।

সেই মুহূর্তে—বাইরে একটা বজ্রপাতের মতো মেঘগর্জন ধ্বনিত হয়ে উঠল।

বাইরে তখন প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। ঘন ঘন বিদ্যুচ্চমকের মধ্যে বর্ষণ দেখা যাচ্ছে। গাছপালায় বাতাসের মাতনের শব্দ উঠছে। তারই মধ্যে পড়ে আছে নিথর বারান্দাটা। ডাক্তার দীনুর প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ করে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। বর্ষণমুখর মেঘ ও অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখের উপর বারেকের জন্য ভেসে উঠল—দীনুর সংগ্রামরত মূর্তি। বিদ্যুতালোকে দেখেছিলেন—একটা লোক লাঠি মারতে উদ্যত হয়েছে দীনুর মাথায়। দীনু উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

একজন নার্স এল।

বললে—ওর জ্ঞান হচ্ছে ডাক্তারবাবু—

—জ্ঞান হচ্ছে? ডাক্তার ঘুরলেন। দ্রুত এসে ঘরে ঢুকলেন।

দীনু তখন চিৎকার করছে—না—না—না!

ডাক্তার এসে পাশে দাঁড়ালেন, বললেন—দীনু, দীনু—ভয় নেই। দীনু!

—এঁ্যা—

—ভয় নেই, তারা পালিয়েছে। তুই হাসপাতালে রয়েছিস। দীনু!

—এঁ্যা, ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ, আমি তোর চিৎকার শুনতে পেয়েছিলাম—

—আপনি বাঁচালেন আমাকে?

—হ্যাঁ। আমি গাড়ি না ঘোরালে তোকে ওরা মেরে ফেলতো।

—আমার ব্যাগ? সরকারী ডাক?

—আছে। সে নিতে পারে নি। ওঃ, যে জোরে আঁকড়ে ধরে ছিলি—!

দীনু আশ্বাসের সঙ্গে বললে—আঃ!

—তুই এখন ঘুমো। ঘুমের ওষুধ দেবে। এখন আর নয়।

—ডাক্তারবাবু!

—কী?

—তাকে ধরেছেন?

—কাকে?

—সেই —

—ও—সেই ডাকাতকে? না। ধরব কী করে? সে পালিয়ে গেল। গাড়ির

আলো ঘুরতেই তোকে ছেড়ে বনের মধ্যে ছুটে চলে গেল। ওদের কি শুধু-হাতে ধরা যায়? ভালো করে দেখতেই পেলাম না। ছায়াবাজীর মতো, ভোজবাজীর মতো মনে হল।

দীন্থ স্থির দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। আঘাত তার মাথার পিছনে। সে কাত ফিরে শুয়ে ছিল।

ডাক্তার একজন নার্সকে বললেন—ওকে বেডে নিয়ে যাও। ওষুধটা খাইয়ে দাও।

দীন্থ ডাকলে—ডাক্তারবাবু!

—কী?

—আমার কী হবে ডাক্তারবাবু? পুলিস—(কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল—দরদর ধারায় তার চোখ থেকে জল নেমে এল।)

ডাক্তার হেসে বললেন—কী হবে? তুই যে কাজ করেছিস তাতে সরকার তোকে পুরস্কার দেবেন রে। আমি সাক্ষী। ওঃ, তুই বীরের মতো লড়াই করেছিস। বুক দিয়ে মেলব্যাগ যেভাবে তুই ঢেকে ছিলি—এক মানুষ নিজের ছেলেকে ওইভাবে রক্ষা করতে পারে বুক দিকে ঢেকে।

দীন্থ হা-হা করে কেঁদে উঠল।

বাইরে মোটরের শব্দ হল।

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

এর পর দেখা গেল—আপিস-ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন এস. পি., পোস্টাল সুপার, সাবইনস্পেক্টর পুলিস, পোস্টাপিসের লোক। ডাক্তারও রয়েছেন।

এস. পি. মেল-ব্যাগের শীল পরীক্ষা করে দেখছেন।

পোস্টাল সুপার পাশ থেকে দেখে বললেন—সীল ভাঙে নি। ঠিক আছে।

ডাক্তার বললেন—ডাকাতদের তো ব্যাগ ছুঁতে দেয় নি দীন্থ। বুক দিয়ে ঢেকে পড়ে ছিল। মাথায় লাঠি পড়ল, তাতেও না। তখনও চিৎকার করছে—সরকার বাহাদুরের ডাক! খবরদার—! আমি গাড়িটা ফেরালাম। হেড-লাইটের আলো পড়তেই—

এস.পি. পরীক্ষা শেষ করে ব্যাগটা নামিয়ে দিয়ে ডাক্তারের কথার মাঝখানেই বললেন—আপনার স্টেটমেণ্ট পরে নেব ডাক্তারবাবু। এরপর পোস্টাল সুপারকে বললেন—ব্যাগটা কেটে দেখুন, ঠিক আছে কিনা! ব্যাগের মধ্যে ক্যাশ স্টেটমেণ্ট নিশ্চয় আছে। কাটুন।

এস. পি. বেরিয়ে এলেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল আর-একজন সাবইনস্পেক্টর ও কজন কনস্টেবল। কম্পাউণ্ডে ডাক্তারের এবং এস. পি.-র মোটর। এস. পি. সিগারেট ধরালেন। বললেন সাবইন-স্পেক্টরকে—তুমি ডাক্তারের ড্রাইভারকে নিয়ে চলে যাও। যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে—সেখানে মোতায়েন থাকো। কোনো কিছু নাড়াচাড়া না হয়।

সাবইনস্পেক্টর স্যাল্যুট করে বললে—ইয়েস স্যার।

—ডাক্তারের ড্রাইভারকে নিয়ে যাও।

তখন সকাল হয়ে এসেছে। বর্ষণ ক্ষান্ত হয়েছে। টিপিটিপি মৃদু দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। তারই মধ্যে—হাসপাতালের আউট-হাউস থেকে জমাদার-জমাদারনীরা বেরিয়ে আসছে। কারও হাতে ঝাঁটা। কারও হাতে বেডপ্যান।

দুটো উলঙ্গ ছেলে—একটা গর্তের মধ্যে জমা জলে লাফিয়ে লাফিয়ে কাদা-জলে সর্বাঙ্গ চিহ্নিত করছে।

গাছের ডালে কাক বসেছে। ডাকছে। গাছের পাতা থেকে জল পড়ছে নিচে টপটপ করে।

গেটের ধারে একদল লোক জমেছে। বিস্মিত হয়ে দেখছে আর ভাবছে—হাসপাতালে পুলিস কেন?

পুলিস-সুপার সিগারেট টানছেন—মধ্যে মধ্যে হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে জুতোর ডগার কাদা ছাড়াচ্ছেন।

পোস্টাল-সুপার চামড়ার ক্যাশব্যাগ ও একখানা ইনসিওর্ড খাম হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন—বোধ হয় এইটের লোভে মিস্টার চৌধুরী, দি অ্যাটেম্প্ট ওয়াজ মেড। হাজার টাকার ইনসিওর। ব্যাগে টাকা সামান্যই ছিল—আড়াই শো। এভরিথিং ইজ্ ইনট্যাক্ট্।

—ইয়েস। দেখলেন এস. পি.।

ইতিমধ্যে গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া হল। এস. পি. হাত তুলে রওনা হতে বারণ করলেন।

পোস্টাল-সুপার বললেন—হি হ্যাজ্ সেভ্ড্ ইট্। ইয়েস্, হি হ্যাজ্ সেভ্ড্ ইট্—ওকে আমি—

চলে যেতে উদ্যত হলেন। এস. পি. বাধা দিলেন।—নট্ নাউ; ওকে একটু সুস্থ হতে দিন। আগে চলুন Place of occurrence-টা দেখে আসি।

তাঁরা গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি রওনা হয়ে গেল।

হাসপাতালের বারান্দা দিয়ে স্ট্রেচারে দীনুকে বয়ে নিয়ে হাসপাতালের বেডে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হল।

দীনুর চোখের সামনে অন্ধকার রাত্রির বর্ষণসিক্ত অরণ্য ভেসে উঠল।

ঘুমের ওষুধের নেশায় সে-ছবি এঁকেবেঁকে তালগোল পাকিয়ে গেল যেন। চোখ বন্ধ হয়ে এল।

নার্স একজন হাওয়া করছিল।

ওদিকে ঘটনাস্থলে গাড়িখানাকে দেখা গেল।

শম্ভু দেখালে ঘটনাস্থলটি।—ঠিক এইখানটায় স্যার। হ্যাঁ এইখানটায়। অনেকটা রক্ত পড়েছিল। বোধ হয় জলে ধুয়ে গেছে। তারা এই দিক দিয়ে বনে ঢুকে গেল আমাদের লাইট দেখে।

রাস্তা বেয়ে তখনও জল চলে যাচ্ছে।

এস. পি. তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলেন। পড়ে আছে শুধু লণ্ঠনটা। এবং মাথার ভাঙা টোকাটা।

বনের মধ্যে ঢুকলেন। সব চিহ্ন জলে ধুয়ে গেছে।

আবার ঘুরে এলেন ঘটনাস্থলে। লাঠির ডগা দিয়ে একটা জায়গায় জমে-থাকা জলের বেরিয়ে যাবার পথ করে দিলেন। বেরিয়ে পড়ল—ছুটি হাঁটুর ছাপ, ছুটি-হাতের ছাপ।

দীমু যে উপুড় হয়ে ডাকের ব্যাগ আঁকড়ে পড়ে ছিল—এই তো! যে লোকটা লাঠি মেরেছিল, সে ছিল এই দিকে—বনের ধার দিয়ে—

ঝুঁকে পড়লেন এস. পি.। সঙ্গে সঙ্গে এস. আই., পোস্টাল-সুপারও ঝুঁকে পড়ে দেখলেন।

এস. পি. বললেন—হুঁ। বুক দিয়েই জড়িয়ে ধরে রক্ষা করতে চেয়েছিল বটে। লোকটা প্রাণ দিয়ে লড়েছে। Yes, he is a brave man—

বিকেল বেলা—মেঘ তখন কেটে এসেছে। আকাশে কাটা মেঘ এবং সূর্যালোকের সমারোহে আলোছায়ার খেলা। এই খেলার ছায়া এসে পড়েছে তখন বিছানায় শায়িত দীমুর মুখের উপর। একদিকে Postal Super। মাথার ধারে টেবিলের উপর ফল সাজিয়ে রেখে Postal Super বললেন—চিনতে পারছ আমাকে?

দীমু সভয়ে বললে—হুজুর! হাত তুলে সেলাম করতে চেষ্টা করলে।

—থাক। তুমি ভালো হয়ে ওঠো। শিগ্‌গির ভালো হয়ে উঠবে—কোনো ভয় নেই।

—হ্যাঁ হুজুর।

—খুব বাহাদুর তুমি। খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছ। সরকার তোমার উপর খুব খুশী হয়েছেন। এর জন্যে তুমি রিওয়ার্ড পাবে। আমি লিখব।

দীমুর ঠোঁট ছুটি থরথর করে কাঁপতে লাগল। উত্তর দিতে পারলে না সে। অথবা দিলে না।

সাহেব Postal Super প্রশ্ন করলেন—কত জন ছিল তারা?

—আজ্ঞে?

—ডাকাতদের কথা জিজ্ঞাসা করছি।

সভয়ে অস্পষ্ট ভাবে বললে, ডা-কা-ত-রা?

হ্যাঁ, কতজন ছিল তারা? কাউকে চিনতে পেরেছিলে? অন্ধকারের মধ্যে হলেও খুব কাছে এসেছিল তো তারা!

বিহ্বলের মতো দীমু কাঁদতে লাগল।

—কাঁদছ কেন? কেঁদো না।

—আমাকে মেরে ফেলাইতো হুজুর—মরে যেতাম আমি—

—না—না—না। তুমি শিগ্‌গির ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা তুমি ভাবো, ভেবে দেখো,—যদি কারুর মতো মনে হয়—মনে করো। আমি আবার আসব। ফলগুলি তুমি খেয়ো। আবার আসব আমি।

সাহেব উঠলেন।

দীনু স্থির দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে পশ্চিমাকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ শান্তভাবেই বলে উঠল—হুজুর!

সাহেব ফিরলেন।—কিছু বলবে?

—হ্যাঁ, হুজুর। শান্তভাবেই সে জানালার দিকে চেয়ে কথাগুলি বললে।

—বলো, কি বলবে বলো?

এবার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। অতিকষ্টে বললে—হুজুর!

Postal Super প্রতীক্ষা করলেন কয়েক মুহূর্ত—তারপর বললেন—বলো, কি ইচ্ছে হচ্ছে বলো?

আত্মসংবরণ করে দীনু বললে—হুজুর, আমার ছেলে—

চোখ দিয়ে জল গড়াল। সূর্যালোক প্রখর দীপ্তিতে মুখের উপর পড়ল। দীনু মুখ ফেরালে।

সুপার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে জানালার ঘষা কাচের দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন—তোমার ছেলেকে দেখতে চাও?

অন্ধকার ছায়ার মধ্যে দীনু বলল—হ্যাঁ হুজুর। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

—বেশ, তার জন্যে কী? আজই তোমার পোস্টাপিসের মাস্টারবাবুর কাছে তার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দীনুর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

সাহেব কাছে এলেন। হেসে বললেন—কাঁদছ কেন?

দীনু বললে—হুজুর!

সাহেব হাতের ফাইলখানা দেখিয়ে বললেন—এতে পড়ছিলাম;—এটা তোমার ফাইল, তোমার চাকরির গোড়া থেকে এ পর্যন্ত সব কথা লেখা আছে। পড়ছিলাম—তুমি ভয়ানক সাহসী লোক। মস্ত লাঠিয়াল। ভূত প্রেত ডাকাত কাউকে ভয় কর না। নবগ্রামে পোস্টাপিস হবার পর যখন পথে সুঁদীপুরের বটতলায় ভূতের ভয়ে ঠ্যাঙাড়ের ভয়ে রানার পাওয়া যায় নি—তখন ওখানকার জমিদারবাবুরা তোমাকে দিয়েছিলেন। আজ পনেরো বছর তুমি ডাকহরকরার কাজ করছ, জলে ঝড়ে—কোন কিছুতে একদিন তোমার পাঁচমিনিট দেরি হয় নি। আজ তুমি ডাকাতের হাত থেকে সরকারী ডাক বাঁচিয়েছ—আঘাত পেয়েছ কিন্তু সে তো খুব বেশী নয়। ক-দিনের মধ্যেই সেরে যাবে। তুমি কাঁদছ কেন?

দীনু স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল—

মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল তার অতীত দিনের কথা:

পনেরো বছর আগে—

নবগ্রামের খড়োচাল মাটির ব্রাঞ্চ পোস্টাপিস। কাঠের খুঁটি দেওয়া মেটে বারান্দা। সেই বারান্দায় বসে আছেন গ্রামের চার-পাঁচজন ভদ্রলোক, পোস্টাল ইন্‌স্পেক্টর, দাঁড়িয়ে আছেন পোস্টমাস্টার, ওভারসিয়ার, পিওন এবং বারান্দার নিচে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে

আছে পনেরো বছর কম বয়সের দীনু। দেওয়ালে একটা নোটিশবোর্ড, একটা নোটিশের মাথায় লেখা—1928—March।

প্রবীণ দাশরথিবাবু—সম্ভ্রান্ত সৌম্য চেহারা—তিনি বললেন—এ কাজ তোকে নিতে হবে দীনু। গ্রামের মান রাখতে হবে। সুঁদীপুরের বটতলার ভয়ে রাত্রে ডাক যায় না—তার জন্যে ডাক যেতে একদিন দেরি হয়, পেতে একদিন দেরি হয়—এতে গ্রামের অসুবিধে, সঙ্গে সঙ্গে দুর্নাম। আমি জানি তুই পারবি।

দীনুর মনশ্চক্ষের সামনে বারেকের জন্য অন্ধকার রাত্রির সুঁদীপুরের বটতলা এবং অরণ্যঘন পথখানি ভেসে উঠল। বটগাছের ডাল দুলতে থাকে।

এই দৃশ্যের মধ্যেই দাশরথিবাবুর কথা শোনা গেল। তিনি বলেই চলেছিলেন—ও পারবে ইনস্‌পেক্টর বাবু। এই তো সেদিন আমার বড়ছেলেকে তার করবার জন্য রাত্রি আটটায় সময় পাঠালাম বোলপুরে এখান থেকে, রাত্রি তিনটে না বাজতে ফিরে এল—তার করে তার রসিদ নিয়ে। ও আমার কৃষাণের ছেলে। লাঠিয়াল হয়েছে, কিন্তু সৎলোক—দাঙ্গা করতে পারে না। ধর্মকে ভয় করে—চোর ডাকাতদের ছায়া মাড়ায় না। যমকেও ভয় করে না। পাউড়েও খুব।

পথের দৃশ্য মিলিয়ে গেল—দীনু বাস্তবে ফিরে এল।

ইনস্‌পেক্টর প্রশ্ন করলেন—পাউড়েও খুব? তার মানে?

—ও। পাউড়ে মানে—পা যার উড়ে চলে ইনস্‌পেক্টর বাবু। মানে খুব জোরে হাঁটতে পারে। আমার ছেলে একবার মহলে ছিল—এখান থেকে পাঁচ কোশ রাস্তা—জরুরী খবর নিয়ে যেতে হবে—আবার ফিরতে হবে সঙ্গে সঙ্গে; মানে এক নাগাড় দশকোশ—বিশ মাইল—তা দীনু চার ঘণ্টায় গিয়ে ফিরে এসেছিল।

—মানে ঘণ্টায় পাঁচ মাইল! বাঃ! দীনু মাথা নিচু করে বসে মাটির উপর খোলাম-কুচি দিয়ে দাগ কেটে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময় পোস্টমাস্টারের মেয়ে আট দশ বছর বয়স—সে ঘরের ভিতর থেকে উঁকি মেরে বলল—বাবা! চা তৈরী হয়েছে। আনব?

মাস্টার ঘুরে তাকিয়ে বললেন—আনো।

মেয়েটি চলে গেল।

মাস্টার পিওনকে বললেন—ফেলবে হয়তো। তুমি গিয়ে নিয়ে এসো।

পিওন ভিতরে চা আনতে গেল।

দাশরথিবাবু ইনস্‌পেক্টরের কথার উত্তরে বললেন—ওকেই এ্যাপয়েণ্ট করুন; ওর জন্যে দায়ী থাকতে হলে আমি থাকতে রাজী আছি। ডাকাত ঠ্যাঙাড়ে সেকালে ছিল একালে নাই। ভয়টাই আছে। কিরে দীনে, ডাকাতের ভয় আছে নাকি? মানে, পথে রাহাজানির—?

দীনু নত মুখেই একটু হেসে বললে—আজ্ঞে না। সি-সব আর কোথা পাবেন? সে কালও নাই সে মানুষও নাই। তবে ওই দু-চার জনা আছে একলা-দোকলা দুব্যল ভালো-মানুষ পেলে—চড়-চাপড়টা মেরে ভয় দেখিয়ে পুঁটুলি-মুটুলী কেড়ে-কুড়ে নিয়ে পালায়। তাও

দিনে-দুপুরে। রেতে-বিরেতে নয়। সি-সব দানা দত্যির মতো মানুষগুলান ফৌত হয়ে গিয়েছে। একেবারে নির্বংশ। পাপ করে কি কেউ বাঁচে? বাঁচে না।

—তা হলে তুমি পারবে বলছ? ইনস্পেক্টর বললেন।

এরই মধ্যে পিওন কাঁসার থালার উপর বসিয়ে চায়ের কাপ নিয়ে এল। পোস্টমাস্টার সেগুলি এগিয়ে দিলেন।

দীনু উত্তর দিলে—হুজুরদের হুকুম হলে পারব না ক্যানে? পারব।

—ভূত প্রেতের ভয়?

ফিক করে হেসে দীনু বললে—ভূত কোথা হুজুর? উ-সব নষ্ট-দুষ্ট মেয়ে পুরুষের কাণ্ড!

—ভূত বিশ্বাস কর না তুমি?

—রাম রাম বলতে বলতে চলে যাব হুজুর।

—বুঝে দ্যাখো। সন্ধ্যের সময় এখান থেকে রওনা হয়ে বোলপুর পৌছুতে হবে এগারোটার মধ্যে। আবার সেখান থেকে বেরুতে হবে তিনটের পর, এখানে পৌছুতে হবে ছটার মধ্যে। পারবে? ইতিমধ্যে চা খেয়ে শেষ করে কাপ নামিয়ে দিলেন। এবং সিগারেট কেস বের করে দাশরথিবাবুর সামনে ধরলেন।—নিন।

দীনু বললে—তা পারব বইকি। এই তো বোলপুর! হামেশাই যেছি আর আসছি!

সিগারেট ধরিয়ে ইনস্পেক্টর বললেন—সরকার বাহাদুরের ডাক। টাকা পয়সা ইনসিওর, রেজিষ্ট্রি। কত লোকের কত চিঠি। জল হোক ঝড় হোক—তোমাকে ডাক নিয়ে পৌছুতে হবে।

—তা ঠিক পঁহুচে দোব হুজুর। ঠিক দোব।

—হ্যাঁ। পৌছে দিতে হবে। পথে কোথাও একমিনিট দাঁড়াবে না, বসবে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতে থাকবে না। তুমি নিয়ে যাবে সরকার বাহাদুরের ডাক।

এবার একটু আতঙ্কিত হল দীনু কথাগুলির প্রভাবে। বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাশরথিবাবু বললেন—চোর আসুক ডাকাত আসুক—জান দিয়ে রুখবি, হ্যাঁ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইনস্পেক্টর বললেন—বিপদের সময় মনে থাকবে তো এ-কথা? তখন ভয়ে ভুলে যাবে না তো? ডাক ফেলে পালাবে না তো?

দীনু হাত জোড় করে বললে—সব বেচে সবাই খায় হুজুর, ধরম বেচে কেউ খায় না, খেতে নাই হুজুর—আমি তা খাব না।

ইনস্পেক্টর ওভারসিয়ার এবং পোস্টমাস্টারকে বললেন—তা হলে ওকেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট দাও। আর রুট বদলে—এই পথ দিয়ে ডাক যাক, এবং সন্ধ্যের পর ডাক যাবে আবার রাত্রেই রওনা হয়ে ডাক এনে ভোরে পৌছবে। (দীনুর প্রতি) তুমি মাইনে পাবে মাসে পনেরো টাকা। ওভারসিয়ার বাবুর কাছে ফরমে তোমার টিপ ছাপ দাও। পেটী নাও কোট নাও—কেমন? মনে থাকে যেন সরকার বাহাদুরের ডাক বইবার ভার নিলে তুমি!

দীনু সরকারী কোর্তা পরে কোমরে পেটী পাথর ও পাগড়ি বেঁধে বাঁধে ঘুঙুর-ঘণ্টা এবং বল্লম পরানো বাঁশের লাঠিটি নিয়ে অহঙ্কৃত ভাবেই নবগ্রামের অল্প কয়েকখানা ছোট দোকানওয়ালা বাজারের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরল।

পথে একটা দোকানের সামনে বাউল হরিদাস আলখাল্লা পরে একতারা বাজিয়ে গান করছিল—দীনু গান শুনে খুশী হল। বাবাজী একতারা হাতে সমবেত জনতার কাছে পয়সা চেয়ে ফিরতে ফিরতে দীনুর কাছে এসে দাঁড়াল। পাগড়ি-কোর্তা পরা দীনুকে সে দীনু বলে চিনতেও পারে নি। চিনতে পেরে সবিস্ময়ে বলল—আঁ! দীনু?

দীনু একটি পয়সা বাবাজীর ভিক্ষাপাত্রে ফেলে দিয়ে বললে—হ্যাঁ গো বাবাজী। চিনতে পারছ না নাকি? মুখের দিকে চেয়ে থেকে বাবাজী বললে—তা লারছি দীনু। এই পোশাক, পেটী কোর্তা পাগড়ি, এ্যাঁ? তার উপর নগদ একটা পয়সা দিলি—ওরে বানাস্ রে!

চারিপাশের জনতার মধ্যে থেকে কেউ বললে—ও বাবা রে! তাই তো বটে! দীনেই তো বটে! আমি বলি কে সরকারী চাপরাসী-টাপরাসী।

একজন বললে—বন থেকে বেরুল টিয়ে লালগামছা মাথায় দিয়ে!

দীনু ওদের কথা গ্রাহ্য না করেই বললে—চাকরি পেলাম যে বাবাজী।

—চাকরি!

—হ্যাঁ গো; ডেকে দিলে—

—ডেকে দিলে?

—খাস সরকারী চাকরি! পোস্টাপিসের ডাকহরকরা। মাসে পনেরো টাকা মাইনে। তার ওপর এই কোর্তা পেটী পাগড়ি।

বাবাজী বললে—বলিহারি বলিহারি! পনেরো টাকা মাইনে। তার উপর কোর্তা পেটী পাগড়ি!

বলেই গান ধরে দিল—

আহা, লাল পাগুড়ি বেঁধে মাথে
রাজা হলে মথুরাতে—
বাঁশী ছেড়ে দণ্ড হাতে বঁধু হলে দণ্ডদাতা
কলঙ্কিনী রাধায় দণ্ড দিলে মান থাকে কোথা?
লাল পাগুড়ি বেঁধে মাথে—
এখন আমি নালিশ করি—
মাখন চুরি বসন চুরি—
শেষে মন অপহরি—ফেরারী চোর গেল কোথা?
বেঁধে এনে বিচার কর—শুনব নাকো ছুতোনাতা।
বঁধু তুমি রাজা হয়ে কেন হলে হায় বিধাতা—

গান শেষ করে হরিদাস তার চিবুকে হাত দিয়ে বললে—তাই জন্মে পয়সা দিলি

আমাকে! হরিবোল হরিবোল। ভালো হবে রে তোর ভালো হবে।

একজন বললে—তা হলে এতদিনে নোটন চৌকিদারের কাছে হেঁট মাথাটা তোর উঠল।

দীনু বললে—উঠল মানে? ওর চেয়ে উঁচু হল গো! ও তো চৌকিদার; মাস্টারবাবু বললে—ওর তো ছোট গবরমেণ্টারের চাকরি! আমার চাকরি বড় গবরমেণ্টারের; ভারত গবরমেণ্টারের গো! হাঁ! তবে হ্যাঁ;—চাকরি ওর সুখের বটে। ঘরে শুয়ে শুয়ে জানলা খুলে এ—হৈ—এ—হৈ—বলে হাঁক মেরেই চাকরি করা চলবে না। আমার চাকরি বুয়েছেন—সরকার বাহাদুরের ডাক—জল হোক—ঝড় হোক—বাজ পড়ুক—ঠিক সময়ে ডাক পৌছে দিতে হবে। আচ্ছা—চলি বাবাজী; আবার উদিকে টিকিস কেটে দেবে। মদের দোকানে গো!

ওদিকে দীনুর বাড়িতে—দীনুর স্ত্রী সদু অর্থাৎ সৌদামিনী দাওয়ায় বসে ভাত রাঁধছে। সেখানে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। মাটির হাঁড়ি মাটির কলসী মাটির ভাঁড় খুরি নিয়ে সংসার। কেবল একটা ঘটি চকমক করছে। চাঁদের আলোয় সেদিন ঝলমলে জ্যোৎস্না। উঠানটার একপাশে একখানা ছোট শাকের ক্ষেত। চারিপাশে বেড়া দেওয়া। একপাশে দুটি বলদ এবং দুটি গাই বাঁধা। এরা বসে রোমন্থন করছে।

একটু দূরে কোথাও থেকে শব্দ আসছে ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। একটু দূরেই একটা খোলা জায়গায় আট ন বছরের ছেলে নিতাই এবং ক-জন পাড়ার ছেলে বাখারির লাঠি নিয়ে লাঠি খেলছে, তারই শব্দ ওগুলি।

দীনুর স্ত্রী রান্না ছেড়ে দাওয়ার প্রান্তে এসে দাঁড়াল।

চালের বাতা ধরে একটু ঝুঁকে ডাকলে—চিৎকার করেই ডাকলে—নেতা-ই! নেতা-ই রে! আরে অ নে—তা—ই!

উত্তরে এল শুধু ঠক্-ঠক্ শব্দ।

দীনুর স্ত্রী নামল উঠানে। আবার ডাকলে—নে—তা—ই!

উত্তর এল। ওই অবিশ্রান্ত ঠক্ ঠক্ শব্দের মধ্যেই উত্তর এল—কী?

—বলি করছিস কী? শুনে যা!

—লারব এখন। সময় নাই।

—সময় নাই লয়, শুনে যা!

—আমি যাব না—! এ্যাই ও! (ধমকটা দিল তার খেলোয়াড়কে)—

—তবে রে হারামজাদা—বজ্জাত—

বলতে বলতে সে এগিয়ে এল—এবার লাঠি-খেলোয়াড়দের দেখা গেল। নগ্নকায় খাটো কাপড় মালকোছা মারা ছেলে কয়েকজন বেশ দক্ষতার সঙ্গে লাঠি খেলছে।

অ্যাই—ও। অ্যাই—ও।

হাই। হাই। হাই!

সঙ্গে সঙ্গে ঠক্ ঠক্ ঠকা ঠক্ ঠকাঠক্—লাঠিতে লাঠিতে সংঘর্ষ চলছে।

সদু-বউ এসে দাঁড়াল এবং ডাকলে—নেতাই! খেলা রাখ!

নেতাই উত্তর না দিয়ে খেলেই গেল—এবং প্রতিপক্ষের লাঠিতে ঘা মারার সঙ্গে হাঁক মেরে গেল—

হাই লে। হাই লে। হাই হাই হাই। হাই ও! হাই—

প্রতিপক্ষ পিছন হটছিল।

সদু কঠোর কণ্ঠে ডাকলে—নেতাই! ওরে হারামজাদা—

—ক্যানে রে হারামজাদী! হাই ও। বলে—ঘুরে এসে নিজের কোটে দাঁড়াল।

—লাঠি রাখ, শোন!

—না। না। না। ভাত এখন খাব না। যা!

—মেরে তোর হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করব বলছি। তোর বাবা এখনও আসে নাই—সেই যেয়েছে। বাবুদের লোক ডেকে নিয়ে যেয়েছে। দেখে আয় একবার।

—যেয়েছে আসবে। আমি এখন যাব না, যা।

—ওরে মুখপোড়া, চাপরাসী বলে গেল সরকারী হাকিম ডেকেছে। সরকারী হাকিম ডেকেছে, এতক্ষণ হয়ে গেল—দেখে আয়—

—পারব না আমি, সি মরুক গো!

—কি বললি? মরুক গো? তু মর।

—তু মর! তু মর! তু মর!

এর প্রতিক্রিয়ায় অন্য ছেলেগুলি থেমে গেল। একজন বললে—য্যা ক্যানে নেতাই। মা ডাকছে। কাল খেলব আবার।

নেতাই ক্রুদ্ধ ভাবে একমুহূর্ত মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে উল্টোমুখে হাঁটতে লাগল। সদু মনে করলে সে তার বাপের খোঁজে চলেছে। সে বললে—বাবুদের বাড়ি দেখবি। সেখানে না-পাস তো একবার মাতালশালে যাস—

নেতাই মুখ ভেঙিয়ে দিল—অ্যাঁই—অ্যাঁই—অ্যাঁই—

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ওদের বাড়ির দিক থেকে কারুর ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল—এ সদ্দু বহু! দীনবন্ধুকে পরিবার! এ—

সদু চমকে উঠল। নিতাই থমকে দাঁড়াল।

আবার হাঁক এল—এ—নেটাইচরণ—দীনাকে লড়কা—

সদু ছেলের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—কে রে? ও নেতাই, পশ্চিমার লোকের মতো কে ডাকছে রে? পুলিস-মুলিস না ক্যা রে?

নিতাই এবার ফিরল। এবং হাঁকলে—কে বটে হায়?

আসলে ডাকছিল দীনু। তার একটু মদের নেশা লেগেছে। বাড়ির উঠানের ধারে দাঁড়িয়ে ওই পাগড়ি পেটী কোর্তার সুযোগ নিয়ে হাতের বল্লম ও ঘণ্টাওয়ালা লাঠিটা ঠুকে

কণ্ঠস্বর বিকৃত করে স্ত্রী পুত্রকে সানন্দ কৌতুক দেখাচ্ছে।—

—এ সদ্দু বহু! এ দীনুকে লড়কা! এ হারামজাদে!

ওপাশে উঠানের প্রান্তে দাঁড়াল এসে মা ও ছেলে।

নেতাই প্রশ্ন করলে—তুমি কে হ্যায়?

দীনু উত্তর দিলে—সরকারী লোক হ্যায়। গবরমেণ্টারকে লোক। চলো। তুম লোক কো যানে হোগা।

সদু চুপিচুপি ছেলেকে বললে—বল, বাবা বাড়িতে থাকতা নেই। বাবা আসে গা তখন আও।

নেতাই সে কথা বলবার আগেই দীনু বললে—নেহি, নেহি। সরকারী হুকুম হ্যায়, তুম লোক—মা বেটাকে ডাকঘরকে থলিয়াকে ভিতর বন্ধো করকে চালান করে গা।

—চালান করে গা? কাহে, ক্যানে?

—তোমার স্বামীকে চাকরি হুয়া—হ্যাঁ—ডাকহরকরাকে চাকরি—। এর পর সে হা-হা করে হেসে ফেললে।

এবার ছেলেটা ছুটে এসে বাপের পাগড়ির লেজটা ধরে টেনে খুলে ফেললে এবং চিৎকার করে উঠল—ওটে মা-টে—বাবা-বাবা। বাবা পাগড়ি বেঁধে চলে এয়েচে!

দীনুর হাসি বেড়ে গেল। ছেলেকে সে কোলে তুলে নিলে। হাসতেই লাগল—হা-হা-হা—হা—হা—হা!

এবার সদু এগিয়ে এল—গালে হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বললে—অ মা-গো! ই সব কী গো? এঁ্যা?

—এই সব? কোর্তা?

—হ্যাঁ। তা পরেতে ইটো কী? কোমরে?

—পেটী। পেতলের ইটো দেখেছ? খোদাই করা দেখেছ? এই দেখ।

এবার স্ত্রীর হাত ধরে দাওয়ায় প্রায় টেনে এনে কেরোসিনের ডিবেটা পেটীর সামনে ধরলে।

—দেখেছ? নেকা রয়েছে খোদাই করে?

—হ্যাঁ গো! কী নেকা রয়েছে গো?

—ডা-ক-হ-র-ক-রা। গবরমেণ্টারের লোক।

—ই তুমি পেলে কোথা?

—হুঁ—হুঁ! যথাসাধ্য হরিদাস বাউলের গান নকল করে গাইলে—

আহা! লাল পাগুড়ি বেঁধে মাথে—আজা হলাম মথুরাতে—

বাঁশী ছেড়ে দণ্ড হাতে—

যা-ছাই, ভুলে গেলাম। এ্যাই এ্যাই—ই ছোঁড়ার কাজ দেখ দি-ই নি। পাগুড়িটা নিয়ে কি করে দেখ! ধুলো লাগছে। ধুলো লাগছে।

নিতাই বাপের পাগড়িটা নিয়ে মাথায় বাঁধছিল। একটা পাশ লুটাচ্ছিল ধুলায়। সেই দেখে ছুটে গেল দীনু এবং পাগড়িটা কেড়ে নিল।

—ওরে বাবা! এ গবরমেণ্টারের জিনিস। সব্বনাশ সব্বনাশ। এখুনি জরিমানা হবে, আমায় আর তোকে ধরে নিয়ে যাবে। সব্বনাশ!

—না। ওমুনি পাগুড়ি আমি লোব। না!

—কিনে দোব। ছোট মতন কিনে দোব। এ ছুঁতে নাই।

—এখুনি। এখুনি লোব আমি। না!

—এই দেখ। ক্ষ্যাপা ছেলের ক্ষ্যাপামি দেখ। আজ কোথা পাব। মাইনে পাই কিনে দোব। শোন শোন. সরকার বাহাদুরের ডাকঘরের নেস্‌পেক্টর সাহেব নিজে ডেকে আমাকে ডাকহরকরার চাকরি দিলে। মাসে পনের টাকা মাইনে। শুধু রেতে ডাক নিয়ে যাব বোলপুর। আর রেতেরেতেই ডাক নিয়ে ফিরে চলে আসব। বুঝলি! দিনে একবেলা খাটব একবেলা ঘুমোব। বুঝলি! এই পেথম মাসের মাইনে পেলেই তোকে একটা কামিজ কিনে দোব—আর লাল শালুর একটা পাগুড়ি কিনে দোব। আর সতুকে—

—না। আজই দে কিনে। আজই লোব আমি—। লইলে ওইটো দে। দে-দে!

পাগড়ি ধরে টানতে লাগল।

—নেতাই!

—না-না-না।

—না লয় শোন। পাগুড়ি বাঁধলে ডাক বইতে হবে। এই দেখ এমনি করে। নিজে পাগড়িটা বাঁধলে—বল্লমটা ঘাড়ে করলে এবং উঠানে ডাকহরকরার পথ চলার অভিনয় করে ছুটতে লাগল—ঘণ্টা বাজতে লাগল। দীনু বলে গেল—সরকার বাহাদুরের ডাক। পাঁচ মিনিট দেরি করলে ডাকগাড়ি ছেড়ে দেবে। জল হোক ঝড় হোক বাজ পড়ুক থামবার উপায় নাই—হ্যাঁ। অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে সুঁদীপুরের বটতলার নিচে দিয়ে—

অন্ধকার রাত্রে বনপথের ভিতর দিয়ে ঝুন্ ঝুন্—ঝুন্ ঝুন্ ঘণ্টা বেজে চলেছে। দীনু ছুটছে ডাক নিয়ে। তাকে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার দিয়ে গড়া মানুষের মতো মনে হচ্ছে। সামনে সুঁদীপুরের বটতলা—

বটগাছের অন্ধকার তলায় মধ্যে মধ্যে ফিস্‌ফিস্ শব্দ উঠছে। ডাল দুলছে। কেউ যেন দোলাচ্ছে।

দীনু বটগাছের তলায় আসতেই ঝরঝর শব্দে বালি কাঁকর ঝরে পড়ল। দীনু চলতে চলতেই হেসে উঠল।

খোনা স্বরে এবার প্রশ্ন হল—কেঁ—রেঁ—?

দীনু হেঁকে বললে—সরকার বাহাদুরের ডাক। আমি ডাকহরকরা নবগেরামের দীনু হে রসের নাগর।

—এ পথ দিয়ে হাঁটিস না। মরবি। সাবধান করে দিলাম।

—আজকে যেতেই আবার ফিরব। দিব্যি রইল গাছ থেকে নেমে পথে দাঁড়িয়ে থাকিস। পারলে ঘাড়টা মুচড়ে দিস।

চলতে লাগল দীনু। সুঁদীপুর পিছনে পড়ে রইল।

অনেকটা এগিয়ে বন শেষ হল। খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে সড়ক গেছে। পাশে গ্রাম। কুকুর চিৎকার করে উঠল।

দীনু গ্রাহ্য করলে না—চলল।

এরপর চলেছে একসারি গাড়ি, মাল নিয়ে চলেছে। গাড়ির চাকায় ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ উঠছে। তার পাশ দিয়ে তাদের অতিক্রম করে সে চলল।

আরও খানিকটা এসে—শেয়াল ডেকে উঠল।

দীনু চলল।

খানিকটা পরেই বোলপুরের আলো দেখা গেল। একটা ট্রেনের বাঁশি শোনা গেল।

দীনু আরো জোরে ছুটল।

শহরের মুখে ঢুকল দীনু।

এর পর সে এসে পোস্টাপিসের দাওয়ায় উঠল।

বললে—হুজুর! মাস্টারবাবু!

ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে।

পিওনেরা চিঠিতে ঝপা-ঝপ ছাপ মেরে চলেছে। শব্দ উঠছে। টেলিগ্রামের যন্ত্রে টকটক শব্দ উঠছে।

দীনুর কথার উত্তরে ভিতর থেকে শব্দ এল—কে?

—নবগেরামের ডাকহরকরা হুজুর!

—নবগ্রামের ডাক?

ঘরের মধ্যে পোস্টমাস্টার ঘড়ির দিকে তাকালেন। আপন মনেই বললেন, নটা বাজে নি এখনও? কটায় ডাক ছেড়েছিল? প্রশ্ন যেন নিজেকেই করলেন।

পিওন একজন দরজার গায়ে লাগানো ছোট দরজাটা খুলে—মুখ বাড়িয়ে বললে—আন, ভিতরে আন।

দীন ডাকব্যাগ ভিতরে এনে নামিয়ে সভয়ে বললে—ডাকগাড়ি চলে যেয়েছে হুজুর?

পিওন বললে—ডাকগাড়ি চলে যেয়েছে? এখনও তিন ঘণ্টা দেরি! বারোটায় ডাকগাড়ি।

—ওঃ। রেলগাড়ির বাঁশির ফুঁকুনি শুনে যে ভয় আমার লেগেছিল! ওঃ। একটু জল পাব হুজুর?

মাস্টার সবিস্ময়ে দীনুকে দেখছিলেন। ওদিকে একজন পিওন ছাপ মেরেই চলেছে।

মাস্টার টেলিগ্রাফে হাত দিয়ে কল চালাতে চালাতে বললেন—ঘেমে যে তুই নেয়ে উঠেছিস! সারাপথ বুঝি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছিস? যা, ওই দিকে দেখ কুয়ো আছে, বালতি

আছে। তুলে নিয়ে থেগে যা। কিন্তু একটু থেমে থাস বাবা। আর এত দৌড়ে আসিস নে।

দীনু চলে গেল।

পিওন বললে—নতুন লোক। পুরনো হোক দাঁড়ান, তখন ঘুমুতে ঘুমুতে আসবে। নবগ্রাম থেকে রওনা হয়েই ঘুম শুরু হবে—এখানে এসে ঘুম ভাঙবে।

মাস্টার টেলিগ্রাফ শেষ করে কলে একটা সমাপ্তির টোকা মেরে বিড়ি ধরালেন।

বললেন—তা মিছে বল নি। ওই গোবিন্দ, মহেশ্বরা এদের সঙ্গে মিশবে তো, তিন দিনে চলতে চলতে ঘুমনো তালিম করে দেবে!

আবার কলটা টক টক করে উঠল।

মাস্টার চটে গিয়ে বললেন—দুরো ছাই! আবার টকর টকর—! টকর টকরের নিকুচি করেছে। জ্বালালে রে বাবা! বলতে বলতেই একটা বই কলটার উপর চাপা দিলেন।

বাইরে আবার ডাকহরকরার ঘণ্টার শব্দ হল।

একজন ডাকহরকরা ডাক নামালে বাইরে।

দীনু তখন দাওয়ায় বসে বিড়ি টানছে।

পিওন বেরিয়ে এসে বললে—কে রে? কে এলি?

নতুন হরকরা বললে—আমি গোঃ।

—মহেশ্বরা?

—হ্যাঁ গো।

—রতনপুর থেকে তোর আসতে এত দেরি? ওই দেখ নবগ্রাম থেকে তোর আগে এসেছে—তোর চেয়ে দুকোশ রাস্তা বেশী! বলছি আমি ওভারসিয়ারকে দাঁড়া।

—মানুষ না ঘোড়া গো আমরা? ভারি বললেন যা হোক! আসছিই তো। পায়ের হাঁটনেই তো হেঁটে আসছি, না কী!

পিওন বললে—ও বুঝি পায়ের হাঁটনে হাঁটে না? বদমাশ কোথাকার। পথে ক-বার বসেছিলি? ক-বার তামাক খেয়েছিস? ক-জনার সঙ্গে গল্প করেছিস?

মহেশ্বরা ডাকব্যাগ ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বললে—ওই কথা তোমাদের। লাও লাও ডাক লাও। ভিতরে ঢুকল সে।

পিওন দীনুকে বললে—তুমি ওইখানে শুয়ে পড় হে। ঘুমিয়ে নাও। এখন সেই তিনটে পর্যন্ত ছুটি।

এদিকে সূর্যোদয় হচ্ছে। দূরে কোথাও শুধু করতাল বাজিয়ে টহলদার গেয়ে যাচ্ছে—'রাই জাগো রাই জাগো বলে শুকসারী ডাকে। রাই জাগো'—মিলিয়ে গেল ওই এক কলির গান। তখন সদ্য-বউ ছিটে বেড়ার দেওয়াল খড়ের চাল গোয়াল ঘর থেকে গোরু বের করে বাইরে বাঁধছে। মার্চ মাস—ফাল্গুন শেষ হয়ে চৈত্র পড়ছে। পাশে একটা পলাশ গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে। নিম গাছে কচি পাতা দেখা দিয়েছে। দাওয়ার উপর বসে

সদ্য ঘুমভাঙা নেতাই বাপের হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে।

সদু গোয়াল ঘর থেকে বের হতে গিয়ে মাথায় ঠোক্কর লাগিয়ে উহু-হু বলে বসে পড়ল। নেতাই তাকিয়ে দেখে বললে—এতটুকু দুয়োরে এই মাথা করে বেরুচ্ছে হারামজাদী। আচ্ছা হয়েছে। অশ্রুপাত হয়েছে।

সদু ছেলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—মারব গিয়ে মুখে থাবড়া! তারপর উঠে দরজার দিকে তাকিয়ে বললে—এই ঘর ভেঙে আগে গোয়াল করব তবে আমার নাম সদু।

—মুড়ি দেটে! মুড়ি দে!

সদু উঠান অতিক্রম করে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘরে ঢুকল মুড়ি আনতে।

নেতাই ব্যর্থ অনুকরণে গাইতে চেষ্টা করলে—আই জাগো, আই জাগো—শুক সারী ডা-কে।

সদু মুড়ি এনে নেতাইয়ের পাতা গামছাখানায় ঢেলে দিয়ে বললে, আই—মুড়ি খেতে খেতে একবার যা। দেখে আয়।

—কী?

—তোর বাবাকে। ডাকঘরে যা।

নেতাই মুড়িসুদ্ধ গামছাখানা নিয়ে উঠে চলতে চলতে বললে—তোর পরান উথুলছে তো তু যা। আমি চললাম মৌফুল কুড়ুতে। বেলা হলে একটো পাব না।

—নেতাই।

নেতাই গান ধরলে—ও সায়েব আস্তা বানালে—

ছ-মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে—
ও সায়েব—

ওদিকে তখন নবগ্রামের পোস্টাপিসের ডাক কাটা হয়েছে।

দীনু বসে তামাক সাজছে একদিকে। পিওন চিঠি পড়ে ভাগ করে রাখছে।

পোস্টমাস্টার ক্যাশব্যাগ এবং রেজেস্ট্রি ব্যাগ মিল করছেন।—ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন গ্রামের পত্র-প্রত্যাশীরা।

দীনু বেরিয়ে এসে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে কলকে ধরে তামাক টানতে লাগল।

বিলিতী মাস্টার বাইরে থেকে বললে—দেখি দেখি ও প্যাকেটটা! ওটা আমার না হে রামলাল?

অন্য একজন বললে—কী হে, ওটা কী হে বিলিতী মাস্টার?

—হরস্কোপ, মানে কুষ্টি। জার্মানি থেকে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—জন্মের সন-তারিখ পাঠালে কুষ্টি করে পাঠাবে। তাই করে পাঠিয়েছে।

পিওনের কাছ থেকে কোষ্ঠীটি নিলে বিলিতী মাস্টার। এবং খুললে। কয়েকজন ঝুঁকে

দেখতে গেল। মাস্টার বললে—না। কুষ্টি দেখবে কী? না। গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল সে।

একজন বললে—বিলিতী মাস্টার! আচ্ছা নাম হয়েছে সরকারের। বিলিতী তালেই আছে।

পিওন দরজা থেকে মুখ বের করে বললে—থানা, থানার ডাক।

একজন কনেস্টবল ভিড়ের পিছন থেকে বললে—হটিয়ে সব, হটিয়ে।

ভিড় সরিয়ে এসে সে ডাক নিলে। এবং চলে গেল।

পিওন এবার ডাকলে—ইউনিয়ন বোর্ড। কে এসেছিস? নোটনা রে!

নোটন চৌকিদার এগিয়ে এল—এই যে আজ্ঞে।

— এই ইউনিয়ন বোর্ড, আর এগুলো তো সিডেন সাহেব দাশরথিবাবুর নিজের। ইস্কুলের কে রয়েছে?

দুটি ছেলে এগিয়ে এল।—দিন।

ছেলে দুটি ডাক নিয়ে চলে গেল।

একজন বললে—আমার কিছু আছে রামলাল?

— কে? গোপেশ্বরদাদা?

—হ্যাঁ ভাই। আমার চিঠি আজও আসে নাই?

— কই দাদা! দেখছি না তো!

—তা হলে? নারায়ণ নারায়ণ! আজও চিঠি পেলাম না ছেলেটার! চোখে খুব পুরু চশমা, গায়ে ফতুয়া, হাতে লাঠি ঠুকঠুক করে চলে গেলেন।

আর একজন হাঁকলে—ও রামলাল! শুনছ!

—হ্যাঁ—।

—আমি হে!

—বসুন সুরেশবাবু। বসুন। দিচ্ছি। তার আগে রমেন্দ্র মুখুজ্জে।—রমেনবাবু!

পিওন মুখ বের করে একখানি রঙিন চিঠি বাড়িয়ে ধরলে। রমেন এগিয়ে এল। পিওন এবং সে দুজনেই একটু হাসলে।

সুরেশ বললে—রঙিন খাম যে! অ্যাঁ! চোখের ভুরু দুটি নেচে উঠল।

পিওন হেসে বললে—খোসবাই আছে, ভুরভুর করছে!

—বকশিশ আদায় কর রমেনের কাছে। সুরেশ বললে—প্রথম বউয়ের চিঠি! হ্যাঁ-হ্যাঁ!

রমেন ফিক করে হেসে দ্রুত চলে গেল।

আবার সুরেশ বললে—দাও না রামলাল কাগজখানা; একবার দেখে নি।

পিওন রামলাল একখানা খবরের কাগজ বের করে সুরেশের হাতে দিয়ে বললে—যত্ন করে খুলবেন মশায়; দেখবেন যেন লাট না খায়। পরের কাগজ—ভারি চটে যায়। রিপোর্ট করলে আমাদের বিপদ হবে।

এক তরুণ বাইসিক্ল চেপে এসে দাওয়ায় পা রেখে বাইসিক্লে চেপে থেকেই বললে,

রামলাল আমার ভারতবর্ষ প্রবাসী—

—আজ তো আসে নি বাবু।

—সে কি? আজ বাংলা মাসের ২রা হয়ে গেল যে! চিঠি?

—চিঠিও আজ নাই আপনার।

—ধুৎ তেরি। সে বাইসিক্ল হাঁকিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে সুরেশ কাগজ খুলে দেখেই বললে– ওরে বাপ রে! কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণের সিদ্ধান্ত। ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দিবার জন্য গরমপন্থীদের সংকল্প। ১৯৩০ সালের পূর্বে মীমাংসা না হইলে আন্দোলন আরম্ভের ব্যবস্থা।

পাশের লোকজন ঝুঁকে পড়ল কাগজের উপর।—দেখি—দেখি।

মাস্টার ভিতর থেকে বললেন—গোলমাল করছেন কেন এত! আস্তে আস্তে পড়ুন না। রামলাল! দীনু কই? দীনু!

দীনু তামাক খেতে খেতে অন্তরালে চলে গিয়েছিল।

ঘরের ভিতর থেকে রামলাল হাঁকলে—দীনু! এই দীনু! কোথা গেলি রে?

মাস্টার বললেন—দেখ আবার চলে গেল কিনা। নতুন লোক। ওকে বলেছিলে—কাগজে টিপ দিতে হবে?

—সে তো কালই বলে দিয়েছি। ও দীনু!

অন্য দরজা দিয়ে দীনু ঘরে ঢুকল।—আজ্ঞে হুজুর, এই আছি আমি।

মাস্টার বললেন—আছিস! আচ্ছা বলেই কাজে মন দিলেন।

—দে—দে এই কাগজে টিপ দিয়ে দে!

মাস্টার কাজ করতে করতেই বললেন—হ্যাঁ। ডাক এনে দিয়ে বসে থাকবি। সব মিল হয়ে গেলে কাগজে টিপ দিয়ে তবে ছুটি।

বাইরে জানালার ওপার থেকে কে বললে—দুখানা পোস্টকার্ড আর একখানা খাম দেবেন বাবু!

মাস্টার হাত বাড়ালেন—পয়সা! ওদিক থেকে একখানা হাত ঢুকল।

মাস্টার পয়সা দেখে বাক্সে ফেলতে ফেলতে পিছন ফিরেই বললেন—দীনুকে ঘাসের কথা বলেছ রামলাল? আমার গোরুর জন্যে এক বোঝা করে ঘাস আনবি দীনু। বুঝলি?

দীনু টিপ দিয়ে মাথায় আঙুলের কালি মুছছিল। সে প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে?

—এক বোঝা করে ঘাস আনতে হবে রোজ।

—ঘাস?

রামলাল বললে—হ্যাঁ রে বাবা ঘাস। গোরুতে খাবে। যে হরকরা থাকে সে-ই আনে।

মাস্টার বললেন—আমি মাসে তোকে কিছু করে দেব। বুঝলি? তোরা না দিলে আমার চলবে কি করে? ওবেলা—সেই সন্ধ্যের সময় যখন ডাক নিয়ে যাবার জন্যে আসবি—তখন, তখন আনলেই চলবে।

রামলাল বললে—যা-তা ঘাস আনিস না। ভালো ঘাস। সন্ধ্যেতে ঠিক সময়ে আসবি। কী, দাঁড়ালি কেন?

—ইগুলান নিয়ে যাব?

দীনু পকেট থেকে খান দুয়েক রঙচঙে খাম ও মোড়ক বের করলে।

রামলাল সবিস্ময়ে বললে—দেখি—দেখি। পেলি কোথা?

—পোস্টাপিসের সামনে পড়ে ছিল। বাবুরা ফেলে দিয়েছে—কুড়িয়ে নিলাম।

—হুঁ। রমেন্দর বউয়ের চিঠির রঙীন খাম। খোসবু উঠছে। এটা তো বিলিতী মাস্টারের জার্মানির কুষ্টির মোড়ক।

—লোব?

—তা নিয়ে যা। কিন্তু করবি কী?

—ছেলেটাকে দোব।

মাস্টার কাজ করছিলেন—হঠাৎ ঘুরে দীনুর দিকে তাকালেন—তারপর হাত বাড়িয়ে দেওয়াল থেকে একখানা শেষ-হয়ে-যাওয়া ক্যালেণ্ডার খুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ছেলে বুঝি ছবি ভালোবাসে? এই নে!

দীনু উজ্জ্বল আনন্দে দীপ্ত হয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতার্থ হয়ে হাত বাড়িয়ে ছবিখানা নিলে।

দীনু বেরিয়ে গেল।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে কাগজখানা মোড়কে পুরে হাতে করে ঘরে ঢুকল।

—এই নাও হে রামলাল। একেবারে ভাঁজে ভাঁজে মুড়ে ঠিক করে দিয়েছি।

ধপ করে ফেলে দিল। তারপর বললে—ও মাস্টার।

—হুঁ। বলো।

—বলব? বলে বলে তো মুখ শুকিয়ে গেল হে! রোজ রোজ আর কত বলব?

—পাঁজি!

—তা ছাড়া কি কারুর একখানা ইনসিওর আমাকে দাও বললে দেবে তুমি? পাঁজি একখানা—ওই বিজ্ঞাপনের একখানা পাঁজি আর একটা ক্যালেণ্ডার।

—দোব। এই গাদা দরুনে যেদিন আসবে—সেদিন দোব।

—এই তো মেলাই এসেছে বাবু, দাও না একটা পাঁজি!—আজ যদি না দাও তো আর চাইব না। আর দাবা খেলতেও আসব না। হ্যাঁ। এই নিলাম আমি একখানা।

বলেই সে তুলে নিল।

—আরে আরে দেখে নাও, কার নামের নিচ্ছ। রামলাল দেখে দাও হে!

—এ কোথাকার কে—হরিলাল ঘোষ—সাকিন কুড়ুমশা—

বাইরে থেকে ওভারসিয়ার ডাক দিল—মাস্টারমশাই!

বাঁড়ুজ্জে তাড়াতাড়ি কামিজ তুলে পেটের কাপড়ের তলায় গুঁজতে লাগল। এবং মাস্টারের বাড়ির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হল।

মাস্টার কিন্তু চমকালেন না; তিনি হেসে উত্তর দিলেন—হরি হে রাজা কর! জয় ওভারসিয়ার বাবু! আসুন আসুন।

বাঁড়ুজ্জেকে বললেন—ভয় নাই। আমাদের মধুবাবু—ওভারসিয়ার। কিন্তু তার আগেই বাঁড়ুজ্জে সরে পড়েছে।

ওভারসিয়ার ঢুকলেন—বয়েস হয়েছে, শক্ত শরীর; এক হাতে লাঠি, কাঁধে ঝোলানো পোস্টাপিসের একটা হলুদ ব্যাগ। বলতে বলতে ঢুকলেন—হরি হে রাজা কর। কিন্তু হরি কানে কালা। শুনতে পান না। জীবনটা মাঠে মাঠে হেঁটেই কাটল। সিংহাসন বলতে দূরের কথা, কাঠের চেয়ারেও একদিন বসে আরাম করতে পেলাম না। টুলটা দাও হে রামলাল, বসি। একটু চা খাওয়ান মাস্টারমশাই।

বাইরে কথাগুলি বলে প্রায় শেষের দিকে ঘরে ঢুকল ওভারসিয়ার। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রাখলে।

রামলাল বাড়ির ভিতরের দিকের দরজায় মুখ বাড়িয়ে বললে—মিনু মা, দু কাপ চা চাই মা। ওভারসিয়ারবাবু এসেছেন, খাবেন এখানে।

ওভারসিয়ার বললেন—উঁহু! উঁহু! তবে আর বললাম কী এতক্ষণ? এখুনি চা খেয়েই যাব—টিকুরী। ব্যাগ থেকে শালপাতায় মুখ মোড়া একটি ভাঁড় বের করলেন কথা বলতে বলতে। রামলালের হাতে দিয়ে বললেন—মিনুকে দিয়ে এস রামলাল। সিউড়ির মোরব্বা। রামলাল নিয়ে চলে গেল। তারপর ওভারসিয়ার আগের কথার জের টেনে বললেন—ঝামেলার কথা আর বলবেন না। টিকুরী থেকে আবার ফিরতে হবে আজই।

—আজই?

—হ্যাঁ। আপনাদের নতুন লাইন হয়ে রাত্রেই বোলপুর!

—দেখবেন। সুঁদীপুরের বটতলায় বলে ভূত আছে।

—ইংরেজ রাজত্ব মশায়। গভর্মেণ্ট সারভেণ্টকে ভূতেও ভয় করে। আর ভূতের ভয় করলে কি এই চাকরি করা চলে! নতুন লাইনের রিপোর্টের জন্যে তাগাদা এসে গিয়েছে।

—চোখ বুজে রিপোর্ট দিয়ে দিন। মাস্টার বললেন।—লোকটা সাচ্চা!

—সাচ্চা সে আচ্ছা মশায়! এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বোলপুর পৌঁছয়। বেটা ঘোড়ার মতো দৌড়োয়।

ঠিক এই সময়েই দূরে—শাঁখ এবং উলুর ধ্বনি উঠল। এবং এই সময়েই রামলাল ও মিনু দুটি কাচের প্লেটে দুটি করে মোরব্বা এবং দু কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকে ওভারসিয়ারের হাতে দিল ও মাস্টারের টেবিলে নামিয়ে দিল।

মিনু বললে—জল লাগবে বাবা?

—লাগবে বইকি। হাত ধুতে হবে তো!

রামলাল ও মিনু চলে গেল। এঁরা মোরব্বা মুখে তুলে চিবুতে লাগলেন।

মাস্টার চিবুতে চিবুতে বললেন—আগের সে মোরব্বা আর নেই।

এর মধ্যে শাঁখ এবং উলু বেজেই চলেছিল। ওভারসিয়ার বললেন—সবই ভেজাল যে। যুগটাই যে ভেজালের। বলে প্লেটটা নামিয়ে রেখে বললেন—এত শাঁখ উলু? বিয়ে না কি? তারপরই বললেন—চৈত্র মাসে বিয়ে?

মাস্টার হেসে বললেন—রেজেষ্ট্রির যুগ। চৈত্র মাসে বিয়েতেই বা বাধা কী?

—যা বলেছেন। চায়ে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন—বোলপুর থেকে এখানে ফেরে কতক্ষণে বলুন তো?

মাস্টার বললেন—দীনুর কথা বলছেন? আমরা উঠবার আগেই ও এসে বাইরের বারান্দায় বসে থাকে। পাঁচটা কি পাঁচটার দু-চার মিনিট আগেই হবে। ওই দু ঘণ্টা—

ওদিক থেকে রামলাল জল নিয়ে ঢুকছিল।

এদিক থেকে 'রামলাল, রামলাল' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে হুড়মুড় করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন সুরেশ বাঁড়ুজ্জে। পরস্পর প্রায় ধাক্কা লেগে গেল। রামলালের হাতের জল পড়ে গেল।

ওভারসিয়ার পোস্টমাস্টার বলে উঠলেন, আরে আরে চিঠি ভিজল—চিঠি ভিজল।

পোস্টমাস্টার বললেন, কী যে তোমার কাণ্ড বাঁড়ুজ্জে! তারপর হঠাৎ চটে উঠে বললেন—কী? কী? রামলালকে নিয়ে কী দরকার? জল-টল ফেলে—

সুরেশ বসে পড়ে জল ওপাশ দিয়ে হাতে করে ছিটিয়ে দিতে দিতে বললে—ভিজবে না ভিজবে না। ঠিক করে দিচ্ছি। এই নাও এই নাও।—জল ছিটিয়ে ওদিকে ফেলে দিল। এই নাও। বাবাঃ—। কিন্তু রামলাল—তুই যা—যা এখুনি যা, বকশিশটা আদায় করে নিয়ে আয়। যা—।

—কিসের বকশিশ? সুরেশ তুমি একটা আস্ত—কী বলব! এমন কর—

—যা বলবে বল—আস্ত উল্লুক—ভল্লুক যা বলবে। এমন করি সাধে! মস্ত বড় কাণ্ড। শাঁখ বাজছে শুনছ না—উলু পড়ছে শুনছ না? শিবু রায়বাবুর নাতি, বেটা-ছেলে হয়েছে। শিববাবুর বাবা-বুড়োকে নিয়ে চার পুরুষ। হৈ-হৈ কাণ্ড। গাঁয়ে মিষ্টি বিলুবে। নোটা চৌকিদার চিঠি নিয়ে গিয়েছিল—সে বেটা দু টাকা বকশিশ পেয়েছে। পিওনকে বকশিশের হুকুম হয়ে গিয়েছে। মাস্টারের বাড়িতে থালা-ভর্তি সন্দেশ আসছে। রামলাল তুই শিগগির যা। টাটকা টাটকা গেলে—বেশী পাবি। গরম গরম—বুঝলি না।

বাইরে থেকে জানালা দিয়ে একখানি হাত ঢুকল—ওপাশ থেকে বললে—একখানা পোস্টকার্ড মাস্টারবাবু।

একটি সভ্য কণ্ঠের কথা শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে—একখানা মনিঅর্ডার ফর্ম দেবেন আমাকে।

বরাবরই শাঁখ উলু বেজে যাচ্ছে—ক্রমশ কমে আসছিল অবশ্য। এবার থামল।

ওদিকে তখন দীনুর বাড়িতে উঠানে হুঁকো কল্কে হাতে দীনু দাঁড়িয়ে আছে। উঠানের

একপাশে দড়ি টাঙিয়ে একখানি ঘরের ছক পাতা হয়েছে, দড়ির পাশে পাশে দাগ টানাও হয়ে গেছে কোদালের কোপ দিয়ে। এক জায়গায় খানিকটা মাটি খোঁড়া রয়েছে। হুঁকো হাতে দীমু ঘাড় বেঁকিয়ে ঘরখানির ছক যেন পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে পরখ করে দেখছে।

উঠানের একপাশে দু বোঝা ঘাস পড়ে রয়েছে।

স্ত্রী সদু কাঁখে করে এক কলসী জল নিয়ে এসে দাঁড়াল।

বললে—এখনও সেই দাঁড়িয়ে রইচ? না বাপু! আচ্ছা মানুষ যা হোক।

দীমু বললে—আধহাত করে চারপাশে বাড়িয়ে দোব কিনা ভাবছি।

—বাড়িয়ে দেবা? ক্যানে? গোরুগুলার লেগে ছপ্পর খাট পেতে মশারি টাঙাবা নাকি? বাড়িয়ে দেবে! সব তাতেই আদিখ্যেতা।

—ক্যানে? আদিখ্যেতা কী হল?

—হল না? বললাম গোয়ালের ছোট দুয়োরে মাথাটো ঠোক্কর লেগে কেটে যেয়েছে। আমি দিব্যি করেছি বর্ষার আগে নতুন গোয়াল করাব।

—তাই তো করছি।

—তাই তো করছি? তাই বলে আজই? বলে ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে। শোনবামাত্র দড়ি টাঙিয়ে বলে আজ বনেদের পত্তন করব। সারা রাত বলে ডাক বয়েছ, জেগেছ—

—দূর! সারা রাত ডাক বইতে হয় নাকি? রাত নটার সময় ডাক ফেলে দেলাম—বাস, তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুম। সেই তিনটে পর্যন্ত। শ্যাষ রাত। ভুলকো তারা ওঠা পর্যন্ত। তারপরে ডাক নিয়ে ফের রওনা। ভোর-ভোর লবগেরাম। চাকরি খুব সুখের সদু! তবে দুখও আছে।

সদু কলসী নিয়ে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হল।

বললে—দুখ আবার কী? সেটো কী বটে?

—ঘুম হয় না।

—ক্যানে? কলসীটা সে নামালে।

—ভাবি—ঘরে একা শুয়ে তু গুনগুন করছিস—

চৈত মাসে শিবদুগ্যা গাজনে নাচে জোড়ে।
এ হেন সুখের দিনে আমার বঁধু নাইকো ঘরে!

—মরণ। দায় পড়েছে আমার! অ্যাই—অ্যাই—ই ছোঁড়ার কাণ্ড দেখ।

—অ্যাই—অ্যাই, ওরে নেতাই অ্যাই—! ঘরের ভিতরের দিক লক্ষ্য করে কথা বলছিল সদু বউ। সে ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকল।—ভাঙবে রে, ভাঙবে।

ঘরের ভিতরে নিতাই শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। প্রচুর পরিমাণে মহুয়া ফুল খেয়ে বেশ যেন নেশায় মেতে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙে এখন সে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে দু-হাতে একটা জলসুদ্ধ ছোট কলসী তুলে খাচ্ছিল—জলে তার বুক মুখ ভাসছিল। মা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই কলসীটা হাত থেকে খসে পড়ে ভেঙে গেল।

সদু বললে—ভাঙলি তো ?

ধুলামাখা গায়ে জল পড়ে চিত্রবিচিত্র নিতাই হি-হি করে হাসতে লাগল।

—হাসছে দেখ ক্ষ্যাপার মতো। অমনি করে মৌফুল খায় ? ছেলে একেবারে মদখেগো মাতালের মতো লাটাচ্ছে।

ছেলেটা তবু হাসতে লাগল।

দীনু ঘরে ঢুকে বললে—বকিস না এখন। আমানি খেতে দে ওকে। ঠাণ্ডা হবে। আর ঘুমুক ; ঘুমুতে দে।

দেওয়ালের গায়ে ইতিমধ্যেই ক্যালেণ্ডারটি টাঙানো হয়েছিল, সেখানা খানিকটা বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। সেখানা সোজা করতে এগিয়ে গেল দীনু। বললে—এই দেখ, এটা আবার বেঁকালে কে ?

সেখানা সোজা করে একটা ভাঁড় থেকে হাত চুবিয়ে খানিকটা তেল নিয়ে মাথায় ঘষতে ঘষতে বললে—আমি চান করে আসি। ভাত খেয়ে খানিকটা শোব। বুঝলি ?

সদু বলে উঠল—ওই—ওই—এই দেখ—ই হারামজাদার আবার কাণ্ড দেখ।

নিতাই জল-পড়া জায়গাটায় কাদার উপর শুয়ে পড়ছিল।

এবার দীনু তার হাতে ধরে ঝাঁকি দিয়ে টেনে বললে—নাঃ, তোকে আর দু-চার চড় না দিলে চলছে না। বড় বেয়াড়া হয়ে গেলি। ওঠ। চল—চল আমার সঙ্গে চান করবি চল। নেতাই !

—যা, আমি যাব না।

—নেতাই ! এবার একটা ঝাঁকি দিলে দীনু।

নেতাই থু থু করে থুথু দিয়ে দিলে।

—নেতাই ! ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠল দীনু।

নেতাই আবার থুথু দিলে।

দীনু ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে নিষ্ঠুর ক্রোধে হাত তুললে—মারবে সে ছেলেকে।

সদু ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে আটকালে।—না—না—না।

—না—না—ছাড়। তুই ওর মাথা খেলি।

—আমার তিনটে মরে ওই একটা। তোমার পায়ে পড়ি।

—সে তিনটে বুঝি আমার ছিল না ? আমার বুঝি আরও তিনটে আছে ? ছেড়ে দে, সদু ছেড়ে দে।

সদুকে ঠেলে ফেলে নিতাইকে ঝাঁকি দিতে দিতে সে নিয়ে চলে গেল।

সদু বেরিয়ে এল দাওয়ায়। নামতেও গেল। কিন্তু কী ভেবে দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দিয়ে জল পড়ল না।

উঠানের পলাশ গাছটা থেকে একটি একটি করে ফুল ঝরে পড়তে লাগল।

হঠাৎ সদু এক সময় যেন সচেতন হয়ে উঠে ঘরের ভিতর ঢুকল এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাপড়ে

ঢেকে কিছু নিয়ে বেরিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে উঠল।

তাদের ঘরের মতোই ঘরদোর।

ডাকলে—বিলাসী! অ বিলাসী!

বিলাসী ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দিলে—কে?

—আমি লো। সদু। শোন একবার।

—কী? বেরিয়ে এল বিলাসী।

—এই এঁচোড়টো তু লে ভাই।

—ক্যানে? আমার তো রয়েছে। আমার রাখু যে তোর নেতাইয়ের সঙ্গে ছিল। বাবুদের বাগানে দুজনাতে একসঙ্গে ঢুকেছিল যে। রাখু দুটো এনেছে।

—জানি। কিন্তু নেতাইয়ের বাবা আজ খুব এগেছে। এর ওপরে যদি জানতে পারে যে পরের বাগান থেকে চুরি করে এনেছে তা হলে আর অক্ষে থাকবে না! তু আখ ভাই। বরং ব্যান্নন এঁধে একটুকুন দিয়ে আসিস। বুঝলি। যাই ভাই আমি।

এঁচোড়টা ফেলে দিয়ে সে দ্রুতপদে ফিরে এল বাড়ি। সেখান থেকেই দেখতে পেলে খানিকটা দূরে দীনবন্ধু স্নান সেরে ছেলেকে স্নান করিয়ে কোলে করে নিয়ে ফিরছে। বাপ ছেলেতে ভাব হয় নি, ছেলে কাঁদছে, বাপের আর তোষামোদের বাকি নেই। ছেলেকে শালুক তুলে গলায় মাথায় জড়িয়ে জড়িয়ে দিয়েছে। মধ্যে মধ্যে চিবুকে কাতুকুতু দিয়ে হাসাতে চেষ্টা করছে।

সদু তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ভাত বাড়তে বসল।

ভাত বাড়তে বাড়তেই শুনলে—দীনু বলছে—বুঝলি কি না, তারপরেতে গোয়াল ঘরটা এবার তৈরি করেই আসছে বার একখানা কোঠাঘর করব। সোন্দর কোঠাঘর। চাকুরি তো ধর আত্তিরে। তাও নটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ঘুমুতে পাব। বাস, সকালে এসে দিবেলোকে ঘর ছাউনির কাজ করতে পারব। দেয়াল বাড়ুইয়ের কাজ করতে পারব। চাকরির মাইনে পনেরো টাকা—ইদিকে সে ধর দিন এক টাকা। তিরিশ টাকা। ভাবনা কী! তোকে পাঠশালাতে ভত্তি করে দোব। নাইট ইস্কুলে। বুঝলি! হঁ্যা, দিনে কাজ করবি। তোকে আমি আজ মিস্তিরীর কাজ শেখাব, বুঝলি। তা-পরেতে তোর বিয়ে দোব। হঁ্যা—। ওই পাশে তখন আর একখানা কোঠাঘর করব।—

সদু স্থির হয়ে শুনছিল। আনন্দে তার হাত অসাড় হয়ে গিয়েছিল। মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে দুটি চোখ দিয়েও গড়িয়ে এসেছিল জলের ধারা।

হঠাৎ চাল থেকে থপ করে একটা টিকটিকি মেঝের উপর খসে পড়ে তার এই তন্ময়তার আবেশ ভেঙে দিল।

ভয় পেয়ে যেন চমকে উঠল সদু, মৃদু স্বরে বললে—মা গো। তারপরই বললে, মর মর। যাঃ—যাঃ।

টিকটিকিটা পালিয়ে গেল।

সন্থুর হাত দ্রুত চলতে লাগল।

দু থালা ভাত দু হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে এল।

তখন দীমু ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে। নিতাই শান্ত হয়েছে—শালুক ফুলের ডাঁটিটা পাক দিয়ে মাথায় বাঁধছে, আর বলছে, আমাকে একটা দু চাকার গাড়ি কিনে দিস বাবা!

—দোব। বড় হ। দোব কিনে। আমি বুড়ো হলে পেনসিল্ লোব—তোকে ডাক-হরকরার চাকরি করে দোব। তু দু চাকার গাড়িতে চেপে সোঁ—সোঁ করে ডাক নিয়ে চলে যাবি।

সন্থু হেসে বললে—তাই দেবে। এখন ভাত খাও।

দীমু এসে ভাতের থালার সামনে বসে বলতে লাগল—আমার মতো জ্যোস্না নাই, আঁধার নাই, খরা নাই, বর্ষা নাই, জল নাই,.ঝড় নাই, শীত নাই, ওই সুঁদীপুরের ভূতের ভয়ে ধুকুর-ধুকুর করে—

জ্যোৎস্নালোকিত বটতলা ও অরণ্যভূমির মধ্য দিয়ে দীমু ডাক নিয়ে চলে যায়।

অন্ধকার রাত্রিতে চলে যায়।

চলে গেলেই বটগাছে খরখর শব্দ ওঠে, ঝরঝর করে কিছু ঝরে পড়ে।

ঝড় ও বিদ্যুতের মধ্যে পার হয়ে যায় দীমু।

কোনো দিন দূরে শেয়াল ডাকে। কোনো দিন কুকুর ডাকে।

আধো-জ্যোৎস্না আধো-মেঘলার মধ্যে যেদিন যায়, সেদিন ময়ূর ডাকে।

শেষ চলে শীতের রাত্রে।

সেদিন প্রথমেই মাঠে কাটা ধান দেখা যায়। আকাশে জ্যোৎস্না। মধ্যে মধ্যে গাড়ির আঁট দেখা যায়। গোরুর গাড়ি খুলে দিয়ে পথে গাড়োয়ানেরা বিশ্রাম করে। মাঝখানে আগুন জ্বলে। তারপর আরণ্যভূম আরম্ভ হয়। সুঁদীপুরের বটতলা আসে। সেদিন ঝরঝর করে তার মাথাতেই ঝরে পড়ল কিছু। গাছে খরখর শব্দ উঠল। দীমু থমকে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে ডাকটা নামিয়ে লাঠিটা খুলে নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে একটা ঝুলে-পড়া ডালে সজোরে মারলে লাঠি।

ধপ করে কিছু পড়ল। দীমু ঝুঁকে দেখে সেটার লেজ ধরে টেনে তুললে। সেটা বেঁজি জাতীয় জানোয়ার। নাম খটাস্। গাছেই ওদের বাসা। সারা রাত্রি গাছের ফল খায়—মানুষ গেলেই ডালে ডালে ছুটোছুটি করে। সেটাকে নিয়ে—ডাক কাঁধে তুলে আবার ছুটল দীমু।

এসে উঠল বোলপুর পোস্টাপিসে। ভিতরে সেই টেলিগ্রাফের টক-টক শব্দ। চিঠিতে মোহর মারার শব্দ উঠছে। বাইরে একটা আলো জ্বলছে। দীমু ডাক নামিয়েই সোৎসাহে বললে—মাস্টারবাবু!

—দীমু?

—হুঁদীপুরের বটগাছের ভূত মেরে এনেছি দেখেন।

—ভূত মেরে এনেছিস ?

—এই ছাখেন না কেনে ?

মাস্টার পিওন সব ভিড় করে এল।

—এটা কি রে ?—এঁ্যা !

—খটাস জানোয়ার মশায়! বুঝেছেন না, বেটারা গাছে একেবারে গেরান শহর বানিয়ে বাসা বেঁধেছে। এতে বেটাদের মাতন লাগে। ফল খেয়ে বেড়ায়, ঝাঁপাঝাঁপি করে, নিচে দিয়ে মানুষের সাড়া পেলেই হুড়মুড় করে ছুটে পালায় গাছের কোটরে। থরথর শব্দ ওঠে গাছময়; আর পাকা ফল ঝরে ঝরঝর করে। কারুর মাথায় জলত্যাগ করে দেয়। আজ এক বছর মশায়—রাম রাম রাম রাম বলতে বলতে পার হয়েছি। বুক ঢিপঢিপ করেছে। সে কী বলব বাবু! আজ বুঝেছেন না, জ্যোস্তা ছিল, আর চোখে হঠাৎ পড়ে গেল। দেখি একটা ঝুলে-পড়া ডালে ছোট মতো কালো পারা কী নড়ছে—চোখ দুটো জুগ-জুগ করছে। আমি মশায় ডাক নামিয়ে—লাঠিখানা নিয়ে—জয়কালী বলে দিলাম ঝেড়ে। আর ধপাস করে পড়ল বেটা—।

হা-হা করে হাসতে লাগল সে।

মাস্টার বললেন—চামড়াটা আমাকে দিস, বুঝলি? নুন দিয়ে বায়েনদের দিয়ে—পাঁঠার চামড়া যেমন করে দেয়—তেমনি করে দিস। কেমন ?

—দোব আজ্ঞে। নিশ্চয় দোব।

মাস্টার বললেন—তোর তো একবছর হয়ে গেল কাজ ?

—আজ্ঞে তা হল।

—আর একটা কাজ করবি? এখান থেকে ইস্টিশানে ডাক নিয়ে যাবি, আবার নিয়ে আসবি। এখানে ঘুমোস, ইস্টিশানে ঘুমুবি। তবে হ্যাঁ—একঘণ্টা দু ঘণ্টা বেশী জাগতে হবে। পারবি? মাইনে আরও দশটাকা পাবি।

ইতিমধ্যেই আরও চার-পাঁচজন হরকরা ডাক নিয়ে হাজির হল।

মাস্টার পিওন এরা ঘরে ঢুকল। মাস্টার দ্রুত গিয়ে টেলিগ্রাফে হাত দিল। পিওনেরা কাজে বসল। মোহর করা চলতে লাগল। দীনুর ডাক কাটা হতে লাগল। দীনু বসল।

বাইরে অন্য ডাকহরকরারা খটাসটাকে ঝুলিয়ে দেখতে লাগল।

একজন বললে—দীনু বাহাদুর বটে বাপু!

—হুঁ হুঁ—শুধু দীনু নয়, দীনবন্ধু !

—খটাস মেরে নতুন চাকরি হয়ে গেল। চামড়া দিয়ে কাজ হাঁসিল।

—আমি একটো কাঠবিড়ালি মেরে আনব, দাঁড়া।

ভিতর থেকে পিওন ডাকলে—ডাক আন, সব কী গজর-গজর করছিস? ডাক আন। স্টেশনে যেতে হবে। ডাকগাড়ির সময় পাল্টেছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট এগিয়ে এসেছে। ডাক আন।

দীনু স্টেশনে সেদিন ডাক নিয়ে গিয়ে—ডাকগাড়ি দেখে অবাক হয়। এত আলো! এত লোক!

পরের দিন সকালে ডাক পৌঁছে দিয়েই বাড়ি ফিরে সন্নুকে বললে।—সন্নু তখন ঘর নিকুচ্ছিল। পাশে একটি মাচাতে লাউয়ের লতা উঠেছে। লাউ ঝুলছে। চারিদিকে একটি স্বল্প সমৃদ্ধি ও শ্রী যেন ফুটি-ফুটি করছে।

গোয়াল ঘরটা তখন সম্পূর্ণ; চালের উপর নতুন খড় ঝলমল করছে।

দীনু ঘরের দিকে তাকিয়েই বললে—সন্নু!

—হুঁ। সন্নু নিকিয়েই চলল।

—হুঁ নয়, হুঁ নয়। শুধু হুঁ বললে হবে না।

—তবে কী বলব? কী হল?

—হুঁ-হুঁ—হুঁ-হুঁ বলতে হবে। এবারে কোঠা ঘর। ঘর হয়ে গেল। ফের নতুন চাকরি। বোলপুরেই পোস্টাপিস থেকে ইস্টিশানটুকু ডাক নিয়ে যেতে হবে আসতে হবে। এই পো-খানেক পথ। বাস্ দশটাকা মাইনে। আর সে ডাকগাড়ির সে কী শোভা সন্নু! ডাকগাড়ির কী শোভা! কী আলো! কত লোক! ঝলোমল করছে। কলকল করছে। ওঃ নয়ন সাথক হয়ে গেল।

ঘর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল নিতাই।

—আমাকে একটো পেণ্টুল—হাফ পেণ্টুল কিনে দিতে হবে বাবা। সে গলা ধরে ঝুলে পড়ল।

দীনু কোলে তুলে নিলে।

সন্নু বললে—আগে বড় ঘরের চাল ঝেড়ে ছাওয়া হোক, দাঁড়া।

দীনু বললে—হবে। হবে। সব হবে। আজই খড় বায়না করব। ধারে লোব। দুমাসে শোধ দোব। কুছ পরোয়া নাই। পেণ্টুলও আমি কাল এনে দোব বোলপুর থেকে।

নিতাই বললে—লোটন কাকা কী বলে জান? কুছ পরোটা নেহি। বলে হি-হি করে হাসতে লাগল।

দীনু এগিয়ে গেল মাচায় দিকে। একটি লাউ তুললে।

সন্নু বউ তখন নিকোনার কাজ শেষ করে উঠছে। বললে—আহা-আহা কচি কচি—এখনও অনেক বড় হবে।

—পায়েস করতে কচিই ভালো। মাস্টারমশায়কে দিতে হবে, পায়েস করে খাবে। বুঝলি? নতুন চাকরিটা পেলাম! আর সনজেবেলা একটা নিয়ে যাব বোলপুরের মাস্টারের জন্যে। আমি দিয়ে আসি দাঁড়া।

নবগ্রাম পোস্টাপিসের সামনে ইট চুন সুরকি পড়ে আছে।

মাস্টার ঘরের মধ্যে কাজ করছেন। সুরেশ বাঁড়ুজ্জে বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছে।

রামলাল চিঠির থাক গোছাচ্ছে ঘরের মধ্যে। দীনু বারান্দা অতিক্রম করে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

—মাস্টারমশায়!

—অ্যাঁ?

দীনু লাউটি নামালে।

রামলাল বললে—লাউ? এ যে নেহাত কচি রে।

—আজ্ঞে আমার গাছের। মাস্টারমশায় পায়েস করে খাবেন।

মাস্টার ঘুরে তাকালেন।—কিন্তু তোর পাঁঠা কী হল রে? লাউ দিয়ে সারছিস?

—আজ্ঞে না। এবারেই ধরম-পূজোতে, এই বোশেখ মাসে। সে-পাঁঠা আমি যতন করে খাইয়ে-দাইয়ে বেশ পুরুষ্টু করে রেখেছি।

সুরেশ এসে ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে বললে—তার আগেই যে মাস্টার চলে যাচ্ছে।

—চলে যেছেন?

—আমার বদলির হুকুম হয়ে গেছে দীনু। মাস্টার বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।

রামলাল বললে—এই সপ্তাহেই চলে যাবেন।

সুরেশ বললে—দে দে, তার আগেই লাগিয়ে দে বাবা! ধরমের নামের পাঁঠা দে গাজনেই শিবের কাছে—খাজ্জিং জিং জিং করে দে। বলো শিবো ধরমজ্জো—যে ধরম সেই শিব।

দীনু বললে—আপুনি চলে যেছেন বাবু! হতাশার সুরে অকৃত্রিম বেদনার সঙ্গে কথা কটি বললে সে।

মাস্টার বললেন—চাকরির এই নিয়ম দীনু। তোদের পোস্টাপিস বড় হল—সাব-পোস্টাপিস হল;—দেখছিস তো—ইট চুন সুরকি এসেছে, পাকা থামের বারান্দা হবে। পাকা মেঝে হবে। আমি ব্র্যাঞ্চ পোস্টাপিসের মাস্টার, এখান থেকে চলে যেতে হবে। আবার যে আসছে—সেও দু বছর চার বছর থেকে চলে যাবে। আবার নতুন মাস্টার আসবে। এই নিয়ম।

সেই নিয়মানুসারে—নতুন পোস্টমাস্টারকে দেখা যায় নবগ্রাম পোস্টাপিসে।

মাস্টার খিটখিটে ডিস্‌পেপটিক লোক। বয়স হয়েছে। দেখা যায় অপরাহ্ণে পাকা বারান্দায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। দেওয়ালে কতকগুলি মোটা হরফে লেখা নোটিশ টাঙানো হয়েছে—সেগুলি পড়ে দেখছেন।

"ডাক বিলির সময় কেহ ভিতরে ঢুকিবেন না। বাহিরে গোলমাল করিবেন না।"

"খাম পোস্টকার্ড টিকিট বিক্রয়ের নির্ধারিত সময়ের বাহিরে পোস্টেজ বিক্রয় হইবে না।"

"মনিঅর্ডার রেজেষ্ট্রির জন্যে নির্ধারিত সময়—১০টা হইতে ১২টা। ১টা হইতে ২টা।"

"যে কোনো কাজই থাকুক, মাস্টারমশায় বলিয়া ডাকিয়া বিরক্ত করিবেন না।"

"বিনা প্রয়োজনে পোস্টাপিসের কাউণ্টারে কেহ ঢুকিয়া ঘোরা-ফেরা করিবেন না। কাজে আসিয়াও তর্ক তকরার বা চিৎকার করিবেন না।"—

ঠিক এই সময়ে এক বোঝা ঘাস মাথায় করে দীনু প্রবেশ করল এবং বারান্দার অপর দিকে দুম করে ফেলে দিল।

মাস্টার চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। তারপরই সামলে নিয়ে চিৎকার করে প্রশ্ন করলেন—Who are you? What's that? কোন হ্যায় তুম? কেয়া হ্যায় উ?

দীনু বিহ্বল হয়ে বললে—হুজুর!

—কে তুমি? কে? এ সব কী?

—আজ্ঞে হুজুর, আমি দীনু ডাকহরকরা।

—দীনু ডাকহরকরা? রানার? কিন্তু এসব কী? ঘাস কেন পোস্টাপিসে?

—আজ্ঞে আপনকার জন্যে—

—What? আপনার জন্যে—? ঘাস নিয়ে কী করব আমি? আমি ঘাস খাই? আমার জন্যে—ঘাস?

—আজ্ঞে, হুজুরের গোরুর জন্যে।

—নো। নো। হুজুরের গোরু নাই। শোনো আমার গোরুটোরু নাই। ঘাস আমার দরকার নাই। ঘাস কোনো দিন চাই না আমার। এসব কোনো দিন আনবে না।

—আজ্ঞে, আর আনব না হুজুর।

—হুজুর? হুজুর কী? What do you mean by হুজুর? আমি হাকিম নই। জমিদার নই। স্যার, স্যার বলবে।

বিহ্বল হয়ে গেল দীনু। সে সভয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার!

অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে এবার মাস্টার বললেন—এখন, উঠাও! উঠাও!

দীনু মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মাস্টার বললেন—ঘাস। ওই ঘাসের বোঝা। উঠাও। বাইরে ফেলে দিয়ে এস! যাও!

দীনু ঘাসের বোঝা তুলে ফেলতে গেল।

মাস্টার রাস্তার দিকে সুমুখ ফিরলেন।

ফিরেই দেখলেন—কম্পাউণ্ডের সীমানায় দাঁড়িয়ে সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

বললেন—কী চাই? এখন পোস্টাপিস বন্ধ। কাল সকালে—To-morrow morning please, এখন যান। তারপর দীনুকে বললেন—আরও বাইরে দীনু—আরও বাইরে ফেলো; Outside the compound—

বলেই ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দেন।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে দীনুকে বললে—লোকটার কিছু হজম হয় না দীনু।

দীনু বললে—ওরে বাপরে, সাক্ষাৎ দুর্ব্বাসা মুনি গো।

আবার পোস্টামাস্টার বদল হয়। নতুন পোস্টমাস্টার বন্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। পোস্টাপিসেরও পরিবর্ত্তন দেখা যায়। পোস্টাপিসের আর খড়ের চাল নাই। এ্যাজবেস্টস

বা টিন হয়েছে। দেওয়ালের নতুন পলেস্তারা হয়েছে ; লেটার বক্সের মুখটি এখন পিতলের, ঝকঝক করছে। নোটিশ বোর্ডটিও নতুন। যে জানালায় পোস্টেজ বিক্রি হত মনিঅর্ডার হত, সে জানালাটি এখন Expanded metal দিয়ে ঘেরা হয়েছে ; কাউন্টারের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দেওয়ালের গায়ে পুরানো মাস্টারের টাঙানো নোটিশবোর্ডগুলির আর একটিও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তার পরিবর্তে মোটা রকম কয়লা দিয়ে কেউ লিখে দিয়েছে—দুর্বাসা gone।

দরজা খুলে নতুন মাস্টার বেরিয়ে এলেন। পিছনে সুরেশ। বেশ নধর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, পান চিবুচ্ছেন আর হুঁকো টানছেন। এবং ঘন-ঘন ফু ফু করে করে কিছু, বোধ করি পানের কুটি, জিভের ডগা থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন। বেরিয়ে এসেই পচ্ করে পানের পিক্ ফেললেন, একবার ফু-ফু-ফু করে নিয়ে বার কয়েক হুঁকোয় টান দিলেন। দীনু তাঁকে প্রণাম করলে। মাস্টার দেওয়ালের লেখাটা অর্থাৎ 'দুর্বাসা gone' পড়ে খি-খি শব্দে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন—কী বললেন সুরেশবাবু, দীনু দুর্বাসা নাম দিয়েছিল? এঁ্যা, দীনবন্ধুর পেটে পেটে এত?

আবার মাস্টার পরিবর্তন হয়।

এবার পোস্টাপিসের পরিবর্তনের মধ্যে সামনে একটি সুরকিঢালা রাস্তা এবং বাউণ্ডারীর চারিপাশে ফেন্সিং দেখা যায়। বাকি সব তাই আছে।

কম্পাউণ্ডের মধ্যে একখানি টপরওয়ালা গাড়ি নামানো। গরু দুটো ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে।

পুরোনো হৃষ্টপুষ্ট পান-খেকো তামাক-খেকো মাস্টার চলে যাচ্ছেন। বারান্দায় টিনের ট্রাঙ্ক, দড়ি দিয়ে বাঁধা পুরানো চামড়ার সুটকেস, প্যাকিং বাক্স, বিছানার বাণ্ডিল নামানো। সেগুলির বাঁধন পরীক্ষা করে দেখছে পিওনেরা। পিওন এখন দুজন। ভবেশ এবং হরিহর। দীনু জিনিসগুলি গাড়িতে তুলছে। গাড়িখানা দীনুরই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন নতুন পোস্টমাস্টার নিত্যানন্দবাবু। আর দাঁড়িয়ে আছে নিত্যানন্দবাবুর পনেরো-ষোল বছরের ছেলেটি। সুন্দর দেখতে, ভালোবাসার মতো ছেলে।

পুরানো মাস্টারের হাতে হুঁকোটি আছে। পচ্ করে পিচ ফেলে বার দুই ফু-ফু করে বললেন—চলি ভাই নিত্যানন্দবাবু, good-bye. কোনো ভাবনা করবেন না। জায়গা ভালো। ফু-ফু-ফু। ওর নাম কী—এরা লোক ভালো। ভবেশ হরিহর good man সব। ভবেশ শুধু দূরের গ্রামের চিঠি এর ওর হাতে দিয়ে দেয়—বলে, দিয়ে দিয়ো। মধ্যে মধ্যে কমপ্লেন হয়। ফু-ফু। আর হরিহর বাসায় গেলে ফিরতে দেরি করে। Newly married কিনা। দ্বিতীয় পক্ষ।

হরিহর বললে—কী যে বলেন বাবু!

পুরানো মাস্টার গ্রাহ্য না করেই বলে গেলেন—আর দীনু, দীনবন্ধুর জয়জয়কার হোক। ওর ঋণে পড়তেই হবে। আমার তো শোধই হবে না।

দীনু এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—আজ্ঞে না বাবা, উ কথা বলতে নাই, আমার অপরাধ হবে।

—হয় তো হবে দীনবন্ধু, সে তোর হবে। কিন্তু আমি না বললে অপরাধ আমার হবে। উহু-উঁহু ভবেশ, ভেঙে যাবে বড় সাধের হুঁকো আমার, ওভাবে নয়;—ওটাকে বরং বিছানার মধ্যে দাও বাবা! তারপর আবার নিত্যানন্দবাবুর দিকে ফিরে বললেন—তবে একটি বিষয়ে সাবধান। সে বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বুঝেছেন! খুব সামলে থাকবেন!

সকলেই অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। দীনু শঙ্কিত বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিত্যানন্দবাবু বললেন—You mean this runner—this chap?

—Yes—this chap, এই দীনবন্ধু, ফু-ফু-ফু! খুব সামলে থাকবেন নইলে একটি মোক্ষম নাম দিয়ে দেবে আপনার। look, দেখুন—এই দেওয়ালে। ফু-ফু-ফু!

নিত্যানন্দ দেওয়ালের দিকে তাকালেন—দেখলেন সেখানে উপরে লেখা—

দুর্বাসা gone—তারিখ 30th April 1934. তার নিচে লেখা—পাঁচুঠাকুর going—1938 15th September.

পুরানো মাস্টার ব্যাখ্যা করে দিলেন—দুর্বাসা মুনি হলেন আমার আগের যিনি, শিবেনবাবু। আর পাঁচুঠাকুর মানে ভুতে-পাওয়া-মানুষ হলাম—ফু-ফু-ফু—আমি। এ-সব নাম দীনুর দেওয়া। আপনাকেও একটি দেবে—ফু-ফু-ফু! মানে—

হঠাৎ ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন—যাও তো বাবা খিলিকয়েক পান নিয়ে এস তো। আর কড়া জর্দা থাকে তো খানিকটা। হ্যাঁ।

ছেলেটি চলে যেতেই মাস্টার বললেন—আমার পুত্র পরিবার নাই, কিন্তু আপনার ছেলে, সে তো ধরুন—আমারও সন্তান-তুল্য। ফু-ফু-ফু! ওর সামনে বলব কেমন করে যে মদ খাই আমি। সন্ধ্যেবেলা কাজ-টাজ সেরে বুঝলেন—কর্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলা আমি মশাই কারণ একটু পান করি। ফু ফু—একটু মানে বেশ। এখানে আবার ওই সুরেশটা জুটেছিল। মধ্যে মধ্যে—ফু-ফু—বে-এক্তার হয়ে বমি-টমি করে সে নরকে পড়ে থাকতাম। সকালবেলা এ নিজেরই ঘেন্না হত বিছানা দেখে। কী করব, নিজেই কাচতাম। কাকে বলব? তা দীনু একদিন দেখে ফেলে। ফু-ফু-ফু! সেই দিন থেকে ও আমাকে একদিনও আর ওসব নাড়তে দেয় নি। কাচত আর বলত—পাঁচু-ঠাকুর আমার দুধ তুলেছেন। ফু ফু-ফু—খুব সাবধান, আপনারও একটা নাম দেবে।

বলেই তাঁর মার্কামারা খি-খি-খি হাসতে লাগলেন।

সে-হাসির ছোঁয়াচ লাগল সকলকে। মায় দীনু পর্যন্ত মুখ নামিয়ে খুথ-খুথ শব্দে হাসতে লাগল।

মাস্টার জের টেনে বললেন—বলে কী, পাচুঠাকুর আমার মুখ তুলেছেন!

বলেই আবার হাসি—অর্থাৎ আমি পেঁচোয় পাওয়া কচি ছেলে।

এই মুহূর্তটিতেই পোস্টাপিসের ভিতর থেকে ক্লক ঘড়ি বেজে উঠল—ঢং ঢং ঢং ঢং।

মাস্টার চমকে উঠলেন—এ কি চারটে? হ্যাঁ চারটেই তো! ওরে বাপ রে, দশটার যে ট্রেন রে বাবা। ও দীনু, ছেলে তোর এল কই? ফু-ফু-ফু—স্টেশনে ভাপাতে হবে রে বাবা।

নিত্যানন্দবাবু বললেন—রাস্তাও যে অনেকটা। দশ মাইলের উপর। আর তো দেরি করা উচিত নয়।

ভবেশ পিওন বললে—তোরও যেমন কাজ দীনু, ছেলে গাড়ি নিয়ে যাবে তাকে রেখে তুই গাড়ি আনলি।

দীনু চঞ্চল এবং অপ্রতিভ হয়ে উঠল। বললে—এল না গো কিছুতেই, বললে—তুমি গাড়ি নিয়ে যাও; আমার কাজ আছে থানিক—

হরিহর বললে—কাজ তো বেটার টেরি কাটা আর হৈ-হুল্লোড় করা। কাজ আছে! দেখ দেখ এগিয়ে দেখ।

দীনু সদর রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল দেখবার জন্যে; যেতে-যেতেই বললে—কী করি বলেন? সময়টা যে আমাদের ভাঁজো পরবের কিনা। প'শু থেকে পরব আরম্ভ। সে আবার পরবের মাতব্বর! তারপর যেন নিজেকেই বললে—কানে কিলিয়ে বলে দিলাম। বললে—আমি গেয়েছি বলে—। ঠিক টায়েনে যাব আমি—

সে এসে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে উদ্গ্রীব হয়ে ঘাড় উঁচু করে সামনের দিকে চেয়ে রইল। সামনে তার বাজারের রাস্তাটা। লোকজন চলছে, বিচিত্র নিঃশব্দ বাজারের সে-ছবি। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও নিতাই নেই।

এদিক থেকে হরিহর ব্যঙ্গ করে বললে—ঠিক টায়েনে যাব; বেটার ট্যাকে যেন ঘড়ি ঝুলছে দশটা।

ইতিমধ্যে নিত্যানন্দবাবুর ছেলে পান এবং দোক্তা নিয়ে এসে দাঁড়াল। পুরানো মাস্টার সেগুলি ডিবেতে পুরতে লাগলেন, একটা পান একটু দোক্তা মুখে নিয়ে পচ্ করে পিক্ ফেলে বললেন—আঃ, এ যে খাস মতিহার!

দীনু বলে উঠল—ওঃই,—ওঃই এসে যেয়েছে। দূরে বাজারের মধ্যে একখানা সাইকেল দেখতে পেয়েছে সে। নিতাই আসছে সাইকেল চড়ে।

নিশ্চিন্ত হয়ে সে ফিরে এসে গাড়ির চারিদিক দেখে নিয়ে বললে—আর কিছু পড়ে-টড়ে নাই তো বাবু?

বলতে বলতেই সদর রাস্তায় সাইকেলে চড়ে এসে হাজির হল দীনুর ছেলে নিতাই। আঠারো-উনিশ বছরের সদ্যযুবক নিতাইচরণ। মাথায় খুব বাহারের শৌখিন টেরি। গায়ে একটা বাহারের গেঞ্জি। গলায় একটা তক্তি। কব্জিতে একটা কারের বেড়। পরনে

টাইট করে মালকোঁচা বেঁধে কাপড়। কানে একটা পোড়া সিগারেট। সাইকেল চালিয়ে এল সে এবং তার পিছনে চড়ে এল আর একটি সঙ্গী। সাইকেল থেকে নেমেই সাইকেলটা তার সঙ্গীর হাতে দিয়ে বললে—নাই বারোটা আত হতে আমি নিচ্ছক ফিরব। বুল্লি! তু সব ঠিক করে আকিস। অভীন কাগজের মালা যেন ভালো করে গাঁথবি। উ পাড়ার চেয়ে ভালো হ'চাই। হাঁ! সঙ্গী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সাইকেলে চড়ে চলে গেল।

দীনু তিরস্কারের সুরেই বললে—তোর আক্কেলটা কেমন বল দিই নি? চারটে বেজে গেল। আমরা ভেবে সারা!

নিতাই উপেক্ষাভরে বললে—চারটে বাজল তো কী হল! কাজ থাকলে করব কী? আক্কেল আক্কেল! আমার নাই!

তারপর খোলা গোরু দুটোর গলার দড়ি দু হাতে ধরে গাড়ির দিকে টেনে আনতে আনতে আপন মনে গজর-গজর করতে লাগল—কোন সময়ে কোন তাল তার ঠিক নাই। প'ও থেকে ডাঁজো পরব। আজ যা বোলপুর গাড়ি নিয়ে।

দীনু বললে—লে-লে, গাড়ি তোল। মেজাজ খারাপ করিস না।

নিতাই একটা গোরুকে পিঠে হাতের গুঁতো দিয়ে বললে—বেকুব বেহদ্দা গোরু কোথা-কার! ইদিকে। ইদিকে। অঁই—অঁই—। আবার দিলে গুঁতো। টেনে নিয়ে এল সে গোরু দুটোকে, গাড়িতে বাঁধলে—তারপর বললে—ল্যান—চড়ে বসেন।

পুরানো মাস্টার পচ্ করে পিচ ফেলে গাড়িতে পা দিয়ে বললেন—মিলিটারি মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা কর বাবা নিতাই! ভয় লাগছে আমার!

নিতাই হেসে ফেলে বললে—ল্যান—ল্যান চড়েন। মেজাজ খারাপ করে দেয় বাবা। ছাথেন ক্যানে—।

মাস্টার চড়ে বসে বললেন—চলি নিত্যানন্দবাবু, নমস্কার। ভবেশ হরিহর—

নিত্যানন্দবাবু বললেন—নমস্কার!

ভবেশ হরিহর হেঁট হয়ে নমস্কার করলে। দীনুও করলে।

নিতাই গাড়িতে উঠে গোরু দুটোর পেটে দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের গুঁতো এবং পিঠে আঙুলের টিপুনি দিয়ে—নাকে ঘড়র এবং জিভে ক্যা-ক্যা শব্দ করে গাড়িটাকে চালিয়ে দিলে।

মাস্টার নিত্যানন্দবাবু বললেন—এইটিই তোমার ছেলে দীনবন্ধু?

দীনু বললেন—আজ্ঞে হাঁ।

—ওই একটিই ছেলে বুঝি!

দীনু অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললে—আজ্ঞেন তাই বটে। কটা ছেলে মরে ছেলেটা হয়েছিল—মায়ের আদরে খানিক বেয়াড়া হয়ে যেয়েছে। তার ওপরে এখানে এয়েছেল একজনা ট্যাক্সিওলা—তার কাছে মোটর ধ'মোছা করতে লেগে অমুনি হল। বলে মোটর চালা শিখব। আর ওই বদ মেজাজ—

হরিহর বলে উঠল—শুধু ছেলের দোষ দিলে কী হবে? মায়ের দোষ দিলেই বা হবে ক্যানে? তুমি আদর কম দাও নেকি? ছেলে বললে সাইকেল লেবে—তাই দিয়ে দিলে—

—সি আজ্ঞে পুরনো সাইকেল—। তিরিশ টাকা নিয়ে দিলেন ওপরস্তার বাবু—

—খুব সস্তায় দিয়েছে ওভারসিয়ারবাবু! ওটা ফেলে দিলে কেউ নিত না। নতুনে পঁচাত্তর টাকা দাম। চড়েছে আট বছর—। বুঝেচেন বাবু, দীনুর স্বভাবই ওই। ছেলে বলতে অজ্ঞান। এই বয়সে একটা মেয়ে হয়েছে। তার নাম রেখেছে সম্মানী! ওঃ, তার আবার কত! ব্যঙ্গ করে হলেও মিষ্টভাবেই বললে সে কথাটা। ঠিক এই মুহূর্তটিতেই সদর রাস্তায় হন্তদন্ত হয়ে এল সুরেশ বাঁড়ুজ্জে। থমকে দাঁড়িয়ে সে কম্পাউণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললে—এই যাঃ। চলে গেল মাস্টার?

বলেই ছুটতে লাগল—মাস্টার! মাস্টার! মাস্টার হে!

ভবেশ বললে—বাঁড়ুজ্জে বোলপুর পর্যন্ত যাবে তুলে দিতে।

নিত্যানন্দবাবু বললেন—এই বুঝি সুরেশ বাঁড়ুজ্জে?

ভবেশ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

একজন রানার ডাক নিয়ে এসে ঢুকল।

হরিহর বললে—রামনগরের ডাক এসে গেল—।

মাস্টার পোস্টাপিসের ঘরের দিকে ঘুরলেন।

দীনু রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

হরিহর এবং ভবেশের কথায় মনে সে আঘাত পেয়েছিল। নিতাইয়ের কথায়-বার্তায় ভদ্রজনদের কাছে সে অপ্রস্তুতও হয়েছে। এই দুইয়ের প্রতিক্রিয়ায় রাগ হয়েছে তার সতুর উপর। ফেরার সময় পদক্ষেপের ভঙ্গিতেই সে রাগ তার একটু পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ফিরছিল সে তাদের পাড়ার পথ ধরে।

রাঢ় বাংলার অচ্ছুত পল্লী।

মাটির দেওয়াল—খড়ের চাল—বাঁশের খুঁটি-দেওয়া পরচালা বা বারান্দাওয়ালা ছোট ছোট ঘর। উঠান রাঙা মাটি দিয়ে নিকানো। চারিপাশে কোনো পাঁচিলের ঘেরা নেই। তারই মাঝখান দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ।

পথের ওপর উলঙ্গ ছেলেরা ঘুরছে, খেলছে। পতিত জায়গায় ছাগল চরছে।

বাড়ির উঠানে মুরগী চরছে। একপাশে গোরু বাঁধা রয়েছে। কোনো বাড়ির উঠানে কোনো মেয়ে কোনো মেয়ের উকুন বাচছে। কোনো বাড়িতে চালায় ঢেঁকিশালে মেয়েরা ধান কুটছে।

পথের ধারে পুকুরে হাঁস চরছে। পথের পাশে একটু দূরে একটি উৎসবের আয়োজন দেখা যায়। একটি গাছতলায় ভাঁজোর বেদী বাঁধা রয়েছে।

গাছের তলায় মাটির একটি বেদী। বেদীটিকে ঘিরে চারিপাশে চারটি খুঁটি। রঙীন কাগজ মোড়া।

সামনেটা চমৎকার করে নিকানো। সেখানে তরুণ-তরুণীরা ভিড় করে রয়েছে। একটি তরুণ ঢোল বাজাচ্ছে। একজন বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে।

কোনোদিকেই দীনুর ক্ষুব্ধ মন আকৃষ্ট হল না। সে সটান এসে উঠল বাড়ির সম্মুখে।

দীনুর বাড়িতে এখন একখানি কোঠাঘর হয়েছে। পাশে সেই গোয়াল-ঘরটি। একপাশে দুটি গাই বাঁধা।

গাছতলায় দীনুর ছ-সাত বছরের মেয়ে সম্মানী খেলা করছে।

সে কাদার তাল দিয়ে ভাত-তরকারি রান্না করছে। স্ত্রী সদু দাওয়ায় বসে রয়েছে, তার সামনে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিলাসিনী তরুণী। তাকে দেখে দীনু থমকে দাঁড়াল। তারপর বললে—মেয়েটি ক্যা রে সদু ?

সদু মেয়েটিকে বললে—রেতে এসে আবার খেয়ে যাবে। এখন ওই আথহরিদের বাড়িতে থাক গা!

দীনু আবার বললে—কে বটে মেয়েটা—? কথা কানে যায় না না কি ?

মেয়েটি ঝাপ্টা মেরে পাশ ফিরে তাকিয়ে বলল—আমি ভাঁজো নাচতে এয়েচি। নিতাই আমার বন্ধু নোক। সে আমাকে নিয়ে এয়েচে। তুমি কে ?

—ভাঁজো নাচতে এয়েছ ?

—হ্যাঁ। সিউড়ি থেকে। তুমি কে ? এমন কথা ক্যানে ?

সদু বললে—যাও মা, তুমি যাও। উ হল নিতাইয়ের বাবা।

—অ। তা এমন লাটসায়েবের মতো মেজাজ ক্যানে ?

বলেই সে যেন হেলেদুলে গা দুলিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল।

দীনু বললে—তুই—সদু—তুই এর জন্যে দায়ী!

—কী, বলছ কী ? হল কী তোমার ?

—কিছু বলি নাই। তোর ছেলে এলে বলিস ই সব চলবে না। আমার সহ্য হবে না।

বলেই আবার বলল—তারও সহ্য হবে না সদু। যা ধরমের সহ্য হয় না তা কারুর সহ্য হয় না। বলিস তাকে।

ছোট মেয়েটা খেলা ছেড়ে মা-বাপের কথান্তর শুনছিল। এখন তার বাপের কথা শেষ হতেই সে ছুটে বাপকে জড়িয়ে ধরে বললে—

—বাবা আমি ধরমপুজো দেখতে যাব।

—ধরমপুজো এখন লয় মা। সে সেই বোশেখ মাসে। এখন পথ ছাড়। যাই।

—না। তুই যে বললি। ধরম-ধরম-ধরম। আমি যাব।

—ই ধরম সে ধরমঠাকুর লয় মা। ই ধরম বড়া কঠিন মা—বড়া ভীষণ! ছাড় পথ ছাড়। চান করে এসে খেয়ে ছুটতে হবে। ডাকের দেরি হয়ে যাবে। ছাড়—সরকার বাহাদুরের ডাক!

সরকার বাহাদুরের ডাক নিয়ে দীনু চলে যায় ভাদ্র মাসের রাত্রিতে। রাত্রিটি অন্ধকার

হলেও কিন্তু বর্ষণমুখর নয়। সুঁদীপুরের বটতলা। বহুদূরে শোনা যায় ভাঁজো-পরবের ঢোলের শব্দ।

আজ চারিদিকের গ্রামেই এই ভাঁজো-পরবের উৎসব লেগেছে। বন পার হয়ে প্রান্তরের মধ্যে পথে এসে পড়ল দীনু,—সেখানেও শুনল ভাঁজো-পরবের ঢোল-কাঁসির শব্দ। এবার গ্রাম কাছে। বাজনার শব্দ স্পষ্ট। দীনু কিন্তু চলেছে তার নির্দিষ্ট গতিতে। পথে ওদিক থেকে আসছিল একদল পথিক। একজন প্রশ্ন করলে—কে ?

দীনু উত্তর দিলে—ডাক। সরকার বাহাদুরের ডাক।

বাজনা বাজতে লাগল।

নবগ্রামেও বাজনা বাজছে। ভাঁজো-পরবের আসরটি জমে উঠেছে।

সেখানে ভাঁজো-তলায় একটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে তাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে একটা হেজাক বাতি।

আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্থানটি।

ভাঁজোর বেদী সাজানো সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রচুর শালুক এবং পদ্মফুল ও নানান ফুলে সাজিয়েছে।

চারিদিকে আমের শাখা এবং কাগজের ফুল দিয়ে বেড় দিয়েছে।

মেয়েপুরুষ ভিড় করে বসেছে। মেয়েরা মাথার খোঁপায় ফুল পরেছে। গলায় মালা পরেছে।

দুটি মেয়েতে গলা-ধরাধরি করে হাসছে। পুরুষেরা রঙীন গেঞ্জি পরেছে—মাথায় রঙীন গামছা বেঁধেছে। কেউ কেউ কোমরেও বেঁধেছে। কানে ফুল পরেছে। গলায় মালা।

নিতাই মাথায় জড়িয়েছে শালুক-ডাঁটির মালা। তার সঙ্গে অন্য ফুলের মালা। কানে ফুল। গলায় মালা। সে বাজাচ্ছে বাঁশি। একজন বাজাচ্ছে ঢোল।

নাচছে বাসিনী—অর্থাৎ শহর থেকে আসা সেই রঙ্গিনী মেয়েটি। সেও সেজেছে যতখানি পারে। তার কোমর পর্যন্ত ফুলের মালা দুলিয়েছে সে।

কতকগুলি মেয়ে বসে একসঙ্গে ধুয়ো গাইছে।

> আমার ভাঁজোর গলায় দোলে পঞ্চফুলের মালা—
> কপালে সিঁদুর-টিপের ছায়ায় ভুবন আলা—
> ও-আমার ভাঁজো সুন্দরী !

তারা থামতেই সব থামল। বাজনা বাঁশি নাচ সব।

এবার গান ধরলে নিতাই—

> আমার মনের রঙের ছটা তোমায় ছিটে দিলে না।
> পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হয়—সে জল পাতা নিলে না।
> টলোমলো টলোমলো—
> হায় সখি সে পড়ে গেলো—

ও হায় চোখের জলের মুক্তোছটা মাটির বুকে ঝলে না।

মাটি হলে গলে মন—মানিক হলে গলে না।

আমার মনের রঙের ছটা—

শেষ লাইনে এসেই বাজনা বেজে উঠল দ্রুত তালে।

সঙ্গে সঙ্গে বাসিনী ওই নাচুনী মেয়েটি বেদীটিকে বেড়ে নাচতে শুরু করে দিলে।

মেয়েরা ধরে দিলে ধুয়ো। শেষ হতেই বাজনার সমের সঙ্গে আবার সব শুদ্ধ।

এবার ওই বাসিনী ধরলে গান—

যে রঙ তোমার মিশে গেল

নীল যমুনার জলে হে—

সে রঙ গিয়ে লেগেছে যে

লাল শালুকের ফুলে হে।

সেই শালুকে মন মানিয়ো—

সকল দুখো পাসরিয়ো—

খালি মনের সিঁদুর-কৌটা—

তাও দিও ফেলে হে—

নিত্য নতুন ফুটবে শালুক—

বাসি ঝরে গেলে হে॥

শেষ কলিতে এসে আবার বাজনা বাজল—বাঁশি বাজল; মেয়েটি দ্রুততালে ঘুঙুরের শব্দে মুখর করে তুললে ভাঁজো-তলা।

এর মধ্যে একসময় ভোরের পাখিদের ডাক বেজে উঠল—কলস্বরে।

সকলে তাকাল উপরের দিকে।

দেখা গেল আলোটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। রাত্রির অন্ধকার ছাপিয়ে ভোরের আলোর আভাস জাগছে। ঊর্ধ্ব-আকাশে আলোর ছটা বেজেছে। আবার বেজে উঠল পাখির ডাক। একটা গাছের মাথা থেকে পাখি পাখা মেলে বেরিয়ে পড়ল। আর একটা গাছ থেকে কাক এসে বসল পথের উপর।

পোস্টাপিসের সামনের যে সড়কটা সেই সড়কটার উপর। সামনে একটা বাঁক। সেই বাঁকের ওপারে শোনা গেল ঝুন-ঝুন শব্দ। বাঁকে মোড় ফিরে দেখা দিল দীনু ডাকহরকরা। কাঁধে ডাক নিয়ে দীনু নবগ্রাম ফিরছে।

ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন শব্দ তুলে দীনু এসে পোস্টাপিসের কম্পাউণ্ডে ঢুকবার মুখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পোস্টাপিসের পাশে একটা ঝোপের আড়ালে পোস্টমাস্টার নিত্যানন্দ বাবুর প্রিয়দর্শন ছেলেটি বৈঠক দিচ্ছে।

প্রিয়দর্শন ছেলেটির সুগঠিত সুন্দর দেহখানি সত্ত ব্যায়ামচর্চায় সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। কিশোর ছেলেটির পরিপুষ্ট পেশীগুলি থেকে একটি পৌরুষব্যঞ্জক মহিমা বিচ্ছুরিত

হচ্ছে যেন।

দীনু ডাক কাঁধে করেই এসে সেখানে দাঁড়াল। একপাশে দুটি মুগুর নামানো ছিল—সে দুটি নেড়ে দেখলে।

ছেলেটি—ছেলেটির নাম অমর—বৈঠকের মধ্যেই তাকিয়ে দেখলে দীনুকে। একটি স্মিত হাসিতে তার মুখ ভরে গেল চকিতের জন্য। তারপর আবার গম্ভীর হল সে। ব্যায়াম শেষ করে এসে দীনুর কাছে দাঁড়াল।

দীনু বললে—আপুনি রোজ করেন বাবু?

হেসে ঘাড় নেড়ে ছেলেটি সায় দিয়ে জানালে—হ্যাঁ।

দীনু বললে—ই খুব ভালো। খুব ভালো। এমন বাঁধবে শরীর!

অমর বললে—আমাকে একটু আড়াল দেখে—কেউ দেখতে না পায় এমন একটা জায়গা দেখে—একটা আখড়ার মতো করে দেবে দীনু?

দীনু খুব খুশী হয়ে বললে—দোব। তার আর কী? ওই পিছন দিকে—খিড়কীর পুকুরের উপর বটগাছের তলায়—দোব করে! আজই দোব।

—উঁ-হু। আরও একটু আড়াল চাই। বাবা যেন দেখতে না পান।

—ক্যানে বাবু? বাবু ই সব ভালোবাসেন না বুঝি?

—না। আজকাল ভদ্রলোকের ছেলে এ-সব করলে পুলিসে বড় হাঙ্গামা করে কিনা। তাই বাবা চান না। তুমি একটা ভালো জায়গা দেখে—

ঠিক এই কথাটির পরই বাড়ির ভিতর থেকে নিত্যানন্দবাবুর ডাক শোনা গেল।—ভবেশ, উঠেছ? ভবেশ! ভবেশ!

ভবেশ সাড়া দিল—আজ্ঞে!

অমর মুগুর দুটোকে নিয়ে দ্রুত চলে গেল বাড়িটাকে বেড় দিয়ে। যাবার সময় বলে গেল—বাবাকে বোলো না। কেমন?

মাস্টার বললেন বাড়ির ভিতরে—হরিহর আসে নি? ডাক? ডাক আসে নি?

দীনু ফিরল। সেও একটু চকিত হয়েছে। সে এসে ডাকঘরের বারান্দার উপর ডাকটা নামিয়ে ডাকলে—বাবু?

এদিকে সদর রাস্তা থেকে কম্পাউণ্ডে এসে ঢুকল সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

বাঁড়ুজ্জে বললে—হ্যাঁ রে দীনু, শুনে এলি কিছু বোলপুরে? যুদ্ধ লেগেছে আবার? হিটলার লাগিয়ে দিয়েছে?

পোস্টাপিসের দরজা খুলে বের হলেন নিত্যানন্দবাবু।—সুরেশবাবু! এত সকালে?

—যুদ্ধ! যুদ্ধ লেগেছে শুনছি! সারারাত কাল ঘুমুই নি।

—কাগজ? হাসলেন নিত্যানন্দবাবু।

দীনু ডাক নিয়ে ঘরে ঢুকল।

দীনু ফিরল তাদের পাড়ার পথে। তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে। সাতটা বেজে গেছে। পাড়াটা আজ নিঝুম। ভোর পর্যন্ত ভাঁজো গান করে সকলে শুয়েছে—ঘুম ভাঙে নি। পথে ছড়ানো ফুলগুলি পড়ে আছে।

অদূরে ভাঁজো-তলা।

সেখানটাও জনশূন্য। দীনু একবার তাকিয়ে দেখলে। এখনও হেজাকটা জ্বলছে।

ভাঁজোর বেদীর সাজসজ্জা ভাঙা বাসরের মতো বিশৃঙ্খল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল দুখানা পা। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে রয়েছে। দীনু সন্তর্পণে এগিয়ে গেল। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখলে গাছের ওপাশে যার পা বেরিয়ে আছে সে নিতাই-ই বটে। নিতাই একা নয়, আরও একজন রয়েছে! পরক্ষণেই শুনতে পেলে—নারীকণ্ঠে কেউ বলছে—

—বলেছি তো। গানেই তো জবাব দিয়েছি হে।

বলেই অতি মৃদু স্বরে গেয়ে দিল—নিত্যি নতুন ফোটে শালুক বাসি ঝরে গেলে হে। বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

সে বাসিনী। বাসিনী এবং নিতাই গাছতলায় গত রাত্রির সেই সাজেই গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে।

বাসিনী আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

নিতাই কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলছে।

নিতাই বলল—না। নিত্য নতুন শালুক আমার চাই না। আমি তোকে চাই।

—লারব ভাই!

—ক্যানে?

—তোমাদের যা ঘর-দুয়োর—থাকবার ছিরি—ই কষ্টে থাকতে আমি লারব।

—আমি পরাণ-পণ করে খাটব বাসিনী!

—কী? ওই তো বাবা করে ডাক-হরকরাগিরি—তুমি কি করবে চৌকিদারি? না মুটেগিরি?

বাসিনীর হাতটা ধরে নিতাই বললে—আমি মোটর চালানো শিখেছি—লাইসেন্স করাব—ডেরাইবার হব আমি—

—বেশ তখন যেয়ো আমার কাছে।

দীনু আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে চলে গেল।

বাড়ি গিয়ে দেখলে সদু এবং মেয়ে সম্মানী তখনও ঘুমুচ্ছে।

সে মাথায় হাত দিয়ে দাওয়াতে বসল।

কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে নিজের কপালে দুটো চাপড় মেরে বললে—এই! এই! এই! তারপর আবার কপালে হাত দিয়ে ঝিমোতে লাগল।

আবার মুখ তুলে ঘুমন্ত সদুর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূঢ় কণ্ঠে ডাকলে—শুনছিস? এই! এই!

সদু পাশ ফিরে শুয়ে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বললে—ঘরের ভেতরে সব ঠিক করে একেছি, নিয়ে খাও ক্যানে।

—খাও ক্যানে! পিণ্ডি খাবার লেগেই আমি হা-হা করছি বটে!

—তবে কী? আমি এখন উঠতে লারব। সদুর শেষ কথাগুলি জড়িয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল।

দীনু নিষ্ঠুর ক্রোধে ঘুরে চুলের মুঠি ধরতে গেল; গিয়েও হঠাৎ ক্ষান্ত হল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তোকে দোষ দিয়ে মেরে-ধরেই লাভ কী? যার যা মতি; যার যা নেকন!

বলে ঘরে ঢুকে ঢেকে-রাখা মদের ভাঁড় থেকে খানিকটা মদ খেয়ে, থালায় রাখা মুড়ি মুখে ফেলে চিবুতে চিবুতেই গামছায় সেগুলি ঢেলে নিয়ে মাথাল মাথায় দিয়ে কাস্তে হাতে বেরিয়ে এল। গোরুগুলি শুধু মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—চললাম তোদের লেগে ঘাস আনতে। শুধুমুখে দাঁড়িয়ে আছিস! কী করব বল—তোদের কপাল আর আমার কম্মফল।

চলে গেল সে মাঠে। সেখান থেকে বোঝা বেঁধে ঘাস কেটে নিয়ে ফিরবার সময় মাঠের ধারের আমবাগানে একটি গাছতলায় বোঝা ফেলে সে জিরুতে বসল। গামছাটা দিয়ে মুখ মুছে ঘুরিয়ে বাতাস করতে লাগল। অনেক পুরনো আমবাগান। ছায়া সেখানে নিস্তরঙ্গ। দু-চারটি পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। দু-চারটি পাতা খসে পড়ছে। তা ছাড়া একটানা উঠছে ঝিঁঝির ডাক। মধ্যে মধ্যে কাঠবিড়ালীরা ছুটোছুটি করছে।

দীনু গাছে ঠেস দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল। আপন মনেই বললে—চলে যাব আমি বিবাগী হয়ে—মরুক গা সব—আমি আর এমন করে—

হঠাৎ বাগানের ওদিক প্রান্ত থেকে বাইসিক্লের ঘণ্টার ঝুন-ঝুন শব্দ শুনে চকিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

চারিদিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে—কে? এ আমবাগানে সাইকেল নিয়ে—কে?

হঠাৎ তার নজরে পড়ল—দূরে একটি গাছের গায়ে পায়ের ভর দিয়ে চেপে বসে রয়েছে পোস্টমাস্টারবাবুর ছেলে অমর। তার সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আর একটি সমবয়সী ছেলে। দীনু বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

ওদিকে হ্যাণ্ডেল-ধরা ছেলেটি আবার ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল; অমর গাছের তলায় তলায় মাথা গুঁড়ি করে সাইকেল চালিয়ে এদিক দিয়ে এগিয়ে আসবার পথে দীনুকে দেখে আবার একটা গাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। হেসে বললে—দীনু!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘাস কাটতে এসেছিলাম গোরুর জন্যে। কিন্তু আপনি এখানে বাবু! বিস্ময়ের তার আর অবধি ছিল না। কারণ এই বাগানটাকে ভয়ের জায়গা বলে সকলে এড়িয়ে চলে।

অমর হেসে বললে—শুনলাম নাকি এই বাগানে তোমাদের ভূত আছে? দিনের বেলাতেও কেউ আসে না! তাই দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি এই সারারাত ডাক বয়ে এসে এখন আবার কী করতে এসেছ?

দীনু বললে—কী করব বলেন? গোরু কটা আছে, অবোলা জীব। ভগবতী! ভাদ্দ মাস। খড় নাই। কী খাবে?

—ও। ওই ঘাস কেটেছ বুঝি? ওঃ অনেক কেটেছ!

—আপুনি কিন্তু ই বাগানের সেই ওঁদের কথা নিয়ে হাসি তামাশা করবেন না বাবু! ঠাঁইটা সত্যিই বড় খারাপ। আমরা এই বাইরে বাইরে যাই আসি।

—কেন? ভূত মেরে ফেলে? কিন্তু ভূত যে আমি মানি না দীনু। আচ্ছা চলি। বলেই সে সাইকেল চালিয়ে খানিকটা গিয়ে আবার ফিরল, দীনু তখনও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিরে এসে বললে—তুমি যেন বাবাকে এ-কথা বোলো না দীনু। কেমন? ভারি রাগ করবেন তিনি।

—কিন্তু তিনি যদি শুধোন বাবু? যদি শুধোন—হাঁরে দীনু, তোর সঙ্গে ওই গলায়-দড়ের আমবাগানে আমার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? তাহলে?

অমর তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে—মিথ্যে কথা বলতে পারবে না? আচ্ছা, বাবা না জিজ্ঞাসা করলে তুমি বোলো না। কেমন? তাতে তো মিথ্যে বলা হবে না।

—আজ্ঞে বেশ। তা বলব না।

অমর বললে—তা হলেই হবে। একটু চুপ করে থেকে বললে—জান দীনু, খুব ছেলেবেলায় আমার মা মরে যান। বাবাই আমাকে মানুষ করেছেন। তাইতেই আমার জন্যে ভারি ভয়। একটুতেই দুঃখ পান।

দীনু বেদনা অনুভব করলে। সঙ্গে সঙ্গে ভারি ভালো লাগল তার এই ছেলেটির বাপের প্রতি ভালোবাসা। সে তাড়াতাড়ি বললে—না—না—বাবু, আমি নিজে থেকে কখনো বলব না। আর—আর বাবু যদি শুধোনও তবে চুপ করে থাকব। বুয়েচেন! পেড়াপীড়ি করলে বলব—কবে বলেন দিকি? কোন্ বাগান বলেন তো? এক রকম করে এড়িয়ে যাব। আর বলব—না—না বাবু, আপনি দুঃখ পান সেই কাজ দাদাবাবু কখুনও করবেন না। সে ছেলেই নয়।

—আচ্ছা—আচ্ছা। আমি চলি।

বলে অমর চলে গেল।

দীনু তার গমনপথের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘাসের বোঝাটা তুলতে উদ্যত হল। অমর যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখে আবার ফিরল। নামল সাইকেল থেকে; বললে—তুলে দেব?

বলেই সে ধরলে বোঝাটার একটা প্রান্ত এবং অবলীলাক্রমে তুলে দিলে।

বিস্মিত হয়ে দীনু বললে—আপনার তো খুব গায়ের জোর দাদাবাবু!

—খুব ? হেসে উঠল অমর। তারপর সে আবার সাইকেল চড়ে চলে গেল।

বাড়ি ফিরেই দীনু রাগে ঘৃণায় যেন পাথর হয়ে গেল।

বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে সেই রঙ্গিণী মেয়েটা বাসিনী প্রায় তুফান তুলেছে। সদু প্রায় হতবাক হয়ে বসে আছে। পাড়াপড়শীরা জমেছে।

বাসিনী বলছে—তোমাদের ছেলে এনেছে আমাকে। পাঁচ টাকা নগদ দেবার কথা। সে না দিলে তোমাদিকে দিতে হবে। আর চড় মেরেছে আমাকে। তার দরুন দশ টাকা দিতে হবে আমাকে। নইলে আমি থানাতে যাব। ডায়রী করে কোর্টে গিয়ে নালিশ করব। আমাকে চড়!

সদু বললে—বেশ সি আসুক। তুমি বস।

বাসিনী বললে—বসব ? না। টাকা দাও আমার। আমি চলে যাব এখুনি।

দীনু এতক্ষণে মাথার বোঝাটা ফেলে সামনে এগিয়ে এল।—কী, হয়েছে কী ? তুমি চেঁচাও ক্যানে গো বাছা ?

দীনুর মেয়ে সম্মানী ছুটে এসে ভয়ার্তভাবে বললে—থানায় যাব বলছে বাবা!

—যাক থানায়। থানায় কোর্টে লাটসাহেবের কাছে যেখানে যাবে যাক। চলে যাও তুমি। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে চেল্লায়ো না।

—রাস্তায় রাস্তায় চেল্লাতে চেল্লাতে যাব আমি। নালিশ করে জেলে দোব। ডাকহরকরাকে চামচিকে সরকারী চাকরে বলেছি—তাতেই আমার বাপ-সোহাগে ছেলের মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল! আমার গালে ঠাস করে চড়!—আচ্ছা—

বলেই সে হনহন করে বেরিয়ে যাবার জন্য ফিরল।

দীনু তাড়াতাড়ি এগিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললে—দাঁড়াও।

মেয়েটা ঘুরল—কী ? সেও যেন ফনা তুলে দাঁড়াল।

—তুমি ক্যানে তা বললে ? ডাকহরকরা চামচিকে সরকারী চাকরে ?

—তোমার ছেলের আমাকে বিয়ে করবার সাধ ক্যানে ? আমি বললাম—আমাকে পুষবে ক্যামনে ? তা বলে—ড্রেরাইবারীর লাইসেন লেবে, মটর চালাবে। আমি বললাম—লাইসেন করাতে টাকা লাগবে যে শ দরুনে। যোগাড় কর। তা বলে বাবার কাছে আদায় করব। তাতেই ঠাট্টা করে বলেছিলাম; তা আমার গালে ঠাস করে চড় ? আমি নালিশ করব।

দীনু বললে—নিয়ে যাও তোমার টাকা। দাঁড়াও; এনে দিচ্ছি আমি।

বলেই সে হনহন করে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

এসে হাজির হল সে গ্রামের প্রধান ব্যক্তি—তার পূর্ব মালিকের বাড়িতে। যিনি তাকে লাগিয়েছিলেন ডাকহরকরার কাজে।

সেখানে তখন জমাট মজলিস।

প্রধান ব্যক্তি তামাক খাচ্ছেন; সুরেশ বাঁড়ুজ্জে যুদ্ধের সংবাদ পড়ছে। আরও দু-

তিনজন বসে আছে।

সুরেশ বলছে—এ যা লাগল—তা বুঝতাছ না তোমরা!

একজন বললে—তুমি পারছ?

—নিশ্চয়; কুরুক্ষেত্র! এবার কৌরব কুল—মানে আমাদের এঁরা—বুয়েছ—হুঁ হুঁ—হিটলার ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়বে। দেখ না কী লিখছে—বারুদ স্তূপে অগ্নিসংযোগ! একেবারে বিস্ফোরণ। দেখ না কী হয়! ধাঁ ধাঁ করে চলে আসবে বাবা—কুইক মার্চ, হেঁটে নয়—এবার যান্ত্রিক বাহিনী। গড়গড় করে।

দীনু এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

কর্তা বললেন—ধানের দর আজই নাকি আট আনা চড়ে গেল?

—আট আনা? দশ আনা। সাড়ে দশ আনা। লাফিয়ে লাফিয়ে চড়ছে। একজন বললেন।

অন্যজন বললেন—যে যেমন পারছে। বুঝছেন না! কোমর বেঁধে বাঁধাই করতে লেগেছে।

দীনু বললে—বাবু!

কর্তা এবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন—দীনু! কী রে? এমন সময়? এখন তো মাইনের সময় নয়? গাড়ি ভাড়ার টাকা জমিয়েছিস বুঝি?

অন্য সকলকে এর পর বললেন—দীনু আমাদের ভারি সঞ্চয়ী। মাইনের টাকাটি পোস্টাপিসে পেলেই যাবার পথে অর্দ্ধেক টাকা আমার কাছে জমা দিয়ে যায়।

সুরেশ বললে—এইবার আরও জমবে। বুয়েছেন না—মজা তো চাকরদের। মাইনে বাড়বে এবার, তার উপর যে ইনকেলাপের ঠেলা।

একজন বললে—ইনকেলাপ? যুদ্ধের সময় ট্যাঁ ফোঁ করলে বন্দুক চালিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে! ইনকেলাপ!

কর্তা বললেন—তোমরা থাম হে! লোকটা দাঁড়িয়ে আছে—কি বলছে শুনতে দাও।

দীনু বললে—আজ্ঞে বাবু, কটা টাকার প্রয়োজন আছে। পনেরটা টাকা লোব। ভারি দরকার।

—নিয়ে যা। সরকার, দীনুর জমা টাকা থেকে পনেরোটা টাকা দাও তো!

বাড়ি এসে টাকা পনেরোটা বাসিনীর হাতে দিলে।

বাসিনী তখন গাছতলায় বসে ছিল স্তব্ধ হয়ে। কৌতূহলী প্রতিবেশিনী প্রতিবেশীরা তখন অধিকাংশই চলে গেছে।

টাকাটা দিয়ে বললে—যাও!

বাসিনী টাকাটা নিয়ে একবার ঘুরে তাকিয়ে সকলকে দেখে নিয়ে তার অভ্যস্ত চলনে হেলে-দুলে চলে গেল।

দীনু সদুকে বললে—সি কোথা? সি শুয়োরের বাচ্চা?

—জানি না। কোথায় গিয়েছে—আমাকে বলে গিয়েছে ?

—যা, উয়োর সঙ্গী-দিগে বল গা, ডেকে দেবে। বল গা আমি ডাকছি।

—সি আসবে যখন মন। তুমি চানটান কর ; ঠাণ্ডামাণ্ডা হও। মাথা গরম কোরো না—লায়েক ছেলের ওপর। উ আমার ভারি রবিমানী ?

—রবিমানী! শুয়োরের বাচ্চা কোথাকার! শুয়োরের বাচ্চার আবার রবিমান! (গোঁয়ারতুমি) গঁরতুমি—শুয়োরের বাচ্চার থাকে গঁরতুমি! এক নম্বরের গঁর কাঁহাকা! অ্যাঁ—মেয়েটাকে চড় মেরে দিয়েছে ?

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ শুনছিল কথা। সে এবার এসে বাপের কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলে—এই বাবা!

দীনু গ্রাহ্য না করে সদুকে বললে—ডাক ডাক, বলব না কিছু ; ডাক। শুনছিস!

মেয়েটা উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলে—এই! এবার হাত দিয়ে খোঁচা দিলে।

দীনু বললে—দিব্যি করে বলছি, আমি কিছু বলব না। ডাক। বাবাকে চামচিকে বলায় বেটার আগ! বলিহারি রে বেটা শুয়োরের বাচ্চা! ডাক। তার কণ্ঠস্বরে খুশির সুর উপচে পড়ল। সদু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মেয়েটা এবার বিড়ালীর মতো পিঠে খামচে ফিরে ডাকলে—এই বাবা! শুনতে পেচিস না কি ?

দীনু বললে—অ-হ-হ। খামচাস ক্যানে—? অ্যাঁ!

মেয়েটা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাপের পানে।

দীনু বললে—তু কাঠবিড়ালি না কি ? নখের ধার দেখ!

মেয়েটা বললে—দাদাকে শুয়োরের বাচ্চা বলছিস ক্যানে ?

—বলবে না ? তোর দাদা নিশ্চয় শুয়োরের বাচ্চা!

—দাদা শুয়োরের বাচ্চা তো—তু কী ? তুই তো দাদার বাবা ?

—কী বললি ? সকৌতুকে সবিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দীনু বললে—কি বললি ? অ্যাঁ! বলে হা-হা শব্দে উচ্চ হাসিতে যেন ভেঙে পড়ল।

ঠিক এই সময়টাতেই নিতাই মত্ত অবস্থাতেই এসে বাপের পায়ে হাত দিয়ে বার বার প্রণাম করে বললে—পেনাম, পেনাম। তুমি আমার বাবা। তোমাকে পেনাম। আর কখুনও এমন কাজ করব না।

—ওঠ, ওঠ। পেনাম করতে হবে না, ওঠ।

নিতাই বললে—উ তোমাকে চামচিকে বললে ক্যানে ? আমি মেরে দেলাম চড়।

—আমি তার টাকা দিয়ে দিয়েছি। খুশী হয়ে দিয়েছি। কিন্তু খবরদার—আর উসব মেয়ের ছ্যাঁ (ছায়া) মাড়াবি না। ও সব মেয়ে পাপ। সাক্ষাৎ পাপ। দুনিয়ায় সব সয়, পাপ সয় না। পাপ বাপকে ছেড়ে কথা কয় না।

—দিব্যি করছি। ভগমানের দিব্যি, মা-কালীর দিব্যি।

দীনু ছেলেকে ধরে দাওয়ায় বসিয়ে প্রায় জোর করে শুইয়ে দিয়ে বললে—শো। এখন ঘুমো। সারা দিন ঘুমো। সন্তু, দে দিইনি একখানা পাখা। বলে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সন্তু পাখা এনে দিতেই পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বললে—খুব ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে দোব তোর। লক্ষ্মীর মতো মেয়ে। মদ-টদ ছাড়। মন পাতিয়ে কাজকম্ম কর—

নিতাই বললে—কালীর দিব্যি, ভগমানের দিব্যি—

দীনু পাখাখানা রেখে দুই হাত জোড় করে প্রণাম জানালে। সন্মানী পরিত্যক্ত পাখা-খানা নিয়ে বাতাস দিতে লাগল।

দীনু তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখে ঠেকিয়ে কাঠবিড়ালির ডাক অনুকরণ করে ডেকে উঠল।

—চিক-চিক-চিক-চিক!

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ের গায়ে সস্নেহে খামচে দিলে।

মেয়েটা অভিযোগের সুরে বলেলে—অঁ-ই অ-মা—

দীনু বললে—হুঁ—আমি এখন কাঠবিড়ালির বাবা! বড় কাঠবিড়ালি যে! বলেই আবার ডাকলে—চিক-চিক-চিক-চিক! হুঁ-হুঁ!

মেয়েটা বললে—যাঃ।

দীনু বললে—শুয়ারের বাচ্চা আচ্ছা হ্যায়। বদমাশ মেয়েটাকে ভাগায়া হ্যায়। মা-কালীকে দিব্যি কিয়া হ্যায়। জয় মা-কালী! দে সন্তু ত্যাল দে, চান করে আসি।

সুরে গাইতে গাইতে সে বেরিয়ে গেল—মনো চাহে যাও হে তুমি—আমি যাইব না; কেলি কদমতলায় বৃন্দে গো!

সেই রাত্রেই সে ডাক নিয়ে গিয়ে বোলপুরে রেল-প্লাটফর্মে মেলব্যাগগুলি নামিয়ে একটা আলোর থামের নিচে এসে বসল, ওই গানটিই গাইতে গাইতে এল গুনগুনিয়ে—

মনো চাহে যাও হে তুমি—আমি যাইব না,
কেলি কদমতলায় বৃন্দে গো!
মানিক পেলে তুমিই নিবে আমি চাইব না—
কালো মানিক কালার—বৃন্দে গো!

সঙ্গী অন্য রানারটি আগে থেকেই এসে বসে ছিল। আপন মনে খোলামকুচি দিয়ে দাগ টেনে ঘর আঁকছিল—সে মুখ তুলে হেসে বললে—আজ ভারি খুশী দীনু ভাই! গান গাইছ লাগছে?

—সি আমলের ভাঁজো গান মনে পড়ে যেল দাদা! ওঃ কী গানই ছেল! সেই উবেলা থেকে গো!

—তা বটে। তা হবে নাকি একদান বাঘবন্দী? ঘর আমি এঁকে একেছি।

—তা বস ! তার আগে ভাই একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে কিন্তুক ।

সঙ্গী খোলামকুচির গুটি সাজাতে সাজাতে বললে—বল ! কথা কী বল !

—একটি ভালো কন্যে দেখে দিতে হবে । ভা—লো কন্যে । বুয়েচ । বেটাটার আমি বিয়ে দোব !

—কন্যে ? তা তোমার রবাব কি ? মেলাই কন্যে !

—মেলাই তো বটে । কিন্তু সো-ন্দ-র কন্যে চাই । আমার বেটার আবার নাক-খানিক উঁচু । বুয়েচ ।

—সো—ন্দো—র কন্যে ! তোমার বেটার নাক-খানিক উঁচু ! ভালো করে ভেবে দেখতে হয় ! সো-ন্দ-র কন্যে !

—হ্যাঁ—ভাঁজোতে নাচতে-মাচতে পারে । বেশ রহলা-কহলা—বুয়েছ মানে—চোখোল-মুখোল মেয়ে চাই ; বেটার উঁচু নাকে দড়ি বেঁধে ঘুরুতে পারা চাই । তা-পরেতে একটা-দুটো বেটাবেটি হলে তখন আমি নিশ্চিন্তি ; তখন ঘোড়ার মুখে কাঁটা লাগাম !

—হুঁ । ব—সে বসে তখন মজা দেখ ক্যানে !

দীনু বললে—শুধু মজা দেখা ? তা দিগে উস্কে দিয়ে মজা দেখব ! হু ! হু ! লাও—এই চাললাম আমি । আমার ছাগল ! চালো ।

—এই এক কাট !

মুসাফেরখানায় তখন স্টল-ওয়ালা হাঁকছে—চা গ্রোম ।

একটা ফেরিওয়ালা হাঁকছে—পান বিড়ি ।

যাত্রীরা শুয়ে আছে ।

ওদিকে ঘণ্টা পড়ে গেল—ঢনো-ঢনো-ঢনো-ঢনো ।

মেলট্রেন আসছে ।

প্লাটফর্মের উপর ওই ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে ইঞ্জিনের সার্চলাইট পড়েছে ।

দীনু এবং অন্য রানার দুজনেই খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ।

অন্য রানারটি হাত তুলে আড়ামোড়া ছেড়ে বললে, উঠো মুসাফের বাঁধো গাঁঠেরি—চলো এখন—পাঁচ কোশ পথ ——ঝুন-ঝুন-ঝুন-ঝুন—

ঝুন-ঝুন-ঝুন-ঝুন—ঘণ্টার শব্দ তুলে দীনু ভোরবেলা এসে ঢুকল নবগ্রামের ভিতর ।

একটা কুকুর উঠল ঘেউ ঘেউ করে ।

দীনু বললে—যা মলো । রোজ দেখেও চেনো না ? ওরে বাবা, সরকারী ডাক ! ভাগো বেকুব কাঁহাকা !

সামনেই একটা চায়ের দোকানের উনোনটা রাস্তার উপর ধোঁয়াচ্ছে ।

একজন পুলিস কর্মচারী বাইসিক্ল চড়ে তাকে অতিক্রম করে চলে গেল ।

একটু পরেই ইস্কুল। পাশে বোর্ডিং।

সেখানে দুজন কনেস্টবল দাঁড়িয়ে।

দীনু বিস্মিত হয়ে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। এত ভোরে এখানে পুলিশ! আবার চলতে লাগল।

একটু এগিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকাল। আবার চলল।

পোস্টাপিসের সামনে এসে তার বিস্ময় উঠল চরমে।

পোস্টাপিসের সামনে কজন কনেস্টবল। কোয়ার্টারের দরজাতেও একজন।

বারান্দায় নিত্যানন্দবাবু দুজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন।

পিওন ভবেশ দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

সদর রাস্তায় ভয়ার্ত মুখে ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

সুরেশ একটু এগিয়ে এসে—মৃদুস্বরে বললে—অ দীনু, মাস্টারের ছেলেকে ধরতে এসেছে পুলিসে রে।

দীনুও মৃদুস্বরে সবিস্ময়ে বললে—অমরবাবুকে ?

—হ্যাঁ রে। সাংঘাতিক ছেলে। বোমা পিস্তল—স্বদেশী!

—না বাবু। মিছে কথা।

—মিছে কথা নয় রে ; নইলে সে পালাবে কেন ?

—পালিয়েছে ?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। পাখি রেতেই ফুরুত ধা।

ওদের কথায় ছেদ পড়ল বুটের শব্দে। বুটের শব্দ উঠতেই ওরা চুপ করল। ওদের সামনে দিয়ে কনেস্টবলেরা চলে গেল। পিছনে অফিসারেরা।

একজন অফিসার থমকে দাঁড়ালো।

—বোলপুর থেকে ডাক আনছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুষ্ককণ্ঠে দীনু উত্তর দিলে।

—মাস্টারবাবুর ছেলেকে পথে দেখেছ ? বাইসিক্লে চড়ে—

—আজ্ঞে না হুজুর।

—হুঁ। যাও, ডাক নিয়ে ভেতরে যাও।

চলে গেলেন তিনি। দীনু ডাক নিয়ে ভিতরে গিয়ে বারান্দায় ডাক নামালে। মাস্টার তখন ঘরের ভিতর মাথা নিচু করে ঢুকছেন।

পিওন বললে—ঘরে—বাইরে আর ডাক নামাবি না।

দীনু মৃদুস্বরে বললে—অমরবাবুকে ওরা—

পিওন বললে—হ্যাঁ, চেঁচাস না।

বাড়ি গিয়েও দীনু চুপ করে ছিল। স্তব্ধ হয়ে।

মনটা তার খারাপ হয়ে গেছে। অমরবাবুর মতন ছেলে—!

স্ত্রী সদু গোরুগুলিকে খাবার দিচ্ছিল। সন্যানী একটা বাছুরকে দড়ি ধরে টানছিল।

গায়ে হাত বুলোচ্ছিল। দীনু বসতেই সম্মানী 'ছবি চিঠি ছবি চিঠি'—বলে ছুটে এসে বাপের হাত থেকে দুখানা রঙীন খাম টেনে নিয়ে শুঁকে বললে—কী সোন্দর সুবাস, দেখ মা!

সদু মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে এইভাবে স্তব্ধ দেখে বললে—এমন করে বসলা যি গো? কী হল?

দীনু উত্তর দিলে না।

সদু বললে—জ্বর-টর হইছে না কি গো?

মেয়েটা বললে—এই বাবা আ কাড়্ ক্যানে! বাবা!

দীনু বললে—চ্যাঁচাস না রে চ্যাঁচাস না। পরানটো আমার ছাড়ো-ছাড়ো করছে। চ্যাঁচাস না।

ঠিক এই সময়েই বাড়ি ঢুকল নিতাই। আজ তার চেহারা দিব্য ফিটফাট। বাপকে দেখে বলে—আইচ ফিরে? কাণ্ড শুনেছ? তোমার মাস্টারবাবুর ছেলের?

- শুনেছি! তাই বলছেলাম—পরানটো আমার ছাড়ো-ছাড়ো করছে।

—ওই গলায়-দড়ের আমবাগানটো একেবারে তছনছ করছে পুলিসে। মাটি খুঁড়ছে। বলে বোমা-বন্দুক লুকোনো আছে।

দীনু চমকে উঠল। মনে পড়ে গেল তার আমবাগানে অমরের ঘোরাঘুরির কথা। ছেলের মুখের দিকে একেবার চকিতভাবে তাকিয়ে সে মাথা নিচু করলে।

সদু বললে—তা তু যে গেলি ঘাস কেটে আনতে, ঘাস কই?—

নিতাই বললে—উ আমি পারব না। বাবা—যে ভাদ্রুরে গরম আর সুড়সুড়ি! আর জোঁক কী? এই বড় বড়!

দীনু বললে—দে, আমার কেদে দে সদু। আর মুড়ির গামছা।

নিতাই বললে—যেতে হবে না। সি আমি বলে দিয়েছি, অতন দিয়ে যাবে।

সদু বললে—অতন দিয়ে যাবে, পয়সা লেবে না?

দীনু উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল। মদের ভাঁড়, কাস্তে, গামছা-বাঁধা মুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল।

নিতাই তখন বলছে—সি টাকা আমি দোব।

—তু দিবি?

—হঁ তো কি? দোব কি—একটো টাকা দিয়ে দিয়েছি আমি।

—টাকা তু কোথা পেলি?

—আজারা মানিক কোথা পায়?

সদু বললে—টাকা উ কার কাছে ধার করেছে। শুধোও তুমি ওকে। সেই ভোরে উঠে কোথা যেয়েছিল। যখন ফিরল তখন—ওর কোঁচড়ে টাকা ছিল।

দীনু বললে—নিতাই! শাসনের সুরেই সে বললে।

নিতাই বললে—অই, তুমি চোখ আঙাতে লাগলে দেখি! বেশ করেছি—আমি ধার

করেছি। আমি ওজকার করে শোধ দোব।

—হুঁ। ভাঁজোর সেই মেয়েটাকে যেমন ওজকার করে দিয়েছিলি টাকা—তেমনি করে দিবি!

—দোব! দোব! দোব! মটর ডেরাইবারির লাইসেন্ লি—তারপর দিই কি না দেখো! লাইসেন করতে আমার শ দুই-আড়াই টাকা লাগবে—তুমি দাও। দেখো আমি কত ওজকার করি!

—টাকা আমার নাই নিতাই। মটর ডেরাইবারির বাসনা তু ছাড়।

—সি আমি ছাড়ব না। টাকা তুমি দাও চাই না-ই দাও। বলতে বলতেই সে বেরিয়ে চলে গেল।

সদু ব্যাকুলভাবে ডাকলে—নেতাই! অ—নেতাই!

সন্মানী ছুটে খানিকটা গিয়ে ডাকলে—দাদা—!

দীনু সদুকে গম্ভীর স্বরে বাধা দিয়ে বললে—খবরদার ডাকবি না! খবরদার! যেখানে মন চায় যাক উ।

সদু বললে—তা উ যদি ডেরাইবার হয়—তো টাকা দাও ক্যানে তুমি। একটো ছেলে—

—একটো ছেলের জন্মে সদু—মাসে মাসে দশ টাকা বারো টাকা করে বাবুর কাছে জমিয়ে বছরে বছরে দশ কাঠা পাঁচ কাঠা করে পাঁচ বিঘের ওপর জমি করেছি। কোঠাঘর করেছি—ছেলে-বউ শোবে। ডেরাইবার হলে সে জমি আমার ঠায় শুকিয়ে পড়ে থাকবে—চাষ হবে না। লইলে বেচে খেয়ে দেবে উ। ডেরাইবার আমি দেখেছি। ওতে শুধু ধরম লয় সদু, জাতসুদ্ধ যাবে। আর টাকাও আমার নাই। জমি কিনে পঞ্চাশ টাকা ছিল—তা থেকে পনের টাকা এনে সেই রঙ্গিণীকে দিয়েছি। টাকা আমার নাই। থাকলেও—

কথাটার উপরেই উঁচু গলায় কথা বলে প্রবেশ করল ভবেশ পিওন।

—দীনু, অ দীনু!

—পেওনবাবু! হঠাৎ—? বাবুর ছেলে?

পিওন ভবেশ চিঠির তাড়া-হাতে ব্যাগ-কাঁধে ডাক বিলি করতে বেরিয়েছে। পথে দীনুর বাড়িতে এসেছে। বললে—সে তো পালিয়েছে। ধরা পড়ে না পড়ে, তার কপাল। এখন মুশকিল হয়েছে দীনু, মাস্টার বড় মুষড়ে গিয়েছেন।

—আহা—তা আর যাবেন না?

—আজ হাটের দিন ছিল—হাট হয় নাই। আমার বিটি আছে ভিন গাঁয়ে। হরিহরের জর। তু বাবা তোর ঘরে লাউ-টাউ কি কুমড়ে-টুমড়ো থাকে তো নিয়ে যা। আর মাছ পো-খানেক। আর তুই বাবা আজ ওখানেই থাকিস। বুঝেছিস? সুরেশ বাঁড়ুজ্জে আছে, তুইও থাকিস।

—আজ্ঞে বেশ! এখুনি চললম আমি

দীনু পোস্টাপিসে এল একটি লাউ, কিছু বেগুন, কিছু লাউয়ের শাক এবং মাছের খাড়ুই হাতে করে। বেলা প্রায় বারোটা।

বাইরের বারান্দায় নিত্যানন্দবাবু এবং সুরেশ বসে আছে। সুরেশের হাতে কাগজ।

মাস্টার বলছেন—ও ছেলের আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি, বুঝেছেন বাঁড়ুজ্জে।

সুরেশ বললে—না—না—। ও কী বলছেন? এখন তো এসব ঘরে-ঘরে গো। রায়বাহাদুরের ছেলে বন্দেমাতরম্ বলে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে! পালিয়েছে, আবার দু দিন পরে ফিরবে। তখন ধরে-পড়ে—

—উঁহুঁ! এ-ছেলেদের জাত আলাদা বাঁড়ুজ্জে। আমার ছেলে বলে বলছি না—

ঠিক এই মুহূর্তেই দীনু জিনিসগুলি নিয়ে দাঁড়াল।

মাস্টার কথায় ছেদ টেনে বললেন—এ-সব আবার কী আনলি রে? ভবেশ বলে গেল বুঝি? কেন আনলি বাবা? দরকার ছিল না। কে রাঁধবে বল? আমার আর খেতে ইচ্ছে নাই।

বাঁড়ুজ্জে বললে—আমি রাঁধব মাস্টার, আমি রাঁধব। যা—যা দীনু, বাসার ভেতর রাখ গিয়ে। আর উনোন-টুনোনগুলো দে দেখি ঠিক করে। বেটারা উনোনসুদ্ধ খুঁড়ে দিয়ে গিয়েছে।

দীনু চলে যাচ্ছিল।

মাস্টার পুরানো কথার জের টেনে বললেন—ও-ছেলে গুলি খেয়ে মরবে, নয় কাউকে গুলি করে ফাঁসিকাঠে ঝুলবে, নয়তো বোমা-টোমা করতে গিয়ে নিজের হাতে মরবে। নয়তো—

একটু থেকে বললেন—ধরা পড়ে ডাকাতি ষড়যন্ত্র রাজদ্রোহ অপরাধে আন্দামান যাবে। মরবার সময় ছেলের হাতের জলও আমি পাব না বাঁড়ুজ্জে, আগুনও না!

খেতে বসে মাস্টার সেই কথার জের টেনে বললেন—বুঝেছ বাঁড়ুজ্জে, সংসারে যে-জিনিসের যে-অঙ্কের যত মূল্য তারই যন্ত্রণা তত বেশী।

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—মাস্টারবাবু! মাস্টারবাবু!

মাস্টার বললেন—দেখ তো দীনু, কে? বল আমি আসছি।

দীনু বারান্দার একপাশে বসে ছিল চুপ করে। শুনছিল কথা। বাঁড়ুজ্জে মাস্টারকে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিল। তরকারির থালা এবং একখানা হাতা হাতে সামনে বসে ছিল। উঠানে একটা কুকুর বসে ছিল উচ্ছিষ্টের আশায়। দুটো কাক বসে ছিল অদূরে।

দীনু উঠে চলে গেল।

বাঁড়ুজ্জে বললে—আর একখানা মাছ দিই। ওই ভাত কটা ভাঙুন।

মাস্টার বললে—গলা দিয়ে যাচ্ছে না বাঁড়ুজ্জে। বলেই পাতের মাছখানা কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বললেন—নে, খা।

দীনু ফিরে এসে বললে—কজনাই দাঁড়িয়ে আছে, মনিঅর্ডার করবে। ধানের মহাজন

নন্দী মশায় সুদ্ধ অয়েচেন। তেনার আবার ইনসিওর আছে।

মাস্টার উঠে পড়লেন।

বাঁড়ুজ্জে হাঁ-হাঁ করে উঠল।—উঠবেন না। অম্বল—অম্বল দিই।

মাস্টার উঠে বললেন—লোকের কাজ আমার দুঃখু মানবে না বাঁড়ুজ্জে। তার ওপর ছেলেটা যা করে গেল—তাতে সামান্য খোঁচাতেই আমার চাকরি চলে যাবে ভাই!

আঁচাতে আঁচাতে বললেন—তুই যেন ভাত নিয়ে যাস দীনু। আর সকাল সকাল আসিস বাবা! ভবেশ কখন ফিরবে, কে জানে, হরিহরের জ্বর। ডাক বাঁধা—চালান—সব আজ আমার এক হাতে!

গামছায় ভাতের থালা বেঁধে নিয়ে দীনু মাস্টারের বাসা থেকে বেরিয়ে এল। তখন পোস্টাপিসের বারান্দায় পাঁচ-সাত জন লোক জমে রয়েছে।

কেউ মনিঅর্ডার করছে। কেউ করবে রেজেস্ট্রি।

ঘরের ভিতর মাস্টার টাকা বাজাচ্ছেন। মনিঅর্ডারের টাকা বাজিয়ে নিচ্ছেন। শব্দ উঠছে।

ওদের মধ্যেই রয়েছে চাল-ধানের মহাজন নন্দী মশায়।

তিনি একখানা ইনসিওর-করা খামের শীলমোহর ভালো করে দেখছেন।

ওদিকে বাজারের মধ্যে কোথাও হচ্ছে বাউলের গান। গানটি শোনা যাচ্ছে, বাউলকে দেখা যাচ্ছে না।

বাউল গাইছে:

> "মনরে আমার হায় শুনলি না বারণ!
> সোনার হরিণ ধরতে গেলি—ঘরে হল সীতা হরণ
> হায় শুনলি না বারণ!
> জীবন-সুতোয় বুনিস যে ফাঁদ সেই ফাঁদতেই হয় মরণ।
> আপন রসের সুতোয় বোনা ফাঁদেই হয় মরণ।"

সেই মুহূর্তে উঠল আর-একটা শব্দ। আকাশে এরোপ্লেনের শব্দ।

সশব্দে একখানা প্লেন উড়ে গেল।

দীনু সবিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

সদর রাস্তা ধরে সজোরে ভাঙা সাইকেল চালিয়ে চলে গেল নিতাই।

সে আস্ফালন করতে করতেই গেল—চল—তু কত জোর যাবি। চ—ল।

দীনু ডাকলে—অই—অই—নেতাই! অই!

নিতাই তখন বেরিয়ে চলে গেছে।

বাড়িতে এসে দীনু স্ত্রীকে বললে—নেতাই এলে বলিস, জমিতে জল আছে কিনা দেখতে। বাবু আমার সাইকেল চড়ে উড়োজাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে!

সদু বললে—উড়োজাহাজের সঙ্গে পাল্লা?

—হ্যাঁ। সি একেবারে বোঁ বোঁ করে চক্ষের নিমেষে চলে গেল।

সদু বললে—উড়োজাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে? এখুনি ঝিটো যেল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

—হেই মা গো!

—তাকে তু বলিস,—জমির জল না দেখে এমন করে সাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ালে আমার সঙ্গে ভালো হবে না—বলে দেলাম।

—সি উ সব দেখতে পারবে না, সে তুমি আগই আর ওযই! সি চাকরি পেয়েছে।

—চাকরি?

—হ্যাঁ, ওই মহাজনদের গদ্দিতে-মদ্দিতে না কোথা বটে বাপু। তাগিদে-টাগিদে ফরমাশ-টরমাশ করবে—মাসে বারো টাকা মাইনে।

—বারো টাকা মাইনে? মাসে ঘি তার মদ লাগে দশ টাকা। দু টাকাতে প্যাটের ভাত, চুলের ত্যাল, ওই বাহিরে গেঞ্জি-ফেরাক—দু টাকায় হবে? বলে দিস—আমি আর একটি পয়সাও দোব না, খেতে দিতেও লারব।

বলেই সে চলে গেল তার বল্লম পেটি নিয়ে, জামাটা কাঁধে ফেলে।

তখন সূর্য পাটে বসেছে।

নিজেদের পাড়ার প্রান্তে বেনেপুকুরের পাড়ের উপর দিয়ে যে-পথটা সেই পথ দিয়ে চলছিল। পূর্ব পাড়ে উঠলেই পশ্চিম পাড়ের ওপারে অবারিত মাঠ। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য তখন অস্তোন্মুখ। লাল আলো পড়েছে মাঠে। মাঠের পথ ধরে আলোর পটভূমিকে পিছনে রেখে বাউল চলেছে তার হাতের একতারা বাজিয়ে আপন মনেই ওই গানটার শেষ লাইন গাইতে গাইতে—

> রসের সুতোর ফাঁদ পাতিলি—
> নিজেই নিজে ধরা দিলি—
> ও তোর রসের নাচন কোদন—শেষ হল হায় কাঁদন।
> ও মন শুনলি না বারণ।
> এখন ফাঁদ কেটে হ প্রজাপতি নইলে তো আর নাই বাঁচন।
> কাঁদিস না মন অকারণ।

দীনু দাঁড়িয়ে শুনলে। বাউল দূরে চলে গিয়ে আমবাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সূর্য তখন সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। পাখি কলরব করে উঠল।

সূর্য ডোবে, আবার ওঠে।

সূর্য উঠছে। পাখি কলরব করছে।

দীনু ডাক নিয়ে পোস্টাপিস কম্পাউণ্ডে ঢোকে।

কম্পাউণ্ডের ফুলগাছে ফুল ফুটেছে। প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। ফুলে বসে মধু খাচ্ছে।

ভবেশ পিওন ভিতর থেকে দরজা খুললে।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে এল বাইরে থেকে। আরও দু-একজন ডাক দেখার লোক এল।

সাইকেল চড়ে এল নিতাই। দীনু তখন ভিতরে।

নিতাই নেমেই দরজার মুখে এসে দাঁড়াল—।

নিতাই? কী রে? বাড়ির সব—

নিতাই বললে—ভালো আছে। আমি পেওনবাবুকে ডাকছি। ওই নতুন মাড়োয়ারী বাবুর এনসেয়োর আছে কিনা শুধোব, বাবু পাঠালে।

দীনু সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরলে।

ঘরের ভিতর পিওন ভবেশ তখন ডাক কাটছে।

মাস্টার নিত্যানন্দবাবু বাসার ভিতর থেকে ঘরে ঢুকছেন।

দীনু বললে—একটুকুন তাড়াতাড়ি করেন বাবু। আমাকে মাঠে যেতে হবে। আউশ-ধান খোড়ের সময়, জল না থাকলে সর্বনাশ হবে।

দীনু মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কোদাল হাতে—আলের উপর পড়ে রয়েছে ঘাসের বোঝা—আর গুনগুন করে—আহা—

রসের সুতোর ফাঁদ পাতালি
নিজেই নিজে ধরা দিলি—

হায়—হায় তাই বটে। বলে একটা জল বের হওয়া গর্তে দু কোদাল মাটি কেটে দিয়ে পা দিয়ে চেপে দিতে লাগল। আর বলতে লাগল—কাঁকুড়ির জ্বালাতে অস্থির রে বাবা! অ্যাই—অ্যাই—অ্যাই! লাথির সঙ্গে সঙ্গে অ্যাই—অ্যাই শব্দগুলি তার মুখ থেকে বের হল তালে তালে।

আকাশে ছায়া নেমে এল। সেখানে মেঘ জমেছে।

মাঠ থেকে ফেরার পথে—বেনেপুকুরের পাড়ে গাছতলায় একটি মেয়ে বসে ছিল—, ঘাসের বোঝা মাথায় দীনু তাকে দেখে চমকে উঠল। এ যে সে—সেই রঙ্গিনী বাসিনী!

মেয়েটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে বাঁ হাতে কপালের একগুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে পাক দিচ্ছে; চোখের দৃষ্টি তার সেই চুলের গুচ্ছটির দিকে; এবং মৃদু মৃদু হাসছে।

দীনু হনহন করে চলতে শুরু করলে। ম্লান হয়ে গেছে দিনের আলো। আকাশে মেঘ ঘন হয়েছে।

বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মৃদু গর্জন হল মেঘের।

বাড়িতে এসে কোদালখানা রেখে ঘাসের বোঝাটা সশব্দে ফেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে যদি নিতাইকে দেখতে পায়।

মেঘাচ্ছন্নতার মধ্যে সদু সেদিন উঠানে বসে কাটারি দিয়ে একটা শুকনো ডালকে কেটে

জ্বালানী তৈরি করছিল।

সম্মানী কোমরে হাত দিয়ে নেচে গাইছিল—নিত্য নতুন ফোটে শালুক,—বাসি ঝরে গেলে হে!

দীনু এসে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে—কেটে কেটে ফেলাব।

মেয়েটা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে।

সদু অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে—ওই, তুমি ক্ষ্যাপলা না কি?

—হ্যাঁ আমি ক্ষেপেছি। সি কোথা?

—ক্যা?

—তোর বেটা?

বলেই হনহন করে বেরিয়ে গেল।

সে গেল মাড়োয়ারীর গদীতে।

লোকজন, ধানবোঝাই গাড়িতে চারিদিক ভর্তি। ঢালা ধান পড়ে আছে, চারিদিকে লোকজন ব্যস্ত হয়ে ধান ঢাকছে তালপাতার চাটাই দিয়ে। বৃষ্টি আসবে।

বারান্দায় গদীতে বসে আছে মাড়োয়ারী। পাশে কর্মচারী লিখছে।

মাড়োয়ারী ইন্‌সিওর-খামে শীল করছে।

দীনু এসে ডাকলে—নেতাই?

একজন কুলীকে জিজ্ঞাসা করলে—নিতাই! নিতাই কোথা মলীন্দ?

—নেতাই? সি আজ ছুটি নিয়ে যেল যি! এই তো যেল। (বলেই হাসলে)

—তু হাসলি ক্যানে মলীন্দ?

—হাসলাম এমনি। তবে তাকে খুঁজো না। পাবে না।

—পাবো না?

—হ্যাঁ। তাই সে বলে যেল আমাদিকে।

—হুঁ! আবার দীনু হনহন করে চলল।

এল সেই পুকুরপাড়ে গাছতলায়।

কিন্তু কোথায় বাসিনী? কোথায় নেতাই?

চারদিকে চেয়ে দেখলে সে। কই?

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দে সে চমকে উঠল—সে হাসি বাসিনীর।

খানিকটা দূরে আর একটা ছায়াঘন গাছতলা। সেই গাছতলা থেকে বাসিনী হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে এল। তার পিছনে পিছনে তাকে ধরতে ছুটে এল নিতাই।

দীনু উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিয়ে উঠল—নেতাই!

নেতাই থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরে তাকাল।

দীমু আবার ডাকলে—নেতাই!

এবার ওদিক থেকে ছুটে এসে বাসিনী নিতাইয়ের হাত ধরে টানলে, বললে—ধ্যেৎ—। এস।

দীমু চিৎকার করে উঠল—আজ থেকে আমি জানব আমি নির্ব্বংশ, জানব তু মরেছিস!

বলেই সে পিছন ফিরল—পিছনে ভেসে এল বাসিনীর খিলখিল হাসি।

ইতিমধ্যে নামল বর্ষণ। পুকুরের জলে চড়বড় শব্দে জলের ধারা পড়তে লাগল।

বাড়ি এসে দাওয়ায় বসল কয়েক মুহূর্তের জন্য। বর্ষণ হচ্ছে। তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে।

মেয়েটা বললে—বাবা!

দীমু বললে—খেলা করগা যা। জ্বালাস না।

বলেই সে উঠল। কণ্ঠস্বরে তার একসঙ্গে ক্ষোভ এবং হতাশার সুর।

সদু সভয়ে বললে—কোথা যাবা?

দীমু উত্তর দিলে না। সেই বর্ষণের মধ্যেই চলে গেল।

মালিকের বাড়িতে এল সে। তখনও রিমিঝিমি বর্ষণ হচ্ছে।

মালিক তখন একলা বসে আছেন। সামনে কাগজ পড়ে আছে।

কাগজের হেড লাইনে লেখা—"থানার মালখানা ভাঙিয়া বন্দুক লুট।"

দীমু মালিকের পায়ে ধরে বললে—জমি আমার চাই না বাবু, জমির সাধ আমার মিটেছে। জমি নিয়ে আমাকে টাকা ভান। তিন শো টাকা!

—জমি বেচে দিবি?

—ছেলে মটর চালাবার লাইসেন করবে। কোম্পানীকে লাগবে। ফি লাগবে।

—বেশ—তাই নিস। যা জমা করেছিলি তাই নিস, জমি আমি নেব।

বাড়ি এসে সদুকে বললে—তাকে বলিস, লাইসেনের টাকা আমি দোব। কিন্তু বাসিনীকে ছাড়তে হবে। বলিস, লইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলব। বুঝেছিস, বলিস!

আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মৃদু মেঘগর্জন হচ্ছে। তার সঙ্গে নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের মধ্যে চলে দীমু ডাক নিয়ে।

অন্ধকারের মধ্যে চলে শুধু লণ্ঠন।

আর ঝুনঝুন শব্দ। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায়। সেই আলোতে চলন্ত দীমুর পিছনটা দেখা যায়।

ক্রমে আরম্ভ হয় বন। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আরম্ভের দৃশ্যটি ফুটে ওঠে।

ডাক্তারের গাড়ি চলে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে ঘন অন্ধকারে গড়া মূর্তির মতো একটা মূর্তি পাশ থেকে এসে দীনুর সামনে দাঁড়াল।

মাথায় পাগড়ি, মুখে ফেটা বাঁধা। সে এক দুর্বোধ্য মূর্তির মতো। হাতের একটা লোহার ডাণ্ডা উদ্যত করে—চাপা গলায় বললে—রোখকে।

দীনু চিৎকার করে উঠল—খবরদার—।

সে বল্লমটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে।

হাসপাতালে বিছানায় শায়িত বিহ্বল দীনুকে নাড়া দিয়ে নার্স বললে—

—কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?

দীনু আবার বললে, সরকার বাহাদুরের ডাক!

নার্স দিলে মুখে-চোখে জলের ছিটে।

দীনুর সম্বিৎ ফিরল—সে বললে—অ্যাঁ? অ্যাঁ!

—কী হল? চিৎকার করছিলে কেন?

দীনু বললে—না। চিৎকার করি নাই। ওই কথাগুলান মনে করছেলাম—তাই—

অপ্রতিভের মতো হাসলে।

বুটের শব্দ তুলে প্রবেশ করলেন—এস-পি। ইনস্পেক্টর। কনেস্টবল।

ঢুকবার মুখেই এস পি কথা-কটি শুনেছিলেন। তিনি বললেন—মনে করতে চেষ্টা ক'ছিলে? Good! তোমার সাহস আছে। একটু চেষ্টা করলেই মনে পড়বে সব।

তারপর চারিদিকে চেয়ে দেখে বললেন—জানলাটা খুলে দাও তো। অন্ধকার হয়ে গেছে বড্ড।

কনেস্টবল জানালা খুলে দিতেই আলো হয়ে উঠল ঘর।

দীনু চমকে উঠল। সাহেবকে বললে—সেলাম হুজুর!

নড্ করে সাহেব বললেন—এখুনি তুমি বলছিলে মনে করছিলে সব—মনে পড়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অভিভূতের মতো সে বললে।

—কী হয়েছিল? ডাক্তারবাবু বলেছিলেন কয়েক মিনিটের ব্যাপার—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী হয়েছিল? কোথা থেকে এল তারা? ডাক্তারের গাড়ির আলোতে রাস্তার উপর কাউকে দেখতে পাও নি?

—আজ্ঞে না।

—তা হলে বনের ভিতর থেকে এসেছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই বটতলার ওইখানে—

—হুঁ। সুঁদীপুরের বটতলা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কত জন? ক-জন ছিল তারা? ডাক্তার বলছিলেন, একজনকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ কী? ক-জন ছিল?

—আজ্ঞে?

—ক-জন ছিল—মনে করে দেখ।

—আজ্ঞে অন্ধকার, সি লাফ দিয়ে এসে ছামুনে—

—কে সে?

—আমি হাঁকিয়ে উঠলাম খবরদার বলে—

সে স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ দিয়ে গড়িয়ে এল দুটি জলের ধারা—

—কেঁদো না, কেঁদো না, কান্নার কিছু নাই। নিজে বেঁচেছ, ডাক বাঁচিয়েছ। সাহসী লোক তুমি, কেঁদো না।

দীনু তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললে—আজ্ঞে না।

—এখন বল, সে লোকটা কে? অন্ধকার হলেও খানিকটা নিশ্চয় চেনা যায়।

দীনু স্তব্ধ হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল।

—বল! দীনু! ধমকের সুরে ডাকলেন এস-পি।

দীনু চমকে উঠল।

—বল।, তুমি তাকে চেন! চিনতে পেরেছ! অন্ধকারেও তুমি তাকে চিনেছ! বল।

তার খুব কাছে এসে বললেন—পোস্টমাস্টারের ছেলে?

দীনু চমকে বলে উঠল—হুজুর—

—তার হাতে যেটা ছিল—সেটা লোহার ডাণ্ডা নয়, রিভলভার পিস্তল। তারই নলটা তোমার ডাণ্ডার মতো মনে হয়েছে!

দীনু কেঁদে উঠল—আজ্ঞে না। আজ্ঞে না। আজ্ঞে না হুজুর।

—তবে কে বল। অন্ধকার হলেও তুমি তাকে চিনেছ—

—সি—সি—হুজুর—সি—।

তার মনশ্চক্ষের সামনে আবার ভেসে উঠল—

অন্ধকার বনভূমে কঠিন সংগ্রামের ছবি।

সে বল্লম খুলতে চেষ্টা করছে। বলছে—সরকার বাহাদুরের ডাক—। ক্রুদ্ধ তার কণ্ঠস্বর।

আক্রমণকারী আবার চাপা গলায় বললে—মাড়োয়ারীর দু-হাজার টাকার ইনসেওর আছে। আমি লোব—।

—কে? দীনুর কণ্ঠস্বর যেন বসে গেল।

উত্তর হল—আমি! দাও!

—না—না—না। চিৎকার করে উঠল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হয়ে পড়ল ডাকের উপর। আক্রমণকারী ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকের ব্যাগ টেনে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলে।

আবার সে চিৎকার করে উঠল, আরও জোরে—না— !

ওদিক থেকে এসে পড়ল মোটরের হেডলাইট।

পড়ল আক্রমণকারীর পিছন দিকে। বটের ঝুলে পড়া ডালের ছায়া পড়ল তার উপর। সে হাতের ডাণ্ডাটা তুললে হিংস্র আক্রোশে। পড়ল সে ডাণ্ডা। মোটরের আলো এগিয়ে এল। আক্রমণকারী ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বনের মধ্যে।

দীনু একটা চিৎকার করলে—ন-আ-আ—।

ওই চিৎকারের সঙ্গে সুর রেখেই—এস-পি বললেন—না! তুমি মাস্টারের ছেলেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছ। বল—সে মাস্টারের ছেলে!

—না। না।

—হ্যাঁ। আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি।

—না হুজুর—মিছে আমি বলতে পারব না—সে—সে আমার—আমার ছেলে!

—তোমার ছেলে—?

দীনুর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নিতাইয়ের ফেটা ও পাগড়ি-বাঁধা মুখ ভেসে বড় হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন।

সেই দিকে তাকিয়ে দীনু বললে—সে নেতাই!

চারিদিকে বেজে উঠল মেঘের গর্জন।

দ্বিতীয় পর্ব

ঘরের ভিতরটা দীনু ওই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রখর বিদ্যুতালোকের ঝলকে ভরে গেল।

মেঘের গম্ভীর গর্জনে সব যেন থরথর করে কেঁপে উঠল।

ঘরের জানালাগুলি ঝড়ের বেগে আছাড় খেয়ে বন্ধ হয়ে গেল। আলোয় ভরা ঘরখানা অন্ধকার হয়ে গেল। আই-বি ইনস্পেক্টর এবং কনেস্টবল প্রায় ছুটে গিয়ে জানালা দরজা বন্ধ করে দিলে।

এস-পি দীর্ঘ এবং ব্যস্ত পদক্ষেপে বের হয়ে গেলেন।

বারান্দা অতিক্রম করে চললেন তিনি। বাইরে মেঘাচ্ছন্ন দুর্যোগময়ী প্রকৃতির অন্তরালে সূর্যাস্তের পরের অন্ধকার নামছে। বাইরে দীনুর চিৎকারে কয়েকজন নার্স কম্পাউণ্ডার বেরিয়ে এসে বিস্মিত দৃষ্টিতে ঘরটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

দুজন নার্স পরস্পরের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল।

এস-পি চলে যেতেই একজন বললে—ডাকাত ওর ছেলে?

—হ্যাঁ।

—স্বীকার করলে?

—চুপ!

কারণ এবার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন ইনস্‌পেক্টর।

ইনস্পেক্টর চলে যেতেই প্রথম মেয়েটি বললে—এরা সন্দেহ করেছিল রেভুলুশনারীদের কাণ্ড বলে। তা, ও বললে, না, সে আমার ছেলে!

অপর মেয়েটি বললে—মা গো!

ওদিকে বৃষ্টি নামল।

এস-পি হাসপাতালের এদিকের বারান্দা থেকে অপর দিকে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে দাঁড়িয়েছিল পোশাকপরা সদাপ্রস্তুত অফিসার ক-জন।

বললেন—আপনি নবগ্রামে চলে যান। অ্যারেস্ট নিতাই দাস—দীনুর ছেলে। Start immediately. It is already late—

বর্ষণ-মুখর মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে সামনের রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল। বিদ্যুৎ চমকাল, মেঘ ডাকল।

এই বর্ষণমুখরতার মধ্যে দাওয়ার উপর একটি হ্যারিকেন জ্বেলে উদাস নেত্রে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে সদু। তার চোখের কোণ থেকে ঝরে-পড়া দুটি জলের ধারার উপর আলোর ছটা পড়ে চিক্‌চিক্ করছে।

বাইরে থেকে কেউ ডাকলে—নিতাই! নিতাই!

সদু উঠে দাঁড়াল—কে গো!

—আমি। পিওন।

ভবেশ এসে দাঁড়াল—মাথায় ছাতা, হাতে লণ্ঠন।

—কী বাবু? সি কেমন আছে? খবর কিছু আর আইচে?

—এসেছে খবর। ভালো আছে। জ্ঞান হয়েছে। নিতাইকে দেখতে চেয়েছে। আমাদের সায়েব বোলপুরে তার করেছেন। নিতাইকে 'পাঠাতে বলেছেন। কাল সকালেই যেতে হবে। সে কোথা?

—সে তো বাড়িতে নেই বাবু! সেই কাল দোপর বেলাতে কোথা চলে যেয়েচে। আজও তো ফেরে নাই।

তখন সেই দীনুর ডাকবওয়া পথ ধরে—বনের মধ্য দিয়ে চলে আসছে পুলিসের গাড়ি। গাড়িতে কনেস্টবল বোঝাই। সামনে ড্রাইভারের পাশে দুজন অফিসার। হেডলাইটের

আলো অন্ধকারকে ভেদ করে সন্ধানী দৃষ্টি হেনে চলে আসছে। অফিসাররা স্তব্ধ, তাদেরও স্থির দৃষ্টি সামনের আলোর দিকে নিবদ্ধ।

একটা রেল-স্টেশনে—টিনের শেডের নিচে একেবারে একপ্রান্তে একটি লোহার থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে এক মূর্তি। মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত একখানা কাপড় শীতের দিনের র‍্যাপারের মতো ঢাকা। খানিকটা পিছনে শেডের মাঝখানে ছোট একটি স্টলে ক জন লোক চা খাচ্ছে, বিড়ি টানছে। পিছনে অনেক দূরে ট্রেনের সার্চলাইট।

স্টেশনটির নাম রাজবাঁধ। প্লাটফর্মের গায়ে কাগজে নামটা ফুটে রয়েছে।

ট্রেন এসে দাঁড়াল। স্বল্প কয়েকজন লোকের সঙ্গে লোকটিও এগিয়ে এল।

সার্চলাইটের আলোয় এবার চেনা গেল লোকটি নিতাই। সার্চলাইট সমেত ইঞ্জিন আগে চলে যেতেই সে এগিয়ে এল ট্রেনের দিকে। পিছনে প্লাটফর্ম যেখানে অন্ধকার সেই দিকে। অন্ধকারের মধ্যেই সে উঠল ট্রেনে।

ট্রেনের গার্ড বাঁশি বাজাল।

ট্রেন হুইসিল দিল।

এদিকে হাসপাতালে গভীর রাত্রে স্তব্ধ দীনু নিষ্পলক দৃষ্টিতে ছাদের দিকে চেয়ে শুয়ে রয়েছে।

বাইরে বর্ষার ব্যাঙের ডাক উঠছে। ঘরে আলোর চারিদিকে পোকা উড়ছে। দরজার গোড়ায় টুলের উপর একজন কনেস্টবল ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

একজন নার্স বারান্দার ওপাশ থেকে জুতোর একটি একক শব্দ তুলে এসে ঘরে ঢুকল।

এসে দাঁড়াল—দীনুর পাশে।

দীনু তবু তেমনি স্থির, সেই নিষ্পলক দৃষ্টি এতটুকু ফিরল না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে।

নার্স সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—এ কী? তুমি—তুমি ঘুমোও নি?

দীনুর কণ্ঠস্বর থেকে বের হয়ে এল—উঁ—হু।

—ঘুমের ওষুদ দিলাম—তবু ঘুম আসছে না?

—উঁহু!

নার্স একটু জল ভিজিয়ে তুলো দিয়ে কপালটা ভিজিয়ে দিলে; মাথায় একটু দিয়ে দিলে। তারপর বললে—একটু জল খাও।

—উঁ—হু!

—তা হলে চোখ বোজো, ঘুমুতে চেষ্টা কর। চোখ বন্ধ কর।

দীনু চোখ বন্ধ করলে।

নার্স চলে গেল। পাখাটা বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

দীনুর চোখ আবার খুলে গেল। এবার নিঃশব্দে জলের দুটি ধারা গড়িয়ে এল চোখ থেকে।

দূরে কোথায় ঘড়িতে টাওয়ার ক্লকে - ঢং ঢং ঢং শব্দে তিনটে বেজে গেল। একটা কুকুর ডেকে উঠল কোথায়। একটা প্যাঁচা ডাকল। খানিকক্ষণ ঝিঁঝির শব্দ হল। সাপে ব্যাঙ ধরার শব্দ উঠতে লাগল। তার মধ্যেই ওই ব্যাঙের ক্লান্ত কাতর শব্দই রূপান্তরিত হয়ে বাজল ঢং ঢং ঢং ঢং—অর্থাৎ চারটে। বাইরে আকাশ ফরসা।

সকাল হলো। ভোর বেলা—

দীনুর বাড়িতে তখন পুলিস এসেছে। ঘিরেছে। দূরে দূরে পাড়ার লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। উঁকি মারছে।

সদু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে দাওয়ায়। একজন দারোগা প্রশ্ন করলেন—নিতাই সেই পরশু বেরিয়ে আর ফেরে নি ?

সদু ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে বললে—না মশায়।

—কোথায় গিয়েছে ? বল!

—জানি না মশায়।

—কে জানে ? তোমার স্বামী ?

—আজ্ঞে না। সেও জানে না। উ বাসিনী বলে একটা মেয়ের সঙ্গে কোথা যেয়েছে।

—বাসিনী!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কে বাসিনী ?

—জানি না মশায়। শহর থেকে নেতাই তাকে ভাঁজো নাচতে এনেছেল। তার লেগে ওর বাবার সাঁতে ঝগড়া; আমি কত বলেছি—তা সি শোনে না। তার বাবা সি দিন মেয়েটার সাঁতে দেখে তাকে বলেছিল—আজ থেকে আমি জানব আমি নির্বংশ। তবু মানে নাই—সেই মেয়েটার সাঁতেই চলে যেয়েছে।

—হুঁ!

ওদিকে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন আর একজন অফিসার। বললেন—নাথিং ফাউণ্ড। নো ট্রেস। চল।

ওদিকে নিতাই চলেছে সেই ট্রেনে।

গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের একটা ট্রেন। হঠাৎ ট্রেনটা সিগন্যাল না পেয়ে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের বাইরে দাঁড়িয়ে গেল।

প্যাসেঞ্জাররা মুখ বের করে দেখছে। নিতাইও দেখছিল।

জায়গাটার চেহারার সঙ্গে বাংলাদেশের সাদৃশ্য নেই। পাহাড় দেখা যাচ্ছে। দূরে বন-রেখা।

নিতাই হঠাৎ উঠল এবং দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দু-চার জন লোক নিচে নেমে দেখছে। কেউ দাঁতন ভাঙছে। সেও নামল। খানিকটা মাঠের দিকে গেল। একবার ফিরে দেখল ট্রেনটার দিকে।

তারপর—রেলের সীমানার তারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপারে বেরিয়ে হনহন করে চলতে লাগল।

পিছনে হঠাৎ সিটি বাজল। সে আবার পিছন ফিরলে। দেখলে সিগন্যাল পড়েছে। গাড়ি হুস করে ধোঁয়া ছেড়ে নড়ল। চলল।

সে আবার পিছন ফিরে চলল। দ্রুত বেগে! তারপর ছুটতে লাগল। ট্রেনটা চলে গেল।

সে ছুটল। কাঁধে সেই ব্যাগটা, যে-ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বাসিনীর সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছিল।

সকালবেলায় ঠিক প্রায় সেই সময়েই—দীনুর বেডের সামনে—পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে তাকে বলছিলেন—বলেছ সে তোমার ছেলে?

দীনু সেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতেই তাকিয়ে ছিল। সে উত্তর দিল না।

তিনি আবার ডাকলেন—দীনু! দীনু!

—অ্যাঁ!

—তুমি বলেছ—ডাকাত তোমার ছেলে?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে দীনু।

—তুমি ঠিক চিনতে পেরেছিলে? সঙ্গে সঙ্গেই দীনু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

সুপার তাঁর কথাসূত্রে একসঙ্গেই বলে গেলেন—অন্ধকারে ভুল হয় নি তো?

দীনু ঘাড় নাড়লে—না।

সুপার ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে বোধ করি সবিস্ময়ে দীনুর কথাই ভাবছিলেন।

দীনু মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বললে—মিছে কী করে বলব?

ঘাড় নাড়তে লাগল শুয়ে শুয়ে—ধীরে ধীরে—'না' 'না'-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল সে।

সুপার তার গায়ে হাত রাখলেন—তোমার যে জ্বর হয়েছে দীনু। দীনু একটু বিষণ্ণ হাসল।

—এ যে বেশ টেম্পারেচার! ডাক্তারবাবু!

তিনি বেরিয়ে গেলেন ব্যস্ত ভাবে।

ওদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে—আরণ্যভূমের প্রান্ত দেশ। সেখানে একটা গাছতলায় উপুড় হয়ে ধুলোর ওপর শুয়ে আছে নিতাই। সর্বাঙ্গে ধুলো। মাথায় সেই ব্যাগটা। হঠাৎ সে মুখ তুললে। অস্তমান সূর্যের আলো তার মুখের উপর পড়ল। তার চোখ থেকে জলের ধারা গড়াচ্ছে।

আবার সে মুখ গুঁজলে—মনশ্চক্ষে দেখলে সেই অন্ধকার রাত্রের বাপের ডাক-ব্যাগ আঁকড়ে-ধরা ছবি!

সে আবার ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর উঠল। চলতে লাগল।

দূরে কোথায় বয়লারের সিটির শব্দ হল।

সে চমকে উঠে দাঁড়াল।

এদিকে টাওয়ার ক্লকে ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং! পাঁচটা।

থানার দারোগা, এস-পি, ইনস্পেক্টরের সামনে বাসিনী বসে আছে।

সে বলছে—আমি জানি না মশায়—সে কোথা! আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি। ভগবানের দিব্যি করে বলতে পারি।

সে কথাগুলি বলছে—বিনয়ের সঙ্গেই বটে কিন্তু সপ্রতিভতা আছে তার মধ্যে।

—ভগবানের দিব্যি করে ?

—কালী দুর্গা হরি যার দিব্যি করতে—

—চোপ রও হারামজাদী—

চমকে উঠে বাসিনী থেমে গেল।

—কালী দুর্গা হরি—! ব্যঙ্গ করে বললেন এস-পি।—তুই জানিস।

—আমি জানি না। আমি জানি না। হুজুর আমি জানি না। সে আমার কাছে আসত; আসত—দুটাকা একটাকা দিত। আমার সঙ্গে ভালোবাসা হয়েছিল। আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি চাই নাই। বলেছিলাম—ওই ওদের ঘরে থাকতে আমি লারব—

—হ্যাঁ—তোকে চড় মেরেছিল। তুই ওর বাবাকে গাল দিয়েছিলি।

—হ্যাঁ। সত্যি কথা। কিন্তু তার পরেতে আবার সিদিন আমার কাছে এসে পাঁচটাকা নগদ দিয়ে ভাব করে গিয়েছিল। বিয়ে করতে চেয়েছিল। বলেছিল টাকার যোগাড় করছে—লাইসেন লেবে মটর ডেরাইবারির। আমি সিদিন না বলেছিলাম। কিন্তু রাতে ভেবে দেখলাম।—চুপ করে গেল সে।

—কী বল!—এই! বল!

—হুজুর আমার সন্তান হবে! উরিরই সন্তান। তাই সোকালে আমি নিজেই গিয়েছিলাম তার কাছে। তার বাবা আমাকে দেখতে লারে; তাই গাঁয়ের ধারে গাছতলায় বসে কথা পাকা করে নিয়েছিলাম। সে আমাকে কথা দিয়েছিল—বিয়ে করে সে আমাকে নিয়ে দূর-দেশে চলে যাবে কোন শহর বাজারে। বলেছিল—টাকার যোগাড় তার হয়েছে; কাল সকালেই টাকা নিয়ে সে আমার কাছে আসবে। আমাকে তৈরী হয়ে থাকতে বলেছিল। গাছতলা থেকে বেরিয়ে আমি চলে আসছি—। একটুকুন জল খাব হুজুর।

—জল দাও।

কনেস্টবল জল দিল একটা অ্যালুমিনিয়মের গ্লাসে।

জল খেয়ে বাসিনী আবার বললে—যখন চলে আসছি—তখন উয়োর বাবা দেখতে পেয়েছিল, একটা পুকুরের পাড় থেকে হুজুর সি ডেকেছিল। আমার ভয় হয়েছিল—বাবার কাছে গেলেই উয়ার মন পালটাবে। বাবাকে ভারি ভালোবাসত। তাই আমি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছেলাম আমার বাড়ি পর্যন্ত। সাঝে পর্যন্ত আটকিয়ে রেখে ছেড়ে

দিয়েছিলাম। ওর বাবা সাঝের সময় ডাক নিয়ে যায়। আর বলেছেলাম, ভোরে আমি তৈরী থাকব। সে যেন টাকার যোগাড় করে নিশ্চয় আসে। কিন্তু সি আসে নাই। আমি আর কিছু জানি না হুজুর। কিছু জানি না। আমার কুক্ষিতে সন্তান আছে হুজুর, তার দিব্যি!

—চল, ওকে হাসপাতালে নিয়ে চল। দীনুর সামনে।

হাসপাতালে দীনুর প্রবল জ্বর।

সে প্রলাপ বকছে।

নার্স মাথায় আইসব্যাগ ধরে বসে আছে।

দীনু চিৎকার করলে—খবরদার!

তার হাত-পা শক্ত হয়ে উঠল। উঠে বসতে চাইল।

নার্স চেপে ধরলে।

কয়েক মুহূর্ত পর বলে উঠল—না—না—না! নেতাই—না।

আবার কয়েক মুহূর্ত পর বললে—না—না—না। মাস্টারবাবুর ছেলে লয়। সি আমার ছেলে। সি নিতাই। মিছে কথা বলতে পারব না। পারব না!

হঠাৎ দেখা গেল দরজার মুখে দাঁড়িয়ে এস-পি।

তার পিছনে অফিসারেরা এবং বাসিনী।

এস-পি ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন—ডিলিরিয়াম? ভুল বকছে? নার্স বললে—হ্যাঁ সার।

—টেম্পারেচার কত হয়েছে?

—একশো দুই।

দীনু বলে উঠল—নেতাই রে! ও নেতাই! নেতাই!

এস-পি নিজেই পাখাটা বাড়াবার চেষ্টা করলেন।

দীনু হতাশ কণ্ঠে বললে—যাঃ, নেতাই হারিয়ে গেল।

তারপরেই বললে—ও বাবা কী অণ্ডকার!

এস-পি বেরিয়ে গেলেন।

ঘন অন্ধকার অরণ্যের মধ্য দিয়ে—

শিল্যুট মূর্তির মতো একটি মূর্তি চলেছে। দূর আকাশের গায়ে চিমনীর মুখে আগুন।

লক্ষ্য তার সেই দিকে।

পরদিন সকালে এস-পি অফিসে ইনস্পেক্টরকে বললেন—মেয়েটাকে ছেড়েই দাও। একটু স্তব্ধতার পর বললেন—ও এর বেশী কিছু জানে না। ছেড়ে দাও। বলে দাও কোথাও যেন না যায়। কীপ ওয়াচ! ইনস্পেক্টর চলে গেলেন। এস-পি ঘণ্টা বাজালেন। আর্দালীকে বললেন—নিরঞ্জনবাবু!

আই-বি নিরঞ্জনবাবু এসে দাঁড়াবা-মাত্র বললেন—এইটে—সারকুলেশনের জন্যে আজই প'ঠান, টু অল রেলওয়ে স্টেশনস্—পোস্ট অফিসেস—আদার পাবলিক প্লেসেস; ফটোগ্রাফ থাকলে ভালো হত কিন্তু উপায় নেই।

কাগজটা হাতে দিলেন।

আই-বি বললে—Postal department-এর চিঠিটার—? বলতে চাইলে, কী জবাব দেব—বা কী করব ?

এস-পি বললেন—সারটেনলি। দীনু মাস্ট বি রিওয়ার্ডেড। আমরাও কিছু রিওয়ার্ড দিতে চাই পুলিস থেকে। লোকটা—

তাঁর মনশ্চক্ষে রোগশয্যায় শায়িত দীনুর সেই ছবিটুকু ভেসে উঠল—না। মিছে কথা আমি বলতে পারব না। মাস্টারবাবুর ছেলে নয়। সে—সে আমার, আমার ছেলে।

এস-পি বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সামনে লনে অজস্র ঘাসের ফুল ফুটেছে।

নবগ্রাম পোস্টাপিসে নিতাইয়ের বিবরণ সম্বলিত সারকুলারটি টাঙানো রয়েছে নোটিশ বোর্ডে।

সেটি পড়ছে—সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

বিজ্ঞপ্তি

৫০০ টাকা পুরস্কার

ফেরার আসামী নিতাইচরণ দাস—বয়স কুড়ি বাইশ, লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। রঙ কালো—সবল স্বাস্থ্য—গলায় হারে বাঁধা রূপোর তক্তি।

নিত্যানন্দবাবু বেরিয়ে এসে বললেন—পড়ছেন ?

—হ্যাঁ।

বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—এমন বাপের ছেলে, ছোঁড়াটা এ কী করলে বলুন দেখি !

নিত্যানন্দ বললেন—আমার দিকে চেয়ে দেখুন না। আমার মতো ভীতু, সরকারী গোলাম—আমার ছেলে—

—সায়েব না দীনুকে অমরের নাম করতে বলেছিল ?

চাপা গলায় বললে সুরেশ।

—হুঁ। কিন্তু সে তা করে নি।

—দীনুকে না কি রিওয়ার্ড দেবে ?

—হ্যাঁ। আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আড়াই শো টাকা। আর পুলিসও বোধ হয় দেবে।

একজন পিওন ডাক হাতে—রেজেষ্ট্রি ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে গেল।

নিত্যানন্দ বললেন—দীমুর বাড়ির একবার খোঁজ নিও ভবেশ।

স্বরেশ আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই নোটিশটা পড়তে লাগল—"৫০০ টাকা পুরস্কার।"

ওদিকে দীমু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। তার মাথাটা কামানো। সেখানে একটা ক্ষতচিহ্ন।

তার সঙ্গে একজন সাব-ইনস্পেক্টর অব পুলিস।

একটা রূঢ়দর্শনা জমাদারনী একটা বেড প্যান পরিষ্কার করে নিয়ে ফিরছিল।

সে বললে—যাচ্ছো? হাসপাতালসে ছুটি?

দীমু ম্লান হেসে বললে—হ্যাঁ।

—তোহ্‌রা বেটা? বেটাকে পতা মিলল? না মিলল?

বলতে বলতেই দীমু তাকে অতিক্রম করে চলে গেল।

মেয়েটা বলতে বলতে গেল—না মিলেসে—উ বেঁচেসে। তু আচ্ছা বাপ!

সাব-ইনস্পেক্টর ধমক দিলেন—এই! যাও আপনা কামমে যাও।

দীমুকে নিয়ে এল জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে।

পোস্টাল-স্থপার, পুলিস-স্থপারও উপস্থিত সেখানে।

ডি-এম তাকে একটি থলি হাতে দিয়ে বললেন—সরকার বাহাদুর তোমাকে এই আড়াই শো টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। আর এই পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছেন—পুলিস থেকে। তোমার সাহসের জন্য, কর্তব্যপরায়ণতার জন্য: সবচেয়ে বড় কথা তুমি তোমার নিজের ছেলেকে বাঁচাবার জন্যও সত্য গোপন কর নি, মিথ্যা অন্যের নাম কর নি, এই দুর্লভ সততার জন্যে তোমাকে দিচ্ছেন। ধর।

দীমু কলের পুতুলের মতোই নিলে। হেঁট হয়ে নমস্কার করলে।

এস-পি বললেন—হ্যাঁ। সাহস থাকলে এবং দেহে শক্তি থাকলে ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। হয়তো লড়াই করে রুখতেও পারে। লড়াইয়ের মধ্যে মরতেও পারে। কিন্তু—

পোস্টাল-স্থপার বললেন—তোমার জন্যে এক মাসের ছুটি স্যাংশন করেছি।

দীমু বললে—ছুটি?

—হ্যাঁ। বিশ্রাম নাও।

—বি-স্‌ সেরাম!

—হ্যাঁ। শরীরটা সারা দরকার।

—আজ্ঞে বেশ।

দীমু গ্রামে ফিরল।

ঠিক প্রবেশমুখেই থমকে দাঁড়াল।

সামনেই সদর রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। দু পাশে দোকানদানী। লোকের ভিড়।

দূরে দেখা যাচ্ছে—একটা দোকানের সামনে বাউল গান করছে—

কুল আর কলঙ্ক নিয়ে, কি করি হায়, বলবে কে সে ?
কুলে আমার, সোনার শথ্যে, কলঙ্ক কালো ভালোবেসে।
শ্যাম কালো এ নয়ন কালো কলঙ্ক মোর, কালো কেশে।
কালো আমার চোখের তারা কি করি হায় বলবে কে সে ?
কুল রাখি, না, শ্যাম রাখি হায়
কুল রাখিলে শ্যাম যে হারায়—
শ্যামের প্রেমে, কুল ভেসে যায়, অকুল পাথার, ডুবি শেষে।
পা-থারে—
(ও-অকূল পাথার—তল নাই তার ডুবি শেষে—)
কি করি হায়, বলবে কে সে ?
কুলের সোনার কোটায় আমার, প্রাণ-ভ্রমরার বাস ;
কালিদহের শ্যাম-কমলের, মধুই শুধু আশ ;
কুল গিয়েছে শ্যাম গিয়েছে
সোনার রাধা লু-টা-ই-ছে—
তবু রাধা কলঙ্কিনী, নাম রটিল দেশে।

গানের মধ্যেই সামনে রাখা ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা পড়ে গেল।

গান শেষ করেই সে—বোল হরি বোল, বোল হরিবোল—বলতে বলতেই পাত্রটি তুলে নিয়ে চলতে লাগল। হাতে তার একতারাটি টুং টুং শব্দে বেজেই চলল।

দীনুর বাড়িতে তখন দীনু এসে স্তব্ধ মূক হয়ে বসে আছে মাথায় হাত দিয়ে। প্রথম ঝড়টা কেটে গেছে। সদু মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পাড়া-প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্য থেকেই কথা বলছে। কথা নয় বাণ। শব্দভেদী বাণের মতো কথাগুলি এসে তাকে বিদ্ধ করছে। নিক্ষেপকারীকে দেখা যাচ্ছে না। নারী এবং পুরুষের কণ্ঠ দুইই আছে।

—বলিহারি বাবা বটে বাবা। বাহাদুর বাবা।

—জিভ দিয়ে বেরুলো তো ছেলের নাম ?

—পাথর লো পাথর। বাবা নয় পাথর।

—ধাম্মিক লোক। পাথর নয়—ধাম্মিক !

—যুজিস্টির ! দীনবন্ধু নয়, উনি আমাদের যুজিস্টির—

—নগদ তিন শো টাকা পেলে যুজিস্টির সবাই হয়।

—এইবার ধরিয়ে দিয়ে আরো পাঁচশো পাবে।

এবার ঘরের একটা কোণের পাশ দিয়ে প্রবেশ করল এক বৃদ্ধা। সে বললে—ই সব তোমরা কী বলছ? বলি ধরম তো আছে, না নাই? দেবতা না হয় পাথরের, কিন্তুক ধরম তো সত্যি, না কী। দীনু তো অন্যায় অধরম করে নাই! লোকটাকে বিঁধছ ক্যানে এমন করে?

—অ-মা গ্‌ অ! এ যে সেই বন থেকে এলেন মাসী, বুনপো তোকে ভালোবাসি! সেই বিত্তান্ত! বুনপোর পরে হাঁড়ি-ফাটা ভাতের মতো ভালোবাসা একেবারে ছতবক্সার হয়ে গেল!

চাপা হাসির গুঞ্জন উঠল।

বুড়ী বললে—বলি তা হলে মুখ খুলব নাকি? হাটে হাঁড়ি ভাঙব নাকি? বলি ওলো—অ লেবারণের বউ! বুড়ো হলেও কান আমার খুব খর লো! একে ঘুম হয় না, বুড়ো মানুষের ঘুম কম। আত দুপুরে গলি দিয়ে পা মটমটিয়ে লেবারণ কোথা যায় লো? আবার শেষ আতে—

দীনু এতক্ষণে বললে—চুপ কর পিসী! পাঁচ জনার মুখ, দু হাত দিয়ে কী করে বন্ধ করবা বল! ওই দেখ সদু কাঁদছে। তার মায়ের পরাণ, কী বলব তাকে? টাকাও তো আমি পেয়েছি পিসী। নিয়েছি। আবার সি যদি কোনো দিন ফিরে আসে তবে—? তখন কী করব আমি? ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বললে—সি যেন আর ফিরে না আসে পিসী, কখুনো না আসে—।

সেই সময়েই নিতাই হাজারিবাগ অঞ্চলে একটা ছোট শহরে একটি মোটর মেরামতের কারখানায় একটা লরির পাশে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। তার গায়ে তেলকালি লাগা একটি গেঞ্জি। পরনে একটা তেমনি হাফপ্যান্ট। লরিটা মেরামত হচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে বড় একটা কারখানার চিমনী।

নিতাইয়ের মুখে বয়সের অনুযায়ী দাড়িগোঁফ বেরিয়েছে। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া হয়েছে।

একটা গাছতলায় মালিকদের দুজনে বসে কাগজ পড়ছেন।

"৫০০ টাকা পুরস্কার! ফেরারী আসামী নিতাইচরণ দাস, বয়স বাইশ-তেইশ। লম্বায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। রঙ কালো—সবল স্বাস্থ্য—।"

অন্য জন বাধা দিয়ে বললেন—খবর ছেড়ে বিজ্ঞাপন পড়তে লাগলে। খবর পড়।

নিতাই ওদের দিকে মুখ তুলে তাকালে। তারপর ঘুরে বসল।

ভিতর থেকে কেউ ডাকলে—এই নতুন ছোকরা! কী নাম? এই!

—আজ্ঞে গৌর।

—একটু এগিয়ে দেখ—সাইলেন্‌সার পাইপটা মেরামত করতে গিয়েছে, আসছে কি না দেখ তো।

নিতাই বললে—যাই! যাবার সময় গাছের ডালে ঝোলানো জামাটা নিয়ে কাঁধে ফেললে।

সে বেরিয়ে এল রাস্তার উপর।

খানিকটা এসে রাস্তা থেকে নেমে সে প্রান্তরে নেমে পড়ল।

কিছু দূর এসে সে পেলে একটা শাল জঙ্গল। তার ভিতর ঢুকে সে একটা গাছতলায় বসে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজল। যেন এলিয়ে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আবার সোজা হয়ে বসল। কোমর থেকে বের করলে একটা গেঁজলে। সেটা খুলে একে একে বের করলে একখানা দশটাকার নোট, একখানা পাঁচ টাকার, খান তিনেক একটাকার; খুচরো কিছু রেজকি। তার সঙ্গে বের হল একটা কারে-বাঁধা রূপোর তক্তি। তক্তিটা তুলে দেখলে। সেটাতে নাম লেখা 'নিতাই'। একটা পাথরের উপর রেখে সেটাকে অন্য একটা পাথর দিয়ে ভেঙে ফেললে। তারপর একে একে আবার সব পুরলে। কোমরে বাঁধলে। আবার চোখ বুজে গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল। চোখ দিয়ে জল গড়াল। সেই অবস্থাতেই জামাটার পকেট খুঁজে বের করলে খবরের কাগজে মোড়া কিছু।

একটা আধ-খাওয়া পাঁউরুটি।

ক্লান্তভাবে খেতে লাগল।

খেতে খেতেই উঠল, চলল।

কিছু দূর এসেই একটা ছোট জোড়—অর্থাৎ পাহাড়িয়া নালা। এক পাশে শীর্ণ জলধারা বয়ে যাচ্ছে। সেখানে জল খেয়ে নিয়ে আবার চলল।

কোথায় যাবে?

সামনে পাথুরে প্রান্তর। পায়ে-চলা পথের রেখা চলে গেছে। কোথায় মুখ কে জানে?

থমকে দাঁড়াল।

হঠাৎ চোখে পড়ল এক পাশে অর্থাৎ ডাইনে বা বাঁয়ে আকাশের গায়ে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া লম্বা হয়ে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

রেলের ধোঁয়ার মতো।

রেলের ধোঁয়াই বটে। দূরান্তে ট্রেনের হুইসিল শোনা গেল।

দিক পরিবর্তন করে সে সেই মুখে চলল।

আকাশে তখন সন্ধ্যা নামছে। পাখিরা নীড়ে ফিরছে। কলকল শব্দ উঠছে।

সে শব্দ শুনে একবার আকাশের দিকে তাকাল। একটা গাছে পাখিরা বসল।

সে দেখলে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার চলল।

অন্ধকারে এতক্ষণে নজর হল—একটা সবুজ আলো। সিগন্যালের আলো।

সে চলতে লাগল। চলবে সে। বাঁচবে।

• দীনু আপনার বাড়িতে গোরুর কাছে বসে তাদের গায়ে হাত বুলুচ্ছে।

সতু সেই শুয়ে আছে। পা থেকে মুখ পর্যন্ত ঢেকে; প্রায় মৃতের মতো পড়ে আছে সে। নিস্পন্দ, নীরব।

দীনু হঠাৎ যেন বললে—শুনছিস ? ওঠ্‌।

সদু ঘাড় নাড়লে—না—না—না।

—না নয়। ওঠ্‌। কী করবি ? বাঁচতে হবে তো !

এবার সদু বললে—না—। বাঁচতে সাধ আমার নাই। সে সাধ আমার মিটেছে। পথে ঘাটে লোকে টিটকিরি দেয়—বলে যুজিস্টিরের পরিবার। শুধু যুজিস্টির নয়, নগদ তিনশো টাকার যুজিস্টির—

তার কথার আবেগের মুখে বাধা পড়ল।

—দীনু—দীনু ! দীনু রয়েছিস ? বলে কাগজ হাতে ঘরে ঢুকল সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

সদু ঘোমটা টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে বললে—খবরের কাগজে তোর কথা বেরিয়েছে দীনু। ছবি সুদ্ধ। এই দেখ্‌।

দীনুর হাতে সে কাগজখানা দিলে।

সুরেশ বলছিল—আমি পাঠিয়েছিলাম ! ওরে, অন্য দেশ হলে—

দীনু কাগজের ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখে—আস্তে আস্তে ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

লম্বা ফালি করে—একটা দুটো তিনটে ফালি করে দিলে।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে স্তব্ধ হয়ে দেখছিল।

ছেঁড়া হয়ে গেলে—ধরা-গলায় অপরাধীর মতো বললে—দীনু, আমি বুঝতে পারি নাই। আমাকে তুই—। তুই কিছু মনে করিস না—

এরই মধ্যে দীনু ধীরে ধীরে উঠল—এবং চলে গেল বেরিয়ে ! কথা শুনবার জন্যে বা উত্তর দেবার জন্যে অপেক্ষা করে রইল না।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে চলে গেল মাথা নিচু করে।

শূন্য অঙ্গনটায় ছুটে এসে ঢুকল একটা বা দুটো ছাগল ছানা, কয়েকটা হাঁস মুরগী। এই সময়ে এসে ঢুকল সেই পিসীবুড়ী, তার কাঁখে একটা মাটির কলসী।

—অ বউ ! আন্না চড়িয়েছিস না কি ? কই ? কোথা গেলি সব ? আমার দেরি হয়ে গেল। ওই নোটন থানদারের সঙ্গে লেগেছেলাম। বললাম, তু চোরকে বলিস চুরি করতে গেরস্তকে বলিস সতর হতে ; তু বুঝবি না। এ তু বুঝবি না।

কলসীটা নামিয়ে দাওয়ায় উঠল সে।

—কই গেলি কোতা ? অ—হ—হ—কোথাও কিছু নাই—কাঠ-মাঠ—

সদু বেরিয়ে এল।

—তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না পিসী। আমি নিজেই চড়াছি আন্না।

—কষ্ট ? আমার ? সর্‌। বেশী বকিস না। তু বোস ! যোগাড়টা করে দে শুধু।

দীনু ফিরে এসে তার বল্লম পোশাক নিয়ে বেরিয়ে যায়।

পিসী বলে—ও দীনু ওসব নিয়ে কোথা চল্লি ?

—কাজে! ছুটি বাতিল করে দেলাম।—ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সে চলে গেল।
সে চলবার সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগল ঝুন-ঝুন ঝুন-ঝুন শব্দ।
ঝুন-ঝুন শব্দ রাত্রির অন্ধকারে বাজতে থাকে অরণ্যপথে।
ওদিক থেকে আসে মোটরগাড়ি।—প্লেটের নম্বর—1942.
বারেকের জন্ম ঝুন-ঝুন শব্দ থামে।
দীনুকে দেখা যায় না। তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, চাপা গলায় ডাকে—নেতাই!
একটা রাত্রিচর প্যাচা ডেকে ওঠে। ক্যাঁচ—ক্যাঁচ।
আবার ওঠে ঝুন-ঝুন ঝুন-ঝুন শব্দ।
আবার আসে মোটর—এবার প্লেটে লেখা—1943
আবার শব্দ থামে।
আবার ডাকে দীনু—নেতাই!
এবার ডেকে ওঠে শেয়াল। অথবা সেই পেঁচাই ডেকে ওঠে।
আবার শব্দ ওঠে ঝুন-ঝুন—ঝুন-ঝুন।
আবার গাড়ি আসে—
পর পর পেরিয়ে যায় 1944—1945.
দীনুর ডাক শোনা যায় তুবার—নেতাই! নেতাই!
কুকুর ডাকতে থাকে ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ—!
বোলপুরের আলো দেখা যায়।
তারপর আসে বোলপুর স্টেশন।

বোলপুর প্লাটফর্মে বাসিনীকে দেখা যায়—একটি চার-পাঁচ বছরের শিশুকে নিয়ে ঘুরছে। ছেলেটা ঘুমন্ত। প্যাসেঞ্জারদের কাছে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। ভিক্ষে করলেও তার স্বভাবের ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট। সাজ-পোশাকের জীর্ণতার মধ্যেও।

হঠাৎ এসে বাসিনী থমকে দাঁড়াল।

ল্যাম্প-পোস্টের নিচে তুজন রানার বাঘবন্দী খেলছে। তার একটু দূরে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে দীনু। দীনুর মুখে চোখে চুলে কয়েক বৎসরের ক্লান্তির চিহ্ন।

বাসিনীকে দেখে একজন রানার বললে—ও বাবারে!

অপর একজন বললে—ক্যা—রে?

—আমাদের যুজিস্টিরকে দেখছে লাগছে? কী কাণ্ড?

বাসিনী এগিয়ে গিয়ে রূঢ় কণ্ঠস্বরে বললে—রাক্কস! তু রাক্কস! তু রাক্কস!

দীনু চমকে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে উঠে দাঁড়াল।—রাক্কুসী, ডাইনী,—তু সেই বাসিনী!

—হ্যাঁরে ছেলে-খেকো রাক্কস—আমি সেই—

—খবরদার !

—কেয়া হুয়া ? কনেস্টবল এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন।

বাসিনী এবার ছুটে পালিয়ে গেল।

দীনু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকে প্রশ্ন করতে গেল। কিন্তু সে সমস্ত ঢেকে বাজল ঢন-ন-ন ঘণ্টা। প্লাটফর্ম সার্চলাইটের আলোয় আলো হয়ে উঠল।

দীনুর বাড়িতে শেষ রাত্রে অন্ধকার ঘরে রুগ্না সদু ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠল—নে-তা-ই !

পাশেই শুয়ে ছিল বুড়ী পিসী।

সে জেগে উঠল—ডাকলে—বউ !

আবার ডেকে উঠল সদু—নেতাই ! এবার চাপা গলায়।

পিসী আবার ডাকলে—বউ !

—দেখ তো পিসী, দুয়োরটা খোল তো। দেখ তো। মনে হল সি ডাকলে !

সে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলে।

—উঠিস না। তু উঠিস না। আমি দেখছি।

পিসী তাড়াতাড়ি উঠে ডিবে জেলে দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

তখন ভোর হচ্ছে। পাখি ডাকছে মধ্যে মধ্যে।

উঠান জনশূন্য। রাত্রির আকাশও যেন ধোয়ামোছা। ভোরের আমেজে তারাগুলিও অদৃশ্য হয়ে গেছে। উঠানের ফুলগাছটা পুষ্পহীন রিক্ত।

শুধু একটা কুকুর শুয়ে ছিল উঠানে। সেটা সাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়াল। লেজ নাড়তে লাগল।

ভিতর থেকে সদু প্রশ্ন করলে—পিসী ?

—কই, কেউ কোথাও নাই বউ !

সদু এবার কোনোক্রমে দরজার মুখে এসে ডাকলে—নেতাই !

পিসী বললে—তা হলে তু স্বপন দেখেছিস বউ।

সদু বললে—স্বপন ? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—হবে।

সকালবেলায় দীনু ডাক নিয়ে ফিরে আসার পর সদুর শিয়রে বসে তার সকালবেলার মুড়ি এবং অল্প একটু মদ খেতে খেতে প্রশ্ন করলে—

—কী স্বপন দেখলি সদু ?

সদু ঘরের চালের দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে তাকিয়ে সেই স্বপ্নের স্মৃতিরই যেন রোমন্থন করছিল। সে চুপ করেই রইল।

দীনু বললে—স্বপন হয়তো লয় সদু ! সে হয়তো এসেছিল।

সতু উত্তর দিলে না।

দীনু বললে—সেই বাসিনী মেয়েটারে কাল এতে বোলপুর ইষ্টিশানে ছাখলাম এতকাল বাদে। কোলে একটা ছেলে! আমার সন্দ হচ্ছে সতু!

সতু এবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে চাইলে।

দীনু বললে—সন্দ হচ্ছে সতু; সিও ওই বাসিনীর সাঁতেই আছে। বন-জঙ্গলে—না-হয় কোথাও—

সতু বাধা দিয়ে বলে—উঁহু! উঁহু!

দীনু সবিস্ময়ে বললে—কী?

সতু বললে—আমি দেখলাম সি একটো মস্ত নদী—শুধুই জল—তারই মধ্যে এই বড় বাড়ির মতন না একটো। তার উপরে মস্ত খুঁটি—সি তারই ওপরে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে।—মা—! পষ্ট 'মা' আমার কানে এল। ঘুমটো ভেঙে গেল। আমি 'নেতাই' বলে চেঁচিয়ে ওঠলাম। তার পরেতে মনে হল—সি হয়তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

ওই স্বপ্নের ছবিটা তার চোখের উপর ভেসে উঠল।

কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে শিল্যুটের মতো ছবি। একটা স্টীমারের মাস্ট ধরে নিতাই দাঁড়িয়ে আছে।

মুছে গেল সে-ছবি। সতু ঘাড় নেড়ে বললে—বাসিনীর সাঁতে? না-না বলে সে ঘাড় নাড়লে।

—ছেলেমানুষ—প্রেথম জন-বয়সে ভুল করেছিল। কিন্তু না-না বলে আবার ঘাড় নাড়লে।

দীনুও আপন মনে ঘাড় নাড়লে। না-না-না। অর্থাৎ সে ওই বাসিনীর সঙ্গেই আছে। সে কাস্তে মাথাল নিয়ে বেরিয়ে এল।

বাইরে উঠানে পিসী গোবর মাখছিল।

সে বললে—দীনু! বোলপুর থেকে কাল একটুকুন তামাকপাতা এনে দিস বাবা।

—আনব। সে চলে গেল।

হেসে পিসী বললে—স্বপনের কথা শুনলি বাবা?

দীনু তখন চলে গিয়েছে।

কিন্তু পিসী বলেই গেল—ভোর বেলার স্বপন। উ মিছে হয় না। সি এবারে আসবে। আসবে।

রাত্রে বোলপুর প্লাটফর্মে বাসিনী একটা জায়গায় বসে একজন ছোকরার সঙ্গে চা খাচ্ছিল, বিড়ি খাচ্ছিল, আর হি-হি করে হাসছিল।

ছেলেটা শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

ছোকরা বললে—হাসছ ক্যানে ?

—হাসছি ক্যানে ? মনে হচ্ছে ! ওই কথাই সবাই বলে হে !

—সবাই বলে ?

—হ্যাঁ—সব্বাই। আমি কী বলি জান ?

—কী ?

বাসিনী গলা বাড়িয়ে তার মুখের কাছে মুখ এনে গুনগুন করে গেয়ে দিলে—নিত্য নতুন ফো-টে শালুক বাসি ঝরে গেলে হে ! নীল যমুনার জলে হে ! বলে সে হেসে উঠল। কিন্তু সে হাসি মাঝপথেই থেমে গেল।

হঠাৎ অদূরে কোন অন্ধকার স্থানে ক্রুদ্ধ জন্তুর মতো চিৎকার উঠল।—আঁ—

চমকে উঠে থেমে গেল বাসিনী। চমকে উঠল লোকটাও। পিছনে প্লাটফর্ম থেকে লোকজন ছুটে এল—এই—এই—এই—এই !

—কী হল ? কী হল ?

বাসিনী উঠে দাঁড়াল। অন্যদিকে চিৎকার উঠছিল—খুন করে ফেলাব। আঁ—!

আর শব্দ উঠছিল—প্রহারের।

সে কণ্ঠ দীনুর। সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কণ্ঠের চিৎকার—বুড়ো বদমাশ। এই—এই—এই !

আবার কেউ বললে—ছাড়—ছাড়—ছাড় !

বোলপুর পোস্টাপিসে দীনু মাথা হেঁট করে উপুড় হয়ে দুই হাতে মাথা ধরে বসে ছিল।

তার কপালের এক জায়গা ফুলে উঠেছে। একটা জায়গা কেটে গেছে।

অন্য একজন তরুণ রানার, তার চুল বিশৃঙ্খল—শরীরে আঘাতের চিহ্ন। সে বলছিল—ও একটা বদমাশ মেয়ে—নচ্ছার মেয়ে—ভিক্ষের নাম করে শয়তানী করে বেড়ায়। ওই ছেলেটা ওর বেজন্মা ছেলে। তিন বার ছেলে ফেলে পালিয়েছে। ওর পাশে ওই বুড়ো ঘুরঘুর করছিল—তাই হেসে আমি বলেছিলাম একটা কথা। হুজুর আমার ওপর একেবারে—ক্ষ্যাপা ভালুকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল—।

মাস্টার বললেন—ছি—ছি—ছি ! দীনুর মতো লোককে এই কথা তুমি বলেছ ? ছি—ছি—ছি। ও অতি সজ্জন লোক।

দীনু এবার বললে—হুজুর ওই সব্বনাশী আমার ছেলেকে ভুলিয়েছিল—ওর তরেই সে—।

কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল।

একটু থেমে বললে—আমার পরিবার আর বাঁচবে না। সে বলেছিল—ওই মেয়েটারে একবার শুদিয়ো উ যদি জানে—সি কোথা আছে। তাই—।

—ছি-ছি-ছি। তুমি ক্ষমা চাও দীনুর কাছে। ক্ষমা চাও।

দীনু বলে উঠল—না, বাবু না। না—না। বাবু না।

উঠে সে ছুটে পালিয়ে গেল যেন। মাস্টার ডাকলেন—দীমু—দীমু!

নদীর ধারে সামনে খানিকটা জঙ্গল।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে দাঁড়িয়ে ডাকছিল—দীমু—দীমু! দীমু!

জঙ্গলের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল দীমু। তার মূর্তি রুক্ষ—শোকাচ্ছন্ন—কপালে সেই আঘাতের চিহ্ন। কিন্তু মুখে উদাসীন প্রশান্তি। গায়ে একটা গামছা জড়ানো।

—বাবু! আপনি! এই শ্মশানে ছুটে এয়েছেন?

—শুনে থাকতে পারলাম না রে! কাল থেকে বাড়ি ছিলাম না। আজ দশটায় বাড়ি ফিরে শুনলাম—

—হ্যাঁ বাবু,—সতু খালাস পেয়েছে। কাল ভোরে স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল। আজও আবার ভোর বেলাতে নাকি তেমুনি স্বপন দেখে ধড়মড় করে উঠে দুয়োর খুলতে যেয়েছিল নিজে—বুকে বেথা ধরে—। স্তব্ধ হয়ে গেল সে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ হেসে বললে, আমি এসে মরা মুখটাই দেখলাম।

সে তাকাল এবার পাশের দিকে।

সেখানে চিতা জ্বলছিল। কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল।

দীমু সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে—মাস্টারবাবুর ছেলের চিঠি এয়েচে আজ?

—হ্যাঁ। পাটনা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। গবরমেণ্ট তো সব ছেড়ে দিচ্ছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছে সব।

—নেতাইয়ের খবরও তুই পাবি। বুঝলি। আমার মন বলছে রে! বলেই সে অপ্রতিভের মতো হয়ে গেল। বললে—মানে এইবার তো ইংরেজরা চলে যাবে শুনছি। তখন দেশ স্বাধীন হলে সব মাপ করে দেবে কিনা! নিতাইয়ের তখন আর ভয় থাকবে না।

—কে জানে মশায়!

বাঁড়ুজ্জে বললে—এবার তু—। বলেই থেমে গেল।

দীমু প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে?

—কাজ ছেড়ে দে। পেনসন নে।

—কাজ ছেড়ে কী করব? দিন কাটলে, রাত কাটবে না যে। সে গভীর নৈরাশ্যে আকাশের দিকে তাকালে—তাকিয়ে থেকেই বললে, রেতে বাড়িতে একা জেগে থাকব গেরাম পিথিমী ঘুমুবে! না সে আমি লারব! সতু সরে গেল বাবু ওই করে। একটু থামল, আবার বললে। এ—কেটে যায় বেশ—ডাক নিয়ে যাই আসি। একটু বেপরোয়া হয়েই বললে—বেশ কাজ বাবু। পিথিমীর সুখ-দুঃখের খবর আনি—আমার কিছু নাই।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল—দীমুর বাড়িতে দীমু উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। পিসী বসে আছে দাওয়ায়।

সে কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছচে।

তিনজন গোরু বাছুরের পাইকার অর্থাৎ দালাল—চারটি গোরুর দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন এক গোছা দশটাকার নোট গুনছে।

দীনু গোরু বাছুরগুলি বিক্রি করে দিচ্ছে।

নোটগুলি দীনুর হাতে দিয়ে লোকটি বললে—গুনে নাও।

দীনু গুনলে না। হাতে ধরে রেখেই বললে—ঠিক আছে ভাই।

লোকটি সঙ্গীদের বললে—চল।

একজন হাতের লাঠি উঁচিয়ে বললে—হেট্—হেট্।

দীনু বললে—দাঁড়াও।

লোকটি ঘুরে দাঁড়াতেই সে বললে—আল্লার নাম নিয়ে কসম খেয়েছ—মনে আছে তো?

—তোবা তোবা। তাই মনে না থাকে? তোমার গোরু কসাইয়ের হাতে দিব না। গেরস্তকে বিকৃরি করব। তাও ভদ্দর ঘরে যারা নিজের হাতে গোরুর সেবা করে না তাদের দিব না। গরিব চাষীর ঘরে দিব। গোরু ঘখের ধন। খোদা কসম! তোমার দুখ কি আর বুঝি না!

দীনু আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে বললে—আর একটি কথা। তোমরা দাঁড়াও। আমি হব্বা পেটি নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাই—তারপর নিয়ে যেও।

সে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

দাওয়ায় উপবিষ্ট পিসী এবার বললে—সব বেচে দিলি বাবা! আমি যা হোক তা হোক করে সেবা করতাম।

—না পিসী! সে তোমারও কষ্ট ওদেরও কষ্ট! আর গাই ছিল সদুর! বলদ ছিল নেতাইয়ের—

বলতে বলতে বেরিয়ে এল—উঠানে নামল। বললে—তারাই নাই—আর—বন্ধন রেখে কী হবে?

কথাটা শেষ হল তার বাড়ির বাইরে।

পশ্চিম দিগন্তে তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে।

মাঠের পথে দীনু পশ্চিম মুখে হনহন করে গিয়ে—বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন দীনুর বাড়িখানি প্রায় জনশূন্য। পাইকারেরা গোরু নিয়ে চলে গেছে। বুড়ী পিসি একা জরতীর মতো বসে আছে। স্তব্ধ। চোখে জলের ধারা। একটা কুকুর বসে আছে। অন্ধকার ঢেকে আসতে আসতে ঢেকে গেল পরিত্যক্ত বাড়িটা।

পরের দৃশ্যে বোলপুর স্টেশনেই প্লাটফর্মের সেই লাইটপোস্টের নিচে একজন ডাকহরকরা এসে গামছা দিয়ে ঠাঁইটা পরিষ্কার করে—বসতে গিয়ে চারিপাশ তাকিয়ে দেখে দীনুকে

না দেখে ডাকলে—দীনু দাদা! ওই! কোথা গেলে হে?

দীনু তখন ওভারব্রিজের নিচে অন্ধকারে একলা বসে আছে।

ডাকহরকরাটি তার সামনে দিয়েই চলে গেল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ডাকলে—দীনু দাদা!

দীনু উত্তর দিলে না।

লোকটি বললে—ভ্যালা মানুষ! শোকাতাপা মন নিয়ে—চাকরি করাকেও বলিহারি যাই! আর কাজই যদি করবি—সে চলল এগিয়ে—দীনু দাদা!

দীনু উঠে পড়ল।

বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে।

এসে ঢুকল থার্ড ক্লাস ওয়েটিং শেডে।

শেডে তখন খুব হাঁক-ডাক নাই।

যাত্রীরা ঘুমুচ্ছে। কেউ বিড়ি খাচ্ছে। নানান ভেণ্ডারেরা বসে আছে।

দীনু চলেছিল স্টলের দিকে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল।

একজন কুলী শুয়ে আছে আর বাসিনীর ছেলেটা তার পা টিপছে।

দীনু স্টলের পথ ভেঙে এসে দাঁড়াল কাছে।

—এই ছেলে!

ছেলেটা চমকে উঠল। তার মুখের দিকে তাকাল সবিস্ময়ে।

—উ কী হচ্ছে? অ্যাঁ?

—পা টিপছি!

—পা টিপছিস?

—হ্যাঁ—পয়সা দেবে একটো!

—পা টিপছিস? একটো পয়সা দেবে? কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে হঠাৎ বলে উঠল—শুয়ারের বাচ্চা! অধম্মের চারা!

কুলীটা উঠে বসল।

সকলে সচকিত হয়ে উঠল।

কুলীটা বললে—কেয়া হুয়া? কেঁও গালি দেতা হ্যায় উস্কো?

দীনু ভ্রূক্ষেপ না করে বললে—তোর মা কোথা?

ছেলেটা বললে—মা কোথায় চলে যেয়েছে একটো নোকের সঙ্গে। শ্রোতারা হেসে উঠল।

দীনুর কণ্ঠস্বর সে হাসিকে ছাপিয়ে উঠল—তু মরে যা! তু মরে যা! তু মরে যা!

বলতে বলতে সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল—মিশে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

প্লাটফর্মের একপ্রান্তে তখন সঙ্গী ডাকহরকরা ডাকছিল—দীনু দাদা হে!

ডাকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল।

সে ঘুরল। ট্রেনের সার্চলাইটে আলোকিত প্লাটফর্মে মানুষেরা জেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সেই ট্রেন থেকেই নামল—পোস্টমাস্টারের ছেলে অমর।

ঘণ্টা বাজল—হুইসিল বাজল।

ট্রেন চলে গেল।

ডাকব্যাগের ঠেলা-গাড়ি এসে দাঁড়াল শহরের পোস্টাপিসের সামনে।

সঙ্গে পিওন এবং দ্বিতীয় ডাকহরকরা।

পিওন হেঁকে ডাকলে—দীনু! মাস্টারবাবু, দীনু ইস্টিশান থেকে—

ভিতর থেকে মাস্টার বললেন—এসেছে সে। শরীর খারাপ বলে চলে এসেছে। তার জন্যে ভেবো না।

অন্য ডাকহরকরা ইতিমধ্যেই এগিয়ে এসেছিল। ডাকব্যাগগুলি নামাতে নামাতে একজন বললে—সে একেবারে ক্যাপাধ্যাপার মতন এসে ধপাস করে বসে পড়ল।

আর একজন বললে—এতক্ষণে একটুকুন ঘোর কেটেছে। নবগেরামের মাস্টারবাবুর ছেলে এয়েছে এই ট্যানে। সেই অমরবাবুর সঙ্গে কথা বলছে।

আর একজন বললে—যুজিস্টির এইবার স্বগ্যে যাবে। আর বেশীদিন লয়।

ভিতরে ডাকঘরে খটখট শব্দে ছাপ পড়তে লাগল।

বারান্দার আর একদিকে—দীনু তখন অমরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

অমর হেসে বললে—এমন করে কী দেখছ দীনু? আমি কি খুব পাল্টে গেছি?

দীনু বললে—আপনি অ্যানেক সোন্দর হয়েছেন বাবু।

অমর বললে—বড় হয়েছি যে অনেক। তা ছাড়া জেলে তো খুব কষ্ট ছিল না।

দীনু বললে—ধরমের দয়া বাবু! কষ্ট দেয় কে?

অমর বললে—আমি জানতাম বোলপুরে নেমেই তোমার দেখা পাব।

—কী আর করব বাবু? চিনির বলদের মতন—পিথিমীর খবর বয়ে নিয়ে যাই। আমারই শুধু—

—আমি সব শুনেছি দীনু। বাবা আমাকে লিখেছিলেন। তুমি সৎলোক, সাধুলোক—

—না—বাবু। মিছে কথা।

—দীনু?

—ঠিক বলছি বাবু। চোরের বাবা কখনও সাধু হয় না—সাধুর বেটা কখনও চোর হয়!

হয় না বাবু, হয় না! সব মিছে কথা!

ঠিক এই সময়টিতেই পোস্টাপিসের ভিতর থেকে পোস্টমাস্টার হেঁকে বললেন—

—ওরে দীনু! ওরে—তোর নামে যে রেজেস্টারী!

অ্যাঁ! দীনু চিৎকার করে উঠল—অ্যাঁ, আমার?

মাস্টার একটি পার্শেল হাতে ধরে বললেন—হ্যাঁ তোরই তো। দীনবন্ধু দাস। ফাদার অব নিতাইচরণ দাস—।

—নিতাইচরণ দাস! নিতাই পাঠায়েছে? নিতাই?

—না। বলছে—দীনবন্ধু দাস—নিতাইচরণ দাসের পিতা। পাঠাচ্ছে এক জাহাজ কোম্পানী।

—জাহাজ কোম্পানী?

—হ্যাঁ ভারত জলান কোম্পানী। বম্বে।

—কিন্তু নিতাইচরণ দাসের নাম ক্যানে রয়েছে?

—হয়তো নিতাইই কিছু পাঠিয়েছে; জাহাজ কোম্পানী ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

—তা হলে—! তা হলে নিতাই—। নিতাইকে কোম্পানী ছেলেমানুষ বলে মাপ করেছে?

—কী করে বলব বল না দেখে!

—খুলুন বাবু, খুলুন! খুলে দেখুন!

—কিন্তু এ যে তোকে তোর পোস্টাপিস থেকে নিতে হবে। এখানে আমি কী করে খুলব!

দীনু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, না, নিতাইকে জাহাজ কোম্পানী ধরেছে! তার বিচার হবে! শিগ্‌গির ডাকটা বেঁধে গ্যান বাবু। শিগ্‌গির।

ডাক ঘাড়ে করে দীনু ছুটছে।

তার চোখের উপর মাস্টারের হাত এবং হাতে পার্শেলটা ভেসে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল।

ডাকটা আছড়ে ফেললে।

এবং একদিন নিতাই যেভাবে ডাকব্যাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তেমনি ভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে নিজেকে সংযত করলে। তারপর বসে হাঁপাতে লাগল। মাথার উপর দিয়ে প্যাঁচা ডেকে গেল। গাছ থেকে একটা ফুল খসে পড়ল। পাখি ডেকে উঠল। দীনু চমকে উঠে ডাক ঘাড়ে তুলে ছুটতে লাগল।

নবগ্রাম পোস্টাপিসের সামনে তখন বেশ একটি ভিড়।

অমর দাঁড়িয়ে আছে।

বাঁড়ুজ্জে আছে। সে বলেছে—Hero—শহীদ—long live অমরচন্দ্র! জিন্দাবাদ!

ঠিক সেই সময়টিতেই দীনু ডাক নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল, বললে—বাবু—বাবু—বলতে বলতে সে ঢুকে গেল ডাকঘরের ভিতরে।

মেঝের উপর ডাক ফেলে সেও যেন ভেঙে পড়ল।

—বাবু, ডাক কাটেন। বাবু!

বিস্মিত হয়ে মাস্টার বললেন—কী রে, কী হল? এমন করছিস কেন?

—আমার এজেন্টালী। আমার নিতাই! আমার খবর আইচে!

—নিতাইয়ের খবর?

—হ্যাঁ। ডাক কাটেন। বাবু ডাক কাটেন!

বাইরে অমর চকিত হয়ে বললে—নিতাইয়ের খবর?

বাঁড়ুজ্জে বললে—রেজেষ্ট্রী?

একজন বললে—নিতাই ধরা পড়েছে?

—সাক্ষীর শমন নাকি? বাবাই তো একমাত্র সাক্ষী!

বাঁড়ুজ্জে বললে—মাপ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। দেশ স্বাধীন হচ্ছে। নিশ্চয় মাপ হয়েছে।

ডাকঘরের ভেতর মাস্টার তখন একখানি মেডেল হাতে নিয়ে দেখছেন।

পার্শেলটি খোলা।

দীনু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

মাস্টার পড়ছেন—Awarded to Nitai Charan Dass—for his heroic—

বাঁড়ুজ্জে অনুবাদ করলে—নিতাইচরণ দাসের বীরত্বপূর্ণ—

দীনু বললে—নিতাইয়ের মেডেল! নিতাই মেডেল পেয়েছে? নিতাই তা হলে মাপ হয়ে যেয়েছে—? বাবু?

পোস্টমাস্টার মেডেলটি রেখে—চিঠিখানা বের করে খুললেন।

দীনু নিজেই মেডেলটি তুলে নিল। দেখতে দেখতে বললে—আর কী লিখেছে বলেন? বাবু?

মাস্টার চিঠিই পড়তে লাগলেন।

—বাবু! পড়েন! বলেন! বাবু! বাবু! তবে? তবে? চিৎকার করে উঠল—ই মেডেল তবে আমার? নিতাইয়ের নাম করে দিয়েছি বলে? বাবু?

—না দীনু!

—তবে?

—এ মেডেল নিতাইয়ের। তার বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গের জন্য—কোম্পানী তাকে

মেডেল দিয়েছে। সে নাই। তার বাবা তুই—

—সে নাই ? চিৎকার করে উঠল।

মাস্টার চিঠি পড়ে গেলেন—আপনার পুত্র নিতাইচরণ আমাদের একজন কর্তব্যপরায়ণ সাহসী লস্কর ছিল। যুদ্ধের সময় সে অনেক বীরত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছে। সে সকলের প্রিয়পাত্র ছিল। সম্প্রতি আমাদের একখানি স্টীমার যুদ্ধের সময়ে পাতা কোনো একটি ভাসা মাইনের সংঘর্ষে জলমগ্ন হইয়াছে। সকল ব্যক্তিকে নিরাপদে নৌকায় তুলিয়া সে একা কাপ্তেন সাহেবের পাশে থাকিয়া বীরের মতো আত্মবিসর্জন দিয়াছে। সেই বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ তাহার স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মেডেল—আপনার নিকট পাঠানো হইল। কোম্পানি যথাসময়ে তাহার প্রাপ্য ইনসিওরেন্স ইত্যাদির টাকা আপনাকে পাঠাইবেন।

এতক্ষণ দীনুর চোখ দিয়ে জল ঝরছিল।

গোটা পোস্টাপিসটা স্তব্ধ।

শুধু টেলিগ্রাফের পোস্টের গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

হঠাৎ টেলিগ্রাফের কলটা টক্ টক্ শব্দে বেজে উঠল।

দীনুও—জয় ভগবান! বলে উঠে দাঁড়াল। তারপর বললে—বাবু—চাকরিতে আমার জবাব নিয়ে ন্যান বাবু! ব্যাস!

মাস্টার মুখ ফিরিয়ে বললেন—জবাব দিচ্ছিস ?

—হ্যাঁ বাবু। চাকরিতে জবাব, এস্তফা! এতকাল পিথিমীর লোকের কত খবর এনেছি, আজ আমার খবর এসেছে। নেতাই চোর হয়ে হারায়ে যেয়েছিল···সে সাধু হয়ে মরেছে, তার মেডেল এসেছে···শেষ খবর আমার ; জয় ভগমান!

বলতে বলতেই সে বেরিয়ে এল।

কম্পাউণ্ডের লোকগুলিকে অতিক্রম করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে এল তার বাঁড়ুজ্জে।

সে ডাকল—দীনু! দীনু!

দীনু তার ডাক গ্রাহ্য করলে না। সে চলতে লাগল···চলতে লাগল বোলপুরের পথে—জয় ভগমান!

বাঁড়ুজ্জে চিৎকার করে ডাকলে—দীনু ওদিকে কোথায় চললি ? দীনু! দীনু!

দূর থেকে দীনু উত্তর দিলে—বোলপুর!

পথে গ্রামের প্রান্তে বাউল গান করছিল···জনতা জমেছিল···

···তোমার শেষ বিচারের আশায় বসে আছি!

দীনু তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

এল সে বোলপুর স্টেশন।

ওভারব্রিজের তলায় ঘুমন্ত ছেলেটাকে উন্মত্তের মতো তুলে নিলে।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল…

সেই অরণ্যপথ ধরে নাতিকে কাঁধে করে সে ফিরছে।

নতুন জামাকাপড়ে সে তাকে সাজিয়েছে।

গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে মেডেল।

তার সামনে এগিয়ে আসছে পথ।

ঘন অরণ্যপথ। অরণ্যপথে কচি পাতা ধরেছে।

একখানা গ্রাম।

তারপর নবগ্রাম।

নবগ্রামের বাজার।

তার পাড়া।

বাড়ির গাছটি ফুলে ভরা।

শূন্যলোকে বাউলের গানটি বাজছে :

খেয়া ঘাটের পারাপারে…
মাশুল দিয়ে বারে বারে…
শেষ খেয়ারই ঘাটের ধারে এলেম দেউলে দশায়…
পাওনা কিছু থাকলে এবার দাওহে রাজা মশায়।
তোমার সেই বিচারের আশায়।

আমার কালের কথা

শ্রীমান

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নীরেন চক্রবর্তী

নরেন মিত্র

অনুজপ্রতিমেষু

তোমরাই আমার ক্ষীর-সাগরের হংসের দল। তোমাদের কথাই আছে আমার কালের কথার প্রারম্ভে। তোমাদের আগ্রহেই আমার কালের কথা লেখার সংকোচ আমি কাটাতে পেরেছি। এর নিন্দা প্রশংসা লজ্জা যা প্রাপ্য—আমিই নেব হাত পেতে। তার ফলে আমার অন্তরের সুখ দুঃখ যেটুকু সেইটুকুর ভাগ নেবে তোমরা, বইখানি তাই তোমাদের হাতেই দিলাম।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অসীম অনন্তকালের পথ অতিবাহন করে চলেছে মানুষের মিছিল। বছরের পর বছর মাইল-পোস্ট পিছনে প'ড়ে থাকছে। বিরাম বিশ্রামহীন চলা। পঞ্চাশটা মাইল পিছনে ফেলে এসে বারেকের জন্য পিছনে চাইতে ইচ্ছা হ'ল।

পাশে যারা সঙ্গী সাথী জুটেছে, যারা কেউ এসেছে—তিরিশ মাইল, কেউ বা বত্রিশ, কেউ বা পঁয়ত্রিশ—যারা ভালবাসে—পথ চলায় যারা বহু সপ্তপদ এক সঙ্গে ফেলে হয়ে উঠেছে অন্তরঙ্গ মিত্র, অনুজের সমান প্রিয়—তারা লক্ষ্য করলে পথ চলার মধ্যে আমার ভাবান্তর। প্রশ্ন করলে—কি হ'ল দাদা?

বললাম—কালের পঞ্চাশটা মাইল-পোস্ট ফেলে এলাম পিছনে; আজ মনে পড়ছে সেই কথা। আঁকাবাঁকা, চড়াই-উৎরাই, রুক্ষ প্রান্তর, ছায়াশীতল সমতল পার হয়ে চলেছে জীবনের রথ, আলোকে অন্ধকারে, সুখে দুঃখে বিচিত্র এর রূপ—সেই সব কথা মনে পড়ছে ভাই।

তারা বললে—বলুন সেই কথা। আপনার কথা।

—না। আমার কথা বলতে নেই ভাই।

—না। বলুন।

না। আমার মা বলেছেন—নিজের পুণ্যের কথা বললে সে পুণ্য ক্ষয় হয়, কীর্তির কথা বললে সে কীর্তির বনিয়াদে ফাট ধরে, নিজের বেদনার কথা বললে নিজের অপমান করা হয়; নিজের সুখের কথা বললে অহঙ্কারের পাপ স্পর্শ করে। নিজের কথা বলা যায় শুধু একজনের কাছে।

তারা হয়তো হাসলে। হাসির কথাই যে। বিংশ-শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে যে-একজনের কাছে নিজের কথা বলা যায় ব'লে অনুমান তারা করলে, তার অস্তিত্ব যে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

—হাসিস নে ভাই, তার কথা আমি বলি নি। আমিও যে তোদের সঙ্গী, এক সঙ্গে পথ চলেছি। তোদের সামনেও যে সন্ধিক্ষণ বা উদয়লগ্নের নব আভাস দেখা দিয়েছে, আমিও যে চোখের সামনে ঠিক তাই দেখছি। আমি বলছি যে-জনের কথা, সে হলাম আমি নিজে। নিজের কাছে ছাড়া নিজের সুখের কথা, পুণ্যের কথা, কীর্তির কথা—এ সব কথা বলতে নেই। যাঁরা অনন্যসাধারণ তাঁরা পারেন বলতে৷ যে হেতু—না, তাঁদের অনুসরণ ক'রেই আমাদের চলা। তাঁরা ঋষি, আদিম কাল থেকে তাঁরা ব'লে আসছেন তাঁদের উপলব্ধির কথা, অভয়ের বাণী—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আর বলে যারা একান্তই নগণ্য সাধারণ, তারা। কারণ তাদের স্পর্শবোধ আছে—অনুভবশক্তি নাই, বেদনায় চিৎকার ক'রে কাঁদা, সুখে কলরব ক'রে উল্লাস করা হ'ল তাদের স্বভাবধর্ম। অনন্যসাধারণ আমি নই; অতি বিনয় ক'রে নিজেকে নগণ্য সাধারণও মনে করি না। তাই চিৎকার করে কেঁদে, বা কলরব ক'রে উল্লাস ক'রে দুঃখ সুখের কথা বলতে পারব না। আমি সাধারণ মানুষ, আমার অধিকার

সম্বন্ধে আমি সচেতন, আমার মর্যাদা সম্বন্ধে সজ্ঞান। তাই আমার নিজের কথা বলব শুধু নিজেকে, নিজেই দাঁড়াব নিজের কাছে বিচারপ্রার্থীর মত এবং বিচারকের মত, সান্ত্বনাপ্রার্থীর মত—সান্ত্বনাদাতার মত। তবে—

—তবে ?

—তবে হ্যাঁ, বলতে পারি কিছু কথা। বলতে পারি পথের কথা অর্থাৎ কালের কথা। এই পঞ্চাশটা বছর—পঞ্চাশটা মাইল-পোস্টের কথা বলতে পারি।

—তাতেও কি আপনার কথা বলা হবে না ? হাসলে অনুজদের একজন।

—না।

—না ?

—হ্যাঁ ভাই, না।

—কালের কথায় আপনি আসবেন না ? আপনার কথা থাকবে না ?

—আসব। থাকবে। তবু সে আমার আসা হবে না, আমার বলা কথা হবে না।

উটপাখীতে শুনেছি বালির মধ্যে মুখ গুঁজে ভাবে আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কথাটা সেই রকম হ'ল না দাদা ?

—ভাই, ক্ষীর-সাগরের হংসের দল, উঠপাখীর এ দৃষ্টান্ত ঠিক খাটে না। বিচার ক'রে ভেবে দেখ, ক্ষীর-সাগরের রসপরিপূর্ণতার হানি না ঘটিয়ে যেটুকু জল তার সঙ্গে থাকে, সেটুকু ন্যায্য অধিকারেই থাকে। জল বলে তাকে বাদ দিতে গেলে ক্ষীর-সাগর ক্ষোয়াক্ষীরের খটখটে চড়ায় পরিণত হবে ভাই। ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তীক্ষ্ণচঞ্চুতে তাকে বিদীর্ণ করে মুক্তাপ্রবাল অনেক আবিষ্কার করবেন তার ভিতর থেকে, কিন্তু হংসের দলের—তোদের বিপদ হবে, সাঁতার দেওয়া চলবে না। ক্ষীরের মধ্যে যতটুকু অধিকার, সেই অধিকারটুকু জুড়ে থাকবে আমার কথা। তার বেশী নয়।

—বেশ মেনে নিলাম। এখন আরম্ভ করুন আপনার কথা।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ঠিক মাইল খানেক পিছনে—১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পোস্টের উপর তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। মাঝখানে তার অশোক-চক্র। ওই ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসেই আমি প্রবেশ করেছি পঞ্চাশের মাইলে। পিছনে উনপঞ্চাশটা মাইল-পোস্ট পার হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে—১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে—বাংলা ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বলগ্নে আমার জীবনযাত্রার শুরু। আমাদের অঞ্চলে বলে, ব্রাহ্ম-মুহূর্তে, সূর্য উদিত হন নি, তাঁর লাল আভা ফুটেছে পূর্বদিগন্তে, এমনি সময় আমার জন্ম বলে শাস্ত্রমতে আমার জন্মদিন ৭ই শ্রাবণ। অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য একদিন আয়ু আমার হয় বেড়ে গেছে বা ক'মে গেছে।

১৮৯৮ সাল। ভারতবর্ষের দিকে দিগন্তে উড়ত তখন ইউনিয়ন জ্যাক। ভারতেশ্বরী তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। লোকে বলত—মহারাণীর রাজত্ব। বাংলাদেশ তখন জেলায়-মহকুমায়-থানায় ভাগ হয়েছে। শিকলে ছাঁদে ছাঁদে বাঁধা এমন বাঁধন যে এক জায়গায় টান

পড়লে শিকলের সবখানে সব কড়া ঠনঠন শব্দে বেজে ওঠে। প্রাচীন রাঢ় বরেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগের নাম মানুষ ভুলে গিয়েছে। বিস্মৃতনামা প্রাচীন রাঢ়ের এক প্রান্তে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম। আমার সূতিকাগৃহ আজও আছে। মাটির মেঝে, শক্ত পাথুরে রাঙা মাটির দেওয়াল দিয়ে গড়া উত্তর-দুয়ারী কোঠাঘর আজও অটুট আছে। শুধু অটুট বললেই বোধ হয় সব বলা হয় না। ঘরখানির সামান্য পরিবর্তনের জন্য বছর কয়েক আগে খানিকটা দেওয়াল ভাঙার প্রয়োজন হয়েছিল, কোদাল টামনা শাবল হার মানলে, শেষে গাঁইতি আনা হ'ল। দেওয়াল ভাঙল বটে, কিন্তু সেদিন যে আগুনের ফুলকি ছড়িয়েছিল গাঁইতির আঘাতে আঘাতে—তা আজও আমার চোখে ভাসছে। গাঁইতির একটা দিক ভোঁতা হয়েছিল, একটা দিক ভেঙেছিল। এরই নিচের তলা ধ'রে আমি প্রথম পৃথিবীর মৃত্তিকার আলিঙ্গন পেয়েছিলাম।

ভূমিষ্ঠ হবার সময় আমি নাকি খুব চীৎকারে কেঁদেছিলাম। আমার জীবনের কর্ম ও সাধন ফলের মধ্যে তার চিহ্ন আছে কি-না মাঝে মাঝে আজ ভেবে দেখি আমি। সে কথা থাক্। সেদিন যাঁরা সূতিকা-গৃহের দুয়ারে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত বিষণ্ণ হয়ে বলেছিলেন—যাঃ, মেয়ে হ'ল! এত উঁচু গলা, এ মেয়ের! আজও আমাদের দেশে বাড়ীর গিন্নীরা বলেন—ছেলেরা ভূমিষ্ঠ হবার সময় কম কাঁদে। মেয়েরা আসে, জীবনে যে কান্না তারা কাঁদবে তারই সুর ধ'রে। কাঁদতেই তাদের জন্ম।

লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত গ্রাম। আমার জন্মস্থান—আমার মাতৃভূমি—আমার পিতৃ-পুরুষের লীলাভূমি ব'লে অতিরঞ্জন করছি না, সত্য কথা বলছি। কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না-মেনে পারি না। এ গ্রামে জন্মেছি ব'লে নিজেকে ভাগ্যবান ব'লে মনে করি।

১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। জমিদারপ্রধান গ্রাম। নবাবী আমল থেকে সরকারবংশীয়েরা ছিলেন জমিদার। তাঁরা তখন বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের ভাঙনের উপর উঠেছে আরও দুটি বংশ, ওই সরকারবাবুদেরই দৌহিত্র-বংশ। এদের এক বংশ হ'ল আমার পিতৃবংশ, দ্বিতীয়টি অন্য এক বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিতীয় বংশই তখন গ্রামের মধ্যে প্রধান। ঠিক এই সময়ে—গ্রামের এক দরিদ্রসন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠীতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন। বীরভূমে জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাঁদের সংখ্যার বাহুল্য। দশ হাজার টাকা আয় যাঁদের, তাঁরা রাজাতুল্য ব্যক্তি। আমাদের গ্রামের জমিদারের আয় পাঁচ থেকে সাত-আট হাজার। কিন্তু তাতেই তাঁদের প্রবল পরাক্রম। সমারোহ প্রচুর। এ ছাড়া চাষের জমির সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো হাজার-টাকা বাৎসরিক আয়ের জমিদার অনেক, হাতপায়ের আঙুলে গনা যায় না। তাঁদের পরাক্রম কম নয়। তাঁরা বলতেন—'মাটি বাপের নয়, দাপের; দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে

বুকে।' বুকে চাপড় মেরে তাঁরা বীর্যের দাবি ঘোষণা ক'রে বলতেন—'আমি জমিদার।' এঁদের সঙ্গে আরম্ভ হ'ল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর বিরোধ। আশ্চর্য সাহস ছিল তাঁদের। সাহসের কথায় একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল। এমনি এক শ-চারেক টাকা আয়ের জমিদারের বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে। বৈষয়িক স্বত্ব নিয়ে ফৌজদারী, পরে দেওয়ানী মামলা চলল। মুন্সেফ-কোর্ট, জজ-কোর্ট, শেষে হাইকোর্ট। একদা এক চাকুরে বন্ধু দেশে এসে সব বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে তিরস্কার ক'রে বললেন—তুই কার সঙ্গে মামলা করছিস?

—কেন? বর্ধমানের রাজার সঙ্গে।

—তাঁকে তুই চোখে দেখেছিস যে মামলা করছিস? তাঁর বাড়ী দেখেছিস?

মামলাকারী হা-হা ক'রে হেসে বলেছিলেন—বাড়ী দেখেছি, তাঁকে দেখি নি।

—তবে?

—তবে আবার কি? বর্ধমানের মহারাজা তো বর্ধমানের মহারাজা রে, ভগবান যে ভগবান সে অন্যায় দাবি করলে তাই মানি না। বিশ বছরের বেটা মরে গেল, পরমায়ু দেয় নি ভগবান, তাই তার চিকিৎসায় টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে লড়াই করেছি, রাত জেগেছি; যম এক-দিকে টেনেছে, আমি একদিকে টেনেছি। হেরেছি। তাতে কি? এক ফোঁটা চোখের জল ফেলি নি।

লাভপুর-সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজ-জীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহের প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ।

২

প্রধান জমিদার-বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাইনর স্কুলের।

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠা করলেন হাই ইংলিশ স্কুলের। মাইনর ইস্কুলটি উঠে গেল।

আমাদের গ্রামের গ্রামদেবতা ফুল্লরা দেবী। একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। আসল নাম নাকি অট্টহাস। ব্যবসায়ী ধনী দেবীর প্রাচীন মন্দির ভেঙে নূতন মন্দির ক'রে দিলেন। জমিদার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়ে দিলেন দেবীর মন্দিরের সম্মুখে দীঘির উপর প্রশস্ত ঘাট।

জমিদার-বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী-পূজার সমারোহ।

ব্যবসায়ী বাড়ীতে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ক'রে রাসযাত্রায় সমারোহ করলেন।

জগদ্ধাত্রী-পূজায় পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য শূদ্র হরিজন ভোজন হ'ত। মনে আছে, চারটে হিসেবে বড় বড় ছানাবড়া—আজকাল যার একটার দাম অন্তত আট আনা, প্রচুর

মাছ, প্রচুর মাংস। খাইয়েদের ব্যবস্থা ধরাবাঁধা নয়, যে যত পারে, সে এক 'নাও নাও' এবং 'আর না, আর না' শব্দ। তারপর বিসর্জনের দিন বারুদের কারখানা, লাঠিয়ালদের লাঠি-খেলা, প্রতিমা নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা ; ছেবেবেলায় সে এক পরম কামনার দিন ছিল। 'দুই পুরুষ' নাটকের প্রথমেই কঙ্কনার বাবুদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার ধুমের কথাটা সেই স্মৃতি থেকেই এসেছে। কিন্তু কঙ্কনার বাবুদের সঙ্গে এই জমিদারবাবুদের কোন সম্পর্ক নাই। সে কথা থাক্।

কার্তিকের শুক্লা-নবমীতে জগদ্ধাত্রী-পূজার কয়েক দিন পরেই রাস-পূর্ণিমা। ব্যবসায়ীর বাড়ীতে পঞ্চগ্রাম সপ্তগ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ, ব্যঞ্জনের সংখ্যা এবং স্বাদুতা নিয়ে প্রতিযোগিতা। পাতায় কুলাত না, ব্যঞ্জনের তেলে নাটমন্দিরের বাঁধানো মেঝে পিচ্ছিল হয়ে যেত। সোডা ক্ষার দিয়ে মাজতে হ'ত। মিষ্টান্নও এখানে বেশী এবং আকারেও বড় হ'ত। তবু ব্যবসায়ী ভোজের ব্যবস্থায় এঁটে উঠতেন না। হার মানতে হ'ত শাক্ত ব্যবস্থার কাছে বৈষ্ণব ব্যবস্থার আয়োজনকে। জগদ্ধাত্রী পূজায় পাঁঠা বলি হ'ত। বৎসর ধ'রে পোষা বড় বড় পাঁঠার মাংসের কালিয়ার ব্যবস্থায় জমিদার-বাড়ী টেক্কা মেরে থাকত। শুধু মাংসের ব্যবস্থাতেই নয়, অয়োজনের সঙ্গে রন্ধন-শিল্পের যে মুন্সিয়ানা এবং যত্নের পারিপাট্য থাকলে সামান্যকে অসামান্য ক'রে তোলা যায়, তা যেমন জমিদার-বাড়ীতে ছিল, ব্যবসায়ীর বাড়ীতে তেমনটি ছিল না। জমিদার-কর্তা নিজে নুন মিষ্টির পরিমাণ দেখতেন, চেয়ার নিয়ে রন্ধন-শালায় ব'সে পাচকের সঙ্গে সারারাত্রি জাগতেন, শেষরাত্রে চাকর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নিজেই তামাক সেজে খাওয়াতেন। উনানে কাঠ ঠেলতেন। সকালে মুখ ধুয়ে পূজারম্ভের পরেই বসতেন দই নিয়ে। দইকে তিনি 'আমদইয়ে' পরিণত করতেন। আমআদা বেটে মিশিয়ে তাকে আম সন্দেশের মত এমন সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু বস্তুতে পরিণত করতে জানতেন যে লোকে ওই আমদই খাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে তার পালা গুনত ; কখন আসবে আমদই ? দীর্ঘদিনের রোগীও আসত, বলত, মুখটা একটু ছাড়িয়ে আসি। সে স্বাদ আজও মনে হ'লে আমার রসনাও সিক্ত হয়ে ওঠে।

রাধাগোবিন্দের ধাতু ও শিলাবিগ্রহ, তার বিসর্জন নাই। তাঁর ছিল রাসপূর্ণিমার পরদিন বনভোজনের ব্যবস্থা। চতুর্দোলায় যেতেন যুগল বিগ্রহ, মশালে মশালে গ্রামের আকাশ রাঙা ক'রে চলত মশালধারীরা, আসাসোঁটা নিয়ে চলত বরকন্দাজ, গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে গ্রামের বাইরে তাঁদের বিস্তীর্ণ বাগানে বিগ্রহ নামাতেন। বাজি পুড়ত, লাঠিখেলা হ'ত, সাঁওতালরা নাচত। দুই তরফের সমারোহেই দশ-বিশখানা গ্রামের লোক ভেঙে আসত। দশ-পনের হাজার লোক। আসলে এটা বিসর্জন উৎসবের প্রতিযোগী উৎসব বলতে ভুলেছি। জগদ্ধাত্রী পূজায় জমিদার-বাড়ীতে দুদিন যাত্রা হ'ত।

এদিকে ব্যবসায়ীর বাড়ীতে রাসে হ'ত মাসখানেক ধ'রে ভাগবতের কথকতা ও যাত্রা। অনেক বার দুই বাড়িতেই হয়েছে খেমটা নাচ। খেমটা নাচের তখন খুব চলন। বিয়েতে খেমটা নাচ না হ'লেই চলত না। পূজা-পার্বণে হ'ত, অন্নপ্রাশন-উপনয়নে হ'ত, এমন কি

আমাদের গ্রামের হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সময় স্কুলের হলে কলকাতার মোটা দক্ষিণার খেমটা নাচ হয়েছিল।

এই ব্যবসায়ী ধনীর বাড়ীতে আসত বড় বড় যাত্রার দল। সে কালের নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ সিতিকণ্ঠ তিন ভাই আসতেন, মতি রায়ও আসতেন। অধিকাংশ সময় আসতেন আমাদের জেলার খ্যাতনামা কৃষ্ণযাত্রার অধিকারী যোগীন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর দল নিয়ে। আমাদের গ্রাম তখন জমজমাট গ্রাম। সচ্ছল গৃহস্থ বাড়ীর যুবকের দল তখন প্রকাণ্ড। ব্যবসায়ীটির কল্যাণে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। কলকাতার নবজীবনের সংস্কৃতির অমৃত কেউ ভৃঙ্গারে ভরে আনতে না পারলেও, ফ্যাশানের হুইস্কির বোতল কেস-বন্দী হয়ে গ্রামে অনায়াসে পৌঁচেছে। তারই ফলে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠ এসেছেন রাসের বাড়ীতে গাওনা করতে। লোকে লোকারণ্য, গান চলছে। কিন্তু গ্রামের কয়েকজন যুবকের গান মনঃপূত হয় নি। তাঁরা আগেই কৃষ্ণযাত্রায় অমত জানিয়েছিলেন। বলহরি-হরিবোল অর্থাৎ যাত্রাকে গঙ্গাযাত্রা ব'লে ব্যঙ্গ ক'রে আসর ছেড়ে বাইরে বেরিযে এসেই তাঁরা অকস্মাৎ চিৎকার ক'রে উঠলেন—আগুন! আগুন! আগুন!

মাটির ঘরের দেশ, ঘনসন্নিবদ্ধ খড়ের চাল। চিৎকার শুনে মুহূর্তের মধ্যে আসর গেল ভেঙে। আতঙ্কিত গ্রাম্য শ্রোতার দল ছুটল আপন আপন বাড়ীর দিকে।

যুবকের দল আবার হরিবোল দিয়ে উঠল—বল হরি হরিবোল!

নীলকণ্ঠের সহোদর—শ্রীকণ্ঠ এবং সিতিকণ্ঠ উভয়েই ছিলেন মানী লোক। তাঁরা সমস্ত বুঝলেন। এবং মাথা নীচু ক'রে আসর ভেঙে লাভপুর থেকে বিদায় নিলেন। পরবৎসর উপযাচক হয়ে নীলকণ্ঠ, লোকে বলত 'কণ্ঠ মহাশয়', এলেন তাঁর দল নিয়ে, সঙ্গে তাঁর দুই ভাই। সেবার তিনি গান করলেন। সে কি গান! আর সে কি জনতা! সে কি স্তব্ধতা! মানুষ হাসল, বুক ভাসিয়ে কাঁদল। কিন্তু এত অসুবিধাতেও কেউ 'আঃ' শব্দ করলে না! লাভপুরের যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে জয় ক'রে নীলকণ্ঠ সেবার ফিরে গেলেন।

এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদার-তন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।

৩

আমাদের রাঢ় দেশে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, 'লক্ষ্মী যখন ছেড়ে যান তার আগে তিনি গৃহস্থকে বলেন—হয় চাল ছাড়, নয় আমাকে ছাড়।' গৃহস্থ চাল ছাড়তে পারে না। লক্ষ্মীই ছেড়ে যান। 'চাল' কথাটা শুনতে খারাপ, চাল কথাটার বাইরের অর্থ হয় তো বাইরের ভড়ং, কিন্তু গভীর ভাবে ভেবে দেখলে জীবনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে, জীবনের ভিত্তির সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ যোগ আবিষ্কার করা যায়। তাই প্রতিষ্ঠা যে-কালে সমাজে সম্পদের উপর

প্রতিষ্ঠিত, দেউলের মাথায় চূড়ার মত, সে-কালে সম্পদরূপী ভিত নড়লে চূড়া বা চাল আপনি খ'সে পড়ে। আবার চূড়ার উচ্চতার প্রতিযোগিতায় চূড়া যখন বিন্ধ্যগিরির মত বাড়তে থাকে তখন চূড়ার ভারে ভিতও আপনি বসে পড়ে। ইট-কাঠ-পাথরের মন্দির জড়বস্তু, কিন্তু মানুষের প্রতিষ্ঠার মন্দির সজীব, তাই কোন নূতন প্রতিষ্ঠাবান যখন অপর সকল প্রতিষ্ঠাবানের প্রতিষ্ঠার মন্দিরকে ছাড়িয়ে নিজের ইমারৎ গড়ে, তখন পুরানো প্রতিষ্ঠার মন্দিরগুলি স্বাভাবিক ভাবে সজীব বিন্ধ্যগিরির মত থাকে। আমরাও ছিলাম স্বল্প আয়ের জমিদার, পাখী-পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্যতা না থাকলেও পাখা ছিল। সুতরাং আকাশের উঁচুতে ওঠার প্রতিযোগিতায় দুর্বল ডানায় ভর দিয়েও মেতে ওঠাই এ ক্ষেত্রে ছিল স্বাভাবিক জীবন-ধর্ম। এ-ই স্বাভাবিক, জীবন-ধর্ম বলেই এই দ্বন্দ্ব আমাদের সংসারকেও স্পর্শ করেছিল। এই ব্যবসায়ী বাল্যজীবনে ছিলেন দরিদ্রের সন্তান; তখন আমাদের বাড়ী থেকে তাঁদের বৃত্তি বরাদ্দ ছিল। পূজার সময় আমার পিতামহদের গোপন দানের একটি বিচিত্র পদ্ধতি ছিল; তাঁরা অপরিচিত মজুর শ্রেণীর লোকের মাথায় কাপড় মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাজিয়ে অভাবী গৃহস্থদের বাড়ী পাঠাতেন। সঙ্গে থাকত জাল চিঠি—গৃহস্থদের দূর-আত্মীয়েরা যেন তত্ত্ব পাঠাচ্ছেন। এবং লিখছেন, 'কিছু তত্ত্ব পাঠাইলাম। তোমাদের সদা সর্বদা খোঁজ লইতে পারি না বলিয়া লজ্জা পাই। যাহা হউক যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবা।' সেই তত্ত্ব এঁদের বাড়ীও যেত। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব আমাদের সংসারকে টেনেছিল স্বাভাবিক ভাবেই।

আমার পিতামহ ছিলেন উকীল। সিউড়িতে ওকালতি করতেন। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। আমার পিতামহ ছোট। দুই ভাই-ই ছিলেন উকীল। সেকালে প্রতিষ্ঠা এবং উপার্জন করেছিলেন যথেষ্ট। বড় ভাই ছিলেন সে আমলের বিখ্যাত উকীল। মানুষও ছিলেন বিচিত্র। একবার এক স্বত্বের মামলায় তাঁর মক্কেলের হ'ল পরাজয়। ইংরেজ জজ। জজ বলেছিলেন—ভূয়া মামলা তুমি মুখের জোরে জিতবে ব্যানার্জী? তা হয় না। তিনি অনেক বুঝিয়েছিলেন—সাহেব, এই পয়েণ্ট আপনি বুঝে দেখুন। সাহেব বুঝতে চান নি। অপমানজনক কথা বলেছিলেন। তিনি অপমানিত হয়ে নিজে হাইকোর্টে আপীল ক'রে সেই মামলা ডিক্রী পেয়েছিলেন। যেদিন খবর পেলেন, সেদিন তিনি ঢাকীকে পয়সা দিয়ে গোটা শহরে ঢাক পিটিয়ে খবরটা জানিয়েছিলেন। সেই জজ সাহেব তখন অন্য জেলায়। তাঁকেও চিঠি লিখে খবরটা জানিয়ে তবে শান্ত হয়েছিলেন।

আমার বাবা ছিলেন পিতার এক সন্তান এবং প্রৌঢ় বয়সের সন্তান। পিতামহ বিবাহ করেছিলেন তিনবার। আমার প্রথম পিতামহী ছিলেন বন্ধ্যা। গল্প শুনেছি, তিনি নাকি অপরূপ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। জীবনে তাঁর কোন মানুষের সঙ্গে কোন দিন বিরোধ ঘটে নি। গড়গড়ায় তিনি নাকি তামাক খেতেন। সে গড়গড়াটি আজও আছে। আমার পিতামহ দ্বিতীয় বিবাহ করেন বাহান্ন-তেপ্পান্ন বৎসর বয়সে। বিবাহ করবার সঙ্কল্প প্রথম স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করতে পারেন নি। বিবাহের পর যখন বধূ নিয়ে এলেন, তাঁর প্রথমা স্ত্রীই হাসিমুখে বরণ ক'রে তুলে বলেছিলেন—আমায় আগে বললে যে বিয়েতে কত ধুমধাম করতাম

বাবু! পিতামহ লজ্জিত হয়েছিলেন, কোন কথা বলতে পারেন নি। কয়েক দিন পর তিনি প্রথমা স্ত্রীকে ডেকে একটি টাকার থলি দিয়ে বলেছিলেন—এইটি তোমাকে দিলাম। এতে এক হাজার টাকা আছে।

তিনি বলেছিলেন—টাকা নিয়ে কি করব?

—যা খুশি তোমার। গয়না গড়িয়ো।

—গয়না তো আছে।

—আরও গড়িয়ো। কিংবা মেয়ে-মহলে মহাজনী ক'রো। অর্থাৎ স্ত্রীলোক-মহলে টাকা ধার দিয়ো। ইচ্ছে হয় কাউকে দিয়ো। আমি দিচ্ছি, 'না' বলতে নেই।

তিনি আর কোন কথা না ব'লে টাকার থলিটি নিয়েছিলেন। এর দশ-এগারো মাসের মধ্যেই তিনি মারা যান। মারা যাবার পর তাঁর গয়নার বাক্স খুলে সোনা রূপা ও নগদ সঞ্চয়ের হিসাব করতে গিয়ে সে থলিটিও পাওয়া যায়। পিতামহ থলিটি বেঁধে দিয়েছিলেন পাটের অর্থাৎ রেশমের গুচ্ছ দিয়ে। দেখা যায় সেই রেশমের গুচ্ছ, তাঁর বেঁধে দেওয়া বাঁধনটি ঠিক তেমনিই আছে। খুলে দেখা যায় এক হাজার টাকার একটি টাকা খরচ হয় নি, অথবা একটি টাকা তাতে যোগ হয় নি।

তাঁর মৃত্যুর বৎসর খানেক পরে আমার বাবার জন্ম। বেশী বয়সের একমাত্র সন্তানের প্রতি আমার পিতামহের স্নেহের দুর্বলতা ছিল অপরিসীম। দুর্বলতার আরও অবশ্য একটি কারণ ছিল। আমার পিতামহী অতি অল্পবয়সেই মারা যান। আমার বাবার বয়স তখন চার-পাঁচ। মাতৃহীন একমাত্র সন্তান অত্যন্ত আবদারে দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার উপর আমার বাবার স্বাস্থ্য ছিল প্রচণ্ড সবল। সিউড়ীতে জেলা-স্কুল তখন স্থাপিত হয়েছে। সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। পড়াশুনায় বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তবুও তিনি অত্যন্ত অল্পবয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দেন। এর জন্য তিনি পরে বহু অনুতাপ করেছেন। তিনি স্কুলে লেখাপড়া অবশ্য করেন নি, কিন্তু পরে ঘরে যথেষ্ট শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। নিজে তিনি সেকালেও নিয়মিতভাবে নিজের ডায়রী রেখে গেছেন। তাঁর ডায়রী থেকে খানিকটা অংশ এখানে তুলে দিলাম, তা থেকেই তাঁর স্কুল ছাড়ার বিবরণ এবং পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে তাঁর মর্মপীড়ার আভাস পাওয়া যাবে। তা থেকেই পরিস্ফুট হবে—সেকালের খানিকটা, যে খানিকটার পটভূমিতে আমি বেড়ে উঠেছি।—

"আমার বয়স পাঁচ বৎসর হইলে পিতা আমার হাতে খড়ি দিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু মাতৃহীন বালক এবং বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান বলিয়া বিদ্যার জন্য বা কোন বিষয়ের জন্য কখনও কোন শাসন করিতেন না। আপন বক্ষে রাখিয়া পালন করিতেন। আমার সাত-আট বৎসর বয়সে প্রথম বাংলা স্কুলে আমাকে ভর্তি করিয়ে দেন; একখানি ঠেলাগাড়ী করিয়া স্কুলে যাইতাম। ক্রমে বীরভূম গভর্ণমেণ্ট ইস্কুলে ভর্তি হইলাম। বাল্যকালে আমার বুদ্ধি এরূপ সুতীক্ষ্ণ ছিল যে একবার মাত্র পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিলে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যাইত। ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান আমার নির্দিষ্ট ছিল। পরে ষষ্ঠ শ্রেণী

হইতে ডবল প্রমোশন পাইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলাম। এই সময় আমার বয়স ষোল এবং এই বৎসরই—১২৮৬ সালে আমার প্রথম পরিণয় হয়।...

"ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে, ডবল প্রমোশন লইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়া আমার বিশেষ পড়ার আবশ্যক ছিল। কিন্তু প্রমোশনের ২।১ মাসের মধ্যেই আমার ইস্কুলে অনেক কামাই হয়, পড়াশুনাও করা হয় না। তাহাতে আমার ক্লাসের পড়া পড়িতে একটু কষ্ট হয়। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বলিয়া কোনরূপে পড়া চালাইতেছিলাম, কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রথম বা দ্বিতীয় আসন রাখিতে পারিতেছিলাম না। ইহার জন্য মনে বড় কষ্ট ছিল। এই সময়ে আবার একটি কাণ্ড ঘটিল। সামার ভেকেশনে লাভপুর আসিলাম কিন্তু ইস্কুল খোলার সঙ্গে সঙ্গে সিউড়ী যাওয়া হইল না। নবীন ভাইপোর বিবাহ মঙ্গলডিহি গ্রামে, ওই বিবাহ জন্য থাকিয়া গেলাম। ১০।১২ দিন কামাই হইয়া গেল। এই আমার জীবনের সুখ বা উন্নতির পথে কাঁটা পড়িল। এই দশ বারো দিন কামাই আমার বিদ্যাশিক্ষার মূলে চির-কুঠারাঘাত করিল। কামাইয়ের পর ইস্কুলে গেলে গদাই গরাঞী নামে একজন মাস্টার আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। আমাকে নিত্যই তিনবার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—'বাবুর বেটা বাবু—তার ওপর কুলীন, ফাল্গুন মাসে একটা বিয়ে, জ্যৈষ্ঠ মাসে একটা বিয়ে, তোমার আর লেখাপড়ার প্রয়োজন কি? যাও, লেখাপড়া ছাড়িয়া আরও দশটা বিবাহ কর না কেন!' নবীনের বিবাহের কথাটা সে কোনমতেই বিশ্বাস করিত না, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহ আমিই করিয়াছি। এই বিদ্রূপ ক্রমে আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখ দিয়া জল পড়িত। অন্য ছেলেরা হাসিত। একদিন দুর্দান্ত ক্রোধ হইল, সে দিন গদাই মাস্টার এই ঠাট্টাটি করিবামাত্র বই বগলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—'হাঁ, বিবাহের ব্যবসা করাই আজ স্থির করিলাম, তোমার কন্যা থাকে—তবে তাহাকেও বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।' এই বলিয়া এক দৌড় দিয়া ইস্কুল হইতে পলাইয়া আসিলাম। বাবাকে বলিলাম—'আমাকে অন্যত্র ইস্কুলে ভরতি করিয়া দিন।' বাবা একমাত্র সন্তানকে বিদেশে পাঠাইতে রাজী হইলেন না। বলিলেন—'এখানে আমার নিকট থাকিয়া তোমার লেখাপড়া হইল না, তখন বিদেশে পাঠাইয়া কি হইবে? বাহিরে পাঠাইয়া আমিও থাকিতে পারিব না, তুমিও নষ্ট হইবে। তুমি আমার নিকট থাক, নিজেকে সংশোধন কর।'

"বুদ্ধি অর্থ অনুরাগ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও পূর্বজন্মের কর্মফল আমাকে কৌশলে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করিয়া আমার জীবনকে সুখশূন্য করিয়া দিল। হায়, বিদ্যাহীন জীবনে ও পশুজীবনে প্রভেদ কি? জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া জীব যদি স্বীয় বংশোচিত সম্মান প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে না পারে তবে তাহার তুল্য দুঃখ কাহার? আমি সেই দুঃখ অহরহ ভোগ করিতেছি..."

আমার বাবার ডায়রীর আরও খানিকটা অংশ তুলে দিলেই আমার জীবনের পটভূমি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বাংলা ১৩১০ সালের মাঘ মাস ৮ই মাঘ ছিল সরস্বতী-পূজা। এ অংশটুকুও ওই দিনের, এবং অংশটুকু আমাকে নিয়েই। বাড়ীতে সরস্বতী-পূজা আছে।

সেবার বারবেলার জন্য পূজা আরম্ভ হতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছিল। বাবা ডায়রীতে লিখেছেন—

"বারবেলার জন্য দুই প্রহরের পর ঘট আনাইয়া ৺সরস্বতী মাতার অর্চনা আরম্ভ হইল। বেলা বেশী হওয়ার জন্য তারাশঙ্করকে বলিলাম—'বাবা জল খাও, জল খাইয়া অঞ্জলি দিলে দোষ হইবে না।' বালক বলিল—'কই, আমার তো পিপাসা পায় নাই।' বালকের দেবভক্তি—বিদ্যানুরাগ দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর তারাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাবা, মাকে প্রণাম করিবার সময় কি বলিলে?' তাহাতে সে বলিল—'আমি বলিলাম—মা, আমাকে খুব বিদ্যা দাও, আমি ডাইনে বাঁয়ে ঢোল দিয়া পূজা দিব—বড় হইয়া পূজায় যাত্রা করাইব—ধুম করিব।' শুনিয়া পুলকিত হইলাম। দেখ বাবা তারাশঙ্কর—জীবনে এ কথা যেন কোন দিন ভুলিয়ো না। অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছি। পৈতৃক সম্পত্তি সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা সম্মান রক্ষা দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈতৃক সম্মান বংশপ্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে। বহু কীর্তি করিবে। এবং সরস্বতী মায়ের কাছে যে সঙ্কল্প করিলে তাহা বজায় রাখিবে। ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়—যত মূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের। আমার বাবার পাট তোমাকে বজায় রাখিতে হইবে। তুমি উকীল হইবে। আমার বাবা শেষ জীবনে শখ করিয়া শালের শামলা কিনিয়াছিলেন; ঐ শামলা আমি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি—ওই শামলা তোমাকে পরিতে হইবে। এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে।"

আরও খানিকটা তুলে দেব। তা হ'লেই আমার জীবনের পটভূমির একাংশ স্পষ্ট হবে। ইংরেজ রাজত্বে যাঁরা ইংরেজী শিখেছিলেন, তাঁরা ইংরেজী-না-জানা লোককে মূর্খ ভাবতেন। ইংরেজী না-জানা লোকরাও ভাবনা-অনুভূতি আচার-ব্যবহার, এমন কি ভারতীয় শাস্ত্র ও তত্ত্বে গভীর অধিকার সত্ত্বেও নিজেদের সম্পর্কে এই অপবাদ স্বীকার ক'রে নিতেন। না হ'লে আমার বাবা ইস্কুল ছেড়ে ঘরে শাস্ত্রাদি পাঠ ক'রে সাংস্কৃতিক জীবনকে আয়ত্ত করেছিলেন, তাতে তাঁর বিদ্যার জন্য আক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল না। তিনি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন। সেকালের সাপ্তাহিক কাগজ—'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী'র তখন বিপুল প্রচার। প্রকাণ্ড সাইজের কাগজ, এক পৃষ্ঠায় শুয়ে অপর পৃষ্ঠা পড়া যেত। দুখানা কাগজই আসত আমাদের বাড়ী। এ ছাড়া সে আমলে তিনি একখানি মাসিকপত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম ছিল 'হিন্দু পত্রিকা'। তা ছাড়া তাঁর ছোটখাটো একটি পুস্তক-সংগ্রহ ছিল। অধিকাংশই ধর্মগ্রন্থ। সংস্কৃত বাংলা দুই ভাষায় লিখিত শাস্ত্র তিনি পাঠ করতেন। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও নানা তন্ত্র তিনি কিনে সংগ্রহ করতেন এবং নিয়মিত পড়তেন। কাব্যে এবং উপন্যাসেও তাঁর অনুরাগ কম ছিল না। তাঁর আমলের কালিদাসের গ্রন্থাবলী আমার কাছে আছে। তাঁর সংগ্রহ থেকেই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আস্বাদন পাই। তাঁর দিনলিপির মধ্যে প্রত্যহ দুই লাইন পুনরুক্ত হয়েছে। "স্নানান্তে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া আহার করিলাম—পরে বৈঠকখানায় খবরের কাগজ 'হিন্দু পত্রিকা'দি পাঠ করিলাম।" এর পরই কোন দিন পাই—"মহানির্বাণতন্ত্র পাঠ করিলাম" অথবা "যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ করিলাম"

অথবা "রাণীভবানী নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করিলাম" অথবা "আজ কালিদাসের কাব্যরসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইলাম।" জীবনে তাঁর একটি দার্শনিক দৃষ্টিও স্পষ্ট এবং পরিস্ফুট হয়েছিল। আমাদের গ্রামের নূতন ধনী ব্যবসায়ী একটি মজা দীঘি কাটাচ্ছিলেন, সেই দীঘিতে উঠল এক অক্ষত শিলামূর্তি। বাসুদেব দেবতা। এই উপলক্ষে সে দিন দশখানা গ্রামের লোক—কেউ বললে—"এই ঠাকুরই সর্বনাশ করবে, জল-শয়নে ছিলেন—মাছের লোভে ঘুম ভাঙালে, এইবার—" এই সুরের কথাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। যারা অন্য সুরে কথা বলেছিল, তারা বলেছিল—সৌভাগ্য ষোল কলায় পূর্ণ হ'ল। কিন্তু তার পরই মৃদুস্বরে বলেছিল—কলা পাকল।

আমার বাবার ডায়রীতে পাই—"শত শত বৎসর পূর্বে যে দেবতা সে আমলের সেবক প্রতিষ্ঠাতার পরাজয়ের দুর্ভাগ্যের নিয়তিকে স্বীকার করিয়া নিজেও অপমানিত হইয়া পুষ্করিণী-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন—তিনি এতকাল পরে উঠিলেন। যখন উঠিলেন তখন নূতন লীলায় প্রকট হইবেন। শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিতহস্ত ত্রিলোকের পালক বিষ্ণু—বাবুর কীর্তির মধ্যে দিয়া উদিত হইলেন। মনে হইতেছে এ গ্রামে ছোট বড় লইয়া যে বিবাদ-কলহ চলিতেছে—তাহার চরম মীমাংসা হইয়া গেল। ত্রিলোকপালক-কে আশ্রয় করিয়া রায় দিয়া দিলেন যে তিনিই এখানকার লোকপালক হইবেন।"

আর এক স্থানে একদিন—নূতন ধনীর আলোকোজ্জ্বল এক সমারোহের আসর থেকে নিজের অন্ধকার-স্তব্ধ বাড়ীর দিকে এসে তিনি রাত্রির অন্ধকারের গাঢ়তার দিকে চেয়ে যা ভেবেছিলেন তাই লিখেছেন—

"রাত্রির রূপ অন্ধকার, তাহার স্পর্শ শীতল, রাত্রির শেষ যামে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। চণ্ডীর মধ্যে পাই—কালরাত্রিরূপা মহাশক্তি মহিষাসুরকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দেখা দিয়াছিলেন। আজিকার অমাবস্যার অন্ধকার—আমাদের চারিদিকে যেন তেমনি রাত্রির ছায়া ফেলিয়াছে।"

মোট কথা—বাস্তব সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি মর্মান্তিক পরাজয়ের ক্ষোভ বহনের দুঃখকে স্বীকার ক'রেই জীবনতত্ত্বের রহস্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি এবং দৃষ্টি আয়ত্ত করার চেষ্টা করে-ছিলেন। তিনি মারা যান অল্প বয়সে। আমার বয়স তখন আট বৎসর। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত ক'রে গিয়েছে। তাঁর মূর্তি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। অত্যন্ত বলশালী দেহ ছিল তাঁর। ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। স্পষ্টভাষী ছিলেন। আমার প্রতি স্নেহ ছিল মাত্রাতিরিক্ত, সর্বদা কাছে রেখে এই ধরনের কথা ব'লে যেতেন। অধিকাংশ বুঝতাম না, কিন্তু সে কথা তিনি ভাবতেন না। তাঁর ডায়রীখানার প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমার নাম আছে। আমাকে সম্বোধন ক'রে কিছু-না-কিছু লিখে গেছেন। চোদ্দ-পনের বৎসর বয়স থেকে ঐ ডায়রী আমি প'ড়ে আসছি। আজকের দৃষ্টি দিয়ে সেকালকে বুঝবার পক্ষে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমার বাবার ঐ ডায়রী। এই ডায়রী আরও একটা পরিচয় বহন ক'রে রয়েছে।

সেটা হ'ল সেকালের ভারতবর্ষের মানুষের উপর ইয়োরোপের সভ্যতার প্রভাব পড়ার পরিচয়। ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের মানুষেরা জীবনের পরিচয় বহন ক'রে আসছে স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে। রাজসিক রুচিতে শিলালিপি তাম্রশাসন রেখে গেছেন রাজন্যবর্গ—গৃহচ্ছদে, মন্দিরে, পোড়ামাটির ফলকের লেখায় বা ঘরের কাঠের মড়দলে সন তারিখ নাম আছে, তবু এ দেশে জীবনান্তে দেহকে ছাই ক'রে সমস্ত কিছু মুছে দিয়ে যাওয়ারই রীতি। কবিদের কাব্যে নিজের পরিচয় দেওয়া আছে, দীঘির নামেও কীর্তিমানেরা নাম জুড়ে রেখে গেছেন সত্য, কিন্তু আত্মজীবনের কথা লেখার রেওয়াজ ছিল না। ভাল-মন্দর বিচার করছি না। স্বভাবের কথা বলছি। ইংরিজী সভ্যতার প্রভাবেই ডায়রী লেখার রেওয়াজ এসেছিল। ইংরিজী শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ না করলেও আমার বাবার উপর তা পড়েছিল। আমাদের গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে কীর্ণাহার। সেখানকার জমিদার স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সরকার মহাশয় ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু, পুণ্যাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বৈবাহিক। তিনি আমার পিতামহের বয়সী। তিনি ডায়রী রাখতেন. বোধ হয় আমাদের অঞ্চলে ডায়রী-লেখক হিসাবে তিনিই প্রথম ব্যক্তি। শিবচন্দ্রবাবুই আমাদের অঞ্চলে প্রথম হাইস্কুল স্থাপন করেন—জেলার মধ্যে বোধ হয় দ্বিতীয় হাইস্কুল। প্রথম হাইস্কুল সিউড়ী শহরের গবর্ণমেণ্ট স্কুল।

বাবার ডায়রীতেও স্পষ্ট এবং সেকালের শ্রুতি ও স্মৃতিতেও প্রমাণ রয়েছে যে, তখনকার কালের মানুষ ইংরাজের রাজত্বে ইংরিজী সভ্যতার ও শিক্ষার রাজকীয় সমাদরে গভীর বেদনার সঙ্গে ভাল-মন্দ যা কিছু অতীত কালের সম্বল ছিল সমস্ত কিছুকে পুরানো পুঁথির দপ্তরে বেঁধে ভাঙা পেঁটরায় পুরে নূতনকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

মন্দ ছিল প্রচুর।

বিশেষ ক'রে মেয়েদের জীবনে। কৌলীন্যের দোর্দণ্ড প্রতাপে তখনও ঘরে ঘরে কন্যারা বিবাহের পরেও পিতৃগৃহে থাকেন। পিতৃগৃহে তাঁদের অবশ্য দোর্দণ্ড প্রতাপ। আমার 'দুই পুরুষে' নুটুর মুখে আছে, 'ব্রাহ্মণের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়, উপবীত থাকে গলায়, ভগ্নীর স্থান মাথায়।' এ সেই আমলের কথা। এক এক কুলীন তখনও চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বিবাহ ক'রে থাকেন। আমাদের দেশে কুলীনদের মধ্যে এ রেওয়াজ তখন কমেছে। বিবাহ পেশা যাঁদের, তাঁদের অধিকাংশেরই বাস ছিল পূর্ববঙ্গে—যশোর, খুলনা, বিক্রমপুর। আমরাও কুলীন। কিন্তু এক স্ত্রী বর্তমানে বিবাহ তখন নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে। সন্তান না হ'লে দু-তিন বিবাহরীতি অবশ্য তখনও বর্তমান। তখনকার দিনে সন্তানহীনা স্ত্রী বংশরক্ষার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিবাহ দিতেন, তার পিছনে ছিল সমাজের উৎসাহ; এমন স্ত্রী সমাজে অজস্র প্রশংসায় ধন্য হতেন। এ সব অবশ্য সম্পত্তিশালী লোকের ঘরেই ঘটত।

'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-প্রণেতা স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আমাদের গ্রামের কুটুম্ব ছিলেন। আমাদের গ্রামে মধ্যে মধ্যে যেতেনও। তিনি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' লিখে যে প্রশংসা পেয়েছিলেন, আমাদের ওখানে সে প্রশংসা উপলব্ধি করার মত লোক ছিল না এমন নয়, ছিল; কিন্তু

স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেন নি বা এমন লোক কখনও আর বিবাহ করবেন না— এই উপলব্ধির প্রশংসাটাই ছিল বড়। তাই তিনি যখন আবার বিবাহ করলেন, তখন লোক তাঁকে আর সে প্রশংসা দিত না। তিনিও দ্বিতীয় বিবাহের পর আর বড় একটা সম্পর্ক রাখেন নি লাভপুরের সঙ্গে।

এমনি যখন দেশের পটভূমি পরিবর্তনমুখী, তখন আমাদের ঘরের পটভূমিতে পরিবর্তন ঘটে গেল খানিকটা দ্রুততর গতিতে। আমাদের ঘরে এলেন আমার মা। তখন আমাদের সংসারের উপর দিয়ে একটা বিপর্যয় চ'লে গেছে সদ্য-সদ্য। আমার পিসীমা ছিলেন পাঁচজন। তাঁদের তিনজন মারা গেছেন অল্প কিছু দিনের মধ্যেই। এক পিসীমা একই দিনে কলেরায় স্বামী-পুত্রকে হারিয়ে ঘরে এসেছেন। আমার বড় মা গেলেন। তারপরই এলেন আমার মা। পাটনা শহরের প্রবাসী বাঙালী ঘরের মেয়ে, বাপ ইংরিজী-নবিস সরকারী চাকুরে। শুধু এইটুকু বললেই বলা হ'ল না। তিনি অসাধারণ একটি মেয়ে। প্রতিভাময়ী। তিনি এসেই আমাদের সংসারকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তখনকার দিনে আমাদের গ্রামে প্রবহমান যে কাল তাকে পিছনে রেখে অনেক দূরে। তখনও পিতার এক পুত্র আমার বাবা মদ্যপানে মাত্রা ছাড়ান, ক্রোধে আত্মহারা হন। আমার পিসীমা একদিনে স্বামীপুত্র হারানোর বেদনায় ক্ষোভে অধীর-চিত্ত, অসহিষ্ণু প্রকৃতি, অনির্বাণ চিতার মত উত্তপ্ত। আমাদের সংসারে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। আছে সবই, কিন্তু শ্রী নাই, মাধুর্য নাই, এমন কি সেবাও নাই—কেউ অসুস্থ হ'লে সে একা বিছানায় রোগযন্ত্রণা ভোগ করে, ঝি-চাকরে এক গ্লাস জল রেখে যায়, কবিরাজ-বাড়ী থেকে ওষুধ আসে কিন্তু অনুপানের অভাবে, ওষুধ মেড়ে তৈরি করবার অভাবে নিয়মিত খাওয়া হয় না। রোগীর যন্ত্রণা তার পীড়িত মনের ক্রুদ্ধ চীৎকারে গোটা বাড়ীতেই নিজের রোগটা সংক্রামিত ক'রে দেয়, এমনি অবস্থা।

আমার মা এলেন আমাদের বাড়ীতে। বয়স তখন পনেরো। পনেরো বছরের মেয়েটি বাড়ীতে পা দেবা মাত্র গোটা বাড়ীটার চেহারা ফিরে গেল। বাবার সমস্ত ঔদ্ধত্য মহিমময় গাম্ভীর্যে পরিণত হ'ল; পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে তিনি যেন শান্ত হয়ে সাধনামগ্ন হলেন। কৌলিক এবং দেশের মাটির যে সাধনা ও ঐতিহ্য রক্তের মধ্যে মানুষ বহন করে, তাঁর মধ্যে তা আত্মপ্রকাশ করল; বর্ষার ভাঙনের খেলায় উন্মত্ত, ভাঙা মাটির রক্তের বন্যার উচ্ছ্বাসে ভরা ভৈরব নদ যেন শরৎকালের ব্রহ্মপুত্রে রূপান্তরিত হ'ল। পিসীমা সেবায় স্নেহে ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে এলেন। বাড়ীর শ্রী ফিরল। নিজের রুচিমত তিনি ঘরগুলি সাজালেন।

বাড়ীতে আমাদের কাঁঠালকাঠের আলমারি খাট চেয়ার টেবিলের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তাতে কোন রঙ দেওয়া ছিল না। দেশে তখনও রঙের চলন হয় নি। বড় বড় দালান-বাড়ীর দরজায় জানলায় আলকাতরা দেওয়া হ'ত। ব্যবসায়ী ধনী স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর বাড়ীর দরজায় জানালায় সবুজ রঙ এসেছে এবং কলকাতার দোকানের বার্নিশ-করা ফার্নিচারও কিছু কিছু এসেছে। আমার মা এসে বাবাকে বললেন, এই খাট আলমারিগুলিতে বার্নিশ দিলে বড় ভাল হয়।

—বার্নিশ? সে দেবে কে?

—দেবে ছুতোর মিস্ত্রীতেই; তুমি কিছু শিরীষ কাগজ আর ফ্রেঞ্চ বার্নিশ সিউড়ী বা কলকাতা থেকে আনিয়ে দাও।

—আমাদের এখানকার মিস্ত্রীরা ও কাজ পারবে না।

—পারবে। আমাদের পাটনার বাড়ীতে বার্নিশ করানো হয়। মিস্ত্রীদের বার্নিশ করা দেখেছি আমি। আমি ব'লে দেব। তোমাকে ব'লে দেব—তুমি মিস্ত্রীদের বুঝিয়ে দিয়ো।

তাই হ'ল। সাজিমাটি দিয়ে আসবাবগুলি ধোবার সময় অনেকে বললে, গেল—কাঠগুলোর দফা গয়া হ'ল।

কিন্তু বার্নিশ শেষ হ'লে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল, বললে—কে বলবে সেই জিনিস? গয়ায় পিণ্ড পেয়ে প্রেতযোনি থেকে মুক্তি পেয়ে নবজন্ম নবকলেবর লাভ করলে জিনিসগুলি। তারপর ঘরে রঙ দেওয়ালেন। বাবার বইগুলিকে পাঠালেন সিউড়ীতে দপ্তরী-বাড়ী। বেঁধে এল সেগুলি। পুরানো ছবিগুলির সঙ্গে কিছু নতুন রবিবর্মার ছবি কিনে নতুন ক'রে পেরেক পুঁতে টাঙালেন সেগুলি, ব্রাকেটগুলিও নতুন বন্দোবস্তে টাঙালেন। ঘরে দেওয়ালে আলমারির তাক ছিল—দরজা ছিল না। সে তৈরী করালেন, কাচ বসালেন। বালিশে ঝালরদেওয়া ওয়াড় তৈরী ক'রে পরালেন। বাক্সের ঘেরাটোপ হ'ল। বাবার বাগানের শখ ছিল, ফুল হ'ত প্রচুর। পূজার জন্য তোলা হ'ত, এখন থেকে ফুলের মালা হতে শুরু হ'ল, বিগ্রহের জন্য আগে—তারপর মানুষের জন্য। রূপার ডিসে লম্বা গেলাসে সাজানো হতে লাগল।

বাড়ীখানিতে যেন তাঁর প্রতিবিম্ব ছড়িয়ে পড়ল। পাড়ায় খবর রটল। মেয়েরা এসে দেখে গেলেন। এমন কি স্বর্গীয় যাদবলালবাবু একদা বাড়ীর দরজায় এসে ডাকলেন—হরিমামা, আমি আপনার ঘর দেখতে এলাম। শুনলাম বাঁকীপুরের মামী নাকি চমৎকার ঘর সাজিয়েছেন। আমি দেখব।

তিনি দেখে গেলেন।

তাঁর বাড়ীও নতুন ছাঁদে সাজল। অনেক উজ্জ্বলতর শ্রী এবং শোভা হ'ল অবশ্য আয়োজনের মহার্ঘতায়, ঝাড়-লণ্ঠনের শতেক বাতির আলো সেখানে জ্বলল। কিন্তু কেরোসিনের কালি-পড়া ডিবের বদলে ঘরে মোমবাতির আলোর প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন আমার মা।

আমার মায়ের আগে আমাদের গ্রামে পদার্পণ করেছিলেন মায়েরই মামাতো দিদি। সারা শহরের বিখ্যাত উকিলের মেয়ে। তিনিই করতে পারতেন এ রেওয়াজের প্রবর্তন; তাঁরও ছিল অনেক গুণ। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তাঁর গুণপনা কার্যকরী হয় নি। তাঁর বিবাহ হয়েছিল আমাদের গ্রামের এক অতি দরিদ্র-সন্তানের সঙ্গে। দরিদ্র-সন্তানটি নিজের শক্তিতে অধ্যবসায়ে এবং যাদবলালবাবুর আনুকূল্যে (যাদবলালবাবুর উপর নির্ভরশীল আত্মীয় ছিলেন) বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। আবার এই

উকীলটি সন্ধান ক'রে ছেলেটিকে বের ক'রে তারই সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু অকালে তিনি মারা গেলেন; শুনেছি মৃত্যুর দু-তিন দিন পরেই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর নিয়োগপত্র এসেছিল অদৃষ্টের পরিহাসের মত। তারই ফলে মাসিমা তাঁর গুণপনার প্রভাব ছড়াতে পারেন নি; দারিদ্র্যদোষ গুণরাশিকে নাশ করে, এর চেয়ে সাধারণ সত্য আর নাই। শুধু তাই নয়, তিনি অকালবৈধব্যের বেদনায় বোধ করি তাঁর প্রভাব ছড়াতেও চান নি।

মোট কথা, কাল-পরিবর্তনের ক্ষণে আমার মা আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ ক'রে প্রসন্না শক্তির মত কাজ করেছেন। শুধু রুচির দিক থেকেই নয়, ভাবের দিক থেকেও তাঁর মধ্যে তিনি এনেছিলেন নূতন কালকে। আমার জীবনে মা-ই আমার সত্যসত্যই ধরিত্রী, তাঁর মনোভূমিতেই আমার জীবনের মূল নিহিত আছে, শুধু সেখান থেকে রসই গ্রহণ করে নি, তাঁকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে। ওই ভূমিই আমাকে রস দিয়ে বাঁচিয়ে প্রেরণা দিয়ে বলেছে, 'আকাশলোকে বেড়ে চল, সূর্য-আরাধনায় যাত্রা কর। তুলে ধর তোমার জীবনপুষ্প দিয়ে সূর্যার্ঘ্য।'

আমার মায়ের দেহবর্ণ ছিল উজ্জ্বল শুভ্র। আর তাতে ছিল একটি দীপ্তি। চোখ দুটি স্বচ্ছ, তারা দুটি নীলাভ। কথাবার্তা অত্যন্ত মিষ্ট, প্রকৃতি অনমনীয় দৃঢ়, অথচ শান্ত। আর আছে জীবনজোড়া একটি প্রসন্ন বিষণ্ণতা। সেটা তাঁর অনাসক্ত প্রকৃতির বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। আমার মা যদি উপযুক্ত বেদীতে দাঁড়াবার সুযোগ পেতেন তবে তিনি দেশের বরণীয়াদের অন্যতমা হতেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পড়াশুনা তিনি যথেষ্ট করেছেন। পিত্রালয়ে পাটনার স্কুলে নিচের ক্লাসে—বোধ হয় আপার প্রাইমারি ক্লাসে পড়ার সময় বিবাহ হয়; পল্লীগ্রামে রক্ষণশীল পরিবারের বধূ হয়ে সংসারের শত সহস্র কর্মের মধ্যেও তিনি তাঁর পড়াশুনা ক'রে গেছেন। আমার বাবার বয়স তখন সাতাশ, মায়ের বয়স পনের, এই দিক দিয়ে অর্থাৎ সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়েই তাঁদের মানসিক মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'ল। এই কারণেই আমার বাবার মত প্রবলব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে শান্ত সংযত বেগবান প্রবাহে পরিণতি তিনি দিতে পেরেছিলেন। তিনি শিষ্যার মত স্বামীর কাছে ধর্মশাস্ত্র পড়েছিলেন। সেকালের উপন্যাসগুলি সবই পড়েছিলেন; পুরাণ রামায়ণ মহাভারত তাঁর কণ্ঠস্থ; কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল পড়েছেন। হরিবংশ, ভাগবতের অনুবাদ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয়-পুরাণ,—এ সবও পড়েছেন। মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমাসম্ভব, পলাসীর যুদ্ধ, রৈবতক, বৃত্রসংহার—এগুলিও সে আমলে পড়েছেন তিনি। আজ তাঁর বয়স সত্তর। ছেলে সাহিত্যিক হওয়ায় এ আমলে কিছু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, প্রভৃতি এবং আমার লেখাও পড়েছেন। সেদিন নারায়ণ গাঙ্গুলীর বই পড়ছিলেন দেখেছি। আজও তাঁর পড়াশুনার অভ্যাস অটুট আছে। এবং সে অভ্যাস বিচিত্র। অম্বলের ব্যাধির জন্য আফিং খান। সন্ধ্যার সময় আফিঙের ঝোঁকে একবার শুয়ে পড়েন। ঘণ্টা দুয়েক পরে ওঠেন, সকলকে খাইয়ে দাইয়ে নিজে বসেন একটি হ্যারিকেন সামনে রেখে একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে। রাত্রের এ

পাঠই তাঁর সত্যকার পাঠ। এবং এ সময়ে রামকৃষ্ণকথামৃত বা অন্য কোন শাস্ত্র ছাড়া আর কিছু পড়েন না। এমনও দেখেছি যে, রাত্রি দুটো, আলো জ্বলছে, মা পড়ছেন। কোন কোন দিন দেখেছি, সেই রাত্রে ভাঁড়ার ঘরে আলো জ্বলছে, মা ঘুরছেন ঘরের মধ্যে। জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর পেয়েছি, 'বইখানা শেষ হ'ল; শুলাম, ঘুম এল না, তাই কি করব? কাজ সেরে রাখছি।' কোন দিন দেখেছি বই বন্ধ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে আছেন। বলছেন, 'বইখানা এই শেষ হ'ল। ভাবছি।'

তাঁর হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর। বানান নির্ভুল, ব্যাকরণেও ভুল করতেন না। আজকাল লেখার পাঠ প্রায় তুলে দিয়েছেন। আমার বাবার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল প্রায় বার-চোদ্দ বৎসর আমাদের বাড়ীর খসড়া জমাখরচের খাতা তিনি নিজে হাতে লিখেছেন; সে খাতাগুলি আজও আছে। পৃষ্ঠাগুলি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কতবার মামলার দাখিল কাগজে তাঁর সই বা লেখা দেখে বিচারক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এ কোন মেয়ের হাতে লেখা হতে পারে না। তেমনি তাঁর সাহস। অনুরূপ স্থৈর্য।

আমাদের বাড়ীর পশ্চিম ভাগে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ। দুটি শিবালয়, নাটমন্দির, দুর্গামণ্ডপ, কালীমণ্ডপ, নারায়ণের মন্দির, তার মধ্যে অনেকটা খোলা জায়গা। শিবালয়-গুলির কোণে একটি বুড়ো কামিনীফুলের গাছ, গাছটিতে চ'ড়ে আমরা ছেলেবেলায় সমবেত জনতার মাথার উপর দিয়ে বলিদান দেখতাম। একদা রাত্রে আমার শোবার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি—মা দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন চণ্ডীমণ্ডপের দিকে। প্রশ্ন করতেই নীরবে দেখিয়ে দিলেন কামিনীগাছটাকে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে দেখলাম—কামিনীগাছের গুঁড়িটির যেখান থেকে দুটি ডাল বেরিয়ে পৃথক হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি শুভ্রবস্ত্রাবৃত মূর্তি। মধ্যে মধ্যে গাছের ডাল দুটিকে নাড়া দিয়ে দোলাচ্ছে। শিউরে উঠলাম। তারপর তিনি নিচে নামলেন। প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাবে? তিনি আঙুল বাড়িয়ে ওই ছায়ামূর্তি দেখিয়ে দিলেন।

—সে কি?

—দেখে আসি।

তিনি বাইরের দরজা খুলে তখন এগিয়েছেন। আমাকে অগত্যা অনুসরণ করতে হ'ল। খানিকটা গিয়ে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন—জ্যোৎস্না। কালো গাছের ফাঁকটায় জ্যোৎস্না পড়েছে।

সত্যিই তাই। কাছে গিয়ে দেখলাম, গাছের ফাঁকটি এই রাত্রে পল্লবের কালো রূপের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোয় ঠিক মানুষের আকার নিয়েছে।

একবার আমাদের খিড়কিতে একটি শেওড়াগাছের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত চোখ দেখে এগিয়ে গেলেন তার তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য।

সবচেয়ে তাঁর সাহস এবং স্থৈর্য দেখেছি সাক্ষাৎ কালস্বরূপ সাপের সম্মুখে। আমাদের বাড়ীতে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পিতামহের বাড়ীতে ও আমাদের বাড়ীতে গোখুরা সাপের প্রাদুর্ভাব

বেশি। আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রেই দেখে আসছি। গ্রীষ্মকাল থেকে শীতের প্রারম্ভ পর্যন্ত অন্ততঃ চার-পাঁচটা বড় বড় গোখুরা মারা পড়েই প্রতি বার। এর সঙ্গে কয়েকটা চিতি, মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর দু-একটা চন্দ্রবোড়া। এক এক বৎসর বাড়ির কাছেপিঠে বাচ্চা হ'লে বিশ-ত্রিশটা গোখুরার আধ হাত থেকে হাতখানেক লম্বা বাচ্চাও মারা পড়ে। একবার তিন-চার দিনে তেতাল্লিশটা বাচ্চা বেরিয়েছিল। সেবার প্রথম বাচ্চাটা দেখা দিয়েছিল মায়ের পায়ের উপর। রোয়াকে উঠানে পা ঝুলিয়ে মা ব'সে আছেন, গরমের সময়, এখানে ওখানে ব'সে আছেন আরও সকলে। মা কথা বলতে বলতে স্থির হয়ে গেলেন। কথাও বলেন না, নড়েন না, মাটির মূর্তি যেন।

পিসীমা ডাকেন—বউ!

উত্তর নাই।

—মা!

উত্তর নাই।

কে যেন শঙ্কিত হয়ে তাঁর গায়ে হাত দিতে উদ্যত হতেই তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন—সাপ।

—কোথায়?

—আমার পায়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে। চুপ কর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বলেন—আলো। পা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুতপদে একটা আলো নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন, উঠান এবং রোয়াকের কোলের নালা বেয়ে চলেছে গোখুরা সাপের শিশু; আলো এবং মানুষের চাঞ্চল্যে তার মনোহর চক্র প্রসারিত ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াল। মা হাসলেন, কিছু বললেন না।

আশ্চর্য তাঁর এই সাপ সম্পর্কে সজাগবোধ। ঘরে সাপ বের হ'লে তিনি ঘরে ঢুকবা মাত্র বুঝতে পারেন। মাটির উপর সাপের বুকে হাঁটার একটা শব্দ আছে। সে শব্দ যত মৃদুই হোক তাঁর কানে ধরা পড়তই। পড়ত এই কারণে বলছি যে, আজকাল মায়ের কানের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তাতেও তিনি বুঝতে পারেন বিচিত্র পর্যবেক্ষণশক্তিতে। ভাঁড়ার ঘরেই সাপ বের হয় বেশি। সাপ ঘরে স্থির হয়ে থাকলেও তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বলেন—আলোটা দেখি। ঘরে বোধ হয় সাপ রয়েছে।

আলো না নিয়ে ঘরে ঢোকাটাই তাঁর অভ্যাস। হাজার হ'লেও আলো নেওয়ার অভ্যাস তাঁর হয় নি। আলো নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি সাপের সন্ধান করেন। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বের করেন—ওই, ওই। কোন ক্ষেত্রে চ'লে যায় সাপ আলোর ছটা পেয়ে, কোন ক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ে, মা আলো সামনে রেখে গতিরোধ ক'রে আমাদের বলেন—লাঠি আনো, মারো। ক্ষেত্রবিশেষে বেদে ডাকানো হয়। বেদে ধ'রে নিয়ে যায়।

যে সাপ স্থির হয়ে থেকে গর্জন না ক'রে নিজের অস্তিত্ব গোপন রাখতে চায়, অন্ধকারেও তার অস্তিত্ব কেমন ক'রে তিনি বুঝলেন, এ প্রশ্ন প্রথম জীবনে সবিস্ময়ে একদিন করেছিলাম—

কি ক'রে বুঝলে তুমি ?

হেসে বলেছিলেন—ঘরে ঢুকেই দেখলাম সব স্থির। আরসুলারা উড়ছে না, ইঁদুর দলের নাচের আসর বসে নি ; বুঝলাম, ঘরে নিশ্চয় এমন কেউ এসেছেন যাঁর সামনে এ সব বেয়াদপি চলে না। ভীষণ শাসন তাঁর।

আরও তত্ত্ব আছে, যে তত্ত্বটি সকল সময় ধরা পড়ে না। সাপ ও সাপিনীর মিলনের সময় সাপিনীর গায়ে কাঁঠালীচাঁপার গন্ধের মত গন্ধ বের হয়। এই গন্ধের তথ্যও তিনিই আমাকে বলেছিলেন। বেদেদের কাছে তথ্যের তত্ত্ব অবগত হয়েছিলাম পরে। এই সমর্থনও পেয়েছি সাপের সম্পর্কে যাঁরা বই লিখেছেন তাঁদের বইয়ে।

এই দিক দিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সাহসের আর দুটি কথা বলব। যদি নিজের মায়ের কথা কিছু বেশীই বলা হয়, তবু মার্জনা পাব ভরসা আছে।

আমার আট বছর বয়সের সময় আমার বাবা মারা যান। তারপর আমাদের বাড়ীর অভিভাবক হয়ে আসেন আমার বাবার মাতুল। তাঁরও ত্রিসংসারে কেউ ছিল না—তাঁর ওই ভাগিনেয়টি ছাড়া। আমাদের ভাগ্য—বৎসর চারেক পরে তিনিও মারা গেলেন এবং আমরা সংসারে হলাম একান্তভাবে পুরুষ-অভিভাবকহীন। বাড়ীতে নায়েব একজন এবং আমার ভাইদের পড়াবার জন্য মাস্টার গৌর ঘোষ, তা ছাড়া চাকর ও চাপরাসী। এ ছাড়াও গরু বাছুরদের পরিচর্যার জন্য দু তিন জন বাউরী জাতীয় চাকর। বৈঠকখানার উঠানে ধানে বোঝাই মরাই তিন চারটি। কয়েকদিন পরেই চাপরাসী, নায়েব, চাকর এবং গৌর ঘোষদের মুখপাত্র হিসাবে গৌর ঘোষ সবিনয়ে মাকে বললেন—মা, অপরাধ নেবেন না ; একটি কথা বলব। পিসীমাকে বলতে সাহস হয় না, উনি রেগে উঠে হয়তো—

—কি বল ?

—বৈঠকখানায় তো টেঁকা কঠিন হ'ল মা।

—কেন ? ব'লেই মা বললেন—ও ! ভয় পাচ্ছ তোমরা ?

—হ্যাঁ মা। কর্তা বোধ হয়—

অর্থাৎ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

এতক্ষণে নায়েব বললেন—সমস্ত রাত্রি, যে ঘরে তিনি মারা গিয়েছেন, সেই ঘরে হট-হট শব্দ হয়, চেয়ার খাটে যেন কেউ বসেন ওঠেন। ভয়ে মা শরীর হিম হয়ে যায়।

পিসীমা শুনেছিলেন কথাটা। তিনি প্রথমটা রাগই করলেন।

তাঁরা সভয়ে চ'লে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এসে চুপি চুপি ডাকলেন—মা ! পিসীমা !

—কি ?

—দয়া ক'রে একবার আসুন, নিজের কানে শুনে যান।

মা উঠলেন, পিসীমাকেও উঠতে হ'ল।

বৈঠকখানার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কান পেতে রইলেন।

হট্-হট্। খট্-খট্। তার পর দুম শব্দ উঠল।

যে ঘরে বাবার মাতুল মারা গিয়েছিলেন, সেই ঘরের মধ্যে। সকলে আঁতকে উঠলেন। মা কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ঘরটার তালা খুললেন। আলো নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। দেখলেন সত্য সত্য চেয়ার টেবিল স'রে ন'ড়ে গিয়েছে। একটা চেয়ার উল্টে প'ড়ে আছে।

পিসীমা সকাতরে বললেন—বউ, কি হবে?

মা কোনও উত্তর দিলেন না। চারিদিক দেখলেন—তার পর আবিষ্কার করলেন একটি জানালা একটু খোলা রয়েছে। তিনি এগিয়ে গেলেন, জানালাটি বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে খিল এঁটে দিয়ে বললেন, সমস্ত জানালার খিলে একটা ক'রে পেরেক এঁটে দিন দেখি।

দেওয়া হ'ল। তারপর বললেন—এইবার দেখুন।

দুদিন পর আবার তাঁরা বললেন—মা, ওই ক'রে কি অশরীরীর উপদ্রব বন্ধ হয়?

—আবার হচ্ছে?

—ঘরে অবশ্য কিছু হচ্ছে না। সমস্ত রাত্রি চালের ওপর চ'লে বেড়াচ্ছেন। মচ মচ শব্দ হচ্ছে। পরের দিন মা একটা পেয়ারা গাছ কাটিয়ে দিলেন। গাছটা ছিল বাড়ির বাইরে। কিন্তু ডাল এসে পড়েছিল চালের উপর।

এবার সবই বন্ধ হ'ল। তাঁরা বললেন—বুঝতে পারি নি মা। ওই মরাইয়ের ধান নেবার উদ্যোগ-পর্ব হচ্ছিল। যাতে ভয় পাই, শব্দ হ'লেও না উঠি।

কিন্তু সেই দিন রাত্রেই বাড়ী থেকে খেয়ে বৈঠকখানায় ফিরেই তাঁরা সদলে চীৎকার ক'রে উঠলেন। গৌর ঘোষ খুব উঁচুদরের ভূতের গল্প বলিয়ে ছিল—সে বাড়ীর ভেতর পর্যন্ত ছুটে এসে প'ড়ে গেল।

—কি হ'ল?

—প্রচণ্ড শব্দ ক'রে গাছের উপর কর্তা 'ঝাঁপ' ব'লে লাফিয়ে পড়লেন।

—বল কি? মা বের হ'লেন।

—বউ, যেয়ো না। বউ! পিসিমা ডাকলেন।

বউ শুনলেন না। গিয়ে যে কাঁঠাল গাছটার উপর কর্তা লাফিয়ে পড়েছিলেন, মাথার উপর আলোটা তুলে সেই গাছটার উপর আলো ফেললেন।

'ঝাঁপ' শব্দ ক'রে এবার লাফ দিয়ে মাটিতে পড়লেন তিনি। তিনি কর্তা নন। পাউষ বিড়াল একটা। এক ধরণের বন্য বিড়াল। অবিকল 'ঝাঁপ' ব'লে চিৎকার করে। সকলেই তখন বললে—বললাম গৌর, ভাল ক'রে দেখ। তা না, ছুটে চ'লে গেলে বাড়ী।

গৌর বেচারা তখন একপাটি চটির অন্বেষণে ব্যস্ত থেকে লজ্জা থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করছে—এক পাটি আবার কোথায় গেল? কি বিপদ!

বিপদই বটে। ছুটে পালাবার সময় ছটকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকেছে হাত-দশেক দূরে মালতী লতার ঝোপের মধ্যে।

মায়ের এই সাহস আমার পক্ষে বিপদের হেতু হয়েছিল এক সময়। প্রথম সিগারেট

খেতে শিখি তখন। রাত্রে বৈঠকখানায় অন্ধকারে আরাম ক'রে সিগারেট খাচ্ছি। হঠাৎ হাত পড়ল পিঠে। ফিরে দেখি মা দাঁড়িয়ে। কখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে দাঁড়িয়েছেন। চমকে উঠলাম। হাত থেকে সিগারেট প'ড়ে গেল। মা বললেন—ছি!

তারপর চ'লে গেলেন।

এই সময়ে অর্থাৎ কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে তিনি যেন আগলে ফিরতেন আমাকে। সর্বাপেক্ষা রাগ হ'ত এবং বিপদ হ'ত আমার উপন্যাস পড়া নিয়ে। তখন যা পাই পড়ি। পড়ি না শুধু পাঠ্যপুস্তক। কিন্তু প্রতি বই পড়তে গিয়েই ধরা পড়ি তাঁর কাছে। তাঁরও ক্লান্তি নেই, আমারও ক্লান্তি নেই। অথচ এই গল্পের প্রতি আমার অসাধারণ আসক্তির মূল তিনি। তিনি আমার গল্পের আসক্তি জন্মিয়েছেন। অসাধারণ তাঁর গল্প বলার শক্তি ছিল। আমি আমার জীবনে চার জন প্রথম শ্রেণীর গল্প বলিয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছি। প্রথম আমার মা। যেমন বলতে পারতেন গল্প, তেমনি অফুরন্ত ছিল তাঁর ভাণ্ডার। অনেক গল্প আজও মনে আছে। আজও কানে বাজছে—

"কোথা গো মা কাজলহারা
মুছাও আমার অশ্রুধারা
প্রাণে মারবে মুক্তাহারা
আসবে রাজা মিনকোহারা
পত্নীহারা কন্যাহারা—
চোখের জলে ভাসবে ধরা।"

"রাজা মিন্‌কোহারা মস্ত রাজা। দুই রাণী তাঁর, মুক্তাহারা আর কাজলহারা। মুক্তাহারা বন্ধ্যা, কাজলহারার একটি মাত্র কন্যা—ননীর পুতলী, যেমন লাবণ্য তেমনি রূপ। মিন্‌কোহারা গেলেন দিগ্বিজয়ে। সুযোগ পেলেন মুক্তাহারা তাঁর সতীনের উপর হিংসা চরিতার্থ করবার। কাজলহারা কিন্তু অত্যন্ত সরলা। তিনি দিদি বলেন মুক্তাহারাকে। ভক্তি করেন, বিশ্বাস করেন। সুযোগ নিলেন মুক্তাহারা, মিষ্ট কথায় কাজলহারাকে ডেকে বললেন—আয় কাজল, তোর চুল বেঁধে দি। কাজলহারা দিদির সমাদরে উৎফুল্ল হয়ে চুলের গুছি দড়ি নিয়ে ছুটে এসে বসলেন ছোট আদুরে মেয়েটির মত। মুক্তাহারা অবিকল সাপের মত আকার দিয়ে বাঁধলেন বেণী, তারপর একটি মন্ত্রপূত শিকড় তাঁর খোঁপায় গুঁজে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজলহারা হয়ে গেলেন এক অজগর সাপ। হয়ে তিনি রাজপুরী থেকে বেরিয়ে নগরের প্রান্তে একটি গাছের কোটরে আশ্রয় নিলেন। পিছন পিছন তাঁর মেয়েটি এসে—সেই কোটরের ধারে ব'সে ঐ ব'লে কাঁদতে লাগল!" এই গল্প। কিন্তু ওই যে রাজকন্যার কান্না—সে কান্নায় শ্রোতারা সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলত, আমি কাঁদতাম। আজও আমার মনে আছে, তার সেই বিলাপের অবিকল শব্দবিন্যাস।

গল্প শেষে মা হেসে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে একটি হিন্দী প্রবাদবাক্য বলতেন—বলনেওয়ালা ঝুটা, শুননেওয়ালা সাচ্চা, অর্থাৎ গল্প যে বলে সে বলে মিথ্যে কিন্তু যে শোনে

সে শোনে সত্য।

আমার মায়ের মধ্যে ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ। আমার বাবারও ছিল। রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান যখন প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাঁর ডায়রীতে পাই—৩০শে আশ্বিনের ডায়রী—"বেঙ্গল পার্টিশন হইয়াছে, হিন্দু মুসলমান সকল জাতিই মনে মনে দুঃখ পাইয়াছে। বঙ্গদেশের এই দুঃখে বঙ্গবাসীগণ আজ নূতন করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। পরাধীনতায় দুঃখ অনুভব করিতেছেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার কবিবর রবীন্দ্র ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞাপন দ্বারা বঙ্গবাসীকে পরস্পরের হস্তে হরিদ্রাবর্ণের রাখী বাঁধিতে বলিয়াছেন। সকল বঙ্গবাসীই তাহা পালন করিবে। ইহা দ্বারাই আমরা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইব। হায়, আজ ৯৫০ বৎসর পরে ঈশ্বরের কি মহিমা যে ভারতের দরিদ্র সন্তানগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে সংকল্প করিয়াছে? হে বিশ্বপিতা, বিশ্বপতি, জগদীশ্বর—হে জগজ্জননী, অসুর-দর্পদলনী মা—একবার তোমাদের চির আশ্রিত শরণাগত ভারতসন্তানগণকে—যাহাদের জন্য তোমরা যুগে যুগে এই ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়া পাপের নাশ করিয়াছ—পুণ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছ—অসুর প্রাদুর্ভাব দলন করিয়াছ তাহাদের শক্তি দাও, তাহাদের হৃদয়ে পুণ্যের আলোক প্রজ্জ্বলিত কর। সত্যধর্ম—হিন্দুধর্মকে গৌরবান্বিত কর। দীনবন্ধো, কৃপা কর—কৃপা কর—কৃপা কর।" অন্যত্র পাই তিনি দেশপ্রেমোদ্দীপক 'পদ' রচনা করেছেন।

আমার মায়ের দেশপ্রেম ছিল আরও বাস্তব। তিনি পাটনার মেয়ে। বাস্তব রাজনীতি-বোধ তাঁর শুদ্ধমাত্র ধর্ম এবং অদৃষ্টের উপরে নির্ভরশীল ছিল না। আমার বড় মামার মধ্যে মাণিকতলার দলের ঢেউ এসে লেগেছিল। পরবর্তী কালে আমার সেজ মামা—আমার থেকে চার-পাঁচ বছরের বড় ছিলেন—তিনি উত্তর-ভারতের বিপ্লবীদলের দলভুক্ত হয়েছিলেন। অকালে বিশ-বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্লেগ রোগে মারা যান। পরে বেনারস কন্স্পিরেসি কেসে তাঁর নাম কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে—তাঁর পরবর্তী ছোট ভাইকে তাতে সাক্ষ্যও দিতে হয়েছে।

ঐ প্রথম রাখীবন্ধনের দিন আমার বড় মামা লাভপুরে ছিলেন। তিনি রাখী এনে আমার মায়ের হাতে বেঁধে দিতেই মা তাঁর হাত থেকে একটি রাখী নিয়ে আমার হাতে বেঁধে দিয়ে মন্ত্র পড়েছিলেন—বাংলার মাটি—বাংলার জল—

এই ঘটনাটির উল্লেখ 'ধাত্রীদেবতা'য় আছে। . 'ধাত্রীদেবতা'র মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। আমার আত্মীয়া একটি কলেজে-পড়া মেয়ে 'ধাত্রীদেবতা' প'ড়ে বলেছিল—'আপনি নিজের মাকে একেবারে মহিমময়ী ক'রে বই লিখেছেন।' আমার মা সত্যই মহিমময়ী।

আজ তিনি বৃদ্ধা, জীবনের দীপ্তি হ্রাস পেয়ে আসছে। সে আমলের সে দীপ্তিময়ীকে প্রথম দর্শনে চেনা যায় না, তার বদলে দেখা যায় এক অপরিসীম করুণাময়ী নারীকে, যাঁর বুকে আজ সকল আগুন জল হয়ে অক্ষয় সরোবরের সৃষ্টি করেছে। সামান্য জীবজন্তুর কষ্ট দেখা দূরের কথা—শুনলেও সে সরোবরে উচ্ছ্বাস উঠে। আছে শুধু আত্মার সেই আকৃতি।

সেই আকৃতিতে তিনি প্রতীক্ষা ক'রে আছেন মৃত্যু কবে আসবে সেই দিনের। এ প্রতীক্ষা জীবনের পরাজয়ের তিতিক্ষায় নয়, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতময়ের সাক্ষাতের প্রত্যাশায়।

মা আমার মহিমময়ী। কালের নূতন পদপাতে আলপনায় পদশোভা আঁকবার শক্তি এবং নৈপুণ্য নিয়ে জন্মেছিলেন বা অর্জন করেছিলেন ব'লেই তিনি শুধু মহিমময়ী নন। আরও কিছু আছে। সেটা হ'ল—নূতন পদপাত ক'রে কাল যে নবযুগভঙ্গিতে প্রকট হলেন, তাতেই তাঁর জীবনদর্শন বা ভাবনা গণ্ডীবদ্ধ নয়। যুগভঙ্গিমায় প্রকট কালের মহাকালরূপ দর্শনের ব্যাকুলতা তাঁর অসীম। নূতনকে আসন ও অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করেছেন; যুগ-ধর্মকে যুগের প্রভাবকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু জীবন-ভাবনায় মানুষ যা চিরদিন ভেবে এসেছে, সে ভাবনা তাঁর গভীর; সেই ভাবনাতেই আজ বৃদ্ধ বয়সে তিনি তন্ময়, তাই সমস্ত কিছুর মধ্যে মানবজীবনের অমোঘ নীতিবোধটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবনমন্ত্র; এবং তাঁর আটষট্টি বৎসরের জীবন —গঙ্গাধারার মত পবিত্র নিরাসক্তির স্রোতোধারায়—অহরহই যেন সদ্যস্নাত। পৃথিবীর সম্পদকে, সুখকে তিনি তুচ্ছ বলেন না, লক্ষ্মীকেই তিনি শক্তিরূপা ব'লে থাকেন, পূজাও দেন, প্রণামও করেন, কিন্তু তাঁর ইষ্টদেবতা হলেন বৈরাগ্যের দেবতা শিব।

মায়ের প্রসঙ্গে এত কথা বলছি যখন তখন এ কথাটিও বলতে হবে সঙ্গে সঙ্গে যে, সেকালে এই ভাবনাটি প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে ছিল। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেছেন, তাঁরা বলেন—এই বোধ বা আধ্যাত্মিকতা মাত্রাতিরিক্ত রূপে এ দেশের মানুষের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ঐহিক সমস্যার সমাধানে সমগ্র জাতিটাকেই ক্লীব ক'রে তুলেছিল। ইতিহাসে তার নজীর আছে। হিন্দুর পরাজয়ের আর অবধি নাই, যে এসেছে—শক-হূন, চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, পাঠান মোগল ইংরেজ—সবার কাছেই তাকে হারতে হয়েছে। শুধু কি মানুষেরই কাছে হেরেছে? সরীসৃপ পশু—এর কাছেও হার মেনে এদের দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করেছে। মনসা পূজা, দক্ষিণরায় পূজা আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। সত্যসত্যই জীবনদর্শন তখন বিকৃত হয়ে উঠেছিল। আধ্যাত্মিকতা পরিণত হয়েছিল তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজাসমারোহে—কোটি কোটি অক্ষম মানুষের 'দেহি দেহি' প্রার্থনা কোলাহলে; ভাবনাও মন থেকে নির্বাসিত হয়ে বাইরে এসে নিয়েছিল অর্থহীন আকার ও অন্ধ সংস্কারের চেহারা।

এ সব স্বীকার ক'রেও কিন্তু আমার মন সেকালকে—কালাপাহাড়ের ভাঙা প্রস্তর বিগ্রহের মত বিসর্জন দিতেও পারে না, শুধু পাথরের পুতুল ব'লে মিউজিয়ামের বস্তু ব'লেও ভাবতে পারে না। ওর মধ্যে কোথায় যেন কি আছে! বিচিত্র বিস্ময়কর কিছু। তেত্রিশ কোটি দেবপূজার শুকনো বা পচা ফুলের রাশির মধ্যে ওই বৈরাগ্যের দেবতা শিবের প্রসাদী নির্মাল্য, অম্লান বিল্বপত্রের মত কিছু। আমার পূজা তাকে না দিয়ে পারি না।

একটু খুলেই বলতে হবে। সে কালও দেখেছি, আবার আজকের কালকেও দেখছি। সেকালের বিকৃতিকে স্বীকার আমি আগেই করেছি। আবারও করছি। বার বার স্বীকার করছি এবং যে আবর্জনার স্তূপ প'চে উঠে ওই চির-অম্লান দুর্লভ বস্তুটিকে চেপে রেখেছিল তা স্মরণ ক'রেও শিউরে উঠছি। মনে পড়ছে এই জঞ্জাল আমার মাথার চুলে বাসা গেড়েছিল ছেলেবেলায়। ছেলেবেলায় আমার মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল ছিল। অন্নপ্রাশনের সময় চূড়াকরণের জন্য কয়েকটি দাগ কেটে ক্ষুর বুলানোর পর পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত চুলে আর কাঁচি ঠেকে নি। লম্বা পিঠ পর্যন্ত চুল অনেকে শখ ক'রে আজকাল রাখেন, শখের দায়ে অনেক কিছুই সহ্য হয়; কিন্তু আমার চুল শখের ছিল না। মাথার লম্বা চুলে আঠা বাধত, চুল শুকুতে হ'ত, মধ্যে মধ্যে উকুন হ'ত, সত্য সত্যই সে আমার মাথায় ছিল জঞ্জালের বোঝা। একদা চুলের এই জঞ্জাল-স্বরূপ এমন উৎকট ভাবে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করলে যে, সে কথা আর বলবার নয়। একদিন রাত্রে বিনুনি বাঁধা আমার মাথায় আমার তিন বছরের বোন বিষ্ঠা লেপন ক'রে দিলে। গভীর রাত্রে সে এক প্রায়শ্চিত্ত। বিনুনির ছাঁদের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকেছে ময়লা। সেই বিনুনি খুলে সেই রাত্রে স্নান করতে হ'ল। সেই রাত্রে মনে হ'ল আমার, কেন আমি চুল রাখব? কাটবই আমি চুল।

কিন্তু নিরুপায় অসহায় আমি। এ চুল দেবতার কাছে মানতের চুল।

একা আমার নয়, অনেকের মাথায় মানতের চুল থাকত। কারও পাঁচ বৎসর কারও দশ বৎসর, কারও উপনয়ন পর্যন্ত (ব্রাহ্মণদের) চুল বাড়ত, কারও কারও আবার চুলের সঙ্গে জটাও থাকত মানত, জটা তৈরি হ'ত সযত্ন পরিচর্যায়। ঠিক আমারই বয়সী আমার বাল্যসঙ্গী বদি বা বৈদ্যনাথের চুল এবং জটা ছিল তেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত। তার উপনয়ন পর্যন্ত মানত ছিল, উপনয়ন হয়েছিল তের বৎসর বয়সে। বেচারী মাথায় রীতিমত খোঁপা বেঁধে ইস্কুল যেত। ওই সময়ে শুনতাম—যখন সে ছোট ছিল, তখন বয়স্কেরা কৌতুক ক'রে বলতেন—কই, তেঁতুল পড়া দেখাও তো! ব'লেই বলতেন—জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে, জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে বদির মাথা ঘন ঘন নড়তে শুরু করত, জটা দুটিও আন্দোলিত হ'ত তেঁতুলের সৌটার মত। বড় হয়ে লজ্জা পেত বৈদ্যনাথ। হঠাৎ আমার সুযোগ এল এ জঞ্জাল-মুক্ত হবার। সে দিন আনন্দের আমার সীমা ছিল না। ব্যক্তিগত জঞ্জাল-জ্বালার অসুখ অসুবিধা ছাড়াও আরও অনেক কিছু ছিল চুলের বেদনা। এ বয়সের কথা যত কিছু মনে আছে তার মধ্যে চুলের জন্য লজ্জা পাওয়ার কথা মনে আছে। বাইরের লোকে আমাকে দেখে প্রথমেই খুকী ব'লে সম্বোধন করত। একদিনের কথা আজও মনে আছে আমার। তখন আমার বয়স তিন বছর। প্রথম মামার বাড়ী যাচ্ছি পাটনায়। ট্রেনে চড়েছি প্রথম। আদমপুর স্টেশনে যখন ট্রেনখানা এসে প্রথম ঢুকল—সে ছবি আমার মনে জ্বলজ্বল করছে একটা টকটকে লাল ছবির মত। মনে পড়ছে ইঞ্জিনের মুখটায় টকটকে লাল রঙ দেওয়া ছিল আর ঝকঝকে সোনার মত উজ্জ্বল পিতলের হরফে কিছু লেখা ছিল। সেই সঙ্গে মনে পড়ছে—কামরার ভিতর বাবা,

মা, মায়ের কোলে কয়েক মাস বয়সের আমার বোন এবং আমি। আর মাথায় কালো টুপি পরা এক ভদ্রলোক ব'সে আছে। রেলিং দেওয়া ঘেরা ছোট্ট খাঁচার মত কামরা। ওই ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি খোকী, মামা-বাড়ী যাচ্ছ? আমি যে কি লজ্জা পেয়েছিলাম—সে আর কি বলব। হাতে ধ'রে বিনুনি দুটোকে টানতে শুরু করেছিলাম।

গ্রামের অনেক প্রবীণ, যাঁরা নাকি সম্পর্কে ছিলেন ঠাকুরদাদা—তাঁরা রহস্য ক'রে বলতেন তারাশঙ্করী। বাল্যবন্ধুরাও শুনে কথাটা শিখে নিয়েছিল।

তবুও কাটবার কোন উপায় ছিল না।

মনে মনে দারুণ ভয় ছিল—বাবা বৈদ্যনাথের মানতের চুল। এর একগাছি চুল ছিঁড়ে গেলে দেবতা রাগ করবেন।

আজ ভাবি এই সব কথা। সে সব জঞ্জাল আজ ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত হতে শুরু হয়েছে ভেবে আশ্বাস পাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের আকৃতিতে তাকে খুঁজে-পেতে দেখি। সে আমলকে চোখে দেখেছি—অন্তরে অন্তরেও অনুভব করেছি ব'লেই স্পষ্ট বুঝতে পারি জীবনের ছবিকে ভস্মে ঢালার মর্মকথা। আমাদের সমাজের যে সব মানুষ স্বল্প আয়, কিছু কৃষিক্ষেত্র নিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা চালিয়ে আসছিলেন—তাঁরা অকস্মাৎ সম্মুখীন হলেন এক অভিনব সভ্যতার, যার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে আরম্ভ হয়ে গেল এক অর্থনৈতিক বিপ্লব। বিপ্লব উপস্থিত হ'লেই বিপর্যয়ের দুঃখ শুরু হয়। সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ ছিল বাইরের জগতে গিয়ে—যে জগৎ গ্রামের অর্থ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখান থেকে অর্থ উপার্জন ক'রে আনা। কিন্তু সে শিক্ষা ছিল না, সাহসও ছিল না। সে আমলের সুধীর অন্যতম সংজ্ঞাই ছিল অপ্রবাসী। সেই কারণে প্রবাসবাস ছিল দুঃখদায়ক এবং সংসারে যা দুঃখদায়ক তাই ভীতির বস্তু। আর শুরু হয়েছিল শিক্ষা-বিপ্লব। যাঁরা ইংরিজী জানতেন না তাঁদের সম্মুখে বাইরের জগতের পথ ছিল রুদ্ধ; অন্তত তাঁরা তাই মনে করতেন। অথচ ব্যক্তিত্বের যোগ্যতায় তাঁরা আজকের দিনের উচ্চপদস্থের চেয়ে হীন কি অক্ষম ছিলেন না। একালের শিক্ষা তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত হ'লে সমান কৃতিত্বের পরিচয় তাঁরা দিতে পারতেন। এই অবস্থার মধ্যে প'ড়ে এই সব মানুষই অসহায় হয়ে একমাত্র দৈববিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে ছিল। বিশ্বাস ছিল না নিজের উপর, ভরসা ছিল না রাজশক্তির উপর, সুতরাং একটা ভরসাস্থল ছাড়া মানুষ বাঁচে কি ক'রে? ধর্মের অবস্থ তখন বিকৃত। এই কালে ধর্মের বিকৃত অবস্থাটা ঐতিহাসিক সত্য। তাই অসহায় মানুষ ক্ষুদ্রতম দুঃখের জন্য দেবতাকে মানত করেছে। এবং মানত করেছে বা করতে চেয়েছে তার সব কিছু। নখ থেকে চুল থেকে প্রিয় আহার্য এবং আরও অনেক কিছু। আমি হাত মানত রাখতে দেখেছি। ডান হাত এক বৎসরের জন্য মানত রেখেছিলেন আমার পিসীমা। ডান হাতখানি দেবতাকে দিয়ে সংসারের সকল কর্ম বাঁ হাত দিয়ে করতেন; প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ঘেমে সারা হচ্ছেন—বাঁ হাতে পাখা চালাচ্ছেন—বাঁ হাত ভেরে গিয়েছে, পাখা রেখে দিয়েছেন, তবু ডান হাতে

পাখা স্পর্শ করেন নি।

এক কালের নগর ভেঙে পড়ল জীর্ণ হয়ে, তার চারিপাশের উপবনগুলি সংস্কারাভাবে হয়ে উঠল অরণ্য, সেই অরণ্য শিকড় গজিয়ে ফাটিয়ে ফেললে নগরীর বসতি, দেওয়ালের সেই ফাটলে ফাটলে উড়ে এসে পড়ল গাছের বীজ, প্রাসাদের বসতির মাথায় মাথায় জন্মাল বনস্পতি—তারই মধ্যে যে মানুষের দল বাস করছিল, তাদের চোখে একদা প্রখরতম আলো ফেলে এগিয়ে এল যখন নূতন কাল তখন চোখ তাদের ধেঁধে গেল; উপায়ান্তরহীন হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ ক'রে লুকাতে চাইল ওই ভাঙা নগরীর গহনতম প্রদেশে। ওইখানেই তাদের বাঁচবার আশ্বাস।

অসহায় মানুষেরা মানত করেছে, পূজা করেছে, ভাল করেছে, মন্দ করেছে, যা কিছু করেছে দেবতার নাম নিয়ে। তান্ত্রিক মদ খেয়েছে কালীমা'র নাম ক'রে, শৈব গাঁজা মদ সিদ্ধি খেয়েছে শিবের নাম ক'রে, বৈষ্ণব গাঁজা খেয়েছে গোবিন্দের নাম ক'রে। তাদের জন্য বেদনা অনুভব করি। ঘৃণা করতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিসের সন্ধান আমি পেয়েছি। ওই নির্মাল্যের সন্ধান। এই স্তূপীকৃত মিথ্যার মধ্যে সত্য কিছু দেখেছি আমি। হঠাৎ সে সত্য আত্মপ্রকাশ করত। এই যে দেবতার পূজা, বিকৃত ধর্মাচরণের অন্তরালে এত পার্থিব কামনা—এই কামনা অকস্মাৎ দেখা যেত শেষ হয়ে গিয়েছে। সেকালের মানুষেরা যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হতেন তখন এই সত্য আত্মপ্রকাশ করত। আজকের দিনে নিজেরাই প্রবীণ হয়ে এসেছি, এই বয়সে একালের অনেক প্রবীণের অন্তিম শয্যার পাশেও উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু সেকালের মানুষদের মৃত্যুসম্মুখীনতার সময়ের রূপ বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। প্রবীণদের কথা বাদই দিচ্ছি; যাঁরা নাকি পঞ্চান্ন-ষাট বছর বয়সেও মহাপ্রয়াণ করেছেন, তাঁদেরও শতকরা আশিজনকে আশ্চর্য প্রশান্ত স্থৈর্যের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে দেখেছি; যেটা নাকি একালে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল বললেও অত্যুক্তি হবে না। রোগে যারা অজ্ঞান হয়ে যেতেন, জ্ঞানহীন অবস্থাতেই যাঁদের জীবনান্ত ঘটত, তাঁদের কথা বলছি না। সেকালে পল্লীগ্রামে টাইফয়েড বা ম্যানেনজাইটিস, আকস্মিক হার্টফেলের মৃত্যু বা সন্ন্যাস রোগ বিরল ছিল। মানুষের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পরমায়ুও স্বভাবতই ছিল দীর্ঘ। প্রবীণেরা সজ্ঞান মৃত্যুকালে প্রসন্ন প্রশান্ত মুখে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতেন, পরমাত্মীয়দের নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে যেতেন। একটি কথা সকলেই ব'লে যেতেন—'অধর্ম ক'রো না সংসারে। দুঃখ কাউকে দিয়ো না।' আর বলতেন কে তাঁর কাছে কি পাবে। সে পাওনা শুধু আর্থিক পাওনাই নয়—অন্যবিধ পাওনাও বটে। বলতেন—'অমুক আমার এই বিপদের সময় মহৎ উপকার করেছিল; আমি তার কিছুই করতে পারি নি, তুমি এই উপকারের ঋণ শোধ ক'রো।' অনেকে আবার ছেলেদের দেনা-পাওনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিতেন সরকারী কর্মচারীদের চার্জ নেওয়ার মত। তাঁর শ্রাদ্ধে কি খরচ করবে, সেও নির্দেশ দিয়ে যেতেন। তারপর হঠাৎ বলতেন—'আর না। দাও, আমার জপের মালা দাও।' কিংবা বলতেন—'শোনাও, এইবার নাম শোনাও।' অনেকে কাশীতে অথবা গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করতে

আয়োজন ক'রে খোল করতাল বাজিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে প্রতি দেবালয়ে প্রণাম ক'রে চ'লে যেতেন—দৃষ্টি আবদ্ধ থাকত হয়তো আকাশের দিকে অথবা গ্রামের সর্বোচ্চ তরুশীর্ষে—কে জানে!

আজ পঞ্চাশোধের্ব যখন দিন চলেছে, তখন এই যাওয়াকে আর তুচ্ছ করতে পারি নে কোন মতেই। ব'সে ব'সে ভাবি আর অনুভব করি যেন তাদের এই মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে অন্তত কিছু পরিমাণও অমৃতের স্পর্শ আছে। সাধক রামকৃষ্ণের গান মনে পড়ে—

"আন্ রে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গাজলে।"

হয়তো সবটাই মানসিক বিকৃতি। এই বিকৃতি এতই প্রচণ্ড যে পাগলের আনন্দে মৃত্যুকে বরণ করতেন তাঁরা—এ বললে তর্ক করব না। সবিনয়ে মাথা নত ক'রে হার স্বীকার ক'রেও বলব নূতনকালকে—নূতনকালের সত্যকে স্বীকার করে, মাথায় নিয়েও কামনা করি, মৃত্যুর সময় যেন এমনই পাগলের আনন্দেই মৃত্যুকে বরণ করতে পারি অর্থাৎ কল্পনায়ও অমৃতবিন্দুর আস্বাদ পাই।

পরবর্তী জীবনে—তখন আমি প্রায় গ্রাম্য পরিব্রাজক, পিঠে বোঁচকা বেঁধে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই; মেলা বেড়ানো একটা রোগে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখেছিলাম। বয়স কত অনুমান করা কঠিন। কাটোয়ার পথে দেখা হয়েছিল। কাটোয়ার পাকা সড়কে হেঁটে চলেছিলাম; পাচুন্দির পর কাঁচা সড়ক, সড়কের দুই ধারে বনওয়ারীবাদের রাজাদের কল্পবৃন্দাবনের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। বড় বড় দীঘি, বাঁধানো ঘাট, পুরাকালের সুরম্য উপবনের ভগ্ন স্মৃতি, কয়েকটা বাঁধানো বেদী, কতকগুলি কেয়াগাছ, কয়েকটা চাঁপা করবীর গাছ, দু-একটি মাধবীলতা; তাল গাছের বেড়া, দু-একটা ভাঙা কুঞ্জে শুধু একটা কি দুটো তমালের গাছ দাঁড়িয়ে আছে আর আছে দু-একটা ছায়ানিবিড় সপ্তপর্ণী, যার চলতি নাম ছাতিমগাছ। এর কোনটা তমালবন, কোনটা কাম্যকবন, কোনটা বা নিধুবন; অর্থাৎ বিস্তীর্ণ চার-পাঁচ ক্রোশ একটি অঞ্চল জুড়ে রাজারা বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন রচনা করেছিলেন; তার অবস্থিতি হ'ল বনওয়ারীবাদ থেকে উদ্ধারণপুরের ঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে। এইখানে তাঁদের গৃহদেবতা বনওয়ারীজীর লীলা চলত। বনওয়ারীবাদের রাজার এখন ভগ্নাবস্থা। কীর্তিও ভাঙা-ভগ্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু ওই ভগ্ন কীর্তিময় পরিপার্শ্ব পথিকের মনে আজও একটি অপরূপ স্বপ্ন রচনা করে। এই পথে যেতে একটি প্রাচীন ছাতিম গাছের তলে দেখলাম বৃদ্ধ বাউলকে। একা ব'সে আছে নিস্পন্দ মৃতের মত। আমারই সন্দেহ হয়েছিল প্রথমটায়। থমকে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম, মৃত নয়, জীবিত মানুষই বটে। এগিয়ে কাছে গেলাম, সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, এই অবস্থায় তুমি এখানে এই গাছতলায় প'ড়ে কেন? কানে ভাল শুনতে পায় না লোকটি, এত জীর্ণ হয়েছে শরীর। ক্ষীণ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলে—কি বলছেন বাবা? কানে হাত দিয়ে হেসে বললে—শুনতে পাই না ভাল।

একটু জোরেই প্রশ্নটির পুনরুক্তি করলাম।—এই শরীর তোমার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার হেসে সে বললে—সেই জন্তেই তো বাবা? যাব উদ্ধারণপুর, মা গঙ্গার তীরে। দেহ রাখতে যাচ্ছি বাবা। পরমপুরুষ ভাঙা আবাসে আর থাকবেন না।

কথায় কথায় সে বলেছিল অনেক কথা। যার সার মর্ম হ'ল—বাবা, ওর মধ্যে কতদিন আত্মাপুরুষ বাস করলেন! দেহ তো নয় বাবা, দেহমন্দির! একদিন কত গরব করেছি, কত মেজেছি ঘষেছি, কত সাজিয়েছি; আজ উনি রব তুলে অহরহ বলছেন—পড়ন্-পড়ম্। তাই নিয়ে চলেছি—গঙ্গার কূলে, সাধক উদ্ধারণ দত্ত বাবার পাটে—গিয়ে বলব—নাও এইবার পড়; সামনে গঙ্গার শীতল জল, জলে প্রভুর পায়ের পরশ, মাটিতে সাধকের পদধূলি; তুমি এই পুণ্যের সঙ্গে মিশে যাও।

প্রশ্ন করেছিলাম—কিন্তু এই দেহ নিয়ে যাবে কি ক'রে? আসছ কত দূর থেকে? এলে কেমন ক'রে?

—চিন্তামণির দয়ায় বাবা। আসছি, তা ক্রোশ ছয় হবে। গোবিন্দ ব'লে বেরিয়ে পড়লাম, ঝুলি কাঁধে নিয়ে, পথের ধারে এসে দাঁড়ালাম, গরুর গাড়ী আসছিল, ডেকে বললাম—ধানের বস্তার ফাঁকে আমাকে একটু বসিয়ে নাও না বাবা, আমিও বস্তার সামিল। তারা তুলে নিলে। ছোট লাইনের ইস্টিশানে এসে রেলের বাবুদের বললাম—দাও না বাবা, মালগাড়িতে বোঝাই করে। বেশী ওজন হবে না। তোমাদের ইঞ্জিনে টানতে একটুও কষ্ট হবে না। তারা তুলে দিলে গাড়ীতে। নামিয়ে দিলে পাঁচুন্দীতে। পাঁচুন্দী থেকে হেঁটে যাবারই বাসনা ছিল। তা উনি নারাজ। কেবল বলছেন, পড়ম—পড়ম—পড়ম। পড়ব—পড়ব—পড়ব। গোটা এক দিন কোন রকমে বুঝিয়ে-সুজিয়ে গড়াতে গড়াতে এসে এই গাছতলায় বসেছি। দেখি, গাড়ী পেলেই বলব—নে বাবা, ভাঙা মন্দিরকে বেঁধে-ছেঁদে তুলে নে, উদ্ধারণপুরের পথে যতটা যাবি নিয়ে চল্। যেখানে পথ ভাঙবি, সেইখানে দিস নামিয়ে। আবার বসে থাকব গাছতলায়—দেখব আবার গাড়ী।

অনেকক্ষণ তার কাছে বসেছিলাম। অনেক কথা বলেছিলাম। সে শুধু বলেছিল—এই কথাই—জীর্ণ দেহমন্দিরখানিকে গঙ্গার পুণ্যতীর্থময় ঘাটে বিসর্জন দিয়ে তার আত্মা-পুরুষকে মুক্তি দেবে। কি আনন্দ যে তার সেই বহুরেখাঙ্কিত পাণ্ডুর মুখখানিতে দেখেছিলাম, সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ যিনি ছিলেন, তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ কৃতী ব্যক্তি তিনি। তাঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের লোক। বড় উকিল ছিলেন, উপার্জন ছিল প্রচুর, ভোগীও ছিলেন তেমনি। বিবাহ করেছিলেন তিনবার। অবশ্য প্রত্যেক বারেই বিপত্নীক অবস্থাতে বিবাহ করেছিলেন। সন্তান ছিল, সে সত্ত্বেও শেষ বারে যখন বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স অনেক, ষাটের উপর তো বটেই, সত্তরের কাছে, হয়তো বা উনসত্তর। কর্তা থাকতেন সিউড়ীতে, ছেলে থাকতেন লাভপুরে—সম্পত্তি দেখতেন। তিনি বিবাহ করলেন, ভাইয়ের নিষেধ শুনলেন না, বন্ধুর নিষেধ না, কারুর না। তাঁর বিবাহের পর সিউড়ীর উকিলেরা শুনেছি ঢাক বাজিয়ে বরকন্যাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। কিন্তু তাতে

তিনি লজ্জিত হন নি। বিচিত্র মানুষ, বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করলেন, কিন্তু পত্নীকে পাঠিয়ে দিলেন লাভপুরের সংসারে। নিজে সিউড়ীতে রইলেন প্রণয়িনীকে নিয়ে। এতে তাঁর কোন সঙ্কোচ বা লজ্জা ছিল না। লাভপুরে আসতেন, প্রচুর মদ্যপান ক'রে পূজা সমারোহে সত্য সত্যই নাচতেন। এক কথায় দান করতেন টাকা পয়সা যা হাতে উঠত তাই। একবারও দেখতেন না কি দিচ্ছেন। মত্ত অবস্থায় আঙুল থেকে আংটি প'ড়ে গেছে, কেউ কুড়িয়ে পেয়েছে, ফেরত দিতে এসেছে, বলেছেন—উঁহু, ও আর আমার নয়, ও তোর। আমার ভাগ্য আঙুল থেকে খসিয়ে নিয়ে তোর হাতে তুলে দিয়েছে। দেশের আইনে অবিশ্যি এটা আমারই, কিন্তু ভাগ্যের আইনে ওটা তোর।

বুঝতে না পারলে বলতেন, ওরে মূর্খ, ওটা তোর হ'ল, নিয়ে যা। আমি বাবা ওপারে গিয়েও ওকালতি করব—সেই আইনের ধারা! এ তুই বুঝবি না। তবে তুই যখন ফিরে দিতে এসেছিস তখন তার জন্যে তোর এ পারের আইনে আরও কিছু পাওনা হয়েছে। নে। ব'লে আধুলিটা বা টাকাটা তার হাতে দিয়েছেন।

আবার যে পেয়েছে কুড়িয়ে—সেকালের সে মানুষ এমনি যে, সে ভেবে আকুল হয়েছে, হায় হায় হায়, সে এখন করবে কি? পরের সোনা কুড়িয়ে পাওয়া যে ভাল নয়! যে মালিক সে ফিরে নিলে ভাগ্যে মন্দ বিধান থেকে নিষ্কৃতি পেত। মালিক নিলে না—সে এখন করে কি? যাক। এমনি মানুষ ছিলেন আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ। বাড়ীতে শিব-প্রতিষ্ঠা করেছেন, দুর্গাপূজা এনেছেন, কালীপূজা সরস্বতীপূজা এনেছেন, নিত্য নারায়ণ-সেবা প্রতিষ্ঠা করেছেন, অহঙ্কার ক'রে বলেন, কাশী বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা করেছি আমি। মানুষটাকে বিচার করলে মনে হয়—প্রতিষ্ঠার আনন্দে বিভোর, তার দম্ভে দাম্ভিক।

তীর্থে যেতে বললে বলতেন—কোথায় যাব, কিসের জন্যে যাব? আমার বাড়ীর দোরে সব দেবতাকে বসিয়ে রেখেছি। আমি যাব কোথায়? সত্যই দাম্ভিক লোক।

এই মানুষ জ্বরে পড়লেন। চেতনা হারালেন। কবিরাজ বললেন—এ জ্বর থেকে কর্তা উঠবেন না। যা ব্যবস্থা হয় করুন।

গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হ'ল। পাল্কী সাজল, গরুর গাড়ি সাজল। তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ পাল্কীতে তোলা হ'ল। গ্রামের সকল দেবালয়ে পাল্কী নামিয়ে—সংজ্ঞাহীন মানুষটির ললাট রজবিভূষিত করা হ'ল। গাড়ী গিয়ে থামল—আমাদের গ্রামপ্রান্তে মহাপীঠতীর্থ ফুল্লরাতলায়। এই স্থানটিই গ্রামের শেষ বিদায়স্থল। এর পর পাল্কী একেবারে গঙ্গাতীরে গিয়ে নামবে। যোলজন বেহারাই যথেষ্ট—কিন্তু বত্রিশজন বলশালী কাহারের ব্যবস্থা হয়েছে। ফুল্লরা দেবীর প্রাঙ্গণে পাল্কী নামল, পুরোহিত মাথায় আশীর্বাদী দিচ্ছেন—কর্তা চোখ মেললেন। চারিদিকে জনতা এবং দেবস্থলের ঘন জঙ্গল ও মন্দির প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে নিজেকে পাল্কীর মধ্যে দেখে প্রশ্ন করলেন—কোথায় এনেছ আমাকে?

ভাই এগিয়ে এলেন, বললেন—মহাদেবী ফুল্লরা মাতার স্থান। আপনাকে জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হাত বের ক'রে ভাইয়ের মাথায় রেখে বললেন—আমি রামচন্দ্রের চেয়ে ভাগ্যবান। আমার লক্ষ্মণ আমার মহাপ্রস্থানের ব্যবস্থা করেছে, তাকে রেখে আমি আগে যাচ্ছি। আমার অন্তরের কামনা সে জানে যে। অচেতন হয়ে পড়েছিলাম—অন্তিম কামনা জানাতে পারি নি।

ভাই বললেন—পাল্কী তুলবে এইবার?

—না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। কর্ম বাকি আছে আমার।

—বলুন।

—আমাদের ঘরে ভাগ্নেরা আছেন। তাঁদের প্রাপ্য দিতে হবে। আমাদের সন্তানেরা কৃতী নয়, তারা অকৃতী কিন্তু ভোগী। তারা কখনও দেবে না। ...এই সম্পত্তি তাদের দিলাম আমি।

আরও দুই-একটি ব্যবস্থার পর হেসে বললেন—বাস্।

ভাই জিজ্ঞাসা করলেন—আর কোনও আদেশ থাকে তো বলুন।

বললেন—এইবার আদেশ, পাল্কী তোল। কালী কালী বল সকলে। দু' কান ভ'রে শুনি। সময় খুব বেশী আছে ব'লে মনে হচ্ছে না।

নিজে নাড়ী অনুভব ক'রে বললেন—হয়তো শেষ রাত্রি পর্যন্ত।

—আপনার শ্রাদ্ধাদি সম্পর্কে—?

হাত নাড়লেন।—কোন কামনা নেই আর, সুতরাং বক্তব্যও আর নেই আমার। এখন চল চল চল। আমার মালা দাও।

আমার পিতামহ কাশীতে গিয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। চুরাশি বৎসর বয়সে সপরিবারে তীর্থ-যাত্রা করলেন। চুরাশি বৎসর বয়সেও তিনি যথেষ্ট সক্ষম ছিলেন। এ বয়সেও তাঁর চুল পাকে নি; কালো ছিল চুল। দেহেও ছিলেন সমর্থ। যা শুনেছি, তা বিস্ময়কর মনে হয় আজকের দিনে। পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সিউড়ীতেই বাস করেছেন। শেষের চার-পাঁচ বৎসর ওকালতি করতেন না। তখন আদালতে ইংরিজীর রেওয়াজ শুরু হয়েছে। ইংরিজী-জানা উকিলেরা এসে বসেছেন। বাংলা ও ফার্সীনবীসদের মানসম্মান চ'লে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। তিনি ওকালতি ছেড়ে দিলেন। সে কথা থাক্। তাঁর সামর্থ্যের কথা বলি। দুর্গাপূজোয় তিনি নিজে পূজকের কর্ম করতেন। ষষ্ঠীর দিন তিনি সিউড়ী থেকে লাভপুর আসতেন। বিশ মাইল পথ, উপবাস ক'রে তিনি পদব্রজে রওনা হতেন, সঙ্গে পাইক থাকত; এই পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি উপবাসী থেকে পদব্রজে বিশ মাইল পথ হেঁটে লাভপুরে পৌঁছে পুনরায় স্নান ক'রে সন্ধ্যার সময় নবপত্রিকা ও নবপল্লবের অধিবাস ও পূজাসংকল্পাদি সেরে তবে জল খেতেন। চুরাশি বৎসর বয়স পর্যন্ত দেহে রোগ বড় একটা কেউ দেখে নি। মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাতশিরার জ্বর হ'ত। বাতশিরা একালে বোধ হয় দুর্বোধ্য; ফাইলেরিয়ার জ্বরকে বাতশিরার জ্বর বলত। এই বয়সে তাঁর আহারও ছিল প্রচুর। দিনে খেতেন ভাতের সঙ্গে ঘি তরকারি মাছ এবং ঘরের

দু' সের দুধ জ্বাল দিয়ে এক সেরে পরিণত ক'রে চিঁড়া কলা ও চিনি দিয়ে মেখে তাই ; এবং রাত্রে হালুয়া ও আধ সের ক্ষীরের মত দুধ। এই মানুষ চুরাশি বৎসর বয়সে তীর্থভ্রমণে যাবার সময় গ্রামের প্রতিজনের কাছে বিদায় নিয়ে, তখন একজন তাঁর দিদিসম্পর্কীয়া জীবিতা ছিলেন—তাঁকে প্রণাম ক'রে, গ্রামের প্রতি দেবালয়ে প্রণিপাত ক'রে একটি প্রার্থনাই জানালেন যে, যে-কামনা নিয়ে তীর্থে চলেছি সে কামনা যেন পূর্ণ হয় আমার। তীর্থস্থলে যেন আমার দেহান্ত ঘটে, আমি যেন মুক্তি পাই।

২২শে কার্তিক তিনি তীর্থযাত্রা করলেন। গয়াতীর্থ সেরে কাশীতে এসে পৌঁছলেন—২৭শে কার্তিক। ৫ই অগ্রহায়ণ তাঁর জ্বর হ'ল, ৬ই তারিখে সে জ্বর ছেড়ে গেল—দেহের উত্তাপ ৯৫॥° ডিগ্রীতে নামল। ৭ই অগ্রহায়ণ তিনি দেহত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় দেহত্যাগ করলেন। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পর্যন্ত খর্ব হয় নি। তার প্রমাণ—তিনি লাভপুর থেকে রওনা হওয়ার পর তাঁর একমাত্র দৌহিত্র অকস্মাৎ মারা গেল লাভপুরে। সে সংবাদ লাভপুরের পত্রে গোপন রাখতে হয়েছিল। লেখেনই নি তাঁরা। ৬ই তারিখে এই পত্র কাশীতে এল। দীর্ঘ পত্র, নায়েব লিখেছেন, পুত্র পিতাকে সে পত্র প'ড়ে শোনালেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ৯৫॥° ডিগ্রী দেহোত্তাপ নিয়ে বৃদ্ধ অর্ধশায়িত অবস্থায় পত্র শুনছিলেন, পত্র শেষ হতেই ঘাড় নেড়ে বললেন—পত্র তো ভাল বোধ হচ্ছে না বাবা।

পুত্র বললেন—কেন বাবা? সবই তো ভাল লিখেছেন নায়েব।

ক্রমশ-স্তিমিতদেহোত্তাপ বৃদ্ধ বললেন—দেখ বাবা হরিদাস, পত্রে গ্রামের লোকের সংবাদ আছে, এমন কি তোমার গরু-বাছুরের সংবাদ দিয়েছে, মামলা মকদ্দমা বিষয়ের কথা আছে, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর একমাত্র সন্তান ভোলার সংবাদ তো নাই!

আমার বাবা বললেন—তোমার ভাবনা একটু বেশী বাবা। ভোলার বাপের মায়ের সংবাদ দিয়েছে, তাদের বাড়ীর খবর দিয়েছে, তার কথা আর স্বতন্ত্র ক'রে কি লিখবে?

ঘাড় নেড়ে বৃদ্ধ বললেন—সকলের সংবাদ পৃথক ভাবে না লিখলে ভাবতাম না বাবা। বালক হ'লেও ভোলা তো বাড়ীর গরু বাছুর থেকে ছোট নয়!

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তখনও এতখানি। পরদিন ৭ই তারিখ রাত্রি নয়টায় একবার প্রলাপ বকলেন ব'সে থাকতেই। প্রলাপই বলব। অন্য কথা বলছিলেন, তার মধ্যেই ডেকে উঠলেন লাভপুরের নায়েবকে।—কই হে ফুল্লরাবাবু, তুমি কেমন লোক হে? কই, আমার আহ্নিকের জায়গা কই করেছ?

ছেলে শঙ্কিত হয়ে গায়ে হাত দিয়ে বললেন—বাবা, কি বলছ? সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন। দেহের উত্তাপ আরও কমেছে।

বাপ আত্মস্থ হয়ে বললেন—কি বলছ?

—রাত্রিকালে আহ্নিকের জায়গা করতে বলছ কি?

—বলেছি? ও। একটু চোখ বন্ধ ক'রে থেকে বললেন - জ্বর আসছে—শিবজ্বর।

জ্বর এল। নিজেই বললেন—আমাকে এবার তীরস্থ কর। আমার উপবীত আমায়

আঙুলে জড়িয়ে দাও।

কুলদাপ্রসাদবাবুও ছিলেন বিচিত্র মানুষ।

যেমন ভোগী তেমনি রসিক সুগায়ক, তেমনি সুপুরুষ ও সুন্দরভাষী। কুলদাবাবু ছিলেন বৈষ্ণবমন্ত্র উপাসক। লোকে তাঁকে ব্যঙ্গ করত। সাধারণভাবে তিনি গ্রামের লোকের প্রিয়পাত্র ছিলেন না; তাঁর সমস্ত গুণগুলি প্রকাশের আতিশয্যে এবং বিষয়বোধের চারিত্রিক জটিলতার জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কীর্তন শুনতে ব'সে তিনি কাঁদতেন; মধ্যে মধ্যে 'ওহো ওহো' বলে ভাবাতিশয্য প্রকাশ করতেন; বহু লোকের কাছে তা হাস্যকর মনে হ'ত। এর মধ্যে আতিশয্য ছিল, কিন্তু কপটতা ছিল না। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে যেতেন, সেখানে বলতেন—দেখ, দইয়ের মাথাটা আন দেখি। আর তেলুক দেখে মাছ। তাঁর ভোগবিলাসে কুণ্ঠা ছিল না। জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত দেখেছি ভোগের প্রতি অনুরাগ। পরিপাটী কোঁচানো কাপড়, শক্তকফ শার্ট, চকচকে জুতো, ঝকঝকে মাজা একটি গাড়ু, তার উপর ভাঁজ করা পরিষ্কার গামছা, চকচকে গড়গড়া, চমৎকার সটকার নল, একখানি সুন্দর কম্বল, একটি ঝালর-দেওয়া পাখা, একটি বাক্স—এই আয়োজন থেকে কুলদাবাবুকে পৃথক করা যায় না। তাঁকে মনে পড়লেই এগুলি মনে পড়বে। লোকে অন্য অপবাদও দিত। তা হয়তো সত্যিই। কিন্তু সেকালে এই দোষ থেকে মুক্ত মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। আমার বাবার ডায়রীতে পাই, তিনি আক্ষেপ ক'রে লিখেছেন—"লাভপুরে আসিয়া—লোকের সংসর্গে আসিয়া অল্পবয়সেই মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলাম, বেশ্যাসক্তি জন্মিল।" আমার মায়ের পদার্পণের পর তিনি এ গ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। মদ্যপান ছিল, কিন্তু সে ছিল তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংযত পরিমাণে পান। থাক্।

কুলদাবাবুর বিষয়াসক্তিও ছিল প্রবল এবং জটিল। মামলা-মকদ্দমা অনেক করেছেন, করতেও বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে আমি এক চিরকালের সম্ভ্রমের মানুষকে দেখেছি। এমন মিষ্ট ভাষা আর এমন সহ্যগুণ সংসারে বিরল। একবারের ঘটনা চোখের উপর ভাসছে। বৃদ্ধ ব'সে আছেন দুর্গাপূজা-মণ্ডপে। কম্বল বাক্স গড়গড়া গামছা পাখা নিয়ে আসর জমিয়ে নবমী-পূজার ব্যবস্থা করছেন। বহু সরিকের পূজা, অনেক কালের পূজা; সরকার-বাড়ির পূজায় দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে কয়েকজন বাঁড়ুজ্জে মুখুজ্জেও সরিক। নবমী-পূজার দিন সরকার-বাড়ির পূজাস্থানে বলি হয় অনেক, প্রায় ষাটটি। এই বলির পর্যায় বাঁধা আছে। এ পর্যায় বংশের সম্মান হিসাবেই নির্দিষ্ট। সেবার এক প্রবীণ দৌহিত্র সরিকের তিরোধান হয়েছে। এই দৌহিত্রের বলি ছিল প্রথম বলি; দৌহিত্র নিঃসন্তান, তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছেন তাঁর ভাগিনেয়। ভদ্রলোক শিক্ষিত, গ্রাজুয়েট, কৃতী ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিবান, আধুনিক। কুলদাবাবু ব্যবস্থা করলেন—এবার প্রথম দেওয়া হবে প্রবীণতম সরিকের বলি। কথাটা গোপন ছিল না। প্রথমেই এ নিয়ে বাদানুবাদ ক'রে মীমাংসায় উপনীত হ'লে ঘটনাটি ঘটতে পেত না। কিন্তু দৌহিত্রের উত্তরাধিকারী এ নিয়ে কোন কথা বললেন না। তাঁর অজুহাত, তাঁকে তো জানানো হয় নি। তবে তিনি ব্যবস্থা

সবই করলেন। ঠিক বলির সময় তাঁর ভাগিনেয় ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রচণ্ড প্রতিবাদ তুললে। কুলদাবাবুর ব্যবস্থা নাকচ ক'রে দিয়ে নিজেদের বলিই হাড়িকাঠে ফেললে। সেই বলিই প্রথম বলি হ'ল। গণ্ডগোলটা বলির সময় স্থগিত থাকল চাপা আগুনের মত। বলি শেষ হওয়ার পর জ্ব'লে উঠল।

দৌহিত্রের উত্তারিকারী আত্মস্থ ছিলেন না, ইচ্ছাপূর্বকই ছিলেন না। চক্ষুলজ্জাকে অতিক্রম করার জন্যই ছিলেন না। তিনি এসে আক্রমণ করলেন বৃদ্ধকে; মৌখিক আক্রমণ। মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তিনি তখন যেন উন্মত্ত। বাক্যপ্রয়োগে শীলতা তো অতিক্রম প্রথম থেকেই করেছিল, কয়েক ক্ষেত্রে শ্লীলতাও অতিক্রান্ত হ'ল। জনতা থমথম করছে। স্তব্ধ। বৃদ্ধ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে নির্বাক হয়ে শুনে যাচ্ছেন আর তামাক টানছেন। তাঁর চারিপাশে তাঁর তিন পুত্র, চার ভ্রাতুষ্পুত্র—সাতজন। এদের মধ্যে বড় ছেলে কৃতী, কয়লা-ব্যবসায়ী, দেহেও শক্তিশালী। ভ্রাতুষ্পুত্রদের একজন বড় পুলিস কর্মচারী, শূরবীর চেহারা। অন্য তিন ভ্রাতুষ্পুত্র শুধু শক্তিশালীই নয়, রোষ-বর্বরতার অখ্যাতিতে কুখ্যাত। আর প্রতিপক্ষেরা স্বজনশক্তিতে মাত্র দুজন। হয়তো কুলদাবাবু বহু স্বজনের রোষভাজন ছিলেন, কিন্তু সে দিন বিবাদ যা দাঁড়িয়েছিল তাতে সমগ্র সরকার-বংশের এক হওয়ারই কথা। শুধু মাত্র কোন একজনের প্রথম সক্রিয় প্রতিবাদ শুরুর অপেক্ষা। ওই মানুষটিই মুখে প্রতিবাদ শুরু করলেই তা হবে। তাঁর মুখ খোলার অপেক্ষা। কিন্তু আশ্চর্য! দৌহিত্রবংশের উত্তরাধিকারী প্রতিবাদ না পেয়ে অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন, গালাগালি অভিসম্পাত ক'রেই চলেছেন, তবু এ মানুষটি নির্বাক, স্থিরদৃষ্টি, স্থির হয়ে ব'সে আছেন। শেষে তাঁর বড় ছেলের আর সহ্য হ'ল না। তিনি বাপের পাশেই ব'সে ছিলেন, অধীর হয়ে ব'লে উঠলেন—মুখ সামলে কথা বলবে।

বারেকের জন্য বৃদ্ধ জ্বলে উঠলেন। আমি বলব—জ্যোতিষ্মানের মত জ্ব'লে উঠে তিনি যেন গৃহদাহী বহ্নিকে নির্বাপিত ক'রে দিলেন। কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের মাথায় তিনি সর্বসমক্ষে চড় মেরে বসিয়ে দিয়ে হেঁকে উঠলেন—খবরদার! চারিদিকে আসন্ন বিস্ফোরণ মুহূর্তে স্তব্ধ ক্ষান্ত হয়ে গেল। এমন কি দৌহিত্রের উত্তরাধিকারীও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আজও আমার চোখের উপর ভাসছে, আমি দেখছি সেই মুহূর্তের ছবি, মানুষের মুখে চোখে পশু তার হিংস্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে—সে হিংস্র চীৎকার করতে উদ্যত হয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। আমার মনে হ'ল, একটা প্রহেলিকা খেলে যাচ্ছে। তার অর্থ কি উপলব্ধি করতে পারছি না। স্তব্ধ নাটমণ্ডপে তিনি ব'লে গেলেন তাঁর বাক্যগুলি, আমার মনের আকাশে বাতাসে এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই প্রতিধ্বনির ধ্বনিই আমি আজ লিখে চলেছি। তিনি ব'লে গেলেন—ওরে মূর্খ বর্বর, তুই কাকে কি বলছিস? কার উপর হাত তুলতে চলেছিস? জানিস ও কে?

অবাক হয়ে জনতা শুনে গেল।

—জানিস ও কে? ও হ'ল—এর ভাগ্নে!—এর দৌহিত্র। (মায়ের নাম ক'রে)

—এর বেটা। ওরে মূর্খ, ও যখন শিশু ছিল তখন ওকে বুকে নিলে ও যদি আমার বুকে বিষ্ঠাত্যাগ ক'রে দিত, তবে কি আমি তাকে ফেলে দিতাম সেদিন? ও আজ বড় হয়েছে দেখছিস কিন্তু আমি যে বুড়ো হয়েছি হতভাগা; তোদের চোখ নেই, তোরা অন্ধ। তাই তোরা দেখতে পাস না, ও আমার কাছে তা-ই আছে। বলুক, ওর যা খুশি ও বলুক। আমার উপর রাগ করবে না তো করবে কার ওপর?

চারিদিকে দেখলাম মানুষের চেহারা পাল্টে গেছে, পশু কোথায় মিলিয়ে গেছে। মানুষের মুখে প্রসন্নতা, চোখে জল।

একবার নয়, বার বার দেখেছি এমনি সহ্যগুণ।

এক ধনীর বাড়িতে মাতৃবিয়োগের পরই তিনি তত্ত্ব করতে এসেছেন। ধনী আধুনিক—ধনী বহুকীর্তিমানের উত্তরাধিকারী। আশ্চর্যের কথা, তবুও তিনি আত্মীয়তাকামী এই বৃদ্ধ আগন্তুককে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য আক্রমণ শুরু করলেন। নাতি-ঠাকুরদার সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে রহস্যের মধ্য দিয়ে কুটিল আক্রমণ। চরিত্র, লোভ, হীনতা, দৈন্য ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ। বৃদ্ধ প্রসন্ন হাসি হাসতে শুরু করলেন। অমৃতং বালভাষিতং। সত্য বলতে, আমি মনে করি, বৃদ্ধের সে বোধ মিথ্যা বা কপট ছিল না।

তিনি গঙ্গাতীরে গিয়ে স্বজনপরিবৃত হয়ে দেহ রেখেছিলেন।

কুলদাবাবুর এক পূর্বপুরুষের কথা না ব'লে পারছি না।

তিনি গ্রামেরই কুটুম্বের কাছে ঋণ করেছিলেন। দলিল দস্তাবেজ ছিল কি ছিল না, সে কথা বাহুল্য। মৃত্যুকালে তিনি কুটুম্বকে ডেকে বললেন—ঋণদায় নিয়ে মরণে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, শান্তি পাচ্ছি না আমি। আমার নগদ টাকা এখন নাই। আপনি এই ভূমি-সম্পত্তি নিয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আমি তৃপ্তি পাই, শান্তি পাই।

কুটুম্ব বললেন—তাই হ'ক।

সানন্দে মৃত্যুপথযাত্রী বললেন—দলিল, একটা দলিল কর।

কুটুম্ব বললেন—গ্রহীতার নাম এই—। আমার নামের পরিবর্তে ওই নামে হবে।

সে নাম কুটুম্বের ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়-বধূর নাম। মৃত্যুপথ-যাত্রীর জামাতা অথবা কন্যা।

মৃত্যুপথযাত্রীর চোখ দিয়ে জল গড়াল। মুছে তিনি নামগান শুরু করলেন। মুছে ফেললেন সকল পার্থিব ভাবনা।

ছেলেবেলায়, তখন আমার বয়স সাত-আট বৎসর, সেই সময় প্রথম দেখেছিলাম—আমাদের গ্রামের বিষ্ণু মুখুজ্জে মহাশয়কে ঠিক এমনি কামনা নিয়ে কাশী যেতে। খোল করতাল বাজিয়ে গ্রামের—গ্রামের কেন—আশপাশের গ্রামের লোকদের প্রণাম নিয়ে, গ্রামের দেবতাদের প্রণাম ক'রে—কাশী গিয়েছিলেন দেহত্যাগ করতে।

আমাদের গ্রামের হিরণ্যভূষণবাবুর মা গিয়েছিলেন গঙ্গাতীর।

আমাদের আশেপাশের গ্রামের অনেকে এমন যাওয়া গিয়েছেন শুনেছি।

এই সব কথা আজ যখন মনে ভাবি, তখন মনে হয়, সেকালের সবই আবর্জনা ছিল না। আবর্জনা-স্তূপের মধ্যে খানিকটা কিছু ছিল।

আর একটা জিনিস ছিল।

সেকালের এই ধর্মাশ্রয়ী মানুষদের ভাষা ছিল বড় মধুর। বড় মিষ্ট। তেমনি ছিল ধৈর্য, সহনশীলতা। আজকের দিনের ভাষ সে দিনের ভাষার তুলনায় অনেক উন্নত—দীপ্তিতে তীক্ষ্ণতায় ব্যঞ্জনামহিমায়, প্রকাশ-শক্তিতে অপরূপ, মনের মধ্যে দাগ কেটে ব'সে যায়, ক্ষেত্রবিশেষে বীণার সপ্ততারে ঝঙ্কার তোলে; কিন্তু মিষ্টতায় সে দিনের ভাষা ছিল বড় মধুর।

এই দুটি বস্তু আজ মনে হয় আমরা হারিয়েছি। অন্যায় সেকালের অবস্থার ঐতিহাসিক দোহাই পেড়েও আর কোন মানসিক অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারি না। মিথ্যার জঞ্জাল সেদিন আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। এই জঞ্জাল অপসারণের ঢেউ তখন বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় উঠেছে, কিন্তু আমাদের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছায় নি; বন্যার প্রথমেই যেমন ঢেউয়ের আগে ভেসে আসে রাশীকৃত ফেনা আর নদীর উৎসমূলের খড় কুটা আবর্জনা, তেমনি নবজীবনের শক্তির সঞ্চারের আগে এসে লাগল ফ্যাশন। গোড়াতেই বলেছি ভৃঙ্গারে ভ'রে মৃতসঞ্জীবনী অমৃতধারা আসে নি, এসেছিল কেস-বন্দী স্কটল্যাণ্ডের তৈরি স্কচ হুইস্কি। সেকালের হুইস্কির বোতল আমাদের বাড়ীতেও আমি দেখেছি। আমার বাবা ছিলেন তন্ত্রোপাসক, বাড়ীতে কালী ও তারা এই দুই মহাবিদ্যার পূজা ছিল। তারাপূজায় কারণের ঘট স্থাপন করতে হয়। কারণের ভোগ হয়। মা-তারাকে উপাদেয়তর দুর্লভ সামগ্রী হিসাবে স্কচ হুইস্কির ভোগও দেওয়া হয়েছিল বোধ হয়। বোতলের গায়ের নাম দেখেছি—H.M.S.; ওটাই নাকি চলতি বেশী ছিল সেকালে। এ বিষয়ে আমার একটা কথা মনে হয়—হুইস্কির নামটা সার্থক ছিল। ইংলণ্ডের রাজার রাজকীয় কর্মসাধনের জন্যই ওটা ঢুকেছিল। শিক্ষার আগে এল ফ্যাশন। জুতোয় জামায়, ম্যানচেস্টারের রেলি-ব্রাদার্সের ধুতিতে শাড়ীতে, নূতন কালের চুল ছাঁটায়, কথায় বার্তায় ঢঙে ধারায় ধরণে সে এক ফ্যান্সী-ফেয়ার এসে ব'সে গেল দেশের মধ্যে।

পূর্বেই বলেছি আমার চুল মানত ছিল বাবা বৈদ্যনাথের কাছে, সেই চুল মানত দিতে গেলাম আমি বিচিত্র পোশাকে, সার্জের সুট প'রে মাথায় বেড়া বিনুনি বেঁধে, তার উপর একটা নাইট ক্যাপের মত টুপি এঁটে। সেদিনের কথা আজ মনে পড়ছে। চুল বেঁধে সুট প'রে টুপি মাথায় দিয়ে বেশ গৌরব অনুভব করেছিলাম; একটি শিশুর আধুনিকত্বের গৌরবে যতখানি স্ফীত হওয়া সম্ভবপর তা সেদিন হয়েছিলাম আমি।

আমার চুল হয়তো আরও কিছুদিন থাকত। হয়তো বৈদ্যনাথের মত পৈতের সময় পর্যন্ত চুল আমাকে বাঁধতে হ'ত, কিন্তু পর পর মর্মান্তিক ঘটনা ঘ'টে গেল। এই উত্থান-পতনের দ্বন্দ্বে বাবা আমার মূহ্যমান হয়ে প'ড়ে বৈদ্যনাথের কাছে মর্মবেদনা নিবেদন করতে ছুটে গেলেন।

একটা ঘটনা ঘটল, যা আজ বিচিত্র মনে হবে।

গ্রামের নব-অভ্যুদিত ধনী হাই ইংলিশ ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইস্কুলের সভাপতি ছিলেন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যানেজিং কমিটিতে গ্রামের প্রধানদের নেওয়া হয়েছিল। আমার বাবাও ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির সভ্য। স্কুলের থার্ড মাস্টার ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং একটু বিচিত্র ধরণের মানুষ। তাঁর ওই স্পষ্টভাষিতার অপরাধে একদা তিনি অকস্মাৎ অপসারিত হলেন। করলেন—হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারী। ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষও রাখলেন না ব্যাপারটা। এক কথায় বাড়ীর মালিকের মত জবাব দিয়ে দিলেন। সেক্রেটারী ছিলেন ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতা নিজে; ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সহজলভ্য ছিল। তাঁদের অনুগামী সভ্যের সংখ্যাও বেশী, তবুও অধীরতার তাড়নায় তাঁরা অপেক্ষা করলেন না। এরই প্রতিবাদে বাবা এবং আরও দুইজন কমিটিতে যাওয়া বন্ধ করলেন। হয়তো কেন—নিশ্চয়ই এটা তাঁদের দিক থেকে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বের একটা রূপান্তরিত প্রকাশ। অন্য দিকে ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতা তাঁর দিক থেকে বিচার ক'রে অন্যায় দেখতেও পেলেন না, স্বীকারও করলেন না। এবং তিনি গ্রাহ্য করলেন না—এঁদের অসহযোগিতা। এর পর স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে এলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, তাঁর নাম ছিল—এস. সি. মুখার্জী, আই-সি-এস। সে সভাতেও এঁরা গেলেন না—প্রতিবাদ জানাবার জন্যই গেলেন না। অনুপস্থিতির অভিযোগ সাহেবের কানে উঠল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়, এবং তিনি সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন যে, গ্রামের এই তিন প্রধান—এই সভায় অনুপস্থিত হয়ে কেবলমাত্র ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতাকেই অপমানিত করেন নি, রাজপ্রতিনিধিরও অসম্মান করেছেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও, এস্-পি এলে স্থানীয় জমিদারকে ডাক-বাংলোয় সেলাম দিতে যেতে হ'ত। সেকালের আই-সি-এস ম্যাজিস্ট্রেটের কথাটা মনে নিলে। তিনি সদরে ফিরে গিয়ে—দারোগা-মারফৎ হুকুমনামা পাঠালেন। এই তিনজন জমিদারকে এই অপরাধের জন্যে ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করতে হবে—স্থানীয় সেটেলমেণ্ট ডেপুটির সম্মুখে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। 'দিল্লীশ্বরো-বা-জগদীশ্বরো বা' কথাটায় যদি কারও সন্দেহ ছিল মুসলমান আমলে, ইংরেজ আমলে 'ইংলণ্ডেশ্বরো-বা-জগদীশ্বরো-বা' ঐ কথাটায় কারও তখন সন্দেহ ছিল না। বুয়োর যুদ্ধ এবং রুশ-জাপান যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে, এঁরা প্রত্যেকেই সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, তৃপ্তি পেয়েছেন, তবুও ইংরাজের সম্পর্কে মনোভাব টলে নি। কাজেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধির এ আদেশ অমান্য করতে তাঁদের সাহস হ'ল না। তাঁরা প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন। ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু মনে হ'ল এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটল দ্বিতীয় ঘটনা। এই নব-অভ্যুদিত ধনী কিনলেন মুসলমান-নবাববংশীয় জমিদারের কাছে একটি জমিদারি। ব্যাপারটা একটু জটিল। সংক্ষেপে বলি। আমাদের গ্রামের জমিদারির অংশীদার সকলেই, কিন্তু দক্ষিণপাড়া—যে পাড়ায় আমাদের বাস—সে পাড়াটি ছিল মুরশিদাবাদের এক মুসলমান জমিদারের। উচ্চ মূল্য দিয়ে এই দক্ষিণ-পাড়ার

জমিদারি কিনলেন। এবং নিজে অর্থব্যয় ক'রে আনলেন গভর্নমেণ্ট সেটেলমেণ্ট। প্রমাণ করতে চাইলেন—গ্রামের প্রধানদের বাড়ীগুলি, যা তাঁরা এতকাল মুসলমান জমিদারের আমলে ব্রহ্মত্র বা লাখরাজ হিসাবে ভোগ ক'রে প্রজা হয়েও প্রজা না হওয়ার সুবিধা পেয়ে আসছেন—সে সুবিধা তাঁরা পেতে পারেন না, ব্রহ্মত্র-লাখরাজ মিথ্যা। তাঁর এই অনুমান পুরোপুরি সত্য না হ'লেও অনেকটাই সত্য ছিল। আমাদের দেশের সেটেলমেণ্টে এক রকম নূতন লাখরাজের সৃষ্টি হয়েছে, যার নাম—ভোগদখলসূত্রে নিষ্কর লাখরাজ। সূত্রটা যেখানে খাজনা না দিয়ে ভোগদখলের, সেখানে দখলটা জবরদখল। প্রচীন মুসলমান জমিদার বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের এই জবরদখল সহ্য করেছিলেন। এরা বর্ধিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণ এই ছিল সহনশীলতার কারণ। কিন্তু নূতন জমিদার সেটা সহ্য করতে চাইলেন না। লাখরাজ যেখানে সত্য নয়, সেখানে কর দিয়ে তাঁকে জমিদার স্বীকার ক'রে তাঁদের প্রজা হতে হবে। যে সেটেলমেণ্ট ডেপুটির সামনে তাঁদের ক্ষমা চাইতে হয়েছিল, সেই সেটেলমেণ্ট ডেপুটি এই উপলক্ষেই তখন লাভপুরে ছিলেন। একদা দেখা গেল—সেটেলমেণ্টের চেন থাক্ নক্সার দাগে দাগে যেতে গিয়ে আমাদের কয়েক বাড়ীর অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করেছে। তার পিছনে পিছনে আমিন কানুনগো, সেটেলমেণ্টের টেবিল ঘাড়ে নিয়ে কুলী, থাক্ নক্সা বগলে জমিদারের কর্মচারী এবং আরও অনেকে। অন্দরের উঠান ছিল বাঁধানো, সেখানে পায়ের ছাপ বা জুতোর দাগ পড়ার কথা নয়, কিন্তু মালিকদের অন্তস্তল দলিত হয়ে গেল।

আরও একটি ঘটনা ঘটল। এর সঙ্গে গ্রামের কোন লোকের সংস্রব ছিল না। আমাদের একটি বড় মামলায় পরাজয় হ'ল। একটি ন্যায্য সম্পত্তির অধিকার থেকে আমরা বিচ্যুত হলাম।

এই তিনটি ঘটনার আঘাতে আমার বাবা মুহ্যমান হয়ে আশ্রয় সন্ধানে ছুটে গেলেন বৈদ্যনাথধামে। দেবতার পায়ে গড়িয়ে পড়বেন। বলবেন—তুমি তোমার শক্তি-প্রয়োগে এর প্রতিকার কর। মানত করবেন। শুধু তাই নয়, আমার পিসীমা ধরনা দেবেন সেখানে। সপরিবারে বৈদ্যনাথ গেলাম। বৈদ্যনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণ, মন্দিরের ধ্বজা আজও আমার চোখের উপর ভাসছে। এর পর আরও কয়েকবার দেওঘর গিয়েছি, এই গতবার ১৩৫৫ সালেও গিয়েছি—কিন্তু সে ছবির সঙ্গে মেলে না। সে মন্দির এত উঁচু, এত শুভ্র যে মনে হয় আকাশের গায়ে সাদা মেঘের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

আমার মাথার চুলের লজ্জা বৈদ্যনাথের পাথর-বাঁধানো অঙ্গনে উজাড় ক'রে দিয়ে সেই দিন সেইখানে নিলাম হাতেখড়ি। মনে হচ্ছে বাংলা এবং দেবনাগরী দুই অক্ষরেই খড়ি বুলিয়েছিলাম। যে পাথরখানির উপর খড়ি বুলিয়েছিলাম, সেই পাথরখানিকে বের করবার জন্য (এবারে ১৩৫৫ সালে) কত যে মনে মনে সন্ধান করেছি! যে দিন গিয়েছি মন্দিরে, সেই দিনই বৈদ্যনাথের পূর্ব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু খুঁজেছি খুঁজেছি। স্ত্রী কন্যা পুত্র জিজ্ঞাসা করেছেন, কি? এমন ক'রে কি দেখছেন?

উত্তর দিই নি। হেসেছি। সম্ভবত লজ্জা অনুভব করেছি।

সে কথা থাক্।

বাবা কেঁদেছিলেন দেওঘরে। স্পষ্ট মনে পড়ছে, রাত্রে শোবার সময় বিছানায় ব'সে বেশ স্ফুটকণ্ঠেই প্রার্থনা করেছিলেন মনে আছে—রাজার হুকুমে এই অপমান, এর প্রতিকার তুমি ভিন্ন আর কে করতে পারে? হে দেবাদিদেব! হে আশুতোষ!

আমার চোখেও জল এসেছিল। তারই প্রভাব আমার জীবনে কাজ করেছে। রাজার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী বিদ্রোহী মনোভাব এইভাবে সৃষ্টি হ'ল তার সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি, এরই মধ্যে হবে আমার জীবনের সার্থকতম বিকাশ।

অপর প্রভাব এই দেবভক্তিই বলি, আধ্যাত্মিকতাই বলি, নীতিবাদই বলি—তার প্রভাব। একটি গভীর অজ্ঞাত অনুশাসন আমি অনুভব করি; মানব-হৃদয়ের এই অনুশাসনের একটি বেদনাময় আকৃতি আমার আছে। এ দুর্বলতা হ'লে আমি দুর্বল। পরাজয় হ'লে আমি পরাজিত।

সে কালকে যতই চেষ্টা করছি প্রকাশ করতে, ততই যেন মনে হচ্ছে ঠিক প্রকাশ করা হ'ল না। প্রথমেই বলেছি, ছোট ছোট জমিদারপ্রধান একটি অঞ্চল, সে অঞ্চলে অকস্মাৎ অভ্যুদয় হ'ল এক লক্ষপতি ব্যবসায়ীর, তাঁর সঙ্গে প্রাধান্য নিয়ে সংঘর্ষ বাধল আমাদের অঞ্চলে। জমিদার-শ্রেণী যতই বিব্রত বিপন্ন হলেন, ততই তাঁরা ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেন। ভগবানের তখন বহু মূর্তি। দেবতা তেত্রিশ কোটী, সুতরাং রূপ তাঁর তেত্রিশ কোটীই। ওর মধ্যে কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে—মূর্তি ছিল আসলে দুটি। শক্তিমূর্তি আর বিষ্ণুমূর্তি। মোটামুটিই ধরা যাক আর অতি সূক্ষ্মভাবেই বিচার করা যাক—ধর্মজীবনে ছিল দুটি পথ বা মত—শক্তি ও বৈষ্ণব। যুগল বিগ্রহ অর্থাৎ রাধাগোবিন্দ, বাসুদেব, গোপাল, নাড়ু-গোপাল, শালগ্রামশিলা, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ—এই ছিলেন বৈষ্ণবদের দেবতা। তা ছাড়া দুর্গা থেকে শুরু ক'রে মনসা ওলাইচণ্ডী পর্যন্ত সবাই ছিলেন শাক্তভনখাভোগী; শিব ঠাকুর থেকে শুরু ক'রে পুরুষ দেবতারাও ওই শাক্তমতের পথের পাশে বাসা গেড়েছিলেন। গাজনে শিবঠাকুর উঠতেন, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ধর্মরাজ, ভাদ্রে ইন্দ্রদেবতা বিশ্বকর্মা—এঁদের সকলের পুজোতেই পাঁঠা-বলির ব্যবস্থা ছিল। ছিল কেন, আজও আছে। সুতরাং ওঁরা শাক্তের দলে। তবে মা লক্ষ্মী এবং মা সরস্বতী এঁরা দুজন সবারই পূজ্য এবং এঁরা বৈষ্ণবের দলে, ওঁদের কথা উঠলেই আজও মনে হয়—নারায়ণ ব'সে আছেন মাঝখানে, দু'পাশে তাঁর দুই প্রিয়তমা—লক্ষ্মী আর সরস্বতী। অদৃষ্ট পরিবর্তনের কামনায় মানতের পরিমাণ বাড়তে শুরু করল এক দিকে, অন্য দিকে যাঁর অভ্যুত্থান হচ্ছে তিনি বাড়াতে লাগলেন সমারোহ।

দেশেও তখন প্রাচুর্য ছিল।

ক্ষেত্র ছিল উর্বর, বর্ষাও তখন এখন থেকে প্রবল ছিল, মাঠে পুকুরগুলিও তখন এখনকার মত এমনভাবে মাঠের সমান হয়ে ম'জে যায় নি, ফসল যথেষ্ট হ'ত। ধান কলাই গম আখ সরষে আলু—এ প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের ক্ষেতে জন্মাত। গোয়ালে ভাল ভাল গাই

ছিল, দুধও হ'ত প্রচুর, পুকুরে বড় বড় মাছ থাকত, অভাব দেশে ছিল না; অল্প চার-পাঁচ হাজার টাকা আয়ে রাজার হালে চ'লে যেত। আমার নিজের যখন বারো-চোদ্দ বছর বয়স তখনকার হাটখরচা আমার মনে আছে—সপ্তাহে দু'দিন হাটে তরকারির খরচ ছিল—ছ আনা হিসেবে বারো আনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর খরচাটা বাড়ল—বারো আনা থেকে আঠার আনা পাঁচ সিকিতে পৌঁছল। আমাদের বাড়ীর মুদীর দোকানের খরচ ছিল বছরে একশো টাকা। কোন বছর দশ টাকা কম—কোন বার পাঁচ টাকা বেশী। বছরে দুবার কাপড় কেনার ব্যবস্থা ছিল—আশ্বিনের পুজোর সময় এবং বছরের শেষই বলুন আর পরের বছরের প্রারম্ভের আয়োজনেই বলুন, চৈত্র মাসে আর একদফা কাপড় আসত। পুজোর সময়—শান্তিপুরে ফরাসডাঙ্গার পোশাকী কাপড় থেকে শুরু ক'রে, গুরু পুরোহিত পূজক দেবপূজার কাপড়, বাড়ীর মুদী মোদক জেলে মুড়ীভাজুনী মেথর চাকরবাকর—এসব নিয়ে পহাড়প্রমাণ কাপড় (তাই বলত লোকে) কেনা হ'ত দোকান থেকে, ফর্দ আসত সত্তর পঁচাত্তর আশি। পাঁচশো টাকা ঋণ হ'লে গৃহস্থ ভাবত, ঋণে সে আকণ্ঠ ডুবে গেছে। চাকরের মাইনে ছিল দেড় টাকা, কাপড় কাচানো থেকে সকল রকম তরিবত জানা খানসামার মাইনে আড়াই টাকা, মেয়ে-রাঁধুনী থাকত দু টাকা আড়াই টাকায়, পুরুষ রাঁধুনীর বেতন সাড়ে তিন টাকার বেশি ছিল না। পশ্চিমা দারোয়ানেরা শুখো সাত টাকা মাইনে পেলে বলত—দরকার হ'লে জান ডাল্ দেগা। বাউরী জাতীয় যারা গোসেবা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকত, তাদের ছোটরা থাকত পেট-ভাতায়, আর বড়দের মাইনে ছিল বছরে ছ টাকা থেকে নয় টাকা পর্যন্ত।

কাজেই সংসার চালিয়েও মানত দিতে খুব বেগ পেতে হ'ত না। দোষ তাঁদের নেই। আবহাওয়াই ছিল তখন এই। ভাগ্য আর অদৃষ্ট ছাড়া পথ ছিল না। দেবতারা ছিলেন ভাগ্যের কাণ্ডারী। সকাল থেকে বাউল বৈষ্ণব আসতেন ভিক্ষে করতে। খঞ্জনি, একতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। পদাবলীর গায়কও দু-চারজন ছিলেন। শাক্ত সন্ন্যাসীও আসতেন। প্রচণ্ড জোরে হাঁক মারতেন—চে—ৎ চণ্ডী! কালী কপালী নরমুণ্ডমালী, বন্ধন কাট মা, বন্ধন কাট। মুসলমান ফকির আসতেন, বয়েৎ আওড়াতেন, তাঁদের কারো কারো হাতে চামড়ার আবরণীর উপর শিকরে পাখী (বাজ পাখীরই একটি ছোট জাত) থাকত, কেউ কেউ গান গাইতেন—দেশী হাতে তৈরি সারেঙ্গী জাতের যন্ত্র বাজিয়ে। প্রায় সব গানই ছিল গোপাল-হারা মা যশোদার বেদনার গান। কেউ কেউ দেহতত্ত্বের গান গাইতেন—

এই দেহে কিবা ফল—পদ্মপত্রে জল—
এ দেহের মিছে গৌরব করিস মন!

কেউ কেউ পীরমঙ্গল গাইতেন। অঞ্চলে যত পীর আছেন, হিন্দুর জাগ্রত দেবতা আছেন, সবাই ছিলেন পীর, সকলের মহিমা কীর্তন করতেন তাঁরা। সে কি হিন্দুর দোরে, কি মুসলমানের দোরে, তাঁরা ওই গানই গেয়ে যেতেন—সকলেই ভক্তিপুলকিত চিত্তে শুনত।

পীর বড় ধনী রে ভাই—ঠাকুর বড় ধনী—
পীর গাজী—মুস্কিল আসান কর, পীর গাজী—!

তোমার গোপাল দুগ্ধ খাবেন জন্ম যাবে সুখে—
দুঃখ তোমার দূরে যাবে—অন্ন দিয়ো ভুখে।
পীরের ঘোড়া পীরের জোড়া পীরকে কর দান,
বাত ব্যাধি হইতে মাগো পাইবে পরিত্রাণ।

মস্ত বড় গান। আজও মনে আছে আমার। আরও মধ্যে মধ্যে আসত 'গরুমারা'। অর্থাৎ গোবধ ক'রে প্রায়শ্চিত্তকারী ভিক্ষুক। আমার মনের মধ্যে আজও ছাপ কেটে রয়েছে প্রথম 'গরুমারা'র ছবি। গরমের সময়, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে আমাদের ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ার উপর তেঁতুল থেকে বীচি ছাড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। মা পিসীমা ঝি রাঁধুনী এদের সঙ্গে আমিও ব'সে গেছি; আমার সঙ্গে আছে আমার শৈশবসঙ্গিনী চারু, ডাকনাম নেড়ী; সকলেই এক-একটা পাথর দিয়ে ছেঁচে তেঁতুলবীচি বের করছি। হঠাৎ সদরদোরে ডাক উঠল, হাম্‌-বা অ্যা-ম-বা—অ্যাম-বা। সমস্ত শরীর কেমন যেন ক'রে উঠল। দরজায় উঁকি মেরে দেখলাম, ধূলিধূসর কৌপীন পরণে একটি জোয়ান মানুষ হাতে একগাছা দড়ি নিয়ে এমনি চীৎকার করছে, অ্যা-ম্‌-ব্যা! অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলে যে উদ্বেগ তার বুকখানাকে তোলপাড় ক'রে তোলে—সেই অসহনীয় উদ্বেগ আমার শিশুচিত্তকে অধীর অস্থির ক'রে তুলেছিল। আমি সমস্ত দিন কেঁদেছিলাম। মায়ের কাছে শুনেছিলাম এই ভাবে বারো বৎসর তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সপ্তাহে দু' তিন দিন আসত পটুয়ারা। দ্বিজপদ পটুয়াকে আজও মনে আছে। সুন্দর চেহারা ছিল তার। তেমনি সে গান গাইত। লম্বা পট খুলে কৃষ্ণলীলা-রাসলীলা-গৌরাঙ্গ-লীলার পর পর সাজানো ছবি দেখিয়ে যেত আর গান গেয়ে যেত—

আহা কি মধুর লীলা রে!

পটের শেষের দিকটায় থাকত ধর্মরাজ অর্থাৎ যমরাজার দরবার। বৈতরণী নদী পার হয়ে যেতে হয় দরবারে, যেতেই হবে, না গিয়ে পরিত্রাণ নাই। যমদূতে নিয়ে যাবে। পাপীর কাছে বৈতরণী টগবগ ক'রে ফুটছে। তাকে ঐ নদীর ফুটন্ত জলে ভাসতে ভাসতে যেতে হবে। ওপারে দরবারে ব'সে আছেন ধর্মরাজ, চিত্রগুপ্ত ব'সে আছেন এই দেখুন হিসেব-নিকেশের খাতা নিয়ে।

নীলবর্ণ যমরাজ। রাজবেশ। পালোয়ানের মত গোঁফ, বড় বড় সাদা চোখ। চিত্রগুপ্তের কানে কলম, হাতে খাতা—খতিয়ানের লম্বা খেরুয়া-বাঁধানো খাতার মত খাতা। তারপর বিভিন্ন পাপে বিভিন্ন নরকে ভূতের মত চেহারা যমদূতের হাতে পাপীদের শাস্তির দৃশ্য—কোথাও অসংখ্য সাপ-বিছে-কাঁকড়াবিছে-পরিপূর্ণ নরকে পাপীকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও ফুটন্ত কড়াইয়ে তাদের ভাজা হচ্ছে, কোথাও ঢেঁকির তলায় ফেলে কোটা হচ্ছে, কোথাও আগুনে গলানো লোহার সাঁড়াশী দিয়ে জিভ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। খেজুরগাছে তুলে হাত-পা গাছের সঙ্গে বেঁধে টেনে নামানো হচ্ছে এমনও একটা ছবি ছিল।

সব শেষ ছবিটি ছিল নদীর ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারী হয়ে ব'সে আছেন নৌকা নিয়ে।

দ্বিজপদ গাইত—ও নামের তরী বাঁধা ঘাটে ডাকলে সে যে পার করে।

বেদিয়ারা আসত। দেশী বেদিয়া সাপুড়ে। এরা সাধারণত আসত বর্ষার সময়, মাঠে আল-কেউটে ধরতে। গ্রামের সাপ দেখিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদরও নাচাত, আর চলত। ওরা যেত—মেদিনীপুর পর্যন্ত। তাদের মুখেই শুনেছিলাম—মেদিনীপুর অঞ্চলে কবিরাজ ছিলেন অনেক, তাঁরা কালো কেউটের বিষ কিনতেন এবং তা দিয়ে ওষুধ তৈরি করতেন। কালো কষ্টিপাথরের মত এদের গায়ের রঙ, তেমনি কি ছিল চুল—পুরুষদের দাঁড়ি-গোঁফের এমন প্রাচুর্য যে ভারতবর্ষের যে কোন শ্মশ্রুগুম্ফগরবীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। মেয়েদের চুলও ছিল তেমনি—রুক্ষ কালো ঘন এক রাশ চুল, বৈশাখের হাওয়ায় ফুলতে থাকত দ্রুত ধাবমান কালো মেঘের মত। তেমনি টিকলো নাক, আর তীক্ষ্ণ চোখ।

ওদের গানের দু-একটা মনে আছে।

ও কালীনাগ ডংসেছে লখাকে—বাসর ঘরেতে—
বেউলা কাঁদে পতির শোকে প'ড়ে ধুলাতে।
কালী—না—গ।

আর একটা গান—

ও জানি না গো—ও গো—এ—মনে হবে।
গোকুল ছাড়িয়ে কালা মথুরাতে যাবে।

আর একটা গান—

কালীদহের ও নাগিনী ফুঁসিস না—এমন ক'রে ফুঁসিস না।
ও তারে—দেখলে লাজের মাথা খাবি, তাও কি মরণ বুঝিস না।
ও নাগিনী ফুঁসিস না।

কালো কেউটে সাপ অত্যন্ত হিংস্র। মানুষকে এরা তাড়া ক'রে কামড়ায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও যে নাই তা নয়। একটি কেউটে সাপের সঙ্গে আমার এক সময় নিত্য দেখা হ'ত। কিন্তু সে কখনও মাথা তোলে নি। সাড়া পাওয়া মাত্র চ'লে যেত। তার কথা পরে বলব। কিন্তু সাধারণ ভাবে কেউটের স্বভাব হিংস্র এবং এরা তাড়া ক'রে যায় মানুষকে। আমিও তাড়া খেয়েছি অন্য কেউটের দু-চারবার। এই বেদেরা আশ্চর্য। এরা তাড়া ক'রে ধরে এই সব সাপ। দেখেছি, বেদের মেয়ে বর্ষার ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে ছুটে চলেছে। আশ্চর্য হয়েছি—কি ব্যাপার! তারপরই দেখেছি প্রকাণ্ড একটা কেউটের মুখ মুঠিতে ধ'রে অন্য হাতে লেজটা টেনে ধ'রে আক্রোশভরে সাপটাকে বলছে—আমার হাত থেকে, যমের হাত থেকে তু পালাবি? মাত্র হাত দেড়েক লম্বা একটা পাচনি ছড়ি হাতে নিয়ে—সদ্য-ধরা সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু দুলিয়ে নাচাতে দেখেছি, গাইতে শুনেছি—"ও নাগিনী ফুঁসিস না।"

পটুয়ারা এবং বেদিয়ারা ধর্মে মুসলমান। বহুকাল পর্যন্ত এ তথ্য জানতাম না। দ্বিজপদ পটুয়া, রাধিকা বেদেনীর সঙ্গে আমার হৃদ্য একটি সম্পর্ক জন্মেছিল। দ্বিজপদের সুন্দর চেহারা

এবং রাধিকার একপিঠ ঘন কালো চুল আর তীক্ষ্ণ চোখ যেন আকর্ষণ করত আমাকে। রাধিকা এক-একদিন বাঁদর নিয়ে নাচাতে আসত। গাইত—

হীরেমন নাচ দেখি লো!
তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে, বাহার ক'রে,
ও হীরেমন নাচ দেখি লো!
যেমন আমার খোকাবাবুর চাঁদমুখ
তেমনি বিদায় পাবি লো!

আমার চিবুক স্পর্শ ক'রে বলত—মায়ের কাছে একখানা শান্তিপুরে শাড়ী এনে দাও খোকাবাবু, হ্যাঁ।

তা আমি দিয়েছিলাম। মা একবার পুরানো একখানা শান্তিপুরে শাড়ী তাকে দিয়েছিলেন। সে কাপড়খানা আমাদের বাড়ীতেই প'রে হেলে দুলে চ'লে গিয়েছিল। বুড়ী রাধিকা একদিন আমায় বললে—তখন আমি কংগ্রেসের কাজ করি—২৩।২৪ সালে বোধ হয়—বললে—হ্যাঁ, খোকাবাবু, দাঁড়কাক অবনীশবাবু যে আমাদিগে হিঁদু হতে বলছে, কি করি বল তো?

দ্বিজপদও বলেছিল। কয়েকদিন পর সেও এসেছিল, সেও বললে। তখন জানলাম ওরা ধর্মে ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

আর এক দল দেশী যাযাবর আমাদের দেশে আছে। আমাদের অঞ্চলে বাজীকর বলে। এরা ম্যাজিক দেখায়। মেয়েরা নাচে, গান গায়। পুরুষেরাও ঢোলক বাজিয়ে গান গায়। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এরা গান বাঁধে। মনে আছে ছেলেবেলায় শুনেছি—

ও—মহারাণীর মিত্যু হ-ই-ল।
ও—বড়লাট ছোটলাট কাঁদিতে বসিল।

এদের কাছেই খুদিরামের ফাঁসীর গান শুনেছিলাম। ওরা বলেছিল—আমাদের বাঁধা গান।

ও—বিদায় দে মা—ফিরে আসি।

এদের মেয়েরা কিন্তু অদ্ভুত। বেশভূষায় এমন বিলাসিনী যে দেখবামাত্র মনে হয় ওরা নৃত্যব্যবসায়িনী নটী। গায়ে গিল্টির গয়না, পাছাপাড় শৌখীন শাড়ী—দেহের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে প'রে, নাকের নথ দুলিয়ে, ভুরু টেনে, হেলে দুলে, সুর ক'রে কথা ব'লে গৃহস্থের দোরে এসে দাঁড়ায়—ভিক্ষে পাই মা, সোনাকপালী, স্বামীসোহাগী, চাঁদবদনী, রাজার রাণী! কোমরে হাতের কনুই দিয়ে ধ'রে রাখে একটা ঝুড়ি। ঝুড়িটা রেখেই বলে—নাচন দেখাই মা, দেখ। ব'লেই আরম্ভ ক'রে দেয়, দুই হাতে তুড়ি মেরে, দেহখানি নৃত্যদোলায় দুলিয়ে দিয়ে গান ধরে—

উরুরুর্—জাগ—জাগ—জাগিন ঘিনা—জার ঘিনি না—
উরুর-র—

অদ্ভুত মিষ্ট ভাষা এদের। তেমনি কি নাছোড়বান্দা! হাঁক দিয়ে দাঁড়ালে যদি গৃহস্থ বলে—ভিক্ষে দিতে নেই, বাড়ীতে অসুখ—

অমনি সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরে দরদ মাখিয়ে সুরেলা উচ্চারণে ব'লে উঠল—বালাই ষাট, ও কথা বলতে নাই মা—শত্রুর অসুখ হোক। হাত জোড়া আছে বললে, বলে—হাতের কঙ্কন নাড়া দিয়ে জোড়া হাত খুলে ফেল রাজার মা, বাবু-সোহাগী! এদের বাজী অর্থাৎ যাদুবিদ্যার পারদর্শিতা অদ্ভুত। এরা বলে অনেক কথা—টাকু মোড়ল ব'লে কে এক ওস্তাদ ছিল; তার দোহাই দিয়ে বাজী দেখাত।

আরও আসত সত্যকারের বেদের দল।

তাঁবু, গরুর গাড়ী, গরু, মোষ, ঘোড়া, কুকুর নিয়ে আসত এক-একটা দল; দলে পুরুষে নারীতে পঞ্চাশ ষাট থেকে চার পাঁচ শো পর্যন্ত লোক থাকত। নানা ধরনের বেদে দেখেছি। সেকালে বছরে তিনটে চারটে দল আসতই। একেবারে বর্বর, একফালি নেংটি পরা, কালো কষ্টিপাথরের মত দেহ, তারা আসত—পায়ে হেঁটে আসত, সঙ্গে থাকত কিছু গরু মহিষ আর এক পাল দারুণ হিংস্রদর্শন কুকুর; এসে গ্রামপ্রান্তে গাছতলায় বাসা গাড়ত, প্রান্তরে প্রান্তরে শিকার ক'রে আনত খরগোস, সজারু, ইঁদুর, গোসাপ, শেয়াল, বড় বড় ধামিন সাপ। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়-হয়, তখন তারা শিকার ক'রে ফিরত, অস্পষ্ট আলোয় ছায়ামূর্তির মত দেখাত, কাঁধে বাঁকে ঝুলত রাশীকৃত মৃত জন্তু, সরীসৃপ। এদের মেয়েরা গ্রামে দুপুরে ভিক্ষা করত। মাটির ঝুমঝুমি, খেজুরপাতায় বোনা থলে বিক্রি করত। দুপুরে স্তব্ধ গৃহদ্বারে হাঁক উঠত—এ খোকার মা, ঝুমঝুমি লেবি? কিনলেও বিপদ, না-কিনলেও বিপদ, কোনক্রমে ঝগড়া বাধিয়ে কিছু-না-কিছু কেড়ে নিয়ে পালাত।

অপেক্ষাকৃত সভ্য বেদের দল আসত।

ইরানীরা আসত। এদের অস্তিত্ব শহরের লোকের কাছে সুপরিচিত। ছুরি কাঁচি বিক্রি করে। মাথায় ডবল বেণীর উপর রুমাল বাঁধে, ঘাঘরা পাঞ্জাবি পরে মেয়েরা। মাথায় পাগড়ী বা মেমটুপী পাজামা পাঞ্জাবি পরে পুরুষরা দল বেঁধে গ্রামে ঢুকত। দর করলে নিতেই হ'ত জিনিস। এবং যে দাম বলত—সেই দামই আদায় করত। আমাদের বাড়ীতে যোগেশদাদা নায়েব ছিলেন। ভারি ভাল মানুষ, সুপুরুষ, গৌরবর্ণ মানুষ, মাথায় লম্বা চুল, গোঁফদাড়িতে মানুষটিকে মানিয়েছিল চমৎকার। সাধু ভাষায় কথা বলতেন। তিনি একবার একটি ইরানী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হ্যায়?

বেণী দুলিয়ে উদ্ধত যাযাবরী ছুটে সিঁড়ি বেয়ে এসে সেলাম ক'রে বললে—ছুরি আসে, কাঁইচি আসে, ক্ষুর আসে—দেকো-দেকো-দেকো। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের চামড়ার ব্যাগ নামিয়ে পসরা খুলে ব'সে গেল ইরানী মেয়ে। টকটকে রঙ, মাথায় লাল রুমাল, গায়ে গাঢ় নীল সবুজ পাঞ্জাবি, কালো দুটো বেণী, খাটো কিন্তু মোটা। যোগেশদাদা একখানা ক্ষুর নিয়ে দেখে বলেছিলেন—আচ্ছা নেহি।

—আচ্ছা নেহি? ইরানী মেয়ে ফোঁস ক'রে উঠল।—আচ্ছা নেহি? ব'লে এক

হাতে যোগেশদাদার হাত চেপে ধ'রে অন্ত হাতে ক্ষুরখানা ধ'রে বললে—বলো, কাটেগা ?

—আরে ? কাটেগা কি ? না—না—

খিলখিল ক'রে হেসে মেয়েটা যোগেশদাদার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—তবে দেকো। ব'লেই ক্ষুরটা বসিয়ে দিলে নিজের হাতে। অল্পই বসালে অবশ্য। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এল। হেসে রক্ত দেখিয়ে বললে—দেকো। ক্যায়সা দার হ্যায় দেকো। আব লেও।

যোগেশদাদা বললে—না। নেব না। তুই ভয়ানক—

ভয়ানকই বটে, ইরানী মেয়েটা খপ ক'রে যোগেশদাদার দাড়ি চেপে ধ'রে বললে—তব তুমার দাড়ি লে লেগা! হামারা ক্ষুর দেখানেকা দাম!

আর আসত সভ্য বেদে। আজকাল অনেকেই এদের জানেন না। মস্ত দল, ঘোড়া গরু মহিষ তাঁবু কুকুর—সরঞ্জাম অনেকে। এরা সব কেউ সাজত সন্ন্যাসী, কেউ সাজত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কপালে তিলক, গলায় তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কমণ্ডলু, বেশ সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে এসে দোরে দাঁড়াত। এদের একটা ভিক্ষের বুলি আমার আজও মনে আছে—সীত্যারাম—সীত্যারাম। বাড়ীর মঙ্গল হোবে রাম। সাধু বিদায় করো রাম। ব'লেই যেত, বলেই যেত—রাজ্য পাবে, পুত্র পাবে, মনের মত পত্নী পাবে। তেমন ভক্তিমান দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত বাড়িয়ে বলত—ধরো, ধরো। রামজী স্বপ্ন দিয়া তুমকো দেনেকো লিয়ে, ধরো। গৃহস্থ শঙ্কিত হয়ে হাত বাড়াত। পেত একটা তামার মাদুলী। সঙ্গে সঙ্গে সাধু বলত—দে দক্ষিণা। একশো—পঞ্চাশ—পঁচিশ—পাঁচ। শেষে এক টাকায় এসে চোখ রাঙা করে বলত—ভস্ম ক'রে দেব। শাপ দেব।

৫

শুধু কি এরাই সেকালের সব? আরও ছিল। বলতে গিয়ে কথা ফুরোয় না। ডাইনী ছিল—স্বর্ণ ডাইনীকে মনে পড়ছে। শুকনো কাঠির মত চেহারা, একটু কুঁজো, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, হাটে তরিতরকারী কিনে গ্রামে ঘরে বেচে বেড়াত। চোখ দুটো ছিল নরুনে-চেরা চোখের মত ছোট। দৃষ্টি তীক্ষ্ণই ছিল, কিন্তু ডাইনী শুনে মনে হ'ত সে চোখ যেন আমার বুকের ভেতরটা ভেদ ক'রে ঢুকে আমার হৃদপিণ্ডটা খুঁজে খুঁজে ফিরছে। স্বর্ণ গ্রামে বড় কারও ঘরে ঢুকত না। আমার অনেক বয়স পর্যন্ত স্বর্ণ বেঁচে ছিল। আমরা স্বর্ণপিসী বলতাম। বেচারী গ্রামের ভদ্রপল্লী থেকে দূরে—জেলেপাড়ার মোড়ে একখানি ঘর বেঁধে বাস করত। সে পথে যেতে-আসতে দেখেছি, বুড়ী ঘরের মধ্যে আধো-অন্ধকার আধো-আলোর মধ্যে ব'সে আছে। চুপ ক'রে ব'সে আছে। কথা বড় কারও সঙ্গে বলত না। কেউ বললেও তাড়াতাড়ি দু'একটা জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকে যেত। তার শেষ কালটায় আমি বুঝেছিলাম তার বেদনা। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেরও তার বিশ্বাস ছিল, সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ ক'রে সে মনে মনে শিউরে উঠত। কাউকে

দেখে চোখে ভাল লাগলে, সে সভয়ে চোখ বন্ধ করত ; চোখের ভাল-লাগার অবাধ্যতাকে তিরস্কার করত। দুই ক্ষেত্রেই তার শঙ্কা হ'ত, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে, হয়তো বা ফেলেছে, বিষাক্ত তীরের মত তার লোভ গিয়ে ওদের দেহের মধ্যে বিঁধে গিয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে তার আত্মীয় ছিল না, স্বজন ছিল না। রোগে যন্ত্রণায় দুঃখে সমগ্র জীবনটাই সে একা কাটিয়ে গেছে।

ডাইনী স্বর্ণ একাই ছিল না, আরও ছিল। কিন্তু স্বর্ণের মত অপবাদ কারুর ছিল না। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। আমার চোখের উপর ভাসছে। জীবনে ভুলতে পারব না শৈশবের দেখা সে ছবি। বলব ঘটনাটি।

আমাদের বাড়ীতে ছিলেন আমাদেরই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-কন্যা! রান্নার কাজ করতেন। আমি তাঁকে বলতাম 'দাদার মা'। তাঁর ছোট ছেলেটিও তাঁর সঙ্গে থাকতেন আমাদেরই বাড়ীতে। অবিনাশদাদার উপর ছেলেবেলায় আমার গভীর আসক্তি ছিল। তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে আঁকড়ে থাকতাম, স্কুলে যাবার সময় তিনি বিপন্ন হতেন। তিনিও আমাকে গভীর স্নেহ করতেন। নইলে ছোট একটি ছেলেকে ভুলিয়ে রাখার মত সম্পদ তাঁর কিছু ছিল না। অবিনাশদাদার গল্প-ভাণ্ডারে একটি মাত্র গল্প ছিল,—'ব্যাজারে ব্রাহ্মণের গল্প'।—এক ব্রাহ্মণ মাঠে গিয়েছেন। এক জায়গায় কুলকাঁটা ছড়ানো ছিল, ভুল ক'রে তারই উপর গিয়ে পড়েছেন আর পায়ে কাঁটা ফুটেছে। সে কাঁটা বের করতে গেলেন, এদিকে অন্য পা-টি ট'লে পড়ল কাঁটার উপর, তাতে ফুটল কাঁটা। এ পা মুক্ত ক'রে নামিয়ে সে পায়ের কাঁটা তুলতে তুলতে টলল এ পা। ফুটল কাঁটা। মোট কথা কাঁটা আর ছাড়ে না। ব্রাহ্মণের একেই ব্যাজার স্বভাব, তার উপর এই ব্যাপার। ক্ষেপে গেলেন ব্রাহ্মণ এবং দুই পায়ে সেই কাঁটা ছড়ানো ঠাঁইটুকুর উপর ভাঁক ভ্যাঁক ক'রে লাথি মেরে নাচতে লাগলেন আর চ্যাঁচাতে লাগলেন—ভোঁক ভোঁক—ভোঁক—ভোঁক। আমাদের দেশে 'কাঁটা ফোটা' বলে না ; বলে—কাঁটা ভোঁকা, কাঁটা ভুঁকেছে। এইটুকু গল্প। কিন্তু সে থাক্। গল্প একটিই হোক আর যত তুচ্ছ সামান্যই হোক, অবিনাশদাদার মূল্য আমার কাছে অসামান্য ছিল। একটা খবর পেলাম অবিনাশদাদাকে স্বর্ণ ডাইনী খেয়েছে। ডাইনে নজর দেওয়াকে আমরা বলি—ডাইনে খাওয়া। প্রবল জ্বরে অবিনাশদাদা অচেতন। দাদার মা তখন তাঁর নিজের বাড়ীতে থাকেন, আমাদের বাড়ীতে কাজ করেন না, কাজ করেন তাঁর বড় মেয়ে সাতনদিদি। সাতনদিদিই সকালে কাঁদতে কাঁদতে এলেন। খবর পাঠানো হ'ল গোসাঁই-বাবার কাছে। 'ধাত্রীদেবতা'র রামজী সাধু। তখন তিনি আমাদেরই বাগানে তারা-মায়ের আশ্রমে থাকেন। প্রায় আমাদের সংসারেরই একজন। আমারই মায়ার ডোরে সন্ন্যাসী আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছেন। গোসাঁই-বাবা ডাইনের ওঝা ছিলেন। মন্ত্র জানতেন। তাঁরই সঙ্গে, বোধ হয় তাঁরই কোলে চেপে, গেলাম দাদার মায়ের বাড়ী। উঠান তখন লোকে লোকারণ্য। সনা ডাইনে খেয়েছে অবিনাশকে, রামজী সাধু ঝাড়বেন।

মেটে কোঠার অর্থাৎ মাটির দোতলায় অবিনাশদাদা শুয়ে আছেন, চোখ বন্ধ। ডাকলে সাড়া নাই। প্রবল জ্বর। মাথার শিয়রে দাদার মা ব'সে। ও-পাশে ব'সে অবিনাশদাদার দুই বোন। গোসাঁইবাবা ডাকলেন—মামা! গোসাঁই-বাবাকে দাদার মা 'গোসাঁইদাদা' বলতেন, সেই হেতু অবিনাশদাদা তাঁকে বলতেন, রামজীমামা। সাধু অবিনাশদাদাকে বলতেন—ভাগ্না, কখনও মামা।

কোন উত্তর দিলেন না অবিনাশদাদা।

—অবিনাশ!

অবিনাশ এবার ঘুরে শুল।—মর্, হাঘরে গোসাঁই। আমি মেয়েছেলে আমাকে কি বলিস তুই?

—তু কৌন রে?

চুপ ক'রে রইল অবিনাশ।

—কৌন তু?

—বলব না।

—বলবি না?

—না।

মন্ত্র পড়া শুরু হ'ল। বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়েন রামজী সাধু আর মধ্যে মধ্যে ফুঁ দেন—ছুঁ—ছুঁ—ছু।

অবিনাশ চীৎকার ক'রে উঠল—পরিত্রাহি চীৎকার। বলছি—বলছি—বলছি।

তবু মন্ত্র পড়া চলল।—ছুঁ—ছুঁ—ছুঁ।

—বাপ রে, মা রে! ও গোসাঁই, আর মেরো না। বলছি, আমি বলছি।

—বোল, তু কৌন?

—আমি স্বর্ণ। স্বর্ণ ডাইনী।

—তু কাহে এখানে? আঁ?

—আমি একে খেয়েছি যে!

—খেলি? কাহে—কাহে খেলি?

—কি করব?—আমার ঘরের ছামুনে দিয়ে এই বড় বড় আম হাতে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি থাকতে পারলাম না, আমি আম না পেয়ে ওকেই খেলাম।

—কাহে, তু মাঙলি না কাহে? কাহে বললি না—হামাকে দাও?

—কি ক'রে বলব? একে লোভের কথা, তার উপরে মেয়েলোক, আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না।

—হাঁ! তব ইবার তু যা। ভাগ্।

—না। তোমার পায়ে পড়ি, যেতে আমাকে ব'লো না।

আদেশের সুরে গোসাঁই বললেন—যা তু। হামি বলছে।

—না। বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অবিনাশদাদার মুখ দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী।

—না? আচ্ছা। এ দিদি, আন্ সরষা।

সরষে এল। হাতের মুঠোয় সরষে নিয়ে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়ে—ছু শব্দে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশদাদার গায়ে।

চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল অবিনাশদাদা—বাবা রে, মা রে, ওরে, মেরে ফেলালে রে! ওরে বাবা রে!

আবার মারলেন সরষের ছিটে।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আর মেরো না। আমি যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ, যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাশ কেঁদে উঠল—ওগো, যেতে যে পারছি না গো।

—পারছিস না? চালাকি লাগাইয়েছিস, আঁ? হাত তুললেন রামজী সাধু, মারবেন ছিটে। অবিনাশ চীৎকার করলে আবার—না না! যাব, যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ, যাবো।

—তব এক কাম কর্। ঘরের বাহারে একঠো কলসীমে জল আছে। দাঁতে উঠাকে লে যা। নেহি তো—

—তাই, তাই যাচ্ছি।

জ্বরে অচেতন অবিনাশ উঠে দাঁড়াল। দাদার মা ধরতে গেলেন। রামজীবাবা বললেন —না। ঘর থকে অবিনাশ বের হ'ল। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি তার। ঘরের বাইরে দোতলার বারান্দায় জলপূর্ণ কলসী আগে থেকেই রাখা ছিল, সেটার কানা দাঁতে কামড়ে তুলে নিলে। দাঁতে ধ'রেই নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, উঠানে নামল, বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁত থেকে কলসীটা খ'সে প'ড়ে গেল, সে নিজেও প'ড়ে গেল মাটির উপর—ধরলেন গোসাঁইবাবা। এবার বিপুল বলশালী পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী কিশোর বা সদ্যযুবা অবিনাশকে ছোট ছেলেটির মত পাঁজাকোলা ক'রে তুলে উপরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। গোসাঁইবাবার পাশে পাশেই রয়েছি আমি। এবার গোসাঁইবাবা ডাকলেন—অবিনাশ! মামা!

—আঁ?

—কেমন আছ?

—ভাল আছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিনাশ দাদার জ্বর ছেড়ে গেল। আমার শিশুচিত্তে ডাইনী-আতঙ্ক দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল। স্বর্ণ সে দফা মার খেয়েছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য।

অনেকদিন পর, তখন আমার বয়স তের-চোদ্দ বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা শুরু করলে। পান-তরকারি নিয়ে আসত। শুনতাম ফুল্লরাতলায় যাওয়া

আসার পথে মায়ের সঙ্গে স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন, ঠাকুরঝি। ওই-টুকুতেই সে কৃতার্থ।

স্বর্ণ আসত এর পর আমাদের বাড়ী। আমার ভয় চ'লে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, দেখতাম স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় ব'সে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো-অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে ব'সে আছে। নিঃসঙ্গ, পৃথিবীপরিত্যক্ত স্বর্ণ। কখনও কথা বলতে সাহস হ'ত না। কি জানি, স্বর্ণ যদি সেই ডাইনী-মন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে উচ্চারণ ক'রে আমাকে শুনিয়ে দিয়ে বলে, তোকে দিলাম। তবে আমি যে ডাইনী হয়ে যাব। স্বর্ণ পাবে জীবন থেকে মুক্তি।

কথাটা আমাকে বলেছিলেন আমার পিসীমা। আতঙ্কে এক রাত্রি ঘুম হয় নি। মাকে বলতে তিনি হেসে বললেন—জানি নে বাবা, সত্যি মিথ্যে কি! সত্যি ব'লে আমার মনে হয় না। তবে ও তোমার এমন অনিষ্ট করবে কেন? স্বর্ণ আমাকে ভালবাসে। তোমাদেরও ভালবাসে। তা ছাড়া, কই, অবিনাশের ওই ঘটনার পর আর তো স্বর্ণকে দিয়ে কারুর অনিষ্ট হয় নি?

স্বর্ণ ছাড়া আরও অনেক ডাইনী ছিল। তার চেয়ে গল্প ছিল অনেক বেশী। প্রকাণ্ড মাঠে একটা অশ্বত্থগাছ ছিল। মাঠটার চারিদিকে আর যে গাছগুলি ছিল সেগুলি সবই বট, মাঝখানে ওই অশ্বত্থগাছটি খানিকটা হেলে দাঁড়িয়ে ছিল। একদিকের শিকড় উঠে বেরিয়ে পড়েছিল, মনে হ'ত গাছটার আধখানা আছে আধখানা নাই। শুনতাম ওটা ডাকিনীর গাছ। দেশে নাকি ছিল ভারী এক গুণীন। কাঁউরের অর্থাৎ কামরূপের বিদ্যাও তার জানা ছিল। একদিন গরম কালের রাত্রে গ্রামের প্রান্তে ব'সে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে আমোদ আহ্লাদ করছে, এমন সময় আকাশ-পথে একটা শব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড বেগে যেন একখানা মেঘ উড়ে চলেছে। সকলে বিস্মিত হ'ল—এ কি?

গুণীন হেসে বললে—গাছ উড়ে চলেছে।

—গাছ? গাছ উড়ে চলে? কি বলছ?

—চলে। কামরূপের ডাকিনীবিদ্যা যারা জানে, তারা গাছে ব'সে বিদ্যার প্রভাবে গাছকে উড়িয়ে নিয়ে চলে—দেশ থেকে দেশান্তর। ডাকিনী চলেছে আকাশ-পথে।

বিশ্বাস করলে না কেউ। বললে—তুমি ধোকা দিচ্ছ।

—দেখবে?

—দেখাও।

গুণীন হাঁকতে লাগল মন্ত্র। আকাশে একটা চীৎকার উঠল, চিলের মত চীৎকার, এক সঙ্গে যেন বিশ-পঁচিশটা চিল ক্রোধে চীৎকার ক'রে উঠল, ঈ—

সকলে ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু গুণীন আপন মনে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রেই চলল। মেঘের মত জিনিসটির গতি থামল না, কিন্তু সামনে সে আর ছুটল না। পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে নামল এক অশত্থগাছ। গুণীনের মন্ত্র তখনও থামে নি। মাটি ফাটল, শিকড়

সেই ফাটলে ঢুকল, গাছটি এইখানে জন্মানো গাছের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারও চেয়ে বিস্ময়ের কথা—গাছের মাথায় অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে, একপিঠ এলোচুল, সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা।

লোকে মাথা হেঁট করলে।

ডাকিনী বললে—আমাকে নামালে তুমি গুণীন, দেশের সামনে এই অবস্থায়। আমাকে লজ্জা দিলে! আমি ডাকিনী হ'লেও মেয়ে। আমার লজ্জা রক্ষা কর, আমাকে কাপড় দাও।

গুণীন হাসল।

ডাকিনী তখন নেমে হাত বাড়িয়ে বললে—দাও, কাপড় দাও।

গুণীন হেসে ঘাড় নাড়লে।—সবুর কর। সবুর কর।

কিন্তু যারা গুণীনের সঙ্গী—তাদের সবুর সইল না; একজন বললে—ছি ভাই!

গুণীন তাকে ধমক দিলে—না।

ততক্ষণে আর একজন অতর্কিতে গুণীনের কাঁধের গামছাখানাই টেনে মেয়েটিকে ছুঁড়ে দিলে। গুণীন আঁতকে উঠল—করলি কি? করলি কি?

ডাকিনী খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল। গামছাখানায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত সামনের দিকে ঢেকে, হেঁট হয়ে, পায়ের দিকের গামছার প্রান্তটা ধ'রে উপর দিকে নিয়ে পিছনের দিকে মাথা পার ক'রে ফেলে দিলে। গুণীন মর্মান্তিক চীৎকার ক'রে উঠল—সকলে সভয়ে দেখলে, গুণীনের দেহের চামড়া পায়ের দিক হতে ছিঁড়ে ক্রমশ মাথার দিকে গুটিয়ে পিছনের দিকে উল্টে গেল। চামড়া-ছাড়ানো মানুষটা পশুর মত আর্তনাদ ক'রে উঠল। ডাকিনীর খিল-খিল হাসি উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠল। সে গিয়ে আবার চাপল সেই গাছে। গুণীন সেই অবস্থাতেই তখনও মন্ত্র পড়ছিল; মন্ত্র আধখানার বেশী পড়তে পারলে না সে। গাছটার আধখানা উঠল না, আধখানা ছিঁড়ে আবার উঠল আকাশে। আবার আকাশে শব্দ হতে লাগল। উড়ন্ত মেঘের মত চ'লে গেল—কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে।

এর উপর ছিল ভূত।

আমাদের বাড়ীর গলিতে—বাড়ী থেকে বৈঠকখানা ও সদর রাস্তা যাবার পথে জ্যাঠা-মশায়দের ডুমুরগাছে ভূত ছিল। শিউলিগাছে ব্রাহ্মণ-প্রেত ছিল। এই গলিপথ নিচের দিকে ছিল সর্পসঙ্কুল—অন্য দিকে মাথার উপরটা ভূত-অধ্যুষিত। সে কি বিপদ শিশুর পক্ষে! বারো-চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত গলির মুখে এলেই ঢুকতাম আমাদেরই বাড়ীর দৌহিত্র-বংশের এক বাড়ীতে। সকাতরে বলতাম—ওগো, আমাকে একটু দাঁড়িয়ে যাও।

সাপের ভয় আমার ছিল না। কোন কালে, আজ পর্যন্ত, আমি একলা যখন যাওয়া-আসা করেছি, কখনও আলো হাতে যাবার প্রয়োজন অনুভব করি নি। মোটামুটি ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ওদের চলাফেরা বুঝতে পারি। গ্রামের মধ্যে যে সব সাপ বাস করে, তারা মানুষের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বাস করে—এটা আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলছি। বিপদ মাঠের সাপের কাছে। তারা মাঠে থাকে, মানুষকে তারা মোটেই বরদাস্ত

করতে পারে না। তাও, উত্তরকালে, আমি যখন কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলাম আবাদ ক'রে সোনা ফলাবার জন্য—তখন এক কালো কেউটের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয়েছিল। প্রায় নিত্যই আমার সঙ্গে দেখা হ'ত তার। পরে তার বাসাও আবিষ্কার করেছিলাম। একবার প্রবল বৃষ্টিতে দেখেছিলাম, তার বাসাটার উপরে মাটি খুলে একরাশি ডিম জলের স্রোতে ভেসে গেল। তখন জানলাম, সাপটি নারীজাতীয়া—নাম দিয়েছিলাম তার কালকুটী!

ভূত থেকে সাপের কথায় এসে পড়েছি। সাপের কথা থাক্।

আমাদের গলিতে ডুমুরগাছের ভূত আমাকে উত্যক্ত করেছে।

শিউলিতলার ব্রাহ্মণের বিবরণ বিচিত্র। ইনি ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা দেন। দেখা দেন কালপুরুষের মত। তিনি দেখা দিলেই বুঝতে হবে, আমাদের কয়েক বাড়ীর মধ্যে কারুর ডাক পড়েছে।

আমাদের বাড়ীর গলির ওপাশে ছিল ভটচাজদের বাড়ী। গল্প শুনতাম এই বাড়ীর রমাই ভূতের। রমাই বাড়ীর চালের সাঙায় পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকত। তার শিশু ভাইপো বিছানায় কাঁদলে তাকে বিছানা-সুদ্ধ তুলে সাঙায় নিয়ে দোল দিত। আরও অদ্ভুত কাণ্ড রমাই ভূতের। শুনেছি, নাকি কাঁদির রাজবাড়ীতে রাস উৎসবের খুব সমারোহ হয়। খাওয়া-দাওয়া দু-তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত।

একবার বাড়ীর মেয়েরা রাসপূর্ণিমার দিন ওই রাজবাড়ীর খাওয়া-দাওয়ার গল্প করছিলেন। একজন বলেছিলেন—মিছে গল্প ক'রে কি হবে? খাওয়াচ্ছে কে? পর-মুহূর্তেই রামাইয়ের কথা মনে ক'রে বলেছিলেন—রামাই যদি ভাই দয়া করে তবে নিশ্চয় সাধ মেটে, খেতে পাই!

ব্যাস্; ঘণ্টা খানেক যেতে না-যেতে শূন্যলোক থেকে নেমে এল দুই চ্যাঙারি। লুচি, মালপো, মিষ্টিতে বোঝাই।

এর পর আর ভূত বিশ্বাস না-ক'রে উপায় আছে?

ভূতের গল্প মা-ও বলতেন, কিন্তু ভূতকে ভয় ছিল না তাঁর। সে কথা আগে বলেছি। ডুমুরগাছের ভূতের ভয় আশ্চর্যভাবে আমার কেটেছিল। সে কথা এখানে নয়, পরে বলব।

ডাইন ডাকিনী ভূত প্রেত সমাকুল আমার সে কাল। বেদে সাপুড়ে পটুয়া দরবেশ তখন দেশে প্রচুর। প্রতিদিনই এদের কারুর না কারুর বা কোন দলের না কোন দলের সঙ্গে দেখা হ'তই। আমার সাহিত্যিক জীবনে এরা দল বেঁধে ভিড় ক'রে এসেছে ঠিক এই কারণেই। কলকাতায় ম্যাজিকওয়ালারা বা বাজীকরেরা যারা তাঁবু খাটিয়ে বাজনা বাজিয়ে ভিতরে কাচের জারের মধ্যে আরকে ডুবানো মরা ছটা-পা দুটো-মুণ্ডওয়ালা ছাগলের বাচ্চা দেখায়, তাদের মত বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য আমি এদের খুঁজে-পেতে আনি নি। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট কাহিনী বলব আমার সাহিত্যিক জীবনের।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়ের কথা। আমার 'ছলনাময়ী' গল্পের বইয়ে "ডাইনীর বাঁশী" গল্পটি আছে। স্বর্ণ ডাইনীর গল্প। রবীন্দ্রনাথ নানা কথার মধ্যে

হঠাৎ বললেন—ডাইনীর গল্পটি ভাল হয়েছে। খুব ভাল লেগেছে আমার। আমি কলকাতায় কয়েকজনের কাছে বললাম। একজন বললেন—আমাদের দেশে উইচ নিয়ে গল্প? গল্পটি নিশ্চয় বিদেশী গল্প থেকে নিয়েছে।

আমি তাঁর কথার মধ্যেই ব'লে উঠলাম—না। ও আমার দেখা। আর আমি তো ইংরিজী ভাল জানি না, আমার গ্রামে ইংরিজী বই পড়ারও সুযোগ নেই। স্বর্ণ ডাইনী আমাদের বাইরের বাড়ীর পুকুরের ওপারে থাকত। তাকে আমি দেখেছি। আমি—

হেসে তিনি বললেন—আমিও তাঁদের তাই বলেছি। এ তারাশঙ্করের দেখা ডাইনী, সে তাকে দেখেছে। পড়তে পড়তে আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ণ দুপুরবেলা ব'সে আছে আর সামনের তালগাছটার মাথায় চিলটা ডাকছে। আমাদের দেশের এঁরা ইউরোপের উইচক্র্যাফ্‌টের কথা অনেক পড়েছেন। শহরে থাকেন, গ্রামের ডাইন দেখেন নি। তাই উইচ নিয়ে গল্প হ'লেই মনে করেন, বিদেশ থেকে না ব'লে ধার করেছে।

এরই মধ্য থেকেই, মায়ের শিক্ষা এবং বাবার গম্ভীর ও গভীর তত্ত্বসন্ধানের আকুতি থেকে, আমি পেয়েছিলাম আমার পথ।

আমার মায়ের মধ্যে ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়াও আর এক উপাদেয় ধারায় পেয়েছিলাম এই শিক্ষা—মায়ের গল্প বলার কথা আগে বলেছি। নিত্য সন্ধ্যায় শুনতাম গল্প। যে দিন চুল বাঁধতে বসতে হ'ত, সেদিন চুল বাঁধার সময় গল্প বলতেন।

"এক ছিল রাজা।
রাজার দুই মেয়ে।"

বলতেন সত্যপ্রিয়ের কাহিনী। আমার 'শ্রীপঞ্চমী' নামে ছেলেদের গল্পের বইয়ের প্রথম গল্প। সত্যই একমাত্র প্রিয় ছিল কুমারটির, শ্রেয়ই হয়েছিল তার প্রেয়। তারই কাহিনী থেকে পেতাম পথের নিশানা। সত্যই একমাত্র পথ।

গল্পের শেষে মা বলতেন—

কহনী হ্যায় সাচ্চা,
বলনেবালা ঝুটা,
শুননেবালা সাচ্চা।

বলতেন—আমি বললাম বানিয়ে। কিন্তু তুমি সত্যি, আর গল্প সত্যি। গল্প তুমি কোনদিন ভুলবে না।

৬

ছেলেবেলায় আমি যত গল্প শুনেছি, এত গল্প বোধ হয় খুব কম ছেলেই শুনতে পায়। আজ মনে পড়ছে, সেকালের গল্পগুলির মধ্যে, অন্তত আমি যাঁদের কাছে গল্প শুনেছি তাঁদের গল্পের মধ্যে, আশ্চর্য ভাবে প্রাণপুরুষের সন্ধান ছিল।

একালে অনেক পুরাকালের গল্প-সংগ্রহ বেরিয়েছে; 'ঠাকুরদার ঝুলি', 'ঠাকুরমায়ের ঝুলি', আরও অনেক। এগুলির মধ্যে আমার শোনা গল্পগুলি পাই নি। এর কারণ বোধ হয় আমার শোনা গল্পগুলির উৎপত্তিস্থান বাংলা দেশ নয়। আমার প্রথম গল্পকথক আমার মা। তাঁর জন্ম পাটনা শহরে, মানুষও তিনি পাটনায়। তিনি বলতেন যে সব গল্প, তার অধিকাংশই তিনি শুনেছিলেন তাঁর মায়ের ঝিয়ের কাছে। বলতেন—বুড়ী দাঈ। বুড়ী দাঈকে তাঁর কি শ্রদ্ধা আর মমতা ছিল! ওই সত্যপ্রিয়ের কাহিনীর কথা এর আগে উল্লেখ করেছি; কাজলহারার কথা বলেছি; আর একটা গল্প তাঁর 'ঘাসেড়ানন্দনের গল্প'। ঘাসেড়ানন্দন শব্দটাতেই হিন্দী ভাষার গন্ধ আছে। তবে আমার মা তাকে আশ্চর্যভাবে আত্মসাৎ ক'রে একেবারে বাঙালীর গল্প ক'রে তুলেছিলেন। এই সেদিনও, বোধ হয় মাস তিনেক আগে (১৩৫৭ সালের ভাদ্র মাসে), সেই গল্প তিনি আমার পৌত্রকে শোনাচ্ছিলেন। আমিও বসলাম পাশে। মা হাসলেন। আমার পিঠে হাত দিয়ে যেন আমাকেই বলতে লাগলেন। এক জায়গায় নানা খাবারের কথা আছে। তিনি ব'লে গেলেন—মল্লিকা ফুলের মত সাদা সুগন্ধ অন্ন, কাঁচা সোনার মত রঙের সোনামুগের দাল, শাক শুক্তো দালনা, নানা রকমের ভাজা, ঝোল ঝাল অম্বল চাটনি, দই পায়স ক্ষীর পিঠা, নানাবিধ মিষ্টান্ন রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ, চমচম, বরফি—অনেক নাম ক'রে গেলেন। কিন্তু কোনটি বিহারের বিশেষ খাদ্য নয়। এই গল্পটির মধ্যে বড় হ'ল বন্ধুপ্রীতি, সত্যপ্রীতি, এবং বীর্যবানের বীর্য। রাজকন্যাও আছে, মায়াবিনী ডাকিনীও আছে, কিন্তু সে সব কিছুই মনে থাকে না। মনে থাকে, বন্ধুর কাছে সত্য গোপন করেছিলেন ব'লে মহাবীর ঘাসেড়ানন্দন তাঁদের বললেন—ভাই, তোমরা বন্ধু, তোমাদের ভোলা অসম্ভব, ভুলতে কখনই পারব না জীবনে। তবে ভাই, সত্য হ'ল তার চেয়েও বড়। সেই সত্যকে আমার কাছে গোপন করেছ তোমরা; সুতরাং আজ থেকে বুকের বন্ধুত্ব বুকে রেখে আমরা পৃথক হলাম। যখন আহার করব, তখন চারজনের আয়োজন করব, চার পাতে সাজাব, আগে তোমাদের তিনজনকে নিবেদন ক'রে তবে নিজে খাব। চারজনের মত আয়োজন যদি না জোটে, তবে যা জুটবে তাই চার ভাগ ক'রে তিন ভাগ তোমাদের উদ্দেশে নিবেদন ক'রে আমি এক ভাগ খাব। তিন ভাগ বিতরণ ক'রে দেব দীনদুঃখীকে।

তিন বন্ধু চ'লে গেলেন একদিনে। তাঁরাও তাই স্বীকার করলেন। দোষ মেনে নিলেন। বললেন—এই মিথ্যা বলার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যদি পারি তো দেখা হবে।

দেখা অবশ্যই হয়েছিল। এবং গল্প শোনার পরমানন্দের মধ্যে ওই কথা কয়টিই কানে বাজত। ওই তো সেই প্রাণপুরুষের সন্ধানের রহস্যমন্ত্র!

গল্প শোনার পর্বকে বলতে পারি—আমার হাতেখড়ির আগে মুখে মুখে জীবনের বর্ণ-পরিচয়ের চেষ্টার প্রথম পর্ব। এই পর্বের মধ্যে মায়ের পরই হলেন আমার গোসাঁইবাবা রামজী সাধু। তিনি আমাদের গ্রামের ফুল্লরা মহাপীঠে তীর্থভ্রমণে এসে আমার বাবার আধ্যাত্মিক চর্চার পরিচয়ে আকৃষ্ট হয়ে বাবার পরম বন্ধুতে পরিণত হন। গ্রামপ্রান্তে একটি

প্রান্তরে বাবা তখন একটি বাগান তৈরী করাচ্ছিলেন। সেই বাগানটির মধ্যে সন্ন্যাসী বন্ধুর জন্য একটি আশ্রম তৈরী ক'রে দেন এবং সন্ন্যাসীর অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি মন্দির তৈরী করে সেখানে শারদ শুক্লাচতুর্দশীতে তারাপূজার প্রতিষ্ঠা করেন। যে বৎসর তারা-পূজার প্রবর্তন হয় সেই বৎসরেই ঠিক দশম মাসে আমার জন্ম হয়, সেই কারণেই আমার নাম হয় তারাশঙ্কর। এই কারণেই এই সন্ন্যাসীটি আমার মমতায় এমনই আচ্ছন্ন হন যে, সমস্ত জীবনে তিনি আর লাভপুর ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁর পার্থিব দেহের সমাধি আমি নিজে হাতে রচনা করেছি। সন্ন্যাসী প্রথম জীবনে পল্টনে চাকরি করতেন, তখন তাঁর নাম ছিল বলভদ্র পাণ্ডে। সন্ন্যাসী-জীবনে তাঁর নাম হয়েছিল রামজী সাধু। আমার ভাগ্যক্রমে রামজীবাবা—আমার গোসাঁইবাবাও—ছিলেন অদ্ভুত দক্ষ কথক। আমার জীবনে চারজন প্রথম শ্রেণীর গল্প-কথকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমার মা, আমার গোসাঁইবাবা, আর দুজনের সাক্ষাৎ পেয়েছি পরিণত বয়সে—একজন প্রায় আমার সমবয়সী, তিন-চার বৎসরের বড়—তাঁর নাম গৌর ঘোষ। অপর জন ত্রিকাল ভট্টাচার্য—অকস্মাৎ অপরিচিত মানুষটি এসে আমার বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন। ত্রিকাল ভট্টাচার্য এককালে ছিলেন পেশাদার গল্প-বলিয়ে, তাঁর মত গল্প-কথক বাংলাদেশে আর কেউ আছেন বলে কল্পনা করতে পারি না। গৌর ঘোষ আশ্চর্য রকম ভাল ভূতের গল্প জানে এবং বলতে পারে। গৌর ভূতের ভয়ে চটি ফেলে ছুটে পালাত, কিন্তু সে যখন ভূতের গল্প বলত তখন ভূত যেন মজলিসের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। বলত—হঠাৎ উ-স শব্দ হ'ল, ছাদ ফুঁড়ে সড়-সড়-সড়-সড় ক'রে নেমে এল একটা সুতো, তারই ডগায় ঝুলছে একটা সদ্যজাত ছেলে, ছেলেটা ওঁয়া-ওঁয়া ক'রে কাঁদছে। গৌর নিজেই ওঁয়া ওঁয়া শব্দে কঁকিয়ে উঠত, আর মজলিসসুদ্ধ লোক আঁ শব্দ ক'রে আঁতকে উঠত। রামজীবাবা ভাঙা বাংলায় হিন্দুস্থানী রূপকথা বলতেন। "সহবত আসর, না—তরুম্ তাসীর? জন্মগুণই বড়, না, শিক্ষা সহবতের গুণ বড়?" তাঁর গল্পের বড় হ'ত শিক্ষার গুণ, জন্মের গুণকে খাটো ক'রে বলতেন—বাবা সহবৎ—সহবৎই হ'ল সবচেয়ে বড় কথা। রাজার ছেলের মুরুখ হ'লে সে ভূত, সে জানোয়ার। সন্ধ্যায় আসতেন—আমি পড়া সেরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতাম, রাস্তার দিকে কান পেতে থাকতাম, রাস্তার উপর কখন সবল পদধ্বনি বেজে উঠবে, তার সঙ্গে ঝনাৎ ক'রে বাজবে তার চিমটার কড়ার শব্দ। তিনি বৈঠকখানার ফটকে ঢুকেই হেঁকে উঠতেন, "নমো নারায়ণায়।" আমার বাবার বৈঠকখানার মজলিস ছিল বিখ্যাত মজলিস। গ্রামের সকল বিশিষ্ট লোকেরাই এখানে আসতেন, বসতেন। চায়ের ব্যবস্থা ছিল—সমারোহের ব্যবস্থা। এক-একবারে বিশ থেকে ত্রিশ কাপ চা তৈরী হ'ত। চায়ের জন্য স্বতন্ত্র ঘর ছিল, সে ঘরে উনান নিবত না। কল্কের পর কল্কেতে তামাক সাজা থাকত। আমার অনন্তদাদা বাবার খাস খানসামা, সে চিটে ধ'রে তাতে আগুন চড়াত। মজলিসে গ্রামের সামাজিক, বৈষয়িক আলোচনা চলত কিছুক্ষণ, তারপর ধর্মশাস্ত্র আলোচনা হ'ত। গোসাঁইবাবা এলেই সকলে উঠে দাঁড়াতেন। গোসাঁইবাবার কিন্তু সে ঘরে ঢোকবার উপায় ছিল না। তিনি এসে ঢুকতেন আমার পড়ার ঘরে।

বাবা হামার—বাবা হামার—বাবা হামার রে!

আমি লাফ দিয়ে উঠে তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে ঝুলে পড়তাম, তিনি বুকে তুলে নিয়ে বলতেন—আজ তো বাবা, লড়াইকে গল্প বলবে। মণিপুরকে গল্প।

মণিপুরের টিকেন্দ্রজিত মহাবীর, মহাভারতের পাণ্ডব-বংশধর। মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত মহাবীর বভ্রুবাহন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র। শুধু তাই নয়, পাণ্ডবের অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে বভ্রুবাহন ও অর্জুনে—পিতাপুত্রে মহাযুদ্ধ হয়েছিল। সে যুদ্ধে অর্জুনকে পরাজিত করেছিলেন বভ্রুবাহন। সেই বংশের সন্তান টিকেন্দ্রজিত। তাঁরই গল্প।—টিকেন্দ্রজিত বীর হইলে কি হোবে বাবা, আংরেজকে কামান—আরে বাপ রে বাপ—সে ছুটল—দনা-ন্-ন্-ন্। দনা-ন্-ন্-ন্।

আমার চোখের সামনে ভেঙে ভেঙে পড়ত দুর্গপ্রাকার। চোখে আসত জল।

মধ্যপথে অনন্তদাদা অথবা ভীমসিং চাপরাসী আসত বাড়ীর ভিতর থেকে, আমার পিসিমায়ের তাগিদ নিয়ে। তিনি আমার জন্য ব'সে আছেন। খাইয়ে দাইয়ে আমাকে নিয়ে শোবেন গিয়ে। আমার পিসিমা শৈলজা দেবী আগুনের মত উত্তপ্ত। আমিই ছিলাম সে উত্তাপে জল। প্রথম জীবনে বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে একই দিনে কলেরায় স্বামী-পুত্র হারিয়ে পিত্রালয়ে এসেছিলেন; বুকে নিয়ে এসেছিলেন জ্বলন্ত চিতাবহ্নি। সে বহ্নিতে কারও নিস্তার ছিল না। আমি যখন জন্মালাম, তখন তিনি মায়ের কোল থেকে আমাকে নিয়ে পালন করতে আরম্ভ করলেন এবং জীবনের উত্তাপও ক'মে আসতে আরম্ভ হ'ল। আমারও পিসিমার কোলের কাছটি ছাড়া ঘুম আসত না। কিন্তু তিনি মাত্র একটি গল্প জানতেন। কাজেই আমার গল্প না শোনা পর্যন্ত তাঁকে ব'সে ঢুলতে হ'ত। ঢুলতেন আর গোসাঁইবাবাকে তিরস্কার করতেন।

গোসাঁইবাবার এ সব তিরস্কার কানে ঢুকত না। তিনি গল্প বলতেন, দন-ন-ন-নন্ দন-ন-ন-নন্।

৭

গল্প শুধু আমিই শুনতাম না, ছেলেরাই শুনত না, সেকালে বড়দের আসরেও গল্প হ'ত। বাবার বৈঠকখানাই ছিল গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে জমজমাট আসর। সকাল থেকে গ্রামের ভদ্রজনদের আসা শুরু হ'ত। সকালবেলা আটটা নাগাদ চায়ের আসর জ'মে উঠত; তিরিশ থেকে চল্লিশ জন ভদ্রলোক এসে ব'সে যেতেন। বাবার খাস খানসামা ছিল আমার অনন্তদা। গ্রামেরই বৈষ্ণব ঘরের ছেলে। ছেলে বয়স থেকে আছে, বাবা নিজে কাজ শিখিয়েছিলেন। কাপড় কোঁচানো, চা তৈরী, গা-হাত টেপা ইত্যাদি তরিবতের কাজে অনন্তদাদার মত নিপুণ শিল্পী সচরাচর দেখা যায় না। অনন্তদা ভোরবেলা উঠে চায়ের সরঞ্জাম, তামাকের সরঞ্জাম তৈরী ক'রে

অপেক্ষা করত। একটা স্বতন্ত্র ঘরই ছিল চা এবং তামাকের। বেলা একটা পর্যন্ত চলত মজলিস, তারপর আবার মজলিস বসত সন্ধ্যা আটটা থেকে; রাত্রি বারোটা বাজতই, কোন কোন দিন রাত্রি দেড়টা দুটোও বাজত। সেদিন খাওয়া দাওয়ার আসরও ব'সে যেত। গ্রামে জামাই বেয়াই কুটুম্ব যার বাড়ীতে যিনিই আসতেন তিনিই আসতেন এই মজলিসে। কয়েকজন—সাত আটজন ছিলেন আসরের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মানুষ। এঁদের মধ্যে গ্রামের ঘরজামাই দু-তিন জন। বাকী গ্রামের ভদ্রজন। তুমুল উত্তেজিত আলোচনা চলত। বৈষয়িক তর্ক, সামাজিক বিচারের তর্ক। আবার উঠত হাস্য-পরিহাসে হাস্যরোল। সে কি হাসি! রাত্রির অন্ধকার শিউরে উঠত। একালে সেকালের মানুষের সে স্বাস্থ্যও নাই, সে কণ্ঠস্বরও নাই, তেমন ক'রে প্রাণ খুলে হাসবার প্রবৃত্তিও নাই; একালে সে হাসি আর নাই। এক সময় মনে হ'ত হয়তো-বা সভ্যতাই সে হাসির উৎসমুখে অনুশাসনের পাথর চাপা দিয়েছে; উচ্ছ্বাস আর সেই স্বচ্ছন্দ বেগবতী ধারায় নির্গমন-পথ পায় না। কিন্তু একদিন, বোধ করি ১৯২২।২৩ সালে, সে ভ্রম আমার গিয়েছিল। তখন আমি কলকাতায় ভবানীপুর বেলতলা রোডে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বাড়ীর ঠিক পিছনের দিকের বাড়ীতে থাকি। আমি যে ঘরটিতে থাকতাম, সে ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা থেকে দাশ মহাশয়ের বাড়ীর দোতলার ঘরেরও কিছুটা দেখা যায়। বাড়ীর বিস্তীর্ণ হাতার সবটা তো দেখা যেতই। তখন প্রথম বাসায় এসেছি। সেই বাড়ীর নিচের তলায় সন্ধ্যাবেলা বসবার ঘরে ব'সে আছি হঠাৎ একটা কোলাহল উঠল। সে কি কোলাহল, কোথায় যেন অকস্মাৎ অভাবনীয় কিছু ঘ'টে গেল! তখন ভবানীপুর এ ভবানীপুর ছিল না, দেশবন্ধুর বাড়ীর সামনে রসা রোডের পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড মাঠ প'ড়ে ছিল; পূর্ণ থিয়েটারও তখন হয় নি। ওদিকটা সবই তখন হয় মাঠ, নয় বস্তী। কোলাহল শুনে প্রায় সবাই ছুটে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় যখন বেরুলাম তখন আর কোলাহল নাই। কি হ'ল? দুর্ঘটনার কোলাহল কি এই ভাবে মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়? দেশবন্ধুর বাড়ীর পূর্বদিকের ছোট ফটকে ব'সে ছিল একজন দ্বারপাল; সে বুঝতে পেরেছিল আমাদের মনের জিজ্ঞাসা। সে হেসে বলেছিল, যা ভেবেছেন বাবু, তা নয়, হয় নি কিছু, সাহেবরা হাসছেন। হাঁ, হাসি বটে! সেদিনও মনে পড়েছিল বাবার মজলিসের হাসি। একালের দোষ নাই, পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নির্ভর করে। আজ স্বাচ্ছন্দ্য নাই, স্বাস্থ্য নাই, কাজেই প্রাণশক্তি অপূর্ণাঙ্গ শিশুর মত দুর্বল, রুগ্ন; সে হাসি হাসবে কি ক'রে মানুষ!

বাবার মজলিসে গল্প হ'ত।

গল্প বেশির ভাগ বলতেন গোসাঁইবাবা।

বাবাও বলতেন। তিনি কথাবার্তা খুব ভাল বলতেন। বক্তা ছিলেন ভাল, কথায় জোর ছিল, কিন্তু গল্পকথক ভাল ছিলেন না। তিনি বেশির ভাগ গল্প বলতেন বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প বা ওই ধরণের গল্প। গল্পের শেষে প্রশ্ন থাকত। প্রশ্নটি উত্থাপন ক'রে বলতেন, বল, কার কি উত্তর! সব শেষে তিনি বলতেন গল্পের উত্তর।

একটা গল্প—চার বন্ধু—একজন কাষ্ঠশিল্পী, একজন চিত্রশিল্পী, একজন বস্ত্র ও ভূষণশিল্পী, একজন মন্ত্রসিদ্ধ তাপসপুত্র—একদিন বনের মধ্যে রাত্রে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। কথা হ'ল, গভীর বন—এই বনে এক-একজন এক-এক প্রহর জেগে পাহারা দেবেন। প্রথম প্রহরে প্রহরার ভার পড়ল কাষ্ঠশিল্পীর উপর। বন্ধুরা ঘুমুচ্ছে, তিনি একা ব'সে আছেন, সামনে জ্বলছে এক অগ্নিকুণ্ড, পাশে কিছু শুকনা কাঠ। একা, নিতান্ত খেয়ালবশেই তিনি নিজের যন্ত্র বের ক'রে কাঠ থেকে গড়লেন এক অপূর্ব নারীমূর্তি। মূর্তিটিও শেষ হ'ল, প্রথম প্রহরশেষের ঘোষণাও বেজে উঠল, কাষ্ঠশিল্পী ডেকে দিলেন চিত্রশিল্পীকে। নিজে শুয়ে পড়লেন। চিত্রশিল্পীর চোখে পড়ল সেই কাঠের নারীমূর্তি। বুঝলেন বন্ধুর কাজ এটি। তিনি এবার নিজের সরঞ্জাম বের ক'রে তাতে রঙ দিলেন। গোলাপ ফুলের মত দেহবর্ণ উজ্জ্বল ক'রে দিলেন, চোখ আঁকলেন, ভুরু আঁকলেন। গাছের বাকল থেকে আঁশ বের ক'রে এক রাশি কালো রঙ দিয়ে চুল ক'রে দিলেন, নখ আঁকলেন, গালে একটি ছোট তিল—তাও দিতে ভুললেন না। শেষ করলেন, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, মনোমত হ'লে তুলি রেখে বসলেন। এমন সময় দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা ক'রে ঘামঘোষেরা কোলাহল ক'রে উঠল। চিত্রশিল্পী মূর্তিটিকে একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে সরঞ্জাম গুটিয়ে শুয়ে পড়লেন, ডেকে দিলেন বস্ত্রভূষণশিল্পীকে। তিনি উঠে আগুনটাকে জোর ক'রে দিয়ে বসলেন, মূর্তিটিকে দেখে চমকে উঠলেন, এই নগ্না সুন্দরী নারী—এ কে? কোন বনদেবী? না, দেবী এমন লজ্জাহীনা নগ্না হবে কেন? তবে কি মায়াবিনী? না, তাও তো নয়। মায়াবিনী এমন নিস্পন্দ স্থির কেন, তার হাবভাব ছলাকলা কই? ভাল ক'রে চোখ রগড়ালেন; এবার বুঝলেন দুই বন্ধুর কীর্তি এটি। হাসলেন এবং পরক্ষণেই নিজের ব্যবসায়ের কাপড় এবং আভরণের বোঁচকা পেটিকা খুলে বসলেন। বেছে মানানসই রঙের পট্টবস্ত্র বের করলেন, আভরণ বের করলেন, পুতুলটিকে মনের মত ক'রে সাজালেন। তারপর তৃতীয় প্রহর শেষ হতেই মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপুত্রকে জাগিয়ে নিজে শুলেন। ব্রাহ্মণপুত্র কিন্তু প্রতারিত হলেন না, তিনি এই অনুপম রূপলাবণ্যময়ী পুতুলটিকে দেখবামাত্র বুঝলেন যে এটি প্রাণহীন পুত্তলিকা মাত্র—এবং তিন বন্ধুর তিন প্রহরের আপন-আপন গুণপনার ফল এই মূর্তিটিকে দেখে খুব খুশী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন যে, তাঁর গুণপরিচয় এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়াই তাঁর কর্তব্য। তা হ'লেই চার বন্ধুর এই রাত্রিযাপনটি পরম সার্থক হয়ে উঠবে। তখন মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপুত্র পুতুলটিকে অগ্নিকুণ্ডের সামনে এনে রাখলেন, কুণ্ডের অগ্নিকে মন্ত্র দ্বারা সঞ্জীবনী অগ্নিতে পরিণত করলেন, তারপর মন্ত্রজপে বসলেন। মন্ত্রজপ শেষ ক'রে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে তারই তিলক এবং উত্তাপে অভিষেক করতেই পুত্তলিকা জীবন লাভ ক'রে চঞ্চল বিস্ময়ে চারিদিক তাকিয়ে বললে—তুমি কে? আমিই বা কে?

এমন সময় ভোর হ'ল। পাখীরা ডেকে উঠল। ঘুমন্ত তিন বন্ধু জেগে উঠে বসলেন, এবং এই অপূর্ব নারীকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। বিস্ময় কাটতেই কিন্তু সূত্রপাত হ'ল কলহের। চার জনেই বললেন, এ আমার সৃষ্টি—এ হবে আমার পত্নী।

এখন কে বিচার করবে—এ নারী কার প্রাপ্য ?

প্রশ্ন হ'ত—বল, তোমরা বল। কে পাবে এই নারীকে ?

গল্প থেকে বিতর্ক উপস্থিত হ'ত। যুক্তির উপর ভিত্তি ক'রে বিতর্ক এবং শাস্ত্রীয় যুক্তি। সকলের শেষে বাবা বলতেন গল্পের মীমাংসা। এ গল্পের মীমাংসা, ওই নারীকে পত্নীরূপে পাবেন ওই বস্ত্র এবং আভরণশিল্পী। প্রাণদাতা ব্রাহ্মণপুত্র পিতার কাজ করেছেন—তিনি দিয়েছেন প্রাণশক্তি; চিত্রশিল্পী কাষ্ঠশিল্পী তাঁরা মায়ের কাজ করেছেন, দিয়েছেন অস্থি মেদ মজ্জা মাংস রক্ত অবয়ব; ওই বস্ত্র এবং আভরণ শিল্পী সদাগরপুত্র বস্ত্র আভরণ দিয়ে ভর্তার কাজ করেছেন; তিনি তার ভর্তা অর্থাৎ স্বামী।

কথনও কথনও পুরাণের গল্প হ'ত। তা থেকে চ'লে যেতেন—শাস্ত্র আলোচনায়। কথনও কথনও হ'ত দেশ-বিদেশের গল্প, কেউ আগন্তুক অথবা বিদেশবাসী গ্রামে ফিরলে সে গল্প হ'ত।—সে তোমাদের কত বলব বাবু! সে দেশ আচ্ছা দেশ! আচ্ছা দেশ! যত মাছ—তত দুধ, সে দুধে ঘি কত হে! হাতে লাগলে ছাড়তে চায় না। পদ্মার ধার—বুয়েচ না—এই পদ্মা—একূল-ওকূল নজর চলে না—বর্ষার সময় সাক্ষাৎ ভৈরবী—সে বাবু দেখেই আমার হৃৎকম্প। কালী কালী বল মন, রাত্রে শুয়ে ঘুম হ'ত না। ভাবতাম ঘুমোব, কখন ধ্বস ছাড়বে অকূলে ভাসব! আঃ, হায়-হায়-হায়, জপের মালাটা নিতে সময় পাব না রে বাবা! ভুক ক'রে ডুবব, আর উঠব না। একেবারে সাগরসঙ্গমের তলদেশে মাটিচাপা··· নয়তো হাঙ্গর-কুম্ভীরের গর্ভে। বর্ষা পার হ'লেই বাস্। রাজ-শাহী তো রাজসাহী রে বাবা!

এর পর চুপি চুপি বলতেন—গাঁজার এক-একটা জটা কি! এ-ই এতখানি লম্বা আর ইয়া পুরু। বুয়েচ না ভাই, রসও কি তেমনি! দু টিপ দিয়েছ তো আঠা একেবারে চট চট ক'রে উঠল। তেজও কি তেমনি রে বাবা! বুয়েচ হরাই ভাই, প্রথম গিয়েছি—এত তো জানি না—মেরেছি জোরে টান। বাস্, গলগল ক'রে সেই যে ধোঁয়া বেরিয়ে চোখের সামনেটা ঝাপসা করে দিল—তিন দিন সে ঝাপসা কাটে না চোখের। পোস্টাপিসের কাজ, চোখে ঝাপসা দেখি, মাথা ভোঁ-ভোঁ করে—তিন আর চারে সাত লিখতে গিয়ে ভাবি, ঠিক হ'ল তো, তিন আর চারে পাঁচ নয় তো? সে এক বিপদ! কালী কালী বল—তারা তারা তারা বল—শিব শিব বল। হরি বোল—হরি বোল।

ইনি ছিলেন আমার ব্রজজ্যাঠা। এমন সদানন্দময় পুরুষ পৃথিবীতে বিরল। সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, পোস্টাপিসে কাজ করতেন, সরকার-বংশের সন্তান, লাভপুরে এঁদের বাড়ীরই দৌহিত্র আমরা। অনুরূপ মানুষ ছিলেন ব্রজজ্যাঠা।

ব্রজজ্যাঠার কথা মনে পড়লে—কত বিচিত্র কাহিনী যে মনে পড়ে! ব্রজজ্যাঠা সেকালে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি গোঁফ রাখতেন, দেখতে ছিলেন সুশ্রী মানুষ, কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট। গান গাইতে পারতেন। ছুটিছাটায় বাড়ী এসে গ্রামের পথে বেরিয়েই গান ধরতেন—"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।" গান শেষ করতেন আমাদের বৈঠকখানার দরজায়। ঘরে ঢুকেই ডাকতেন—ভাই কানাই! ভাই হরাই! আমার বাবার নাম ছিল—

হরিদাস, তাঁকে আদর ক'রে ডাকতেন—হরাই।

বিচিত্র মানুষ। পেন্সন নেবার পর একবার বর্ধমান গিয়েছিলেন—বর্ধমানে মেডিকেল স্কুলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। পেন্সন বিক্রীর অভিপ্রায় ছিল। গিয়ে উঠেছিলেন আমাদেরই গ্রামের শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাসায়। তিনি ছিলেন তখন বর্ধমানের পুলিস কর্মচারী। নিত্যগোপালবাবুর কথা পরে বলব। এখানে শুধু এইটুকু বলব যে, এই মানুষটি ছিলেন যেমন রূপবান, তেমনি সুকণ্ঠ গায়ক; যেমন উঁচু মেজাজের লোক, তেমনিই ছিলেন জনপ্রিয়। ব্রজবাবুকে পেয়ে গোপালবাবু কৃতার্থ হয়ে দু-একদিন বেশী রাখতে চেয়েছিলেন। ব্রজজ্যাঠা কিন্তু কিছুতেই থাকবেন না। রসিক মানুষ, শেষ পর্যন্ত বললেন—গোপাল, আমি তা হ'লে ক্ষেপে যাব। বাড়ীতে বুড়ী আছে, তার জন্যে আমার মন কেমন করছে। আমি আর থাকতে পারি? ধরে রাখলে গোবধ ব্রহ্মবধ হবে রে ছোঁড়া। তার পাপ তোকে অর্শাবে।

অবশেষে গোপালবাবু কৌশল অবলম্বন করলেন। ব্রজজ্যাঠার জুতো জোড়াটি সরিয়ে রাখলেন। ব্রজজ্যাঠা জুতো না পেয়ে শেষে ধপাস ক'রে ব'সে প'ড়ে মাথায় হাত দিয়ে বললেন—আমার সর্বনাশ হ'ল রে গোপাল, সর্বনাশ হ'ল।

গোপালবাবু বললেন, এক জোড়া জুতোতে আপনার সর্বনাশ হ'ল?

—ওরে ভাই, তুই জানিস না। জুতো জোড়া আমার নয়—শম্ভুর জুতো আমি চেয়ে নিয়ে এসেছি ভাই। আঃ, শেষ পর্যন্ত ললাটে কি আছে তা বুঝতে পারছি না আমি। হায়-হায়-হায়। আমি এখন করব কি?

—কি করবেন? আমার বাড়ী থেকে জুতো গিয়েছে—আমি কিনে দোব।

—ওরে শম্ভুকে জানিস না রে, শম্ভুকে জানিস না তুই।

শম্ভু সরকার দুর্দান্ত ক্রোধী লোক, গোপালবাবুরই বয়সী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। লেখাপড়া বিশেষ করেন নাই—প্রচণ্ড শক্তিশালী মানুষ তার উপর দুর্দান্ত ক্রোধী—গোপালবাবুর বয়সী এবং বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীনকালের তন্ত্রমন্ত্রের অন্ধ ভক্ত; গ্রামের লোকে তাঁর ভয়ে ত্রস্ত।

গোপালবাবু হেসে বললেন— আমি সে জোড়ার চেয়ে দামী ভাল জুতো কিনে দেব দাদা।

এবার ব্রজজ্যাঠা কেঁদে ফেলে বললেন, ওরে শম্ভুকে তুই জানিস না গোপাল, সে যদি বলে—আমার সেই জোড়াটির চেয়ে ভাল জুতো আর হয় না, আমার সেই জোড়াটিই চাই?

তৎক্ষণাৎ গোপালবাবুকে জুতো বের ক'রে দিতে হ'ল।

এর অনেক দিনের পরে—আর একটি ঘটনা বলি। ব্রজজ্যাঠার তখন শরীর ভেঙেছে, আমার বাবার অনেক দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে। আড্ডা নাই। ব্রজজ্যাঠা তাঁর পাড়ার কাছাকাছি এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় বসেন। লোকজন থাকলেও বসেন, কেউ না থাকলেও এসে বারান্দায় বেঞ্চে ব'সে থাকেন। যাঁর বৈঠকখানা তিনি জীবনে কৃতী ব্যক্তি, ধনী মানুষ। কিন্তু আকস্মিক পত্নী-বিয়োগে অহরহ মদ্যপান ক'রে হয় প'ড়ে থাকেন, নয় প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের সঙ্গে বৈষয়িক কর্তৃত্ব নিয়ে প্রচণ্ড কলহ করেন। ছেলে কলেজে তখন

বি. এ. পড়ে। ঘটনার দিন সকালবেলা থেকেই পিতাপুত্রে বাদানুবাদ চলছিল। সকালে পিতা অনেকখানি প্রকৃতিস্থ ছিলেন, ছেলের প্রতিবাদের উত্তরে যুক্তিপূর্ণ কিছু বলতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়েই বেরিয়ে চ'লে গেলেন। ছেলে বেঞ্চে ব'সেই রইল। তারপর সেও উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান ক'রে বাপ ফিরে এলেন। দেখলেন বেঞ্চে ছেলে ব'সে রয়েছে। তিনি কিন্তু ছেলে নন, তিনি আমার ব্রজজ্যাঠা। ভদ্রলোকের ছেলে উঠে যাবার পর তিনি এসে চুপ ক'রে একলাটিই ব'সে আছেন। ক্রোধে মদ্যপানে আত্মহারা ভদ্রলোক একেবারে জুতো খুলেই ছেলে ভ্রমে ব্রজজ্যাঠাকেই প্রহার করতে শুরু করলেন, তবে রে ব্যাটা হারামজাদ, তবে রে নচ্ছার—

ব্রজজ্যাঠা কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর হাত তুলে নিজের দাড়ি দেখিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, ও অমুক—আমি, ওরে আমার পাকাদাড়ি! ওরে, তোর অপরাধ হবে!

ভদ্রলোক দাড়ি দেখেই থেমেছিলেন। তার পরই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। ব্রজজ্যাঠা তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন ভদ্রলোকের মৃতা পত্নীর নাম ধ'রে—আঃ, তুই এ কি ক'রে গেলি মা! হায়-হায়-হায়! সোনার মানুষ, এ কি হয়ে গেল—তোর বিহনে!

ব্রজজ্যাঠা বাংলা দেশের পোস্টাপিসের কাজে যেখানে যেখানে গিয়েছিলেন সেখানকার খাওয়া-দাওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের গল্প বলতেন। মানকরের কদমা, দুবরাজপুরের বাতাসা, সিউড়ির মোরব্বা, কাঁদির মনোহরা, জয়নগরের মোয়া, গুপ্তিপাড়ার মণ্ডার গল্প ছেলেবেলায় ব্রজজ্যাঠার মুখেই শুনেছিলাম। দুধ দই ঘি মাছ মাংস ইত্যাদির দর পর্যন্ত মুখস্থ ছিল তাঁর। শুধু তাই নয়, কোথায় কোন্ সাধুর কত বড় জটা দেখেছেন, কোন মিঞা সাহেবের কত লম্বা দাড়ি দেখেছেন, কোন্ জমিদারের বাড়ীতে কত বড় ও কত ভয়ালদর্শন কুকুর দেখেছেন সেগুলি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতেন।

কেদার চাটুজ্জেও গল্প বলতেন। ইনি ছিলেন আমাদের গ্রামের জামাই। ঘরজামাই ছিলেন না, তবে তাঁর নিজের পৈতৃক ভিটা গুপ্তিপাড়ার সঙ্গেও সম্ভবত বিশেষ সংস্রব ছিল না। ইংরাজী-জানা মানুষ, সরকারী আবগারী বিভাগের সাবইনস্পেক্টর ছিলেন এবং নিজেও ছিলেন আবগারী বিভাগের একজন সত্যকার পৃষ্ঠপোষক। অতিরিক্ত মদ্যপান ক'রে কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্যই মধ্যে মধ্যে সস্‌পেণ্ড হতেন। সস্‌পেণ্ড হ'লেই লাভপুরে এসে উঠতেন। শ্বশুরও ছিলেন সেকালের তান্ত্রিক। ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকড়া দাড়ি-গোঁফ; মুখে বিচিত্র শব্দ করতে পারতেন—বাঁশীর শব্দ, জন্তু-জানোয়ারের শব্দ; মন্ত্রতন্ত্র জানতেন, কুকুর কামড়ালে বিষ ঝাড়তেন, সাপের বিষের মন্ত্র জানতেন, চব্বিশ ঘণ্টাই নাকের একটা রন্ধ্রে একটা পাথর রেখে এক রন্ধ্রেই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতেন। সমস্ত দিনই প্রায় একটা গাইয়ের দড়ি ধ'রে তাকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। জামাইয়ের সঙ্গে খুব বনাবনতি হ'ত না শ্বশুরের। উভয়ে প্রায় সমবয়সীই ছিলেন। জামাই এসে শ্বশুরবাড়ীতে উঠলেও খাওয়ার সময় এবং শোবার সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকী সময়টা থাকতেন আমার বাবার আড্ডায়। তাঁর ছিল বড়

বড় গল্প। রাজা উজীর আমীর ওমরার কথা। লোকে বিরক্ত হ'লেও কিছু বলত না। অমুক দাদা কি অমুক কাকার জামাই, তাকে কি কখনও কিছু বলা যায়! সেকালের সমাজের এই ছিল প্রথা। জামাই, বিশেষ কুলীন ঘরের জামাই, তার সব দোষ শত ঔদ্ধত্যও ছিল মার্জনীয়।

আর প্রায়ই আসতেন সাধু সন্ন্যাসীর দল। গ্রামে আমাদের একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ ব'লে খ্যাত ফুল্লরা দেবীর স্থান পবিত্র তীর্থ, শাক্ত সাধু সন্ন্যাসী প্রতিদিনই দু-চারজন আসতেন যেতেন।

দু-একজন কিছু দিন ধ'রেই থাকতেন। কেউ সাধনা করতেন, কেউ দিন গুজরান করতেন দেবস্থলের প্রসাদান্নে। এঁদের মধ্যে আসতেন পর্যটক সাধুর দল। ফুল্লরা মহাপীঠে তাঁরা এলে আমাদের তারামায়ের আশ্রমে রামজী বাবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ত। বাবারও খ্যাতি ছিল সাধুপ্রীতির এবং শাস্ত্র আলোচনার, সেই হেতু তাঁরা আসতেন আমাদের বৈঠকখানায়। বাবা সাধুভোজন করাতেন। পশ্চিমদেশীয় সাধুরা আমাদের বাড়ির আতিথ্যে সত্য সত্যই পরম পরিতৃপ্ত হতেন। তার কারণ পশ্চিম-প্রবাসী বাড়ির কন্যা আমার মা তাঁদের ছাতুভরা রুটি তৈরী ক'রে অতিথি সৎকার করতেন। পরম উপাদেয় খাদ্য; ছাতুখোর ব'লে যাঁরা পশ্চিম-দেশীয়দের ব্যঙ্গ করতেন সেকালে—তাঁরাও এই ছাতুভরা রুটি খেয়ে বলতেন—ভাই হরিবাবু, আর একদিন ছাতুভরা রুটি খাওয়াতে হবে।

এই সাধুরা করতেন দুর্গম তীর্থস্থলের গল্প।

তাঁদের মুখেই ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, লছমনঝোলার দড়ির সাঁকোর কথা। মনে আছে শিশু-কল্পনাতেই দেখেছিলাম দুদিকে খাড়া পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে গাছপালা, দুই খাড়া পাহাড়ের মধ্যে অনেক নিচে গঙ্গা ব'য়ে চলেছে প্রচণ্ড বেগে, সেই প্রচণ্ড বেগে—যে বেগে ইন্দ্রের ঐরাবৎ গিয়েছিল ভেসে। আর তার উপরে দড়ির পুল, দুখানা পাশাপাশি দড়িতে কাঠের টুকরো লাগানো, মাথার উপরে আর দুটো দড়ি, দড়ি ধরে দড়িতে বাঁধা কাঠে পা দিয়ে চলতে গেলে দোলে, মানুষের মাথা ঘোরে। হাতের মুঠি খুলে গেলে পা ফসকে গেল; মানুষ পড়ছে মাথা নিচু ক'রে নিচে, নিচে আরও নিচে, তারপর আর দেখা গেল না। শরীর শিউরে উঠত। বলতেন বদরীনারায়ণের কথা, কেদারনাথের যোশীমঠের কথা, মানস-সরোবরের কথা। জ্বালামুখী কামাখ্যা-তীর্থের কথা।

পুজোর পর মাস দুয়েকের মধ্যে আসতেন অনেক গায়ক। কাপড়ের খোলে সযত্নে ঢাকা তানপুরা বগলে নিয়ে এসে উঠতেন। তাঁদের কারুর কাছে শুনেছিলাম, তানসেনের গল্প। শুনেছিলাম, আকবরশাহ একদা তানসেনের প্রতিপক্ষের মুখে দীপকরাগ শুনে চমৎকৃত হলেন—গানের মহিমায় সামাদান ঝাড়ে বাতি জ্ব'লে উঠল। প্রতিপক্ষ সুযোগ পেয়ে বললেন—তানসেন যদি দীপক গায়, তবে আগুন জ্ব'লে উঠবে দাউ দাউ ক'রে। বাদশা ধরলেন তানসেনকে। তানসেন প্রথমে রাজী হন নি, অবশেষে বাধ্য হয়ে রাজী হলেন। গাইলেন দীপক এবং আগুন জ্বলল, তাতেই তিনি পুড়ে গেলেন। যাদের মল্লার

গেয়ে মেঘ এনে বর্ষণ করাবার কথা ছিল, তারা তো তানসেনের মত সঙ্গীতসিদ্ধ ছিলেন না—কাজেই তাঁরা পারলেন না মেঘ এনে তাকে গলিয়ে বর্ষণ নামাতে। যে গায়কেরা আসতেন, গ্রামের প্রতিষ্ঠাবানদের বাড়ীতে তাঁদের বাৎসরিক বৃত্তি ছিল। কোথাও এক টাকা, কোথাও দু টাকা, কোথাও বা চার টাকা। অনেক বিত্তক্ষ প্রতিষ্ঠাবান বংশের ঘরে—চার আনা আট আনা হিসাবে বৃত্তি পেতেন। গান শোনাতেন, গল্প শোনাতেন। পুরানো কালের গায়কদের গল্প, নূতন কালের গায়কদের গল্প। অনেক সেতারী আসতেন।

মধ্যে মধ্যে জ্যোতিষী আসতেন। দেশের জ্যোতিষী। বিদেশের অপরিচিত জ্যোতিষী। এঁদের কাছেও গল্প শুনেছি। দুটো একটা গল্প মনে রয়েছে।

এক ছিলেন অভ্রান্ত জ্যোতিষী। তাঁর যেমন সূক্ষ্ম গণনা, তেমনই ছিল নির্ভুল বিচার। তাঁর এক কন্যা হল পরমাসুন্দরী। কন্যার অদৃষ্ট গণনা ক'রে দেখলেন—অদৃষ্টে রয়েছে বাসর-বৈধব্যের যোগ।

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। অনেক ভেবে কঠিন সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটি যুগের ক্ষণ লগ্ন গণনা ক'রে এমনই একটি দিন ও লগ্ন আবিষ্কার করলেন, যে লগ্নের এক অতি দুর্লভ গ্রহসমাবেশের ফলে এক অমৃতময় বিবাহযোগের সৃষ্টি হয়েছে। এমন পুণ্য লগ্ন বহু বর্ষ পরে আসে। যুগে একবার আসে। এ লগ্নে বিবাহ হ'লে বৈধব্য হতে পারে না। তিনি সেই লগ্নে বিবাহ দিয়ে বিধিলিপি খণ্ডন করবেন স্থির করলেন। নিজে বালিঘড়ি ধ'রে লগ্ন নির্ণয়ের জন্য বসলেন। ক্ষণ গণনা ক'রে চলেছেন, পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন বিবাহসজ্জায় সজ্জিতা কন্যা; মধ্যে মধ্যে নূতন আভরণগুলি নাড়ছেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী, তাঁর কন্যার বিবাহ; কত রাজা কত ধনী কত মহাজন আভরণ যৌতুক দিয়েছেন, মণি-মুক্তার আভরণ, তাতে বিভূষিতা হয়ে মেয়েটির আনন্দ হয়েছে প্রচুর, সেকথা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ মেয়েটি চকিত হয়ে ব'লে উঠল—যাঃ! তার গলার একটি মালা ছিঁড়ে গেছে। ঝরঝর ক'রে খ'সে প'ড়ে গেল মুক্তাগুলি। জ্যোতিষী চকিতের জন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। বালির পাত্রের দিকে চেয়ে রইলেন। ঝুরঝুর ক'রে বালি ঝ'রে পড়ছে। তিনি বললেন, যাক। যেতে দাও।

লগ্ন এল, বিবাহ আরম্ভ হ'ল।

জ্যোতিষী কঠিন হেসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিধাতাকে বলতে চাইলেন, তোমার বিধান লঙ্ঘিত হবে, এর জন্য অপরাধী আমাকে ক'রো না। অপরাধ আমার নয়। যে বিদ্যা তোমার মানসকন্যা, অপরাধ যদি হয়—অপরাধ তার। এ তারই প্রসাদ।

কিন্তু ও কথা বলা হয় না তাঁর। আকাশের দিকে তাকিয়েই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ কি? আকাশে কোটী কোটী নক্ষত্র ঝলমল করছে, তারই মধ্যে তাঁর দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে গ্রহ-নক্ষত্র-সংস্থানের অবস্থা; যেমন নাকি সমুদ্রতটের অসংখ্য শুক্তির মধ্যে মণিকার চিনতে পারে কোন্‌টি কোন্‌টি মুক্তাগর্ভ শুক্তি। ওই বৃষ, ওই মিথুন। কিন্তু যে লগ্ন তিনি গণনা করেছেন তাতে চন্দ্রের তো এই রাশিতে অবস্থানের কথা নয়। এ সংস্থান তো সে লগ্নের

পরবর্তী কালের অবস্থান। পাগলের মত ছুটে গেলেন বালিঘড়ির কাছে। কি হ'ল? দেখলেন, বালু নির্গমনের নালিকার মধ্যে আশ্চর্যভাবে তখনও একটি মুক্তার অর্ধাংশ আটকে রয়েছে। বুঝলেন, তিনি যে মুহূর্তে চকিতের জন্য ফিরে তাকিয়েছিলেন—সেই মুহূর্তে একটি মুক্তা ভেঙে তারই আধখানা লাফিয়ে গিয়ে পড়েছে ওই নালিকার মধ্যে এবং আংশিকভাবে পথ রুদ্ধ ক'রে আটকে রয়েছে। তারই ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পরিমিত বালুটুকু শেষ হতে অনেক বেশী সময় লেগেছে। লগ্ন সেই অবসরে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাঁকে উপহাস ক'রে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পণ্ডিত প্রণাম করলেন নিয়তিকে। মনে মনে বললেন—আমার দম্ভকে ক্ষমা ক'রো। তুমি মহাশক্তি, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ করবার জন্য তুমি দশমহাবিদ্যার রূপ ধ'রে দেবাদিদেব মহাদেব মহাকালকে পরাভূত ক'রে আপনার পথে চ'লে যাও! মনে ছিল না আমার। ক্ষমা ক'রো আমাকে।

আর একটা গল্প—

এমনই আর এক জ্যোতিষী ছিলেন।

একদা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এক কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ। বললেন—শুনেছি নাকি তোমার গণনা অভ্রান্ত! তোমার দৃষ্টির সম্মুখে অহরহ নাকি গ্রহসংস্থান দৃশ্যমান রয়েছে? কোন গ্রহেরই নাকি সাধ্য নাই তোমার দৃষ্টির বাইরে যেতে?

জ্যোতিষী হাসলেন,—বললেন—গুরুর প্রসাদ এবং দেবী সরস্বতীর বর। কৃতিত্ব আমার নয়।

—ভাল। আমিও সামান্য চর্চা করি এই বিদ্যার। কিন্তু আমি কোন মতেই আজ ছায়াগর্ভসম্ভূত সূর্যতনয় মহাগ্রহের অবস্থান নির্ণয় করতে পারছি না। বল তো পণ্ডিত, শনি-গ্রহের অবস্থিতি এখন কোথায়?

পণ্ডিত খড়ি তুলে নিয়ে ছক এঁকে, সামান্য গণনা ক'রেই পিছন ফিরে আগন্তুকের দিকে তর্জনী নির্দেশ ক'রে বললেন—এইখানে তাঁর অবস্থিতি।

মুহূর্তে তাঁর তর্জনীটি জ্ব'লে উঠে ভস্ম হয়ে প'ড়ে গেল। অট্টহাস্যে সাধুবাদ উঠল, সাধু—সাধু—সাধু! আগন্তুক কৃষ্ণ বিদ্যুতের মত দীপ্তিতে চারিদিক উদ্ভাসিত ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

একবার এক জ্যোতিষী এসেছিলেন। বিদেশী অজ্ঞাতকুলশীল জ্যোতিষী। এসেই গ্রাম তোলপাড় ক'রে দিলেন। যিনি এলেন তাঁকেই তাঁর নাম ধ'রে ডাকলেন, এস অমুকবাবু, কি অমুকচন্দ্র, এস বাবা! তারপর বলতে লাগলেন তাঁর জীবনকথা। যেন গড় গড় ক'রে প'ড়ে যাচ্ছেন তার জীবনের খাতা। তিনি প্রথমে এসে উঠেছিলেন যাদবলালবাবুর ঠাকুর-বাড়ীতে। এক বেলার পর আমার বাবার সঙ্গে আলাপ হতেই এসে উঠলেন আমাদের বাড়ী। আমার বাবাকে বললেন—তুমি আমার পূর্বজন্মের পিতা। তারপর আমাদের বৈঠকখানা একেবারে জনসমাগমে ভ'রে গেল। অদ্ভুত জ্যোতিষী। যে কোন আগন্তুক

এলেন—তাঁর অভ্রান্ত পরিচয় এবং জীবনকথা ব'লে গেলেন। তারপর ভবিষ্যদ্বাণী। কারও অম্লশূলের ব্যাধি, তাকে বললেন—তোমার পেটে তিনটি বিচিত্র অন্ন আছে—একটির বর্ণ লাল, একটির নীল, অপরটি কালো। মাদুলি দিলেন। সবশেষে যাদবলালবাবুর বড় দৌহিত্র সম্পর্কে বললেন—সামনে কঠিন ফাঁড়া, মৃত্যুযোগ। শান্তির ব্যবস্থা হ'ল। তন্ত্রমতে কালীপূজা ক'রে শনিগ্রহের শান্তি। কৃষ্ণবর্ণ ছাগ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, কৃষ্ণবর্ণ গাইয়ের দুধের ঘি, এ ছাড়া নীলা স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি অনেক আয়োজন। গভীর রাত্রে পূজার ব্যবস্থা গ্রামপ্রান্তে নির্জনে। পূজা আরম্ভ হ'ল। শুধু দেবী এবং সাধক ছাড়া কেউ রইল না। রাত্রির শেষ প্রহরে দেখা গেল মাটির দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন, আয়োজনসহ সাধক অন্তর্হিত। এ সত্ত্বেও সেকালের অনেকে বলেছিল—পূজা শেষ ক'রে সাধক স্বস্থানে চ'লে গেছেন। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ ছাগটা চীৎকার ক'রে বললে—উ-হু—উ-হু।

আরও আসত লাঠিয়াল। প্রকাশ্য পেশায় লাঠিয়াল। গোপন পেশায় ডাকাত। এরাও বৃত্তি পেত। বৃত্তি ছাড়াও মধ্যে মধ্যে আসত, অভাব অভিযোগ থাকলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসত পুলিসের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। কিন্তু একটা বিশেষত্ব ছিল। পুলিসের অভিযোগ সত্য হ'লে সে ক্ষেত্রে তারা আসত না। যে ক্ষেত্রে অভিযোগ মিথ্যা, সে ক্ষেত্রেই তারা আসত। বলত—মিছে লাঞ্ছনা হবে হুজুর!

আবার নিজেদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকলে এদের ডাকা হ'ত। এরা আসত কাপড় গামছা লাঠি নিয়ে। কাজ ক'রে বকশিশ নিয়ে চ'লে যেত।

এরই মধ্যে গল্প করত। ডাকাতির গল্প। দাঙ্গার গল্প। শিউরে উঠত মানুষ সে সব গল্প শুনে। আমার রাত্রে ঘুম হ'ত না আতঙ্কে, তবু শুনতাম সেই সব গল্প। মনে আছে পোড়া সেখের ডাকাতির সব গল্প। পোড়া সেখ ছিল দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল, তেমনি প্রকৃতিতেও ছিল নিষ্ঠুর। ও অঞ্চলে তার জুড়ি ছিল না। ময়ূরাক্ষীর ওপারে অবশ্য ভল্লারা ছিল। তারা আজও আছে। এই অর্ধাহার অনাহারের দিনেও তাদের মধ্যে বীর্যবান আছে। জাতিতে অবশ্য ভল্লা নয়—তারাচরণ হাড়ি আজও আছে, ওই ওদেরই অঞ্চলের ওদেরই শিক্ষায় সে গ'ড়ে উঠেছে; তারাচরণ—বীর তারাচরণ। অল্পদিন আগেই ১৩৫০ সালেই আমাদের ও-অঞ্চলে একটা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়ে গেছে। দোষ কার—সে সঠিক জানি না, তবে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল দলবদ্ধ হয়ে মুসলমানেরাই। অঞ্চলও মুসলমানপ্রধান। বীরভূম-মুরশিদাবাদের ওই সীমান্তটিতে মুসলমান প্রায় শতকরা সত্তরের বেশীই হবে—কম হবে না। হিন্দুদের গ্রামে তখন খাওয়াদাওয়া হচ্ছে। আক্রমণ সেই অবস্থায়। তারাচরণ ছিল সে দিন সে গ্রামে। একা তারাচরণই দাঁড়িয়েছিল লাঠি হাতে। ক্রমে পাশে অবশ্য লোক জমল কিছু। কিন্তু সে প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক কম। তবুও তারাচরণ তাদের গ্রামে প্রবেশ করতে দেয় নি। তারাচরণের কথা থাক্। পোড়া সেখের কথা বলি। পোড়া সেখ দেশ ছেড়ে ফেরার হয়েছিল। গিয়ে পড়েছিল এমন অঞ্চলে, যে অঞ্চলে পাঞ্জাবী ডাকাতের প্রাদুর্ভাব এবং সাহেবসুবোর কুঠি ছিল। আজ মনে হয় রাণীগঞ্জের

কলিয়ারী অঞ্চল হবে। পোড়া সেখ নাকি (পোড়াকে আমি দেখি নি) সেই পাঞ্জাবীদের দলে মিশে সাহেবদের কুঠি লুঠতে গিয়েছিল। সে বলত—হ্যাঁ, মরদ বটে! সাহস বটে পাঞ্জাবীদের! আমি তাদের ফুঁয়ে উড়ে যাবার যুগ্যি! তবু আমার খেলা দেখে তারা সঙ্গে নিয়েছিল। বলত—অন্ধকার রাত্রি, দু'পহর পার হয়েছে—আকাশে মেঘ। আ—আ—আ শব্দ ক'রে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল সব—বাঘের মত। ওদিকে কুঠির বারান্দা থেকে ছুটতে লাগল গুলি। হামাগুড়ি দিয়ে চলল। চারিদিকের দরজায় কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল। ভাঙল দরজা। সাহেবের বন্দুক চলছে, মেম গুলি ভরছে। কিন্তু চারপাশের দরজা ভাঙলে সে কি করবে? সাহেবকে কেটেছিল তারা। পোড়া বলত—আমি ছিলাম বাইরে, ফাঁক পেয়ে গেলাম ভেতরে ছুটে। এক জায়গায় দেখলাম, ছোট একটা সাহেবের মেয়ে, কানে মাকড়ী, প'ড়ে আছে ভয়ে বেহুঁশ হয়ে। খুলে নিতে সময় লাগবে, নিলাম পট্‌ পট্‌ ক'রে ছিঁড়ে।

অসংখ্য ডাকাতির গল্প।

মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে উনান জ্বেলে কড়া চড়িয়ে তেল গরম ক'রে সেই তেল গায়ে ঢেলে দিত। কত সময় মানুষকে বেঁধে সেই তপ্ত কড়ায় বসিয়ে দিত। জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পিটত। মানুষের গলা আধখানা বা দু'-ফাঁক ক'রে দিয়ে যেত। শড়কিতে গেঁথে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দিত।

কত রাত্রি বাল্যকালে আতঙ্কে বিনিদ্র কাটিয়েছি—তার হিসাব নাই। মধ্যে মধ্যে এক-একটা সময় আসত, যখন দু-তিন মাসের মধ্যে তিন-চার ক্রোশের ভিতর চার-পাঁচটা ডাকাতি হয়ে যেত। শৈশবের একটা স্মৃতি মধ্যে মধ্যে আজও মনে পড়ে। অন্ধকার রাত্রি, কাঁচা ধানভরা মাঠ, আর সেই মাঠের মধ্যে সঞ্চরমাণ কয়েকটা আলো দেখলেই মনে প'ড়ে যায় সে স্মৃতি।

সম্ভবত আশ্বিন মাস। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, পিসিমা উঠে বসেছেন, জানালা খুলেছেন, সভয়ে ডাকছেন—বউ—বউ—বউ!

মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—ছাদে যাচ্ছি আমি।

আমি তখনও কিছু বুঝি নি। এই মুহূর্তে একটা তীব্র আর্তকণ্ঠের চীৎকার কানে এসে ঢুকল। উঃ, সে কি চীৎকার! বজ্রপাতের চীৎকারে স্তম্ভিত অভিভূত হয়ে যায় মানুষ, মরবার হ'লে ম'রে যায় এক মুহূর্তে; কিন্তু এ চীৎকার যেন মানুষের শ্বাস রোধ ক'রে দেয় নিদারুণ আতঙ্কে। আকাশ চিরে গেল, বাতাসের পাথারে মাথা কুটে আছড়ে পড়ল সে চীৎকার। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভেঙে গেল। সে চীৎকারে ভয়ে কেঁদে উঠেছিলাম আমি। আমাদের বাড়ীর জানালা দিয়ে তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়, গ্রামের দক্ষিণ মাঠ নিম্নচের জোল। সেই জোলের উপরে জমাট অন্ধকার থরথর ক'রে কাঁপছে। আলো—অনেক আলোয় ভ'রে যাচ্ছে—বিচ্ছিন্ন আলো সব ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পর উঠল চীৎকার। মানুষের এমন প্রাণ-ফাটানো আর্তস্বর আর শুনি নাই।

পরে শুনেছি সে চীৎকারে ভাষা ছিল—জান বাঁচাও। জান বাঁ-চা-ও!

আমাদের গ্রামের সিকি মাইল দক্ষিণে সিউড়ি থেকে কাটোয়া যাবার পাকা সড়ক চ'লে গেছে, সেই সড়ক দিয়ে—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চ'লে গেল সেই আর্তনাদ। জান বাঁ-চা-ও! বিপন্ন প্রাণের সেই ভয়—সেই আকুতি এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে যে ঘরে ঘরে মানুষ থরথর ক'রে কাঁপল। বুকের ভিতরটা চড়চড় ক'রে উঠল, গলা শুকিয়ে গেল। আবার তার জান বাঁচাবার জন্য মানুষ দলে দলে আলো হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি তখন গ্রামের পক্ষে বেশী হ'লেও আমাদের গ্রামের পক্ষে, বিশেষ ক'রে আমাদের বাড়ির পক্ষে, বেশী নয়। রাত্রি এগারটা সবে বেজেছে। বাবার মজলিস পুরোদমে চলেছে। মা তখনও জেগে।

ছুটল মানুষ। কিন্তু দিগ্বিদিকজ্ঞানহীন ভয়ার্ত হতভাগ্য সামনের পাকা রাস্তা ধ'রেই ছুটে চলেছে—ছুটেই চলেছে। নিতান্ত হতভাগ্য, গ্রাম ঠাওর করতে পারে নি। পাশের দু-চারটে ঘন জঙ্গল গেছে, আশ্রয় নিতে সাহস করে নি। সামনেই ছুটে চলেছে। পিছনে তার ছুটে আসছে মৃত্যুদূতের মত পরস্বাপহরী ঠ্যাঙাড়ে; আমরা বলি 'মান্‌মুড়ে'। আজ মনে হয়, মানুষ বাঘের মুখে সাপের মুখে তত ভয় পায় না, যত ভয় পায় হত্যাভিপ্রায়ে হিংস্র মানুষকে দেখে। তারই মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে বোধ হয় মৃত্যুর ভয়ালতম রূপ। আক্রান্ত মানুষটির পিছনে ছিল ওই ভয়ালতম রূপ; তাই উন্মাদের মতই সে সামনে ছুটে চলেছিল। হতভাগ্য ভাবতে পারে নি, নিয়তি নদীর রূপ নিয়ে রোধ ক'রে দাঁড়াবে। সামনে ছিল নদী। আমাদের গ্রামের দেড় মাইল দূরে কুয়ে নদীর ঘাট—সেই ঘাটে সড়কে ছেদ পড়েছে। দিনে খেয়া চলে, রাত্রে জনহীন ঘাট। সেই ঘাটের উপরে উঠল আর একটা মর্মান্তিক চীৎকার। তারপর সব স্তব্ধ। সকলে ছুটে গেল।—ভয় নাই—ভয় নাই! গিয়ে দেখলে জনহীন ঘাট, ঘাটের উপরে খানিকটা রক্তচিহ্ন। আর কিছু নাই। অনেক খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। শুধু দূরে ধানভরা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে সঞ্চরমাণ ছায়ামূর্তির মত কয়েকটি কিছু যেন কেউ কেউ দেখেছিল। কিন্তু তারা ভয়ার্ত নয়, আলোর আশ্বাস তারা চায় না, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কোথায় সেই বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রে, খুঁজে পাওয়া গেল না। পরের দিন পাওয়া গেল—নদীর ঘাটের খানিকটা পাশে—দহের বুকে ঝুঁকে-পড়া একটা শ্যাওড়া গাছের মধ্যে একটি বিদেশী মুসলমানের মৃতদেহ।

পরে প্রকাশ পেল ঘটনাটি।

'বাম্‌নিগ্রাম' বহুকাল থেকে একদল 'মান্‌মুড়ে' মুসলমানদের জন্য কুখ্যাত। এ কাণ্ড তাদেরই। বিদেশী মুসলমানটি গরু বা মহিষ কিনতে এসেছিল পাঁচুন্দির হাটে। কাটোয়ার কাছে পাঁচুন্দি, কিন্তু তখন ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া-বারহারোয়া লাইন হয় নি। পাঁচুন্দি যাবার রাস্তা ছিল—লুপলাইনের আমেদপুর স্টেশনে নেমে ওই পাকা সড়ক। এই পাকা সড়কে আমেদপুর ও লাভপুরের মধ্যে এই বাম্‌নিগ্রাম। আমেদপুর হয়ে আগয়া নদীর ব্রীজ থেকে প্রায় তিন মাইল ব্যাপী প্রান্তর। মধ্যস্থলে সুঁদীপুরের বটতলা, ঝুরি-নামা শিকড়ে বিশ-পঁচিশটি কাণ্ড

সৃষ্টি হয়েছে, সে এক ঘন জঙ্গলে ঘেরা ঠাঁই। দিনে সূর্যের আলো পড়ত না। সুঁদীপুরের বটতলার উল্লেখ আমার রচনায় আছে, "ডাকহরকরা" গল্পে, "হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়" ও 'তামস-তপস্যা'য় আছে মনে পড়ছে। এই বটতলায় তারা রাত্রে পথিকের প্রতীক্ষা করত। বাঁশের খাটো লাঠি—মাটি ঘেঁষে সুকৌশল নিক্ষেপে প্রচণ্ড বেগে ছুটে পথিকের পায়ে আঘাত করত, পথিক প'ড়ে যেত। এরা ছুটে এসেই একটা লাঠি তার গলায় বা ঘাড়ে দিয়ে দুই প্রান্তে পা দিয়ে চেপে ধরত, অন্য একজন দুজন পায়ে ধ'রে মানুষটাকে উল্টে দিত, মট্‌ শব্দ ক'রে ভেঙে যেত ঘাড়ের মেরুদণ্ডটা। তারপর অনুসন্ধান করত, তার কাছে কি আছে! এমনও শোনা গেছে যে, একজন মানুষকে হত্যা ক'রে পেয়েছে হয়তো চারটে পয়সা, আর তার পরনের জীর্ণ কাপড়খানা।

এই বিদেশী মুসলমানটিকে আমেদপুর থেকে—এই দলের একজন অপরাহ্ণে ভুলিয়ে তার গাড়িতে নিজের বাড়ি এনে তুলেছিল। স্বজাতি হিসাবে বিশ্বাস করেছিল সে। কিন্তু সন্ধ্যার পর লোকটি বুঝতে পেরেছিল এদের অভিপ্রায়। তাই এক সময়ে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে প্রাণভয়ে ছুটেছিল। কিছুক্ষণ পর ষড়যন্ত্রীরা পালানোর কথা জানতে পেরে মুখের শিকার ফসকানো হিংস্র পশুর মত ছুটেছিল তার পিছনে পিছনে। দুরন্ত মৃত্যুভয়ে হতভাগ্য সামনে দুখানা গ্রাম পেয়েও তাতে ঢোকে নি। হয়তো গ্রাম ব'লে বুঝতে পারে নি। অথবা মানুষকেই আর বিশ্বাস করে নি। সেদিন সে মুহূর্তে কার উদ্দেশে সে এমন ক'রে জান বাঁচানোর আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিল—সে-ই জানে।

মানুষুড়ে মুসলমান দলটি আজ আর নাই। তাদের বংশই শেষ হয়ে গেছে। শুধু বামনি-গ্রামেরই নয়, আরও কয়েকখানা গ্রামের এ অপবাদ ছিল। আমাদের গ্রামের উত্তর-পূর্বে মাইল চারেক দূরে ধনডাঙার হিন্দুদের এ অপবাদ ছিল। মাইল আষ্টেক দূরে দাশকল গ্রামে হিন্দুদের এ দুর্নাম ছিল। শোনা যায়, এইখানে যে ছিল এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক, সে একদিন রাত্রে পথিকভ্রমে হত্যা করেছিল নিজের একমাত্র পুত্রকে। ছেলে চীৎকার ক'রে বলেছিল—বাবা আমি, বাবা। তার দেহখানা ঘুরিয়ে দিতে দিতে বাপ বলেছিল—এ সময়ে সবাই বাবা বলে। আমার "আখড়াইয়ের দীঘি" গল্প এবং "দ্বীপান্তর" নাটকের উদ্ভব এখান থেকেই। ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদওয়ালা বাদশাহী সড়ক এখানেই; সেই সড়কের উপরে গাছতলায় ব'সে এক বৃদ্ধ বীরবংশীর মুখে এই পুত্রহত্যার কাহিনী শুনেছিলাম।

বজরহাট ব'লে একখানি গ্রাম আছে—মুসলমানের গ্রাম। ময়ূরাক্ষীর ওপারে। সেখানেও এই ব্যবসা ছিল। আমি নিজে একবার এই বজরহাট হয়ে যাচ্ছিলাম সাঁইথিয়া। সন্ধ্যার পর। পড়েছিলাম এদের হাতে। আমি ছিলাম বাইসিক্লের আরোহী, আর নিতান্তই ছিল পরমায়ু (এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা যায় না সে দিনের সে বিচিত্র পরিত্রাণকে), তাই বেঁচেছিলাম। সে কথা এখানে নয়।

লাঠিয়াল ডাকাত যারা তারা ঠিক এদের মত ছিল না। খুন তারা সহজে করত না।

তারা এই মানুষ-মারাদের ঘৃণা করত। লাঠিয়ালের প্রকৃতি এবং মানুষুড়ের প্রকৃতিতেও প্রভেদ দেখেছি। লাঠিয়ালরা—ডাকাতরা অনেক ভাল। এদের কাছে গল্প শুনতাম। এমনি এদের কথা ভারি মিষ্টি। বলত—বুঝলেন বাবু, মদ খেছি গাঁয়ে মজলিস ক'রে; একজনা লোক, মাথায় গামছার পাগড়ী, হাতে আলানকাঠি, জাল বুনতে বুনতে এসে বসল; বললে—মদ দেবা খানিক? আমি ধীবর, যাব কুটুমবাড়ি, তা ভাই মদ দেখে ভারি লোভ লেগেছে। তা বললাম—ব'স, খা। খেলে, আলাপ করলে, চ'লে গেল। দু দিন পর এল পিঠে গামছায় বাঁধা পাঁচটা পাকী মদের বোতল আর এক বড় রুইমাছ। বললে—সেদিন তোমরা খাইয়েছ আজ আমি খাওয়াই। বুয়েচেন না, ভারী খুশী হলাম। একদিন খেয়ে গিয়ে যেচে খাওয়াতে এসেছে লোকটা, খুশী হবারই কথা। তা আবার পাকী মদ! বুঝলাম, ধীবর মশায়ের পয়সা আছে। রাত-বিরেতে জাল ফেলে পরের পুকুরে রুই কাতলা ধরেন, পয়সার আর অভাব কি? ব'সে গেলাম খেতে। মাছ ভেজে বেশ আসর ক'রে বসলাম, সেও বসল। বসল কিন্তু নিজের কাজ ভুললে না। খেলে আর জাল বুনলে। গল্প করলে। আবার দিন সাতেক পর এল। তা'পরে বলে—সোনা থাকে তো দাও, কিনব। মানে ডাকাতির মাল। আরও দুদিন এল। মদ মাস, গান খুব জ'মে গেল। তা'পরেতে কথাবার্তা। সোনা দোব ঠিক হ'ল। দিনও ঠিক হ'ল। ঠিক দিনে বুয়েচেন কিনা 'ক্যার্-ক্যার্' ক'রে গোটা গাঁ ঘেরাও। চারিদিকে লালপাগড়ী। আর সেই ধীবর মশায় ভোল পাল্টে গোয়েন্দা দারোগা! ও বাবা! এমন ধীবরের মত জাল বোনা, এমন ঢক ঢক ক'রে পচুই খাওয়া—এ দেখে কি ক'রে বুঝব বলুন যে এ ধীবর নয়? তা আমরাও ঠকেছিলাম। তিনিও ঠকলেন। মাল কোথা পাবে—ঘরে কি থাকে? মাল পোঁতা আমাদের ময়ূরাক্ষীর ধারে, গাছের তলায়। তবু ছাড়ে না। নিয়ে গেল ধ'রে। মারপিঠ, নখে ছুঁচ ফুটানো, অনেক হ'ল। শেষ লোভ। অনেক ভাবলাম, তা'পরে বললাম—চল দেব দেখিয়ে। কিন্তু একা আমার সঙ্গে যেতে হবে। তাই রাজী। পিস্তল ঝুলিয়ে চলল। ময়ূরাক্ষীর বালিতে এনে এক জায়গা বেশ ক'রে খুঁড়লাম। বললাম—এইখানেই তো ছিল। কই? তা—। যা আঁচ করেছিলাম, ঠিক তাই হ'ল। দারোগা মনের আকুলিতে হেঁট হ'ল—"ছিল তো যাবে কোথায়?" ওই যেমন হেঁট হওয়া আর এক ঠেলা পেছন থেকে; মুখ থুবড়ে পড়ল সেই গর্তে। অমনি চাবুলে ধ'রে দিলাম বালি চাপিয়ে। পা দুটো থাকল বেরিয়ে। আমি টেনে দৌড়। তা বেটার ভাগ্যি, পরমায়ু আছে—একটা মেয়েছেলে দেখেছিল, নদীর ধারে ঘাস কাটছিল, সে ছুটে এসে বালি সরিয়ে ঠ্যাঙে ধ'রে টেনে বেটাকে বার করলে।

—তারপর?

—তা'পর আর কি? তা'পরে বছরখানেক পরে ধরা পড়লাম। ঠেলে দিলে চার বছর!

হা-হা ক'রে হাসত।

এই আমার কালের প্রথম জীবনের সেকাল। সেকালের—সেকালের এই রূপ। দেশে নূতন কাল তখন এসেছে, এসেছে কলকাতায়, এসেছে তার আশেপাশের জেলায় আমাদের জেলায়, বোলপুরের প্রান্তে ভুবনডাঙায় শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, সেখানে এসেছে, বোলপুরের পাশে বিখ্যাত লর্ড সিংহের রায়পুর, সেখানে এসেছে ; কিন্তু সিংহবাড়ির নূতন কালের মানুষেরা এ দেশ ছেড়ে কলকাতায় গেছেন। শান্তিনিকেতনের চারিপাশে তখন গণ্ডী টানা। ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিরোধের গণ্ডী টেনে এ দেশের লোক শান্তিনিকেতনকে পতিত ক'রে রেখেছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা। প্রথম যেদিন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়, যেদিন তিনি স্বর্ণ ডাইনীর গল্প নিয়ে কথা বলেছিলেন সেই দিনেরই কথা।

ওই স্বর্ণের প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, আমাদের দেশে কত বিচিত্র ধারা, কত বিচিত্র রীতি-নীতি, কত বিচিত্র মানুষ, এঁরা তা দেখেন নি, দেখা দূরের কথা, কল্পনাও করতে পারেন না। তুমি এদের দেখেছ। আমি কল্পনা করতে পারি, কিন্তু দেখি নি। দেখবার সুযোগ পাই নি, দেখতে দাও নি তোমরা, আমাদের তোমরা পতিত ক'রে রেখেছিলে।

পতিত শব্দটি তিনিও ব্যবহার করেছিলেন।

আবার এর একটি বিপরীত দিকও আছে। নূতন কালের মানুষেরা পুরানো কালের মানুষদের অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

এ দিকে ছিল ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত উপেক্ষা।

অন্য দিকে ছিল পীড়িতচক্ষু মানুষের আলোক-ভীতির মত বেদনা-দায়ক বর্জন-প্রবৃত্তি।

একটা নদীরই মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড চড়া, চড়ার দুধারে ব'য়ে যাচ্ছে দুটি স্রোত। একটির সম্মুখে পথের সন্ধান নাই, অপরের সম্মুখে পথের সন্ধান এবং জীবনের গতি। কিন্তু দুটি একত্রিত না হ'লে জলস্রোতে সে বেগ সঞ্চারিত হবে না, যে বেগে সম্মুখের যে ভূমিতলে পথের দিশা আছে, সে ভূমিতলকে কেটে আপন গর্ভপথে পরিণত ক'রে তারই বুক বেয়ে ধেয়ে যেতে পারবে জীবনস্রোত সাগরাভিমুখে।

৮

না। সেকালের সেকালে আরও আছে। আছে অবশ্য অনেক, কিন্তু যেটুকুর কথা মনে প'ড়ে গেল, সেটুকু না বললে সে-কালের অনেকটাই অপ্রকাশ থেকে যাবে।

আগে কিছুটা বলেছি। বলেছি, বাখারে গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে বড় বড় বলদ ছিল, দুধালো গাই ছিল, গ্রামে বড় বড় পুকুর ছিল—পুকুরে গভীরতা ছিল, জল ছিল অথৈ, সে অথৈ জলে পুকুর-ভরা মাছ ছিল, বাড়ীর ক্ষেতে খামারে শাক ছিল, সব্জী ছিল, ঘরে কাঁসা পিতলের বাসন ছিল, রূপার বাসনও ছিল দু-দশ জনের ঘরে। আরও ছিল—আকাশে

মেঘ ছিল, সে মেঘে জল ছিল। অনাবৃষ্টি তখন কম হ'ত। তখন বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৫০ থেকে ৬০ ইঞ্চি পর্যন্ত। আমার মনে আছে, ১৩১৩ সালে আমাদের অঞ্চলে 'আকাড়া' অর্থাৎ অনটন হয়েছিল। টাকায় তেরো সের চাল হয়েছিল; কাঁচি ৬০-এর ওজনের তেরো সের আজকের ৮০র ওজনের দশ সের তিন পোয়া। আজকের ওজনের এক সের চালের দাম হয়েছিল ছ পয়সা। পরবর্তী কালে জেলার বৃষ্টিপাতের খতিয়ান দেখেছিলাম, তাতে দেখেছি সেবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৪০ ইঞ্চির কিছু বেশী। আজ সেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হয়েছে ৩০ ইঞ্চি থেকে ৪০ ইঞ্চি পর্যন্ত, যে বৎসর খুব বেশী বর্ষা হয়, সে বার হয়তো ৪৫ ইঞ্চিতে পৌছোয়। তাই বলছি, আকাশে মেঘ ছিল, মেঘে জল ছিল।

আমার 'গণদেবতা' বইয়ে আমি লিখেছি, গ্রাম্য বৃদ্ধ দ্বারিকা চৌধুরী গ্রামে আটকবন্দী যতীনের সঙ্গে আলাপ করতে এলে যতীন তাকে বলেছিল—সেকালের গল্প বলুন আপনাদের।

—গল্প? হঁ্যা, সেকালের কথা একালে গল্প বইকি। আবার ওপারে গিয়ে যখন কর্তাদের সঙ্গে দেখা হবে তখন একালে যা দেখে যাচ্ছি তাই বলব, সেও তাঁদের কাছে হবে গল্প। সেকালে গাই বিয়োলে দুধ বিলোতাম, ক্রিয়াকর্মে বাসন বিলোতাম, পথের ধারে আম-কাঁঠালের বাগান করতাম, পথের ধারে মাঠের মধ্যে পথিকের ছায়ার জন্যে, চাষীর ছায়ার জন্যে, গাছ প্রতিষ্ঠে করতাম; মানুষে, জীবে জন্তুতে জল খাবে ব'লে পুকুর প্রতিষ্ঠে করতাম, সরোবর দীঘি কাটাতাম, দেবতা প্রতিষ্ঠে করতাম, তাঁর প্রসাদে ঘরে নিত্য অতিথি সৎকার হ'ত। মহাপুরুষদের ঈশ্বরদর্শন হ'ত। তাঁদের আশীর্বাদ পেতাম। এই আমাদের সেকাল। সে তো আজ আপনাদের কাছে গল্প মনে হবে গো!

—আপনি দীঘি কাটিয়েছেন চৌধুরী মশায়?

—আমার ভাগ্য ভাঙা ভাগ্য বাবা। ভাঙা ভাগ্যের ঝুড়ি ভাঙা, কোদাল ভাঙা, মাটি কাটা যায় না, কোন মতে খুঁড়লেও ভাঙা ঝুড়িতে তুলে ফেলা যায় না। তবে আমার বাবা দীঘি কাটিয়েছিলেন। তখন আমি ছোট, আমার মনে আছে। এক ঝুড়ি মাটি কাটত একজন, বইত একজন। দশ কড়া কড়ি ছিল দাম। মানে আধ পয়সা। একজন লোক ব'সে ব'সে ঝুড়ি গুনত, কড়ি দিত। বিকেলে কড়ি দিয়ে পয়সা নিয়ে যেত।

—আধ পয়সা ঝুড়ি?

এ আমি কল্পনা ক'রে লিখি নি। এই সেকালের কথা। আধ পয়সা ঝুড়ি মজুরি, ওদিকে দু'টাকা মণ চাল। টাকায় চব্বিশ সেরও দেখেছি আমি। দুধের সের ছিল দু'পয়সা। হিসেব ছিল "পাই" অর্থাৎ আধ সেরের—এক পয়সায় এক পাই দুধ মিলত।

মায়েরা ছেলেদের চাঁদ ধ'রে দেবার জন্যে চাঁদকে লোভ দেখিয়ে ডাকতেন—

"আয় চাঁদ আয় আয়
বাটি ভ'রে দুধ দোব

রূপোর থালায় ভাত দোব
রুই মাছের মুড়ো দোব
সুখশয্যে পেতে দোব
চাঁদ তুই সুখে নিদ্রা যাবি
আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে
ছায়ায় ছায়ায় যাবি।"

ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসিকে ডেকে বলতেন—

"ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী ঘুম দিয়ে যাও।
বাটা ভ'রে পান দেব গাল পুরে খাও॥"

আবার ছেলে ভুলাবার, ছেলে ঘুম পাড়াবার অন্য ছড়াও আছে, যে ছড়া সম্ভবত সেকালের হরিজন সম্প্রদায়ের মায়ের রচিত—

"আয় রে ঘুম যায় রে ঘুম বাউরীপাড়া দিয়ে
বাউরীদের ছেলে ঘুমালো কাঁথা মুড়ি দিয়ে।"

ঘুম যদি জেলেপাড়া দিয়ে যেত, তবে ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুমাত। যদি যেত ডোমপাড়া দিয়ে তবে ঘুমাত টোকা বা ঝুড়ি মুড়ি দিয়ে। দারিদ্র্য ছিল। এখনকার তুলনায় ঘরদুয়ারের অবস্থায়, পরিচ্ছদের ব্যবস্থায়, আভরণের ব্যাপারে সেকালের দারিদ্র্যকে অতি নিষ্ঠুর মনে হবে। আজ আমাদের হরিজনদের ঘর-দুয়ার অনেক ভাল, দরজা-জানালা আছে, অনেকে মাটির কোঠা অর্থাৎ দোতলা করেছে, বাইরে বারান্দায় কলি ফেরানো অর্থাৎ চুন দেওয়া হয়েছে, দরজায় আলকাতরা মাথানো হয়েছে। সেকালের ঘর ছিল ঘুপচি ; হয়তো চার-কোণে মানুষের মাথায় চাল ঠেকত ; জানালা দূরে থাক্, দরজাও সর্বক্ষেত্রে থাকত না, থাকত আগড়। একখানিই ঘর, তার এক দিকে হেঁসেল, এক দিকে হাঁস মুরগী, মাঝখানে শুত মানুষ। আজ মুগগী হাঁস আলাদা থাকে, রান্না রাখবার জায়গা আলাদা, মানুষেরা শোয় অনেক ক্ষেত্রে খাটিয়ায় তক্তাপোশে, বিছানাও তাদের ভাল। সেকালে দরিদ্র পুরুষেরা সাত হাত কাপড় প'রে নগ্নপ্রায় হয়ে বেড়াত, মেয়েরাও পরত তাঁতের খাটো সাড়ে আট হাত শাড়ী। আজ দশ হাত শাড়ী জামা-সেমিজ পরে। যুদ্ধের পরে হাফপ্যাণ্ট যথেষ্ট আমদানি হয়েছে। সেকালে মেয়েদের আভরণ ছিল রূপাদস্তার বালাকাটা ব'লে একটা গয়না। কারুর গলায় পিতলের 'মুড়কীমালা'—মোটা কস্তায় মাদুলী গেঁথে তারই মালা ; আর কারও কারও থাকত সরষের মত গোল একদানা সোনার নাকছবি। আজ মেয়েরা রুপোর গয়না তো পরেই, অধিকাংশেরই হাতে তামার উপর সোনার পাত মোড়া শাঁখাবাঁধা আছে। সোনার বেশ মানানসই নাকছবি সকলের নাকেই আছে,—কারও নাকে হরতন, কারুর চিড়িতন, কারও একটা ইংরাজী অক্ষর, কারুর কারুর সোনার নাকছবিতে ওপেল পাথর কি ছোট রুবির টুকরো দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া মাথায় রূপোর কাঁটা, কানে সোনার টাপ প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। সেকালে রাত্রে অধিকাংশ ঘরেই আলো জলত না। কেরাচিনি

(কেরোসিন) তেলের একটি ডিবে আর একটি 'থরবাক্‌সো' বা 'দেশলাই' অর্থাৎ ফায়ারবক্‌স বা দেশলাই থাকত বিপদ আপদের জন্য, তাতে অন্ততঃ একটা মাস চ'লে যেত। তাদের কেউ কেউ নিমের ফল কুড়িয়ে জড়ো করত। জেলেদের পাড়ায় এটি ছিল প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য। নিমের ফল কুড়িয়ে ঘানিতে পিষিয়ে তেল তৈরী ক'রে সেই তেলে প্রদীপ জ্বালানো হ'ত। আজ প্রত্যেক ঘরেই হ্যারিকেন হয়েছে, ডিবেও আছে, আলো নিয়তই জ্বলে। নিমফল অবশ্য ছেলেরা এখনও কুড়িয়ে তেল পিষিয়ে নেয়। সমস্ত দিন জলে কাজ ক'রে এসে এই নিমতেল তারা গায়ে মাথে চর্মরোগ নিবারণের জন্য। তুলনায় সেকালের দারিদ্র্য শোচনীয় ছিল মানুষের। কিন্তু তবুও সেকালে অনাহার, অর্ধাহার ছিল না, একালে অবস্থার এই উন্নতি সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে তাদের অনাহার ঘটে।

সেকালের ব্যবস্থায় এদের সঙ্গে মধ্যবিত্তদের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ এবং অন্তরঙ্গতা ছিল। বিচিত্র এবং মধুর সে যোগ ও অন্তরঙ্গতা। এক-একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের সঙ্গে কয়েকটি ক'রে দরিদ্র পরিবারের এই সম্পর্ক ছিল। প্রায় পুরুষানুক্রমিক যোগ।

আমাদের বাড়ীর সঙ্গেও এমনি যোগ ছিল গুটি কয়েক পরিবারের। তাদের মধ্যে 'ধাত্রী দেবতা'র শিবুর অনুচর শম্ভু বাউরীদের বাড়ীই প্রধান। শম্ভুর পিতামহ থেকে তারা আমাদের বাড়ীতেই কাজকর্ম করে। শম্ভুর পিতামহকে আমি দেখি নি। তার পিতমহী 'মোনা'—নাম ছিল মনোমোহিনী—তাকে আমি দেখেছি। ভোর না-হতেই মোনা এসে হাজির হ'ত। এসেই ঘর দুয়ার উঠান থেকে চারিপাশ সাফ করত, জল দিয়ে ধুয়ে দিত। কালো পোকা-খেগো চেহারার মত বুড়ী মোনা এসেই প্রথম বকত বাড়ীর ঝিকে। তারপর চাকরকে, তারপর রাঁধুনীকে, তারপর কখনও কখনও আমার মাকে। শুধু বকতে সাহস করত না আমার পিসীমাকে। বকত বাড়ীর বিশৃঙ্খলার জন্য, অব্যবস্থার জন্য।

বলত—হা টে, (অর্থাৎ হ্যাঁ লা) টুকুচি শাসন করতে লারিস (পারিস না) ওই ঝিচাকরগুলানকে ? অমুনি অব্যবস্থা ! দেখ্ দেখ্, তোর কটা কটা চোথ দুটো তো খুব ঝকঝকে, বলি আপচোটা (অপচয়) একবার দেখ্। জিনিস ফেলেছে দেখ্।

মা হাসতেন। মোনা বা তার সম্প্রদায়ের সকলেই 'আপনি' ব'লে কথা বলতে জানে না, এ কথা নয়। বাবা যদি ডাকতেন, মোনা ! তৎক্ষণাৎ মোনা হাত জোড় ক'রে উত্তর দিত—আজ্ঞে বাবা, আজ্ঞা করুন।

মোনা আমাদের শাসন করত। আমাকে কম। কিন্তু আমার মেজ ভাই, আমার বোনকে শাসন তো করতই, প্রহারও করত।

ছেলেবেলায় চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত আমাদের এদের বাড়ীতেই কাটত। এরাই মানুষ করত। সকালবেলায় নিয়ে যেত, এগারটা নাগাদ ফিরিয়ে আনত, তারপর নিয়ে যেত আবার বেলা তিনটেতে। সন্ধ্যে হ'লে বাড়ী দিয়ে যেত। ওদের অন্ন ব্যঞ্জন অনেক পেটে আছে আমাদের।

মোনার একটা কথা ভারী কৌতুককর। সে ব্যাঙকে ভয় করত যমের মত। তার ধারণা

ছিল ব্যাঙের বিষেই সে মরবে। ব্যাঙ দেখলে মোনা ভয়ে আতঙ্কে বু-বু তি-তি শব্দ ক'রে লাফাতে আরম্ভ করত। অকস্মাৎ বড় ব্যাঙের সামনে পড়লে তার চোখের দিকে চেয়ে যেন আতঙ্কে জ'মে পাথর হয়ে যেত।

মোনার ছেলে গোষ্ঠ আমাদের বাড়ীতেই গরুর পরিচর্যা করত। সে মারা গেলে তার তিন ছেলে সতীশ, মতিলাল, শম্ভু—সকলেই প্রথমে রাখাল, তারপর মাহিন্দার, তারপর কৃষাণ ও ভাগ-জোতদারের কাজ করেছে। সতীশের পুত্র 'লেড়ো', সেও কাজ করেছে।

মোনা মারা গেল। তারপর মোনার পুত্রবধূ তার কাজ করতে লাগল। সতীশের মাকে আমরা 'সতের' মা বলতাম। সতের মা সে দিন পর্যন্ত জীবিত ছিল। শেষ বয়সে কাজ করতে পারত না, তার পুত্রবধূ 'সতের বউ' তখন কাজ করত।

সতীশের মায়ের কি অধিকার আমাদের উপর! তার সে অধিকার অনস্বীকার্য। অকপটে বলছি, সে অধিকার স্বীকার করতে কোনদিন একবিন্দু গ্লানি অনুভব করি নি। এসে দাঁড়াত সতের মা, বলত—বলি হাঁগো, তুই ইসব কি করছিস? লোকে বলছে—তোকে ধ'রে নিয়ে যাবে? সাহেবদের সঙ্গে ল্যাই (কলহ) করছিস! একজন বললে—জ্যালে ভ'রে তো দেবেই, গুলি ক'রে না দেয় তো ভাল।

ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছিল সতের মা।

ইদানীং যখনই কলকাতা থেকে বাড়ী যেতাম তখনই স্টেশন থেকে আমাদের বাড়ী যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকত সতের মা, বলত, বাবা এলি? অঃ, আচ্ছা পাষাণ বটিস বাবা! আঃ, মুখ মনে পড়ে না রে! দাঁড়া খানিক দেখি।

আমি জেলে থাকতে শম্ভু মধ্যে মধ্যে রওনা হ'ত সিউড়ী, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা সে করবেই। কিন্তু খানিকটা পথ যেতে যেতে তার সাহস চ'লে যেত, পুলিস এবং সাহেবদের ভয়টা উঠত বড় হয়ে, ভগ্নমনে বাড়ী ফিরে কাঁদতে বসত।

অন্য দিক দিয়ে আমাদের বাড়ীতে তাদের অখণ্ড অধিকার ছিল, অংশীদার বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিপদে, রোগে, দুর্ভিক্ষে শ্মশানে পর্যন্ত পরস্পরের সহযোগিতা আত্মীয়তা ছিল প্রসারিত। আমাদের খড় তাদের ঘর ছাওয়াতে দিতে হ'ত, তাদের জ্বালানি—সেও আমাদের বাড়ী থেকে যেত; আমাদের পুকুরের মাছ তারা নিত্য ধরত, আমাদের ডাক্তার তাদের দেখত। বাড়ীতে মাছ এলে তাদের ঘরে যেত। আমাদের পুরানো জামা কাপড় পছন্দ ক'রে নিয়ে যেত।

শুধু সংযুক্ত হরিজন পরিবারটিই নয়—গোটা পল্লীর ভারই সমগ্রভাবে মধ্যবিত্তদের উপর ন্যস্ত ছিল, অবশ্য-কর্তব্যরূপে সে ভার তাঁরা বহন করতেন।

কোন হরিজন পরিবার অনশনে থাকত না। সেকালের গৃহিণীরা বেলা তিনটে নাগাদ বের হতেন এই পল্লী-ভ্রমণে। দেখতেন সকলের চালের দিকে চেয়ে, কার চালের উপর দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, কার চালের উপর ধোঁয়া নাই। ঘরের ভিতর উনোন জ্বললে, চালের খড়ের উপর দিয়ে ধোঁয়া বের হয়। যার ঘরের চালের উপর ধোঁয়া উঠছে না, তার উঠানে গিয়ে

দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতেন—কি, তোর আজ আখা (উনান) জলে নাই কেন রে ?

সঙ্গে সঙ্গেই কারণের প্রতিবিধান হ'ত—পুরুষ অসুখে পড়েছে, ঘরে চাল নাই,—ওষুধের ব্যবস্থা হয়েছে, চাল দেওয়া হয়েছে। মেয়ের অসুখ হয়েছে, রাঁধবার লোক নাই, ঘরে পুরুষ নাই, ছেলেরা ছোট—সে ক্ষেত্রে ছোট ছেলেদের ডেকে ভাত দেওয়া হয়েছে! দুধ গিয়েছে, তৈরী সাগু গিয়েছে।

বেলা দুটোর পরই ওদের মেয়েরা নেমে যেত পুকুরে, মাছ ধরত—শোল মাছ ন্যাটা মাছ। বিনা মাছে তারা ভাত খেত না। মধ্যবিত্তের বাগানে শুকনা কাঠ আহরণ করতে বের হ'ত প্রত্যহ সকালে। কাঠ ভেঙে আনত প্রচুর পরিমাণে। এ সব ছিল তাদের জীবনের অধিকারভুক্ত।

তালগাছের পাতা এবং ফল—এতে ছিল ওদের অধিকার। গ্রামের ভিতরের গাছের তাল কেটে খাওয়া সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ ছিল। এই তাল পাকলে ওরা কুড়িয়ে খেত, পেড়ে খেত।

ওরা অস্পৃশ্য ছিল, তবু মানুষের হৃদয়ে ওদের প্রবেশাধিকার ছিল অবাধ। আমার মেয়ে বুলু যে দিন মারা যায়, সে দিন সতীশের মা আমার স্ত্রীকে আমাকে যে অসঙ্কোচ অধিকারে স্পর্শ করেছে সে কথা স্মরণ ক'রে এ কথা লিখতে আমার দ্বিধা হচ্ছে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ছে এদের দৃষ্টিতেই সে দিন দেবতার ভোগ নষ্ট হ'ত, এদের সঙ্গে একটা লম্বা খড় কি দড়ির সংস্পর্শে স্পর্শদোষ হ'লে প্রাপ্তবয়স্কেরা স্নান করেছেন। এদের বাস্তুতে এরা শুধু বাস করবারই অধিকারী ছিল, ভূমিতে কোন অধিকার ছিল না। এরা সে বাস্তুর উঠানে গাছ লাগাত, বাড়ীর পিছনে বাঁশ লাগাত, সে গাছ সে বাঁশঝাড় আমার হয়েছে। একটি ডাল কি একটি বাঁশের প্রয়োজনে আমার কাছে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াত। ওরা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করেছে হীনকুলে জন্মাপরাধে ওরা সত্যই অস্পৃশ্য। পরবর্তী কালে যখন সমাজ-সেবার ব্রত নিয়ে ওদের বোঝাতে চেয়েছি যে, অস্পৃশ্যতা মানুষের সৃষ্টি, বিধাতার নয়—তখন ওরা শিউরে উঠেছে, আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেছে। উপরের কথাগুলির সঙ্গে মনে পড়ছে—সেকালের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যত পঙ্ক যত ক্লেদ সমস্ত নিক্ষেপ করেছে তারা ওদেরই জীবন-পাত্রে, সে জীবন-পাত্র বিষাক্ত ক'রে দিয়েছে। ওদের যুবতী বধূ-কন্যাদের প্রলুব্ধ ক'রে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যে—চার আনা আট আনার বিনিময়ে ভ্রষ্ট করেছে—ভোগ করেছে। এমন হয়েছে যে, গভীর রাত্রে নেশার তাড়নায় কামোন্মত্ত হয়ে নির্লজ্জ হল্লা ক'রে ওদের পল্লীতে প্রবেশ করেছে, লাথি মেরে ঘরের আগড় বা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে, ভীত স্বামী বা পিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, বাড়ীর গৃহিণী কর্তার পৌরুষের লজ্জাকে ঢেকে নিজের নারীজনোচিত লজ্জার মাথা খেয়ে সামান্য দক্ষিণা গ্রহণ ক'রে বা বিনা দক্ষিণাতেই বধূ বা কন্যাকে সমর্পণ করেছে ভদ্রজনের হাতে। কেউ যদি অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ করেছে, তবে শতকরা নিরানব্বুই ক্ষেত্রে অভিভাবক অভিযোগকারীকেই ঘৃণাভরে কঠিন শাসন ক'রে উত্তর

করেছেন—নিজের ঘর শাসন কর্ হারামজাদা। আর কারও ঘরে না গিয়ে তোর ঘরেই গেল কেন? আমরাই এদের সমগ্র নারী-সমাজকে এমন ক'রে তুলেছি যে, এরা ক্রমে হয়ে উঠেছে জন্মগত স্বৈরিণী। চারিদিকের সমাজের সকল লম্পটের দেহজ বিষ এদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, গোটা সম্প্রদায়কে বিষাক্ত ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে তুলেছে। বছর কয়েক আগে আমি হিসাব ক'রে দেখেছি, এদের শতকরা ষাটটি বাড়ী আজ সন্তানহীন। আলো বেশী কি অন্ধকার বেশী বিচার করতে চাচ্ছি না। শুধু স্মরণই করছি সেকালকে।

এদের বিপদে সেকালে সাহায্য করেছি, রোগে ডাক্তার দেখিয়েছি, অভাবে দান করেছি, ওরাও নিয়েছে—এ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে, স্বল্প অপরাধ ওদের ক্ষমা করলেও কি কঠিন শাসনই না সেকালে করেছি আমরা! সে শাসন নয়, নির্যাতন।

প্রথমেই আমার বাবার কথাই বলি। পিতামহের শ্রাদ্ধে মাছ ধরানো হ'ল আমাদের পুকুরে। এক-একটি মাছ পনের সের থেকে বিশ সের চব্বিশ সের। জেলেরা টানা জালে মাছ ধরলে। মাছ তুললে কিন্তু একখানা মাছসুদ্ধ জাল জলে ফেলে রেখে এল সকলের অজ্ঞাতসারে। তার মধ্যে রইল একটা আঠারো সের মাছ। বাকী মাছ বাড়ী এল, জেলেরা সকলেই বাড়ী চ'লে গেল। বাড়ীতে ক্রিয়ার আয়োজন চলেছে, এমন সময় একজন চুপিচুপি খবর দিয়ে গেল, জেলেরা মাছ চুরি করেছে এবং সেই মাছ এনে কাটাকুটির আয়োজন করছে। হাটকুড়া জেলে এর পাণ্ডা, কীর্তি তারই। বাবা অগ্নিমূর্তি হয়ে বেত হাতে বেরিয়ে গেলেন একটা জনবিরল পথ ধ'রে, তার খানিকটা অতিক্রম করলেন একটা পুকুরের জলহীন অংশ ধ'রে। অকস্মাৎ গিয়ে উঠলেন হাটকুড়ার উঠানে। জেলেরা ভয়ে পাথর হয়ে গেল। বাবা হাটকুড়াকে বেতের আঘাতে জর্জরিত ক'রে দিলেন। মাছ উঠিয়ে আনা হ'ল। বাবার শেষে খানিকটা অনুতাপ হ'ল, তিনি হাটকুড়াকে ডেকে এক টাকা বকশিশ দিলেন। এ আমার শোনা গল্প। আমার জীবনে আমি বাবাকে প্রহার করতে দেখি নি। তখন তাঁর ঘোর পরিবর্তন হয়েছে।

চোখে দেখেছি কত শাসন, আমাদের বাড়ীতে না হলেও আশেপাশে মাসে দুটো একটা এ শাসন চলত। একবার দেখেছিলাম এক শাসন। স্মরণ ক'রেও শিউরে উঠি আজ।

হঠাৎ চামড়ার দর চ'ড়ে গেল। সক্রিয় এবং সচেষ্ট হয়ে উঠল চামড়ার ব্যবসাদারেরা। এরা সকলেই মুসলমান। চামড়া সংগ্রহ ক'রে বেড়ায়, গ্রামে গ্রামে হিন্দু সমাজের চর্মকারেরা বিক্রি করে। এরা চামড়া ছাড়িয়ে আনে ভাগাড়ে-ফেলে-দেওয়া মৃত জন্তুর দেহ থেকে। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে আমাদের দেশে গরুই প্রধান।

হঠাৎ গরু মরতে শুরু হ'ল। গরুর পাল চারণভূমে যায়, ফিরে আসে—হঠাৎ অবস্থা দাঁড়ায় কলেরা-রোগাক্রান্ত মানুষের মত, ওষুধ খাটে না, ভাল চিকিৎসকও নাই—ম'রে যায়। বৈদ্যরা বললেন, বিষকাঁড় করেছে মশায়। অর্থাৎ বিষপ্রয়োগ করেছে, ঘাসের পাতায় বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।

গরুর চারণভূমে যাওয়া বন্ধ হ'ল, কিন্তু তবু গো-হত্যা বন্ধ হ'ল না। চামড়ার ব্যবসায়ীদের

যারা প্রলুব্ধ দরিদ্র চর্মকারেরা তখন টাকার নেশায় পড়েছে। আবার ভয়েও বটে—ব্যবসায়ীরা ভয়ও দেখিয়েছে—এখন নিরস্ত হ'লে তারাই প্রকাশ ক'রে দেবে এ অপকর্মের কথা। তারা গ্রামের মানুষ, পথ দিয়ে যায় আসে; শাক তুলতে, কাঠ ভাঙতে কি কোন অজুহাতে গ্রামের লোকের বাড়ীতেও ঢোকে; সুযোগ বুঝে গরুর খাবার জাবের মধ্যে বিষ মাখানো পাতা রেখে যায়, গরু খায়, মরে। আমাদের কয়েকটা গাই ম'রে গেল। সব চেয়ে ক্ষতি হ'ল আর একজন জমিদারের। তিনি তখনও প্রবল প্রতাপশালী জমিদারদের মধ্যে। দুর্দান্ত লোক। তাঁর বড় বড় হেলে বলদ ম'রে গেল, কয়েকটা গাইও গেল। বলদগুলি ছিল তাঁর শখের জিনিস। তিনি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ধ'রে আনলেন চর্মকারদের। আমরা শুনলাম, তাদের শাসন করা হচ্ছে। দেখতে গেলাম লুকিয়ে। সে দৃশ্য ভুলব না। কয়েকজন বাঁধা রয়েছে গাছে। দুজনকে হাতে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হনহন ক'রে এসে ঢুকলেন বৈঠকখানায়, আবার বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গীদের কেউ বললে—মদ খেয়ে তেজী ক'রে নিলে মন। দেখলাম, তিনি গেলেন, বেত হাতে নিলেন, প্রহার শুরু করলেন। আমি ছুটে পালিয়ে এলাম।

অথচ এই জমিদারটির মত এই সম্প্রদায়ের হিতৈষী রক্ষাকর্তা আর কেউ ছিল না। গ্রামে প্রবল মহামারী চলেছে, ভদ্রজনেরা সকলে গ্রামান্তরে স্থানান্তরে গেলেন। ইনি যান নি, এই হরিজন-পল্লীতে কলেরা চলেছে—তাদের জন্যই যান নি। ওদের দেখবে কে? কলেরার চিকিৎসা সেকালে ছিল না, ডাক্তারেরাও যেত না, তবু ওদের চাল দিতে হবে, অন্ন চাই; সব চেয়ে বড় কথা—সাহস দিতে হবে, তার লোক চাই। তিনি থাকতেন। একবার এমনি মহামারীতে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন; তিনি বললেন—কি করব? ওদের ছেড়ে যাব কি ক'রে? তা কি হয়! শুধু ওই হরিজন সম্প্রদায়ই নয়—এ শাসন বিস্তৃত ছিল সমস্ত মজুরশ্রেণীর উপর, সমস্ত কৃষকশ্রেণীর উপর। আমাদের ওই অঞ্চলে মুসলমানেরা আর্থিক অবস্থায় পেশায় কৃষকশ্রেণীভুক্ত। তাদের উপর ঠিক এতখানি না চললেও কিছুটা চলত। আমাদের গ্রামের পাশে ঠাকুরপাড়া। তারপর পশ্চিমপাড়া। তার ওদিকে ব্যাপারীপাড়া। ব্যাপারীপাড়ার পাশে ছোট গোগা, শেখপাড়া, একখানা গ্রাম পার হয়ে পুরানো মহগ্রাম, কামারমাঠ, ফলগ্রাম। এগুলি সব মুসলমানের বসতি। এক কালে ঠাকুরপাড়ার ঠাকুরেরা ছিলেন এ অঞ্চলের অধিপতি। ঠাকুরেরা মুসলমান। এঁরা ছিলেন নাকি যোগী বংশের সন্তান তাই লোকে বলত—ঠাকুর। শুধু এ অঞ্চলে ভূমির অধিপতিই ছিলেন না, মুসলমানদের ধর্মগুরুও ছিলেন। সম্রাট আলমগীরের তামার ছাড়পত্র আজও এঁদের বাড়ীতে আছে। নানকার নিষ্কর জমির ছাড়পত্র। মূল বংশের আর কেউ আজ নাই। আমার বাল্যকালেও কয়েকজনকে দেখেছি। মাথায় সাদা টুপি, সৌম্যদর্শন মুসলমান। কি মধুর ব্যবহার, কি মিষ্ট কথা! নিজেদের দলিজায় তক্তাপোশের উপর ব'সে থাকতেন, এক প্রসন্ন উদাস দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে থাকতেন। কোথাও যেতেন না।

অনেক সন্ধান করেছি, সন্ধান ক'রে আমার মনে হয়েছে, কোন কালে এঁরা ছিলেন হিন্দু

এবং ধর্মগুরু ব্রাহ্মণই ছিলেন। কোন মতে স্বধর্মচ্যুত হয়েছিলেন এবং হয়েছিলেন তাঁর স্বজাতীয় অপর কোন ব্রাহ্মণ প্রতিপক্ষেরই চক্রান্তে। তার ফলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্য যজমান ভক্ত সকলেই ইসলাম অবলম্বন করেছিলেন।

থাক্ সে কথা।

মুসলমানেরা কিন্তু হরিজন কৃষক মজুরদের মত এত নত ছিল না। থাকবার কথাও নয়। ইসলামের ওই গুণটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। চোখে দেখেছি যে, হরিজন কোন কারণে ইসলাম অবলম্বন করলে কিছুদিনের মধ্যেই তার পরিবর্তন ঘটে, সে মাথা উঁচু ক'রে চলতে শেখে।

মুসলমানদের মধ্যে প্রথম আধিপত্য ছিল জমিদার হিরণ্যভূষণবাবুর। তারপর সে আধিপত্য আয়ত্ত করলেন নবোদিত ধনী যাদবলালবাবু। এই আয়ত্তে আনার উদ্যোগপর্বে ওই সব গ্রামের জমিদারির অংশ কিনলেন তিনি। তাদের প্রচুর কাজ দিলেন। বড় বড় ইমারত তৈরীর কাজে, দীঘি কাটার, জমি তৈরীর কাজে—তাদেরই তিনি ডাক দিলেন। তারা এল এগিয়ে। তবুও তারা হিরণ্যবাবুকে ত্যাগ করলে না। তখন যাদবলালবাবুর বড় ছেলে এদের শাসন করবার জন্য উদ্যত হলেন। বেত হাতে নিলেন। ফলে একদা গুজব রটল, মুসলমানেরা এক হয়ে এর প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হয়েছে। তারা স্থির করেছে, অত্যাচারীকে হত্যা ক'রে ফেলবে। স্বর্গীয় যাদবলালবাবু উপেক্ষা করলেন না গুজব, তিনি পুত্রকে সংযত করলেন, মুসলমানদের ডেকে সান্ত্বনাবাক্য ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলে, এ অত্যাচার তিনি কোন মতেই হতে দেবেন না।

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা নিয়েও কোন বিরোধ সে দিন অনুভব করি নি। শুদ্ধাচারী হিন্দু মুসলমানকে স্পর্শ ক'রে কাপড় ছাড়তেন। এ মুসলমানেরা জানতেন। তাঁরাও কোন দিন হিন্দুর বাড়ীতে অন্নজাতীয় আহার্য গ্রহণ করতেন না। মধ্যে মধ্যে সামাজিক নিমন্ত্রণে সিধা এবং ফল-মিষ্টানের আদানপ্রদান চলত।

তবু এ কথা বলব যে, বাহ্যিক প্রশান্ত প্রসন্ন এই সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন ছিল একটি ভেদ এবং বিরোধের সুর।

মনে পড়ছে এবারত হাজী এবং আব্বাস হাজীকে।

এবারত হাজী ভীমের মত বিশালকায় মানুষ। দুই ভাই প্রথম জীবনে মাটি কাটার কাজ করতেন। শুধু দেহের শক্তিবলেই বিস্তীর্ণ ভূমিলক্ষ্মীর অধিকারী হয়েছিলেন; শুনেছি, দুই ভাই পতিত জমি বন্দোবস্ত নিয়ে নিজেরা কোদালে কেটে মরা পুকুরের পাঁক ব'য়ে তাতে দিয়ে উর্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। দুনিয়া সুদ্ধ লোকের চাচা ছিলেন। হজ ক'রে এসেছিলেন। মাথায় টুপী প'রে, লুঙ্গির মত কাপড় প'রে, গায়ে চাদর দিয়ে আমাদের বাড়ীতে আসতেন; বাড়ীর ভিতরে আসতেন—কই, পিসীমা কই?

আমরা ডাকতাম—চাচা।

উত্তর দিতেন—বাপ। ঘুরে তাকিয়ে বলতেন, আরে বাপ রে, বাপজান! ছোট হুজুর!

বলতাম, চাচা সেইটে বল।

হা-হা ক'রে হেসে চারদিক চঞ্চল ক'রে তুলে বলতেন—খুব উঁচু গলার লম্বা উচ্চারণে বলতেন, আমরা মু-স-ল-মা-ন, আমরা এ-তো ব ড়ো—! নিজের হাতটা যতখানি ওঠে তুলে এবং নিজে খুঁড়িয়ে উঠে আরও খানিকটা উঁচু ক'রে দেখাতেন কত বড়। তারপর মিহিগলায় হাতের দুটি আঙুল জুড়ে একটি মটর বা সরষের আকার দেখিয়ে বলতেন—তোমরা হিন্দু এতটুকু। কথাগুলি দ্রুত উচ্চারণে ব'লে যেতেন।

এটুকু অবচেতন বিরোধের প্রকাশ। সমাজগত ভাবে বিরোধ উপস্থিত হ'লে এর প্রকাশ্য প্রকাশ হ'ত। সেকালে কদাচিৎ হ'ত। তবু ছিল।

এই আমার সেকালের সেকাল।

আমার কালের সেকালের আর একটি স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এর আগে তার দোষ বলেছি, গুণ বলেছি, যেমন চিনেছি তেমন বলেছি। এবার যেটি বলব সেটি সুন্দরের স্মৃতির শোভা! সেকালের ঘর-দুয়ারের ছিল পরিচ্ছন্ন-শ্রী। অপরূপ শ্রী ছিল। স্বাচ্ছল্য সেকালে ছিল। কিন্তু একালে স্বাচ্ছল্য অনেক স্থলে অনেক বেশীই আছে, সমারোহ একালে সর্বত্রই বেশী। কিন্তু স্বল্প আয়োজনে যে পরিচ্ছন্ন শ্রী সেকালে দেখেছি সে একালে নাই। নিকানো মাটির মেঝে—খড়ি রঙের আলপনা, নিকানো উঠান, নিকানো খামার, সবুজ সজীক্ষেত, ঘরের এক পাশে কিছু ফুলের গাছ—এই আয়োজনের সে শ্রী অপরূপ। আজ দালান হয়েছে, পাকা মেঝে হয়েছে, চেয়ার টেবিল আসবাব হয়েছে, ফোটোগ্রাফে ছবিতে দেওয়াল সাজানো হয়েছে; কিন্তু সে পরিচ্ছন্নতা নাই—সে নয়নমনোরম শ্রী নাই।

ফুলের বাগান—অন্তত পক্ষে কয়েকটি ফুলের গাছ সব বাড়ীতেই ছিল। রুচিবানদের বাড়ীতে বাগান ছিল। আমার বাবার বাগান ছিল বিখ্যাত। সকালবেলাতেই দেবস্থলের পূজারীতে, ইষ্টভক্ত প্রবীণ-প্রবীণা পূজার্থীতে, ব্রতপরায়ণা কুমারীর দলে ভ'রে যেত। সে বাগানের চিহ্ন আজও আছে দু-একটি পুরানো গাছে আর ইটের কেয়ারীতে। মাঝখানে ছিল একটি বাঁধানো বেদী। সেটিও আছে। বেদীর কোল ঘেঁষে সোজা একটি রাস্তা—তার দুধারে বাগান। বাগানের পশ্চিম দিকে গ্রামের রাস্তা, বাগানের দুই প্রান্তে বাড়ী ঢুকবার দুটি দুয়ার—এক দুয়ারের মাথায় মাধবীলতা, অন্যটির মাথায় ছিল মালতীলতা। বর্ষার শেষে শরতের প্রারম্ভে সাদা ফুলের অজস্রসম্ভারভরা মালতীলতাটি আর নীল আকাশের টুকরা টুকরা সাদা মেঘ—মনকে অপরূপ প্রসন্ন মাধুর্যে ভ'রে দিত। আর তেমনি উঠত নাতিমদির মৃদু মধুর গন্ধ। মালতীর মালা গেঁথে—কোনদিন আমার গলায় পরার অথবা প্রিয়ার কবরী ভূষিত করার আকাঙ্ক্ষা জাগে নি। ফুল তুলে দেবস্থলে পাঠিয়েছি। বসন্তে ফুটন্ত মাধবী, অপরূপ কারু তার গঠনে—মর্মস্থলে বাসন্তী রঙের ছোপ, থোকা থোকা ফুটে থাকত হরিদ্রাভ-মর্ম রত্নগুচ্ছের মত। তেমনি মধুর গন্ধ। এ ফুলে মালা গাঁথা যায় না, আমি গাঁথতে পারি নি, গুচ্ছ গুচ্ছ তুলে দেবপূজায় পাঠিয়েছি, বিছানায় ছড়িয়েছি।

বসন্তে আরও ফুটত বেল ফুল, রজনীগন্ধা। বেল ফুল ফুটত প্রত্যহ এক ঝুড়ি। বসন্তে শুরু হ'ত—চলত বর্ষার শেষ পর্যন্ত। বর্ষায় আরও ফুটত জুঁই। লতানে জুঁই নয়, ঝাড় জুঁই, এ ঝাড় দুটির গোড়া খড়ের দড়িতে বেঁধে বাবা তাকে এক বড় তোড়ার মত আকার দিয়েছিলেন। রাশি রাশি জুঁই ফুটত। মালা গাঁথা হ'ত, দেবতা পরতেন—মানুষ পরত। আর ছিল কামিনী। করবী টগর জবা, এরা ছিল—বারো মাস ফুল দিত, কামিনী দিত কিছুদিন পরে পরে—ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল; সমস্ত রাত্রিটা মদির ক'রে রাখত বায়ু-পরিমণ্ডলকে। সকাল থেকে তার ঝরা শুরু হ'ত। শরতে শিউলি ফুটত, মেয়েরা ফুল কুড়িয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে শুকিয়ে কাপড় রাঙাত। আমরা কাগজে দেওয়ালে কাঁচা বোঁটা ঘ'ষে হলুদ রঙের দাগ টানতাম। ম্যাপে দিয়েছি শিউলি-বোঁটার হলুদ রঙ। ধারে ধারে ছিল ফলের গাছ, নারকেল গাছ ছিল, কাঁঠাল গাছ ছিল, লেবু ছিল; সুপারী ছিল, আর ছিল আমাদের শিশুজিহ্বা-মনোহর পেয়ারা গাছ। একটু দূরে ছিল একটি আম গাছ, আমার শৈশবের কত দ্বিপ্রহর সেই গাছে কেটেছে; পেয়ারা গাছে আমার কত কাপড় ছিঁড়েছে তার হিসেব নাই, কিন্তু মনে আছে। এই সব ফুলের শোভার মধ্যে আমাদের বাড়ীতে মধ্যমণির মত ছিল একটি গোলাপ গাছ। ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপের গাছ। গাঢ় কালচে লাল, ভেলভেটের মত একটি কোমল লাবণ্য ভরা সে ফুল—আজও আমার মনের মাঝখানে যেন ফুটে রয়েছে। ঘন সবুজ ডাঁটার সর্বাঙ্গে কাঁটা—অগ্রভাগ ঈষৎ রক্তাভ, তারই প্রান্তে বড় আকারের ফুলটি বাতাসে দুলত;—লাল মানিকের মত ফুটে থাকত। একটি ফুলই মনে পড়ে। কবে যে ফুটে আমার মনোহরণ করেছিল, সে দিন ক্ষণ মনে নাই, ফুলটি অক্ষয় আছে মনে—কোন দিন ঝরল না, শুকাল না।

ফুল জীবনে অনেক দেখলাম, অনেক দেখব, কিন্তু, আজ বার বার মনে হয়—তেমন গোলাপ আর কোথাও ফুটবে না; তেমন ব্ল্যাকপ্রিন্স আর দেখব না। সেই বোধ হয় প্রকৃতির রূপের সঙ্গে আমার শিশুচিত্তের প্রথম প্রেম—শুভদৃষ্টি।

নীল আকাশের তলে বৈঠকখানার সাদা দেওয়ালের পটভূমিকে পিছনে রেখে গাঢ় কালচে লাল—ব্ল্যাকপ্রিন্স দুলত। লম্বা সবুজ ডাঁটিটি পর্যন্ত মনে রয়েছে। ছোট আমি—আমার চেয়ে খানিকটা বড়ই ছিল স্মৃতির সেই ডালটি, তারই মাথায় সেই গাঢ় লাল কোমল ফুলটি; —তুলতে বারণ ছিল, কিন্তু লোভ ছিল, নুইয়ে শুঁকতে চেষ্টা করেছি, স্পর্শ করতে চেয়েছি, পারি নি, কাঁটা ফুটেছে হাতে, লাল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়েছে। রক্তের ফোঁটায় ব্ল্যাকপ্রিন্স ফুটত।

সে গাঢ় কালচে লাল মস্ত বড় গোলাপ ফুল—একালে আর কোথাও ফুটল না। তাই বলছিলাম—আমার সেকালের পুষ্পশোভা আর এই লাল গোলাপ ফুল, একালের সকল দীপ্তির মধ্যেও অম্লান-দীপ্তিতে ফুটে আছে। ঘন লাল, কালচে লাল ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ সে বোধ হয় আমার কাছে ছিল ব্ল্যাকপ্রিন্সেস।

মধ্যে মধ্যে মনে হয়—জীবন ও স্মৃতি যদি এমন জীর্ণই হয়ে আসে যে, সকল কিছু সুন্দরের

মুখ কুহেলিকায় ঢেকে আচ্ছন্ন হয়ে আসবে, তবে শেষ ঢাকা পড়বে ওই লাল ফুলটি। ওই যেন আমার সকল সুন্দরের কেন্দ্রে বিরাজিত রয়েছে। মৃত্যুকে বলি—মৃত্যু, তুমি যদি সুন্দর হও, তবে তোমায় নিশ্চয় দেখব ওই স্মৃতির গাঢ় লাল গোলাপের ছবিতে, জীবনের দৃষ্টিগণ্ডী ক্রমসঙ্কুচিত বলয়রেখার মত ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে আসবে, আকাশ পৃথিবীর মানুষ সবই বলয়গণ্ডীর বাইরে প'ড়ে যাবে, শেষ থাকবে ওই ফুলটি। ফুলটি যখন থাকবে না, তখন চোখের দৃষ্টি মুছে যাবে। আমার ব্ল্যাকপ্রিন্সেস। গাঢ় কালচে লাল—ভেলভেটের মত গোলাপ ফুল আমার কালের সেকালের এবং সকল কালের মনোহারিণী।

দোষে গুণে সেকাল এক জীর্ণমূল বনস্পতির মত। বিস্তীর্ণ শাখায় শাখায় ঘন পত্রপল্লবে পল্লবে ছায়া বিস্তার ক'রে সে বিরাজিত ছিল। তার সর্ব অঙ্গে জীর্ণতা—বহু বজ্রপাতে বহু কোটরের সৃষ্টি হয়েছে, বহু শাখা ভেঙে গেছে, ভগ্ন শাখার চিহ্নগুলি মহাযোদ্ধার অঙ্গের ক্ষত-চিহ্নের মত সম্ভ্রম জাগাত। তার তলায় চলেছে সাধুর সাধনা, পথিক পেয়েছে বিশ্রাম, রাখাল গিয়েছে নিদ্রা, সরীসৃপ তার কোটরে গর্জন করেছে, মাথায় শকুন বসেছে, ডালে শুক বাসা বেঁধেছে, রাত্রের অন্ধকারে ব্যভিচার চলেছে। তার তলায় ডাকাতেরা, চোরেরা, ঠ্যাঙাড়েরা এসে মজলিস করেছে, মন্ত্রণা করেছে, লুঠের মাল ভাগ করেছে। তার ডালে দড়ি বেঁধে গলায় জড়িয়ে কেউ আত্মহত্যা করেছে। কোন অমাবস্যার রাত্রে তারই তলে শবাসনে ব'সে তান্ত্রিক তপস্যা করেছেন। আর জীর্ণমূল বনস্পতি ঝড়ের অপেক্ষা করেছে আকাশের দিগন্তের দিকে চেয়ে। কখন আসবে ঝড়? ভেঙে পড়বে সে, তার আত্মা সেই ঝড়ে উড়ে মহাকালের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। মাটির তলায় নূতন কালের বীজ তখন ফেটেছে, অঙ্কুর উঠছে। ওই বনস্পতিরই ঝরে পড়া বীজের অঙ্কুর, তারই গোড়ায় সে জন্মাচ্ছে। ঝড়ে চারিদিক বিপর্যস্ত হবে, বর্ষণে মাটি নরম হবে, অতীত কালের বনস্পতি ধরাশায়ী হয়ে আকাশপথ করবে উন্মুক্ত, সেই পথে নূতন কালের অঙ্কুরের আলোকসাধনা হবে শুরু। কখন আসবে ঝড়?

মানুষও তখন বলতে শুরু করেছে—এর শেষ কর! আর সয় না।

কবে আসবে নূতন দিন?

৯

এল ঝড়। এল নূতন কাল। এল আমার কালের নূতন কাল।

১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন।

বাঙালীর জীবনে—ভারতবর্ষের জীবনে সে একটি মহামহিমময় দিন। এমন দিন জাতির জীবনে, দেশের ইতিহাসে বহু শত বৎসরে একবার আসে।

সূর্যোদয় হয় নিত্য; পাখীরা কলরব করে, ফুল ফোটে, কীটপতঙ্গেরা পাখা মেলে ভেসে পড়ে; গুঞ্জনধ্বনি তোলে, মানুষ জেগে ওঠে—তাদের বাঁধাধরা কাজ-কর্মের বোঝা কাঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানকে বহন ক'রে নিয়ে চলে প্রত্যাশাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে;

কালকে নিয়ে চলে কালান্তরের সন্ধিক্ষণের পানে। চলে—চলে—চলে। দিনের পর দিন চ'লে যায়, এক পুরুষের বোঝা অপর পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা অন্তিম নিশ্বাসের সঙ্গে বেদনায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যায় এই ব'লে যে, 'পুরুষান্তর হ'ল, তবু সেই সন্ধিক্ষণ এল না; বহুকামনার কালান্তর হ'ল না।' কামনা ক'রে যায়, 'যেন তার পরবর্তী পুরুষের জীবনে সেই সন্ধিক্ষণ আসে।'

১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন সেই সন্ধিক্ষণ এল, ঘোষণা ক'রে বললে—'আমি এলাম।'

সেই তিরিশে আশ্বিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে দিন দেশ যে জেগে উঠল—সে জেগে ওঠার তুলনা নাই। সেদিন পাখীরা যেন কলরব ক'রে গেয়ে উঠল—

"ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।"

ফুলেরা ফুটল, তাদের বর্ণে গন্ধে বাণী ফুটে উঠল—

"তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়।"

কীট-পতঙ্গের পক্ষগুঞ্জনে উঠল তারই প্রতিধ্বনি। মানুষেরা জেগে উঠল, সূর্যপ্রণাম ক'রে বললে—

"হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়
তোমারি হউক জয়।...
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয়।"

মহাকবির কাব্যকে আশ্রয় না-ক'রে তার মহিমা প্রকাশ করা যায় না।

আমার জন্ম ১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসে। ১৯০৫ সালের অক্টোবরে আমার বয়স সাত বছর দু মাস। আমার চোখে সে-দিনের সে জাগরণের স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে। মনে পড়ছে ভোর হতে না হতে গ্রামের তরুণ দলের সাড়া জেগে উঠল। এ ওকে ডাকছে, ও তাকে ডাকছে—

—নির্মল!

—কে? গোপাল?

—হ্যাঁ। উঠে আয়।

—আসছি।

—আয়। আমরা আর সবকে ডাকতে যাচ্ছি।

—ষষ্ঠী! ষষ্ঠী!

—ষষ্ঠী তো বেরিয়ে গেছে বাবা। সে ফোড়নকে ডাকতে গিয়েছে।

—গাবু! গাবু!

—যাচ্ছি।

—ধীরেন উঠেছে?

—উঠেছি। আমি ছোটকাকা একসঙ্গে যাচ্ছি।

—সুধীর! সুধীর!

—সে কালীকিঙ্করের বাড়ীতে।

—রজনী! রজনী!

—সে কালীকিঙ্করের বাড়ী গেল সুধীরের সঙ্গে।

—কালীকিঙ্কর!

—যাচ্ছি আমরা।

ডাক চলেছে এপাড়া থেকে ওপাড়া। সেখান থেকে বাজারপাড়া। ওদিকে ইস্কুল-বোর্ডিং থেকে সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি ভেসে আসছে—বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্!

আমার বাবা উঠতেন একটু দেরিতে। আগেই বলেছি তাঁর বৈঠকখানায় একটা বড় মজলিস বসত। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের অন্তত অর্ধেক প্রধানেরা এসে সমবেত হতেন। সে মজলিস চলত রাত্রি বারোটা পর্যন্ত। তারপর বাড়ি এসে মুখ হাত ধুয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে ইষ্টস্মরণ সেরে শুতে প্রায় একটা বাজত। কোন কোনদিন মজলিস ভাঙতে আরও দেরি হ'ত। কাজেই ভোরে তিনি উঠতে পারতেন না। সেদিন কিন্তু ভোরবেলা উঠেছিলেন তিনি। তাঁর ডায়েরীতে সে কথার উল্লেখ রয়েছে। আমার মনে আছে—তিনি আমাকে একটি গল্প বলেছিলেন। তিনি গল্প বড় একটা বলতেন না। সেদিন বলেছিলেন। বলেছিলেন, সুলতান মামুদের সোমনাথ-মন্দির ধ্বংসের গল্প। একটা কথা তার মধ্যে আজও মনের মধ্যে জলজল করছে। বলেছিলেন—"সোমনাথ শিবলিঙ্গকে উপড়ে নিয়ে গেল সুলতান মামুদ। সোমনাথ আপত্তি করলেন না, রুদ্রমূর্তিতে জেগে উঠলেন না, তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন হিন্দুর অধঃপতন দেখে। দেবতা প্রসন্ন থাকেন, সাহায্য করেন, পরিত্রাণ করেন সাধুকে। সাধু কে? না, যিনি সৎ, যিনি পবিত্রাত্মা, তিনি। হিন্দু জাতি তখন অধঃপতিত, তাদের সততা নাই, অন্তরের পবিত্রতা নাই, তাই দেবতা তখন তার প্রতি বিমুখ। দেবাদিদেব বহুপূর্বেই ওই পাথরের গড়া লিঙ্গ-মূর্তি ভিতর থেকে চ'লে গিয়েছেন স্বস্থানে। মন্দিরের পাণ্ডারা, পূজকেরা ওই লিঙ্গমূর্তির নিচে একটা গহ্বর তৈরী ক'রে তাতে লুকিয়ে রাখত ধন সম্পদ—কোটী কোটী টাকা মূল্যের সোনা মণি মাণিক্য। দেবাদিদেব শিব পরম বৈরাগী, শ্মশানের ছাই তাঁর অঙ্গভূষণ, মড়ার হাড় তাঁর আভরণ, পশুচর্ম তাঁর বসন। সম্পদ সোনা রূপা হীরা মণি মাণিক্যের স্পর্শে তাঁর শরীরে যন্ত্রণা হয়। ঘর দোর তিনি তৈরী করেন না, তিনি ঘুরে বেড়ান শ্মশানে, বাস করেন হিমালয়শিখরে কৈলাসে। তিনি লোভী পূজক আর

অধঃপতিত, অপবিত্র-আত্মা মানুষের পূজা নেবেন কি ক'রে? তাই চ'লে গিয়েছিলেন। সেই কারণেই দেবতা-পরিত্যক্ত পুণ্যহীন উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুরা হ'ল পরাজিত। অনায়াসে সুলতান মামুদ জয় করলেন সোমনাথের মন্দির, ভেঙে ফেললেন পাথরের শিবমূর্তি। পেলেন রাশি রাশি ধন। সেই ধনসম্পদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন শিবমূর্তি। হাহাকার উঠল দেশে—সমস্ত ভারতবর্ষে। অরক্ষিত হ'ল ভারতবর্ষ। তখন স্বপ্নাদেশ দিলেন পরমেশ্বর। স্বপ্নে বললেন—"অধঃপতনের এ হ'ল প্রায়শ্চিত্ত। এ প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে, যে দিন সমস্ত জাতি অনুতপ্ত হয়ে আবার পুণ্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে, পুণ্য যেদিন সঞ্চিত হবে সেই দিন। এমনি পুণ্যবান যদি কেউ আমার বেদীতে বা ওই বিদেশে গিয়ে আমার ভগ্নমূর্তির উপর এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল আর একটি মাত্র বিল্বপত্র নিয়ে 'নমঃ শিবায়' ব'লে দিতে পারে—তবে সেই মুহূর্তে আমি আবার আবির্ভূত হব।" গল্পটি শেষ ক'রে বলেছিলেন, 'জান বাবা, আজ যে এই দিন—এ বোধ হয় সেই দিন। আজ বোধ হয় আমাদের চৈতন্যোদয় হ'ল। আজ বোধ হয় শুরু হ'ল পুণ্য সাধনার।' চোখ তাঁর ছলছল ক'রে উঠেছিল।

পুণ্য সাধনার যে সূত্রপাত হ'ল, এ যেন সে দিন চোখে দেখা গিয়েছিল। বেলা দশটা নাগাদ গ্রামের রাস্তায় বের হ'ল প্রকাণ্ড মিছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক ঘরের অল্পবয়সী ছেলেরা, বোর্ডিঙের ছেলেরা—খোল করতাল বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। দলের পুরোভাগে ছিলেন কে কে—সকলকে স্মরণ করতে পারি না। তবে তিন-জনকে মনে আছে। আমাদের গ্রামের শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি সুগঠিতদেহ গোপালবাবু আমার চোখে সেদিনের লাভপুরের নব অভ্যুদয়ের অগ্রদূত। সৃষ্টিকর্তা দুর্লভ মূলধন দিয়ে তাঁকে যেন পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার মত রূপ, দুর্লভ সুকণ্ঠ, জন্মগত সঙ্গীতপ্রতিভা, তেমনি প্রতিভা ছিল সাহিত্যে; বুদ্ধি ছিল শাণিত তীক্ষ্ণ, সাহস ছিল অপার। তিনিই ছিলেন সেদিন গানের দলের অগ্রগায়ক অধিনায়ক। তাঁর পাশে আরও দুজন ছিলেন—একজন স্বর্গগত নির্মলশিববাবু, অপরজন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বর্গত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অল্পবিস্তর পরিচিত। বিশেষ ক'রে তাঁর 'রাতকানা' প্রহসনটি বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের প্রহসন বিভাগে স্থায়ী আসন পেয়েছে। তিনি আমাদের গ্রামের আকাশের নবোদিত ভাস্করতুল্য—নবীন ধনী স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর ছোট ছেলে। ইতিমধ্যেই ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিরা যাদবলাল-বাবুকে করস্পর্শ দিয়ে সম্মানিত করেছে, নিজের সামনে চেয়ার দিয়ে বসবার অধিকার দিয়েছে, কানে কানে ভাবীকালে খেতাবের কথাও বলেছে। বলেছে, তোমরাই হ'লে আইন ও ন্যায়াধিকারে প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। তুমি দেখবে যাদবলালবাবু, এখানে যেন ওই সব বাজে হুজুগ—That Suren Banerjee's wretched Bandemataram movement, কাপড় পোড়ানো, এ সব না হয়। কিন্তু নির্মলশিববাবু সে দিন ছিলেন তরুণ। সে দিন তিনিও সাড়া না-দিয়ে পারেন নি। তিনি ছিলেন পুরোভাগে, তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। আর স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন—আমাদের নূতন হাই ইস্কুলের

থার্ড মাস্টার। তেজস্বী দীপ্তিমান মানুষ। খড়্গের মত নাক, চোখ দুটি ছিল অদ্ভুত ছোট, কিন্তু তাতে ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবং সে দৃষ্টির মধ্যে ছিল অকুতোভয়তা। আর ছিলেন তিনি সুবক্তা, সুবক্তা বললেও ঠিক বলা হ'ল না—তাঁর মধ্যে বাগ্মিতার বীজ ছিল।

আজ এই তিনজন সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা কথাই তিনজন সম্পর্কে মনে হচ্ছে। তিন-জনেই জীবনে সার্থক হতে পারেন নি। গভীর বেদনা অনুভব করি তিনজন সম্পর্কে। মধ্যে মধ্যে ভাবি কেন পারলেন না? অথচ উপাদান ছিল প্রচুর।

স্বর্গীয় নির্মলশিববাবুর কারণ জানি। ধনসম্পদ এবং ইংরেজ সরকারের রাজপুরুষদের মোহে প'ড়ে তিনি তাঁর সাধনমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। সুখ তাঁকে নষ্ট করেছিল। তিনি যদি রায় বাহাদুর উপাধি না পেতেন, তবে শেষ জীবন এমন সকরুণভাবে নিষ্ফল ব্যর্থ হ'ত না। তাঁর জীবনে ছিল সুদুর্লভ একটি গুণ, বহু তপস্যা না ক'রে এ গুণ আয়ত্ত করা যায় না। মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, সে জন্মায় জীবরূপ নিয়ে, তার স্বাভাবিক ধর্ম হ'ল ক্রোধ হিংসা লোভ। নির্মলশিববাবু জন্মেছিলেন যেন অক্রোধ নিয়ে। ওটি যেন ছিল তাঁর জন্মগত গুণ-সম্পদ। শেষবয়সে উপাধি এবং সম্পদ তাঁর দেবদুর্লভ গুণকে বহুলাংশে নষ্ট করেছিল। বাইরের যাঁরা তাঁরা হয়তো এর আঁচ পান নি। আর যারা লাভপুরের নিকটের মানুষ—তারা এ আঁচ পেয়েছিল। আর ছিল প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগ, অভিনয়-প্রীতি ও প্রতিভা। এমন অভিনয়-প্রতিভা ও প্রীতি দুর্লভ। জীবনের প্রথমাংশে এসব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সত্যকারের সাধক। তাঁর সাধনার ফল গোটা গ্রামকে ধন্য ও সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু সে সাধনাতেও তাঁর ছেদ টেনে দিলে ইংরেজ রাজসরকারের তুচ্ছ প্রসাদ প্রলোভন।

নিত্যগোপালবাবুকে নষ্ট করেছে, তাঁর জীবনকে ব্যর্থ করেছে, ঠিক তার উল্টো দিকের আঘাত। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বাড়ীতে শাসন ছিল অতিমাত্রায় কঠোর, আঠারো-উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাকার হাতের বেত্রাঘাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তবু হার মানেন নি। হার মানতে হ'ল নিষ্ঠুর অভাবের মধ্যে প'ড়ে। আদর্শানুরাগী তরুণ, কন্যা-দায়গ্রস্ত শিক্ষককে তাঁর অন্তিমশয্যায় প্রতিশ্রুতি দিলেন, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করলেন। শিক্ষক তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। গোপালবাবু গোপনে শিক্ষক-কন্যাকে বিবাহ ক'রে প্রতিশ্রুতি রাখলেন। কিন্তু বিবাহের সন্ধ্যাতেই কথাটা প্রকাশ পেয়ে গেল। বেত্রপাণি খুল্লতাত লোক নিয়ে ছুটে গেলেন, বিবাহ বন্ধ করবেন। কিন্তু তখন বিবাহ হয়ে গেছে। বর্জিত হলেন সংসার থেকে গোপালবাবু। বয়স তখন ১৯।২০, আরম্ভ হ'ল দুঃখের পরীক্ষা। উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। আশ্রয় নাই, অন্নসংগ্রহের সাধ্য নাই; কি করবেন? ওই অবস্থাতেই অগ্রসর হতে না-পেরে তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হ'ল, তারও বেশী—নিতে হ'ল তাঁকে পুলিসের চাকরি। জীবনাদর্শের সব শেষ হয়ে গেল। নইলে তিনিই নিয়ে এসেছিলেন আমাদের গ্রামে বিবেকানন্দের ভাবধারাকে বহন ক'রে। সাহিত্যসাধনার একটি ধারাকে শঙ্খ বাজিয়ে নিয়ে

এসেছিলেন তিনি এবং নির্মলশিববাবু, তাঁরাই এ ক্ষেত্রে ছিলেন যুগ্ম ভগীরথ। সবচেয়ে বড় ছিল তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা। এমন সতেজ এবং সুডৌল মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর বোধ হয় আমার জীবনে আমি শুনি নি। সে সুরমাধুর্য আজও কানে লেগে রয়েছে। শঙ্করাচার্যের শিবাষ্টকং, রবীন্দ্রনাথের 'কে হে মম মন্দিরে' এ গান দুখানি ছেলেবেলায় শুনেছি, অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

থাক্ সেসব কথা।

মিছিলের কথা বলি।

সেদিন মিছিল চলল করতাল বাজিয়ে, দেশের বন্দনা গান গেয়ে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে এসে উপনীত হ'ল আমাদের গ্রামের মহাপীঠে। সেখানে স্নান করলেন সকলে।

'ভাই-ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই' বলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

'বাংলার মাটি বাংলার জল' মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে হলুদ রঙের রাখী বাঁধলেন পরস্পরের হাতে। শপথ নিলেন—এ শপথ সকলে নিলেন নিজের কাছে নিজে। শপথ নিলেন—'সকল দুর্বলতাকে করব পরিহার, আত্মনিয়োগ করব পুণ্যের তপস্যায়। সকল কালিমাকে করব মার্জনা, করব ধৌত, করব মুক্ত। অন্তরকে করব শুভ্র, করব নির্মল সুপরিচ্ছন্ন সুপবিত্র।'

আশ্চর্যের কথা, তরুণেরা যারা ইতিমধ্যেই জমিদার ও তান্ত্রিক-প্রধান গ্রাম্য-সমাজের প্রভাবে মদ্যপান শুরু করেছিল, কলকাতা-ফেরত যারা কলকাতার ফ্যাশন ও বিলাসলালসায় মদ্যপান শুরু করেছিল—দুই দলই শপথ করলে, ছাড়ব।

এরা বললে—মদ খাব না।

ওরা বললে—Drink করব না।

এরা খেত—দেশী মদ।

ওরা খেত—হুইস্কী।

সত্যিই সেদিন এল নবযুগ। নূতন সূর্যোদয়। জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব যেন প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম।

আমার হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন আমার মা।

আমার বড় মামা তখন লাভপুরে ছিলেন। তাঁরও থাকা উচিত ছিল মিছিলের পুরোভাগে। কিন্তু তিনি তা থাকেন নি। ছিলেন পিছনে। তাঁর সঙ্গে তখন বিপ্লবী দলের ক্ষীণ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। মুরারীপুকুর বাগানের বোমারু দলের সঙ্গে পাটনার কিছু লোক সংস্রবে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তিনি মিছিল থেকে ফিরে মায়ের হাতে রাখী বাঁধলেন। মা একটি রাখী নিয়ে আমার হাতে বেঁধে দিলেন।

মনে আছে আমার। স্পষ্ট মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে—গোপালবাবু কবিতা রচনা ক'রে হাতে লিখে নাটমন্দিরের দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছেন। শুনলাম ওটা নাকি রাজদ্রোহমূলক কবিতা। বয়স তখন আমার সাত পূর্ণ

হয়েছে। রাজদ্রোহ কাকে বলে ঠিক বুঝি না। তবে কবিতাটিতে যে একটি ঝাঁঝ ছিল, সে অনুভব করবার মত আমার মনের স্পর্শশক্তি তখন হয়েছে। সে কবিতাটির একটা লাইন আজও মনে আছে। ভাবটা গোটাই মনে রয়েছে। কবি বলছেন মহাশক্তিকে—মা, তুমি জাগো…মা, তুমি জাগো। যে লাইনটি মনে আছে, সেটি হচ্ছে এই—

"দেবাসুর-সংগ্রামের এই তো সময় !"

মনে হয়েছিল …অসুর ওই ইংরাজেরা। স্পষ্ট মনে আছে।

১০

কয়েক বৎসর আগে হ'লে ও-লাইনের অর্থ হ'ত অন্যরূপ। বুঝতাম, অসুর মানে তারাই যারা সোমনাথ ভেঙেছে, বেণীমাধবের ধ্বজা ভেঙে মসজিদ তুলেছে, যারা বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের চূড়া ভেঙেছে ; কিন্তু উনিশ শো পাঁচ সাল নূতন কাল নিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে আনলে নূতন ব্যাখ্যা নূতন ব্যঞ্জনা। এ ছাড়াও অনেক কিছু নিয়ে এল।

বিচিত্র আবির্ভাব! কেমন ভাবে সে যে এল তা ব'লেও যেন তৃপ্তি হচ্ছে না। গাজনে মহাকালের পূজা হয়, ধ্বজাপতাকা উড়িয়ে ভক্তবৃন্দ উচ্চকণ্ঠে কালাধিপতি মহাকালের নাম ঘোষণা ক'রে বলে, বলো—শিবো কালরুদ্র। নূতন বৎসর আসে, সে নিয়ে আসে নূতন জীবন। এও ঠিক তেমনি। বন্দেমাতরম্!

উনিশ শো পাঁচ সালের পর নূতন জীবন আত্মপ্রকাশ করল।

আগে বলেছি, এর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের গ্রামে ছিল পুরানো কালের মানুষদের অসহায় মনের ধর্মবিশ্বাস—অন্ধ ধর্মবিশ্বাস। আর এক দিকে ছিল নূতন কালের ইংরাজী সভ্যতার ফেনা অর্থাৎ ফ্যাশন। নিছক ফ্যাশন। যাকে আমি তুলনা করি সেকালের প্রচলিত—O. H. M. S. Whiskyর সঙ্গে। ইংরেজ জাতির অধিপতির প্রতি আনুগত্য সঞ্চার করা এই ফ্যাশনের একটি স্বভাবধর্ম ছিল। সেই হিসাবে O. H. M. S. নামটি সার্থক।

হঠাৎ Whisky পরিণত হ'ল সঞ্জীবনী রসে।

নেশার উত্তেজনায় কৃত্রিম জীবনোচ্ছ্বাস নয়, এ যেন স্বতোৎসারিত ভোগবতী ধারার আত্মপ্রকাশ। চোখের সামনে সে দেখা দিল আমাদের বীরভূমের বৈশাখের তৃণহীন গৈরিক প্রান্তরের বুকে—নববর্ষণে শ্যামলাভায় জেগে-ওঠা তৃণাঙ্কুর প্রকাশের মত। বিস্ময় লাগে। প্রশ্ন জাগে, লাল মাটির রুক্ষ রসহীন বুকের মধ্যে এই পৃথিবী-দগ্ধ-করা রৌদ্র সহ্য ক'রে এই তৃণবীজগুলি বেঁচে ছিল কেমন ক'রে ? মনে মনে যেন অনুভব করতে পারি—জীবন অবিনশ্বর। সেদিনও মনে হয়েছিল জীবনমহিমা—মানবসাধনা অবিনশ্বর।

শুধু তৃণাঙ্কুরই জাগল না, কিছুদিনের মধ্যেই ফুল ধরল ঘাসগুলির ডগায়। উনিশ শো পাঁচ সালেই 'বন্দেমাতরম্' নাম ললাটে ধারণ ক'রে জেগে উঠল দুটি প্রতিষ্ঠান। আরও একটি প্রতিষ্ঠান জাগল, যার নামে বন্দে মাতরম্ না থাকলেও বন্দে মাতরমের প্রত্যক্ষ প্রাণধর্ম ছিল

সেই প্রতিষ্ঠানটিতেই।

'বন্দেমাতরম্ থিয়েটার'। থিয়েটার শব্দটিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করবার মত মনোভাব তখনও হয় নি। আর হ'ল 'বন্দেমাতরম লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠা।

আর প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'দরিদ্র সেবা ভাণ্ডার'। এর প্রতিষ্ঠাতা নিত্যগোপালবাবু, তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বর্গীয় শৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবলালবাবুদের প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারবংশের সন্তান।

বন্দেমাতরম্ থিয়েটার, বন্দেমাতরম্ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতাদের অগ্রণী ছিলেন স্বর্গীয় নির্মল-শিববাবু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিত্যগোপালবাবু, দ্বিজেনবাবু। থিয়েটারের মধ্যে ছিলেন আর একজন। তিনি ছিলেন আমাদের গ্রামের জামাতা, গৃহজামাতা—স্বর্গীয় শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। শশাঙ্কবাবুর প্রাণ ছিল এই থিয়েটার। আরও একজন ছিলেন প্রথম দিকে, তাঁর নাম ছিল রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনিও ছিলেন গৃহজামাতা। শশাঙ্কবাবুর কথা একটি গল্পে আমি বলেছি, 'চন্দ্র জামাইয়ের জীবন-কথা'য়। শেষের দিকটা কল্পনা। অবশ্য পুরো কল্পনা নয়, দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁর আকর্ষণ তখন জেগেছিল। আমাকে গোপনে বলেছিলেন—আর বয়স নাই তারাশঙ্কর! সাহস পাই না। ভরসা হয় না।

থাক্ সে সব কথা। থিয়েটারের কথা বলি। থিয়েটার আমাদের গ্রাম্য সমাজে অনেক রস পরিবেশন করেছে। ভালয় মন্দতে অনেক দিয়েছে। নূতন যুগের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় আমাদের এই নাট্য-আন্দোলন যতখানি করিয়ে দিয়েছে, ততখানি আর কিছুতে হয় নি।

নির্মলশিববাবু, নিত্যগোপালবাবু আগেই সাহিত্যের অমৃতরসের সন্ধান পেয়েছেন। সাহিত্যরস-পিপাসার সঙ্গে এই নাট্য-আন্দোলনের সমন্বয় ঘটল। তাঁরা নাটক লিখেছেন—অভিনয় হয়েছে। হয়তো নাট্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না-হ'লেও তাঁরা সাহিত্য-চর্চা করতেন। কিন্তু তাঁরা ছাড়া গ্রামে যুবক সম্প্রদায় ছিল, তারাই অনেকখানি রক্ষা পেল নাট্য-আন্দোলনের প্রভাবে। কয়েক জনের কথা বলি। নির্মলশিববাবুদের সমবয়সী বন্ধু ছিলেন দুজন—একজন ষষ্ঠী, অপর জন সীতাংশু, ডাকনাম ফোড়ন। ষষ্ঠী ফোড়ন তখনও পড়ে। পড়ে নামমাত্র। অধঃপতনের সকল আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। ষষ্ঠী টেরি কাটে—ডাইনে বাঁয়ে দু দিকে সামনের চুল কপালের উপর গুটিয়ে গোল হয়ে উঠে থাকে, লম্বা ফুলে-ফেঁপে থাকে, ষষ্ঠী তারই মধ্যে গুঁজে রাখে আস্ত তিনটি চারটি সিগারেট। এবং সেই নিয়েই ইস্কুলে যায়। বাড়ী ফেরে। বাড়ীতে গ্রাজুয়েট প্রাইভেট মাস্টার রেখেছিলেন বাপ। মাস্টার বই খুলে ব'সে থাকেন, ষষ্ঠী বাঁয়া তবলা নিয়ে সঙ্গীতচর্চা করে। ফোড়ন সঙ্গে থাকে। এমনি ফোড়ন এবং ষষ্ঠী অনেক তখন। এরা স্বাভাবিক ভাবে পরিণত হ'ত উনবিংশ শতাব্দীর বিকৃত তান্ত্রিক কি শৈব কি বৈষ্ণবে। কিন্তু এই নাট্য-আন্দোলন এদের নূতন কালের ভাবের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলে।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়ছে। তার নাম ছিল দুকড়ি চক্রবর্তী। বর্ণ-ব্রাহ্মণের ছেলে, সামান্য লেখাপড়া শিখেছে, তার উপর গিয়েছে দৃষ্টিশক্তি, প্রায় অন্ধ বললেই

হয়। দিনের আলোয় মানুষকে দেখে সে আবছা আবছা। রাস্তার ধারে বাড়ী—দাওয়ার উপরটিতে ব'সে থাকে রাস্তার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে। মানুষ যায় আসে—সে দেখে কিছু যেন নড়ছে, কিছু যেন চলছে। হঠাৎ কোন পরিচিত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর কানে এলে মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে ডাকে—কে মরিরাম? শোন—শোন।

মরিরামের দৃষ্টি আছে, কাজ আছে, সে চ'লে যায়—ঢুকড়ির মুখের আলো নিভে যায়।

ঢুকড়ি বাঁচল থিয়েটারে যোগ দিয়ে। সুন্দর চেহারা ছিল, অভিনয় করবার শক্তিও ছিল। আর একটা শক্তি ছিল, দৃষ্টিশক্তি ছিল না কিন্তু কানে শুনে সে পার্ট্ মুখস্থ ক'রে ফেলত অল্প সময়ের মধ্যে।

শশাঙ্কবাবু এসে ডাকতেন—দোকন?

—জামাইবাবু!

—এস।

শশাঙ্কবাবু হাত ধ'রে তাকে নিয়ে যেতেন, দোকন যেত—মহলার মজলিসে বসত। রাত্রে শশাঙ্কবাবুই তাকে পৌঁছে দিতেন। দোকন সকাল থেকে দাওয়ায় ব'সে পার্ট আওড়াত আপন মনেই। ক্রমে সে পেলে অভিনয়ে প্রতিষ্ঠা। তখন তার সঙ্গীর অভাব হ'ত না। বেকার যুবকেরা তার কাছে ব'সে আড্ডা জমাত। তার সুপারিশ নিয়ে তারাও ঢুকবে থিয়েটারে। তা ছাড়া লাইব্রেরী থেকে দোকন নাটক আনত। ওরাই তাকে প'ড়ে শোনাত। দোকন সুর ক'রে বক্তৃতা ক'রে যেত—

"উত্তাল তরঙ্গময়ী ফেনিল নর্মদা
ভীষণা রাক্ষসী-মুখে তুলিয়া হুঙ্কার—
কার লোভে ছুটিয়াছ পুনঃ উন্মাদিনী।"

অদ্ভুত ছিল তার স্মৃতিশক্তি। যে ভূমিকায় সে একবার অভিনয় করেছে সে ভূমিকার অংশ কোনদিন ভোলে নি। উলুপী নাটকে সে গঙ্গার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, সে ছবি আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে।

নাট্য-আন্দোলন আর একটি সুমহৎ কাজ করেছিল। গ্রামের সকল স্তরের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অতি মধুর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সেকালের গ্রাম্য সমাজ, গ্রামটি জমিদারপ্রধান, জমিদারেরা সকলেই ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকাল ধ'রে ব্রাহ্মণ সমাজের যুবকেরা অপর সকল স্তরের যুবকদের থেকে স্বতন্ত্র থাকতেন। চলায় ফেরায়, ওঠায় বসায় অহেতুক অশোভন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলতেন। এক দাওয়ায় এক বিছানায় বসতেন না, এমন কি কোন সাধারণ কর্মে গ্রামের তরফ থেকে সম্প্রদায়নির্বিশেষে কোথাও যেতে হ'লে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পথ চলতেন। মেলায় যাত্রা-কীর্তনের আসরে বাবুদের ছেলেরা বসত যেখানে, সেখান থেকে খানিকটা স'রে বসতেন অন্য সম্প্রদায়ের যুবকেরা। নাট্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে—সেই বিসদৃশ স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হয়ে গেল। নাট্যসম্প্রদায়ের মহলার আসরে সকলেই বসতেন এক ঘরে এক বিছানায়, সরস

হাস্যপরিহাসে সকলেই যোগ দিতেন, সকলেই হাসতেন সমান প্রাণ খুলে, সমান উচ্চ কণ্ঠে। শুধু তাই নয়—এই সর্বস্তরের যুবকদের এমনি অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফলে—জীবনে, আচার-আচরণে ও ব্যবহারের মধ্যে দেখা দিল উদ্ধত আভিজাত্যের পরিবর্তে উদার মাধুর্য, সস্নেহ আত্মীয়তা; অন্য দিকে সভয় সঙ্কোচ এবং গোপন হিংসার পরিবর্তে অসঙ্কোচ প্রসন্নতা, শ্রদ্ধান্বিত গুণমুগ্ধতা।

এর জন্য সমস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য দুটি লোকের। প্রথম, এ যজ্ঞের যাঁকে যজ্ঞেশ্বর বলা যায়—তিনি, স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে—তাঁর ধাতুর মধ্যে ছিল অপরূপ মাধুর্য। প্রথম যৌবনে মানুষকে কাছে টানবার, মানুষকে স্বীকার করবার, মানুষকে মানুষ ব'লে বুকে গ্রহণ করবার এই সহজাত মাধুর্য এবং ঔদার্যের তুলনা সংসারে বিরল—অতি বিরল। দ্বিতীয় জন—ওই শশাঙ্কবাবু, হাত ধ'রে এদের নিয়ে আসতেন, নির্মলশিববাবু পরমস্নেহে গ্রহণ করতেন সকলকে। শশাঙ্কবাবু ছিলেন ঘরজামাই। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি ঘরজামাই। যাঁরা চিরকাল বসবাসের সংসারেও জামাই সেজে থাকতেন, এক মুহূর্ত ভুলতেন না জামাইয়ের মর্যাদা—তিনি তাঁদের একজন। আমাদের গ্রামে তিনিই বোধ হয় শেষ খাঁটি ঘরজামাই। ভোরবেলা উঠতেন, প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে দস্তুরমত বেশভূষা ক'রে নিচে নামতেন, সামান্য জলযোগ ক'রে ছড়ি, থিয়েটারের বই এবং পার্টলেখার কাগজপত্র বগলে নিয়ে বের হতেন। এসে বসতেন—দোকনের দাওয়ায় অথবা গোপাল স্বর্ণকারের দাওয়ায়। তারা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে মোড়া বা চৌকি পেতে দিত। তামাক সেজে হুঁকাটি হাতে দিত। তিনি তামাক খেতেন, পার্ট লিখতেন, আর খোঁজ নিতেন—পাড়ার কোন্ কোন্ তরুণের থিয়েটারে যোগ দেবার অভিপ্রায় আছে, যোগ্যতা আছে। তাদের ডাকতেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতেন, নিমন্ত্রণ করতেন মহলার আসরে যাবার জন্য। সন্ধ্যার ঠিক আগে এসে তার দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতেন, এস, আমার সঙ্গে এস। তিনি জানতেন যে, সঙ্গে না-নিয়ে গেলে ইচ্ছা সত্ত্বেও ওরা যেতে পারবে না। গিয়েও হয়তো দরজার মুখ থেকে ফিরে আসবে। সঙ্গে নিয়ে হাসিমুখে শশাঙ্কবাবু আসরে ঢুকে বলতেন, একে নিয়ে এলাম। বেশ ছেলে—ভাল ছেলে!

নির্মলবাবু সহজাত মিষ্ট হাসি হেসে বলতেন, ব'স ব'স। তুমি তো- -এর ছেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এত দূরে—এমন ভাবে এক পাশে স'রে বসলে কেন? ভাল ক'রে উঠে ব'স। গান গাইতে জান?

—আজ্ঞে না।

—বাজাতে?

এবার চুপ ক'রে থাকত সে।

—বাজাতে পার তা হ'লে। কই, তবলাটা বাঁধ দেখি!

এগিয়ে দিতেন তবলাটা।

মজলিস চলত। গানে বাজনায়, সরস সর্বজনীনতার মহিমায়, উদার রসিকতায়, প্রসন্ন হাস্যের মধ্যে কেমন ভাবে যে সে একদিনেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠত, সে কথা কেউই বুঝতে পারত না।

মজলিস-শেষে শশাঙ্কবাবু জ্বালতেন তাঁর হ্যারিকেন লণ্ঠনটি। একেবারে আসল ভিট্‌জ লণ্ঠন। তেমনি ঝকঝকে, ঠিক যেন নতুনটি। কাচটি তেমনি পরিষ্কার। সপ্তাহে কাচটি একদিন ক'রে চুন মাখিয়ে সাফ করতেন। তেমনি আধখানা চাঁদের মত ক'রে কাটা পলতেটি। আলোটি জ্বেলে বলতেন, এস।

ডাকতেন তিনি—দোকনকে, হরি স্বর্ণকারকে, পঞ্চানন সাহাকে, ক্ষুদিরাম সাহাকে। প্রত্যেককে পৌঁছে দিয়ে তিনি বাড়ী ফিরতেন।

এর মধ্যেও কিন্তু শশাঙ্কবাবু ছিলেন—বিশ্বামিত্র। দুরন্ত ছিল তাঁর ক্রোধ। সে ক্রোধ হ'ত তাঁর অভিনয়ের সময়ে বা অভিনয়ের পথে ত্রুটিতে কি বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হ'লে। সুরেন গড়াঞীকে দেওয়া হয়েছিল একটি পরিচারকের ভূমিকা। রাজবাড়ীর পরিচারক। রাজবাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, নিরুপায় অসহায় বৃদ্ধ রাজার পরিত্রাণের কোন পথ নেই। রাজা ডাকছেন—ওরে, কে আছিস—আমার জপের মালা। ওরে—মালা আন্, আমার জপের মালা। ওরে কে আছিস—

শশাঙ্কবাবু তিন মাস প্রত্যহ সুরেনকে তালিম দিয়েছেন—মালাগাছি হাতে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে—রাজাকে প্রথম প্রণাম করবে, তারপর মালাগাছি রাজার হাতে দেবে, তারপর আবার একটি প্রণাম ক'রে চ'লে আসবে। সুরেন প্রতিদিন মহলার সময় ঠিক ঠিক নির্দেশ পালন ক'রে এসেছে। অভিনয়ের দিন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে সুরেন, শশঙ্কবাবু মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা ডাকছেন। ঠিক সময়টিকে মালা সুরেনের হাতে দিয়ে—রেসের ঘোড়াকে জকির ইঙ্গিতের মত ইঙ্গিত দিলেন তিনি। সুরেন প্রবেশ করলে রঙ্গমঞ্চে। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে দর্শকভরা আসরের দিকে তাকিয়ে তার কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সে প্রণাম করলে, তারপর মালাখানি রাজার হাতে না দিয়ে নিজের গলায় পরলে, তারপর আবার প্রণামটি ক'রে ফিরে এল। এক গা ঘেমে সে তখন যেন নেয়ে উঠেছে। ওদিকে দর্শকের আসরে হাসির অট্টরোল উঠেছে তখন। শশাঙ্কবাবুর মনে হচ্ছে, সমস্ত অভিনয়ের উপর বজ্রাঘাত হয়ে গেল। মাথায় তাঁর আগুন জ্ব'লে গেল। সুরেন উইংসের ফাঁক থেকে পা বের করবামাত্র তার গালে তিনি বসিয়ে দিলেন প্রচণ্ড চপেটাঘাত।

সুরেন জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেল সেইখানে।

শশাঙ্কবাবুর দৃক্‌পাত নেই, তিনি তার গলা থেকে মালাখানি খুলে নিয়ে নিজেই গিয়ে দিয়ে এলেন রাজার হাতে।

দোকনদের দল বলত, বাপ রে—জামাইবাবু সাক্ষাৎ বাঘ!

আবার বলত, এমন মানুষ আর হয় না।

সুরেনও বলত।

পরের দিনই শশাঙ্কবাবু নিজে গিয়েছিলেন সুরেনের বাড়ী।

—সুরেন! সুরেন!

—কে?

—আমি হে। শশাঙ্কবাবু। জামাইবাবু। শোন। বাইরে এস।

—আজ্ঞে জামাইবাবু!

—কাল মেরেছি। বড় লেগেছিল তোমার। তোমার—

'তোমার কাছে মাফ চাইতে এসেছি' বলতে পারেন না। মুখে বাধে। কিন্তু সুরেন বুঝে নেয়। সে পায়ের ধুলো নিয়ে বলে—আজ্ঞে না। লাগে নাই বেশী।

—আজ যেন ঠিক সময়ে যেও। ঠিক আটটায় প্লে আরম্ভ হবে।

—যাব আজ্ঞে।

অভিনয়ের ত্রুটির জন্য শুধু যে সুরেন গড়াঞীরাই মার খেয়েছে শশাঙ্কবাবুর হাতে তা নয়। রথী-মহারথীরাও মার খেয়েছে, তিরস্কৃত হয়েছে। স্বয়ং নির্মলশিববাবুও একবার চড় খেয়েছিলেন। নির্মলশিব ছিলেন অক্রোধ। চড় খেয়ে হেসে বলেছিলেন, বড় জোর হয়ে গেছে হে শশাঙ্ক।

নির্মলশিববাবু পার্ট মুখস্থ করেন নি। নিজে ছিলেন নাট্যকার, পার্ট আটকায় নি, তিনি নিজেই গ'ড়ে ব'লে চালিয়ে এসেছিলেন।

আর একবার নির্মলশিববাবু রঙ্গমঞ্চে হেসে ফেলেছিলেন। তার জন্যও শাস্তি দিয়েছিলেন শশাঙ্কবাবু। পরবর্তী অভিনয়ে তাঁকে সামান্য দূতের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

আর একবার, ইন্দুবাবু নামে একজন বিদেশী ভদ্রলোক অভিনয় করবেন। অভিনয়ও হচ্ছে বিদেশে। লাভপুর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে—সুপ্রাচীন জমিদার-প্রধান গ্রাম এড়োয়ালীতে। কাঁদীর কাছাকাছি। রেল-স্টেশন থেকে পনের মাইল পথ। গরুর গাড়ী ছাড়া যান নাই। অভিনয়ের দিন সকালবেলা ইন্দুবাবুর আসার কথা। কিন্তু গাড়ী ফিরে এল, ইন্দুবাবু এলেন না। সমস্ত দিন শশাঙ্কবাবু গ্রামের বাইরে পথের ধারে একটা গাছতলায় ব'সে রইলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেল, ইন্দুবাবু এলেন না। ওদিকে ডুপ্লিকেটের ব্যবস্থা হচ্ছে। অভিনয় শুরু হবে। হঠাৎ ইন্দুবাবু এসে হাজির হলেন অশ্বপৃষ্ঠে। মুখে রঙ, হাতে একগাছা মালা। ভদ্রলোক ধানবাদের ওদিকে কোথায় অভিনয় করছিলেন গত রাত্রে। অভিনয় শেষ হতে বিলম্ব হওয়ায় যে ট্রেন ধরবার, সে ট্রেন ফেল করেছিলেন; পরের ট্রেনে এসে অপরাহ্ণে নেমেছেন। গরুর গাড়িতে মাইল পাঁচেক এসে এক মিঞাসাহেবের কাছে অনেক কাকুতি ক'রে ভাড়া দিয়ে অশ্বটি সংগ্রহ ক'রে এসে পৌঁছেছেন। শশাঙ্কবাবু চপেটাঘাতের জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু বিবরণ শুনে ক্ষান্ত হন।

ইন্দুবাবুর কথায় নাট্য-আন্দোলনের আর একটি মহৎ কল্যাণের কথা মনে পড়ছে। সেটি হ'ল আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশ-দেশান্তরের যুবক সম্প্রদায়ের যোগাযোগ। এত বিদেশী ব্যক্তি, গণ্যমান্য রসিক জনের সঙ্গে আমাদের গ্রামের যোগাযোগ হয়েছিল যে, সে কথা স্মরণ ক'রে আজও বিস্মিত হই।

কামদাবাবু, ইন্দুবাবু, ললিতবাবু, প্রফুল্লবাবু, হরিশবাবু, সোমনাথবাবু, ফণিবাবু, আরও কত জন—তুলসীবাবু, প্রমথ, বলাই।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চের রাধাচরণ ভটচায দীর্ঘদিন লাভপুরে ছিলেন। তখন তাঁর বয়স অল্প, স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করতেন, মেয়েদেরও এত ভাল মানাত না নারী-ভূমিকায়। তেমনি ছিল সুকণ্ঠ।

ক্ষুদিরাম মালাকার। সে বোধ হয় পঁচিশ বৎসর অভিনয় করেছে লাভপুরে। আর্ট থিয়েটারের আমলে—তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র এঁরাও একবার লাভপুরে গিয়ে 'কর্ণার্জুন', নাটকে পরশুরাম ও ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের ভূমিকায় স্বেচ্ছায় অভিনয় ক'রে এসেছেন।

আর যেতেন স্বর্গীয় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ওখানে থাকতেন। নাটক লিখতেন। যেতেন স্বর্গীয় নাট্যকার ও অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মন্মথমোহন বসু মহাশয় গিয়েছেন। রসরাজ স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু গিয়েছেন। তিনিই আমাদের নবপর্যায় নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলন করেছিলেন।

আমি বাল্যকালে এঁদের দূরে থেকে দেখতাম।

প্রথম যৌবনে ধন্য হয়েছি এঁদের কাছে এসে।

মনের আবেগে কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে—একসঙ্গে অনেক কালের কথা ব'লে ফেলেছি। উনিশ শো পাঁচ সালে—আমাদের প্রথম রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হ'ল। আজও মনে পড়ছে। কি অপরূপ মায়ারাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল সেদিন। দৃশ্যপট—উজ্জ্বল আলো! অভিনয়ে নূতন সুর—নূতন ছন্দ! আমার শিশু নয়নের নিদ্রা কোথায় গেল কে জানে, আমি বিনিদ্র হয়ে ব'সে অভিনয় দেখলাম। হরিশ্চন্দ্র আর বিল্বমঙ্গল অভিনয় হ'ল প্রথম।

হরিশ্চন্দ্র ও বিল্বমঙ্গলবেশী নির্মলশিববাবুকে মনে পড়ছে। পাগলিনীবেশী নিত্যগোপাল-বাবুকে মনে পড়ছে। বিশ্বামিত্রবেশী শশাঙ্কবাবুকে মনে পড়ছে। চণ্ডালবেশী আমার মামাকে মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে—চিন্তামণি ও শৈব্যা-বেশী এক কলকাতার কিশোরকে। তার নাম ছিল শিবচন্দ্র। আরও একজন এসেছিল, তার নাম জ্যোতির্ময়। সেও এসেছিল কলকাতা থেকে।

এর পরই হ'ল পাকা স্টেজ। নূতন ড্রপসিন আঁকানো হ'ল। মধ্যস্থলে ভারতমাতা, দুই পাশে—এক দিকে হিন্দু, অপর দিকে মুসলমান; ভারতমাতা দুজনের হাত ধ'রে মিলিয়ে দিচ্ছেন। উপরে লাল অক্ষরে লেখা বন্দেমাতরম্ থিয়েটার। ছবির নিচে লেখা—'হিন্দু মুসলমান একই মায়ের দুই সন্তান'।

এসব নিয়ে এল ওই নূতন কাল।

* * *

এই যে এল নূতন কাল, সে অবশ্য এল আপন বেগে; কালবৈশাখী ঝড়ের মত এল। যা কিছু আবর্জনা, যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু পথে দিলে বাধা, তাদের উড়িয়ে ভেঙে ফেলে ঢেলে

দিলে বর্ষণ ; আবর্জনার পুঞ্জ মাটির সঙ্গে মিশে পচল, উর্বর ক'রে তুলল দেশকে, নূতন সৃষ্টি-সমারোহে চঞ্চল হয়ে উঠল চারিদিক। ঋতুর পর অন্য ঋতু কাল হতে কালান্তর আপনিই আসে। কিন্তু বসন্তশেষে গ্রীষ্মাবির্ভাবের মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তিতে আমরা করি গাজন। বৈশাখে বিষ্ণুদেবতার চন্দনযাত্রার অনুষ্ঠান ক'রে সচেতন ভাবে কাল হতে কালান্তরে মহাকালের পদচিহ্নে আলপনা এঁকে আমরা করি তার অর্চনা। অনেক সময় ঋতু অথবা কাল পরিবর্তনের জন্য সাধকেরা সাধনা করে থাকেন। ভারতবর্ষেও তাই হয়েছিল। সে মহাযজ্ঞের প্রথম সমিধ-সংগ্রহ এবং অগ্নি-প্রজ্বলন হয়েছিল বাংলা দেশেই। ইতিহাসে সে কথা লেখা হবে।

আমাদের গ্রামে যে যজ্ঞাগ্নির আলোর আভাস এল, তার উত্তাপও আমরা অনুভব করলাম। উচ্চারিত মন্ত্রসঙ্গীতের ঝঙ্কার মনের তানে কম্পন তুললে।

এর জন্যও আয়োজনের প্রয়োজন হয়, সাধনার প্রয়োজন হয়। সে সাধনা আমাদের গ্রামে যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মনে পড়ছে।

স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর কথা আগেই বলেছি। তিনিই গ্রামে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বালিকা বিদ্যালয়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তখন তাঁকে কীর্তির নেশায় পেয়ে বসেছে। শ্মশানভূমির মত একটা পরিত্যক্ত প্রান্তর তাঁর কীর্তিমালায় হেসে উঠেছে। তিনিই আমাদের গ্রামের সেই সাধক। মানুষও অকৃতজ্ঞ নয়, আজও লাভপুর বলতে আমরা যাদববাবুর লাভপুরকেই বুঝি। তাঁর উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে পরবর্তী কালে গ্রামের সমস্ত লোকের বিরোধ বেধেছে। আসল বিরোধ সেই প্রতিষ্ঠার বিরোধ, সে বিরোধ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু তবুও কেউ স্বর্গীয় যাদবলালবাবুকে ভুলে যায় নি, তাঁর স্মৃতির প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে নি। যাববলালবাবুর কীর্তি লাভপুরে অবিস্মরণীয়, তিনিই লাভপুরে নবযুগ-যজ্ঞ-প্রজ্বলনের সমিধ সংগ্রহ করেছিলেন, বেদী রচনা করেছিলেন, নৈবেদ্য সাজিয়েছিলেন। দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, নীলচক্ষু, হাস্যপ্রসন্ন মুখ, মিষ্ট কথা ; এ মানুষকে লক্ষের মধ্যে চেনা যায়। আমরা ছেলেবেলায় আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে খেলা করতাম, তিনি তাঁর ভিতরবাড়ী থেকে তাঁর ঠাকুরবাড়ী, কাছারীবাড়ীতে যেতেন ওই চণ্ডীমণ্ডপ হয়ে ; প্রতিটি ছেলের সঙ্গে কথা ব'লে যেতেন। তিনি আমার কাছে অবিস্মরণীয়। তিনি লাভপুরে আবির্ভূত না হ'লে, এই বর্তমান রচনা কোনদিনই রচিত হ'ত না। আমি লিখতেই হয়তো শিখতাম না। লাভপুর অন্তত বিশ-ত্রিশ বৎসর পিছিয়ে থাকত।

তাঁর সঙ্গে আর একজন এসেছিলেন লাভপুরের সৌভাগ্যক্রমে। তিনি স্বর্গীয় রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবলালবাবু তাঁর মেসোমশায় হতেন। দরিদ্রের সন্তান, অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভা দেখে যাদবলালবাবুই তাঁকে পড়তে সাহায্য করেছিলেন ; এম. এ. পাস ক'রে আগ্রা কলেজে অধ্যাপনা করতেন ; যাদবলালবাবুর কীর্তিস্থাপনের প্রারম্ভেই তিনি লাভপুরে এলেন। নূতন কালের শিক্ষায় প্রদীপ্তদৃষ্টি শক্তিশালী মানুষ, নিষ্ঠাবান সাধক, জীবনে বিপুল আশা ও উৎসাহ। তিনি প্রাণপাত পরিশ্রমে যাদবলালবাবুর সকল কীর্তিকে

সার্থক ও পূর্ণ ক'রে তুললেন। পরবর্তী কালে সমগ্র বীরভূম তাঁর কর্মে কল্যাণ পেয়েছে। তাঁর সে কর্মের সূত্রপাত লাভপুরে। তিনি বিবাহও করেছিলেন লাভপুরে।

আজও স্মরণ করতে পারি, তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমার বুকের ভিতরটা যেন গুরু গুরু শব্দে ধ্বনি তুলত। যখনই কালপরিবর্তনের কথা স্মরণ করি, তখনই আমার কল্পনানেত্রে আমি দেখতে পাই, লাভপুরের পশ্চিমদিকে গেরুয়া রঙের প্রান্তরে বেদী বাঁধা হয়েছে, সমিধ সংগৃহীত হয়েছে, নৈবেদ্য সাজানো রয়েছে। স্বর্গীয় যাদবলালবাবু স্নান ক'রে পট্টবস্ত্র প'রে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই যজমান ; যজ্ঞস্থলে বেদীর উপর উত্তরসাধকের বেশে স্থান গ্রহণ করেছেন অবিনাশবাবু। অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন স্বর্গীয় অতুলশিববাবু, স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপালবাবু, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্করবাবুরা দল বেঁধে ; ওঁদের পিছনে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। স্বয়ং কাল পুরোহিত।

যজ্ঞ প্রজ্বলিত হ'ল। ঘৃতগন্ধে আকাশ বাতাস ভ'রে উঠল। মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল। সব পাল্টে যেতে শুরু হ'ল। দ্রুত পাল্টে যেতে শুরু হ'ল সব।

১১

আমার শৈশবকালের পটভূমিতে দেশের দ্রুত পরিবর্তন, সমাজের পটভূমিতে গ্রামের দ্রুত পরিবর্তনের উপরেও আমাদের পারিবারিক জীবনে এল মর্মান্তিক পরিবর্তন। আমার বয়স তখন আট বছর। সে কথা বলবার আগে আমার ছেলেবেলার নিজের কথা কিছু ব'লে নেব। আমার মনে যে ঘটনাগুলি ছবি হয়ে রয়েছে সেইগুলির কথা। যে যে শৈশব-সাথীদের চোখ বুজলে আজও দেখতে পাই তাদের কথা। আগে বলব ঘটনার কথা।

আমার জীবনে প্রথমে সঙ্গী আসে নি, বন্ধু আসে নি, এসেছিল সঙ্গিনী, বান্ধবী। তার কথা আগে বলেছি। চারু আমার সম্পর্কে ভাই-ঝি, আমার থেকে বছর দেড়েক বড়। আমাদের বাড়ীতে কোন শিশু ছিল না, আমাদের সঙ্গে এক-দেওয়ালে-বাড়ী আমার জ্যাঠামশায়ের বাড়ীতেও কোন শিশু ছিল না। আমাদের বাড়ীর দৌহিত্র-বংশের কন্যা চারুই ছিল আমাদের নিকটতম বাড়ীতে আমার একমাত্র সমবয়সী। তার মা—আমার বউদিদি আমার মা'র চেয়ে বয়সে ছিলেন অনেক বড়। তবুও সেকালের প্রথা অনুযায়ী—বয়সে ছোট শাশুড়ীকে প্রণাম করতেন, ভক্তি করতেন। সে ভক্তি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তার কারণ অবশ্য আমার মায়ের ব্যক্তিত্ব এবং শক্তি। তাঁর কাছে আপনি মাথা নুয়ে পড়ত। তাঁরা সবাই ছিলেন আমার মায়ের গল্পের আসরের শ্রোতা।

চারু আমাকে পৃথিবীর অনেক কিছু চিনিয়েছে। বাড়ীর আশপাশ থেকে গাছ তুলে এনে সিমেন্ট-বাঁধানো উঠানে বাগান করতাম, চারু আমায় গাছের নাম বলত। আমের আঁটি থেকে ভেঁপু তৈরী হয় এ কথা সে-ই আমাকে বলেছিল। কাগজের নৌকা করতে সে-ই আমাকে শিখিয়েছিল। পুতুল খেলতে শিখিয়েছিল।

চারু আমার অত্যাচার সহ্য করেছে অনেক। মেয়ে ব'লেই বোধ হয় বয়সে বড় এবং দৈহিক শক্তি বেশী থাকা সত্বেও সে আমার প্রহার সহ্যই করত, কখনও আমার গায়ে হাত তোলে নি। একবার তার উপর চরম অত্যাচার করেছিলাম। এর আগে দেওঘর যাওয়ার কথা বলেছি। চারুর মাও পুত্রসন্তান কামনায় আমাদের সঙ্গে দেওঘর গিয়েছিলেন, সঙ্গে চারুও গিয়েছিল। চারুর কাকা—আমার আশুদাদা—তিনি সঙ্গে গিয়েছিলেন—তাঁর ছিল অম্লশূলের ব্যাধি। আশুদাদার স্ত্রী তাঁর জন্য ধর্না দিয়েছিলেন। আশুদাদা আমার প্রথম শিক্ষক। দেওঘরে হ'ল হাতেখড়ি; সেইখানেই তিনি শুরু করলেন আমাকে পড়ানো। আশুদাদা ছিলেন ছোটখাটো মানুষটি, মুখে ছিল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী। সাধারণ লোকের কাছে তিনি কেমন দেখতে ছিলেন জানি না, কিন্তু আমার স্মৃতিতে তিনি বড় সুন্দর মানুষ। ছোটখাটো মানুষ আশুদাদার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। আমার বাবা আমাদের অঞ্চলে ব্যক্তিত্বের জন্য, গম্ভীর প্রকৃতির জন্য খ্যাতনামা ছিলেন। আজও তাঁর নাম আমাদের গ্রামের আজকালকার প্রবীণেরা ক'রে থাকেন। আমার বাবার চেয়ে আশুদাদা বয়সে বড় থাকলেও সম্পর্কে ছিলেন ভাইপো, প্রতিষ্ঠায় ছিলেন অনেক ছোট। কিন্তু আশুদাদা বাবাকে অনেক সময় তিরস্কার করতেন। বিশেষ করে জমিদার বংশের মর্যাদা রাখতে গিয়ে মামলা-মোকদ্দমা করার ক্ষেত্রে বলতেন—কেন? মামলা কেন? যদি আপসে কথা বললে মিটে যায়, তবে মামলা কেন? আরও তিরস্কার করতেন যখন মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর দল এসে অতিথি হ'ত। বাবা হাসিমুখে সহ্য করতেন। আমার যত ভালবাসা ছিল এই মানুষটির উপর, তত ভয় ছিল। এই আশুদাদাও গিয়েছিলেন দেওঘরে। পাণ্ডাদের মহল্লায় বেশ একটা বড় বাড়ীতে বাসা হয়েছিল। কয়েকখানা ঘর প'ড়ে ছিল—তার মধ্যে একটাতে ছিল বোলতার চাক। একটা দ্বিপ্রহরে চারুর সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে দুজনে বোলতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিলাম। ছোট ছোট ঢেলা সংগ্রহ ক'রে এনেছিলাম পূর্ব থেকেই। ঢেলা ছুঁড়তে শুরু করলাম। ঢেলা লাগে না। তখন চারুই বললে—একটা লম্বা কিছু নিয়ে খোঁচা দিলে কি হয়?

কি যে হয় তা চারু কয়েক মিনিটের মধ্যেই উপলব্ধি করলে। লম্বা একটা কিছু—বোধহয় ঘর ঝাড়বার জন্য একটা বাখারিজাতীয় কিছু—বাড়ীওয়ালারা বাড়ীতেই রাখত—সেটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিলাম। বোলতারা ভোঁ ভোঁ ক'রে উড়ল—উড়ে তেড়ে এল। আমি বুঝে নিলাম কি হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ-দৌড়—পিছনে অনুসরণ করছে বোলতা। আমি ঘর থেকে বেরিয়েই দরজাটা দিলাম টেনে। চারু চীৎকার করতে লাগল ঘরের মধ্যে। মর্মান্তিক আর্তনাদ! আর্তনাদ শুনে ওদিক থেকে আশুদাদা চীৎকার ক'রে শাসন করলেন চারুকে, আমি আর দরজা খুলতে সময় পেলাম না, পালিয়ে এসে ঢুকলাম বাবার বিছানায়। চারু বোলতার কামড়ে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছিল। তবু সে আমার উপর রাগ করে নি। তবে চারুটা ছিল বুদ্ধিহীন, আশুদাদা বলতেন—মাথামোটা। দুর্ভাগিনী চারু আজও বেঁচে আছে। ভাইদের সংসারে নিঃসন্তান চারু, জীবনের ভার বহন ক'রে চলেছে। দুর্দান্ত মুখরা মেয়ে।

আমি যখন দেশে যাই, তখন সর্বাগ্রে দেখা হয় চারুর সঙ্গে। চারুর ভাইয়েরা গ্রামের ভিতর থেকে স'রে এসে স্টেশনের ধারে বাড়ী করেছে। আগে থেকে খবর জানা থাকলে চারু পথের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। নইলে আমার সাড়ায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ছানিপড়া চোখের মোটা কাচের চশমা আমার মুখের উপর তুলে আমায় দেখে বলে, এলেন ? ওরে বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে! এক যুগ পরে ? ব'লে সেই পথের উপরেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে।

আমি বলি—ভাল আছিস তুই ?

—ভাল ? ভাল কি ক'রে থাকব, বেঁচে রয়েছি যে! চারু হাসে।

চারুর পরে এল বন্ধুরা। প্রথম বন্ধু কে তা ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, দুজন প্রায় এক সঙ্গেই এসেছিল। একজন লক্ষ্মীনারায়ণ—অন্য জন প্রতুলকৃষ্ণ। ডাকনাম—নারাণ আর খোকা। শান্তশীল আর অশান্তশীল। একজন যত শান্ত, যত মধুর-প্রকৃতি, অপরজন তত অশান্ত-তত বিচিত্র-দুষ্টবুদ্ধি। নারায়ণ স্বর্গীয় নির্মলশিববাবুর মেজ বোনের ছেলে, যাদবলালবাবুর দৌহিত্র, তার মা গ্রামের মেয়ে, আমার মায়ের সমবয়সী, কিছু ছোট, সখী। তিনি ছেলেকে কোলে নিয়ে এলেন। নারাণের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল এক মুহূর্তে। আমার ছিল বিখ্যাত কার্তিক-গড়িয়ে মতিলাল মিস্ত্রীর হাতের তৈরী দুটি কার্তিক ঠাকুর। একই হাতের তৈরী, কিন্তু একটি ছিল খারাপ। খুব তাড়াতাড়ি গড়া ব'লেই এমন হয়েছিল। মতি বোধ হয় বিরক্ত হয়ে গড়েছিল। আমিই দুটির নামকরণ করেছিলাম—বাবু-কার্তিক, আর পেয়াদা-কার্তিক। আমি ছিলাম দুই কার্তিকেরই মালিক, সুতরাং আমি অনুগ্রহ ক'রে নিত্যই নারাণকে দিতাম পেয়াদা-কার্তিক। কোন কোনদিন জেদ ধরত, আজ বাবু-কার্তিক নেবেই সে। আমি তখন বলতাম—তবে আমি খেলবই না। তারপর জানলার গরাদ ধ'রে জানালায় উঠে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে হাত পুরে বাইরে আনতাম আর আকাশে উড়িয়ে দিতাম কাল্পনিক পায়রা।

—এই—গিরে মদা—হুস ধা!

গিরে মদা, অর্থাৎ গিরি নামক কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কেনা মদ্দাটা।

—এই তিলে মাদী—হুস—ধা!

অর্থাৎ তিলের মত অজস্র কালো বিন্দু আছে গায়ে যে মাদী পায়রাটার—সেইটা।

এ সব নাম এবং এই পায়রা ওড়ানোর ভঙ্গি শিখেছিলাম আশুদাদার ভাইপো ষষ্ঠীর কাছে। যে ষষ্ঠী নির্মলশিববাবুর সমবয়সী, থিয়েটার-প্রসঙ্গে যার নাম এর আগে করেছি—তার কাছে।

নারাণ অবশেষে পেয়াদা-কার্তিক নিয়েই খেলতে রাজী হ'ত। এর পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার ধারা পাল্টাল। নারাণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্ষীণ হ'ল না। বোধ হয় তখন আট-দশ বছর বয়স, তখন থেকে একটা নূতন খেলা খেলতে শুরু করেছিলাম আমরা দুজনে। রামায়ণ খেলা। খেলাটা আমার আবিষ্কার। তখন রামায়ণ পড়েছি, তিন-চারবার তো নিশ্চয়। রামায়ণের কাহিনী কণ্ঠস্থ। এমন কি বানর সেনাপতিদের সুগ্রীব-অঙ্গদ-নল-

নীল-গয়-গবাক্ষ ক'রে সমস্ত নাম—মহাবীর হনুমান তো বটেই, ওদিকে রাক্ষস সেনাপতি খর, দূ্ষণ, ভস্মলোচন, অতিকায়, তরণীসেন—সব নাম মুখস্থ। আমাদের দেশে গেরুয়া রঙের খোয়াইয়ের মধ্যে অজস্র বিচিত্র আকারের বিচিত্র বর্ণের—লাল নীল সবুজ নুড়ি ছড়ানো। সেই নুড়ি কুড়িয়ে আনতাম পকেট এবং আঁচল ভর্তি করে। তার থেকে রঙ এবং আকার মিলিয়ে কোনটিকে করতাম রাম, কোনটিকে লক্ষ্মণ, কোনটি হনুমান, কোনটি রাবণ, কোনটি কুম্ভকর্ণ, কোনটি অতিকায়, কোনটি মেঘনাদ। বারান্দায় খড়ি দিয়ে সেতুবন্ধ থেকে স্বর্ণলঙ্কা এঁকে দুই দিকে প্রস্তর বাহিনী সাজিয়ে—রামলীলা হ'ত। তালশিরের কাঠিতে সুতো বেঁধে হ'ত ধনুক এবং কুঁচিকাটি ভেঙে করতাম তীর। সীতাহরণ থেকে সীতা-উদ্ধার পর্যন্ত এই খেলা চলত। বলা বাহুল্য, আমিই বেশীর ভাগ নিতাম রামপক্ষ, নারাণকে নিতে হ'ত রাবণপক্ষ। তাই নিত নারাণ। নারাণের চরিত্রের মধ্যে ছিল নির্মলশিববাবুর ওই মহৎ গুণের প্রতিফলন—অক্রোধগুণ। আরও গুণ তার ছিল—সে ছিল সত্যকারের সমাজকর্মী। প্রথম যৌবনে—চরকা খদ্দর নিয়ে সংগঠনে সত্যকারের শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু ওই এক পথে, যে পথে নির্মলশিববাবু হয়েছেন সাধন-ভ্রষ্ট, সেই পথে নারাণও হ'ল সাধন-ভ্রষ্ট। সে কথা থাক্। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দ পনের বছর বয়সে—আবার খেললাম নূতন খেলা। তখন আমরা দুই দলের দুই নেতা। আমরা যুদ্ধ করলাম। ওই যুদ্ধের খানিকটা ছাপ আছে 'ধাত্রী দেবতা'র প্রথমে।

তারপর বয়স বাড়ল। বন্ধুত্ব বিচিত্রভাবে পরিণত হ'ল সম্পর্কে। সে হ'ল আমার ভগ্নীপতি—আমি হলাম তার ভগ্নীপতি। কিন্তু দুজনের জীবনপথ ধীরে ধীরে সরতে শুরু করেছে তখন। বলতে ভুলেছি সাহিত্যচর্চা, তাও শুরু করেছিলাম দুজনে একসঙ্গে। নিত্যগোপাল-বাবুর কবিতা লেখা দেখে আমরাও কবিতা রচনা করলাম—

শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল
তত সব লোকদের আনন্দ বাড়িল।

আর এরই মধ্যে এল প্রতুলকৃষ্ণ—খোকা।

চারুর জ্ঞাতি-ভাই খোকা। নিত্যগোপালবাবুর আপন খুড়তুতো ভাই। আমরা ইস্কুলে এক ক্লাসে ভর্তি হলাম। খোকা, আমি আর শিবকৃষ্ণ—তিনজন ছাত্র ক্লাসে। খোকা প্রথমবার হ'ল ফার্স্ট, হয়ে ডবল প্রমোশন নিলে। আমি সেকেণ্ড, ক্লাস প্রমোশন পেলাম। শিবকৃষ্ণ থার্ড, ফেল হ'ল। কিছুদিন পর খোকাকে একদা দেখলাম, গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে আমাদের ঠাকুর-বাড়িতে ঘুরছে। আমাকে ডাকলে। আমি গেলাম। অনেক কথা হ'ল। সে সমস্তই হ'ল কেমন ক'রে নির্মলশিববাবু-নিত্যগোপালবাবুর মত ফ্যাশনেবল হওয়া যায়। খোকা বললে—ওরা দাড়ি কামায়। ওরা ছ আনা দশ আনা চুল কাটে। তাই এমন সুন্দর দেখায়। বের করলে একটা কাঁচি, এবং প্রস্তাব করলে সে আমার চুল কাটবে—আমায় কামিয়ে দেবে, আমি করব তার ক্ষৌরকর্ম। সে প্রথমেই আমার মাথার পিছনে চালালে কাঁচি। তারপর বললে, ঠিক হয়েছে। এইবার দাড়ি। কিন্তু দাড়ি তো নেই,

কি কামাবে? অথচ না কামালে চলবে না। অতএব ভুরুর উপর চালালে কাঁচি। তারপর আমি ধরলাম কাঁচি। কয়েক মুহূর্ত পরে যথাসাধ্য সুন্দর ক'রে তাকে ছেড়ে দিলাম।

মা পিসীমা মুখ দেখে অবাকবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

খোকার কথা অনেক।

১২

খোকার কথা অনেক।

আমার চেয়ে দেড় বছরের বড়; হিলহিলে লম্বা। কথায় কথায় ফিক্-ফিক্ ক'রে হাসত। দারুণ দুঃখেও তার সে হাসি বন্ধ হ'ত না। মায়ের একমাত্র সন্তান। প্রকাণ্ড একটি পরিবারের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। খোকার বাপ-খুড়োরা ছয় ভাই। সে আমলের নিয়ম অনুযায়ী খোকার মা-খুড়ি-জেঠীদের আসল নাম কেউ জানে না। বউরা বাড়ীতে পদার্পণ করবামাত্র নামকরণ হ'ত—মতি-বউ, যুঁই-বউ, বেলি-বউ, শরৎ-বউ, মানিক-বউ, রাণী-বউ, সৌরভ-বউ, ইত্যাদি। বউদের নামের মধ্যে মূল্য এবং সৌন্দর্য দুই বোধেরই পরিচয় চোখে পড়বে। সমাদর যেখানে বেশী সেখানে মানিক বউ নাম পেতেন বউ-মানিক, রাণী-বউ হতেন বউ-রাণী। খোকার মায়ের নাম ছিল—যুঁই-বউ, লোকে ডাকত যুহি-বউ বলে। অতি শান্ত সরল মিষ্ট প্রকৃতির ছোটখাটো মানুষ ছিলেন, গায়ের রঙ ছিল কাঁচা সোনার মত। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সে বৈধব্যের আঘাত যেমন আকস্মিক তেমনি প্রচণ্ড; ছোট দেওরের বিবাহে গেল তাঁর বড় ছেলে, খোকার দাদা অতুল, আর ফিরল না, কলেরায় মারা গেল। সেখান থেকে ফিরেই তিন দিন কি চার দিনের দিন মারা গেলেন স্বামী। কয়েকটা দিনের মধ্যে বাড়ীর আনন্দ আয়োজনের আসরে যুহি-বউদি একসঙ্গে হারালেন স্বামী পুত্র। যুহি-বউদি মারা গেছেন গত বৎসর ১৩৫৬ সালে। খোকার উপর তাঁর প্রত্যাশা কতখানি ছিল তা বুঝতে পারি নি, কখনও কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে দেখি নি। খোকা কলকাতাতেই থাকে। আমি কলকাতা থেকে গেলে বউদির সঙ্গে দেখা হ'ত, কিন্তু কখনও প্রশ্ন করেন নি—খোকার সঙ্গে দেখা-টেখা হয় নি ভাই? এর একটা কারণ আমার মনে হয়, এই সংসারটির সে আমলের অস্বাভাবিক অতি কঠোর ব্যবস্থার ফল। এরই জন্যে খোকা জীবনে হয়েছে অকৃতকার্য—ব্যর্থ। নিত্যগোপালবাবুর নাম পূর্বে করেছি—তিনি এই বাড়ীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, ভগবানের অজস্র প্রসাদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, দুর্লভ রূপ, দুর্লভ মধুর কণ্ঠস্বর, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি; বলেছি তো অজস্র প্রসাদ। সংসারের এই কঠোর ব্যবস্থার ফল তাঁর জীবনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। অন্তঃপুরে খোকার কুণ্ডলিনী পিসীমা ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী, বাইরে কর্তা ছিলেন ওঁদের সেজকাকা। একজন জ্বলন্ত চুল্লী, অপরজন উত্তপ্ত কটাহ। ষোল-সতের বয়স যখন নিত্যগোপালবাবুর—যখন তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবেন তখনও বেত্রাঘাতে তাঁর পিঠ জর্জরিত ক'রে দিয়েছেন সেজকাকা। তাঁর

প্রচণ্ড শাসনের অন্তরালে ছিল—এমন উচ্চাশা, যা মানুষকে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেয়। সম্ভবত, সম্ভবত কেন—নিশ্চয়ই, তাঁর উগ্র উচ্চাশা ছিল এই যে, তাঁদের বাড়ির ছেলেরা প্রত্যেকেই হবে স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম, মাইনরের পর থেকে এণ্টান্স, এফ-এ, বি-এ, এম-এতে বৃত্তি পাবে, প্রথম হবে, পরিশেষে হবে ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জজ। এই গ্রামের অপর যে সকল পরিবারের মাথা তাঁদের পরিবারের মাথা থেকে উঁচু হয়ে আছে, সেগুলিকে অবনত ক'রে দেবে। তাঁর সকল শাসন ছিল—গ্রাম্য ঈর্ষা-বিদ্বেষের উত্তাপে উত্তপ্ত। সে আমল; দৃষ্টি একমাত্র আবদ্ধ ছিল সরকারী চাকরির প্রতি। নইলে নিত্যগোপালবাবুর প্রতিভার বিকাশে তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারত। থাক্। খোকার কথা বলি। খোকারও ছিল মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং তার বুদ্ধিও ছিল তীক্ষ্ণ; সে আর কিছু পারুক না-পারুক, পরীক্ষা পাস ক'রে বি, এ ডিগ্রী নিয়ে কোন বড় অপিসের হেডক্লার্কও হতে পারত। কিন্তু সেজকাকার শুভ কামনার উগ্রতা সে সহ্য করতে পারলে না। ক্লাসে সে ফার্স্ট হতেই সেজকাকা হেড মাস্টারকে ধ'রে তাকে ডবল প্রমোশন দেওয়ালেন। খোকা পড়ত আমার সঙ্গে, আমাকে পিছনে ফেলে উপরে চ'লে গেল—সেজকাকার উগ্র উচ্চাশা সেদিন পরিতৃপ্ত হয়েছিল সাময়িক ভাবে। তারপর অন্তরালে যা ঘ'টে গেল—সে দেখবার দৃষ্টিও তাঁর ছিল না, অবকাশও ছিল না। বেচারা শিশু হাঁটুজলে সাঁতারে পারঙ্গমতা দেখিয়েছে ব'লে তাকে অগাধ জলে ঠেলে দিয়ে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন—মধ্যসমুদ্র থেকে তুলে আনুক সহস্রদল পদ্মটি, যার মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন কমলালয়া লক্ষ্মী। প্রথম ভাগ পড়ে (সত্য-সত্যই প্রথম ভাগ, পাঠ্য-বইয়ের নাম ছিল শিশুপাঠ—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগকে সংক্ষিপ্ত ক'রে সে এক বিচিত্র বই) ফার্স্ট হয়েছে ব'লে খোকাকে ঠেলে উঁচুতে তুলে দ্বিতীয় ভাগ বাদ দিয়ে—তার সামনে প্রায় ধ'রে দেওয়া হ'ল চারুপাঠ। খোকা বেচারা—চারুপাঠে ভীমভীষণ ঝঞ্ঝাতাড়িত 'উত্তাল তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ অর্ণববক্ষে' প'ড়ে গিয়ে ডুবে গেল অর্ণবতলে, অথবা উত্তাল তরঙ্গমালায় তাড়িত হয়ে ঊষর বালুবেলায় নিক্ষিপ্ত হ'ল; যে বেলাভূমে—মুক্তা তো দূরের কথা, ঝিনুক শামুকের একটা কুচি পর্যন্তও নাই। পালাতে লাগল খোকা। বাড়ীতে পড়তে ব'সে পালাতে লাগল, স্কুলে ক্লাস থেকে পালাতে লাগল, মিথ্যা কথা বলতে শিখলে বাধ্য হয়ে, ছেলে-মানুষ অপটু ভাবে মিথ্যে বলত। প্রথম প্রথম পালাবার স্থান আবিষ্কার করলে—'পেমনা' নামক এক গন্ধবণিকনন্দন বন্ধুর বাড়িতে। ব'সে থাকত, তামাক খেত। ক্রমে সে স্থানের সন্ধান জানাজানি হতেই যত্র-তত্র ধাবমান হ'ল।

অনেক দিন পরের একটা ঘটনার কথা বলছি। তখন আমার ফার্স্ট ক্লাস। খোকা তখনও ফোর্থ ক্লাসে। সেই বোধ হয় স্কুলে শেষ বৎসর খোকার। আমার ক্লাস থেকে বেরিয়ে আমি লাইব্রেরীর দিকে যাচ্ছি; বড় হলের মধ্য দিয়ে পথ; হলে দুটো ক্লাস বসে পাশাপাশি—ফোর্থ ক্লাস আর থার্ড ক্লাস। ফোর্থ ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন আমাদের সেকেণ্ড মাস্টারমশাই ননীবাবু, তিনি আমায় দেখেই হঠাৎ বললেন—এই হয়েছে। শোন তো তারাশঙ্কর।

দেখলাম খোকা দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। বইয়ের আড়াল দিয়ে অবশ্য। সেকেণ্ড মাস্টার বললেন, শ্রীমান প্রতুলকৃষ্ণের বাড়ি তো তোমাদের পাশেই। এক খিড়কির ঘাটেই তো আচরণ তোমাদের। বলতে পার—শ্রীমান প্রতুলের মা নাকি কাল খিড়কির ঘাটে পা পিছলে প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন?

কি বলব ভেবে পেলাম না। এমন কোন সংবাদও শুনি নি, তার উপর আজই তাঁকে বকতে শুনেছি। খোকাকেই বকছিলেন।

আমি বিব্রত হলাম, কিন্তু খোকা হেসেই চলল সমানে।

মাস্টার মশাই বললেন, অতঃপর আজ তোমাদের বাউরীপাড়ায় একটা নাকি দাঙ্গা হয়ে গেছে?

দাঙ্গা হয়েছে কি না জানি না, তবে বাউরীপাড়ায় ঝগড়া তো লেগেই থাকে, আজ সকালেও গোলমাল একটা শুনেছি। হঠাৎ প্রতুল ব'লে উঠল, এই ডাক্তারবাবুকে শুধান না স্যার! বাঁকা বাউরী আর নন্দ বাউরীর শালার মধ্যে ঝগড়ায় লাঠালাঠিতে নন্দর মাথাটা দু ফাঁক হয়ে গিয়েছে কিনা? বলুন না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু স্কুলে কোন প্রয়োজনে এসে হলে মাত্র প্রবেশ করেছেন। হেসে ডাক্তারবাবু বললেন, দু ফাঁক ঠিক নয় তবে কেটে খানিকটা গিয়েছে। খোকাই নিয়ে এসেছিল তাকে ডাক্তারখানায়। কিন্তু সে কথা এখানে? কি ব্যাপার?

মাস্টার বললেন, আমি পরশু শ্রীমান প্রতুলকে আলটিমেটাম দিয়েছি যে, বেতন নিয়মিত দিলেই যে তুমি এই ক্লাসের বেঞ্চিতে বসতে পাবে, তা পাবে না। হয় পড়শুনা কর, নয় স্কুল ছাড়। পাকা উচ্ছেদের নোটিশ। কি প্রতুল, বল কথা ঠিক কি না?

খোকার নাকের নীচের অংশটা খোলা বইটায় ঢাকা, উপরের অংশটা দেখা যাচ্ছিল, সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ, কথা ঠিক।

খোলা বইয়ের আড়ালের অন্ধকারে ঠোঁটের উপর মুচকি হাসি ঘন ঘন খেলে যাচ্ছিল, সে সত্য অন্ধকার ঘরে শব্দ তুলে ছোট্ট ইঁদুরের ছুটে বেড়ানোর মত শব্দের ইঙ্গিতেই আত্মপ্রকাশ করছিল। খোকার মুখের আড়াল দেওয়া বইয়ের ভিতর থেকে শব্দ উঠছিল খুক্-খুক্-খুক্।

মাস্টার মশায় বললেন, কিন্তু কাল পড়া জিজ্ঞাসা করতেই, ঠিক এমনি ভাবে বইয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়াল এবং কড়িকাঠের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে বললে—কাল খিড়কির ঘাটে প'ড়ে গিয়ে ওরা মা সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন—শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন, তাঁর সেবা করতে গিয়ে পড়া করবার অবকাশ পায় নি। মাতৃভক্তি, মাতৃসেবার পুরস্কার দিতে না পারি, তিরস্কার কি ক'রে করি? কাল সন্তুষ্ট মনে মার্জনাই করেছিলাম। আজ জিজ্ঞাসা করলাম পড়া, আজও ঠিক কালকের অবস্থা—ওই দেখুন না, বইয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ বলছে—বাউরীপাড়ায় ভীষণ দাঙ্গা বেধেছিল কোন এক বাউরী-বধূ নিয়ে; দুই বীরপুঙ্গবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সে যুদ্ধ থেকে কেউ তাদের নিবৃত্ত করতে পারে নি—অগত্যা ওকেই যেতে হয়েছিল রণাঙ্গনে। যুধ্যমান দুই বীরের উদ্যত মহাস্ত্রের মধ্যস্থলে উপবীতধারী দেবতার মত দাঁড়িয়ে

ওকে বলতে হয়েছে—ক্ষান্ত হও। নতুবা ভস্ম ক'রে দেব। তবে তারা ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়, বিচার করতে হয়েছে—ওই কন্যাটি কার প্রাপ্য—

খোকা বললে, তারপর নন্দার শালার মাথা ফেটেছিল, তাকে—

ডাক্তার বললে, হ্যাঁ, তাকে আমার কাছে এনেছিল। একটু টিংচার আইডিন দিয়ে বেঁধে দিলাম।

মাস্টার মশায় বললেন, তবে আজও তোমার মার্জনা। জনসেবার পুরস্কার দিতে না পারি, তিরস্কার করব কি ক'রে? ব'স প্রতুলচন্দ্র।

যাক, আগে তার গোড়ার কথা বলি।

প্রতুল ডবল প্রমোশন নিয়ে—পরের. বারে ফেল হ'ল পরীক্ষায়। প্রতুলের সেজকাকা যত চটলেন প্রতুলের উপর, তত চটলেন পরীক্ষকদের উপর। তিনি রেগে ইস্কুলে গেলেন এবং রাগারাগি ক'রে প্রতুলকে প্রমোশন দেওয়ালেন, এবং আমাদের বাড়িতে আমার গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কিন্তু তখন তার শিশুমন অরণ্যবহ্নির উত্তাপে আতঙ্কিত কুরঙ্গশিশুর মত পলায়নপর। জীবনে সে আতঙ্ক ব্যাধির মত পেয়ে বসেছে। সে একমাত্র পথ আবিষ্কার করেছে—পলায়ন। সে পালাতে চায়, ছুটে পালায়। জ্ঞানরাজ্য সমাদর ক'রে ডাকলেও সে কর্ণপাত করে না। নিত্য সন্ধ্যায় সে পড়তে আসত। আমার গৃহশিক্ষক ব্রজেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় দুর্বলদেহ মানুষ ছিলেন। তার উপর ছিল তাঁর নিতান্ত অল্প বয়স। অতি সৎপ্রকৃতির আন্তরিকতাপূর্ণ মানুষ ছিলেন, স্কুলে পড়াতেন কঠিন পরিশ্রম ক'রে। পড়ানোর স্চীর মধ্যে তাঁর কাজ ছিল—ড্রিল শেখানো। প্রায় দু ঘণ্টা—দুটো থেকে চারটে—নিজে ড্রিল ক'রে দেখিয়ে ড্রিল শেখাতেন। স্কুল থেকে ফিরতেন একেবারে ক্লান্ত হয়ে। সন্ধ্যায় পড়াতে ব'সে পড়াগুলি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। যেমন তাঁর নাক ডাকা শুরু হ'ত, অমনি খোকা পড়া বন্ধ করত। দু মিনিট—তিন মিনিট—পাঁচ মিনিট অন্তর পড়া বন্ধ করত, এক মিনিট দু মিনিট তিন মিনিট থাকত আবার শুরু করত—মনোহর ইক্ষুদণ্ড, মনোহর ইক্ষুদণ্ড, মনোহর ইক্ষুদণ্ড। তারপর হঠাৎ আমার হাতখানা চেপে ধরত; আমি মুখ তুলে চাইলেই ফিক্ ক'রে হেসে ফিসফিস ক'রে বলত—আমি চললাম।

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করতাম আমি—কোথায়? বা কেন?

সে বলত, বাড়ী।

আমি পড়তে পড়তেই আঙুল দেখিয়ে দিতাম মাস্টারের দিকে।

সে বলত, ব'লো তার মা ডাকছিল।

খোকাদের বাড়ি এবং আমাদের বৈঠকখানা-বাড়ি সামনাসামনি, মাঝখানে হয়তো দশ ফুট চওড়া একটা গ্রাম্য রাস্তা। ওদের বাড়ীর কথাবার্তা আমাদের এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যেত। ওই কথা ব'লেই খোকা বই বগলে নিয়ে অন্ধকার রাস্তায় আমাদের বৈঠকখানার উঁচু দাওয়া থেকে ঝপ ক'রে লাফিয়ে পড়ত। সিঁড়ি বেয়ে নামবার বিলম্ব তার সইত না। মিনিট দুয়েক পরেই শোনা যেত খোকার পিসীমার উচ্চ কণ্ঠের কথা—এরই মধ্যে তোর পড়া

হয়ে গেল খোকা ?

এর উত্তরে খোকা কি বলত শোনা যেত না। কিন্তু ওর পিসীমার কথা শোনা যেত—ভাত খেতে চ'লে গেল ? এই তো সন্ধ্যে এরই মধ্যে ভাত খেতে গেল ?

এবার খোকার কথা শোনা যেত। সে এবার উচ্চ কণ্ঠেই জবাব দিত, না ? গেল না ? মাস্টার সন্ধ্যেবেলাতেই খেয়ে নেয়। ভূতের ভয় মাস্টারের। ওর নাম বু-বু মাস্টার, তা জান না না কি ?

আমি হঠাৎ চমকে উঠতাম মাস্টার মশায়ের ডাকে—পড়্। তুই নিজে পড়্।

মাস্টার জেগে উঠেছেন ইতিমধ্যে। সম্ভবত খোকার পিসীমায়ের উচ্চ কণ্ঠস্বরেই জেগে উঠতেন, এবং নিজের 'বু-বু মাস্টার' নাম শুনে লজ্জা পেতেন। তার প্রতিক্রিয়ায় ক্রুদ্ধ হতেন।

খোকার পিসীমা বলতেন, এই খানিকক্ষণ পড়ানোর জন্যে মাসে দু-দুটো টাকা ? বলছি আমি সাতনকে। এ যে গালে চড় মেরে টাকা নেওয়া !

তিনি ব'কেই যেতেন।

এদিকে ক্রোধ মাস্টারের মনে খোঁচা-খাওয়া সাপের গর্তে ঘুরপাক খাওয়ার মত ঘুরপাক খেত।

এ লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায় ! ছাত্রকে না পড়িয়ে তিনি ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়ে থাকেন ? বু-বু মাস্টার নামের লজ্জাও লঘু হয়ে যেত।

অথচ এ নামটায় তাঁর ছিল অপরিসীম লজ্জা। আমাদের বাড়ির ঠাকুর তরুণ ক্ষুদিরাম নিষ্ঠুর কৌতুক ক'রে মাস্টারকে ভয় দেখিয়েছিল। ঠাকুর ক্ষুদিরাম মাস্টার মশায়ের চেয়েও অল্পবয়সী ছিল। মাস্টারের বয়স ছিল কুড়ি-বাইশ, ক্ষুদিরামের ছিল সতের-আঠারো। আমাদের বৈঠকখানা থেকে ভিতর-বাড়ি যেতে একটি দীর্ঘ গলিপথ অতিক্রম করতে হয়। দু পাশেই আমাদের নিজেদের লোকের বাড়ী-ঘর। আমার জ্যেঠামশায় পেয়েছিলেন আমাদের পুরানো বাড়ি, সে বাড়ির অনেক অপবাদ। একটা পুরানো ডুমুর গাছ গলির মাথায় ছত্রছায়া মেলে থাকত। সেখানে নাকি কেউ থাকতেন, মধ্যে মধ্যে দুটো পা ঝুলতে দেখা যেত—চকিতের মত ; এই বাড়ীতেই ছিল একটা শিউলি গাছ, সেখানে কেউ থাকতেন নাকি—তাঁর মাথা ন্যাড়া, পায়ে খড়ম। তিনিও মধ্যে মধ্যে দেখা দিতেন, এবং তিনি দেখা দিলেই নাকি আমাদের পরিবারের মধ্যে কাউকে যেতে হ'ত। এই ভৌতিক গৌরব বা অপবাদগ্রস্ত গলি নিয়েই হোক বা অন্য কোন হেতু হতেই হোক, মাস্টার মশায় ক্ষুদিরামের ভূতসম্পর্কীয় কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন। অনেক নজীর দেখিয়েছিলেন, বিজ্ঞানবাদ বুঝাতে চেয়েছিলেন, সায়েবদের দোহাই পেড়েছিলেন এবং ক্ষুদিরামকে নির্বাক ক'রে দিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম তখন নির্বাক হয়ে সেই রাত্রে মাস্টার মশায় যখন খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের বাড়ীর ভিতর থেকে একাকী বৈঠকখানায় আসছেন, (সুকৌশলে ক্ষুদিরাম সেদিন মাস্টারকে একাই ফেলেছিল) তখন হঠাৎ ওই গলির মধ্যে এক স্থানে ঝরঝর

শব্দ তুলে এক রাশি কিছু বর্ষণ হয়ে গেল। সম্মুখেই ডুমুরতলা, তার ওদিকে শিউলিগাছ। মাস্টার মশায়ের রামকবচ—অভয়মন্ত্র বইয়ের মধ্যে আছে, বই তখন সঙ্গে নেই। কাজেই তিনি বু-বু-বু-বু শব্দ ক'রে আমাদের বাড়ীর মধ্যেই ফের দৌড়ে গিয়ে প'ড়ে গেলেন। শব্দটা তিনি প্রাণ খুলেই করেছিলেন, পাড়ার লোকে শুনেছিল; কাজেই ও-নামটা সেই দিন সেইক্ষণেই করণ ক'রে দিলে লোকে। মর্মান্তিক লজ্জা সেই জন্যে।

এ লজ্জাও তাঁর কাছে লঘু হয়ে যেত। টাকা নিয়ে ছাত্রকে পড়াতে তিনি ফাঁকি দেন? চোখ ফেটে তাঁর জল আসত। হতভাগ্য শিশুর মনের দুঃখ বুঝে ওঠা সহজ নয়, সে আমলে এ দিকটায় বুঝবার মত আলোকপাতও হয় নি; কিন্তু শিশুর প্রতি করুণা-মমতা মানুষের অন্তরের সহজাত বৃত্তি, জৈব প্রবৃত্তির মত। অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে হরণ ক'রে পশু তাকে হত্যার পরিবর্তে পালন করেছে। মাস্টার মশায় হৃদয়বান মানুষ ছিলেন, তবুও পরদিন সন্ধ্যায় পড়তে এলেই তাকে ধরতেন চুলের মুঠোয় চেপে। তারপর নির্মম প্রহার। কি কান্নাই কাঁদত প্রতুল! কিন্তু মাস্টার তাকে ছেড়ে দেবার কিছুক্ষণ পরেই সে চোখ মুছতে মুছতে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলত। আমি তাকে বলতাম, আমি বলি নি রে। মাস্টার মশাই নিজেই শুনেছে।

সে ঘাড় নাড়ত—ঠিক। ঠিক। তুমি বল নাই সে আমি জানি।

দু-চার দিন আমিও ব'লে দিয়েছি। যে দিন ছুটি নেওয়ার ইচ্ছা হ'ত, অথচ খোকার পিসীমা ওদিকে কোন গোল তুলতেন না সেই দিন। সেদিন আমাকেই তুলতে হ'ত সাড়া। ডাকতাম—মাশ-শাই—অর্থাৎ মাস্টার মশাই! স্যার! এদিকে টেনে নিতাম অঙ্কের খাতা।

—হুঁ!

—এটা হ'ল কি না দেখুন!

—কি, পড়।

—অঙ্ক স্যার।

—এখন অঙ্ক নিয়ে বসলি কেন? উঠে বসতেন মাশ-শাই। নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাস ব্রজেন্দ্র পণ্ডিত অঙ্কশাস্ত্রে সত্যকার পণ্ডিত ছিলেন। কলেজ-ক্লাসের গণিতশাস্ত্র নিয়ে আপন মনেই ক'ষে যেতেন। সে যে তাঁর কি আনন্দ, আমি তা ভুলব না। আবার কবিতাও লিখতেন, মস্ত খাতায় কবিতার পর কবিতা লিখে যেতেন। তিনি আজ নেই, কিন্তু কবিতার খাতার স্তূপ আছে। নাটকও লিখেছিলেন তিনি। সে কথা থাক্। খোকার কথাই বলি। জেগে উঠে ব'সে অঙ্ক দেখে বলতেন, কুড়কুড়ির ছা, ভুরভুরির মা, কষেছ তো ঠিক। বাঃ বাঃ! ওই বিচিত্র শব্দ দুটি তাঁর আবিষ্কার, ওর অর্থ তিনিই জানতেন। আমি যেটুকু বুঝতাম, সেটুকু মাস্টার মশায়ের স্নেহের সমাদর। মাস্টার এর পর লক্ষ্য করতেন খোকা নেই।

—খোকা? পালিয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার। বললে, জিজ্ঞাসা করলে বলিস, মা ডাকছিল।

—হুঁ।

এর পরই বলতাম—আমিও যাই স্যার।

—ওই ছোঁড়াই তোর লেখাপড়া হতে দেবে না। চল্।

তার পরদিন আবার খোকাকে সৎপথে পরিচালনা করবার চেষ্টা করতেন। এ দিনের প্রহার তত নির্মম হ'ত না। খোকা কাঁদত। আমার সঙ্গে কথা বলত না। কাঁদতে কাঁদতেই পড়ত। আমি মধ্যে মধ্যে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাতাম, সেও তাকাত। একবার—দুবার—তিনবারের বার খোকা ফিক্ করে হেসে ফেলত।

এই সময়টুকুর বাইরে খোকার সঙ্গে আমার কোনও সঙ্গ ছিল না। তার জীবন যেখানে মুক্তির অবকাশ পেয়েছে, সেইখানেই সে গিয়েছে। বাড়ী ঘর সমাজ থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছে, নিচের স্তর থেকে আরও নিচের স্তরে গিয়েছে। সে যেন খুঁজত অন্ধকার। যে অন্ধকারে মানুষ শৃঙ্খলা-শাসন-লজ্জা—সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত। সেখানে সে ছুটত বুনো কালো ঘোড়ার মত। গ্রীষ্মের ছুটিতে খোকা গামছা কাঁধে বের হ'ল স্নান করতে। গিয়ে উঠল আমবাগানে। কাঁচা আম খেয়ে কামড়ে ছড়িয়ে দাঁত ট'কে গেলে উঠত তালগাছে। তাল কেটে খেয়ে জলে নেমে—পুকুরের পাঁক ঘুলিয়ে বাড়ি ফিরত প্রায় তৃতীয় প্রহরে। তখন ভাত খেলেও চলেও, না খেলেও চলে। সেজ কাকা তখন ঘুমিয়েছেন। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়েছেন। জেগে আছেন শুধু তার মা। এর পর হঠাৎ খোকা পেটের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে চীৎকার করত। তারপর ভেদবমি। এই ভেদবমি তিনবার কলেরার পর্যায়ে উঠেছে। আম জাম তাল এ সবের সময় পার হয়ে গেলে খোকা ছুটত বিচিত্র আঁকাবাঁকা পথে। সমস্ত কথা ভুলে গিয়েছি। দুবারের কথা বলছি। একবার হঠাৎ দেখি, খোকা থিয়েটারের স্টেজের ভিতর থেকে উঁকি মারছে। তখন পাকা স্টেজ হয়েছে। সামনেটা চট দিয়ে ঢাকা থাকে। সেই চটের একটা বড় ছিদ্র দিয়ে খোকার মুণ্ডটা বেরিয়েছে। সে মুণ্ডটা দুলিয়ে ডাকলে। লোভ সামলাতে পারলাম না। সে বললে, পিছনের জানালা দিয়ে এস। পিছন দিকে গিয়ে দেখলাম, জানালার একটা শিক নেই। শিকটা খোকা ছাড়িয়েছিল কি না খোকাই জানে। অন্যে ছাড়িয়ে থাকলে সেটা খোকার চোখ এড়ায় নি। জীবনের যে দিকটা পিছনের দিক, যে দিকটায় জ'মে থাকে আবর্জনা, ভাঙা খোলা—সে দিকটার খবর ছিল খোকার নখদর্পণে। ওর চোখে পড়তই। আমি যখন ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, তখন সে এরই মধ্যেই সেজেগুজে বসে আছে। মাথায় সখীর পরচুলো—একটা বেণীওয়ালা চুল প'রে দেওয়ালে ঝুলানো একখানা আয়নায় মুখ দেখছে আর ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছে, বললে, কেমন লাগছে বল তো?

আমারও সে দিন ভাল লেগেছিল। আমিও পরলাম একটা পরচুল। আয়নায় মুখ দেখলাম। খোকা বললে, বিল্বমঙ্গলে আমি সাজব পাগলিনী, তুমি সাজবে চিন্তামণি। হোক?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম, মুখে বললাম, হ্যাঁ।

—দশরথচংবাবুর চেয়ে আমি ভাল পাট করব। দেখো তুমি। ব'লেই সে গানও

এককলি গাইলে—কেমন মা তা কে জানে ?

দস্তখৎবাবু হ'ল নিত্যগোপালবাবুর সে আমলের একটা চটানে নাম। আমাদের গ্রামে ফুল্লরা দেবীর স্থানে মেলা হয়। সে মেলায় সেকালে বড় বড় যাত্রার দল আসত। একবার কলকাতার থিয়েটার পার্টিও গিয়েছিল। সেবার এসেছিল ফকির অধিকারী মশাইয়ের নামজাদা দল। মেলায় যাত্রা হ'ল। দশখানা গ্রামের লোক দেখলে। দেখতে পেলে না কেবল আমাদের গ্রামের ভদ্রঘরের মেয়েরা। মেলায় মেয়েদের জন্যে আসরও করা হয়েছিল, কিন্তু তবু সেখানে যাওয়া চলত না সে আমলে। হোক না কেন ফকির অধিকারীর দলের যাত্রাগান। এই কারণেই গ্রামের মেয়েরা পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন—নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে একদিন যাত্রাগান করাতে হবে—গ্রামের ভিতরে।

তাঁরা চাঁদা তুলতে শুরু করলেন। কিন্তু দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে কে ? কর্তা যাঁরা, যাঁরা গ্রামের প্রধান তাঁদের কাছে এ কথা বলতে সাহস হ'ল না। তাঁরা এসব কাজ কখনও করেন না। মেয়েরা ধরলেন নিত্যগোপালবাবুকে। নিত্যগোপাল নিজে সুকণ্ঠ গায়ক—গান-বাজনায় গভীর আসক্তি। তার উপর অফুরন্ত প্রাণশক্তি, পনের-ষোল বছরের উৎসাহী ছেলে—সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ঘাড় পেতে তুলে নিলেন দায়। দলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা ব'লে এলেন। দলের ম্যানেজারের কাছ এ ধরণের বায়না নূতন নয়। তখন বাংলা দেশের কোন বর্ধিষ্ণু গ্রামে যাত্রার দল তিন দিনের বায়নায় গেলে অন্তত ছ দিন গান গেয়ে তবে বের হ'ত গ্রাম থেকে। এ-পাড়ার মেয়েরা ও-পাড়ায় যায় না, এ-বাবুর বাড়ী ও-বাবু যায় না, বাবুদের পাড়ায় দোকানী-পাড়ার লোকেরা বসতে পায় না; সুতরাং তিন দিন মূল বায়নার পর তিন দিন বাড়তি গাওনা গেয়ে তবে তারা ফিরত। এ সব ক্ষেত্রে দক্ষিণাও কম নিত। খাওয়া-দাওয়া এবং শীতান্তে শীতবস্ত্রের 'সেল প্রাইসে'র মত 'কম-সম' দক্ষিণা নিয়েই গান গাইত। আর মেয়েদের উদ্যোগের প্রতিভূ হয়ে এই রকম কিশোর ছাওয়ালরাই আসে বরাবর। দিনে চাল ডাল মাছ এবং রাত্রে ঘি ময়দা, আসরে পান তামাক আর টাকা পঞ্চাশেক দক্ষিণায় বায়না হ'ল। দশ টাকা বায়নাও দেওয়া হ'ল। ম্যানেজার পাকা লোক, বললেন, শর্তগুলো কাগজে লিখে কিন্তু একটা সই ক'রে দিন।

নিত্যগোপালবাবু বললেন, বেশ তো। ব'লেই কাগজ কলম নিয়ে খস-খস ক'রে লিখে দিলেন।

ম্যানেজার বললেন, সইটা—? সইটা কি—

—আমিই করব। ব'লেই সই করে দিলেন—এন. জি. মুখার্জি।

সন্ধ্যায় যাত্রার দলের সাজ-পোশাক নিয়ে গরুর গাড়ী এল। সাজঘরে আলো জ্বলছে, আসরও পড়েছে; কিন্তু নিত্যগোপালবাবু তখন লুকিয়ে পড়েছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত যে টাকা উঠেছে তার পরিমাণ দেখে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন চাল-ডাল, ঘি-ময়দা-মাছ-তরকারি উঠেছে; কিন্তু টাকা উঠেছে তিরিশটি, আরও পাঁচ টাকার প্রতিশ্রুতি

আছে। কিন্তু সে বাকী টাকা কোথায়? কি করবেন নিত্যগোপালবাবু? এ দিকে যাত্রার দলের ম্যানেজার ব'সে রয়েছেন টাকার জন্য। টাকা না-নিয়ে গান শুরু করবেন না। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক। শ্রোতারা এসেছে, তাদের মধ্যে থেকে জন কয়েক গিয়ে বললেন, কই মশায়, কখন আর করবেন? বাবুরা যে সব এসে গেছেন। কর্তারা তখন সত্যিই এসেছেন, তাঁরা সেদিন নিমন্ত্রিত অতিথি। ম্যানেজার বললে, আমরাও তো তৈরি। দেখুন না—সকলেই তৈরি। কিন্তু আমাদের টাকা কই? বাকী চল্লিশ টাকা দক্ষিণা—পান-তামাকের ছ টাকা; টাকাটা পেলেই শুরু করব। তিনি কই?

—কে?

—কে আবার? একটা তীক্ষ্ণকণ্ঠ ব্যঙ্গভরে ধ্বনিত হয়ে উঠল—সারা আসরটা ছড়িয়ে পড়ল। শনির ভূমিকার অভিনেতা শনি সেজেই তার স্বভাবগত তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব্যঙ্গ ক'রে ব'লে উঠল, কে আবার? সেই দস্তখচংবাবু মশায়। বায়না করতে গিয়ে কাগজ টেনে নিয়ে খসখস ক'রে লিখে—টানা ইংরিজীতে সায়েবী ঢঙে দস্তখচং সেরে দিলেন। সেই ছোকরা—দস্তখচংবাবু?

কথাটা ছড়িয়ে দিলে শনি। বাবুদের কানে গেল। ব্যবস্থাও হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। তবু যাত্রা শুরু হয় না। কেন?—আরে মশায় সে দস্তখংবাবুকে আসুন, তিনি সামনে বসুন, তবে তো গাইব আমরা।

গান হয়ে গেল। দল চ'লে গেল। লোকে গানের কথাও ক্রমে ভুলে গেল, কিন্তু নিত্যগোপালবাবুর 'দস্তখচংবাবু' নামটা লোকে সহজে ভুললে না।

খোকার জ্যাঠতুত দাদা নিত্যগোপালবাবু, খোকা আড়ালে তাকে বলে—দস্তখচংবাবু। শুধু নিত্যগোপালবাবুকেই নয়, অন্তরালে নিজের বাড়ীর সকলকেই ডাকে এমনি ধরনের এক একটা নাম ধ'রে।

দ্বিপ্রহরের অবসরে এমনি ভাবে সে ঘুরে বেড়াত। আপনার মনে যা খুশী তাই করত এবং আমাদের সঙ্গে দেখা হ'লেই এই অবসরের কীর্তি-কলাপের কথা এমন রঙ দিয়ে বড় করে বলত যে, অবাক হয়ে যেতাম আমরা। ছোট একটা সাপ দেখে থাকলে বলত—সাড়ে তিন হাত লম্বা একটা মিস্ কালো আলান (কেউটে) সাপ, বুঝলে কিনা, বুঝলে কিনা—এই তার ফণা। কুলোর মতন—কুলোর মতন; চক্র কি? এই চক্র। আমাকে তাড়া করলে।

—তারপর?

আমাকে তাড়া করলে। সোঁ-সোঁ ক'রে তাড়া করলে।

—হ্যাঁ। তারপর? তুই কি করলি?

—ছুটলাম। হ্যাঁ, ছুটলাম। আমিও ছুটলাম। বোঁ-বোঁ ক'রে ছুটলাম।

—সাপের দৌড়ের সঙ্গে মানুষ পারে?

—তা—পারে নাকি? কিন্তু—আমি—আমি—। আমি মন্তর জানি কিনা। সেই

সীতারাম বাবা সন্ন্যেসীর কাছে শিখেছিলাম। সেই মন্তর, ব'লে বললাম—যা, ফিরে যা। সে তখন সুড়-সুড় করে ফিরে গেল।

এমনি ধারায় থেমে থেমে নিজে মিথ্যে কথা ভেবে নিয়ে শ্রোতার চক্ষে প্রকট করে ধরেই সে মিথ্যে বলতে শিখেছিল। সে অভ্যাস তার জীবনে আজও যায় নি। মিথ্যে যখনই বলে, এবং বলে সে প্রায়ই—অকারণেই বলে, নিঃস্বার্থ ভাবেই বলে—অপরের ঈর্ষা না করেই বলে,—বলে এমনি থেমে থেমে। আমাদের গ্রামের লোক বা তার পরিচিত লোক সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধমক দিয়ে বলে—থাম্ খোকা।

খোকা দুঃখিত হয় না, লজ্জিত হয় না, ফিক্ করে হাসে।

১৩

যখন ভাবি, এত অবহেলা অবজ্ঞার মধ্যে, অত্যন্ত পীড়াদায়ক অপ্রতিষ্ঠা ও গৌরবহীনতার মধ্যেও খোকা ওই হাসিটুকু বাঁচিয়ে রাখল কি করে, তখন আশ্চর্য না হয়ে পারি না।

জীবনের অনুভূতি ম'রে গেছে? মনের ক্ষেত্র, সারা জীবন প্রশংসা প্রেরণা সস্নেহ উৎসাহের বর্ষণ না পেয়ে, শাসনের উত্তাপে, অবহেলা ও অপ্রতিষ্ঠার বালু-ঝড়ে একেবারে অনুর্বর হয়ে বন্ধ্যা হয়ে গেছে?

হয়তো হবে। কোন ফুলই ফোটাতে পারলে না সে তার জীবনে। শুধু প্রখর কিছু তার উপর উত্তাপ বিকিরণ করলেই তার জীবন-বিস্তৃত বালুকণা চিক্‌মিক্ ক'রে ওঠে,—তার না আছে কোন মূল্য না আছে কোন অর্থ। মূল্য নাই, অর্থ নাই ব'লে লোকে হাসি দেখলেও চটে ওঠে। সকল লোকেই চটে ওঠে—স্ত্রী পুত্র পর্যন্ত।

আমার অনুমান, ওর স্ত্রীও ওর গল্পে বাধা দিয়ে বলে, থাম বাপু, আর ব'কো না।

—কেন?

—কেন? যত সব মিছে কথা—

—কক্‌খনও না।

—নিশ্চয় মিছে কথা। যা বলছ, তাই হয় কখনও?

—হয় না! তুমি সব জান?

—সব না জানি; এটুকু জানি যে, তোমার সব কথা মিছে।

—মিছে?

—নিশ্চয় মিছে।

—নিশ্চয় মিছে?

—নিশ্চয়—নিশ্চয় মিছে!

—এই দেখ—

এবার মুখের কাছে মুখ নেড়ে বউ বলে, নিশ্চয় মিছে—নিশ্চয় মিছে—নিশ্চয় মিছে,

একশো বার মিছে। হাজার বার, লক্ষ বার মিছে। ঢের ঢের মিথ্যেবাদী দেখেছি—তোমার মত দেখি নি।

এবার খোকা ফিক্ করে হেসে ফেলে। ওঃ, বউ কথাটা জোর বলেছে—হাজার বার, লক্ষ বার মিছে! এঃ, ধরে ফেলেছে!

ছেলেরা বড় হয়েছে, তারা বাড়ীতে-ঘরে পাড়ায়-গ্রামে দেশে-দেশান্তরে যত পরিচিত স্থান আছে, সর্বত্রই তাদের বাপের অখ্যাতি অপবাদের কথা শুনে আসছে, চোখেও দেখেছে, বাপের প্রতিষ্ঠাহীনতার দৈন্য তাদের পীড়া দেয়—তারাও অনেক সময় গল্পমুখর খোকাকে বলে, তুমি বাপু, বড় বাজে বকো।

—বাজে বকি? জানিস তুই? শূয়ার কোথাকার!

—না! বকো না!

—অ্যাই—

—চুপ কর, চুপ কর—লোক আসছে, থাম। না যদি থাম তবে আমিই উঠে যাচ্ছি—যত খুশি পেট ভ'রে তুমি বাজে বকো-- মিছে কথা বল। 'পেট ভ'রে' কথাটা বিচিত্র উচ্চারণে বলে—'পে-ট ভ'-রে'!

ছেলে উঠেই চ'লে যায়।

অল্প দুটি একটি মুহূর্তের জন্য খোকা স্তব্ধ হয়ে থাকে, তারপর আপন মনেই ফিক ক'রে হেসে ফেলে। ধ'রে ফেলেছে ছেলেটা।

অর্থহীন মূল্যহীন হাসি, বালুকণার ঝিকিমিকি! নীরস-নিষ্ফল জীবনের প্রতিফলন ওষ্ঠ-প্রান্তে ফুটে ওঠে। কেন মিথ্যে বলে—সে খোকা জানে না। হয়তো ওর আত্মা ব্যঙ্গ-ভরে বলে—সব ঝুট হ্যায়। তাই হয়তো মিথ্যে বলতে গ্লানির পরিবর্তে আনন্দই অনুভব ক'রে থাকে খোকা।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে, খোকা হাসে, কাঁদে না। কাঁদলে সে কোন্‌দিন ম'রে যেত।

খোকার অনেক কীর্তি, কিন্তু কথা এইটুকুই—এর বেশী নয়। একটা কীর্তি অপর-টারই পুনরাবৃত্তি। থাক্ খোকার কথা এইখানে।

খোকার পর আরও বন্ধুরা এল, পাড়ারই ছেলে সব।

দ্বিজপদ, বৈদ্যনাথ, বড় পাঁচু, ছোট পাঁচু।

ক্রমে ও-পাড়া থেকে এল বংশী। তার পরের পাড়া থেকে বীরেশ্বর। বীরেশ্বর বয়সে আমার চেয়ে বড়। তারই মাধ্যমে আলাপ হ'ল আমাদেরই পাড়ার বীরেশ্বরের বয়সী করালীর সঙ্গে।

দ্বিজপদ আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে আছে।

আমার 'কবি' উপন্যাসের বিপ্রপদ—দ্বিজপদেরই অক্ষম রুগ্ন অবস্থার চিত্র। বাল্যকালে দ্বিজপদ ছিল দুর্দান্ত দুরন্ত ক্রোধী, প্রচণ্ড রূঢ়ভাষী; কিন্তু আমার কাছে এবং আরও কয়েক-জনের কাছে সে ছিল প্রীতিমধুর, মিষ্টভাষী, অপরূপ মানুষ। আমার সঙ্গ সে খুব পেত না।

তবে পেলে কৃতার্থ হ'ত। সম্পর্কে (দূরসম্পর্ক নয়) আমি হতাম তার দাদামশায়, তার মায়ের কাকা। সে, তার দাদা, তার বোনেরা আমাকে 'দাদামশায়' বলত। দ্বিজপদ ছাড়া সবাই ছিল বয়সে বড়। এদের সকলের চরিত্রেই ছিল দ্বিজপদের মত দুটি বিপরীতধর্মী মানুষ—এক জন যত ক্রোধী, অপর জন তত মিষ্টভাষী। এর কারণ একেবারে রক্তগত বৈচিত্র্য, বংশানুক্রমের অতি সুস্পষ্ট প্রকাশ। দ্বিজপদের মা, আমার ভাইঝি তিগুণাসুন্দরী—'তিগুণী'র বংশের ভাষা—তার নিজের ভাষা ছিল অতি মিষ্ট ; দ্বিজপদের বাপের দিকের চরিত্রে ছিল অপরিমেয় রূঢ়তা, প্রচণ্ড ক্রোধ, কর্কশ উচ্চ কণ্ঠ ; আর ছিল জৈব আবেগের উন্মত্ততা, সে প্রায় অন্ধ উন্মত্ত ঘোড়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে চলত জীবনকে। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে সাদা কালো দুটি স্রোতধারা যেমন পাশাপাশি চলে, তেমনি ছিল দ্বিজপদের জীবন। আমার ভাগ্যে আমি যতবার ওদের জীবনধারায় অবগাহন করেছি, ততবারই স্নাত হয়েছি স্নিগ্ধ শান্ত কালিন্দীর কালো জলের ধারায়।

দ্বিজপদ আমার চেয়ে বয়সে ছিল এক বৎসরের ছোট। পড়ত কিন্তু ক্লাস তিনেক নিচে, ক্রমে সে ব্যবধান—পাঁচ ছয় ক্লাসের ব্যবধানে পরিণত হয়েছিল। দ্বিজপদের কণ্ঠ ছিল উচ্চ, উল্লাস ছিল উগ্র, তেমনি প্রবল ছিল জৈব প্রবৃত্তির পথে ছুটবার আবেগ। দ্বিজপদের বাবা ছিলেন আমার বাবার বাল্যবন্ধু, সম্পর্কে হতেন নাতজামাই, প্রতিবেশীও ছিলেন অতি-নিকট। দ্বিজপদের বাবা নিত্য আসতেন আমার বাবার ওখানে। চা খেতেন, গল্পগুজব করতেন। রামজী গোসাঁইবাবা তাঁকে ডাকতেন 'রাজা' ব'লে। তার কারণ যৌবনে দ্বিজপদের বাবা গ্রামের যাত্রার দলে রাজা দুর্যোধন সাজতেন। রাজার মত চেহারাও ছিল। তাঁর কথা থাক্। দ্বিজপদের কথা বলি। আমার জীবনে দ্বিজপদ এবং বড় পাঁচু হঠাৎ একদা এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা ক'রে দিলে, সে সূচনা সূত্ররেখার মত সূক্ষ্ম সূত্রপাত থেকে ভবিতব্যের রেখায় মিলে প্রশস্ত হয়ে হ'ল পায়ে-চলা পথ ; তারপর পরিণত হ'ল রাজপথে ;—অথবা তারা সেইদিন বল্মীক-স্তূপে আরোহণের আস্বাদন দিয়ে আমাকে ভাবীকালে দুরূহ পর্বতাভিযানে রত ক'রে দিয়ে—নিজেরা নেমে গেল অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে। অন্ধকারে কোন্ মনোরমের হাতছানি তাদের মুগ্ধ করেছিল, সেই কথাই আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবি।

স্পষ্ট মনে রয়েছে সেদিনের কথা।

বড় পাঁচু, দ্বিজপদ আমার সঙ্গে খেলা করছিল আমাদের বাড়ীতে। কয়েকদিন আগে নারাণের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। বড় পাঁচু এবং দ্বিজপদকে নিয়ে রামায়ণ-খেলা খেলছি। পাঁচু হি-হি ক'রে হাসছে ; ওটা ছিল পাঁচুর স্বভাব। কথার একটু জড়তা ছিল। অল্প বয়সেই—বোধ হয় এগারো বারো বছর বয়সেই মারা গিয়েছিল পাঁচু, যতটুকু মন পড়ে, তার স্বভাবের মধ্যে একটি ভীরু চতুরপ্রকৃতির জীব উঁকি মারত। ঠাকুর-বাড়ীতে পূজক ছিলেন বুড়ো ভট্টাচার্য, আগুনের মত কোপন-স্বভাব, কণ্ঠস্বর একটু খোনা ছিল ব'লে ছেলেবয়সে নাম হয়েছিল—খোনা, ক্রমে সেই নাম কোপন-স্বভাব হেতু—'খুনে'তে পরিণত হয়েছিল। চতুর ভীরু পাঁচু তাঁর কাছেও হি-হি ক'রে হাসত। ভটচাজ পূজা করতেন, পাঁচু দোরের পাশে

দাঁড়িয়ে উঁকি মারত আর হাসত—হি-হি! হি-হি! হি-হি! আশ্চর্য চতুর পাঁচু অনুভবে বুঝত যে, খুনে এতেই খুশী হবে।

সত্যই ভটচাজ রাগ করতেও পারতেন না। তিনিও হেসে ফেলতেন এবং পূজার মধ্যে অবকাশ হ'লেই প্রশ্ন করতেন—কি ?

—পেছাদ।

প্রসাদ দিতেন ভটচাজ। একটু চিনি, একখানা বাতাসা। এর বেশী শিবঠাকুর আর কি পান ?

পাশাপাশি পাঁচটি শিবমন্দির। ভটচাজ এক মন্দিরে পূজা সেরে দ্বিতীয় মন্দিরে ঢুকতেন। পাঁচু আবার এসে দাঁড়াত।

—হি-হি! হি-হি! হি-হি!

—আরে আবার কি ?

—ভশচাজ!

—কি ? আবার কি ?

—পেছাদ!

—আরে! আবার প্রসাদ ? এই যে দিলাম!

—তু আমাকে বায়ে বায়ে দে—আমি বায়ে বায়ে খাই ভশচাজ।

এবার ভটচাজই হেসে ফেলতেন হা-হা-ক'রে।

সেদিন খেলতে এসেও অকারণে হাসছিল পাঁচু।

হঠাৎ নারাণ এসে নিমন্ত্রণ জানালে। ভাগবত খেলছে তারা।

ভাগবত! অবাক হয়ে গেলাম।

ভাগবতের কথকতা তো তখন শুনেছি। সংস্কৃত শ্লোক—তার ব্যাখ্যাগান, বিচিত্র রস-রসিকতা—সেই সব ওরা করবে ? কে করবে ? তুই ? না—

—না, আমি না। নিশাপতি করবে। মঙ্গলডিহি থেকে নিশাপতি এসেছে।

নিশাপতি মঙ্গলডিহির ছেলে হ'লেও লাভপুরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে বেশী। নারাণের জীবনে সে-ই হয়েছে—নব নায়ক। সে-ই করবে ভাগবতের কথকতা।

গেলাম। সঙ্গে দ্বিজপদ পাঁচু এরাও গেল। সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। নিখুঁত পরি-পাটি আয়োজন। একখানি আসন, সামনে একটি ছোট জলচৌকি, তার উপর একখানি কার্পেটের ঢাকনি, কার উপরে ফুল ও একখানি বই। পুষ্পমাল্যশোভিত কণ্ঠে তিলকশোভিত নিশাপতি বসেছে আসনের উপর। সে বললে, অহো ভাগ্য! আসুন—আসুন। নমস্কার—

—নমস্কার। বললাম আমরা।

নিশাপতি গম্ভীর ভাবে বললে, দেবর্ষি নারদকে দেখে রাজা বললেন—অহো ভাগ্য! আসুন—আসুন—আসুন, দেবর্ষি, নমস্কার।

নিশাপতি তখন ভাগবত কথকতার এ স্টাণ্টটুকু আয়ত্ত করেছে। সেকালে ভাগবতের আসরে এই ভাবে অনেকজন আগন্তুক কথকের সাদর সম্বর্ধনায় আপ্যায়িত হয়ে বিনয় প্রকাশ ক'রে অপ্রস্তুত হতেন।

আমি অপ্রস্তুতই হলাম। কিন্তু পাঁচু বা দ্বিজপদ হ'ল না। তারা এমন হি-হি ক'রে হাসতে শুরু ক'রে দিলে যে, নিশাপতিই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এর পর সে সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে গেল।

মুখস্থ চাণক্য শ্লোক আউড়ে তার ব্যাখ্যা ক'রে নিশাপতি ভাগবত পাঠের খেলা খেলছিল। চাণক্য শ্লোক তখন বাল্য বয়সেই শেখানো হ'ত। আমি চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করি নাই; তবে কেউ বললে চাণক্য শ্লোক ব'লে চিনতে পারতাম। আমার মুখস্থ ছিল রঘুবংশের প্রথম শ্লোক—বাবা শিখিয়েছিলেন,

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥"

আমার সে শ্লোক আওড়াবার অবকাশ ছিল না। আমি চুপ ক'রেই রইলাম। নিশাপতি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুরু করলে। বিষ্ঠার মধ্যেও স্বর্ণখণ্ড থাকলে, তা সযত্নে সংগ্রহ করবে। বাস্, আর যায় কোথায়। হি—হি—হি—! হি—হি—হি!—বিষ্ঠা! ভাগবতের মধ্যে বিষ্ঠা! পাঁচু এবং দ্বিজপদ হেসে আসর পণ্ড ক'রে দিয়ে উঠে পড়ল, এবং পাঁচু মুখে মুখে কবিতা রচনা ক'রে ফেললে—

নিশাপতি—খিশাপতি—ছিশাপতি রে—

ভাগবতে হ্যাক-থু—হ্যাক থু-থু! হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি! সে আর থামে না। নিশাপতি প্রায় ক্ষেপে গিয়ে ভ্রষ্টযোগীর মত আসন ত্যাগ ক'রে উঠে মারপিট শুরু ক'রে দিলে। ওরা দলে ছিল ভারী। এলাকাটা ছিল ওদের। তবুও আমরা শুধু মার খেয়েই এলাম না, নাকের বদলে নরুনের মত দু-এক ঘা দিয়েও এলাম। এলাম আমাদের বৈঠকখানায়। এসে শোধ নেওয়ার পরামর্শ চলতে লাগল। হঠাৎ বাগানের একটা গাছ থেকে পড়ল একটি পাখির বাচ্চা। ছোট্ট পাখির বাচ্চা, বাসা থেকে প'ড়ে গেল কি ক'রে? খেলার মোড় গেল ঘুরে। শোধ নেওয়ার পরামর্শ স্থগিত থাকল। পাখিটিকে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে বাঁচাবার জন্য পরিচর্যা শুরু ক'রে দিলাম। জল দিলাম, গাড়ুর নলের মুখে জল। খামার থেকে ধান এনে দিলাম তার মুখে—খা খা। পরিচর্যায় হাঁপিয়ে উঠে ছোট পাখির ছোট প্রাণটুকু বেরিয়ে গেল। ঘাড়টি লট্‌কে পড়ল। অত্যন্ত দুঃখ হ'ল। আহা হা, ছোট পাখিটি! বাঁচলে—কেমন পুষতাম!

অতঃপর পাখিটিকে সমাধি দেবার কল্পনা হ'ল। মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলাম। পাখির ছানাটি প'ড়ে রইল বাগানের বাঁধানো বেদীর উপর।

হঠাৎ পাঁচু ডাকলে—দেখ।

দেখি, পাখির মা ডাল থেকে নেমে এসে ছানাকে ডাকছে। তার চারিপাশে ঘুরছে,

সস্নেহে ঠোকরাচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম।

পাঁচু ইতিমধ্যে মুখে মুখে কবিতা রচনা ক'রে ফেললে—

"তারা দাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি
তার মা এসে কাঁদিতেছে কেঁউ-কেঁউ করি।"

আমাদের বৈঠকখানার দরজায় লাইন দুটো খড়ি দিয়ে লিখে ফেললে সে। আমি বিস্মিত হয়ে পাঁচুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কবির সম্মান, কবির মূল্য তখন বুঝি নি, কিন্তু পাঁচু যা করেছে সে যে একটা মহাগৌরবের—তার মূল্য যে পরম মূল্য—তা যেন সেই মুহূর্তেই উপলব্ধি করলাম। উপলব্ধি করলাম নিজের বিস্ময়ের পরিমাণ থেকে, গম্ভীরতা থেকে। মা-পাখিটা ইতিমধ্যে ডালে গিয়ে বসলে, আবার এল, আবার গেল, কয়েকবারের পর ডালেই ব'সে রইল। তখন খড়ি নিয়ে আমি পাঁচুর লাইন দুটির নিচে লিখলাম—

পাখির ছানা—মরে গিয়াছে—
মা ডেকে ফিরে গিয়াছে—
মাটির তলায় দিলাম সমাধি—
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।

লাইন কটি অন্তত কুড়ি বৎসরের উপর লাল রঙ করা দরজার খড়খড়ির গায়ে লেখা ছিল। বোধ হয় কুড়ি বৎসরেরও বেশী। আমার আমলেই আমি নিজে হাতে সাদা রঙ দিয়েছিলাম দরজায়, তাতেই সে ঢাকা প'ড়ে গেছে। আমার সাহিত্য-সাধনা শুরু হয়ে গেল সেই দিন।

পাঁচু লিখেছিল প্রথম দুটি চরণ। আমি করেছিলাম পাদপূরণ। দিন তারিখ মনে নেই। তবে বয়স মনে আছে। আমার বয়স তখন আট বছরের কম। আট বছরেই আমার বাবা মারা গেলেন। তখন বাবা আমার বেঁচে ছিলেন। সেই বারেই পুজোর সময় কবিতা রচনা করলাম—

শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।

আর মনে নেই, আরও অন্তত বারো চৌদ্দ লাইন ছিল। বাবা সে কবিতা দেখেছিলেন। কবির সম্মান, কবির মূল্য আমাকে বুঝিয়েছিল পাঁচু। জিহ্বায় জড়তা, সবতাতেই হাসি, বিচিত্র পাঁচু হঠাৎ সেদিন কি ক'রে এবং কেন কবিতা রচনা করেছিল—তা ভাবি আর বিস্মিত হই। কবিতা রচনা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তার আকস্মিক উচ্ছ্বাস মুহূর্তে আমাকে দিয়ে গেল জীবনের দীক্ষা।

"শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।"

কবিতাটি রচনা করেছিলাম যখন, তখন অলক্ষ্যে কাল নিশ্চয়ই হেসেছিলেন। আজ সেই বহুকালের পুরানো কথা স্মরণ করতে গিয়ে—যখন পুরানো ছবিগুলি ঝাড়ামোছার পর স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে তখন মনে হচ্ছে—সেদিন ছবিগুলি আঁকা হওয়ার সময় অনেক কিছু চোখে পড়ে নি—পড়লেও সেদিন তার অর্থ উপলব্ধি হয় নি। কাল হেসেছিলেন এবং সে হাসি ঠিকই চোখে পড়েছিল, কিন্তু তাকে কালের হাসি ব'লে চিনতে পারি নি। এত কাল পর্যন্ত, এই মুহূর্তে সেই কাহিনী লিখবার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও না। আজ মনে পড়ছে সেই কালের হাসির খানিকটা ফুটেছিল বাবার মুখে—খানিকটা ফুটেছিল লোকের মুখে। বাবা হেসেছিলেন, রোগশয্যায় শুয়ে ছোট্ট কাগজে ছাপানো কবিতাটি প'ড়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটেছিল। প্রসন্ন, কিন্তু রোগের ক্লান্তি ও ক্লিষ্টতার জন্য বিষণ্ণ ও ব্যথিত। আমায় ডেকে সমাদর ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতটা লিখেছো, নারাণই বা কতটা লিখেছে?

কবিতাটির নিচে রচয়িতা হিসাবে আমার এবং নারাণের নাম ছিল। ছাপা হয়েছিল কলকাতার তখনকার দিনের এক বিখ্যাত প্রেসে—ক্যালিডোনিয়ান প্রেসে। নারাণের ঠাকুরদা ছিলেন ক্যালিডোনিয়ান প্রেসের বড়বাবু। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কুলীন। ঘেঠেরা তারাচরণের বংশধর, আমাদের গ্রামের জামাই। বছরে বার দুয়েক শ্বশুরবাড়ী আসতেন। পুজোর সময় একবার এবং আর একবার যখন হোক। তিনিই এনেছিলেন ছাপিয়ে। নারাণের সঙ্গে তখন বিরোধ মিটে গেছে; নারাণের পাশ থেকে নিশাপতির দলও অন্তর্হিত হয়েছে, আমার আশপাশ থেকে দ্বিজপদ পাঁচু এরাও সরেছে। পৃথিবীকে যারা ভাল-মন্দবোধের বিচার দিয়ে বেছে-বুছে ভোগ করে—তাদের সঙ্গে, যারা দু'হাতে ভোগ ক'রে যায় কোন বিচার না ক'রেই, তাদের সঙ্গে—ঠিক বনে না। ওদের সঙ্গে তাই ঠিক বনত না আমার। পাঁচু অল্পবয়সে গেছে, দ্বিজপদ অনেক দিন দুনিয়াকে দুর্দান্ত ভাবে ভোগ ক'রে—শেষ-জীবনে যেন কার প্রচণ্ড গদাঘাতে ভগ্ন-উরু দুর্যোধনের মত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। সুস্থ জীবনে যার প্রচণ্ড চীৎকার ক'রে পৃথিবীতে কোলাহল সৃষ্টি ক'রে চলা অভ্যাস ছিল, হঠাৎ সে একেবারে রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল; কঠিন যৌন ব্যাধি থেকে বাত। রোগের সামান্য উপশম হ'লেই দ্বিজপদ লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে গ্রাম্য রাস্তা উচ্চ হাস্যে রসিকতায় মুখর ক'রে তুলত। থাক্ সে কথা। দ্বিজপদরা বার বার এসেছে আমার কাছে। কিন্তু কিছুতেই বনে নি, কয়েক দিন পরেই আমার সঙ্গ ছেড়ে যেন পালিয়ে গেছে। সে দিনও নারাণ এলে ওরা চ'লে গিয়েছিল। বড় পাঁচুর দেওয়া প্রেরণা তখন আমার মনের প্রদীপে আলো জ্বালিয়েছে। একটা ছোট কথা মনে প'ড়ে গেল। এ ঘটনার অনেক পরে—সম্ভবত বছর পঁচিশেক আগে—কালীপূজার রাত্রে আমাদের গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে এক

জায়গায় পুজা। দেখতে চলেছিলাম ; হঠাৎ পথের ধারে গাছতলায় সিগারেট খেতে ব'সে দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় চোখে পড়ল কিছু খড় প'ড়ে আছে, বোধ হয় কোন যাত্রী ফেলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হ'ল খড়গুলিতে আগুন ধরিয়ে বহ্ন্যুৎসব করবার। ধরিয়ে দিলাম আগুন, খড় পুড়ে ছাই হতে লাগল। হঠাৎ বেশ একটু দ্রুতগতিতে এল দুটি লোক, বললে—'বাঁচলাম বাবু, দাও তো একটু আগুন, লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিই। আলো ধরিয়ে নিতে আগুন পাই নাই সারাটা পথ। সাথে দিয়েশলাই নাই।' আলোর শিখা জ্বেলে নিয়ে তারা চ'লে গেল মাঠের পথে। আমার সামনে খড় জ্ব'লে নিভে গেল ; অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠল। কেউ খড় পুড়িয়ে হাসে, কেউ পথের আলো জ্বালিয়ে নেয় তা থেকে।

বাল্যকালে একদিন আমার আলোয় নারাণকেও বললাম. তুই ভাই ধরিয়ে নে তোর মনের পিদীম এই শিখাতে। তা হ'লে ভাল হবে—একসঙ্গে চলব দুজনে।

নারাণ প্রথমটা উৎসাহিত হয়েছিল। এ উৎসাহ তার অনেকদিন ছিল। ওই কবিতা রচনায় সেদিন সেও যোগ দিয়েছিল। কতটা সে, কতটা আমি রচনা করেছিলাম—সে হিসাব আজ মনে নেই, করবও না।

বাবার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম, আমি অর্ধেক, নারাণ অর্ধেক।

—তুমি সবটা লিখলে না কেন ?

আমি চুপ ক'রে ছিলাম। তারপর বলেছিলাম, ওর ঠাকুরদাদাই যে ছাপিয়ে দিলেন।

এবার বাবা চুপ করেছিলেন।

সেদিন ষষ্ঠী। সপ্তমীর দিন সকালে ছাপা কবিতার তাড়া নিয়ে ঢাক ঢোল শানাই কাঁসী কাঁসর ঘণ্টা মুখর শোভাযাত্রার মধ্যে—দুটি শিশু কবি—সর্বসমক্ষে সলজ্জ বিনয়ের অন্তরালে সগৌরবে আত্মঘোষণা করলে—'আমাদের পদ্য, পড়ে দেখুন।' আমার এই আত্মঘোষণার সময় কাল হেসেছিলেন বিচিত্র হাসি।

ক্ষুদ্র একটি বাংলার পল্লীতে সেকালের গ্রাম্য বাঙালীর সমাজে এ আত্মঘোষণা খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু আমাদের গ্রাম ক্ষুদ্র ছিল না—আকারেও না, প্রকৃতিতেও না, প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে অহরহ উত্তপ্ত গ্রামখানিতে দ্বন্দ্বী রথীর সংখ্যা ছিল অনেক। আভিজাত্য, কৌলীন্যগৌরব ; বংশগৌরবের এবং সম্পদগৌরবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাজক্ষেত্রটি প্রায় কুরুক্ষেত্র তখন। অল্পস্বল্প ভূসম্পত্তি, গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ—এমন ধরনের ব্যক্তিরা সে কুরুক্ষেত্রে অর্ধ-রথীর সামিল। কিন্তু তা হ'লেও অস্ত্রে ধার তাঁদের কম ছিল না। কুরুক্ষেত্রের সময়ে সেনাপতি শল্যের মত বিক্রমে তাঁরা ভীষ্ম দ্রোণের অভাবে সৈনাপত্য গ্রহণের শক্তি ধরতেন। বড় রথী ছিলেন তাঁরাই, যাঁরা শুধু গ্রামেই প্রতিষ্ঠাবান নন—গ্রামের বাইরেও যাঁরা গণ্যমান্য। এমন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে আবার আমাদের গ্রামে এমন সব মানুষ ছিলেন, যাঁরা সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতায় থাকতেন, প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। রূপে, সজ্জায়, অস্ত্রে, ধ্বজায়, শঙ্খনাদে, তাঁরা এমনই দীপ্যমান ছিলেন যে তাঁদের চিনিয়ে দিতে হ'ত না—দেখবামাত্র চেনা যেত। এই রথীদের সামনে প্রতিষ্ঠাকামী বালকের আত্মঘোষণা সহজ ছিল না। সে দিন

রথীরা সবাই সমবেত। সমস্ত বৎসরের মধ্যে দুটি দিন তাঁরা সকলে একত্রিত হতেন, মহাসপ্তমীর প্রভাতে ঘট পূর্ণ করবার ঘাটে এবং বিজয়া-দশমীর দিন ওই ঘাটেই—ঘট বিসর্জনের অপরাহ্নে। আজ স্মৃতি স্মরণ করতে ব'সে সে দিনের আমার গ্রামের সেই দীপ্তমুখ প্রসন্নস্বাস্থ্য উজ্জ্বলশ্রী প্রাণবন্ত মানুষের সমারোহ মনে ক'রে চোখে জল আসছে। চারিদিকে দীপ্তি—চারিদিকে সবল দ্বন্দ্বে যুধ্যমান মানুষ, সে কত কোলাহল—কত বাজনা—কত উল্লাস—সে কি উচ্চ হাসি, সে কি প্রাণখোলা আলাপ! আবার তেমনি কঠিন উচ্চ ছিল বাদানুবাদ, ক্ষেত্রবিশেষে দৈহিক আক্রমণও হয়ে যেত। আর বক্র তীক্ষ্ণ হাস্যের গুণ আরোপ ক'রে মর্মান্তিক শরক্ষেপ—সে সে যেন অগ্নিবাণ ব্যর্থ হচ্ছে বরুণাস্ত্রে, বরুণাস্ত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে বায়বাস্ত্রে, বায়ুবাণ স্তিমিত স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে শৈবাস্ত্রে; সে যুদ্ধ বিচিত্র! তার মধ্যে ছাপা পদ্য হাতে নিয়ে যখন প্রবেশ করলাম, তখনকার অবস্থা আজ কল্পনা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে—অভিমন্যুর মতই দুঃসাহস হয়েছিল আমার সে দিন। কাগজ বিলি করতেই এই রথীদের অধরধনুতে বক্র হাস্যের জ্যা যোজিত হয়েছিল—পদ্য! কবিতা! কে লিখে দিলে? কি থেকে টুকলে? এরই মধ্যে ডিম ফুটে কালিদাস-হংস বেরুল নাকি? কেউ কেউ হয়তো মহাকবির "মন্দঃ কবিযশপ্রার্থী" শ্লোকটির প্রথম চরণও আউড়ে ছিলেন। সংস্কৃত-জানা কালিদাস-পড়া লোকও না-থাকা ছিল না আমাদের গ্রামে আমার কালে। আমার বাবার কালিদাস গ্রন্থাবলী আজও রয়েছে। অর্ধপ্রসন্ন অর্ধবক্র কালের হাসির প্রসন্ন ভাগটা ফুটেছিল শয্যাশায়ী আমার বাবার মুখে—বক্রকুটিল দিকটা ফুটল সেদিনের সমবেত জনতার মুখে। কয়েকজনের মুখে প্রসন্ন প্রশংসার হাসিও ফুটেছিল। তাঁদের আজও ভুলি নি। এঁদের ভোলা যায় না।

স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু, তাঁর মেজদাদা স্বর্গীয় অতুলশিববাবু, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপালবাবু, এঁদের সেদিনের প্রশংসা-প্রসন্ন হাসি আমার চোখের উপর ভাসছে।

দ্বিজপদ সেদিন হঠাৎ আমায় সম্বোধন করলে 'কপিবর' ব'লে। সঙ্গে সঙ্গে কোন পূজাবাড়ী থেকে সংগ্রহ ক'রে আনা একটা কপিপাতা নিজে কচকচ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে বললে, কপি খেয়ে ফেললাম। ওর আচরণটুকু আমাকে ওর বাক্যের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে। বুঝলাম, কেউ ওকে শিখিয়ে দিয়েছে কপিবর কথাটা। কিন্তু কপির অর্থ বেচারা জানে না। আমি কপিপাতা চিবিয়ে খাওয়া দেখে হেসে উঠেছিলাম। পরবর্তী কালে দ্বিজপদকে আমিই ডাকতাম কপিবর বলে। সে প্রাণ খুলে হাসত। মধ্যে মধ্যে বলত, একদিন কিন্তু 'উ-প' শব্দ ক'রে ঘাড়ে চ'ড়ে বসব।

আমি হাসতাম, বলতাম, ঘাড়ে না, তুই নাতি, তুই বন্ধু—পড়িস তো বুকে লাফিয়ে পড়িস। কখনও কখনও বলতাম, দোহাই, যেন ঘাড়ে ব'সে কান ধ'রে টেনে ছিঁড়িস না।

সে জিভ কেটে পায়ের ধুলো নিয়ে বলত, দাদু, ছি-ছি দাদু! ছি-ছি! গাল পেতে বলত, মার মার, তিন চপেটাঘাত—থ্রি স্ল্যাপস। সটাসট—সটাসট!

সেদিনের কথাই বলি। কপিবর ব'লে কপির পাতা চিবিয়েই দ্বিজপদ ক্ষান্ত হ'ল না, সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় দ্বিজপদ ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এল—ওই ছাপানো

'পত্ত' নিয়ে।

—কে লিখতে পারে? কার ক্ষমতা আছে বল্ না শুনি? আমাদের পাড়ায় চারজনা পত্ত লিখেছে। গোপালবাবু লিখেছে, নির্মলবাবু লিখেছে, তারাশঙ্কর লিখেছে, নারাণ লিখেছে। কে লিখেছে তোদের পাড়ায়?

—লেখে নাই, লিখতে পারে আমাদের কালীকিঙ্করবাবু।

—কালীকিঙ্করবাবু! কালীকিঙ্করবাবু তোদের পাড়ার? একা তোদের পাড়ায়? কালীকিঙ্করবাবু দু পাড়ার।

শেষ পর্যন্ত মারপিট ক'রে ফিরল দ্বিজপদ।

আমাকে এসেই ডাকলে।—লাগাও যুদ্ধ ওদের সঙ্গে, ও পাড়ার সঙ্গে।

আমাদের বাড়ীতে তখন সমস্ত কিছু যেন থমথম করছে। বাবার অসুখ দেখে ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছেন পিসীমা। বাবা পুজোর বাজার করতে গিয়েছিলেন কলকাতা; সেখান থেকে এসে জ্বরে পড়েছেন। একজ্বরী জ্বর। প্রথমে ছিল অল্প জ্বর। ধীরে ধীরে জ্বর বেশী হয়ে চলেছে। আজ চারদিন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন নি। আমাদের গ্রামের ডাক্তার গিরিশবাবু ভয় পেয়েছেন আজ। আমার আশুদাদাও চিন্তিত হয়েছেন। তখন আমাদের জেলায় সিউড়িতে ছিলেন লালা গোলোক ব'লে একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। কিন্তু তাঁর চেয়েও খ্যাতি বেশী ছিল রামপুরহাটের হরিতারণ ডাক্তারের। ডাক্তার আনাবার জন্য লোকও অপরাহ্নে রওনা হয়েছিল, কিন্তু অন্য কয়েকজন প্রবীণে সে লোককে ফিরিয়ে এনেছেন।

সেকালে এটি ছিল একটি গ্রাম্য সমাজের বৈশিষ্ট্য।

শুধু ক্রিয়াকলাপেই নয়, অসুখে-বিসুখেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এসে একান্ত আপন জনের মত বসতেন। কতটা তার আন্তরিক কতটা যুদ্ধ কর্তব্য পালনের তাগিদ—সে কথা বলতে পারব না, তবে এটা ছিল। সে অসুস্থ ব্যক্তি, যেমন প্রতিষ্ঠার মানুষ হোক না কেন, তার চারিপাশে মানুষের অভাব হ'ত না।

রোগের গুরুত্ব তাঁরা ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাঁরা নিজেরা প্রত্যেকেই নাড়ী দেখতে জানতেন। ওটা ছিল সেকালের অপরিহার্য একটা শিক্ষা। অনেকের এই নাড়ীজ্ঞান ছিল যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি বিচক্ষণ।

ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে নাড়ী চলছে, পায়রার মত থমকে-থমকে চলছে, পিঁপড়ের পায়ের মত চলছে—এ সব কথা এখনও আমার মনে আছে। তাঁরাই নিজেরা নাড়ী বিচার করে লোক ফিরিয়ে আনলেন।

বাবার হয়েছিল টাইফয়েড। কলকাতা থেকে বীজাণু সংক্রামিত হয়েছিল। নাড়ী দেখে তাঁরা সে আভাস সকলেই পেয়েছিলেন, কিন্তু রোগ কতটা কঠিন হয়েছে বা হতে পারে তাই নিয়ে মতভেদ হয়েছিল। আমার বাবার স্বাস্থ্য ছিল অপরূপ। এই রোগে—শেষ তিন চারদিন বিছানায় থাকলেও—বসেই আছেন; সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যাচ্ছেন।

তিনি নিজেও বললেন, কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ শৈলজা ? তুমি ব্যস্ত হলেও তো রোগ ব্যস্ত হয়ে চলে যাবে না। ওর ভোগ ও পূর্ণ ভোগ করে তবে যাবে।

সপ্তমীর দিনই সকালবেলা আমায় পুজোর পোশাক বের করে দিয়েছেন। আমরা তখন ভাইবোন তিনজন—আমি বড়, আমার ছোট বোন, তারপর আমার মেজভাই ; আমার কনিষ্ঠ সহোদর পাঁচ মাস মাতৃগর্ভে। আমাদের সকলকে পোশাক পরিয়ে ভাল করে দেখেছেন কাকে কেমন মানিয়েছে। রসিকতা করেছেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রাম চাকরের কোলে আমার ছোট ভাইকে দেখে। মাকে আদেশ করেছেন পোশাকী কাপড় পরতে। পরদিন মহাষ্টমীতে আমাদের বাড়ীতে গ্রামের লোকের নিমন্ত্রণ, তার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই চণ্ডীমণ্ডপ—জানলা খুললে খাটে বসেই সব দেখা যায়। তিনি খাট থেকে নেমে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পূর্ণঘট চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশমাত্র প্রণাম করেছেন ;—নবপল্লবকে মণ্ডপে স্থাপন করে সপ্ততীর্থের জলে স্নান করানো দেখেছেন—হুলুধ্বনি দিয়ে পান সুপারি ছিটিয়ে বরণ করে নবপল্লব পূজাবেদীতে স্থাপনার পর তবে আবার বিছানায় শুয়েছেন। সুতরাং তাঁকে খুব বেশী অসুস্থ না ভাববার মত কারণ অনেক ছিল। বুঝতে কয়েকজন পেরেছিলেন। মা-পিসীমা মনের একটা আকুলতা থেকে বুঝেছিলেন। রাম চাকরও যেন বুঝেছিল। আর বুঝেছিলেন যোগেশদাদা। যোগেশ মজুমদার ছিলেন আমার জ্যাঠামশায়ের নায়েব। তাঁর কথা আগে বলেছি। তাঁর মত নাড়ীজ্ঞান ক্বচিৎ দেখা যায়। নাড়ী দেখে তিনি বলে দিতেন—এ জ্বরের ভোগ হবে কত দিন। বলতে পারতেন—জ্বরের পরিণতি কি হবে। খুব বেশী দিনের কথা নয়, বোধ হয়, বৎসর পঁচিশেক আগে, আমাদের ওখানে স্বনামধন্য কয়লা-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছেলের টাইফয়েড হল। বারো দিনের দিন যোগেশ-দাদা নাড়ী দেখে এসে বললেন, কলকাতা থেকে ডাক্তার আনবার জন্য লোক গেল। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কেমন দেখলে যোগেশদা ?

—আমি ? দাড়িতে হাত বুলিয়ে যোগেশদা ম্লান হাসি হাসলেন।

—কঠিন কিছু ?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, ভাই, নাড়ীর গতি আমি যতটুকু বুঝি তাতে আমার মনে হল, রোগটি ব্রহ্মা-বিষ্ণুর আয়ত্তের বাইরে। তবে শিব সব পারেন। মৃত্যু একমাত্র তাঁর আয়ত্তাধীন।

তারপর বলে দিলেন—আঠারো দিন কি বাইশ দিন। তার পূর্বে বোধ হয় একটি অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যাবে।

সে অসুখে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন, কলকাতার বর্তমান চিকিৎসা-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। পাঁচ-ছ দিন তিনি ছিলেন, প্রাণপণে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে যা করবার করেছিলেন। অবশ্য তিনিও আশা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তাঁর কর্তব্য তিনি করেছিলেন। প্রায় অক্ষরে অক্ষরে যোগেশদাদার নাড়ী-পরীক্ষার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। চিকিৎসা তিনি করতেন না, শুধু ওই নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন আশ্চর্য

সাধনায়। আজ পেনিসিলিন-স্টেপ্‌টোমাইসিনের যুগে যোগেশদার নাড়ীজ্ঞান অনেকটা বিভ্রান্ত হ'ত এ কথা ঠিক, কিন্তু তাঁর একটা কথা লিখবার সময়েও আমার কানের কাছে যেন বাজছে। ঐ সময়েই তিনি বলেছিলেন, ভাই, সাধারণ রোগের নাড়ী আর মৃত্যু-রোগের নাড়ীতে পার্থক্য আছে। বুঝা কঠিন, সব সময়ে বুঝতে পারাও যায় না। তবে গভীর মন দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলে আভাস পাওয়া যায়, বুঝা যায়। সাধারণ রোগে নাড়ী দেখে এও বলা যায়—ঠিক ঠিক ঔষধ পড়লে এই এই দিনে এই উপসর্গের হ্রাস হবে, এই ভাবে জ্বরত্যাগ হবে। সে বলা কঠিন নয়। রোগের প্রকোপের মাত্রা, ঔষধের শক্তির মাত্রা, ঐ দুইয়ে যোগ-বিয়োগ ক'রে বেশ বলা যায়। কিন্তু মৃত্যুব্যাধিতে ঔষধ কার্যকরী হয় না।

এই যোগেশদাদা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনিও এ কথা বলতে পারেন নি। কি করে বলবেন—এই ভেবে তিনি কূলকিনারা পান নি।

রাম চাকর সকলকে বলেছিল—আমার কি রকম লাগছে গো। উহু, ই ভাল নয়। উহু! উহু!

সে এক বিচিত্র পরিবেশ! আজও মনে পড়ছে—আমার শিশুচিত্তের সে কি দ্বন্দ্ব! বাইরে দুয়ারের ওপারে আনন্দ-কলরোলের প্রবাহ বয়ে চলেছে, শঙ্খ-ঘণ্টায় হুলুধ্বনিতে ঢাকে-ঢোলে-কাঁসীতে সানাইয়ের সুরে ঘোষণা করে আনন্দ-কলরোল প্রহরে প্রহরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, পরিচ্ছদের বর্ণচ্ছটায়, শরৎ-রৌদ্রের ঝলমলানিতে, দেবমূর্তির সৌন্দর্যে গাম্ভীর্যে রূপের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। রূপের সঙ্গে গন্ধ মিশেছে—গঙ্গা যমুনার ধারার মত। দেবমন্দিরে উঠছে ধূপগন্ধ, ঘৃতদীপের গন্ধ, পরাতের উপরে রাশীকৃত গন্ধপুষ্প—পদ্মফুল এসেছে ডালা ডালা, গন্ধরাজ টগর মালতীর রাশি সাজানো রয়েছে, ওদিকে ঘষা হচ্ছে অগুরু চন্দন। বধূ-কন্যাদের পরিচ্ছদে উঠছে পুষ্পসারের গন্ধ।

সেই চণ্ডীমণ্ডপের গায়েই আমাদের বাড়ীটা সে দিন যেন ধনীর দুয়ারে কাঙালিনী মেয়ের মতই দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ীর ভিতরে পূজার আয়োজন চলছে, তবু যেন সেখানকার আকাশ মেঘমলিন, সব যেন স্তব্ধ হতশ্রী, বায়ুতেও যেন অভাব ঘটেছিল। বাড়ীতে থাকতে আমার শিশুচিত্তের যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল। তবু সেখান থেকে বেরুতে পারছিলাম না। কেউ জোর করে চণ্ডীমণ্ডপে পাঠিয়ে দিলে—সেখানেও থাকতে পারছিলাম না, কঠিন আকর্ষণে বাড়ীতে এসে ঢুকছিলাম।

আমাদের সেকালের লাভপুর ব্যক্তিত্বে আভিজাত্যে এবং যোগ্যতায়, রুচিতে এবং মহার্ঘ্যতায় বাংলাদেশের মহানগরীর রুচিসমৃদ্ধ পল্লীর সঙ্গে তুলনীয় ছিল; পূজার সময় সেই শোভা ষোলকলায় পরিপূর্ণ হত। বিদেশে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা প্রতিটি জন ফিরতেন গ্রামে। ষষ্ঠীর দিন রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যেকে যেন ফিরতে বাধ্য ছিলেন। না-আসাটা মহা-অপরাধ বলে গণ্য হত। সমাজের কাছে, গ্রামের কাছে এই শর্তে যেন দলিল লেখা ছিল। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ যাঁদের বলি, সেদিনের লাভপুরের জীবন-দ্বন্দ্বের মহারথী ও রথী—তেমন

মানুষের সংখ্যাই ছিল ষাট-সত্তর জন, এঁদের সঙ্গে আসত পরিজনেরা। একটি পল্লীগ্রামে এমন দেড়শত মানুষের আগমন কম কথা কথা নয়। তাঁরা এসে পূজা-সমারোহের মধ্যে যে উল্লাসের সৃষ্টি করতেন তাতে গ্রামের সকল বিষণ্ণতা, সকল মলিনতা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যেত। তাঁরাও যেন দমিত-উল্লাস হয়ে গেলেন। আমার বাবার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিত্বের কথা আগেই বলেছি। এই পূজাসমারোহের মধ্যে তিনি থাকতেন পুরোভাগে। তাঁর কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য উল্লাসকে যেন একটি মহিমা দিত। এবং তাঁর অসুস্থতা ছিল যেন কল্পনার বাইরের ব্যাপার। তিনি যে-অসুখে উঠতে পারেন নি, সে-অসুখ তো কম নয়—এই কথাটাই সকলকে উল্লাসের মধ্যেও সংকিত ক'রে দিয়েছিল। একে একে দল বেঁধে তাঁরা আসতে শুরু করলেন দেখতে।

এর মধ্যে বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে কয়েক জনকে। ইন্দ্রবাবু উকিল, যোগীবাবু উকিল আর ব্রজ জ্যেঠা-মহাশয়কে। বাবার সমবয়সী—অন্তরঙ্গ বন্ধু তিনজনেই। ইন্দ্রবাবু শুধু লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলই ছিলেন না—তিনি সে আমলের সত্যকারের সংস্কৃতবান মানুষ ছিলেন, পাণ্ডিত্যে ব্যক্তিত্বে আচারে ব্যবহারে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর-ভূদেব-বঙ্কিম-ইন্দ্রনাথের (পঞ্চানন্দ) অনুগামী। সম্ভবত সেকালে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সপ্তমীর সন্ধ্যায় বাবার রোগশয্যার চারিপাশে মজলিস ব'সে গেল। আমি উঁকি মারছিলাম। যেতে পারছিলাম না। মনে আছে—ইন্দ্রবাবু আমার গায়ে বীরভূমের বসোয়া-বিষ্ণুপুরের সিল্কের পাঞ্জাবি দেখে বলেছিলেন, হরিবাবু, এই জন্যই আপনাকে এত ভালবাসি। এখানে এসে দেখলাম ছোট ছেলেদের গায়ে আগাগোড়াই বিলিতী জামা পোশাক। আপনার ছেলের পরনে দেখছি, ফরাসডাঙ্গা ধুতি—দেশী সিল্কের পাঞ্জাবি। ছেলে কাঁদে নি—জরিদার ভেলভেটের পোশাকের জন্যে ?

বাবা মৃদু হেসেছিলেন।

এইটুকুই মনে আছে। তারপর আলোচনা চলেছিল অনেকক্ষণ। যোগীবাবু ছিলেন অন্য ধরণের মানুষ। সৎ মানুষ, খাঁটি উকিল। বাবার সুখ-দুঃখের বন্ধু ছিলেন—আমাদের উকিলও ছিলেন। তিনি ব'সেই ছিলেন চুপ ক'রে।

ব্রজজ্যেঠার আসার কথা মনে আছে। আত্মভোলা সরল রসিক মানুষ। গান গাইতে পারতেন। তিনি গান গেয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। শুনেছি, তিনি সিঁড়ি থেকেই গান ধরেছিলেন—

"ও ভাই কানাই, তু ভাই বিনে রাখাল-খেলা হয় না খেলা—
তু ভাই শুয়ে থাকলি ঘরে, চ'লে যে যায় গোঠের বেলা।"

ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, এ কি কাণ্ড ভাই হরাই! মনে মনে কত আঁচ ক'রে গাঁয়ে এলাম—মহামায়ার পূজা, তুমি ভাই অসুখ ক'রে ঘরে পড়ে! শিবরাম। শিবরাম! তারা কালী—কালী তারা! কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠে বলেছিলেন, হরি—হরি—হরি! এ যে অনেকটা জ্বর ভাই হরাই!

ব্রজজ্যেঠা আমার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন, জ্যেঠা, তুমি নাকি পদ্য লিখেছ? আমাদের পাড়ার সদরে দেখি—ছেলের দল দেওয়াল থেকে কাগজ ছিঁড়ছে। আর ঐ পাড়ার শশনের ব্যাটা—কি নাম—আচ্ছা বাহাদুর লেড়কা—এই যে কি-পদ—তার কান ছিঁড়ছে। আমি ছাড়িয়ে দিয়ে বললাম, কান ছিঁড়িস না বাবা, তার আগে বল্ হ'ল কি? বলে—হরিবাবুর ছেলে তারাশঙ্কর আর চারুবাবুর ছেলে নারাণ পদ্য লিখেছে—তাই ওই কি-পদ—ও এসে টিটকিরি দিয়েছে আমাদের পাড়ার ছেলেদের। তাই ছেলেরা—পদ্য ছিঁড়েই ক্ষ্যান্ত হয় নি, ছোকরার কানও ছিঁড়ে দেবে। আমি বলি, বাবারা, তাতে রাগ কেন? সরকারপাড়ার আমরা সাতপুরুষ জমিদার—কাগজং-কলমং-লিখনং-পঠনং—ও আমাদের বারণং; হায়—হায়—হায়, নইলে পোস্টাপিসে চাকরি পেয়েছি সেই কবে, আজও প্রমোশন হ'ল না রে বাবা! যতবার দরখাস্ত করি, ততবার ওপর থেকে লেখে—'নো'। কেন 'নো'? না—দরখাস্তেই এত ভুল যে ওতে প্রমোশন হয় না। আমি বলি, দিস না ব্যাটারা। জমিদারকে প্রমোশন দিতে হ'লে রাজা করতে হয়, সে তোদের হাতে নেই। কই জ্যেঠা তোমার পদ্য দেখি। ছেঁড়া কাগজটা তো পড়া হয় নি!

হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার এবং আশুদাদা। তাঁদের পিছনে পিসীমা।

ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। ডাক্তার দেখবেন। পিসীমা বললেন, সকলেই বলছেন ভাল আছেন দাদা। কিন্তু আমার যে ভাল ঠেকছে না ডাক্তার। তুমি দেখ। ভাল ক'রে দেখ।

মুহূর্তে অন্ধকার এল ঘনিয়ে। ইন্দ্রবাবু আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, ক্ষিদে পায় নি? যাও, মায়ের কাছে যাও।

অকস্মাৎ কাল এসে দাঁড়াল।

তাকে যেন স্বচক্ষে দেখেছিলাম। অষ্টমীর দিনও কেটে গিয়েছিল এমনি ভাবেই। মহা-নবমীর দিন অকস্মাৎ অতর্কিতে সে এসে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে তার ঠোঁটের এক কোণে বাবার ঠোঁটের ম্লান হাসি, অন্য কোণে ফুটেছিল বক্র তীক্ষ্ণ হাসি।

মহানবমীর দিন বেলা একটার সময় বাবা মারা গেলেন।

স্পষ্ট মনে পড়ছে, বাবা দশটার সময়ে বললেন—এ ঘর তিনি বদল করবেন। মহানবমীর দিন আমাদের ও অঞ্চলে পূজা-সমারোহের সর্বোচ্চ লগ্ন। বলি হয় অনেক—ছাগ-মেষ-মহিষ, এবং বলির নিয়ম এক স্থানের পর অন্য স্থানে পর্যায়ক্রমে। গ্রামে সকল পূজা-বাড়ীর ঢাক ঢোল একত্রিত হয়ে বাজতে থাকে, গোটা গ্রামের লোক এক স্থানের পর অন্য স্থানে চলে শোভাযাত্রার মত।

এই কারণেই বাবা বললেন, এ ঘরে বাজনার শব্দ হবে প্রচণ্ড। একটু দূরের ঘরে যাবেন। ডাক্তারে নিষেধ করলেন। কিন্তু তিনি শুনলেন না। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি হেঁটেই ঘর বদল করলেন।

বেলা এগারটা নাগাদ দেখা দিল বিকার। ভুল বকতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সে

চোখের দৃষ্টি আমার চোখের উপর ভাসছে, রক্তাভ চোখের অস্থির চঞ্চল অর্থহীন দৃষ্টি ; সে দৃষ্টি কি যেন খুঁজছিল।

মনে আছে, ইন্দ্রবাবু উকিল মুখের কাছে ব'সে প্রশ্ন করলেন, হরিবাবু !

—আঃ ! কি ?

—কে আমি বল তো ? চিনতে পারছ আমাকে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি ইন্দ্র।

—কিন্তু এমন কেন করছ ?

—সর ইন্দ্র, সর। স'রে ব'স। দেখছ না, বসতে পাচ্ছেন না। দাঁড়িয়ে আছেন।

—কে ? কি বলছ ?

—ঠিক বলছি। বাবা। আমার বাবা এসেছেন, দাঁড়িয়ে আছেন। আঃ, ইন্দ্র, গুরু-জনের সম্মান রাখ। স'রে ব'স, জায়গা দাও। বাবা—আমার বাবা। স'রে যাও, সব স'রে যাও। শৈল, আসন দে। আসন দে।

কপালের উপর জলপটি, লাল চোখ, অস্থির দৃষ্টি—বাবার চোখ আমার দিকে পড়ল, কিন্তু আমি তাঁর চোখে পড়লাম না।

কে যেন আমায় কোলে তুলে নিয়ে গেল।

তারপর মনে পড়ছে, বাবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগের ছবি। সেই সময় ছুটে এসে পড়েছিলাম। বিহ্বল হ'য়ে দেখলাম।

চারিদিকের কলরব কান্না—কিছুই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারে নি। আমি দেখলাম, সে বিকারের প্রচণ্ডতা—সে অস্থিরতা।

আবার আমাকে কে নিয়ে গেল।

বাবার দৃষ্টি তখন স্থির হয়ে গেছে।

আবার ফিরে এলাম।

জনতা তখন স্তব্ধ। মৌন মূক সব। মা উপুড় হয়ে প'ড়ে আছেন আপাদমস্তক আবৃত ক'রে ঘরের এক পাশে। বোধ হয় চেতনা ছিল না তখন। পিসীমা প'ড়ে আছেন। একে একে লোক আসছে, দাঁড়াচ্ছে, আবার চ'লে যাচ্ছে। শুধু উঠছে পদধ্বনি।

বাবা শুয়ে আছেন। চোখ দুটির পাতা তখন নামিয়ে দিয়েছে কেউ। আমি নেড়েছিলাম বাবার দেহ। ঠাণ্ডা হিম—কঠিন। মুহূর্তে মনে হ'ল, আর ডাকলে সাড়া দেবেন না। ঠাণ্ডা হিম কঠিন হয়ে গেছেন বাবা। স্বচক্ষে মৃত্যু দেখলাম প্রথম। আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম। আতঙ্কিত অভিভূত আমি থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলাম।

১৬

আমার কাল সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কাল।

আমার কালের কথা স্মরণ করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সে-কালকে। ধরাশায়ী বিশালকায় ঘনপল্লব বনস্পতি। মনে ভেসে ওঠে আমার পিতার শবদেহের কথা। শালপ্রাংশু মহাভুজ, লৌহকপাটের মত বুক, প্রশস্ত ললাট, ললাটে সারি সারি চিন্তাকুল বলী-রেখা। গম্ভীরদৃষ্টি মানুষটির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি মনে পড়ে না। মনে পড়ে কঠিন হিমশীতল দেহ, অর্ধনিমীলিত স্থির শূন্যদৃষ্টি চোখ, নিথর হয়ে প'ড়ে আছেন, ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন যেন অনন্তের ধ্যানে। এই আমার সে কালের ছবি। তাই সে কালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ত্রুটি বিচ্যুতি অপরাধ, তার স্খলন আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মত। আমার বাবা তাঁর দিনপঞ্জীতে তাঁর চরিত্রের কোন দিক অনুদ্ঘাটিত রাখেন নি, এবং সে দিনলিপি আমাকেই উদ্দেশ ক'রে লিখে গেছেন, সব জানিয়ে গেছেন ; বার বার ব'লে গেছেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে, বংশগত ঐতিহ্য-মহিমাকে অক্ষুণ্ণ অটুট রাখতে, অপূর্ণ কামনাকে পরিপূর্ণ করতে। সে ঐতিহ্য, সে মহিমা ব্রাহ্মণের। ধনীর নয়, দরিদ্রের নয়, জমিদারের নয়, প্রজার নয়, মহিমময় মানুষের। যে ত্রুটি জীবনে ছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আদেশ দিয়ে গেছেন। তাই তো শ্রদ্ধা ছাড়া অবজ্ঞা ঘৃণা করতে পারি না সেকালকে! তাই তো বলতে পারি না সেকাল ছিল ভ্রান্ত।

কোন ভ্রষ্ট জন কি বলে ?—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রো। আমি পারি নি ; হে আমার উত্তরপুরুষ তুমি ক'রো।

কোন ঘৃণ্য জন কি বলে ?—জীবনে যেটুকু সত্য তাকে জীবন বিনিময়ে রক্ষা ক'রো। হে আমার উত্তরপুরুষ, তোমার উত্তরপুরুষের জন্য এটুকু গচ্ছিত দিয়ে গেলাম তোমার কাছে।

কোন অতৃপ্ত আত্মকেন্দ্রিক অসুস্থ মানুষ কি বলে ?—আমার জীবনে যা পরিপূর্ণ হ'ল না, হে আমার উত্তরপুরুষ, তা যেন তোমার জীবনে পূর্ণ হয়!

আমার কালের অপরার্ধ নূতন-কাল যেন আমার মা।

জ্যোতির্ময়ী—প্রসন্ন।

তিনি বলেন, আঘাতে বিচলিত হ'য়ো না, ক্লান্ত হ'য়ো না, পথ চল।

শুচিশুভ্রবস্ত্রাবৃতা মায়ের একটি কথা ব'লেই শেষ করব।

বাবার মৃত্যুর পরই অকস্মাৎ একদিন অনুভব করলাম—আমি নিঃসহায়, আমি সমগ্র গ্রামে উপেক্ষার পাত্র, করুণার পাত্র। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শারদীয়া নবমীর দিন আমার বাবা মারা গেলেন। পরদিন বিজয়া-দশমী। তারপরদিন একাদশী। একাদশীর দিন সকালে আমাদের হিন্দুসংসারে একটি অনুষ্ঠান আছে। আজও আছে। বলে 'যাত্রার সাইত'।

সম্ভবত, রামচন্দ্র বিজয়া-দশমীর দিনে রাবণ বধ ক'রে বিজয়যাত্রা শেষ ক'রে পরদিন প্রাতে সভানুষ্ঠান করেছিলেন। পুরস্কৃত করেছিলেন বানর-সৈন্যদের, রাক্ষসদের মার্জনা করেছিলেন, প্রসাদ বিতরণ করেছিলেন। মহাযজ্ঞ শেষে আরম্ভ হয়েছিল নবজীবন। সেই অনুকরণেই বোধ হয় এই প্রথার সৃষ্টি।

সেদিন সকালে শুভসময়ে চণ্ডীমণ্ডপে গৃহস্থকর্তা তাঁর সম্বল নিয়ে বসতেন—আজও নামমাত্র বসেন—সামনে থাকত বাক্স। বাক্সের মধ্যে আধুলি সিকি দুয়ানি ডবলপয়সা পয়সা। তখন আনি মুদ্রার সৃষ্টি হয় নি; ডবলপয়সা ছিল তামার এবং আকারে ছিল টাকার মত বড়। প্রথমেই আমাদের গ্রামদেবতা ফুল্লরা দেবীর পূজক পুরোহিত ও পদিয়ান এসে প্রসাদী বিল্বপত্রের মালা গলায় দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে দাঁড়াতেন। কর্তা টাকা বা আধুলি বা সিকি দিয়ে প্রণাম করতেন। তারপর দুর্গাপূজার পূজক, পুরোহিত, পরিচারক, পাচক, ছেস্তাদার, প্রতিমা গঠনের কারিগর, ডাকসাজের মালাকার, নাপিত, বাজনদার, প্রতিমাবিসর্জনের বাহক দল, প্রতিমার চুল যারা তৈরি করে তারা, প্রতিমার নাকের নথ দেয় যারা তারা, আসন-অঙ্গুরী-সরবরাহকারী, ফুলবিল্বপত্র-সরবরাহকারী—সে অনেক অনেক জন—এসে তাদের প্রাপ্য নিয়ে যেত। গ্রামান্তর থেকে লাঠিয়াল আসত, তারা বিসর্জনের মিছিলে রক্ষক হিসেবে থাকত, তারা নিয়ে যেত প্রাপ্য। এর পর আসতেন চিকিৎসক, বৈদ্য, বিষবৈদ্য—অর্থাৎ সাপুড়ে, গো-বৈদ্য, চৌকিদার, দফাদার, কনস্টেবল, পোস্টাপিসের পিওন। মোদক আসত মিষ্টান্ন নিয়ে, মুদী আসত মসলা নিয়ে, জেলে আসত মাছ নিয়ে। তারা কাপড় পেত, টাকা—একটা টাকাও নিয়ে যেত, হিসেবে জমা করত। গ্রামের দাই আসত, রজক আসত, কর্মকার আসত। দু আনা চার আনা বৃত্তি নিয়ে যেত। বাউল আসত, দরবেশ আসত, ভিক্ষুক আসত, সন্ন্যাসী আসত। সাঁওতালেরা আসত দল বেঁধে, তারা নাচত; বাঁশী মাদল বাজাত, দু পয়সা চার পয়সা বিদায় পেত আর পেত অন্দর দুয়ারে আঁচল ভ'রে মুড়ি খই মুড়কী। এ সব এই মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পেত। এই আসরে এসে বসত গ্রামের শিশু বালক বালিকার দল। প্রতি আসরে একটি করে পয়সা পেত। এ হ'ল শিশুদের বৃত্তি, এ আজও আছে। এই দিনটিতে ছেলেদের হাত পাততে কোন বাধা নাই। লক্ষপতির সন্তানেরও নাই। আমি আমার বাবার কাছে প্রতি বার পেতাম একটি ক'রে টাকা। তা ছাড়া সকল আসর ঘুরে পাঁচ ছ আনা হ'ত।

সেবার যাত্রার সাইতের আসরে আমাকেই বসিয়ে দিলে আমার বাবার শূন্য আসনে। ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ পরেই হ'ল আমার ছুটি। উঠবার সময় কিন্তু আমার বৃত্তি একটি টাকা নিতে ভুললাম না। আমাকে তখন পাশের আসর থেকে ডাকলেন জ্যাঠামশাই। একটি সিকি বা কিছু যেন দিলেন। ওপাশ থেকে ডাকলেন হিরণ্যভূষণবাবু। তিনি বোধ হয় আধুলি দিলেন। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, এমন অভাবিত সৌভাগ্যের হেতু। একটু উৎসাহিত হয়েই অন্যান্য কর্তাদের আসরে গেলাম স্বাভাবিক ভাবেই।

এক স্থানে অভাবিত ভাবে সমাদৃত হলাম।

আমাকে একটা টাকা দিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম।

আমার সঙ্গেই ছিল আমার বন্ধু ওই কর্তার ভাগিনেয়। তার হাতে দিলেন তিনি একটি সিকি। কর্তার ভাগিনেয় স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষুণ্ণ হ'ল। বললে, ওকে টাকা দিলে, আমি সিকি নেব কেন?

কর্তা কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে তাকে বললেন, যাও—যাও, যাও বলছি।

আমি পালিয়ে এলাম। হয়তো ভয়েই এসেছিলাম। মনে হয়তো হয়েছিল যে, আমার টাকাটাও হয়তো ফিরিয়ে দিয়ে সিকি নিতে হবে।

বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম বন্ধুর অপেক্ষায়। সে কি পায় দেখব। যাত্রার সাইতে কে কত পায় এ নিয়ে প্রতিযোগিতা হ'ত আমাদের মধ্যে। যে বেশী পেত, সে-ই আপন সৌভাগ্যে স্ফীত হয়ে উঠত।

হঠাৎ কানে এল ভিতর থেকে বন্ধুর কান্নার শব্দ। বন্ধু কাঁদছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, কর্তার বাড়ীর কোন কর্মচারী বন্ধুকে বলছে, ছি, কাঁদতে নাই। ছেলেমানুষ টাকা নিয়ে কি করবে? ওর বাবা মরেছে কিনা—তাই ওকে একটা টাকা দিয়েছেন তোমার মামা। ওর হিংসে করতে নাই, ও নেহাত হতভাগা ছেলে!

সে দিনের সে মুহূর্তটি আমার মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। সে যে কি হয়েছিল—তা বর্ণনা করা আজ সম্ভবপর নয়। শুধু ওই একটা কথা যেন লক্ষ কোটী হয়ে আমার পৃথিবীর আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে বেজে উঠেছিল।

হতভাগা ছেলে! হতভাগা ছেলে! হতভাগা ছেলে!

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।

মা আমার তখনও মাটির প্রতিমার মত আপাদমস্তক থান কাপড়ে আবৃত ক'রে প'ড়ে ছিলেন। এসে মায়ের কাছেই শুয়ে পড়েছিলাম। হাতে আর তখন টাকা-পয়সাগুলি সব ছিল না। প'ড়ে গেছে রাস্তায়।

মা মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি মস্ত লোক হবে। কেন হবে হতভাগা! দুঃখ ক'রো না। ও তোমাকে তাঁরা ভালবেসে বলেছেন।

টাকাটি ছিল না, প'ড়েই গিয়েছিল। বাকী সিকি দুয়ানি আধুলিগুলি মা ভিক্ষার্থীদের দিয়ে দিয়েছিলেন।

এই কারণেই একালে অবজ্ঞা অবহেলা জীবনে যা এসেছে, তাই আমি পথে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলতেই চেষ্টা করেছি আজীবন। আমার কালের যে অংশ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, পালন করেছে আমাকে মায়ের মত—এ হ'ল তারই শিক্ষা। দীক্ষা আমার কালের সেকালের কাছে।

অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমীলিত চক্ষু, হিমশীতল দেহ আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ—আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্তদৃষ্টি শুভ্রবাসপরিহিতা তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ; আমার জীবনে আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার

সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চিরকল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই। কোন কালে ওপারে ফুটেছে ফুল—কোন কালে এপারে ফুটছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়। ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপ ভেদ ক'রেই একদা আমাকে দেখা দেবেন। সে দিন আমার মাল্য-রচনা সমাপ্ত হবে। বলব, নাও আমার মালা। শেষ ক'রে দিলাম মালা-গাঁথার পালা। আমি হারিয়ে যাই তোমার মধ্যে। তোমার জয় হোক—জয় হোক—জয় হোক।